









# উজীর পুত্র

---

( নবজ্যাস )

---

শিবজীর অভিনয়-প্রণেতা  
ককিরচন্দ্র বসু প্রণীত ।

---

প্রকাশক  
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।  
বসুমতী-কার্যালয় ।

---

কলিকাতা,  
১৫১৪ নং গ্রেট স্ট্রীট, “নূতন কলিকাতা ইলেক্ট্রিক মেশিন যন্ত্রে”  
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

---

১৩১৮

মূল্য ৩/ তিন টাকা



# উপহার।

মহিমাধর

শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহিমাধরের।

মহার বাহাদুর।

আপনি আমাকে বিস্তর ভালও বাসেন, আমার অহুরাগও বিস্তর করেন। আমার কোন স্পৃহা নাই, যে, তাই প্রদান করিয়া আপনার সেই প্রণয়, সেই অহুরাগের সমাদর করি। আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব করেন, “আমার গুপ্ত কথা অতি আশ্চর্য্যই” তার প্রদীপ্যমান প্রমাণ। সেই সাহসে নির্ভর করিয়াই আমার এই “উজীর-পুত্র”কে আপনার প্রিয়তম নামে দরে বরণ করিলাম। “উজীর-পুত্র” আমার অনাথ লেখনীর মুখনিঃসৃত কতকগুলি সুসামান্য লিন রচনা। আপনাকে উপহার দিয়ে যে আপনার উদার প্রণয়ের, উদার অহুরাগের প্রতিদান রি, সেগুলি তার যোগ্য নয়। তথাচ বিদুরের কষ্টলব্ধ যৎকিঞ্চিতেও তায়, এই অপ্রস্তুত যোগ্য উপহারটি আপনার প্রতি আমার আন্তরিক ও শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিবে।

কুমার! যিনি হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্ত প্রথমাধি শেষ পর্য্যন্ত অবগত আছেন, তিনি অবশ্যই লিতে পারেন, ঐ রাজ্যের রাজসিংহাসন আরক্ত করিবার জন্য কি কি উপায়, কি কি কৌশল রংবার অবলম্বন করা হইত। শাজাহান বাদশাহের সভাসদবর্গের ষড়্‌যন্ত্র, রাজসিংহাসন হইয়া রি পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর ঘোর বিবাদ, এই সমস্ত ঘটনা এই অভিনব রচনার প্রদান স্পৃহা। যিনি চাতুরী, কোটল্যা, প্রবঞ্চনা ও নির্ভরতরূপ পাপময় অপবিত্র তরঙ্গের মধ্য দিয়া তা তরী চালাইবার চেষ্টা করেন, তাহার গমনপথে যে সকল দুঃখ, কষ্ট, বিপদ ও উপদ্রব উপ-হত হয়, তদ্ব্যব এই রচনাপটে চিত্রিত হইল, লক্ষ্য হইবে।

একজন মুসলমানের জীবন বৃত্তান্ত, এই নামে গ্রন্থখানি আপনার পরিচয় দিতেছে। গ্রন্থ-খানি ব্যক্তিবিশেষের জীবনাখ্যান হইলেও, ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি অস্থায়ী গল্পও নিবিষ্ট করা হইল। যে সকল লোক বহুজাতিতে বিভক্ত হইয়া এই প্রাচীণ জগতে বাস করিতেছে, তাহাদিগের রীতি, চরিত্র, আচার-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া ঐ গল্পগুলি লিখিত হইয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, এ স্থলে কাহারও স্বভাব বা প্রকৃতির উপর সমত প্রকাশ করা উচিত হয় না। ঐ দুই জাতির মধ্যে কোন জাতি নির্ভর আচরণে আর শোণিতপাত দর্শনে অধিক আমোদী, অথবা তাহাদিগের মধ্যে আর প্রকৃতি অধিক মন, তাহা স্বয়ং পাঠক মুহাশয়ের ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তবে তাঁহার এইমাত্র স্মরণ করা আবশ্যক যে, যৎকালে কন্যে গ্রন্থের লিখিত ঘটনাগুলি উপস্থিত হয়, তৎকালে হিন্দুরা,—পৌত্তলিক ধর্ম্মীক হিন্দুরা—তাহার স্বভাব উগ্রদর্শন মোগলদিগের আধিপত্যের অধীন বাস করিতেছিলেন। একজন ইংলকার ইকার কহেন, ঐ বিজেতা মোগল রাজপুরুষদিগের প্রদর্শিত পথের অহুগামী লইয়া পরভূত হিন্দুরা যে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে অচেতন থাকিবেন, অথবা অসংস্বভাবের গর্বে আত্মপ্রাধা ক্রিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

কুমার! যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ রাজকার্য্যের ভার লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, এতদেশস্থ লোকের স্বভাব ও চরিত্রের সংস্কারার্থ তাহাদিগের প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি-  
প্রাণিক। ঐ রাজপুরুষেরা, বিশেষতঃ বাহারা প্রধান প্রধান পদে অভিযুক্ত, তাহারা যদি ধর্ম্মের সেতু হইয়া সংপথ প্রদর্শন করেন, তবেই আমাদের আশা ফলবতী হইবার সম্ভ

নচেৎ শুদ্ধ বিজ্ঞানদান দ্বারা, কি মিসরীদিগের ভয়সী প্রবন্ধে তাহা কদাচ সফল হইবার নহে। ভৃত্য যদি দেখে, তার প্রভু কুসংস্কারে অঙ্গ টাণিয়া ফলাটলি করিতেছেন, তবে যে সেই ভৃত্য তাহার নিজের কুচরিত্র, কুব্যবহারগুলি পরিত্যাগ করিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর, সে প্রত্যাশা করাই বৃথা। ঐহারা এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রভু বলিয়া অভিমান করেন, অবৈধ, অকর্তব্য কার্য্য না করাই ঐহাদিগের ধর্ম্ম, হায় কি পরিতাপ ! ঐহাদিগের মধ্যে অনেকেই এ দেশের কুসংস্কার-পন্ন লোকের ছায় সেই সকল অকর্তব্য কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। মনে করেন, ঐহারা যেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জগদীশ্বরের অনধিকারেই বাস করিয়া থাকেন !

কুমার ! আপনি সরল, সদয়চিত্ত, দাভা এবং প্রণয়বান, আপনার নিখিল গুণের স্বরণস্বরূপ এই অকিঞ্চকর ক্ষুদ্র উপহারটি প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

কলিকাতা,—শোভাবাজার,

বাং সন ১২৭৮। ইং সন ১৮৭২।

বিনয়াবনত

শ্রীফকিরচাঁদ বসু।

## পাঠক মহোদয়ের প্রতি।

মহাশয় !

সম্প্রতি আমি বাঙ্গালা লেখাপড়ার আসরে নেশেছি। “শিবজীর অভিনয়” থেকে শুরু, এখন কোথা গিয়ে থামি, তা বলতে পারি নে। যেমন সামান্য গৃহস্থেরা বৃহৎ কর্ম্ম কোরে সুখ্যাতি কিনতে পারে না, তেমনি আমার মত হস্তীমুখ পণ্ডিতেরা লেখাপড়ার আসরে অভিনয় দেখিয়ে প্রভুল কোরে তুলতে পারে না। মহাশয় ! লোক যতই আহাম্রিক, যতই নাদান হোক, একটা না একটা গুণ তার থাকেই থাকে। আমিও সেই চিরপ্রসিদ্ধ স্বভাব-পদ্ধতির বার নই,—লোক হাসান, লোক চলান গুণটি আমার বেশ আছে। আমার রচনা-অভিনয় দর্শন কোরে আপনারা যে হাসবেন, সে কথা আমি দিবি কোরে বলতে পারি।

“উজীর-পুত্র” দেখে আপনি যদি হাসেন, হাসুন। কিন্তু যা ভেবেই আর যা বলেই হাসুন, একবার হাসলেই আমি জান্লেম, “উজীর-পুত্র” আপনার মনোরঞ্জন করেছে, কেন না, মনে আমোদ লে যুখে হাসি এসে না, এ কথা সকলেরই জানা আছে। আপনার সেই হাসি দেবে পরিশ্রম, আমার যত্ন, আমার আশা সফল হলো জান করুবো।

নৃত্য-গান যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, কবিবর শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী, প্রভাকরের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই মিত্রব্রতের সাহায্যে “উজীর-পুত্রের” প্রথম পর্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল।

কলিকাতা,—শোভাবাজার,

বাং সন ১৮৭৮। ইং সন ১২৭২।

বিনয়াবনত

শ্রীফকিরচাঁদ বসু।

# সুচিপত্র ।

## প্রথম পর্ক ।

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আমি আমার হইলাম	১
২।	বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ ভয়ানক	১২
৩।	বিনা মেঘে বজ্রাঘাত	১৭
৪।	এখন কার মন রাখি	৩০
৫।	যা ভেবেছ তা নয়	৪২
৬।	প্রণয় বি জোরের কাজ	৬৭
৭।	দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল	৮০
৮।	যার যেমন মতি তার তেমনি গতি	৮৬

## দ্বিতীয় পর্ক ।

৯।	আমার বাড়ী ভাঙে দাপা দিতে চায়	১০১
১০।	অনাথার দৈব সখা	১০৩
১১।	বাড়ী ভাঙে ছাই পড়ল	১১৭

## তৃতীয় পর্ক ।

১২।	মন চিন্তিলে মন হয়	১২৩
১৩।	যত হাস তত কান্না	২০৬
১৪।	যেমন কর্ম তেমনি ফল	২১৭
১৫।	সত্যী	২২৩
১৬।	হাসিলে না হাসে যেই	২৬৪
১৭।	যাক প্রাণ থাকুক মান	৩০৪
১৮।	না তোয়ানের দুনো মালগুজারি	৩১০

## চতুর্থ পর্ক ।

১৯।	লগাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে	কন ১
২০।	সাঁতার না জানিলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে	তাহা ১০
২১।	মা না বিউলো বিউলো মামী	পলকার ২০
২২।	বড় বাড়ীতে বড় ভালে	৩৫
২৩।	মুখে খুব মিঠে কিন্তু নিম-নিসিন্দে পেটে	৪২
২৪।	বিধির লিপি কপাল জোড়া	৫৩
২৫।	মরে নারী উড়ে ছাই	৭৪
২৬।	কর্তা গেলে খোল পাশনা	৮৮
২৭।	খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে	১০৪
২৮।	বিধির লিপি কপাল জোড়া	১১০



# উজীর-পুত্র

## প্রথম পরিচ্ছেদ

“আমি আমীর হইলাম।”

আগরা মোগল-প্রধান শাহজাহান বাদশাহের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে যখন আমি নগর-দর্শনার্থ গৃহের বাহির হইতাম, তৎকালে চতুর্দিক্ হইতে এই কথাগুলি আমার কর্ণ-বিবর চুধন করিত ; -

“সাদক সেলাম! সাদক বন্দগি! শাহজাহান বাদশাহ জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ। আল্লা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছেন। সাদুলা সেই দুর্জয় বলবান্ সম্রাটের উজীর। আপনি সেই প্রবীণ পরাক্রান্ত উজীরের পুত্র, আপনার মঙ্গল হউক।” আহা! ঐ সাদর বন্দনাগুলি শ্রবণ করিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতাম! ঐ স্তব-স্ততিগুলির উচ্চারণধ্বনি কতই মধুর বোধ হইত! হায়! আমার তেমন দিন আর হবে না! সেই সুখময় দিন আমার ভাল স্মরণ আছে, আজও বিস্মৃত হই নাই। তখন আমাকে সকলেই গোরব করিত। তখন ধনবানেরাও—আমার অপেক্ষা প্রধান পদের লোকেরাও—দুর্জয় মোগলরাজের প্রিয় উজীরের পুত্রের নিকটে মণ্ডক অবনত করিতে দিবা করিতেন না। তখন কাহাকেই বা আমার ভয় ছিল;—সুখ, সম্মান, ঐশ্বর্য্য ভিন্ন আর আমার অভিলাষই বা তখন কি ছিল? আমার পিতা উজীর-প্রধান; বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার বিত্তীয় বৃহস্পতি বলিলেই হয়। তৎকালীন তাঁহার সদৃশ রাজনীতিবেত্তা অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহার রাজস্বামী শাহজাহান শত-যুগে তাঁহার গুণের অহরাগ করিতেন। পিতার

অনেক শত্রু ছিল, তাহারাও তাঁহার প্রভুত বুদ্ধিপ্রভাবে অথবা স্থির বীর্যের প্রতিবাদ করিত না। পিতা আমার আপনার ক্ষমতা-বিষয়ে নিশ্চয় ছিলেন। রাজপ্রসাদে কখনও বঞ্চিত হইবেন, সে সংশয় করিতেন না। এই সকল সাহসে নির্ভর হইয়া তিনি কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতেন না। অস্ত্রের তো কথাই নাই, বাহারা বাদশাহকে অষ্ট প্রহর ঘিরিয়া থাকিত, সে সকল ওমরাওকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তাহাদের একবার ফিরেও দেখিতেন না, কি একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না। অথবা বাহারা তাঁহার পদের অভিলাষী হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের হিংসা করিত, সে সব লোকের সঙ্গেও মিত্রতার কোশল করিতেন না। পিতা আমার সকল কার্যের আদর্শ ছিলেন। তিনি যখন যেক্রমে যে কার্য্য করিতেন, আমি সেই সময়ে সেইরূপে সেই কার্য্য করিতাম। অবশেষে তাঁহার চালিচলনগুলি অবিকল শিক্ষা করিলাম। এমন কি, লোকে স্পষ্টই বলিত, ‘যদি বয়সের ভেদাভেদ না থাকিত, তবে বৃদ্ধ উজীর কি বালক উজীর আমরা কাহার সম্মুখে উপস্থিত আছি, সেটি সন্দেহের বিষয় হইত।’ আমার আকৃতি পিতার সদৃশ ছিল না, তথাচ লোকে ওরূপ সন্দেহের কথা কেন বলিত? বোধ হয়, আমাকে প্রসন্ন করাই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। পিতা ধর্ম্মীকার, স্থলকার; যুক্তি-ধানিও সুদৃঢ় ছিল না। অথচ আমি না স্থল, না ক্রুশ; দীর্ঘকায় ছিলাম। দৃষ্টি যদিও তাদৃশ রূপবান্ নই, কিন্তু অরঙ্গবুট স্ত্রীভোল ছিল।

শাহজাহান (সাগরা-পৃথিবী পতি) ইংরাজি ১৫৯২ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬২৭ সালে দিল্লীর মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৬ বৎসর।



বাদশাহ ভারতরাজ্য জয় করিয়া অধিকার করেন। তৈমুরলেন হইতে পুরুষপরম্পরায় শাহজাহান দশম পুরুষ। শাহজাহান বাদশাহ কোথাও রজ্জুর কোশলে, কোথাও অসির প্রভাবে তৈমুরধারাগত পুরুষমাত্রের প্রাণ সংহার করেন। অবশেষে বাদশাহ আপনি ও তাঁহার পুত্রকতিপয়মাত্র বাবরের বংশাবশিষ্ট ছিলেন। শাহজাহানের এই ভূনাট্যটি কাহারও নিকট গোপন ছিল না। শাহারা বাদশাহের প্রতিনিধি হইয়া সেই রুধিরপ্রাবিত নিষ্ঠুর ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কেহ ভরসা করিয়া তাঁহাদিগের নাম প্রকাশে ব্যক্ত করিত না। কেবল কোণে কানাচে ফস্ফাস কবিয়া কানে কানে মাত্র বলাবলি করিত। ঐ দুর্জন নৃপালের কে কে গুপ্তচর ছিল, তাহাদিগের নামই বা কি, কেনই বা তাহারা নিমিত্তের ভাগী হইল, এ সকল তথ্যের সন্ধান করিলে আমি সুখী হইতাম কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ সে সকল বহুকালের ঘটনা। বোধ হয়, আমি তখন জন্মগ্রহণও করি নাই। এক্ষণে সেই রক্তান্তগুলি লোকের মুখে শুনিতে হইত। কিন্তু লোকে যেটি বলিত, সেটি সত্য কি মিথ্যা, সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার উপায় ছিল না। তাই সাত পাঁচ চিন্তা করিয়া আমি আর সে বিষয়ের আন্দোলন করি নাই। ইতিমধ্যে চঠাং একদিন একটি গুপ্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল।

কিছু দিন পরে পিতার আধিপত্যে যোগল-রাজের প্রধান শরীররক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক নহে। তথ্যচ বাদশাহের অন্তঃগৃহে আমীরের পদ প্রাপ্ত হইব, এই আশা বলবতী হইল। অল্পকালের মধ্যে তাহা সফলও করিলাম। এত অল্প বয়সে উচ্চপদস্থ হইতে ও দিন দিন সম্মান লাভ করিতে দেখিয়া ওমরাও-পুত্রদিগের হিংসা জগিল। তাঁহাদিগের এ বৈরিতা বিচিত্র নহে, পিতা সেটি পূর্বেই স্থির কোরে রাখিয়াছিলেন। তাই তিনি আমাকে কথায় কথায় সাবধান হইয়া চলিতে বলিতেন। কি কার্যের, কি বাক্যের

ক্রটিতে আমার উপর কেহ যেন কুপিত না হয়, আমি যে প্রধান, এ ভাবটি যেন ভঙ্গির দ্বারা প্রকাশ না করি, সকলের নিকট বিনয়ী ও নম্র-হই, যে যেমন ব্যক্তি, তাহাকে সেইরূপ সম্মান সমাদর করি, পিতা সর্বদাই এই সকল উপদেশ দিতেন। আমিও তাঁহার আদেশমত চলিতে লাগিলাম। কিন্তু মনুষ্যেরা যখন সংকল্প করিয়া পরহিংসায় ত্রুণী হয়েন, অথবা যিনি যতই স্তাবক হউন, কাহারও গুণ-স্বত্তিতে প্রসন্ন হইবেন না, তাঁহারা যখন একরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তখন আমি কি, প্রাচীনেরাও তাঁহাদিগের হিংসা-শর বার্থ করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহাদের চতুর কোশল, প্রবীণ বুদ্ধি সকলই অকর্মণ্য হইয়া যায়। আমার সম্বন্ধে সেইটিই ঘটিল। দেখিলাম, শত্রু চতুর্দিকে বেড়িয়াছে। তখন এত কি জানি; আবার ভাবিলাম, আমিই পিতৃভূনাট্যের অকারণ মূল্য-ধার! সে জন্যও অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। যাহাই হউক, যে দিবস পদস্থ হই, সেই দিন সায়ংকালেই রাজপুরীর মধ্যে নির্দিষ্ট গৃহে বাসস্থান করিলাম। গৃহগুলি আতঃশস্ত্রমধ্যে একটি উঠান, ঐ উঠানের মধ্যস্থলে এ-টি ফোয়ারা বিরাজ করিত; তাহার চতুর্পাশ্ব সুন্দর সুন্দর পুষ্প হরুতে সুষোভিত। ফোয়ারার জলপ্রবাহে ও নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভে বাসস্থানটি যেমন সুশীতল, তেমনি আবার প্রফুল্লরসে পবিত্র ছিল। ফোয়ারার সম্মুখে একটি বারান্দা, সেই বারান্দায় বসিয়া জলপ্রবাহের কোতুক দর্শন করিতাম। দোঁসরে মধ্যে একটি আলবোলা। কতকগুলি বারিধারা প্রস্তরময় সিংহ ও নরসিংহের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমতঃ উর্দ্ধে উঠিত, আবার নম্রমুখে প্রবাহিত হইয়া একটি কৃত্রিম খাতে পতিত হইত। সেই সময়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা আমার মুখমণ্ডল শিশিরাক্ত করিত।

আমার এ অবস্থাটি স্থলের একশেষ বলিলেও বলা যাইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; হৃদয় উদ্ঘাটন করিয়া নির্ভয়ে সকল কথা কহিতে পারি, ঈদৃশ একটি মিত্রের অভাবে আমি বড় অসুখী ছিলাম। কি পরিতাপ! আমার বন্ধু কেহই ছিল না। স্তাবক, চাটুখান্দী অনেক ছিল বটে, কিন্তু সেই সকল লোকের

## উজীর পুল

প্রতি আমার জাত-স্বর্ণা থাকায়, বরং একাকী থাকিতে ভালবাসিতাম, তখাচ ভাক্ত বন্ধুদিগের সংসর্গ করিতাম না। যখন কোন কার্য্য-কর্ম্ম না থাকিত, বারান্দায় বসিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে ফোয়ারার জলপ্রপাত দর্শন ও বরষার জলপাতের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতাম। বাসস্থানটি পুষ্পগন্ধে আয়োদিত ছিলই-তো, কখন বা সেই উপাদের বায়ুর আঘাণে আপনাকে আপ্যায়িত করিতাম। এইরূপে দিনযামিনী কাটিতে লাগিল।

একদিন সায়ংকাল অত্যন্ত করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি; জলধরনের শব্দের মিক্ররসে শরীর লোমাক্ষিত হইল, অমনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। বরকন্দাজ খাঁ যে দিকে বাস করিতেন, সেই দিকের একটি কবাট সশব্দে রক্ত হওয়াতে তাহার স্বপ্ননাথ আমার চৈতন্য হইল। বরকন্দাজ খাঁ রাজকীয়তা, তিনি বাদশাহার কনিদ পুত্রা রসিনারা বেগমকে সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত অপেক্ষা এই ব্যক্তি আমার পদম শত্রু। সম্প্রতি আমি যে পদে নিযুক্ত, অনেকদিনাবধি বরকন্দাজ খাঁর মনে মনে ছিল, তাহার ভ্রাতৃপুত্র ইউসোফ ঐ পদে অভিযুক্ত হয়। যাহাই হউক, শব্দ শুনিয়াই অমনি উঠিয়া বসিলাম, বোধ হইল, বারান্দা থেকে একটি লোক নিঃশব্দে চলিয়া গেল, আমি যেন তাহার ছায়া দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ পেয়কবজখানি হস্তে লইয়া বারান্দার অন্তঃস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইলাম, মন্ত্রণের সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলাম না। একবার ভাবিলাম, একে ত অন্ধকার রাত্রিে ঝাপসা বোধ হয়, তাহাতে আবার তামাকের ধোরে অধোরনিদ্রায় অচেতন ছিলাম, হয় ত আমার ভ্রমই হইয়াছে। আবার ভাবিলাম, না, কেহ আমাকে গুপ্ত-হত্যা করিবার মনন করিয়াছে। শেষে সেইটিই স্থির করিলাম। আমি যে গৃহে শয়ন করিতাম, তাহার নিয়তলস্থ পার্শ্বের ঘরে কেহ কোথা লুকাইয়া ছিল কি না, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তত অন্ধকারে চোরা চোরা দরজা দিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিঁড়ি

বাহিয়া নীচে নামিলাম, নামিয়াই কতক দূর চলিয়া গেলাম, পরে অল্পমান হইল, আমার বাসস্থান অনেক পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি অমনি ফিরিলাম, ফিরিয়া বড় অধিক দূর আসি নাই, এমন সময়ে মন্ত্রণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। রাস্তার বামে স্থিত একটি কুঠরী হইতে ঐ কণ্ঠস্বর আমার কর্ণ স্পর্শ করিল। আমার এ অবস্থাটি সূত্রে হইল না, আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম। এখন করি কি? প্রকাশ হই, না ধীরে ধীরে প্রস্থান করি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কখন কেঁদার খুলিয়া বাহিরে আসিবে, সেই প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে দাড়িয়ে থাকা আমার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না, হয় ত কেহ বলিবে, আমি কোন পক্ষের চর হইয়া তাহাদিগের গুপ্ত কথা শুনিতেছিলাম। নেটি বড় রণার কথা।

তখন ভাবিলাম, বহুমতীর গর্ভে যদি স্থান পাইবার উপায় থাকিত, তবে আমি এই দণ্ডেই প্রবেশ করিয়া তাহার কি বলাবলি করিতাম, শুনিতাম। গুপ্ত পরামর্শ যে কাহারও শুনিবার অধিকার নাই, সেটি তখন বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তখন মহা অন্ধকার কোলের মাছুষ দেখা যাইতেছিল না। আমি ঐ অন্ধকারে হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, একটি দ্বার উদার মুক্ত রহিয়াছে, ঐ ঘরের পার্শ্বগৃহেই কতকগুলি লোক এক-মন এক-চিত্ত হইয়া কথোপকথন করিতেছিল। আমি ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে মনে এই স্থির করিলাম, উহারা যেই হউক, যতক্ষণ না কথা-বার্তা শেষ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে, ততক্ষণ আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করিব। অপেক্ষাই করিতেছি, তাহাদিগের কথোপকথন শেষ হইয়াও হইতেছে না, কি কথা হইতেছিল, আমি তাহার এক বর্ণও শুনিবার চেষ্টা করি নাই। কেবল ভাবিতে লাগিলাম, কতক্ষণে শেষ হইবে, কতক্ষণেই বা আমি পরিভ্রাণ পাইব, কি আমাকেই বা আজ এই ঘোরাচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তে রাত্রি প্রভাত করিতে হয়। অবশেষে অনেকক্ষণের পর সেই নিগূঢ়ায়ক অল্পক কণ্ঠস্বর নীরব হইল, বোধ হইল, যে যাহার স্থানে

চলিয়া গেল। কি বিপদ! আবার দুই ব্যক্তি পথে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতে লাগিল, আমি যে গৃহে গোপনে ছিলাম, তাহার নিকটেই নাকি তাহার দাঁড়াইয়া ছিল, সুতরাং তাহাদিগের কথাগুলি অবোধে শুনিতে পাইলাম। এক ব্যক্তি বলিল, “তুমি তা আশ্চর্য জান করিতেছ কেন? যখন পিতার উপকারগুলি বাদ শাহ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না তখন তাঁর পুত্রের উচ্চ পদ, উচ্চ সম্মান হইবেই তো, সে তো হবার কথা।” দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যঙ্গস্বরে বলিল, “পুত্র। বটেই তো! কিন্তু তুমি যে সর্কদাই বল, শোণিতপাত-ব্যাপারই ঐ উন্নতির একমাত্র মূল্যধার, সে কথা কি সত্য?” প্রথম ব্যক্তি কহিল, “সত্য নয় তো কি? সাহসার নরহস্তাহস্তে তৈমুর বংশের শেষাবশিষ্ট সন্তান নিধন হয়, এ কথা কে না অবগত আছে?”

আমার আর সহ্য হইল না। ঐ কথা শ্রবণ করিয়াই আমি তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলাম। ‘হারামজাদা, ও সব মিথ্যা কথা, আমার পিতার কোন দোষ নাই, তিনি নিরপরাধী’ ইত্যাকার গর্জন-শব্দে ঐ দুরাচারদিগের সম্মুখে ধাবিত হইয়া এক ব্যক্তির হাত ধরিলাম, সে তাহার হাত ধরিতেই “সুব্বাহান আল্লা! এ যে সাদক!” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং আমার হস্তপাশ হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিল। আমি বলিলাম, “হাঁ, আমিই বটে, দৈবযোগে এ স্থানে আসিয়া আমি তোদের গ্লানির কথা সব শুনিয়াছি, তোরা কে? তোদের নাম কি? তোদের এ সব মিথ্যা কথা, তা যতক্ষণ না স্বীকার করি, ততক্ষণ আমি কাহাকেও ছাড়িব না।” আমাকে দেখিয়াই দুরাত্মারা অতিশয় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু আমার এই আশ্ফালনের অবসরে আবার তাহাদের সাহস জন্মিল, তখন আমাকে ধম্মাধরি করিয়া, যে ঘরে কথোপকথন হইতেছিল, সবলে আকর্ষণ পূর্বক সেই ঘরে লইয়া ফেলিল। আমার ত্রাস হইল, হয় তো আমাকে হত্যা করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়; কিন্তু হুঠেই আমাকে ঐ ঘরে রাখিয়া তাড়াতাড়ি বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। আমি সেই অন্ধকারে পূর্বের মত হস্তস্পর্শ

করিয়া দেখিলাম, দ্বারটি বন্ধ নয়, কেবল সংলগ্ন মাড় রহিয়াছে। তাই দেখিয়া সাহস হইল, তখন আন্তে আন্তে বাহিরে আসিয়া কোন দিকে আর দৃষ্টিপাত না কোরে একেবারে গৃহে উপস্থিত হইলাম, ভাবিলাম, এ যাত্রা পরিত্রাণ হইল। আমার প্রক্লাম্পদ পিতার ঘৃণিত অপবাদটি অরণ করিয়া মনে মনে মহা দুঃখিত ও বিরক্ত হইতে লাগিলাম। মন সুস্থির ছিল না। সুতরাং সে রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা হইল না। পরদিবস প্রাতে আমাকে আমখাসে উপস্থিত থাকিতে হইবে, সেই জন্ত সকাল সকাল গাত্রোথান করিয়া তাহার উদ্যোগ করিলাম। ঐ রাজমন্দিরে সম্রাট প্রত্যহ গিয়ে বসিতেন। আমার এ নূতন পদ, সবে আজ আমি সভাস্থ হয়ে নূপালসমীপে প্রথম উপস্থিত হইব। অল্প দিনেরূপ পরিচ্ছদ কোত্তম, আজিও প্রায় সেইরূপই কোলেম, বিশেষ ঘোর ঘটা কিছুই ছিল না, ভাব্লেম, আমাকে কে না জানে, কে না চিনে, বেশভূষার আড়ম্বর কোরে পরিচয় দিবার আবশ্যক কি? তবে আর আর দিন অপেক্ষা অঙ্ককার পরিচ্ছদটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। সভা আরম্ভের অনেক পূর্বে সমরোচিত সুসজ্জিত হলেম, কিন্তু তৎকালীন রাজদর্শনে উপস্থিত না হয়ে, আপনার বারান্দায় সেকৌতুকে ইতস্ততঃ বেড়াতে লাগেলাম। বারান্দার এক ধারে একখানি বৃহৎ আয়না ছিল এক একবার ঐ দর্পণ খানিতে আপনার অবয়বটি দর্শন করি, আর এক একবার বারান্দায় পায়চারি কোরে বেড়াই, কখন বা একটু স্থির হয়ে একবার গৌকে তা দিই; একবার বা দাড়িটি আকৃষ্ট কোরে চেঁচু আকারে উর্দ্ধে উঠিয়ে রাখি। এইরূপে সেই মিত্রবৎ অল্পকাল দর্পণের সম্মুখে বারম্বার উপস্থিত হলেম, ঐ দুইবারই আমার নিজের মূর্তিটি ভিন্ন অল্প কিছুই দৃষ্ট হইলো না। তৃতীয়বারে উপস্থিত হয়ে দেখ্লেম, হুটি কক্ষ আখি পল্লরাগমণির জায় আরক্ত বিষাদবরের সন্দেশে একত্রে ঐ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হোচ্ছে, দর্শন কর্ণবামাত্র বোধ হলো, কেহ যেন শলাকায় বিদ্ধ কোরে আমায় সেই স্থানে আবদ্ধ কোলে। আমি কি জাগ্রত, না এটি স্বপ্ন, না কোন

## উজীর পুত্র ।

সুসুন্দরী সুপ্রসন্ন হয়ে আঁমায় কুণ কোলেন? আমি তো কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেন না। যার উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত হয়ে আমার চক্ষু-দক্ষ কোলে, তিনি কে? তাঁহার নিবাস কোথায়? কেন আঁমায় সদয় হয়ে দর্পণে দর্শন দিলেন? এই সমস্ত সন্ধান জানবার নিমিত্ত আঁমায় চিত্ত ব্যাকুল হলো। মনে কতই কি উদয় হতে লাগলো। আপনা আপনি কতই বিতর্ক কোত্তে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই অন্তঃকরণের তৃপ্তি জন্মিল না, স্থির কিছুই কোত্তে পাল্লেন না। আমি এখন পূর্ণাঙ্গের আঁরও বাস্ত, আঁরও ব্যাকুল হলেম, আঁমায় যেন যমযন্ত্রণা, আঁমায় যেন শয্যাকটক উপস্থিত হলো। একবার একটু স্থির হয়ে কত কি সিদ্ধান্ত করি, আঁবার দ্বিগুণ উৎকর্ষিত হয়ে একবার বারান্দার এ দিক, একবার সে দিক ছুটোছুটি কোবে বেড়াই এইরূপ উৎকর্ষায় অবলুপ্তি হোচ্ছি, ইতিমধ্যে একবার ঐ দর্পণ থেকে নয়ন অপসৃত কোরে, বারান্দার পুরঃস্থিত প্রাঙ্গণের পরপারে যেমন দৃষ্টিপাত কোলেম, অমনি একটি গবাক্ষদ্বার তড়িতের ত্রায় দ্রুতবেগে অবরুদ্ধ হলো। তখন আমি অনেক সুস্থির হোলেম, আঁবার পূর্বমত সেই দর্পণে আপনার অবয়বটি দেখতে লাগলেন। মনে মনে বাসনা, সেই চাকরুপটি পুনর্বার দর্শন করি। কিন্তু কি পরিতাপ! সে বিনোদমূর্তিটি আঁর আঁবির্ভূত হোলেন না, কস্মিনকালেও যে আঁর তাঁর দর্শন পাব, এ পাপচক্ষে আঁর যে কখন সে রূপের ডালি অবলোকন কোরবো, এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে আঁর যে কোন কালে সেই কৃষ্ণনয়নার সাক্ষাৎ ঘোটবে, এমন আশাও রহিল না। আমি যদি তৎকালীন তত উতলা হয়ে, কে কি বৃত্তান্ত জানবার অভিলাষ না কোত্তেম, তবে আঁর এ মনস্তাপটি পেতেম না। এক্ষণে আঁবার নূতন উপসর্গ উপস্থিত—সেই মোহিনী মূর্তিখানি আঁমায় অন্তর-পটে চিত্রিত হগো। আমি বাহ-জ্ঞান-শূন্য হয়ে কেবল সেই চিত্রখানিই দর্শন কোত্তে লাগলেন। সময় যে কারও বাধা নেই, আমি যে কেন আঁজ বেশভূষা কোরে

প্রস্তুত হয়েছিলাম, তখন আঁর সে সকল কিছুই মনে ছিল না। আঁমায় ভূতা সলিমান এসে আঁমায় যদি চেতনা কোরে না দিতে, তবে যে কতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ধ্যানে ঐ জ্ঞানে অচেতন থাক্তেম, সে কথা কে বলতে পারে? আমি বাবান্দায় পাদ-বিহার কোত্তে কোত্তে সেই বিনোদ রূপখানির চিত্তা কোত্তেছিলাম, এমন সময় সলিমান এসে ব্যাঘ্রের মত হঠাৎ আঁমায় আক্রমণ কোলে। ভয়, আতঙ্ক ও বিস্ময় তাহার মুখমণ্ডলে চিত্রিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহার ধৃত্যয় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “বেটা! তুই বড় বে-আদব হয়ে উঠেছিস—তোরা ভারি বুক বেড়ে গেছে; আঁমায় সঙ্গে বরাবরি করিস, তোরা এত বড় আঁস্পর্কী!” সলিমান বলিল, “হজুর! রাগত হবেন না, আপনি কি শেখবারের নাগরার ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই? অনেকক্ষণ হইল, সম্রাটের বার হয়েছে,—ওমরাওরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, আমখাসে খাইতে আঁর বাণী কেহই নাই।” আঁমায় তখন চৈতন্য হইল, কি করিলাম! কি সর্বনাশ! আজি অদৃষ্টে কি আছে না জানি। আমি এখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাজদরবারে চলিলাম। গিয়া দেখি, আমখাস জমজম করিতেছে—সকলেই প্রফুল্ল, কেবল বাবার মুখখানি মলিন,—তিনি বিষমভাবে দাড়িয়ে আছেন। বরকন্দাজ খাঁ আঁল্লাদে বকের পাটা উঁচু করিয়া গৌকে তা দিতে দিতে চলেছে। তাহার ভাতুপুত্র ইউসোফের বদনে আঁনন্দের হাসি উথলিয়া উঠিতেছে। তাহারা তখন দুর্জয় শাহাজাহানকে কেবলমাত্র অভিবাদন করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিতেছিল। হায়! আঁমায় অনেক বিলম্ব হইয়াছে! এক্ষণে আঁর কি বলিয়া বাদশাহের সম্মুখে দাড়াইব? কোন্ লজ্জায় আঁর তাঁহাকে মুখ দেখাইব? আঁদব বাজাইবার—সেলাম করিবার আঁর সময় নাই;—সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে! আমি কাঁফরে পড়িলাম; কি ডাইনে, কি বামে, কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস হইল না। খানিকক্ষণ অধোবদনে রহিলাম; শেষে ওমরাওদিগের

নিকট হইতে অন্তর হইয়া আমখাসের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাদশাহ পাছে আমাকে দেখিতে পান, কি জানি পাছে দৈবাৎ আমি তাঁহার চক্ষে পড়ি, সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে আমার অধীনস্থ সেনা-বাহী ইয়াইল খাঁ দেখিতে পাইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

ইয়াইলের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল না, তিনি যথার্থই আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “সেনাবাহী! আপনি এমন দুঃখ কেন—” এই পর্য্যন্ত বলিতেই “আল্লার দিবা, আর ও কথার উল্লেখ করিও না, আমি সময়-শিরে উপস্থিত হইতে পারি নাই, আমার মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছে, আমি নাগরার আহ্বানধ্বনি শুনিতে পাই নাই,” এই উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। আমার বাক্যের মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইয়াইল মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইলেন, শেষে বলিলেন, “আপনি রাজপুরে বাস করিতেছেন অথচ নাগরার ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই?” যেরূপে বাহা খটিগ, তিনি তো সে সব রসাতল কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস হওয়াই সম্ভব। দপণে আবিভূত সেই দুটি রূক্ষ আঁখি, সেই দুটি লোহিত ওষ্ঠাধর আমাকে এত অভিভূত করিয়াছিল, নাগরার ধ্বনি তো অতি সামান্য কথা, যে ভূমিকম্পে পৃথিবী রসাতল-শায়িনী হন, তাদৃশ গুরু আঘাত ভিন্ন অন্য কোন লঘু অভিঘাতে আমার চৈতন্য হওয়া সম্ভব ছিল না। এটি স্বল্প কথা, অত্যাক্তি নহে।

এই কথা শুনিয়া ইয়াইল অবাক হইয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, আমি বলিলাম, “বন্ধু! এটি অসম্ভব বটে, তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে সত্য, আমি কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার এ বিলম্ব হওয়া শুদ্ধ দৈব বিপাক।”

ইয়াইল বলিলেন, “তা আমি নিশ্চয়ই বুঝেছি, এখন সন্ধ্যার মনে সেইটিই বিশ্বাস হউক, আমার এই প্রার্থনা।” এই কথা শুনিয়া আমি উচ্চনাদে বলিলাম, “সন্ধ্যাটুকি আমার

কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?” ইয়াইল বলিলেন, “সে কি কথা, বাদশাহ তাঁহার ক্ষুদ্র দামকেও বিশ্বস্ত হন না, আপনি তাঁহার প্রধান শরীররক্ষক, আপনাকে বিশ্বস্ত হইবেন?—এ আপনার বড় ভ্রম। আপনার উচিত ছিল, সকলের অগ্রে বাদশাহের সম্মুখে জাহ্নু পাতিত করেন।” আমি বলিলাম, “আল্লার দিবা, সমাটুকি বলিয়াছেন, বল।” ইয়াইল উত্তর করিলেন, “আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর মনে যে কষ্ট হইয়াছে, আপনি তা বুঝিতেই পারিয়াছেন।” আমি বলিলাম, “হাঁ, সেটি আমি জানিতে পারিয়াছি সত্য, কিন্তু এত কাণ্ডের পর শেষে কি দাঁড়াবে, বলতে পার?”

ইয়াইল উত্তর করিলেন, “শেষে অমঙ্গল, বিশেষতঃ এ সময়।” আমি বলিলাম, “কেন, এ সময়ের মানে কি, এ কি মন্দ সময়?” ও কথার কোন উত্তর না দিতে হয়, তাই একটা ওজর করিয়া ইয়াইল স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমি এক্ষণে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও পূর্ব্বের মত আবার ঘেননিষ্ঠ হইলাম। এই সময়ে আমখাসের সমারোহ-ব্যাপার দর্শন করিবার প্রচুর অবকাশ হইল। যাহারা মোগলরাজ্যের রাজসভা ও তদ্ব্যস্তান্ত সবিশেষ অবগত নহেন, তাহাদিগের কোতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত এই স্থলে সংক্ষেপে কতক কতক বর্ণনা করিতেছি।

আমখাস একটি বৃহৎ বাটী;—চতুর্দিকে অট্টালিকা, মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত চতুর্দোণ উঠান। অট্টালিকার গৃহগুলি খিলানে নির্মিত এবং একটি একটি ভিত্তি দ্বারা পরস্পর পৃথক্, অথচ গৃহ-পরস্পরে গমনাগমনের নিমিত্ত একটি একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। উঠানের বহির্ভূৎ সংহদার, ঐ সংহদারের উপরে নাগরাধানা। তুরী, ভেরী, শানাই, করতাল, জয়ঢাক প্রভৃতি নানাবিধ বাজ্যন্ত্র ঐ নাগরাধানায় এককালে নিনাদিত হইত, কিন্তু তাহার সময় নির্দিষ্ট ছিল। ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা কহেন, ঐ নাগরাধানার বাজের শব্দ এত কঠোর যে, লোকের কর্ণ বধির করিত, কিন্তু অভ্যাসের এমনি শক্তি, দেখাচারের এমনি গুণ, তত কঠোর হইয়াও কাহারও

অসুখ বোধ হইত না, বরং সকলেই বিবেচনা করিত, নাগরাখানার সদৃশ স্তম্ভের বাজ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই \* । সিংহদ্বারের পশ্চাতে যে বৃহৎ উঠান, ঐ উঠান অভিক্রম করিয়াই একটি পরম রমণীয় প্রকাণ্ড দালান, দালানটি মহান্ উচ্চ, বায়ু-সেবনযোগ্য উদার যুক্ত এবং অনেকগুলি চিত্রিত ও স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ-মালায় সুশোভিত । ইহার তিন দিক্ অনারত; ঐ তিন দিক্ হইতে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটি দৃষ্ট হইত । যে ভিত্তিমালা অন্তঃপুরের গৃহগুলি স্বতন্ত্র ছিল, সেটি আট হাত উচ্চ, তাহার মধ্যস্থলটি বিশাল আয়ত, বিস্তার অনারত । বাদসাহ প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে সেই দালানে রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন । দারা, আরজুজিব, সুলতানজঙ্গা মুরাদবাকি, এই চারি রাজপুত্র তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিতেন পোজারা বড় বড় পাখা লইয়া বাতাস করিত, কেহ বা মশা-মক্ষিকার উৎপাত নিবারণার্থে বিচিত্রপুঙ্খ চামর ঢুলাইত ।

সিংহাসনের নীচেই ওমরাও, রাজা ও রাজ-প্রতিনিধিগণের স্থান । বকের উপর কোণা-কাণি ছাত বাধিয়া নতশিরে অধোদৃষ্টে তাঁহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত । দালানের দাকী অবকাশস্থান ও আমখাসের সমুদয় উঠানটি ধনী, অধনী, নীচ, উচ্চ, নানা প্রকার লোকে পরিপূর্ণ হইত । যিনি যেখানে অবস্থান করুন, সম্রাট্ সকলকে সমানরূপে দেখিতে পান, এই কোশলে ঐ রমণীয় দালানটি প্রস্তুত হয় ।

আমখাস লোকারণ্য, বাদী প্রতিবাদী চামাস্গীর ভিন্ন, জমাদার, চোপদার, মেপাই, গান্ধী, পাইক, বরকন্দাজ, উকীল, মোক্তার, নফর-চাকরে গিন্ গিন্ করিতে লাগিল । আমি কোতুক দেখিব কি, বরং আঁধার দেখিতে লাগিলাম । এমন সাহস হইল না, একবার চক্ষু বুলাইয়া চারিদিক্ ভাল করিয়া অবলোকন করি । সময়মত হাজির হইতে পারি নাই, সেই অলক্ষণ বিলম্বের ভয়েই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল । কত লোক ভিড় ঠেলিয়া,

\* ঐ মধুর বাদ্য বিদেশীয় ইংরাজ ও অন্য ইউরোপ-বাসীর কর্ণে কর্ণশ বোধ হইতে পারে । কিন্তু অশ্ব-শাদিহ্র অবশে মূলা বর্ণন করে ।

কেহ বা পাশ কাটাইয়া সম্রাটের দিকে ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে যাইতে লাগিল, হয় ত তাহার মুখে কোন প্রার্থনা করিবে, নয় ত একখানি আরজি আপনারা হাতে করিয়া তাহার পায়ের উপর দরিয়া দিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায় । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে বুকদাড়া খাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কেহ বা পায় পায় বাধিয় পড়ে যাইতে লাগিল । ইহাদের সাহস কম । অনেকে আবার মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া সেই নিবিড় জনতার মধ্যে দিয়া পথ করিয়া লইল, ইহাদের ডানপিটে স্বভাব, যেমন ছপ, তেমনি বুক; কাহাকেও গ্রাহ্য নাই । বাদশাহ তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার ক্রক্ষেপও করিল না, বরং অকুতোভয়ে তাঁহার দৃষ্টিপথে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রহিল ।

আমখাসের তামাসা দেখা শেষ হইয়া বাহাদের একটু এ দিক্ ও দিক্ কটাক্ষপাত করবার অবকাশ ছিল, তাহার কেবল এই হতভাগাকেই চেয়ে চেয়ে দেখিতে লাগিল । নিঃসন্দেহ তাহাদের মনে এই সংশয় হইল, অপর অপলা প্রধানেরা তো আপনাদের মধ্যে পরস্পর বলা-কহা করিতেছিল, আমিও তো একজন প্রধান বটে, তবে আমি কেন আমার সমগুটী আমীরদের সঙ্গে কর্তব্যান্ধায় না থাকিয়া চোরের মত এক পাশ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম ? ভাল তাই যা হউক, আপনার স্থানে গিয়াও তো বসিতে পারিতাম, তাই বা না করিলাম কেন ? আজ আমার উচ্চ পায় কোথায়, আরও মান-রুদ্ধি হইবে, লোকে আরও গৌরব করিবে, তা না হইয়া ঠিক তাহার উল্টা হইল ! আজ আমার সঙ্গে কেহ একবার ভাল মুখে কথাও কহিল না, কেহ একবার ডেকে জিজ্ঞাসাও করিল না । আর আর দিন বরং ভাল ছিল, আজ আমাকে সকলেই উপেক্ষা—সকলেই অনাদর করিতে লাগিল । এই অপমানে দুগায় আমার চটকা ভাঙ্গিয়া গেল । নচেৎ বলিতে কি, ইহার পূর্বে আমি আর আনাতে ছিলাম না । আমখাসের দরবার ভঙ্গ হইল, সকলে যে বাহার স্থানে চলিয়া গেল, ভিড়ও ক্রমে ক্রমে কমিয়া পড়িল । উঠানটি খালি পড়িয়া আছে, এখন দিল্লি পরিষ্কার,

একটি প্রাণীও নাই। পূর্বাণর এই রীতি ছিল, ঐ সময়ে যুদ্ধের ঘোড়াগুলি আনিয়া মহারাজের সম্মুখে সারিবন্দী করিয়া রাখা হইত। অশগুলি স্তম্ভাবস্থায় আছে কি না, তাদের প্রতি যত্ন করা হয় কি না, সম্রাট তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। পূর্বে বলা-কহা ছিল, তাই এই অবসরে সহস্র আমার নিজের ঘোড়াটি সাজাইয়া লইয়া আসিতেছিল, আমি এক লাফে তাহার উপরে চড়িয়া বসিলাম; সোয়ার হইয়াই সিংহাসনের নিকট দিয়া আগে আগে চলিলাম। রাজপ্রহরাদিগের বাকী অশগুলি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল, সহস্রদের ডাকিয়া বলিলাম, “তোরা আপনার আপনার ঘোড়াগুলি এমনি স্থলে, এমনি কোশলে রাখিবি, সম্রাট যেন অবলীলাক্রমে তাহাদের ভাল মন্দ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন। একটু পরেই আমি ঘোড়া থেকে নামিলাম, তিনবার পৃথিবী চুম্বন করিয়া দিল্লীশ্বরের দীর্ঘ আশু ও তাঁহার রাজ্যের চিরমঙ্গলের নিমিত্ত জগদীশ্বরের উদ্দেশে একটি স্তুতি পাঠ করিলাম। মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, বাবার মনে বড় ভয় হইয়াছে, এমন তো ভয় নয়, তাঁহার মুখ চোখ সেহাই হয়ে গিয়াছে, যেন কেউ কালী ঢেলে দিয়েছে। আমার এই ধর্ষ্ট্যমীতে বাদশাহ পাছে আরও নারাজ হন, সেই ভয়েই তাঁর মনে তত ভয় হয়। কিন্তু সম্রাটের মুখভঙ্গিমাতে কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না, তিনি যে ভাবে, সেই ভাবেই ছিলেন। আমার এই বাহাদুরী দেখান শেষ হইলে সম্রাট বলিলেন, “তুমি তো আর অখ্যাখ্যক্স কেবাৎ খাঁ নহ, আমি তোমাকে প্রধান শরীর-রক্ষকের পদেই নিযুক্ত করিয়াছি।” অশ্বের কর্ণে আমার অধিক রুচি ছিল, আমি যদি কেবাৎ খাঁর মত উপযুক্ত হইতাম, তবে আমার কর্ণ তাঁকে দিয়া তাঁর কর্ণ আমি লইতাম।

যে জন্তু বিলম্ব হইয়াছিল, সেই কাহিনীটি বলিব মনে বরিয়্য কেবল তাহার স্তম্ভপাত করিয়াছি, এমন সময় বাদশাহ আমাকে নিষেধ করিয়া তাঁহার সম্মুখ থেকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন! তিনি যুখে কোন বধাই কন

নাই, হস্ত হেলাইয়া ইসারায় ঐ অভিশ্রাট জানাইলেন। আমি ত একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসিয়া পড়িলাম, মনে মনে যেমন অপ্রতিভ, তেমন দুঃখিত হইলাম; কিন্তু কি করি, একটু সরিয়া তফাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। যে আশা করিয়া সওয়ার হইলাম, তারমত সমাদর বাদশাহ ত কিছুই করিলেন না। মনে বড় ঘৃণা হইল, দূর হোক, তবে আর এখানে ইতরের মধ্যে থাকিয়া কি করি, যাই, যেখানে বন্ধু ইন্সাইল প্রভৃতি অল্প অল্প প্রাণেরা আছেন, সেইখানে গিয়া বসি। এই ভাবিয়া সেখান থেকে চলিয়া ইন্সাইলের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। জুর্ডাবনার তো অন্তই ছিল না, কিন্তু সে ভাবটি চেপে চুপে ঢেকে রাখিলাম, কাহাকেও জানিতে দিলাম না। বাদশাহ আমার উপর নারাজ হইয়াছেন, হয়েছেন, হয়েছেন। আমি হেসেই উড়াইয়া দিলাম, যেন গ্রাহ্যই করিলাম না। সেটি কিন্তু লোক দেখানো।

অশ্ব-সমারোহের পর হস্তীদিগের আহ্বান হইল। করিদল ধীরে ধীরে গদাইলস্বরী ঢঙ্গে সঙ্গমে পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের ভীম দেহগুলি জলে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। গুঁড়গুলি লাল রেখায় চিত্র-বর্চিত করিয়া আঁকা, গলায় ছোট ছোট রূপার ঘণ্টা বাঁধা, চলিবার সময় সেইগুলি টুন টুন বরিয়্য বাজিতে লাগিল। হাতীগুলিকে সম্রাটের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া মাহুতেরা মাথায় ডাঙ্গন মাঝিতে লাগিল, অর্মান তারা গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিয়া গুঁড়গুলি আকাশ মুখে করিয়া রাখিল, সকলে বলিল, বাদশাহকে দেলাম করিতেছে।

হস্তীর কোতুক শেষ হইলে কুম্ভসার, গণ্ডার ও অর্ণা-মহিষের অভিনয় আরম্ভ হইল। মহিষগুলির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ, সেটি জগদীশ্বরের মহিমা, তাহাদের যদি তত বড় তত দুর্জয় শিঙ না থাকিত, তবে তারা সিংহ-ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পর নাকেস্বরী ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, সারসপক্ষী, বাজপক্ষী প্রভৃতি অল্প অল্প নানা রকমের ক্রীড়া-কৌতুকী পান্থী এবং নীকারী কুকুর রক্তভূমিতে দর্শন দিয়া



## উজীর পুত্র ।

সকল ব্যক্তির কৌতুক-দর্শনের তৃষ্ণাশাস্তি করিল ।

সদর ফটকের দিকে কতকগুলি লোক কল-বল করিতে লাগিল, ইয়াইল অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিলেন, “বন্ধু ! এই দেখ, এই চেয়ে দেখ, এই সময় আপনার বাহাহুরী দেখাইয়া মহারাজের কাছে প্রতিপন্ন হও, যেমন ছিলে, আবার তেমন হও ।” আমি চাহিয়া দেখি, একজন লোক আগে আগে আসিতেছে, তাহার হাতে একটি মরা ভেড়া । আমি ত আর আনাড়ী অব্যবসায়ী নই যে, ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিব না । আমি বলিলাম, “বন্ধু ! দ্বাদশ ইমাম সাক্ষী, আমার কাছে যেমন তীক্ষ্ণ তেজীয়ান্ অস্ত্র আছে, আমি এক ঠুকে বলিতে পারি, এ এজলাসে তেমন আর কাহারও নাই । আমার বাহুর কত পরাক্রম, আমার তলবারের কত প্রতাপ, আজ হয় তাই সপ্রমাণ করিব, নয় এ মুখ আর দেখাইব না, একেবারে দেশত্যাগী হইব ।” এই বলিয়াই তলোয়ারখানি বাহির করিলাম, সেই সময় পিতাও অমনি ইসারায় জানাইলেন যে, তিনিও সম্মত আছেন । তার পরেই একটি সূত মেঘদেহ উঠানের শত-মধাহলে রাখা হইল । তাই দেখিয়া জন কয়েক চেঁড়া ওমরাও ও কতকগুলি বে-আক্কেল মুনসেফদার অগ্রসর হইল, মনে মনে বড় আনন্দ, “ইবার এক হাত জাহাঁবাজি দেখাইবেন । তাঁহাদের তলবারগুলি দেখিতে জন্মকাল ছিল, রৌদ্রের তেজে চকমক্ চকমক্ করিতে লাগিল । উহাদের মধ্যে বরকন্দাজ খাঁর ভ্রাতৃপুত্র ইউসোফ ঘোড়ালি করিয়া সকলের আগে আগে চলিলেন । তাঁহার মালমাটে মাটী কাঁপিয়া উঠিল, ভাবিলেন, আজ তাঁহারি পোয়াবারো, কাজটি তিনিই সাবাড় করিবেন, আর কাহাকেও অস্ত্র পরিতে হইবে না, সেই আশোনে আগে আগেই তাঁহার মুখখানি চক্চক করিতে লাগিল । তিনি যে গেটটি কাঁকিলেন, তাহাতে গোয়ারের মত কেবল বলই প্রকাশ পাইল, কৌশলের নাম-কণ্ড ছিল না । সেই এক আঘাতেই তাঁর সেই লুজলে জাঁকাল তলবারখানি ভেঙ্গে চুরমার হিয়া গেল । ইউসোফের মুখখানি শুকাইয়া

আমচুর হইল, সকলে হো হো করিয়া হাত-তালি দিয়া উঠিল, তিনি অমনি স্ফুড়-স্ফুড় করিয়া তাঁহার খুল্লতাতে দান্তিক বরকন্দাজ খাঁর কুপিত নয়নের অন্তরালে কুণ্ডলাকার হইলেন । এই অবসরে আমি এক-পা ছু-পা করিয়া আশ্বে আশ্বে মহাড়া লইলাম, তলোয়ার মাথার উপর ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগলাম, খেলাইতে খেলাইতে পশ্চাদ্ধিক্ হইতে এক চোটে মেঘদেহটি ছুটুকরা করিয়া ফেলিলাম । অস্ত্রখানির সর্বাঙ্গ—আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু কোথাও টোল বা দাঁত পড়ে নাই । “বাহবা, সাবাস, ক্যা সাফাই হাত !” চারিদিকে টি টি পড়িয়া গেল, আমি অমনি আছলামে উধলিয়া উঠিলাম । “এইরূপে যেন চিরকালই সম্রাটের দুষ্মনের মাথা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পারি ।” এই আশ্বাসন করিয়া গলা-বাজিতে আকাশ ফাটাইতে লাগিলাম । বাবাও আছলামে কুলিতে লাগিলেন, তাঁহার চোক মুখ যেন আনন্দে ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল । তিনি এই অবসরে অবীখরের নিকট আমার গুণগুণবাদ করিতে লাগিলেন । সম্রাট্ ইসারা করিয়া বলিলেন, “সাদক ! নিকটে আইস ।” আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলাম, “মহারাজ ! জগদীশ্বর রাজ্যের মঙ্গল করুন, পবিত্র রাজশরীরও নিরীক্রে রক্ষা করুন ।” শাজাহান বলিলেন, “সাদক ! তোমার ভুজবলের অসীম প্রতাপ, তোমার অসিখানিও প্রলয়ঙ্করী, প্রয়োজন-সময়ে অনেক কাজে লাগিবে । কিন্তু দেখিও, যেন পদটি খোয়াইও না, রাজাহুরোধ ভিন্ন অত কোন গুরু অহুরোধে পড়িলেই তোমার বিপদ ঘটিবে ।”

“আমার অপরাধ হইয়াছে, সম্রাট্ আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন ।” আমি উচ্চকণ্ঠে এই উত্তর করিলাম ।

বাদশাহ—“আর কেন, ডের হয়েছে । তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, নিজ্জনে বলিও, খবরদার, স্মরণ থাকে যেন ।”

আমি এখন অন্তর হইয়া দাড়াইলাম । নিজ্জনে সাশাং করিবার কথা শুনিয়া মনে মনে বড় ভয় হইল, এত ভয় যে, মুখে তাহা



বলিয়া উঠিতে পারি না। কেন বলিব হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব, কি উত্তর করিব? ছুটি কৃষ্ণ আঁখি আমার পথাবরোধ করিয়াছিল, তাই আমি সময়মত হাজির হইতে পারি নাই, এ কথা বলিতে কি ভরসা হয়? তবে কি একটা মনগড়া মিথ্যা বলিব? রাজার কাছে মিথ্যা বলিতে কি সাহস হয়, না তা বলা উচিত? মিথ্যা বলিব, এ কথা মনে হইলেও আপনা আপনি ঘৃণা হয়। আমি ত ভেবে কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না,—অস্থাই পঞ্চমে পড়িলাম। দূর হোক, যা থাকে অদৃষ্টে হবে। মিথ্যা!—কখনই বলা হবে না, তার নিকটেও যাব না, স্বরূপ কথাই বলিব, যা যথার্থ ঘটেছে, যে কারণে যা হয়েছে, তাহাই বলিব, শেষে এইটিই অবধারিত করিলাম।

একপে যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল, সম্রাটও চলিয়া গেলেন। উজ্জীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, আমাকে বলিলেন, “সাদক! তুমি একটু থেকে যাও, সম্রাট তোমাকে এখনই ডাকিয়া পাঠাইবেন।” বাবার কথা অনুসারে আমি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আমাকে অধিকক্ষণ বসিতে হয় নাই, ইতিমধ্যে একজন চোপদার আসিয়া ইসারা করিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাদশাহের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মোগলরাজ একধানি বড় চৌকিতে বসিয়া আলবোলা টানিতেছেন। ভাবিলাম, আজ কি আছে অদৃষ্টে, বলিতে পারি না, মাথাই যায় কি শিরোপাই পাই, দুয়ের একথানা হবেই হবে। আমি ভূমি লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং ষোড়হাত করিয়া উর্দ্ধদৃষ্টে ঘণ্টার গুরুড়ের তায় ঝাড়া রহিলাম। সম্রাট ইসারা করিলেন, পিতা ও আর আর যাহারা উপস্থিত ছিলেন, চলিয়া গেলেন; আমি একলা থাকিলাম, ভয়ে বুক ছুর ছুর করিতে লাগিল। বাদশা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। তখন আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “সাদক! তুমি না জান, তা নয়, যিনি রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন, ইউসোফ তাহার পঞ্চম আশ্বীন, সেই ইউসোফকে বঞ্চিত করিয়া

তোমাকে এই উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছি, আমি তা করিতাম না, কিন্তু কি করি, তোমার পিতার অহুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। যাই হোক, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই সকলের আগে আমথাসে উপস্থিত হইয়া আদব বাজাইবে, কিন্তু সেটি তুমি কর নাই, অহুপস্থিত ছিলে, এর কারণ কি? তোমাকে সত্যকথা বলিতে হইবে, তুমি যদি সাজাইয়া একটা মিথ্যা বল, আমি তা শুনিব না। যিনি দান করেন, তিনি দিগ্বে আবার কেড়ে লইতেও পারেন; যিনি পুরস্কার দেন, তিনি তার পরিবর্তে দণ্ড করিতেও পারেন। এই কটি কথা তোমার যেন স্মরণ থাকে।”

আমি বলিলাম, “মহারাজ! অবধান করুন, আমি যদি সত্যই না বলিব, আমি যদি আপনার একান্ত শরণাগতই না হইব, তবে কি সাহস করিয়া সসাগরা ধরা-স্বামী সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতাম? আমার এ অপরাধের মার্জনা নাই, তার আশাও করি না, কিন্তু তথাচ আমি মিথ্যা বলিব না, সে পথেও যাব না, কেন বলিব হইল, সে বিষয় নিবেদন করিতে প্রস্তুত আছি। প্রপেও জানিতাম না যে, আমার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনা ছিল; সেটি অতাবনীয়, তাহাতে মনুষ্যের হাত নাই।” এই গৌরচন্দ্রাকার পর যেরূপে বাহা ঘটয়াছিল, যে জন্মে আমার বিলম্ব হয়, অদ্যোপান্ত সমুদায় বলিলাম। বাদশাহ শুনিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না; তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, “সোভান আল্লা! ছুটি আঁখির অহুরোধে যে ব্যক্তি আপনার অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে অবেহলা করে, তারে বিশ্বাস করিয়া রাজশরীর-পরিরক্ষণের ভার অর্পণ করিলে প্রায়ই শেষে অন্ততাপ করিতে হয়।”

আমি বলিলাম, “জেনাবালি! আপনি অধিলপতি, আমি আপনার দাস, আপনার বিচারে যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন; কিন্তু দৈবাৎ একবার একটি ক্রটি হইয়াছে বলিয়া আমার রাজভক্তি নাই, কি আমি অক্ষম কাপুরুষ, এরূপ বিবেচনা না করেন—এইমাত্র আমার প্রার্থনা।” সম্রাট

বলিলেন, “বধেই হয়েছে, আচ্ছা, এবার তোমার মাপ করা গেল, তুমি এখন যাও, এখন অবধি তোমার গুণে যেন তোমার পূর্বদোষ ঢেকে যায়, আমরা যেন তা ভুলে যাই। তোমার শত্রু পায়ে পায়ে ফিরিতেছে, এটি যেন মনে থাকে, বুকে শ্রবে চলিও। আচ্ছা, তবে এখন তুমি বিদায় হও।”

মনে যে কত আত্মদাদ হইল, তাহা বলিবার নয়। যে একটা মস্ত ফাঁড়া ছিল, তা কেটে গেল, এখন আমি তাড়াতাড়ি পিতার কাছে চলিলাম। তিনি এই আসে এই আসে করিয়া পথ চাহিয়া ছিলেন।

কি বিপদ! আবার তাঁর কাছেও বিলম্বের বায়নাটুকি আহুপূর্ণিক সব বলিতে হইল। বাবা আমাকে বিস্তর ভৎসনা করিলেন। তিনি বলিলেন, “সাদক! খবরদার! বরকন্দাজ ধাঁ।

আমার চিরশত্রু, তার সংক্রান্ত রাজাস্তঃপুরের কোন দ্বীলোকের সঙ্গে তুমি আলাপ করিও না, সে দিকে ফিরেও দেখিও না, তাহাদের নিকট দিয়েও যাঁও না।” আমার বাসস্থানের নীচের দ্বারে যে কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিয়াছিলাম,—পিতার ছুঁনিয়া করিতে শুনিয়া দেহরূপ রাগত হইয়াছিলাম, সে সমস্তও বাবার কর্ণগোচর করিলাম। পিতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, কেন না, যদিও আমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল বটে, কিন্তু তৎকালীন গুরুত্ব প্রকাশ করা অতি অস্বাভাবিক কাণ্ড হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রেও পিতা আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি অতি নিবোধ, অতি পাগল, এত বড় হইলে, তবু তোমার কোন জ্ঞান হইল না! একে এ অন্ধকার রাত, তায় আবার তুমি একলা, তোমাকে যদি তারা মেরেই ফেলিত, তখন কে রক্ষা করিত? ভাল, যা হয়েছে, তা হয়েছে, এমন কুদর্শ আর কখন করিও না, তাহারা যে তোমাকে প্রাণে না মারিয়া অমনি ছেড়ে দিয়েছে, এই আমাদের পরম ভাগ্য।”

যে পরামর্শ হয়, সে ঘরে কটি লোক ছিল, কিন্তু পথান্ত তাহাদের কথাবার্তা চলিয়াছিল, দাঁড়াইয়া যাহারা তাঁহার নামোল্লেখ কর্কে,

তাহাদের কিরূপ চেঁচায়া, গলার স্বরই বা কিরূপ, বাবা আমাকে এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও যতদূর জানিতাম, সে সব কথা উত্তর করিলাম। উত্তর করিয়া বলিলাম, —“বাবা! বেলা আর নাই, সন্ধ্যা হইল, এখন অনুমতি হয় তো বিদায় হই। একবার হাওয়া খাইতে বাহিরে যাইব।” এই বলিয়া ঘোড়ার উপর সোয়ার হইয়া প্রস্থান করিলাম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

“বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ \* ভয়ানক।” রাজবাটীর কতকগুলি লোকের অস্পষ্ট অপরিষ্কৃত ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা ভিতরে ভিতরে একটা কারখানা করিতেছে, কি একটা ভারি মংলবে ফিরিতেছে। যখন কোথাও কেহ না থাকিত, চার পাঁচ ব্যক্তি একত্র হইয়া কত কি কুসুফাস করিয়া বলাবলি করিত, এক একবার আড়ে আড়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখিত, কি জানি, যদি কেহ আচম্ভক আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন বা একটা এঁদো ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া চুপে চুপে কি পরামর্শ করিত। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, যখনই সাক্ষাৎ হইত, দেখিতাম, তাহারা মুখামুখী হইয়া আছে, হাত নাড়িতেছে, কখন মাথা নাড়িতেছে, কখন বা চোক ঘুরাইতেছে। আমাকে দেখিলে পরস্পর গা টেপাটিপি,—চোক চায়াচায়া করিত, কখন বা সেখান থেকে উঠিয়া যাঁইত, নয় স’রে গিয়ে তফাতে বসিত। আমি যেন তাহাদের চক্ষুর শূল। আমার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করিত না, আমি যদি গায়পড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, “তোমরা রোজ রোজ কি গালাগুসা কর?”—“সংসারের কত কথা আছে তুমি তা শুনিয়া কি করিবে?” এই বলিয়া আসল কথা ঢাকিয়া লইত। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, ভয়ও হইল। তাহা-

লাম, ইহারা গোপনে গোপনে কি একটা চক্র করিয়াছে, তাহাদের মংলব কি, তা বলিতে পারি না, তাহারা যে সেই মংলবটি হাসিল করিবার জন্য সময় খুঁজিতেছিল, তাহার সন্দেহ ছিল না। সুসময় হইলেই অহুচরদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কৰ্ম্ম ফসাঁ করিত, আপনারা হাতে হেতিয়ারে কিছুই করিত না। আমি অন্তরে অন্তরে থাকিতাম, কাহারও ত্রিসীমানায় যাই-তাম না। বন্ধুবান্ধবই হোন আর আত্মীয়-স্বজনই হোন, কাহারও সঙ্গে মাখামাখি বা গাচাটাচটি ভাব করিতাম না; কোন আমোদ-প্রমোদের অনুরোধও শুনিতাম না। ভয় হইত, পাছে কেহ পাকচক্র করিয়া আমাকে রাজ-বিরোধীর দলে আবদ্ধ করে; পাছে কাহারও কুহকে পড়িয়া তাহার স্বার্থের ঝাপস্ক হই। মন কখন কোন পথে যায়, কেহ বলিতে পারে না, সর্বদা গতিবিধি থাকিলে শেষে পিরীত-প্রণয় হয়ই উঠে; কিন্তু সে অভিপ্রায় আমার ত কোন কালেই ছিল না, পূর্বেও একপ্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি, যতদিন বাঁচিব, রাজ-স্বামীর অহুগত হইয়া রহিব, প্রাণান্তেও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিব না। তবে যদি মহারাজ আমার সঙ্গে কোন রকম কুব্যবহার করেন অথবা বুদ্ধির দোষে বিবেচনামত আমার উপর হুকুম হাকাম করিতে অশক্ত হন, সে স্বতন্ত্র কথা। শাজাহানের শরীর ক্রমে ভয় হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আবার নিত্য নিত্য দরবারে বসা, ডিক্রী-ডিস্‌মিস বিচার-নিষ্পত্তি আদি রাজ-কার্য্য করা, রাজা উজীর লইয়া মজলিস্ মহা-ফেল করা, এই সকল ঝগাটে ভারাক্রান্ত হইয়া তিনি দিন দিন আরও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা অষ্টগ্রহর মুখে মুখে থাকিতেন। তাঁর ইচ্ছা যে, কতক ভার গ্রহণ করিয়া বাদশাহের পরিশ্রম লাঘব করেন। কিন্তু সম্রাট কোন কার্য্যেই তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না।

সম্রাট কেবল রাজকার্য্য লইয়া উন্নত;—বিধিব্যবস্থা, আদেশ অহুমতি, রফা-নিষ্পত্তি, এই সকল বিষয় লইয়াই মহাব্যস্ত। এ দিকে যে তাঁহার সিংহাসন লক্ষ্য করিয়া একটি গুপ্ত

বিপদ অন্তর থেকে উঁকি মারিতেছিল, তাহার কোন খোঁজ-খবর ছিল না, সে বিষয়ের বাস্পও জানিতেন না। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ মন, কাহার কিরূপ চরিত্র, তা তিনি প্রকৃতরূপে অবগত ছিলেন না। তাঁহার সম্মানগণের চিত্ত যে দুর্জয় প্রলোভনে মত্ত হইয়াছিল, সে সন্ধান তিনি কিছুই জানিতেন না।

দারার পরিণামবিবেচনা ছিল না, স্বভাব অতি উগ্র, হঠাৎ রাগ উপস্থিত হইত, কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি সঙ্গুণও ছিল,—কাহাকেও অপ্রিয় বা রুঢ় রাক্য বলিতেন না, সকলেই তাঁহার শীলতার অহুবাগ করিত। যে বাহাতে সম্ভট, তাহার সঙ্গে সেইরূপ আলাপ; যে যেমন ব্যক্তি, তাহাকে সেইরূপ সমাদর, তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতেন, মুখে কাহারও অনাদর করিতেন না। তত্ত্বি আওভাও, লোক-লৌকিকতা ভাল জানিতেন। দারা উদ্দাম দাতা ছিলেন, যে বাহা চাহিত, সে তাহাই পাইত, তিনি কাহাকেও মুখ মুড়িতে পারিতেন না। আশা করিয়া আসিয়া কেহ কখন বিমুখ হইয়া মুখ হাতে ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার এই একটি মন্ত ভ্রম ছিল, তিনি মনে করিতেন, তিনি যেমন উপযুক্ত, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তেমন আর কেহই নয়। তিনি বাহা বুঝিতেন না, তিনি বাহা পারিতেন না, তাহা আর কেহই বুঝিত না, আর কেহই পারিত না। এই অহঙ্কারে তিনি কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কোন পরামর্শের কথা বলিলে, তিনি তাহা গ্রাহ্যই করিতেন না, ভুড়ী দিগে হেসে উড়াইয়া দিতেন। বড় বড় প্রবীণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে, বড় বড় ক্ষমতাবান ও মরাও-দিগকে সামান্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে হতব্রদ্ধা করিতেন। তিনি আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন, অথচ যখন কোন গরজ পড়িত, হিন্দুর কাছে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ানের কাছে খ্রীষ্টিয়ান হইতেন। মহাবল মোগলরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া যেরূপ সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত, দারার ঐ দোষে লোকে তাঁহাকে সেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি, সেরূপ সমাদর করিত না; অনেকে স্পষ্টই

মুখের উপর বলিত, শুধু ঐ দোবেই তাহারা দারার পক্ষ না হইয়া কেহ আরদজেবের, কেহ কেহ তাঁহার অজ্ঞ অজ্ঞ সহোদরের স্বাপক্ষ হইয়াছে ।

সুলতান সুজার অনেক ধরণ দারার মত ছিল, তবে তিনি তত অবিবেচক ছিলেন না, ধূর্তবুদ্ধিতে তাঁহাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না । যখন যে মনন করিতেন, সেটি সহজে পরিত্যাগ করিতেন না । খুব স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন । ওমরাওদের সঙ্গে সন্তাব রাখিতেন, প্রাণান্তেও অপ্রণয় করিতেন না । রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বেশ পৈঁচাল বুদ্ধি ছিল, মংলবের কেহ থই পাইত না । এমন পাকচক্র করিতেন যে, কখন কি অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিতেন, কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না । কেলি-গৃহের আমোদ-প্রমোদেই অনেক সময় কাটাইতেন । যদুপানে অতিশয় রত ছিলেন ; এমন কি, ক্রমিক পাঁচ সাত দিবস কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত না, তাঁহারও বাহিরে আসিবার তাকত থাকিত না ;—তিনি একজন প্রকৃত ডাকসাইটে মাতাল ছিলেন । ধর্ম্মসম্বন্ধে সুলতান সুজা পারসী-দিগের মতাবলম্বী ছিলেন, অথচ তাঁহার পিতা ও তাঁহার সহোদর রাজকুমার দারা তুরকী মতের সমাদর করিতেন । সুজার কোন দুরভিসন্ধি ছিল, বোধ হয়, সেই জন্তেই তিনি পারসীমতের গোঁরব করিতেন । সে সময় রাজ-দরবারে পারসীদিগের বিস্তর আধিপত্য হয়, যেহেতু, রাজসরকারে যেখানে যত উচ্চপদের চাকরী ছিল, সে সমস্ত তাহারাই গ্রাস ক'রে রাখিয়াছিল । তুরকীরা ওসমানের শিষ্য, তাহারা বলে, ওসমানই মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ওসমান মহম্মদের ভ্রাতৃপুত্র, তাঁহার শিষ্যদিগকে সন্নি কহে ; পারস্যানের লোক আলীর শিষ্য, তাহাদের সিয়া বলে । আলী মহম্মদের জামাতা ; পারসীরা কহে, শাজমত ঐ আলীই মহম্মদের যথার্থ উত্তরাধিকারী ।

আরদজেবের ধীর বুদ্ধি ছিল । দারার বা সুলতান সুজার সেরূপ ছিল না । ভাস্কর বিভায় তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিলেই হয় । তিনি মধ্যে মধ্যে বকধর্ম্মীর ঠাঁয় ভণ্ডতপস্বী হইয়া অনেক

কাজ উদ্ধার করিতেন ; ধর্ম্মসংক্রান্ত বারচটক দেখাইয়া অনেককে মুগ্ধ করিতেন । তাঁহাকে ভক্তির আড়ম্বর দেখিয়া লোকে বিবেচনা করিত, আরদজেব বিবেকী ; ধর্ম্মান্ত তাঁহার প্রাণ, বিষয়-বিভবের প্রতি তাঁহার কোন লোভ নাই । তাঁহার পিতা শাজাহান তাঁহার কৃহক বুদ্ধিতে পারিতেন না, তিনি মনে করিতেন, আরদজেব উদাসীন, সংসার-মুখে তাঁহার বড় ঔদাস্য, সেই জন্ত সম্রাট্ তাঁহাদের অধিক ভালবাসিতেন । আরদজেবের মনোগতই ছিল যে, লোকে তাঁহাকে বিষয়ভ্যাগী উদাসীন জ্ঞান করে ।

মুরাদবাকী বানশাহের চতুর্থ পুত্র । আর আর সহোদরেরা বেরূপ বুদ্ধিব্রাবী ছিলেন, ইনি সেরূপ ছিলেন না । ইহার বুদ্ধির ভোল স্বতন্ত্র, উত্তম আহার আর সতরঞ্চ খেলার আমোদ, এই দুই বিষয় ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন না, তাতেই দিন-রাত মত্ত থাকিতেন । তিনি কোন কৃকথায়, কুমন্ত্রণায়, কি কোন কুচক্রে লিপ্ত থাকিতেন না, সে সব সন্ধানও রাখিতেন না । সে জন্তে তাঁহার মনে মনে অভিমানও ছিল । তিনি বার বার এই কথা বলিতেন, আমি কোন ফেরেব-কন্দীর ধার ধারি না, কাহারও গুহ কথার মধ্যেও থাকি না ; আমাকে পরমেশ্বর যেমন রেখেছেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট । মুরাদবাকীর পরাক্রম ছিল না, এ কথা কেহ বলিতে পারিত না । তিনি লোকের স্প্রীতিপাত্র হউন বা নাই হউন, বল-বীৰ্য্য ও বীরত্বের জন্তে বরং সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠাই করিত ।

বেগম সাহেব রাজকুমারদিগের প্রথম ভগ্নী, ইনি অতি অপরূপরূপবতী ছিলেন, দেখিলে বোধ হইত যেন, তুলীতে চিত্রকরা একখানি সুচারু উজ্জ্বল প্রতিমা । রাজকুমারী বড় মন-গুমরে ছিলেন, চৈকারে মাটীতে পা দিতেন না, তুলে ধন্তে গ'লে পড়িতেন । মেজাজ আমীরী, দাসদাসী প্রভৃতি অসুগত আশ্রিতদিগের সঙ্গে ধমকাইয়া, চোক রাজাইয়া, চোট পাট্ করিয়া কথা কহিতেন, প্রভূত ভালবাসিতেন । বাদশাহও তাঁহাকে অনেক আধিপত্য প্রদান করিয়া ছিলেন । রাজকুমার দারার সঙ্গেই তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত, অপর সহোদরদের সঙ্গে

প্রায়ই বাক্যলাপ করিতেন না। তাহার তাৎপর্য্য এই, দার। তাঁহার কাছে প্রতিশ্রুত হন যে, তিনি যখন তাকে বসিবে, রাজবালা মনোমত পাত্রকে বিবাহ করিতে পারিবে।

রসিনারা বেগম বাদশাহের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি সহোদরার স্তায় পরমা সুন্দরী না ইউন, তাঁহার মত হাবভাব রসে সুরসিকা ছিলেন। বেগমসাহেবের মত রসিনারার বুদ্ধি-বিবেচনা চোকস ছিল না, কিন্তু ইনি বড় ধূর্ত ছিলেন, অনেক ছলনা জানিতেন, কলে কৌশলে লোকের মন বেশ মুগ্ধ করিতে পারিতেন। বাদশাহ তাঁহার শঠতাচক্রে পড়িয়া বরকন্দাজ খাঁর সহিত বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন। বরকন্দাজ খাঁ একজন মহামায়া নামজাদা পারসী, দেখিতে অতিশয় সু-পুরুষ, বাদশাহের অমাত্য। এই ব্যক্তিকে কন্যা দান করিয়া মোগল-রাজ কৌলিক প্রথার বহির্ভূত কার্য্য করেন। এ বিবাহে ওমরাওদিগের মত ছিল না, সম্রাট ও তাঁহাদের অমতে এ কার্য্য করিতেন না। কিন্তু রাজকুমারী রসিনারা সলিয়ে কলিয়ে, মন-যোগান কথা কয়ে তাঁহার মত করাইয়াছিলেন। বিবাহের পর বরকন্দাজ খাঁ রাজাস্তঃপুরে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফ ও তাঁহার একটি নবযুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

পাছে আবার কোন চাতরে পড়িতে হয়, এই ভয়ে আমি পরদিবস সকাল সকাল আম-খাসের দরবারে উপস্থিত হইলাম। বাদশাহ আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, সমাদরও করিলেন, আমি তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণে বেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। বরকন্দাজ খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসোফের মাধ্যম যেন বজ্রাঘাত হইল, বিশেষতঃ বরকন্দাজ খাঁ আমাকে সাবেক কর্ণে বাহাল দেখিয়া একেবারে মুগ্ধি-ডিয়ে পড়িলেন, তাঁহার কেবল লাকালান্দি দাপাদাপিই সার হইল।

বথাকালে আমখাসের দরবার ভঙ্গ হইল; যে বাহার কার্য্যে চলিয়া গেল, আমি আপনার গৃহে আসিলাম। পূর্ব্বের মত বারান্দায় বসিয়া

আছি, সেই আয়নাখানি সম্মুখে রাখিয়া আপনার মুষ্টিটি দর্শন করিতেছি, আর এক একবার ঘাড় ফিরাইয়া খড়্‌খড়ির দিকে চাইয়া দেখিতেছি। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভাবে অবস্থান করিলাম, কিন্তু নয়নাভিলাষ সকল হইল না, সেই দুটি কৃষ্ণ অঁধির প্রতিক্রম আর দেখিতে পাইলাম না, দর্পণখানি এবার আমাকে প্রতারণা করিয়া সে আশায় বঞ্চিত করিল। বড় দেহ-সেক্‌ বোধ হইল, ভাবিলাম, দূর হোক, আর তা মনেও করিব না, আর তা ভাবিব না, ভুলিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টাও করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। সেই দুটি পদ্ম-অঁধি আমার মনোদর্পণে বিরাজ করিতে লাগিল, আমি মনের সাধ মিটাইয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল।

এক্ষণে কৃষ্ণাবরণে ধরা অবগুষ্ঠিত। থান-সামাকে ডাকিয়া তামাক ও কাকি আনিতে বলিলাম। ফোয়ারার বারিধারাগুলি বিমল আভ্যরণ করিতেছিল, আমি তার স্নিগ্ধ শোভা দর্শন করিয়া নয়ন শীতল করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার মন-প্রাণ সেই খড়্‌খড়ির পথে বিহার করিতে লাগিল, খড়্‌খড়িটি এ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধই ছিল। ঐ খড়্‌খড়ির অন্তরালে যে কোন নিরুপম মোহিনী মুষ্টি অপ্রকাশ আছে, সেটি আমার বেশ বিশ্বাস হইল। গবাক্ষের দ্বার মুক্ত হইবে, আমি আবার সেই মনোমরী প্রতিমার দর্শন পাইব সে অনেক দূরের কথা,—সে আশা করাই রাখা,—আমি সে সুখে নিরাশ হইলাম। একা পরেই উপরি উপরি অনেকগুলি শব্দ হইল কেহ যেন একটার পর একটা এইরূপ পর পকতকগুলি কবাট বন্ধ করিল বোধ হইল আমার প্রতিবাসী বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে কাহারো দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল তাহার। বিদায় হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পরক্ষণেই সেই জানালার দু-বাইকপাট আন্তে আন্তে অতি মৃদু-মন্দ শব্দে খুলিয়া গেল, আমি তাই দেখিয়া ভাবিলাম, 'কি চমৎকার ব্যাপার! কিন্তু কি পরিতাপ একখানি সুললিত কোমল' হস্ত ভিন্ন আ

কিছুই দেখিতে পাইলাম না, খড়্‌খড়ির পাখি-  
গুলি বিরোধী হইল, আমার দৃষ্টি চলিল না,  
কবাট দুখানি আপন আগন ভারে যেমন বাহি-  
রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, অমনি সেই বিনোদ  
হস্তখানি অপসারিত হইয়া অদৃশ্য হইল। তখন  
আর কিছু না করিয়া ঐ স্থানেই বসিয়া রহি-  
লাম, যেন অশ্রুমনস্ক! কোথায় কি হইতেছে,  
আমি যেন তার কিছুই জানি না। ইতিমধ্যে  
খড়্‌খড়ির পাখিগুলি খড়্‌খড় করিয়া মুছ মুছ  
লড়িতে লাগিল, কে যেন তাহা তুলিয়া ফাঁক  
করিতেছিল, আমি সেই পাখিগুলির ছিদ্র  
দিয়ে চাঁপার কলির সদৃশ একটি জগদ্বারাধ্য  
বিনোদ অঙ্গুলি দর্শন করিলাম, বোধ হইল,  
কেহ যেন পাখিগুলি উঠাইয়া উঁকি মারিয়া  
আমার শরীরের নবীন কান্তি অবলোকন  
করিতেছিল, তাহার কটাক্ষে আমার মনের  
ভাবান্তর হইল কি না; তাহাও যেন লক্ষ্য  
করিতে লাগিল। চারুহাসিনী রূপসীদিগকে  
বিস্মৃত হয়, কাহার সাধ্য! তাহার অহর্নিশি  
মনের অতিথি;—কি ঘরে, কি বাহিরে, কি  
পথে, কি প্রান্তরে, যেখানে সেখানে,—যখন  
তখন মনের অভ্যন্তরে গতিবিধি করে, কেহ  
তাহা নিবারণে সক্ষম নহে। তবে আর আমি  
কেন নিবারণের চেষ্টা পাই? সেই মধুর বিনোদ  
প্রতিমাধিনি আমার হৃদয়ান্তঃপুরে যদি বিচরণ  
করে ত করুক, আমি তাতে বাধা দিয়ে প্রতি-  
বাদী হইব না, শেষে এইটিই অবধারিত করি-  
লাম। আমাকে যে কেহ একদৃষ্টে চেয়ে  
দেখিতেছিল, সেটি যেন জানিতে পারি নাই,  
এইরূপ ভাণ করিয়া আমি অশ্রুমনা হইলাম।  
খড়্‌খড়ির আড়ালে লুকাইয়া যিনি আমাকে  
অপাঙ্গে দৃষ্টি দান করিতেছিলেন, তিনি অব-  
শ্যই আমার ঐ ঔদাস্ত্যাব বৃত্তিতে পারিয়া-  
ছিলেন, বুঝিয়াও গুলিলিত চারু অঙ্গুলি দ্বারা  
পাখিগুলি ঘন ঘন লাড়িতে লাগিলেন; আমি  
তার অগ্রভাগ মাত্র দেখিতে পাইলাম। নিম্নে  
জলপাতের শব্দ হইতেছিল, অজ্ঞান হইল, সেই  
বরষার শব্দের সঙ্গে আমি যেন একটি গভীর  
দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, সেই  
শব্দটি আমার কর্ণমূলে ঘন আঘাত করিল।

এক্ষণে আমি কি প্রত্যুত্তর দিই? কাঁকরে  
পড়িলাম, সেই হৃৎধের পরিবর্তে কি একটি  
অশ্রুবিন্দু পাত করিব, না সেই উজ্জল কমল-  
নয়নের দিকে একটিবার কটাক্ষ নিক্ষেপ  
করিব? তাহাতেই বা ফল কি? সেই চারু  
নীলনলিন-নেত্রেশ্বর আমার পরম শত্রু পাখি-  
গুলির আড়ালে লুকাইয়া ছিল, হয় ত সেই  
চারু নয়না আমার হৃৎপ্রকাশের বাষ্পও  
জানিতে পারিবেন না! তবে আর কি করিয়া  
হৃৎধের পরিবর্তে হৃৎখ জানাইব? যে মুখচন্দ্র  
হইতে ঐ দীর্ঘ-নিশ্বাসরূপ নৈরাশ-তরঙ্গ উথ-  
লিয়া উঠিল, সেই বিমল চন্দ্রানন প্রেমাদরে  
চুষন করিয়া যে আশ্রয় করিব, তাহারই বা  
সম্ভাবনা কি? সেটিও বৃথা আশা! চরাশা  
বলিলেই হয়। হায়! কি হৃৎখ! আমার  
সে সুখাভিলাষের পথে অনেক কষ্টক! সে  
কষ্টক উদ্ধার করিতে হইলে অনেক বিয় ঘটি-  
বার সম্ভাবনা। হায়! সে পথটি কেবল  
হুর্ভেদ্য হৃৎখে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহাতেই  
আমি নিরুপায় হইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরি-  
ত্যাগ করিয়া সেই দীর্ঘনিশ্বাসের প্রত্যুত্তর  
করিলাম। কিন্তু আমার নিশ্বাসপাতের শব্দটি  
উচ্চ হইল, সেটি কিন্তু আমার মনোগত ছিল  
না, শব্দটি আপনা আপনিই দীর্ঘ হইয়া পড়িল,  
নিবারণ করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, ঐ  
শব্দ শুনিয়াই পাখিগুলির আন্দোলন রহিত  
হইল। পরক্ষণেই একখানি শীর্ণ শুক কুণ্ডিত  
হস্ত প্রসারিত হইয়া সেই খড়্‌খড়ির দ্বার অব-  
রুদ্ধ করিল।

আমি এখন কত কি ভাবিতে লাগিলাম,  
কত প্রকার চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইতে  
লাগিল। আমি সেই সকল ধ্যানে নিমগ্ন  
আছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া  
বলিল, “হজুর! উজীর সাহেব আপনাকে  
ডাকিতেছেন, কোন বিশেষ বরাত আছে।”  
এই কথা বলিয়া আমার ধ্যান ভঙ্গ করিল,  
আমিও ঐ কথা শুনিয়া অমনি উঠিয়া দাঁড়াই-  
লাম। রাজবাটী হইতে অধিক দূর নয়, যমু-  
নার ধারেই পিতার রমণীয় অটালিকা বিরাজ  
করিত; সুতরাং সত্বরেই তাহার কাছে উপস্থিত

হইলাম। দেখিলাম, পিতা অতিশয় বিষয়-অতি-শয় উদ্বিগ্ন। তাঁহাকে ঐরূপ ত্রিযমাণ দেখিয়া বলিলাম, “বাবা! আপনাকে এত স্নান স্নান দেখছি কেন? যেন কত কি ছরবগাহ ছর্ভাবনায় পড়িয়াছেন।”—তিনি মুখে ও কথার কোন উত্তর না দিয়া একটি বিষাদাবহ সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাসমাত্র পরিত্যাগ পূর্বক “আল্লা!” গভীরস্বরে এই দীর্ঘ রব করিয়া কপোলে করাঘাত করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ ছুটি ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, বোধ হইল, তিনি তখন সেই অখিল-পতি বিশ্বরূপ-জগৎপিতাকে মনে মনে ডাকিতে ছিলেন। তার পরে একটু স্থস্থির হইয়া বলিলেন, “সাদক! আমার যশঃ-প্রতিষ্ঠারূপ সুখ-স্বর্গ্য অনন্ত দুঃখাচলে সবেগে অন্তর্মিত হইতেছে, সেই ভয়ে আমি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। কি হইবে, কোথা যাইব, কি করিব,—ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছি। আমার মনে ঘোর অশ্রুৎ,” আমি ঐ কথা শুনিয়া শিহরিয়া বলিলাম, “বাবা! আপনি কি বলিলেন, আমি তার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। খোলোসা করিয়া বলুন, নচেৎ কি করিয়া বুঝিব?” পিতা তখন অঙ্গুলি দ্বারা আসন নির্দেশ করিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, আমি উপবেশন করিলাম। পিতা ক্ষণকাল নিস্তর হইলেন, তাহার পর ধানিক ক্ষণ স্থিরদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রহিলেন, যেন অন্তর ভেদ করিয়া আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, “সাদক! সেই গলিপথে তুমি যে গুপ্তকথাগুলি শ্রবণ করিয়াছ, সেই কথাগুলি পুনরায় আমাকে বল।” আমি সেইগুলি পুনর্বীর বলিয়া এই কথা কহিলাম, “বাবা! আপনি তো নিরপরাধী, তবে এত সশঙ্কিত, এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন কেন?” বাবা আমার মুখে ঐ কথা শুনিয়া “উঁহঁ, তা নয়” এই শব্দ করিয়া অশ্রু-রেণু ত্রায় বজ্রতেজে অক্ষাণ হাত দুখানি ধরিয়া কহিলেন, “আমি নিরপরাধী নই, তুমি গোপনে যে সকল কথা শুনিয়াছ, সে সকলই সত্য।” পিতা যখন তাঁহার আশ্রয়-কৃত পাপ স্বীকার করিতেছিলেন, তাঁহার আপাদমস্তক থর থর

করিয়া কাঁপিতেছিল এবং কপোল-বিগলিত বড় বড় বর্ষ্যবিন্দু গও বহিয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার বজ্রসম দৃঢ় দেহবন্ধন শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। আমরা উভয়েই এখন নিস্তর, — গভীর নিস্তর। এইটুকু কি ভয়ঙ্কর সময়! ইহার বিকট মূর্তি ধ্যান করিলে অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠে।

এখন মনে মনে আপোস হইল যে, কেন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, আমার না আসাই ভাল ছিল, আমি কেন বধির হইলাম না, তবে তো আমাকে এ দুঃসহ দুর্ভাস্ত শুনিতে হইত না! অপর অপর ব্যক্তির উপর আমার সম্বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার পিতা যে এরূপ দুঃস্থ অপরাধে অপরাধী, এ সংশয় আমার কখনই হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে একটু স্থস্থির হইয়া পিতা বলিলেন, “সাদক! পুত্র! তুমি যে আমার কৃত পাপের রক্তাস্তগুলি কেবল কানে শুন্বে, কি আমার মনের দুর্জয় কষ্টগুলি কেবল চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে, আমি তোমাকে সে ক্ষেত্রে ডাকি নাই, তোমাকে কোন সাহায্য করিতে হইবে, শুধু সাহায্যও নয়, তোমাকে স্বয়ং কোন কার্যও করিতে হইবে, আমি তোমাকে সেই ক্ষেত্রেই ডাকিয়াছি। যে সময় সেই ঘোর দুর্দান্ত কার্য সমাধা করিতে হইবে, সে সময় আগত-প্রায়,—তার আর বড় বিলম্ব নাই: সেই সময় রুধির-প্রিয় শাজাহানের—” ঐ নাম শুনিয়াই আমি চমকে উঠিলাম; পিতা অমনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “আঃ! ও কি! তুমি কি এখনও এত বালক যে, দুটো মিষ্টি কথায় অন্তঃকরণ গলে যায়?”

আমি বলিলাম, “বাবা! আমি পূর্বে শপথ করিয়াছি যে, বাদশাহের বশতাপন্ন হইয়া থাকিব; যদবধি তিনি আমার প্রতি স্বামী-উচিত ব্যবহার প্রদর্শন করেন, ততকাল তাঁহার বিশ্বস্ত পাত্র হইয়া রাজাজ্ঞা পালন করিব।

পিতা বলিলেন, “সে ভালই করিয়াছে, এখন রাজার অন্তর্গত হইয়া পিতার কালের স্বরূপ হও।”

আমি তখন বিম্বিত হইয়া বলিলাম,



বাবা ! আপনার এ হুজুর কথার ভাবার্থ কিতে পারিলাম না ; আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন ; আপনার জীবন-রক্ষার্থে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিব, কিন্তু যাহাতে অর্থ হয়, যাহাতে আমার রাজ-স্বামীর নিকট দাসোচিত কর্তব্যানুষ্ঠানের ক্রটি হয়, এরূপ কোন কার্য করিতে আমাকে অনুমতি করিবেন না ।”

পিতা বলিলেন, “আমি তোমাকে সে কথা এখন খুলিয়া বলিতে পারিব না, এখন আমার মনের স্থিরতা নাই, পূর্বকথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ বড় কাতর হইতেছে, বিশেষতঃ আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমাকে ঘোর সম্বন্ধে পড়িতে হইবে, তাহার বিলম্বও বড় নাই, আপাততঃ সেই দুর্ভাবনাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, তবে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি, তোমার হাতে আমার প্রাণ, তুমি সহায় না হইলে আমার পরিদ্রাণ নাই,—আর তোমারও নিস্তার নাই, আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি, তুমি এ কথা বিস্মৃত হইও না ।”

তখন ‘যে আজ্ঞা, আপনার কথা অমান্য করিব না,’ পিতাকে এইরূপ সাস্তুনা করিয়া বিদায় হইলাম ; আমার হতভাগ্য পিতা তখন মনোগোচর পাপের যাতনায় ছটফট করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া প্রস্থান করিলাম।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

“বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ।”

পিতার নিকট বিদায় হইয়া বাড়ী আসিলাম, আমার খানসামা সলিমান এসে হাজির হইল । সলিমানেই এই এক অপূর্ণ স্বভাব ছিল, একটা আনুগ-রকম ঘটনা হইলে, কি কোন নূতন খবর থাকিলে, সে গুমরে মেজাজ ভারি করিত । সলিমান বেশ জানিত, তার সে চেহারা দেখিয়া আমি কখনই চুপ করে থাকিব না, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব, “কও !—মুখ চোক ভারি ভারি

দেখছি যে, আজ কোন নূতন সংবাদ আছে না কি ?” সে তখন আমার সাহস পাইয়া যা কিছু বলিবার থাকিত, বলিত । আজ আমি খুব অসুখী, মেজাজ ভাল ছিল না, পিতার মুখে তাঁহার আশ্র-কৃত পাপের কথা শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইতেছিল, তাই আজ কোন কথা-বার্তা না কহিয়া আপন মনে শয়ন-গৃহে চলিলাম । সিঁড়ির ধাপে ধাপে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া উপরে উঠিতেছি, সলিমানও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, আমি যে তাহার সাহসকার মূর্তিট লক্ষ্য করিয়াছি, সে আর তা বুঝিতে পারিল না ; মনে করিল, আমি তাহার চেহারার প্রতি দৃষ্টি করি নাই, কি দৃষ্টি দেখিয়াই থাকি, ভাল করিয়া প্রণিধান করি নাই । ভাবিয়াছিলাম, আমি কোন কথাই কহিব না, সে প্রতিজ্ঞা কিন্তু রক্ষা হইল না, আমার সেই অগাধ পণ্ডিতটির হাত এড়াইতে পারিলাম না । সিঁড়ির কতক দূর আসিয়া আমাকে মুখ বলিতে হইল ; বলিলাম,—“সলিমান ! তুমি এখন কিরে যাও, তোমার আর সঙ্গে আসবার দরকার নাই ?” সে ও কথা কানে তাঁই দিল না, ভ্রক্ষেপও করিল না, ঘরের দরজা পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাড়াইল, আবার কি ভাবিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে তাকাইয়া দেখিল, তার পর ওঠের উপর একটি আঙ্গুল রাখিয়া আস্তে আস্তে অতি মৃদু-মন্দ-স্বরে বলিল, “হজুর ! একটি কথা,—কথাটি কিন্তু বড় ভারি !” আমি বলিলাম, “আচ্ছা, তবে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুনব ।” আমার মুখের কথা না বেরতেই সলিমান তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গি । বলিল, “হজুর ! তবে আসুন, আমি দরজা বন্ধ করি ।” আমরা ঘরের মধ্যে কণাট দিয়া নিরিবিলা হইলাম । সলিমান অগাধ ভক্তির সহিত একটি মন্ত লম্বা চোড়া সেলাম করিয়া দ্বিতীয় বাচ-স্পতির ত্রায় ঘোর আড়ম্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিল । প্রতি কথাতেই কেবল তাহার আপনার দর আপনার দাম বাড়াইতে লাগিল ; সলিমান যে মন্ত কাজের মানুষ, সে যে একজন ভারি দরের লোক, বুঝে ফিরে কেবল সেই কথাই বলিতে লাগিল । আমি শেষে বিরক্ত



হইয়া বলিলাম, “তোরা ও সকল ফাল্গু জাঁক রেখে দে, এখন আসল কথা কি, তা বল।” সলিমান আমার ও কথা আমলেই আনিল না, তার আপনাত্তর কথাই পাচ কাহন। সে শুনে এইমাত্র বলিল,—“শুনিলেই মাত্ৰ করা হইল, শোনার নামই মাত্ৰ।” আমার এইমাত্র মান রাখিয়া সে আবার সাবেক মত ধুয়া ধরিল, বরং আগের চেয়ে এবার তার বাচালতা আরও বেড়ে উঠিল। কখন রাজা উজীর মারিতে লাগিল, কখন ডিক্ৰী-ডিসমিস্ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল, “সংসারের এই ত গতি ! এর পর লোকের দশাটা হবে কি ?” এই বলিয়া মন্ত প্রাজের জায় এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। আবার আপনা-আপনিই তর্ক, আপনা-আপনিই সিদ্ধান্ত করিয়া কহিতে লাগিল, “যাব অদূরে যা আছে, সে তাই ভোগ করবে, আমার সে সকল কথায়, সে সকল অনধিকার-চর্চার দরকার কি ? আমি কেন তাতে কথা কহিতে গেলেম, আমার গরজ কি ? — চরমে সৃষ্টিসংসারের দশা যা হবে, আমি সব জানি, সে সকল আমার নথ দর্শন।” এই কঁাদুনী করিয়া সে গেন সেই সকল ভবিষ্যৎ কাণ্ডের পূর্বলক্ষণ বলিতেছে, এইরূপ ঢঙ্গে বচন আওড়াইতে লাগিল।

আমার আর বরদাস্ত হইল না, আমি চোটে উঠে চোক রাঙ্গাইয়া বলিলাম, “বেটা ! তুহ এখন ভাঁড়ামী আরম্ভ করি ?” সলিমান দেখিল, আমি সত্য সত্যই রাগত হইয়াছি। সে বলিল, “হজুর ! আমি বাঞ্জে কথা কহি না, সেই আসল নিগূঢ় কথাটি বলছি, শুহুন। বিধাতা যদি আপনার অন্তরে বিড়ম্বনা না লিখিতেন, তবে আশ আপনার বুকের ছাতি দশ হাত দাঁচু হয়ে উঠিত—তবে আজ একটি নিরুপমা সুন্দরীর সহবাসে রাত্রি প্রভাত করিতে পারিতেন। সেই চন্দ্রাননী কখন কখন প্রসন্না হইয়া খড়্খড়ি ছিড় দিয়া প্রকাশমানা হয়েন।”

আমি ঐ কথা শুনে শিহরিয়া উঠে বলিলাম,—“কি ! কি বলি ? ফের ভাল করে বল, আমি এই দণ্ডেই সেখানে যাব।”

“না না হজুর, আমাকে ক্ষমা করুন, আজ

সেখানে কোন মতেই যেতে পারবেন না, বাবার ঘো-ই নাই।” সলিমান এই কথা বলিল।

আমি বলিলাম,—“যাব না ?—কেন ?”

সলিমান বলিল,—“একটি বে-আড়া মাচকো-ফের আছে, সেটি আপনি তলিয়ে বুঝছেন না। আমি আপনাকে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি মাচকো-ফের ?”

সলিমান বলিল,—“আপনি অরুপস্থিত থাকিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—‘কেমন, যাবেন কি ?’ আমি বলিলাম ‘না না, তিনি কোন মতেই যেতে পারবেন না।’ যুগের মত জবাব পেয়ে সে নৈরাশ হয়ে ফিরে গেল, আমি আগেই সে পথ মেয়ে রেখেছি, এখন আর কোন যুখে সেখানে যাবেন ?”

আমি বলিলাম,—“নাদান, বে-আকুফ, তুই বেটা বড় গাধা, বড় আহম্বক ! তুই কি সাহসে আমার হয়ে জবাব করি, আমি যাট না যাই, তুই সে কথা বলবার কে ? কার সঙ্গে তোর এ সকল কথা হয় ?”

সলিমান বলিল,—“হজুর মাপ করুন, ঘাট হয়েছে, দেখুন আমার অপরাধ কি ? সে স্ত্রীলোকটি যখন এসেছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা—বেশ কোল-আঁধার হয়েছে।”

আমি বলিলাম,—“সে স্ত্রীলোকটি ?—কোন স্ত্রীলোকটি ? কার কথা বলছিস তুই ?”

সলিমান বলিল,—“আমি সেই কথাই বলছিলাম, তখন প্রায়—প্রায় কেন,—সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়েছে, সেই সময় একটি বেলফুলের মধুর সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তার স্নিগ্ধ গন্ধে মুগ্ধ হয়ে, পল্লবসম্মত ফুলটি তুলিব মনে করিয়া, ফোয়ারার এ দিক্ সে দিক্ সেই গাছটি খুঁজে বেড়াতেছিলাম, এমন সময় যেন কেহ দরজা খুলিল, সেইরূপ কাঁচ কাঁচ শব্দ শুনতে পাইলাম, তার পরেই এক বৃদ্ধা—”

“বৃদ্ধা”—ঐ নাম শুনিবামাত্র আমি অমনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠিলাম, দূর ! দূর !”

সলিমান বলিল,—“হজুর ! একটু স্থির হই—হু—আগে শুহুন, এখনই চোটে যেন না। বৃদ্ধা

বলে যুগা করবেন না। বুদ্ধারা রূপা না করিলে মাতব্বর মাতব্বর যুবতীদের কাছে নির্জলা মান পাওয়া ভার, তারা না থাকলে, সুন্দরীর কেহ ছায়াও দেখতে পেরে না, ভাগ্যিস তারা ছিল, তাই বেঁচে যাচ্ছি।”

আমি বলিলাম,—“তুই বেটা ঠেঁটা, ঠেঁটা-কাটা। তোর ও সব ব্যক্তি আমার ভাল লাগচে না, আমার মেজাজ ভাল নাই, তুই এখন যে কথা বলছিলি, তাই বল।”

সলিমানকে কতক কতক ভাঁড়ের মত দেখাইতে লাগিল। ছই চারি বার দাড়ি ঝেড়ে, একবার ঘাড় উঁচু করে, আড়াযোড়া খেয়ে, ভাল করে সামলিয়ে দাঁড়াইল। সে যেন কতই সর-সকানের কথা জানে, সেইরূপ অভিমানের ভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল,—“হুজুর! যার কথা বলছিলাম, সেই স্ববিরা পায় পায় ফোয়ারার কাছে আসিয়া ছোট-একটি তামার কলসী কোরে জল লয়ে চলে যায়, আমি মনে করিলাম, তবে বকি-আমার সঙ্গে আলাপ না করে অমনি চলে গেল, মনে মনে চোটলেম; কি! অমনি এলো আর গেল! আমার সঙ্গে একটা কথাও কহিল না? আমি তাকে ডাকলেম,—ডেকে বল্লেম—‘আরে মাজী! আমিও এক ব্যক্তির চাকর, একবার কি যুথের আলাপও কোন্তে নাই?’ আমার পাঁচ সাত ডাক তো কাও গেল, বুদ্ধা শেষে আশার পানে একদৃষ্টে চেয়ে বসে উঠল—‘হা আল্লা রহিম! এ কার গলার আওয়াজ! সলিমান সিকু না দাঁড়ায়ে?’”

“আমি বলিলাম,—‘হাঁ আমিই বটে, যদি চক্ষু কর্ণের ভুল না হয়ে থাকে, বোধ হয় আমি আমার প্রতিবেশিনী জিনার কথা শুন্চি।’”

বুদ্ধা বলিল,—“সলিমান! তাই বটে। দেখা হয়ে ভাল হলো। তোমার মুনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ভার লয়ে এসেছিলাম। তুমি গিয়ে তাঁহাকে বল, তিনি একবার নেবে ফোয়ারার কাছে আইসেন। তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর সৌভাগ্য নৃত্য করিতেছে।”

আমি বলিলাম,—“বাস! তুমি কি মনে •করেছো আমার মুনিব নিরুদ্ভা, তাঁর আর কোন কাজকর্ম নাই, কেবল দিবারাত্র তামাক

টানেন, আর বিছানায় পড়ে গড়াগড়ি যান, তাই তোমার যুথের কথা বেরুতে না বেরুতে অমনি এসে জাজির হবেন? সরকারী কাজের বন্ধাটে তাঁর মাথা চুলকোবার অবকাশ নাই। এক এক দিন কাজকর্মের এত বরাত পড়ে যে, তাঁর খাওয়া পর্য্যন্ত যুথের যায়, তিনি ভিন্ন সরকারী কোন কাজই নির্বাহ হয় না। ভদ্রে, তুমি আশীষ কর, তিনি যেন এইরূপ বন্ধাটেই থাকেন; বল্লে প্রত্যয় যাবে না, ইস্তক সকল নাগাত সন্ধ্যা, বাটীতে লোক ধরে না, আমীর, ওমরাও ও অপর অপর লোকের এক আমদানী হয় যে, বসবার স্থান হয় না।”

আমি রাগতাহইয়া বলিলাম,—“তুই যখন জানিস, আমি কোথাও বাই না, কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি না, কেহ দেখা করিতে চাহিলেও আমি দেখা করি না, তখন কি সাহসে তুই ও সকল কথা বলি? তুই বেটা ভাণ্ডি নছার!”

সলিমান বলিল,—“সে কি হুজুর! গোস্তাকি মাপ কোরবেন, ওরূপ ব্যাপার ত ঘটেই থাকে, সে ত নূতন কথা নয়! তবে আপনার আমলে আজও তা হয় নি বটে, তা নাই হলো, তাতে ক্ষতি কি? ও পদ অন্নের হোলে তো এত দিনে তাই ঘটতো, তা হলেই যে যথেষ্ট।”

আমি বলিলাম,—“তা যাক; তুই নিরর্থক সুধু সুধু কতকগুলি মিথ্যা কথা কেন বলি? তাতে তোর কি ইষ্টাপত্তি ছিল?”

সলিমান বলিল,—“যদি প্রণয় কখন উগরিয়া দিতে হয়, তখন কি হবে? সে বড় ভজকট, ও লেঠা না জড়াইয়া অমনি টেলে দেওয়াই ভাল, মিটে গেলেই আপদের শাস্তি।”

আমি বলিলাম,—“তোমার সে সবকথায় কাজ কি? ফের যদি তুই এরূপ গোস্তাকি করিস, তবে আমার কাছে তোর নিস্তার নাই। ভাল, তার পর কি হলো বল?”

আমার চোক্রাদানীতে সলিমান কিঞ্চিৎ ঠোঁট-মুখ চাটা হইয়া বলিল—“শেষে বুদ্ধা কহিল, ‘সেই ক্রকনয়না সুন্দরীর সহিত যদি সাক্ষাৎ কি আলাপ করিবার মানস থাকে, তবে

তোমার যুনিব এই দণ্ডেই আমার সঙ্গে চলুন।’ আপনি বাটীতে নাই শুনিয়া, সে বলিল,— ‘আচ্ছা, তবে আজ থাক, কাল রাতে তাঁহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে।’

এই নিমন্ত্রণ পাইয়া আমি যে কি উল্লাসিত, কি আনন্দিত হইলাম, তা বৃথ্বে বলিবার সাধ্য নাই, আচ্ছাদে মন নেচে উঠিতে লাগিল। পাঠক মহাশয়! আপনার অদৃষ্টে যদি কখন এরূপ সৌভাগ্যের সংঘটনা হইয়া থাকে, তবে আপনার আনন্দের সঙ্গে বৃকে দেখিলে আমার আনন্দের পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। সলিমান বিদায় হইল। সে যাহা বলিল, এখন নির্জনে বসিয়া তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি ফিকির করিয়া বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করি, এখন সেই ভাবনায় পড়িলাম। একে ত আমার সঙ্গে তার মনের অকোশল, প্রায় মুখ-দেখাদেখি উঠে গ্যাছে, মস্ত আড়-আড়ি, আকচা-আকচি চলছে, ভাল, সে যেন তারি দোষে, কেন না, তাতে আমার কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তাই বোলে কি এখন সত্য সত্যই তার কাছে অপরাধী হইব, তবে ত তারে পথ পরিহার করে দেওয়া হয়, ঐ একটা ছুতো পেয়ে সে এখন আমার সঙ্গে বে-আড়া হাদাম-হজ্জত উপস্থিত করিবে। তা কত্তে দেওয়া কি উচিত? এইটি আমি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম। পরিমাণ চিন্তা আমার কানে কানে যেন প্রত্যাদেশ করিল,—‘না, কখনই উচিত নয়।’ ভাল, সেই কথাই মান্লেম; কিন্তু আমি না হয়ে যদি অপর কোন প্রতিবাসী ঐ কৃষ্ণনয়নার প্রেমডোরে বাঁধা পড়িত, সে কি সেই চন্দ্রাননার প্রণয়াক্ষরন অবহেলা করিত, না তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিত, আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন করিলাম। প্রণয় আমাকে চুপে চুপে বলিল, “না, সে তা কখনই করিত না।” ভাল, ও কথা যাক, প্রণয়-সুত্রে নাই থাক, সে মানস নাই থাক, অল্প কোন অভিপ্রায়ও নাই থাক, আমি তাঁর প্রতিবাসী ত বটে; আমাদের অমনিই কি একবার দেখা-সাক্ষাৎ হোতে পারে না? কি পরিতাপ! তাতেও

বিস্তর প্রতিবন্ধক দেখতে পাই। কৃষ্ণনয়ন অন্তঃপুরে বাস করেন, স্বর্ধোর মুখ দেখতে পান না, তাঁর হেফাজতের নিমিত্তে রক্ষক, প্রহরী-অবগ্ৰহী আছে, তবে সে আশা করাই বৃথা। আবার ভাবিলাম, যদি প্রণয়ই না হলো, তবে তাঁর সঙ্গে আপস কোরে কল কি? কি ইষ্টাপত্তি তাতে? শুধু আলাপে কি প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! সব দিক্ ভাবতে গেলে তবে আর তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে উঠে না। এইরূপ আপনা আপনি বিস্তর তর্ক করিতে লাগিলাম, এক একবার বিরক্ত হয়ে ভাণি, দূর হোক, ও সব পেয়াল ছেড়ে দি, কপালে থাকে ত তারে বড় তারে বড় অনেক সুন্দরী পাব। কিন্তু মন কি তা মানে, না শোনে! সে কোন মতেই আমার পথে এলো না।—মন কারো প্রতি বিরক্ত, কারো প্রতি অহরক্ত কেন যে হয়, তা কেহ বলতে পারে না,—বিষম আকষ্টবন্ধে পড়িলাম। একবার পালকের উপর গিয়ে শুই, নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করি, নিদ্রা হয় না; কত কি মনে উদয় হয়, আমি তা ভুলিবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না; সেই ক্রম আঁধি মনে পড়ে, প্রাণটো অমনি ছ্যাৎ কোরে উঠে, ষড়মড়িয়ে উঠে বসি, কখন বা একেবারে উঠে দাঁড়াই, হয় ত ঘরের মধ্যে খানিক ক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াই; অল্প অল্প ভাবনা এনে ফেলি, কিন্তু তাতে মন ডোবে না,—ভেসে ভেসে বেড়ায়। আবার গিয়ে শয়ন করি, আবার উঠি, আবার বেড়াই, এইরূপ ছটফট কোত্তে কোত্তে প্রায় তামাম রাত কেটে গেল, একবারও চোক বৃজ্জতে পাল্লেম না—প্রাণ আই চাই কোত্তে লাগল।—ইচ্ছা যে, উড়ে গিয়ে সেই কৃষ্ণনয়নাকে একবার দেখে আসি। শেষে আর কোন পথ না পেয়ে এই স্থির করিলাম, অদৃষ্টে যাই ঘটুক, বরকন্দাজ খাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ কোত্তেই হবে; কাল সন্ধ্যার সময় আমি কৃষ্ণনয়নার সঙ্গে একান্তই সাক্ষাৎ করিব। আমি এখন ইষ্ট-মস্তের নায় সুন্দরীর ধ্যান করিতে লাগিলাম। একটু পরেই আবার স্বরণ হলো, সে সময় পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা আছে। বড় আতঙ্করেই পড়িলাম, আবার

আমি অধীর হইলাম : যদি বা এক ভাবনার হাত এড়াইলাম, কোথা থেকে আর একটা চিন্তা আদিয়া স্বপ্নে চাপিল। আমাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া এসেছে, নিদ্রা নাই হোক্, একবার একটু চোক বুজতে পারিলেও শরীরটা সুস্থ হয়, এই ভাবিয়া শয়ন করিলাম। সে নামমাত্র শয়ন, ঘুম হইল না, কেবল মট্‌কামেরে পড়ে রহিলাম। প্রভাত না হইতেই গাভ্রোখান করিলাম। কাঁচা ঘুমে উঠিবার লায় গা-টা মাটি মাটি করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রে যখন সলিমানকে বিদায় করিয়া শয়ন করিতে যাই, তখনও যেমন অসুখী ছিলাম, এখনও তেমনি, কি কোরবো, কিছুই স্থির কোত্তে পারিলে না।

আর আর দিন অপেক্ষা আজ রাজসভায় বড় গোল। এ ওর কানে, সে তার কানে, এইরূপ পরস্পর ফুসফাস করিতেছিল। সকলেই চিন্তিত, সকলেই উৎকণ্ঠিত,—কোন অদ্ভুত কোতুক দর্শনের নিমিত্ত লোকের মন যেরূপ ব্যগ্র হয়, সেইরূপ চিন্তোদ্বেগের চিহ্ন প্রত্যেকের বদনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছিল। আমখাসের আসর সরগরম; দরবার জমজম করিতেছে। ব্যাপার কি? আজ এত ধুমধাম কেন? দুই একজন ওমরাওকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম, সেনাপতি মুক্তার খাঁ বাদশাহের হুকুমতে দূত হইয়া আসিতেছে। রাজপুত্র মুরাদবাকীর শীকারে চলেছেন, কিঞ্চিৎ দূরে যাবার তাঁর মানস, তাই তিনি সহস্র সৈন্তের প্রার্থনা করেন। মুক্তার খাঁ বাদশাহকে না জানাইয়া তাঁহার বিনা অহুমতিতে রাজপুত্রের ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন, এইমাত্র তাঁর অপরাধ। যাই হোক্, বাদশাহের এই ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইল, তিনি নিতান্ত অচেতন ছিলেন না, পুত্রদিগের অতিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহাদের অন্তর্জাত দুর্জয় বাসনা তিনি না জানিতেন, তা নয়। সুগয়া উপলক্ষে এত অধিক রাজসৈন্তের প্রয়োজন শুনিয়া তাঁর ভ্রাস হইয়াছিল। বাদশাহ আসীন আছেন, এমন সময়ে আমি গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলাম। তার পরেই দেখিলাম, মুক্তার

খাঁ নজরবন্দী কয়েদ হইয়া আসিতেছেন। প্রহরীরা তাঁহাকে বেড়ে, ঘেরবেঁধাও কোরে আছে, সরদার ইয়াইল খাঁ সেনাপতি হইয়া আগে আগে আসিতেছেন।

বাদশাহ দুই চক্ষু আরক্ত করিয়া দুর্ভাগ্য মুক্তার খাঁর প্রতি কটমট কোরে চাহিতে লাগিলেন। মুক্তার আপনার বাচোয়ার নিমিত্ত বলিলেন, “আমি শুদ্ধ রাজপুত্র বিবেচনাতেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি, আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাঁহার প্রার্থনা পত্রের লিখিত অমিত প্রায় ভিন্ন মুরাদবাকীর অন্ত কোন উদ্দেশ্য ছিল” আত্মরক্ষার্থ মুক্তার খাঁ যে সকল উত্তর প্রত্যাভার করিলেন, বাদশাহ তাঁহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহার কোন আপত্তিও শুনিলেন না। সত্ৰাট মনে করিলেন, এই ব্যাপারের অন্তঃশীলে কোন মন্দ অভিসন্ধি আছেই আছে। এই ভাবিয়া বলিলেন, “প্রথমতঃ, তোমাকে পদচ্যুত করিলাম, দ্বিতীয়তঃ, তোমাকে তলোয়ার পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু, তোমার অপমান করাই আমার অ-প্রায়।”

মুক্তার খাঁ অসম্মুচিত-চিন্তে মোগলরাজের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমার রাজভক্তির উপর, আমার পরিণাম-বিবেচনার উপর, হুজুরের যখন সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আমি আপন ইচ্ছায় সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিলাম; তাতে আমার খেদ নাই, বরং আমি সন্তুষ্টই আছি। কিন্তু জীবন থাকিতে তলোয়ার পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরব-বংশে আমার জন্ম, মহারাজ তা অবগতই আছেন, হাতিয়ার আমাদের জীবনের সাথী, প্রাণের অপেক্ষাও অল্পকে অধিক গৌরব করিয়া থাকি। মহারাজ! অবধান করুন, হুজুরের কাছে আমি কাতর হয়ে ঘোড়হাত কোরে বলছি বিবেচনা কোরে দেখুন, তলোয়ার আমার প্রাণ, সে তলোয়ার কেড়ে নিলে আমার প্রাণ কেড়ে লওয়া হয়। আমাদের কাছে হাতিয়ার ও প্রাণ উভয়ই তুল্য। তলোয়ার পরিত্যাগের হুকুম প্রদান করিয়া আপনি আমার অচিরৎ মৃত্যু-বিধান করিতেছেন। অতএব গোলামের এই প্রার্থনা, তলোয়ার ছিনিয়ে লয়ে আমার প্রাণ

সংহার করিবেন না।” এই বলিয়া মুক্তার মৌনা-  
বলধন করিলেন ।

কাহারও মুখে কথা নাই—সকলেই নিস্তব্ধ !  
সভাস্থল নীরব । না জানি, বাদশাহ কি উত্তর  
দেন, শেষ কি দাঁড়ায়, সভ্যটের মুখ থেকে যে  
হুকুম একবার বেরিয়েছে, তার অন্তথা হয় কি  
না, তাই দেখবার নিমিত্ত সকলে মনে মনে  
শশব্যস্ত হইল । আমাদের বড় অধিকক্ষণ “কি  
হয়, কি হয়,” করিয়া ভাবিতে হইল না । শাজা-  
হান মূর্ত্তিমানে কালাগিরি স্নায় দুই চক্ষু রক্তবর্ণ  
কোবে গর্জিয়া বলিলেন,—“প্রহরি ! যো  
চাহিয়ে করিয়ে । খবরদার ! আবি তলওয়ার  
ছিন লেও !!”

হৃদ্যন্ত বলবান মুক্তার খাঁ বাদশাহের ঐ  
ভয়ঙ্কর ক্রোধবাক্যে মোরিয়া হইয়া বিহ্বাদ-  
বেগে আপন তলোয়ার বাহির করিলেন  
এবং রাজপ্রহরীদের সঙ্গে-সম্মুখ যুদ্ধে মত্ত  
হইলেন । মুক্তার খাঁর ভূজবলের কত প্রতাপ,—  
চরম কঠিন-ধাতু নিম্নিত তলোয়ারের কত  
পরাক্রম, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অল্প  
সাক্ষীর প্রয়োজন হইল না, স্বয়ং রাজ-  
প্রহরীরাই তাহার সাক্ষিয় হইল । মুক্তা-  
রের হস্তে তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা পাইল ।  
খাঁ বাহাদুরের দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি একাকী,  
নিঃসহায় ; প্রহরীরা অনেক, দলবদ্ধ । মুক্তার  
যেন বেড়া-মাগুনে পড়িলেন ; শেষে কাজেই  
অবসর হইয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল ।  
তাঁহার শরীরে এত অস্বাভাব হয় যে, তিল  
রাখিবার স্থান ছিল না ; ক্ষতগুলির আকার  
এত বিকট, এত ভয়ঙ্কর যে, দেখিয়া লোকের  
ত্রাস হইল । সেই হৃদ্যন্ত বীরপুরুষ তখন প্রাণ-  
বায়ুর সঙ্গেই তত গৌরবের তলোয়ার পরিত্যাগ  
করিয়া আপনার বীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন ।  
মুক্তার খাঁ স্বপদে থাকিলে ঐ হাতিয়ারখানি  
বাদশাহের শত্রু-নিপাতে না জানি কতই পরা-  
ক্রম, কতই বীর্য প্রকাশ করিত !

মুক্তার খাঁ অপরাধী নন ; কেবল অদৃষ্টের  
ফেরেই প্রাণটি হারাইলেন । তাঁহার দুর্গতি  
দেখে সকলেই দুঃখিত, সকলেই কাতর ; সভা-  
স্থল লোক হায় হায় করিতে লাগিল ।

তাঁহার মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করে নাই, এমন  
ব্যক্তিই ছিল না।—কেহ বলিল, “হা ভগবন  
কি কোলো !” কেহ কহিল, “হা বন্ধু ! কেন তুমি  
অভিমানের বশ হয়ে প্রাণত্যাগ কোলে !” চারি-  
দিক্ থেকে এইরূপ হাহাকারের কোলাহল  
উঠিল,—কেহ কেহ বা ভেউ ভেউ কোরে  
কাঁদিতে লাগিল ।

সেই তেজোয়ান বীরপুরুষকে যখন সদর  
ফটকের দিকে লয়ে যাইতেছিল, তাঁকে দেখি-  
বার নিমিত্ত লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল । সেই  
ঠাসাঠাসির মধ্যে কত লোক ভুড়ি খেয়ে  
পোড়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো, কত  
লোক আশপাশ দিগে ঘাড় বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে  
উঁকি মাস্তে লাগলো । এই সময় একটি শোক-  
তরঙ্গ উখলিয়া উঠিল ; স্বয়ং শাজাহান যদি  
তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতেন, তাঁহারও অশ্রু-  
করণ ছুঁতে গলিয়া যাইত । মুক্তার খাঁর এক  
স্ত্রী, দুই পুত্র । তারা মনে করেছিল, এ সামান্য  
অপরাধ, এ অপরাধে মুক্তার নিদ্রতি পাইবেন ।  
তিনি অব্যাহতি পেয়ে কতক্ষণে ফিরে আই-  
সেন, তাই তারা সদর ফটকে দাঁড়িয়ে পথ  
নিরীক্ষণ কোত্তেছিল, এমন সময় মুক্তারের  
শব লয়ে উপস্থিত করিল । ঐ শব দেখিয়া  
পুত্রপরিবারের প্রাণ উড়িয়া গেল ! মাথায় যেন  
বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল ! অনেকক্ষণ পরিস্ত হতবুদ্ধি  
হয়ে চিত্রপুতলীর স্নায় নীরব—নিস্তব্ধ হয়ে  
রহিল । একটু পরে মুক্তারের স্ত্রী চীৎকার  
কোরে উঠিল, পুত্র দুটি “বাবা বাবা” কোরে  
বঁউরে কেঁদে উঠিল ! তাদের কান্না দেখে  
লোকের বুক যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল ।  
চীৎকারের ধমকে নাগরাখানার বাজা রহিত  
করিতে হইল । সকলে স্তব্ধ, রাজপুত্রী নীরব ।  
মুক্তারের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে করুণস্বরে বিলাপ  
কোরে বলতে লাগল, “হা প্রাণেশ্বর ! তুমি  
আমাদের পরিত্যাগ কোরে কোথায় গেলে !  
কার কাছে আমাদের রেখে গেলে, এমন আমরা  
কোথায় যাব ? কার কাছে দাঁড়াব ? আর ত  
তোমাকে দেখতে পাব না ! আর ত তোমার  
বাক্য শুনতে পাব না ! তুমি পুত্রপরিবারে  
মোয়া কি কোরে বিশ্বস্ত হলে ? হা প্রাণবল্লভ !”

মি আমাদের একেবারে পাথারে ভাসিয়ে গেলে  
খন কে আর আমাদের মুখের দিকে চাবে ?

আর আমাদের স্নেহ করবে ? কে আর আমা-  
র আবদার সইবে ? এখন আর কার কাছেই  
আমরা আবদার কোরব ? হা নাথ ! আমার  
দয় কল্পিত হচ্ছে ! অন্তর দগ্ধ হচ্ছে ! প্রাণ  
বিস্তির হচ্ছে ! কোথায় যাব ? কোথায় গেলে  
টল হব ? কে আর আমাদের স্নেহ বাক্য  
পালন করবে ? কে আর আমাদের দুঃখের  
খী ব্যথার ব্যথী হবে ?” এইরূপ কাতরস্বরে  
রাদন কোত্তে কোত্তে শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে  
জ্ঞারের স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পোড়ে মৃতস্বামীর গলা  
ধরে জড়িয়ে রহিল । পুত্র দুটি ধুলায় পোড়ে  
জড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন মৃতপিতার গলা  
গরে ফুলে ফুলে কাঁদিতে লাগিল, তখন তাঁর  
গায়ের উপর পোড়ে আছাড়পিছাড়ি খাইতে  
লাগিল । সে সময় বাঁহারা বাঁহারা সেখানে  
উপস্থিত ছিলেন, এই বোর অন্তর্যাতী শোকা-  
জনয় দর্শন কোরে সকলেই মহামায়ায় মুগ্ধ  
ইলেন, সকলেই হায় ! হায় ! কোরে মহাদুঃখ  
প্রকাশ কতে লাগলেন, সকলেই চক্ষের জলে  
ভাসিতে লাগিলেন । মৃত্যুরের স্ত্রী স্বামীর  
গলা জড়িয়ে আছে, সেই হতভাগিনীকে  
ছাড়িয়ে লইবার জন্য অনেক কষ্টাকৃষ্টি করি-  
লাম, কিন্তু পেরে উঠিলাম না, এত শক্ত  
কোরে ধোতরছিল যে, মনুষ্যে তেমন পারে  
না, সে যেন তখন দৈববল পেয়েছিল । এখন  
তাকে ছাড়িয়ে লইবার জন্য ধস্তাধস্তি কোত্তে  
ছিলাম, সেই সময় সুন্দরী একটিবার মাত্র মাথা  
টু করেছিলেন।—উঃ ! কি ভীষণ মর্ন্তি !  
আমি তাঁর অদ্বুত চেহারা দেখে চমকে উঠ-  
লুম । এমন যে প্রকৃত মুখকমল, একেবারে  
রক্তে মাথামাখি হয়েছে ! জামল চুলগুলি  
এদিকে সেদিকে ঝুলছে ! সেগুলিও রক্তমাখা !  
মৃত্যুরের তামাম শরীর ক্ষত বক্ষত, সেই সকল  
খায়ের মুখ দিয়ে রক্ত পড়িতেছিল, যুবতী ঐ  
রক্ত সর্ষাঙ্গে মেখে যেন রক্তমুখী সজ্জাছিলেন ।  
বালক দুটি গলাধরাধরি কোরে ফুলে ফুলে  
ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল, এক এক বার  
ইখন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল, দেখে ভক্ত

হচ্ছিল, এইবার বুঝি দম ফেটে প্রাণ ঠিকরে  
বেরিয়ে গেল । তাহের করুণা শুনিলে পাষা-  
ণও ভেদ হয় । যে অতি মৃত, অতি পাবণ, যার  
হৃদয় বজের সন্ধান কঠিন, তারও অন্তঃকরণে  
দয়ার সঞ্চার হয় । আমি বিস্তর বুঝলেম,  
অনেক সান্ত্বনা কল্লেম, কিছুতেই তাদের কান্না  
থামাতে পারলুম না,—অবিরল চক্ষের জল অন-  
ধরতই ঝরিতে লাগিল, কোনমতেই তাহা  
নিবারণ হইল না ! অন্ন শোকের জন্তেই সান্ত্বনা  
শুরু শোকে কি মন প্রবোধ মানে ? তৎকালে  
সে স্থলে আশে পাশে যেখানে বত স্ত্রীলোক  
ছিল, বালকদের ঐ কান্না দেখে তারাও কাঁদে  
ঢলাঢলি কোত্তে লাগলো । এর দেখাদেখি  
ও কাঁদে,—তারে দেখে সে কাঁদে, এইরূপে  
কান্নার উপর কান্নাতে কান্নাঘটির তরঙ্গ উঠিল ।  
তত উচ্চ প্রাচীরে বেরা আমখাসের তত বড়  
বাড়ী চীৎকার শব্দে তোলপাড় করিয়া ফেলিল ।  
সেই আর্ন্তনাদের প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনির প্রতি-  
ধ্বনি আমখাপবাটির চারিদিকে ঘুরে ফিরে  
মেতে বেড়াতে লাগল । সে আর্ন্তস্বর বাদ-  
শাহও শুনতে পেয়েছিলেন, কেন না, তখনই  
এক জন চোপদার এসে মৃত্যুরের শব তফাৎ  
করিতে কহিল, বাদ্যকরদেরও বাজাইতে  
আদেশ করিল ।\* একখান ডুলি আনা হইল,  
তার মধ্যে মৃত্যুরের মৃতদেহ রেখে এক  
পাহুপা কোরে ধীরে ধীরে সহরের বাহিরে লয়ে  
গেল।—মৃত্যুরের স্ত্রী তখনও তারে জাপটে  
ধরে আছে । দুটি অপোগণ্ড নাবালক শিশু  
হাত ধরাধরি কোরে কখন বা গলা জড়াগড়ি  
কোরে, কুকুরে কুকুরে কাঁদতে কাঁদতে ডুলীর  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল । বিস্তর লোক  
মায়ায় অহুরোধে শব ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে চলিল ।  
শব বিদায় হয়ে গেলে আমি ফিরে

\* অপরায়ীরা দত্তপ্রাপ্তির সময় যদি চীৎকার কোরে  
সোরসরাবৎ করিত, ঐ চীৎকারধ্বনি ঢাকিবার জন্য  
বাদ্যোদ্যম হইত । বাদ্যকরেরা এত উচ্চশব্দে বাজা-  
ইত যে, অপরায়ীরা যোর আর্ন্তস্বর ছাপাইয়া উঠিত ।  
তাদের আর্ন্তস্বরোক্ত চীৎকার করিলে ঐরূপ বাদ্যো-  
দ্যম হইত । এ প্রথা শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়,  
হিন্দুদের মধ্যেও বোধ হয় প্রচলিত ছিল ।

আমখাসের দরবার-ঘরে ঢোলে এলেন। বাদশাহ উঠেন উঠেন হয়েছেন, তখন তাঁর অন্তঃপুরে যাইবার সময়। আমাকে দেখে পিতা ইসারা কোরে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “সাদক! তোমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, বিস্তার সৌভাগ্য তোমার মুখ চেয়ে আছে। হুর্ভাগ্য মুক্তার খাঁর পদে তোমাকে বাহাল করা গেল, তার কর্ম তোমার হয়ে চুকেছে। তোমাকে এই কথা বলতে মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করেছেন। এক ঘটীর মধ্যেই বাদশাহী পঞ্জা সমেত তোমার নিকট নিয়োগপত্র পৌঁছিবো।” এ ঘটনাটি স্বপ্নের অগোচর, আমি কখন মনেও করিনি যে, মুক্তারের কর্ম আমার হবে। সংবাদটি শুনে স্তম্ভ না হয়ে বরং দুঃখিত হইলাম। কেন না, কথাই আছে,—কথা কেন, স্পষ্ট জানাই আছে, “অনেক পাই অনেক খাই যেখানে সেখানে আবার সময় বুকে অনেক কোত্তেও হয়”। বিশেষতঃ বাড়ানাড়ি যেখানে, শীঘ্র ছাড়াছাড়িও সেইখানে। আমি ঐ কথা শুনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—“তবে কি ইউসফ আমার কর্মে বাহাল হোলেন?”

পিতা ঠাট্টার স্বরে বলিলেন—“কে? ইউসফ, হুঁ! তাই বটে! না, না, সে পদও তোমার থাকবে।”

আমি বলিলাম,—“বাবা! দুই দিক্ কি রক্ষা কোত্তে পারবো? তার মত যোগ্য কি আ—”

পিতা অমনি বাধা দিয়ে বলিলেন, “ছি ও কি কথা! যোগ্য তোমাকে হতেই হবে, অবশ্যই হতে হবে।” এ ছাড়া আমার কানে কানে চুপি চুপি বলিলেন,—“এই বন্দোবস্ত! উপর তোমার পিতার জীবন নির্ভর কোচ্ছে।”

আমি আর কোন উচ্চবাচ্য না কোরে, সেখান থেকে ঢোলে আসি, এমন সময় বাবা আমার হাত ধোরে কানে কানে বলিলেন, “তবে আজ রাত্রে আর আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক নাই। আমি অল্প অল্প কাজে ব্যস্ত থাকিব।” আঃ, বাঁচলেন! হাড়ে বাতাস লাগলো, ষাড়ে থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। আমার অল্প বয়সে ছিল, সেখানে বাবার জন্তে প্রাণটা হাঁসকাঁস

কোচ্ছিল। আমি বল্লেন,—‘বাবা! আমি ত হাজিরই আছি, আপনার সুবিধা বুঝে ডেকে পাঠাবেন, আমি তখন গিয়ে সাক্ষাৎ কোরবো।’

আমি বাড়ী আসিলাম। কেবল এসে বোসেছি, এক ঘটীও হয় নি, এখন সময় পিতা যেরূপ বোলোছিলেন, আমার নিয়োগ-পত্র পৌঁছিল। এখন আমি আগরা সহর ও প্রদেশের সেনাপতি হইলাম। সুনীলাম, এ খবর সৈন্যদের মধ্যে সহরে ও গ্রামে পুর্কেই ঘোষণা কোরে দেওয়া হয়েছে। সৈন্তেরা প্রতীক্ষা কোরে আছে, আমি কখন গিয়ে তাদের উপর হুকুম-হামাম করি। বরকন্দাজ খাঁর পূর্ণ প্রত্যাশা ছিল যে, এই পদটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউসফের হবেই হবে। এক্ষণে আমার উপর তার যে প্রকার আক্রোশ ও ক্রোধ জন্মিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। আমি কি দুঃসাহসী! এ সকল জেনেও গোপনে গোপনে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ কত্তে সাহস করিতেছি!—তার ভ্রাতুষ্পুত্রী যে আমার সেই কুম্বনয়না, তার আর সন্দেহ নাই। সেই সন্দেহীর সঙ্গে একটিবারমাত্র সাক্ষাৎ করিব, ইহাই আমার অভিলাষ।

সায়ংকাল উপস্থিত। একজন আমলা আর ৫০ জন সিপাইকে সঙ্গে লইয়া যেখানে যেখানে হাওলদার, সরদার ও গ্রহরী ছিল, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁদের হাতিয়ারগুলিও তদারক কোরে দেখিলাম এবং তাদের প্রতি আবশ্যকমত হুকুম-হাকাম দিয়া অবসর লইলাম।

আগরা আর আগরার কেলা যমুনাতীরেই অবস্থিত! এই স্থানটি হিন্দুস্থানের যোগল-নৃপাল-গণের অতি মনোমত প্রিয় আবাস। মহাশক্তিব সম্রাট আকবর শাহ এই নগর নির্মাণ করিয়া আপন নামে নামকরণ করেন। সেই জন্ত ইহার আর এক নাম ‘আকবরাবাদ’। দিল্লী অপেক্ষা আগরা সহর আরতনে অনেক বড়। এই সহরে ‘বিস্তার ওমরাওর বাস। নগরবাসীদিগের গৃহগুলি উত্তম প্রস্তরে নির্মিত; কিন্তু গলি-পথগুলি অতি ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত, বিশেষতঃ সেই-গুলিতে বিস্তার ফের ও ঝাঁক। সে জন্ত



দরবারের সময় লোকের ঠাসা-ঠাসি হয়ে রাস্তায় বড় গোল হইত।

আগরার মূর্তিটি বিবিধ মনোহর গ্রামা শোভায় সুদৃশ্য। ওমরাওরা আপন আপন উঠানে ও উদ্যানে বড় বড় বৃক্ষ আরোপণ করিয়া ছায়া প্রস্তুত করিত। তাহাদের অট্টালিকাগুলি স্থানে স্থানে নবীন নধর নিবিড় লতা-পল্লবে ঢাকা থাকিত, ঐ সকল অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে মহাজনদিগের প্রস্তুত-নির্মিত গগনস্পর্শী বিরাট গৃহগুলি কানন-বেষ্টিত হর্গের ন্যায় শোভা করিত।

তার পর হাওলদার, কোতোয়াল, জমাদার, এরা সকলে এককাত্তি হয়ে জিজ্ঞাসা করিল,— ‘হজুর! সহরে গতিবিধির বিষয়ে আপনার কিরূপ অহুমতি, আজ্ঞা করুন।’ আমি বলিলাম, “তুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কাহারও যাতায়াতের নিষেধ নাই, কিন্তু কেহ ২০ জনের অধিক লোক লয়ে একেবারে সহরের মধ্যে ঢুকিতে কি তার বাতিরে যাইতে পারিবে না। যদি কাহারও সঙ্গে অতিরিক্ত লোক থাকে, তবে আমার সহীমোহর ভিন্ন তাহাদের ভিতরে প্রবেশ বা বাহিরে গমন করিতে দেবে না। আরঙ্গজেব আর যুরাদ-বাকী, এই দুই রাজপুত্রের সর্ব্বকে এ বন্দোবস্ত নয়, তাঁহাদের সঙ্গে যে পরিমাণে লোকজন থেকে থাকে, তাঁহারা যদি তার অতিরিক্ত লোক সঙ্গে আনেন, তবে তাঁহাদের পক্ষেও এই নিয়ম বলবৎ রহিল।” ঐ দুই রাজকুমার তৎকালীন সহরের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

বাহিরের বন্দোবস্ত শেষ কোরে রাজবাটীর প্রহরীদিগের তদারক করিলাম, দেখিলাম, সে রাত্রের জন্তে সকলেই আপন আপন স্থানে ব্যবস্থামত বিলি রহিয়াছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেই কাচময় ফোয়ারার সম্মুখে বারন্দায় বোসে পেঁচোয়া টানিতে লাগিলাম। সলিমান যে বুদ্ধার কথা বোলেনছিল, সে কথন আসবে, কতক্ষণে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, কেবল সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত রহিলাম। এই আসে, এই আসে করিয়া এক একবার পল্লও তাকাইতে লাগিলাম।

বাহার আসিবার কথা ছিল, সন্ধ্যার কক্ষ—

আচ্ছাদনের সঙ্গে সঙ্গে সে এসে উদয় হইল। তত আদরের দৃতীকে আস্তে দেখে আমার অন্তঃকরণ-আহ্লাদে ধড়াস্ ধড়াস্ কোরে লাফাতে লাগলো। অথচ মনে মনে তখন এ বিবেচনাও না কোরে থাকতে পারেন না যে, সে আমার বিপদের দৃতী হলেও হতে পারে, আমার অনন্ত দুঃখের পথ-প্রদর্শিকা হলেও হতে পারে, অথবা আমার আশু মৃত্যুর মৃলা-ধার হলেও হতে পারে। বুদ্ধা ফোয়ারার ধারে গিয়ে একটা আমার কলপ নিয়ে নাকরা কোত্তে লাগলো। কলসটা জলে একবার ভোবায়, একবার তোলে, কখন তারে চিৎ করে, কখন উবুড করে, কখন বা কাত করে, একবার তাতে জল ভরে, আবার সে জল ফেলে দেয়। নীচে নেমে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি কি না করি, সাত পাচ ভাবতে লাগলাম। কিন্তু বুদ্ধা মনে কোত্তেছিল তারে বন্ধ-ভক্ত কোত্তে দেখে আমি ছুটে গিয়ে দেখা কোরব। ফলে শেষে সেইটিই ঘটল। আমি আর স্থির থাকতে পারেন না, একটা ক্ষুদ্র চোরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেম, নামিয়াই বুদ্ধার পাশে গিয়ে দাঁড়াইলেম; একদান প্রকাণ্ড লাল রঙ্গের মাল গুড়ি ষোড় কোরে জড়ায়ে সর্বাঙ্গে ঢেকে রাখিলাম। ভাবিলাম, আমার চেহারাও দেখতে পাবে না, চিন্তেও পারবে না। কিন্তু আমি ঠোঁক্লেম, সে বুদ্ধি খাটলো না, বুদ্ধা আমাকে দেখতে পেয়েই সন্মোহন কোরে বোলে,— “কে ও, হজুর! আসুন আসুন, এত বিলম্ব করা ভাল হয় নি, বিশেষতঃ যে স্থানে কোন যুবতী প্রত্যাশাপন্ন হয়ে আশাপক্ষ চেয়ে আছে, সে স্থলে, ব্যক্তি যাব, হচ্ছে হবে, একরূপ গয়ংগছ না কোরে একটু চটপটে হওয়াই ভাল।”

আমি বলিলাম,—“ও কথা যেতে দাও। যার চারু প্রতিমা আমার দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই হরিণনেত্রী অপ্সরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার উপায় কি? তার কোন সম্ভাবনা আছে কি? থাকে ত, সেই কথা আগে বল।”

বুদ্ধা বলিল,—“আপনি আমার পেছনে পেছনে আসুন।”

আমি বলিলাম,—“রোসো, একটু দাঁড়াও,



একটা কথা শুন। তুমি ত অবিশ্বাসের কার্য্য কোব্বে না? দোহাই আল্লার, ফাঁকি দিয়ে ত ফাঁদে ফেল্বে না? প্রতারণা কোব্বে না ত?”

বুঝা বলিল,—“আচ্ছা! বেশ! যদি ভয়ই হয়ে থাকে, তবে যাবেন না,—ফিরে গিয়ে বারান্দায় বোসে পেঁচোয়া টানুন। আমি বোড়গাত কোচ্ছি হুজুর, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না, আমি ত আর চলুন চলুন বোলে আপনাকে সাহুতে আসিনি। আপনি যাবেন, আমি দেবল সঙ্গে কোরে পথ দেখিয়ে লয়ে যাব।”

আমি বলিলাম,—“আচ্ছা, তবে যাই, চলো।”

তখন বুঝা আমাকে সঙ্গে কোরে উঠানের এক টেরে একটি ক্ষুদ্র দরজার কাছে লয়ে উপস্থিত করিল। কোমর থেকে একটি চাবিকাঠি বার কোরে আন্তে আন্তে অতি সাবধানে কলুপে লাগিয়ে চেপে ধরিল; কলুপটি খুলে গিবে কবাট ছবাইল ক্রমে ক্রমে ফাঁক হয়ে পড়িল। বুঝা তখন আমাকে বলিল,—“এখন প্রবেশ কর।” আমি প্রবেশ করিলাম। বুঝা আমার পেছনে থেকে নিঃশব্দে দীর্ঘে দীর্ঘে দ্বারটি পুনরায় বন্ধ করিল। তার পর আমার কানে কানে কহিল, “তোমার যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে কথা কইও না, বোবা হয়ে থাক।” শেষে একটা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে আর একটা দরজায় উপনীত হইলাম। আমার পথ-প্রদর্শিকা কহিল,—“আপনি এই স্থানে একটু দাঁড়ান, আপনি এসেচেন, আমি গিয়ে ভিতরে সংবাদ করি।” আমাকে বড় অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে হলো না। বুঝা শীঘ্র ফিরে আসিল। আমাকে সঙ্গে কোরে লয়ে অঙ্গুণী হেলিয়ে একটি কামরা দেখিয়ে দিয়ে বলিল,—“আপনি এ ঘরে যান।” সে ঐ কথা বোলে চোলে গেল। ঐ গৃহের একদেশে একটি স্ত্রীলোক বোসে ছিলেন, মুখটি স্থূল অবদুগ্ধনে আচ্ছাদিত, হস্ত দুখানি বহু মূল্যের রত্নে ভূষিত। মনে মনে কতই গর্ষ করিতে নাগিলাম, ভাবিলাম, আমি কি কপালে পুরুষ! কেবল অদৃষ্টের জোরেই এই নিরুপমা স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম, নচেৎ এঁর সঙ্গে আলাপ করা

দূরে থাকুক, এঁর নিকটেও বেষিতে পারিতাম না; অদৃষ্টই আমাকে নিষিদ্ধে এঁর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

“ইহু! সাদক! আমি যে, তা তুমি কেমন কোরে জানতে পারলে? যে মন্ত ঘোমটার মধ্যে আছি, মনে কোরেছিলেম, তুমি আমাকে চিন্তে পার্বে না।” আমাকে দেখে সেই স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম,—“তা সত্য বটে, কিন্তু ঐ দুটি পঙ্কজ-নয়নের নিকট আমি অপরিচিত নই, তাদের উজ্জ্বল জ্যোতি একবার আমার উপর বিকীর্ণ হয়েছে, তাতেই আমি—”

“সত্যি নাকি? কই, কবে? কোথায় বল দেখি?” আমার কথা না ফুরাতেই যুবতী এই কথা বলিলেন।

আমি বলিলাম,—“কেন? এখন সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন?”

যুবতী বলিলেন,—“প্রয়োজন আছে, বোধ হোচ্চে, তোমার ভ্রম হয়েছে।”

ঐ কথা বলিয়া তিনি ঘোমটা উন্মোচন করিলেন। আমি যে চেহারা দেখ্বে অভিলাষ কোরে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে এসেছি, এ সে চেহারা নয়! বার মুখ দেখ্লে ভয়ে পেটের পিলে চমকে উঠে, এ সেই রাজকুমারী বেগম সাহেবের মূর্তি।

আমার ভ্রম হয়েছে দেখে, রাজকন্যা একটু হেসে বলেন,—“তুমি ভাঁত হইও না, আমাকে তুমি পরম বন্ধু জ্ঞান করিও। তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তবে এই বন্ধু দ্বারাই তুমি তোমার প্রণয়স্পদের সাক্ষাৎ পাইবে। আমি যদি তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি সে অনুরোধ শুনবেন, অমাত্য কোরবেন না; আমি বোলে তিনি তোমার সম্মুখে এলেও আসতে পারেন।” বেগমের মুখে ঐ কথা শুনে আমার চোক থলে গেল। এখন বুঝতে পার্লেম, এ সকল তাঁরই কৌশল। রাজকুমারীর স্বভাব আমার বেশ জানা ছিল, তিনি যে বিনি গরজে কারো উপকার করেন, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আমি বলিলাম,—“আমার রাজভক্তির অন্তর্গত না হয়, এমন কার্য্য কোত্তে প্রস্তুত

আছি, আমি আপনার গোলাম ।” আমার বেন  
বোধ হলো, রাজতনয়া আমার মুখে ঐ কথা  
বনে বক্রচক্রে একবার একটু কটাক্ষপাত করি-  
লেন, আমি বেন দেখ্লেম, তাঁর কপোলে একটু  
নকুটির উদয় হয়ে আবার তখনই অদৃশ্য হইল,  
অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী ছিল, উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই  
তার অন্ত হয়েছিল বলিলেই হয় । কেন না,  
তার পরেই রাজবালা এমনি একটি মধুর  
ভঙ্গীতে মুচকে হাসলেন যে, আমাকে মনে মনে  
অপ্রস্তুত হইতে হইল ! ভাবিলাম, রাজকন্যা  
এদি রাগ কোত্তেন, তবে তখনি তখনি অমন  
হাসির ছটা তাঁর মুখ থেকে কখনই বেরুত না ।  
আমারি ভ্রম হয়েছে, আমিই বুঝতে পারিনি,  
রাজকন্যা কোপভঙ্গী করেন নি, তাঁর প্রতি  
সে সন্দেহ করা অতি অন্যায় । অপরাধ যে  
আমারি হয়েছে, সেই এক হাসিতেই আমি তা  
মেনে লতে অর্দ্ধাঙ্গের অধিক রাজী হয়েছিলেম ।  
মুঠি হোক, বেগম বলিলেন,—“সাদক ! আমি  
বা বলি, মন দিয়ে শুনো : আমি বাদশাহ ছাড়া  
নই, তাঁর যে অভিপ্রায়, আমারও তাই, তিনি  
সে আজ্ঞা কোরবেন, সকলকে তা কোন্তেই  
হবে । তুমি মনে কটো, কোন একটা অভি-  
প্রায় ভিন্ন আমি কখন কারো প্রতি সদয় হই  
না, একটা মৎলব না থাকলে আমি তোমাকে  
সজ্ঞ তোমার উপকারের নিমিত্ত ডাক্তেম না ।

স্ব মুহূর্তকাল ভেবে দেখ দেখি, তোমার দ্বারা  
যার কি উপকারের সম্ভাবনা ? আচ্ছা, বল  
পিতুমি আমার কি উপকার কোন্তে পার যে,  
উপকার আমার নৃপ-পিতা, তোমার রাজ-  
নী মনে কোন্তে কোন্তে পারেন না ? তোমার  
নি কি ক্ষমতা আছে যে, সে ক্ষমতা বাদ-  
শাহের নাই ? তুমি যদি মনে কর, তোমার  
নি কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে, তবে অব-  
তোমার পদ-মর্যাদার অতিরিক্তই বিবেচনা  
রে থাক ।”

আমি বলিলাম,—“রাজপুত্রি ! ভদ্রে ! আমি  
কান কুমন্ত্রণা বা কুচক্রে লিপ্ত থাকব না, সে  
ভিপ্রায় আমি জেনে শুনেই পরিত্যাগ  
করিছি । যাহার কাছে আমি সর্বপ্রকারে ও  
কল বিষয়ে ঋণী আছি, কেবল তাঁহারি

সেবাতে আত্ম-সমর্পণ কোরব, এই আমার  
সকল । কিন্তু আবার এ কথাও বলি, মন কারো  
বাধ্য নয়, তার কাছে অভিমান খাটে না, সে  
যে পথে যায়, সেই পথে যেতেই হয় । যারা  
বড় সাধু-যাঁদের বড় নিষ্ঠা, যারা ঠিক ঠিক  
পথে চলেন, তাঁহারাও কখন কখন মনোভিলা-  
ষের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না । সেটি  
মনের দোষ, কিন্তু সে অভিলাষ—”

আমার ও কথা চাপা দিয়া বেগম বলিলেন,  
—“থাক, আর বোলতে হবে না, বুঝেছি, সেই  
কৃষ্ণনয়নার সতিত সাক্ষাৎ করিলে যদি তোমার  
রাজভক্তির লাবব হয়, তবে আপনি বিদায়  
হউন, তবে আর আপনার এ স্থলে আসবার  
আবশ্যক নাই । আগে বিবেচনা করেছিলেম,  
আমরা যার সঙ্গে কারবার কোন্তে বোসেছি,  
তিনি একজন মত্ত প্রেমানুরাগী প্রেমিক তাঁহার  
প্রণয়রাগ অতি তেজস্বর, সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া  
উঠে । বিশেষতঃ সেই কৃষ্ণনয়না নবীনা যুবতীকে  
অধীরা দেখে মনে করেছিলেম, সে যেমন  
তোমার জন্তে পাগলিনী, তুমি তার জন্তে অতি-  
রিক্ত উন্নতই না হও, নিদেন তার সমানও  
তো হবে, তা অবশ্যই হবে, এখন দেখ্লেম,  
সেটা আমাদের বুঝবার চক ।”

আমি কৃষ্ণনয়নার নাম শুনিয়া অধৈর্য্য হয়ে  
চেঁচিয়ে বলিলাম, “কি ! কি বলেন ? তবে কি  
তিনি আমার জন্তে—”

এই পর্য্যন্ত বলিতেই বেগম বলিলেন, “আর  
ও কথায় কাক নাই, বোধ্য গেছে, তার হয়ে  
আমি তোমাকে অনেক বলেছি, এখন বল ত,  
তোমার পথ-প্রদর্শিকা সেই বুদ্ধীকে ডেকে  
পাঠাই । বাদশাহের নিকট তোমার রাজ-  
ভক্তির ক্রটি হয়, আমি তোমায় এমন পরামর্শ  
দিতে চাই নাই, পরমেশ্বর করুন, আমার বেন  
সে প্রবৃত্তি না হয় ।” আমি কাতর হয়ে বলি-  
লাম, “রাজপুত্রি ! আমার অদৃষ্টক্রমে আপনি  
সকলি উল্ট বুদ্ধীলেন, আমার মধুরপ্রতিমা  
আমার জন্মে চিত্রিত হয়েছে, তাঁকে দর্শন কর-  
বার নিমিত্ত বদি সহস্র সঙ্কটে পড়তে হয়, কি  
সহস্রবার প্রাণবিয়োগ কোন্তে হয়, তাও  
আমার স্বীকার । যাকে দেখবার জন্তে নয়ন

পাগল হয়েছে, থাকে না দেখে প্রাণ থেকে থেকে কঁদে উঠছে, তাঁর ছবি কি শুধু অন্তরে দেখে অভিলাষ মেটে, না মনের সান্ত্বনা হয়?”

বেগম বলিলেন, “ভাল বলেছো; সার কথাই ত ঐ; চুল চেরা বিচার কোন্টে গিয়ে মিছে মিছে কেবল সময়ই নষ্ট কোরে; সময়ের কি মূল্য আছে? তবে এখন আমার সঙ্গে এস।” আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমাকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটা লম্বা গলিপথে লয়ে গেলেন, সেই পথের পাশের দিকে যে ঘর, সে ঘরের দরজা খোলা ছিল। বেগম আমাকে ঐ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াতে বলে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি অপূর্ব মানস-মোহিনী যুবতী দেখতে পেলেম, তেমন সুমধুর কোমল মুক্তি কেহ কখন চক্ষে দেখেনি। আমার দর্পণে তাঁর নীলোজ্জ্বল কমল-নেত্র ও রক্তোজ্জ্বল বিবাহের প্রতিবিম্বিত হয়, ইনি সেই রমণী-রত্ন। ষিখুমুখী একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়ী হয়ে আছেন। তাঁহার লোলিত ক্রোড়ে পার-স্থানের এক প্রকাণ্ড বিড়াল শরন কোরে ছিল। মাতা যেমন শিশু সন্তানের নিদ্রাবসন অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, যুবতী তেমনি ঐ বেরালটির নিদ্রাকাতর আধ-মুদিত নেত্র নিরীক্ষণ কর্ত্তেছিলেন। বেগম ঘরের মধ্যে গিয়ে সেই মানস-বিলাসিনী দেলজানের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন বর-কন্দাজ খাঁর ভ্রাতৃপুত্রীর নাম দেলজান। তাঁরা অতি অহচ্ছন্দে আলাপ কোচ্ছিলেন, আমি তার কোন কথাও শুনতে পেলেম না। একটু পরে বেগম ফিরে এসে আমার ইসারা কোরে ডাকলেন, আমি আনোদে ফুলফুলে হয়ে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। আমার মনে যে তখন কত ক্ষুণ্ণি হলো, তাহা বলে উঠতে পারি না। গিয়ে দেখি, দেলজান ঘোমটা টেনে চন্দ্র-বদন ঢেকে ধসে আছেন; যেখানে ছিলেন, সেইখানেই আছেন; সেই বেরালটি তখন ম্যাও-ম্যাও কোরে ডাকছিল, সেটি দেলজানের সোহাগের ‘হুলাল’, তাকে স্থখে রাধবার নিমিত্ত শিশুমুখী সত্যত উৎকণ্ঠিত;

অথচ বেরাল জানিত না যে, তার সৌভাগ্য একচেটে, তাতে অন্তের অধিকার ছিল না; সে বোধাবোধ নাই বলিয়াই সে পরম সুখী ছিল। বেগম একটু এগিয়ে গিয়ে বলিলেন, “দেলজান! যার কাছে পরিচিত হলে সকলেই স্নানোজ্ঞান করেন, তোমার প্রতিবাসী সেই সাদককে লয়ে এসেছি।” বেগম এই কথা বলে সেখান হতে প্রস্থান করিলেন। আমি এখন দেলজানকে ঘরে একলা পেয়ে আফ্লাদে চুরচুরে হলেম যুবতী কিন্তু অপ্রতিভের মত হয়ে কি কোরে আপনার অঙ্গ ঢাকবেন, সেই জ্ঞে উত্তর উত্তর বাস্ত হতে লাগলেন। একবার এদিকে, একবার ওদিকে দোরে বসেন, কখন বা একটু হেলে থাকেন, ওড়নাখানা দিয়ে কখন সর্কাজ ঢাকেন, কখন তার এক মুড় পিঠে ফেলে দেন, কখন কাঁধের উপর রাখেন, কখন বা সেখানা বুকের উপর ঝেঁপে দেন, তাতেই স্পষ্ট বোধ হলো, স্নানরী বড় লজ্জিতা হয়েছেন।

আমি বলিলাম, “দেলজান! যে দুটি তেজো-ময় অঁধি অবগুণ্ঠনের মধ্যে আছে, একপে দৃষ্টির বার হওয়ায় নরলোকে আর তাদের দর্শন পাচ্ছে না; কিন্তু ইতিপূর্বে ঐ কোমল নয়ন দুটি কতবার আমাকে ব্যাকুল, কতবার আমাকে পাগল করেছে, তখাচ কখন সাহস কোরে এমন আশা করি নাই যে, আমি কখন তাদের বিশ্ববিজয়ী মধুর উজ্জ্বল জ্যোতির নিকটবর্তী হব। আমি এসেছি বলে আপনি যদি মনে মনে বিরক্ত হয়ে থাকেন ত বলুন, আমার ঘাট হয়েছে, কেন আমি এমন অসম সাহস কোল্লম? আমি আপনাকে কাতর হয়ে বোল্চি, আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে ত ক্ষমা করুন।”

দেলজান খানিকক্ষণ মৌন হয়ে ছিলেন; কি উত্তর কোব্বেন, তাই বেন ভাবছিলেন, শেষে মধুর-মুহুর স্বরে বলিলেন, “আমথাসের উঠানের সম্মুখের বারান্দায় কে বসিতেন, আমি তা জানতেন না, আমি যে মধ্যে মধ্যে খড়-খড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতেম, সেটি অসঙ্গত কর্ম্ম হয়েছে। আমার ঐ অবিবেচনার দরুন মহারাজ আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন শুনে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি, আগে বুঝতে না

পেরে এখন পশ্চাচ্চি । এখন এই ভাব্চি যে, এমন কু-কর্ম কেন কোলেম, আমা হতে একজন ভদ্রলোক হক না হক নষ্ট হলো ! এত দিন সাক্ষাৎ পাইনি বোলে সে আক্ষেপ আপনার কাছে প্রকাশ কোন্তে পারিনি, আজ সেই অবসর পেয়ে বড় সুখী হলেম ।”

আমি বলিলাম, “আহা, দেলজান ! সে দিন যদি পৃথিবীর সমুদায় নরপাল আমার প্রতীক্ষায় ব্যস্তিতেন, তথাচ ঐ দুটি কৃষ্ণ-আঁখি আমাকে ঐ স্থানে আবদ্ধ কোরে রাখিত; পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ কোরে রাখিত সে দিন রাজদরবারে যাইবার মহা দরকার হইলেও আমি তা বিস্মৃত হয়ে যাইতাম ।”

দেলজান ও কথায় কান না দিয়া প্রকৃত দ্রুগ্ধিত-স্বরে বলিলেন, “কেমন, বাদশাহ ত এখন আপনার উপর সদয় হয়েছেন ? আর ত তাঁর রাগদ্বন্দ্ব নাই ?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, সে সব নির্বিঘ্নে চুকে গ্যাছে, এখন তিনি আমার প্রতি বেশ প্রসন্ন হয়েছেন, সম্প্রতি আরও অনেক সম্মান আমার উপর স্তু পাকার কোরেছেন ।”

ঐ কথা শুনে হিতাভিলাষিনী দেলজান বলিলেন, “আল্লা তাই করুন, তাঁর কুদরৎ বাড়ুক ।”

আমি বলিলাম, “দেলজান ! তবে কি তুমি আমার হিতাকামনা কর, তবে কি আমাকে স্তম্ভী দেখে তুমি সুখী হও ?”

দেলজান বলিলেন, “তা হই, তা হওয়া কি উচিত নয় ? এই হতভাগিনীই ত তোমার ভংখের মূল্যধার হয়েছিল ।”

আমি বলিলাম, “হতভাগিনী কেন ? সে কথা বোলো না, আমার সোভাগ্য যে, তুমি আমার প্রতি কুপাদৃষ্টি কোরেছিলে ।”

দেলজান বলিলেন, “ভাল, সে সব কথা পরে হবে, আমরা অত ফের-ফারের কথা-বুঝি না, সম্প্রতি আপনি যে এখানে আস্তে সাহসী হয়েছেন, আপনি কি জানেন না, এতে কত ভয়, কত জখম আছে ? শেষে আপনাকে বিস্তর ঝুঁকিতে পড়তে হবে, অনেক দায়ে ঠেকতে হবে ।”

আমি বলিলাম, “তাতে কিছু এসে যায় না, যে দুটি কৃষ্ণ আঁখির উজ্জ্বল প্রভা আমাকে উন্নত করেছে, সেই আঁখি দুটি আর একবার দর্শন কোরব, এর জন্তে আমি কি না কোন্তে পারি ? জখম ঘাড়ে করা কোন বিচিহ্ন ! তার জন্তে আমি --”

দেলজান অমনি বলে উঠলেন, “একটু ক্ষান্ত হউন, যে আশয়ে বোল্চেন, আপনি এখনও সে বিষয়ের কিছুই জানেন না । এখন বিদায় হউন, আপনাকে বিনয় কোরে বল্চি, আপনি বিদায় হউন, কথায় কথায় রাত অনেক হয়েছে, আপনি এখন ঘরে যান, আমিও বিদায় হলেম ।”

আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, “না, তা হবে না, কি কোন্তেই বা এলেম ? আবার কি বোলেই বা যাই ? আবার কেবে দেখা সাক্ষাৎ হবে, সে কথা আগে বল, তবে আমি যাব, নচেৎ কেমন কোরে যাই ? কাল কি আবার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে না ?”

দেলজান বলিলেন, “ও কথার উত্তর আমি দিতে পারি না, আমি আমার কহা নই, বেগম যা করেন, তাঁর একাধিপত্য ; তিনি যা বোলবেন, তাই হবে ।”

আমি বলিলাম, “তা হলেই যথেষ্ট, আমি আর কিছু বলতে চাই না । বেগম ত আমার পরনন, পরম বন্ধু ; তবে কাল আমি ফের আস্চি দেলজান ! দেলজান ! তুমি একটি দুর্বল পুষ্ণ, দেবতারা প্রহরী হয়ে তোমাকে যেন রক্ষা করেন ।” বিদায়কালীন এই কথা বোলে গাত্ৰোত্থান করিলাম ।

দরজার কাছে এসে বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো । তিনি আমাকে সঙ্গে কোরে আপনার ঘরে লয়ে গেলেন । রাজবালা যে কুপা কোরে আমার চাকলোচনা প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন, সেই উপকার স্বরণ কোরে পাতিতজানু হয়ে আমি তাঁকে বিস্তর সাধুবাদ করিলাম । দেলজানের গহিত আবার কাল একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এ জন্তে তাঁকে অনেক সাধ্লেম, বিস্তর কোরে বোল্লেন, কিন্তু রাজবালা কোন ক্রমেই তাতে ঘাড় পাত্লেম না ।

কেবল মাথা নেড়ে বোল্লেন, “সে কথা এখন গায় রইল, আগে দেখি, কোথাকার জল কোথায় মরে, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখন ভূমি কোন কথাবার্তা না কোয়ে কেবল ফোয়ারার দিকে চেয়ে থাক, যদি সেই বুড়ীকে দেখতে পাও, তবে নীচে নেমে তাকে সঙ্গে কোরে বাড়ী চোলে যাও।” ঐ কথা বোল্লে বেগম করতালির শব্দ কোল্লেন, শব্দ শুনেই আমার সেই পথ-প্রদর্শিকা হাজির হইল। আমি বিমগ্ন হয়ে বিদায় লইলেম, সে আমাকে সঙ্গে কোঁরে নিবিঁয়ে বাটী পৌঁছিয়ে দিল।

বিবি দেলজানের বয়ঃক্রম আন্দাজ সতর আঠার ; মাঝারি গোচের গড়ন, বরং কিঞ্চিৎ দোহারী ; দেখতে না খাট না লম্বা, মাঝামাঝি রকম, মুখধানি বড় লম্বাও না, বড় গোলও না, বাদামে ; হাঁ ছোট ; ঠোঁট পাতলা, টুকটুকে, বেন রক্ত ফেটে পোড়চে ; চক্ষু দুটি ডাগর, বেশ দীর্ঘ ছাঁদ, সজীব ও প্রফুল্ল, এত উজ্জ্বল যেন নক্ষত্র জল্চে, যৌবনের তরলতায় দিব্য-রাত্রি ঢল ঢল কোচ্ছে ; চাউনি অল্প বাঁকা, অথচ লজ্জায় অধ্ৰাবনত ; ক্র বেশ টানা, দেখলে মনে লয় যেন মুখপদ্মের মধুর আশায় ভ্রমরদল সারি বেঁধে কাতার দিয়ে উড়ছে ; মাথার চুল বেশ কালো, যেমন বন, তেমন লম্বা ; বর্ণ দুখে আলতা, ধব্ ধব্ কোচ্ছে ; লাবণ্য অতি কোমল, অতি মোলাম, যেন ননীৰ পুতুলটি ; হাত-পায়ের গড়ন বেশ গোল, সুডৌল ; আঙ্গুলগুলি টাপার কলির ছায় সুলী ; বিবি দেলজানের শরীরে কোন খুঁত ছিল না, তাঁকে দেখলে জ্ঞান হয় যেন, একটি নিখুঁত গোলাব-ফুল ; কণ্ঠস্বর ‘এত মধুর যে, জ্বী-মাধুরী তার কাছে লজ্জা পায়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

“এখন কার মন-রাখি।”

পরদিন দরবারের সময় আমখানে হাজির হইলাম। সত্ৰাটের চরণে প্রণাম কোরে সম্ভ্রতি প্রাপ্ত উচ্চসম্মানের জ্ঞে আপনার উদার কৃত-জ্ঞতা জানাইলাম। মহারাজ শুনে চুপ কোরে রহিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না ; আমি আন্তে আন্তে তাঁর সম্মুখ থেকে চোলে আসিলাম। বাবার মুখ অতিশয় মলিন, শুকিয়ে যেন মড়ার মত হয়ে গ্যাছে। তাঁর চেহারা দেখে বৃক্কে পাল্লেম, তাঁর মনে ঘোর অসুখ। চিত্ত-ব্যাকুলতার তাবৎ লক্ষণ তাঁতে স্পষ্ট লক্ষিত হোচ্ছিল। দরবার শেষ হতে না হোতে মনের অবসাদে আকান্ত হয়ে তিনি একেবারে হাত-পা ভেঙ্গে পোড়িলেন, প্রায় উঠে যাবার শক্তি ছিল না ; আমি তাঁর অপেক্ষা কোরে রইলেম, কি জানি, যদি কোন কথা বলবার থাকে ত বোল্বেন, কিন্তু আজ কোন বিশেষ কথা ছিল না যে বলেন। তবে আজ রাত দুই প্রহরের সময় তাঁকে একবার সহরের বাহিরে না গেলে নয়, কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেই জ্ঞে বাহিরে যাবার একখানা অনুমতি-পত্র চাহিলেন। আমি পত্রখানি লিখে হাতে হাতে তখনি ধোরে দিলেম। বাবা আজ বাহিরে যাবেন শুনে আত্মলাদে মেতে উঠিলাম, ভাবিলাম, তবে আর আমাকে কে পায়, আর আমাকে কে আটকায়, এখন আমি স্বচ্ছন্দে চারুহাসিনী বিবি দেলজানের সঙ্গে দেখা কোন্তে যেতে পারব ; তবে কেবল এখন যাবার যোগাড়টা হয়ে উঠিলে হয়, সেই যোগাযোগটা হোলে আর কোন চিন্তা থাকে না।

বেলা অপরাহ্ন হয়েছে। রাজপুরী ও সহর প্রদক্ষিণ কোন্তে বেরুলেম, যেখানে যে কোতো-য়ালী ছিল, দেখে শুনে তদারক কোরে ফিরে এসে সাবেক দস্তুরমত সেই ফোয়ারার সম্মুখে গিয়ে বস্লেম। এখন সন্ধ্যা অল্প অল্প ঘোর হয়ে এসেছে, দেখি যে, সেই বৃদ্ধা পূর্বের মত আমার

কলসটি লয়ে ঐ রক্ত-জলনির্ঝরের নিকট আসিতেছে, আমি তাই দেখে আত্মদে কুলুতে কুলুতে ছুটে গিয়ে তাকে ধোয়েম, সে আমাকে নিঃসাড়ে বরকন্দাজ খাঁর অন্ধরু-মহলে পৌছিয়ে দিলে। সেখানে গিয়ে দেখি, বেগম সাহেব আমার আশাপথ চেয়ে আছেন। আমি তাঁকে প্রীতি পূর্বক নমস্কার কোরে কুতাজলি হয়ে বলিলাম, “আপনি আমাকে অনেক রূপা কোলেন, আমার উপকার কোলেন, আপনার দ্বার আমি কখনও পরিশোধ কোত্তে পারব না।” এই শিষ্টাচারের পর আমার প্রেমময়ী দেলজান কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোলেন। বেগম একটু হেসে আমাকে সঙ্গে কোরে দেলজান যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে লয়ে গেলেন, গিয়ে দেখি, আমার বিলাসিনী সেখানে নাই, বরং বালি পোড়ে আছে, খাঁ খাঁ কোচে! তাই দেখে আমি যেন কুলুকো কাণা হলেম, একেবারে বুক ভাঙা হয়ে বোসে পোড়লেম। বেগম আমাকে বোলে, “একটু অপেক্ষা কর, তোমার চিত্রময়ী দেলজান এখনিই আসবেন, এলেন বোলে।” এই কথা বোলতে বোলতে একটা দরজা খুলে গেল, অমনি আমার প্রণয়িনী দেলজান এসে দর্শন দিলেন। তিনি যখন আসছিলেন, বোধ হলো যেন, একটি অপরূপা আসছেন, সেই প্রকার ঠমকে ঠমকে, থমকিয়ে থমকিয়ে চোলুতেছিলেন। দেলজানের ঘোমটা সোরে পেড়ে আলুথালু হয়ে কাঁধের উপর ঝুলুতেছিল। হায়! কি মনোহর ললিত ভঙ্গী চক্ষে দর্শন কোয়েম। মস্তকের কেশদাম নবজলধরের তায় শোভা পাচ্ছিল। চন্দ্রমা যেন মেঘে ঢাকা ছিল, কেবল এইমাত্র তা থেকে মুক্ত হয়েছে। তাঁর মুখচন্দ্রিমা সেইরূপ সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল ছটা বিকাশ কোরে আমার নয়ন-মন সুশীতল কোর্তে লাগল।

আমি যে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, দেলজান তা জানতেন না। বরের মধ্যে প্রবেশ কোরেই দেখেন, সম্মুখে এক ব্যক্তি অপরিচিতের তায় দাড়িয়ে; সুন্দরী অমনি ঘোমটা টেনে দিলেন। এবং অপ্রতিভ হয়ে লজ্জায়

বেগমের বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে শশিমুখখানি ঢাকলেন। বেগম তাঁর কানে কানে কি বলেন, বোধ হলো, সেই কথা শুনে যুগ্মদ্বয় মনে সাহস হলো, কেন না, তাঁর পরেই আমার দিকে ফিরে আলাপ কোরে আরম্ভ কোলেন। বেগমও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন, আমি তাই দেখে আত্মদে এত বিস্মল হোলেম যে, আমাদের কি কথা হোচ্ছিল, আমার সে হৃৎ ছিল না, তবে আমার এইমাত্র স্মরণ হয়, নানা প্রকার আঘোদ ও হস্তপরিহাসের আলাপ চোলুচ্ছিল, কতক্ষণ ধোরে চোলুচ্ছিল, তা আমার মনে নাই। এর মধ্যে একবার আমি ঘাড় উঁচু কোরে দেখি, কেবল আমি আর দেলজান বোসে আছি, বেগম নাই, তিনি তখন চোলে গেছেন; কখন উঠে গেছেন, তা বোলতে পারি না।

অনেক বোলে কোয়ে, বিস্তর সেধেপেড়ে, বিস্তর মাথার দিবি দিয়ে, দেলজানের মুখাবরণ মোচন করালেম। সুন্দরী যখন ঘোমটা খুলেন, তাঁর রূপের এমনি ছটা বেকলো, জ্ঞান হকো যেন, একটি জ্যোতি দপ কোরে জ্বলে উঠে ঘর আলো কোলে। একে তাঁর রূপে আলু-তায় গোলাবী রং, তার উপর আবার মুখখানি ঝক্‌মক ঝক্‌মক কোরে লাগল, সে রূপের তরঙ্গ দেখে কার চৈতন্য থাকে? আমি সংজ্ঞা-শূন্য হোলেম, বুদ্ধি-ভুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, প্রেয়সীর অতুল্যমতি না চেয়ে, না বোলে না কোয়ে, তাঁর একখানি হাত টেনে লয়ে আশ্বে আশ্বে আমার হাতের উপর রাখলেম, সুন্দরী অমনি হাতখানি কোলের দিকে সরিয়ে নিলেন,—বিরক্ত হয়ে সরিয়ে নিলেন। ভাগিস প্রেমাতুরাগের আর কোন পরিচয় দিই নি, তা হোলে আজ অদৃষ্টে কি ঘটতো, বলা যায় না!

দেলজানের মুখে শুনে পেলেম, রাজকুমারী রসিনারা তাঁর স্বামী বরকন্দাজ খাঁকে হতভ্রম্বা করেন। তাঁহাদের পরস্পর অপ্রণয় হবার প্রধান কারণ এই—রসিনারা আরম্ভজীবের মঙ্গল কামনা করেন, অথচ বরকন্দাজ খাঁ দারার চিরানুগত বিশ্বস্ত পাত্র। দেলজানের কথার

আভাসে বোধ হলো, তিনি রাজপুরীর চক্রান্তের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন, এটি তাঁর ইচ্ছা। আমি সকল দিক্‌ দাঁটিয়ে চল্‌তেম ; কি জানি, যদি দৈবাৎ কখন কোন বেকাঁস বা অসঙ্গত কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সর্বদা সাবধান হয়ে কথা কইতেম। যিনি এক্ষণে আমার সম্মুখে বোসে, ইনি একটি ছোটখাট ধূর্ত রাজনীতি-চতুর। আমায় বলেন, “আচ্ছা, আপনার কি মত, যদি এর মধ্যে শাজাহানের লোকান্তর হয়, তবে রাজসিংহাসন কার হবে ? কার সম্ভাবনা জেয়াদা ?” রাজপুত্রদের মধ্যে কার বলাবল্‌ অধিক ?” এই বিষয়ে আমার মত জানবার জন্ত দেলজান অনেক কৌশল করেন, অনেক চার—অনেক চোপ ফেলেন কিন্তু আমায় গাঁথতে পারেন নি, আমি আদৌ ও কথা গায়ে পেতে নিতেম না। সুন্দরী বধনই কথায় কথায় রাজ্যতত্ত্বের কথা ভুলতেন, আমি অমনি সে কটকময় পথ পরিত্যাগ কোরে অতি প্রাজ্ঞপ্রেম-কথা পাড়তেম। আমি দেখ্‌লেম, দেলজান রাজাস্তম্ভপুত্রের বাস কোরে সুখী নহেন, তিনি কেবল বাদশাহজাদীদের খেলনার পুতুল হয়ে আছেন। তাঁরা তাঁকে যে দিক্‌ ফেরাচেন, যে ভাবে নাচাচেন, তাঁকে সেই দিক্‌ ফির্ন্তে হোচ্ছে, সেই ভাবে নাচতে হোচ্ছে। দেলজানেরও শাহজাদীদের উপর বড় একটা স্নেহ-মমতা ছিল না ; এমন স্থলে তা থাক্‌তেই পারে না। সুন্দরীর কথার ভাবে বোধ হলো, আমি যে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে যাই, তাঁর খুড়ী রসিনারা সে খবর জানতেন না। আর আমি যে তাঁর নয়নপ্রতিমা দর্শন কোরে হতজ্ঞান হয়েছিলেম, এক দিন বাদশাহ কথায় কথায় বেগমের সঙ্গে সেই গল্প করেন। বেগম আবার সেই কথা লয়ে দেলজানের সঙ্গে পরিহাস কোত্তে কোত্তে বলেন যে, তিনি মধ্যস্থ হয়ে আমাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ কোরিয়া দেবেন, কিন্তু এ কথা যেন খুব গোপন থাকে, কদাচ মুখের বার না হয়, এই বন্দোবস্ত স্থির হয়।

আমি বলিলাম, “দেখ দেলজান ! বেগমের কোন স্বার্থ নাই, অথচ আমার প্রতি তাঁর কত

অনুগ্রহ। তিনি আমার কত উপকার কোলেন, সে জ্ঞাতি আমি তাঁর কাছে আজন্ম গণী হয়ে রইলেম।

দেলজান বলিলেন, “আমি চাই, সেইটিই যেন শেষে সপ্রমাণ হয়। কিন্তু আর একটি বিষয় ছিল, তা হোলে বড় মনের মত হতো অর্থাৎ—” এই পর্য্যন্ত বোলে দেলজান থতমত খেয়ে থমকিয়ে চুপ্‌ কোরে রহিলেন, ভয়ে যেন মুখ চোক ভুকিয়ে গেল।

আমি বলিলাম, “ভাবিনি ! দেলজান ! এই সময়টুকু আমার জীবনের সুখের সময়, যে কথা বোলে ফেলেছো, তার জ্ঞাতি আবার ভয়ে কাঁপচো কেন ?”

দেলজান একটু সামলে, দিক্‌ ধোরে হেসে বোলেন, “কৈ ! কি বোলেছি আমি ?”

আমি ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে যৌন হয়ে রইলেম, কিন্তু বাগ্‌-নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চেয়ে থাক্‌লেম। তাই দেখে নিরপরাধিনী দেলজান কাঁপরে পোড়লেন। বিলাসিনী শেষে লজ্জার নতমুখী হয়ে বোলেন, “আমি এই কথা বোলছিলেম, বেগমের মনোগত অভিপ্রায় কি, সেটি জানতে বাকী আছে, এখনও তা জানা যায় নি। বেগম বড় খোদ-গরজী, তাঁর মনে মনে কোন একটা মংলব আছেই আছে, সেটি স্বরণ হোলে, আমরা যে পরস্পর সাক্ষাৎ কোরে সুখী হব, এমন মনে হয় না।”

আমি বলিলাম, “ভয় কি ? তুমি সে আশঙ্কা কারো না, তুমি মাত্র সদয় থাক, তা হোলে সহস্র বাদশাহজাদী এলেও আমাদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাঘাত জন্মতে পার্‌বেন না। তোমার চারুকান্তির ছবি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে রোয়েছে। তুমি অভাবে এই জগৎসংসার আমার কাছে শূন্যময় জ্ঞান হয়।” সুন্দরী ঐ কথায় লজ্জিতা হয়ে অল্প দিকে মুখ ফিরালেন। আমি বল্‌লেম, “আবার কাল এসে দেখা করবো, কি বল দেলজান ? রাজী আছ ত ?” দেলজান তাতে সম্মত হন হন, এমন সময় বেগম এসে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে বোলেন, “রাত ঢের হয়েছে, আর দেরি



করা ভাল হয় না, এখনি তুমি বিদায় হয়ে  
দেখ নাও।” প্রেমিকদের সময় কি চপলা!  
দেখতে দেখতে গত হয়। আমার যেন জ্ঞান  
হলো, সব এইমাত্র আমার কথাবার্তা কুইতে  
আরন্ত কোরেছি, এর মধ্যে আমাকে বিদায়  
চাইতে হলো! যাহাকে আটপ্রহর চক্কের উপর  
বৈথে নয়নের তৃপ্তি জন্মে না, যার সঙ্গে অহো-  
রাত্র আলাপ কোরে মনের আক্ষেপ ষেটে না,  
যার সঙ্গে উদয় অস্ত একত্রে বসে কোরে অন্তঃ-  
করণের খেদ যায় না, সেই প্রেমময়ী দেল-  
জানের পার্শ্ব শূন্য কোরে আমাকে যেন টেনে  
ছিঁড়ে ছিঁড়িয়ে বার কোলে। কি করি, বিলম্ব  
কোলে পাছে কেউ জানতে পারে, সেই ভয়ে  
তাড়াতাড়ি কথা শেষ কোরে আমায় উঠতে  
হলো। আসবাব সময় বেগম আমাকে বিস্তর  
আশ্বাস দিয়ে বোলেন, “সাদক! মনে কিছু  
পারো না। তুমি তোমার বিলাসিনীর সঙ্গে  
আর একটিবার দেখা কোতে পাবে, এই  
কথা হির রহিল।” আমি বেগম সাহেবকে  
বিস্তর স্তব-স্ততি কোরে পূর্বের মত সেই বুদ্ধাকে  
নজ্জ কোরে নির্ধিয়ে আপনার গৃহে পৌছি-  
লাম। পথে কারো সঙ্গে দেখা হলো না, তখন  
একটি প্রাণীও জেগে ছিল না।

এইরূপে একাদিক্রমে আট দিন গত হলো,  
নিত্য রাত্রে প্রতিবাসীর অন্তর-মহলে যাতায়াত  
কোরে দেখা-সাক্ষাৎ করি। এর মধ্যে পিতা  
একদিন একটি সভায় ডেকে পাঠালেন। সভাটি  
যতন্ত রকমের, আমি ত দেখে শুনে অবাক!  
তাবলেম, এ কি চমৎকার ব্যাপার! সভা  
নিমন্ত, ঘোর নিমন্ত, সকলেরই ভয়ঙ্কর মৃতি,  
সকলেরই অবয়বে ঘোর! দুজ্জের অভিশ্রায়  
লঙ্কিত হোজে, দেখে স্পষ্ট অনুভূত হলো,  
তাদের মনে কোন একটা ভয়ানক গুরুতর  
গৃহকথা বিচরণ কোচে। পাছে অসাবধানতা  
বশতঃ কথায় কথায় সেই কথা রসনা অতিক্রম  
কোরে ঘূণাক্ষরে বাহিরে বেরিয়ে পড়ে, সেই  
জন্তে সকলে ঘোর নীরব, গভীর নিমন্ত হয়ে  
আছে।

দেলজানের সঙ্গে যে দিবস আমার প্রথম  
দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তার অষ্টম দিবসে দরবার-

ভঙ্গের পর সম্রাট আমাকে বোলে পাঠালেন,  
আজ যেন খাস্কা মরায় গিয়ে শ্রীমানের সঙ্গে  
সাক্ষাৎ করি। আমি সেই আদেশান্তরে মহা-  
রাজের সহিত দেখা কোলেম। অতি ভক্তি-  
ভাবে গদগদচিত্তে কুতান্ধলি হয়ে দাড়িয়ে  
আছি, বাদশাহ অনেকক্ষণ ধোরে তাকিয়ে  
তাকিয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ  
কোলেন। তার পর বোলেন, “সাদক! তুমি  
প্রতিজ্ঞা কোরেছ, তোমার রাজস্বামীর বিশ্বস্ত  
পাত্র হবে, প্রাণান্তেও অবিশ্বাসের, কাঁধা  
কোরবে না।”

আমি ধরাতলে প্রণত হয়ে পুনরায় ঐ  
প্রতিজ্ঞা করিলাম।

বাদশাহ বোলেন, “এইবার তোমার পরীক্ষা  
লওয়া যাবে। এখন যা বলি, মনোযোগ কোরে  
শুন। পুত্রেরা আমাকে রাজাসম্পদে বঞ্চিত  
কবার চেষ্টা পাচ্ছে, চারজনই আপনার  
আপনার ফিকির দেখছে, আপনার আপনার  
পন্থায় ফিছে। আমরা সে সব সংবাদ পেয়েছি।”

শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেল, আকর্ণ-  
শূন্য হলো, বুক গুঁড়ু কোতে লাগলো।

মহারাজ ভয়ে চকিত হয়ে বোলেন, “সাদক!  
সে কথা মিথ্যা নয়, যথার্থই তারা জাল ফেলে  
ফেলে, ফাঁদ পেতে পেতে বেড়াচ্ছে। এখন  
তোমার উপর আমাদের লক্ষ্য, তুমি তাদের  
এমনি একটা শিক্ষা দিতে চাও, তারা যেন  
স্বপ্নেও জানতে না পারে যে, কোথা থেকে কি  
হলো। সাদক! তুমি সর্বদা বোলে বেড়াও,  
তুমি কারও পক্ষ নও। তুমি যে কারও পক্ষ নও,  
তা আমাদেরও বিশ্বাস হয়, আমরা তোমার  
সে কথা মানি। কিন্তু তুমি যে আমাদের  
নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নিত অন্তগত ও একান্ত বাধ্য,  
সেইটিই সপ্রমাণ কোরে আমাদের মনে  
নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাস জন্মিয়ে দাও। আমরা  
যখন যে হুকুম কোরব, তোমাকে তখনই সেই  
হুকুমমত চোলে হবে, তা হোলে আমরা  
বোলেতে পারব, ধর্মভয় রাখে, যুনিবের বিশ্বস্ত  
পাত্র, একরূপ চাকর আমাদের যদি অধিকও না  
থাকে, নিদেন একজনও ত আছে।”

অন্তঃপুরের মধ্যে একটি নির্জন ঘর, তার



চারিদিক মন্ত চণ্ডা ভিতের প্রাচীরে ঘেরা।  
 একটিমাত্র দরজা, তাও লোহার, সে লোহাও  
 আবার খুব শক্ত, সেই বরের মধ্যে আমাদের  
 কথোপকথন হোচ্ছিল। তাতেও শ্রীমানের  
 বিশ্বাস হলো না। বাদশাহ ত চিরকালই সন্দ্বি-  
 মনা, তিনি আপনার আসন থেকে উঠে এসে  
 আমার কানে কানে বোলেন, “সাদক! রাজ-  
 কুমারেরা যাতে মৃত হয়, তা তোমাকে কোন্টেই  
 হবে।” ঐ কটি কথা যখন তাঁর মুখ দিয়ে  
 বেরল, সেই সময় মহারাজ আমার বাহু জাপটে  
 ধোলেন, খুব শক্ত কোরেই ধোলেন, বোধ হলো,  
 আমাকে যেন ধমে ধোলেন। আমি পূর্বে জান-  
 তেম না যে, তাঁর শরীরে তত শক্তি ছিল। হাত  
 ধোরেই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন; তিনি  
 তাঁর বোরোজ্ঞল অন্তর্ভেদক তীক্ষ্ণচক্ষু দ্বারা  
 আমার মনের ভাব নিরীক্ষণ কোরে দেখতে  
 লাগলেন। শ্রীমানের মুখে ঐ সকল ভয়ানক  
 কথা শুনে আমার এত বিস্ময় হলো যে, মুখে তা  
 ব্যক্ত করা যায় না। তখাচ বাদশাহ আমার  
 সে অন্তর্ভাব জানিতে পারেন নি, আমি তাঁকে  
 জানতে দিই নি। আমি বিনয়াবনত হয়ে  
 মুখে কেবল এইমাত্র বোলেন, “মহারাজ!  
 আদেশ শুনলেই মান্য করা হলো, শোনার  
 নামই মান্য।”

সম্রাট বোলেন, “তবে সেই কথাই ভাল,  
 আমরা যে একটি স্ত্রীজীবী ভীতস্বভাব বালক  
 লয়ে কার্য্য কোচ্ছি না, এও আমাদের পরম  
 আশ্রাদের বিষয়। সাদক! দেখো, খবরদার,  
 এককালেই চারজনকে ধোরে কারারুদ্ধ কোন্টে  
 চাও, অগ্র-পশ্চাৎ হয় না যেন। তাদের তুমি  
 অপমান, অসম্মান কোরো না, কিন্তু ঘেরাও  
 কোরে রেখো। দেখ, আমার মুখের দিকে  
 চাও। তাদের ধোরে একেবারে গোয়ালীয়ারের  
 কেল্লায় লয়ে যেও।”

‘গোয়ালীয়ার’ এই কথা শুনে আমার গায়  
 যেন জ্বর এলো। মনের বেগ সংবরণ কোন্টে না  
 পেরে, মুখ দিয়ে হঠাৎ এই শব্দ বেরিয়ে  
 পড়লো, “কোথায়? গোয়ালীয়ারে?”

“আঃ! কি বালাই! তোমার ভয় হলো না  
 কি?” বাদশাহ এই উক্তি করিলেন।

আমি বলিলাম, “মহারাজ! ‘ভয়’ সে  
 অনেক দূরের কথা।”

সম্রাট বোলতে লাগলেন, “তোমার মনের  
 ভিতর যা যা হোচ্ছে, আমি যেন তা দেখতে  
 পাচ্ছি। তুমি মনে কোরেছ, আমি তাদের প্রাণে  
 মোরে ফেলব, এই আমার অভিপ্রায়। সাদক!  
 তা নয়, তারা যে জেলে প’চে মোরবে, সেটা  
 কথার কথা। তারা আমার সম্মান ত বটে।  
 তবে কথা কি, আমাদেরও প্রাণ বাঁচে, তাদেরও  
 জীবনরক্ষা হয়, এই উভয় দিক বজায় রাখবার  
 নিমিত্ত ঐ উপায় অবধারিত করা হয়েছে।  
 রাজ-সরকারে লম্বা বয় আছে, তারা তোমারি  
 তাঁবেদার, সকলেই তোমার হুকুম-বরদাবি  
 কোরবে। তাদের লয়ে যা ভাল বুঝবে, তাই  
 কোরবে, কিন্তু দেখো যেন, কষ্টবাসাধনে ক্রটি  
 না হয়।”

আমি কোন কথা বলব বলব, মহারাজ আমাকে  
 সে কথা বোলতে না দিয়ে কহিলেন, “রাজ  
 কুমারদিগের মৃত ও কারারুদ্ধ করণের ক্ষমতা  
 প্রদান কোরে তোমাকে পরোয়াণা পাঠান  
 যাবে, তাতে বাদশাহী পঞ্জা সমেত আমার দস্ত-  
 খত থাকবে। ক্ষমতাদানের পত্র তোমার  
 নিকট সময়মত পৌঁছবে। তুমি আর তিলান্বিত  
 বিলম্ব কোরো না, পরোয়াণা যেমন পাবে,  
 অমনি তুমি তোমার কাজে চোলে যাবে।” এই  
 সকল কথা শেষ হইলে মহারাজ আমাকে বিদায়  
 দিলেন। আমিও আশু আশু আপনার গৃহে  
 চোলে আসিলাম। কি বিষম সঙ্কটেই পোড়-  
 লেম, কি কঠিন ভারই এসে ঘাড়ে চাপলো!  
 সোরষের ফুল দেখতে লাগলেম। ভেবেই  
 অস্থির, ভাবনার সমুদ্রে ভাসতে লাগলেম।  
 ঘরে এসে বড় অধিকক্ষণ বোসতে পারিনি,  
 এমন সময়ে বাবার কাছ থেকে একজন ষাউড়ে  
 সহি-মোহরের একটা পুলিন্দা লয়ে উপস্থিত  
 কোলো। পুলিন্দা দেখে যা ঠাউরেছিলাম, তাই  
 হলো। বাবা লিখে পাঠিয়েছেন, আজ রাত দুই  
 প্রহরের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্টে যেতে  
 হবে। পূর্বে তাঁর নিজ বাটীতে গিয়ে দেখা  
 কোন্টেম, এবার তা নয়, অত্ৰ কোন স্থানে গিয়ে  
 সাক্ষাৎ কোন্টে হবে। পিতার লোক বিদায়

হোতে না হোতেই একজন চোপদার এসে উপস্থিত; সম্রাট আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গিয়ে দেখি, বাদশাহ অতিশয় উদ্ভিন্ন। আমাকে দেখে বোলেন, “সাদক! তোমাকে কি সকল শাহজাদাদের ধোঁতে হুকুম দিয়েছি?”

“আজ্ঞে, সকলকেই, আমি ত মহারাজের এইরূপ হুকুমই পেয়েছি।” আমি এই উত্তর করিলাম।

বাদশাহ বলিলেন, “তা ভালই হয়েছে। পরোয়াণাতে সকলেরই নাম থাকা ভাল, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিকে ধোঁতে না হয়, তা হোলে বড় স্মৃতি হব। কেমন, এ কথা মর্ম্ম রূপে পেয়েছ ত?”

আমি বলিলাম, “শ্রীমানের কি আজ্ঞা হয়, তাই কেবল একবার স্বকর্ণে শুনব। আমার যত দর সাধ্য, হজুরের হুকুম রক্ষা করব। কোন্ রাজপুত্রের প্রতি রাজরূপা হয়, আজ্ঞা করুন?”

বাদশাহ বলিলেন, “আচ্ছা, ঐ কথাই ভাল। এর উপর আর কথা কি? মুরাদবাকী যুগ্মার আনোদে আছেন, থাকুন, তাঁর উপর উৎপাত করবার আবশ্যক নাই। তবে যদি তিনিও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কোরে থাকেন, তুমি যদি তা জান, কি শুনে থাক ত বল, আমি তোমায় বোল্তে বোল্ছি, তুমি বল, তা যদি হয়, তবে তাঁকেও ছাড়বে না, ধোঁরে নিয়ে কয়েদ করাবে।”

আমি বলিলাম, “রাজপুত্র মুরাদ যে কোন একম অবিশ্বাসের কার্য্য কোরেছেন, এমন কথা আমি কারো মুখে শুনিনি, আমি তা জানিও না। হজুর যখন এ গোলাঘের মতামত জিজ্ঞাসা কোলেন, তখন আমাকে সত্যকথা বোল্তে হয়। রাজপুত্র মুরাদবাকী আপনার অবাধ্য নন, তাঁর রাজপিতাকে অসুখী কি উৎকণ্ঠিত করেন, এ মানস তাঁর নাই, বরং আমার বাসনা যে, এ বিষয়ে কেউ তাঁর ছন্দ না করে।”

বাদশাহ বলিলেন, “আমি খোদাতালাার নাম কোরে বোল্ছি, তা যদি সত্য হয়, তবে মুরাদ স্বাধীন হয়ে আপনার অভিক্রটিমত যেখানে সেখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করুন, আমি তাতে বাধী হব না। আমি তাঁর পিতা এবং

রাজাও বটে। তবে যদি তিনি এর পর বিবেচনা না করেন, আমার সঙ্গে তাঁর যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, তা যদি তিনি ভুলেই যান, তবে তাঁর সহিত আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত, তা তৎকালীন বিবেচনা করা যাবে।” ঐ কথা বোলে শ্রীমান হস্ত আন্দোলন কোরে আমায় বিদায় হোতে ইচ্ছিত কোরেন। আমি বিদায় লয়ে বাড়ী আসিলাম। যে দূরত্ব কঠিন ভার আমার উপর সমর্পণ করা হয়েছে, তার চারি অংশের একাংশ হইতে পরিভ্রাণ পাইলাম, তাই ভেবে মন অনেক সুস্থ হইল।

একপে সায়ংকাল উপস্থিত। সেই স্ববিধা কখন আসবে, কখন আসবে কোরে প্রাণ ধড়ফড় কোত্তে লাগলো, এক একবার তাকিয়ে তাকিয়ে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেম। আর কিছু নয়, আজ আমি রাজ-অন্তঃপুরে যেতে পারব না, সে এলে এই কথাটি তাকে বুঝিয়ে বোলে দেব। পিতা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আজ রাতে সাক্ষাৎ না কোলে নয়। বরূপা যে সময়ে এসে থাকে, সে ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলো, তখন তামসী রক্ত আবরণ প্রসারিত কোরে দিগ দিগন্ত ঢাকিয়াছে। বরূপাকে দেখে আমি নীচে নামলেম, তার হাত দুটি ধোঁরে বিস্তর বিনয় কোরে, বিস্তর সেধে-পেড়ে বোল্লেম যে, দেলজানকে বুঝিয়ে বলো, আজ অদৃষ্টক্রমে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হলো না, সেটি কোন মতেই ছোটে উঠল না। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোত্তে পাল্লেম না বোলে আশায় বঞ্চিত হয়ে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হোলেম। কি করি, পিতার অনুরোধ এড়াতে পাল্লেম না।

বরূপা বলিল, “তা হবে, আপনি কি আর মিথ্যা বোল্চেন? কিন্তু হজুর! তা যাই বলুন, যে ওজরই করুন, আপনাকে যেতেই হোচ্ছে। সেই ক্রকনয়নার সঙ্গে আর যদি কখন সাক্ষাতের বাসনা রাখেন, তবে এই রাত্রেই একবার সেখানে চলুন, আসুন, আমার সঙ্গেই যাবেন, বেগম একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন, নিদেন ছদ্মগুর নিমিত্তেও আপনাকে একবার যেতে হবে।”

আমি ত বড় ভক্তকটতেই পড়্লেম। ভেবে কিছু খই পেলেম না। এমন কি জরুরি কথা আছে যে, আজ আমাকে একবার না গেলে নয়। বেগমেরও আজ তা না বোলে নয়? রাজকুমারদের সম্বন্ধে মহারাজ্ঞ যে মনন কোরেছেন, রাজবালা কি তা শুন্তে পেয়েছেন? বাদশাহের কি তত এলোমেলো স্বভাব? বুড়িতে চতুর, কাহনে কাণ? রাম না হতে রামায়ণ গেয়ে দিলেন নাকি! না, তা না হবে, বাদশাহ তত অদাবধান নন, তিনি যে সে কথা যুগ্মকরেও কাকে বোলেছেন, আমার বিবেচনায় তা বোধ হয় না। যাহা হোক, ঐ কথা শুনে আমি আর দ্বিধাক্তি না কোরে বুজ্জার সঙ্গে সঙ্গে চোলেম। গিয়ে দেখি, বেগম আমার বিলম্ব দেখে একবার ঘর, একবার বার, এইরূপ ঘর-বার কোরে ছটপটিয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি আর আমি যখন নিরিবিগি হোলেম, বেগম বোলেন, “সাদক! সত্য বোলছি, আমি তোমাকে এক লহমার অধিক আটকিয়ে রাখব না।” এই কথা বোলে বোলেন, “কিন্তু এখানে এমন কোন লোক আছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোলে না বোলে তিনি বড় অস্বপী হবেন, তাঁর মনে অতিশয় দুঃখ হবে।” আমি বেগমকে বিস্তর ধোরে কোরে বোলেম, তিনি যেন সেই লোকটিকে ভাল কোরে বুঝিয়ে বলেন, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে বোলেই আজ তাঁর সঙ্গে দেখা কোন্তে পাল্লেম না, নচেৎ সাক্ষৎ না হবার আর কোন কারণ নাই।

বেগম বোলেন, “শুনে বড় দুঃখিত হোলেম। চাই কি, তোমার সঙ্গে আর কখন তাঁর দেখা-সাক্ষৎ না ঘোটতে পারে।”

আমি অমনি বোলে উঠ্লেম, “আর কি কখনই দেখা হবে না? কেন, কে আমাদের ধোরে রাখবে?”

বেগম বলেন, “আজ যে বড় জোর জোর কথা! ঠাণ্ডা হও, অত উতলা হইও না। সে তোমার ইচ্ছা। চাই তুমি জন্মের মতই বিচ্ছেদ কর, কিংবা আর কখন ছাড়াছাড়ি না হয়, তেমনি মতই দেখা-সাক্ষৎ কর, সে ভার তোমার উপর, তুমি তার কর্তা।”

ঐ কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পোড়্লেম, অবাক হইয়ে বেগমের অন্তর্যম মুখভঙ্গীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম। কিন্তু বেগম আমার অবাক-মুষ্টি দেখে মনে মনে কিছু নরম হওয়া, কি দমে যাওয়া, তা তিনি কিছুই হন নি। তিনি তাঁর আপনার রোখেই ছিলেন। রাজতনয়া দুই চোক পাকিলে আমার দিকে চেয়ে বোলতে লাগলেন, “হাঁ, আমি ঠিক কথাই বোলেছি, সে কথা ত মিথ্যা নয়! সে বিবেচনা তোমার আছে, সে বিষয় তোমার উপর নির্ভর কোছে। সাদক! সে তোমাকে এত ভালবাসে যে, তোমার জন্তে সে পাগল। তুমি মনে কোলে স্বপ্ন এনে হাতে দিতে পার, আবার তুমি মনে কোলে তাকে অকূল পাথারে ভাসাতেও পার। তুমি ইচ্ছা কোলে তার হৃদয় বিদীর্ণ কোরে চরমার কোন্তে পার, আবার ইচ্ছা কোলে সেই হৃদয়কে তুমি আনন্দে নাচাতেও পার; সে সকলি তোমার হাত, তুমি যা কর, তাই—”

আমি উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, “ভদ্রে! আর্যো! আমাকে সব খুলে খেলে বলুন, অন্ধকারে রেখে আর আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না! আমার কি ক্ষমতা? আমি কি কোন্তে পারি? দেলজানের স্থখ-দুঃখের উপর আমার কি অধিকার আছে? কিসে আমি মনে কোলেই তাঁরে স্থপী, মনে কোলেই দুঃখী কোন্তে পারি? আমার সব স্পষ্ট কোরে বলুন, আমি অত ফেরফারের কথা বুঝি না।”

বেগম বলিলেন, “তুমি যদি সদয় হলে আমার একটি উপকার কর, তা হোলেই সব দিক্ বজায় থাকে।”

আমি বলিলাম, “হায়! আমার কি ক্ষমতা? যে, আপনার উপকার করি?”

বেগম বলিলেন, “কেন? যুবরাজ দারাবে রেহাই দিলেই আমার উপকার করা হবে।”

বাঘিনী সাংঘাতিক লক্ষ প্রদান-উক্কাবার পূর্বে শীকারের প্রতি একবার কোপ-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করে, তার ঐ কোপদৃষ্টিতেই শীকারের প্রাণরক্ষার আশারূপ ঘর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আমার তার পলাইবার পথ থাকে না। আমার

সদ্যক্রেও ঠিক তাই ঘোটল। বেগম ঐ কথা বোলেই আমার দিকে দুই চোক তাকিয়ে রইলেন। তাঁর ঐ ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে আমি মনে মনে কঁপে গেলেম, তবে জড়সড় হয়ে বোলেম, ‘রাজবালা! আমি কি প্রকারে রাজপুত্র দারার উপকার কোত্তে সক্ষম, তা আমায় ভেঙ্গে বলুন?’

আমায় কুণ্ঠিত দেখে বেগম যেন মনে মনে খসী হয়েছেন, সেইরূপ একটু অহঙ্কারের হাসি হেসে বোলেন, “কি বল্লো? আমাকে কি কচি থকী পেয়েছ? আমি কি কিছু জানিনে? কোন সচিব বাদশাহকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, আমি তা অবগত নই, তুমি বুঝি তাই মনে কোরেছ? সেই পাণে সে যেন নরকে সেক্ত হয়। আবার বাদশাহ যে সেই পাণিষ্ঠের দুর্নয়গাছ-সারে চোলবেন স্থির করেছেন, তাও কি আমি জানিনে বিবেচনা কোরেছ? সাদক! তোমার যেন সে ভ্রান্তি না হয়, আমি না জানি কি? আমি সব শুনেছি। তুমি নাকি দেলজানের প্রণয়-অভিলাষী, তার প্রণয়ের মর্যাদা টের পেয়েছ, আমার সহিত তোমার ভাব-প্রণয় বজায় থাকে, দারা অপ্রমাদে বেঁচে যান, এগুলি নাকি তোমার মনের ইচ্ছে, সেই জন্তে আমি গম্যাকে ডেকে বোল্চি, রাজকুমার দারার ভাগ্যে যা ঘোটবে স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা যেন না ঘটে। দারা যেন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কোত্তে পারে। তাঁকে তুমি ধোরো না। বাকী রাজপুত্রদের তুমি পুতাই কর, আর তাদের প্রাণে মেরেই ফেল, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমার যেমন মনে লয়, তাই করো। কিন্তু খবরদার! রাজকিশোর দারার একটি আঙুলও যেন স্পর্শ করো না।”

বেগমের মখে ঐ ভয়প্রশ্ননের কথা শুনে, দরভায় অস্বাভাবিক শুকিয়ে গেল। আমি ভাবাগজারামের মত তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেম। একদিকে বাদশাহের কাছে চিরবিশ্বাস রক্ষা করা, অপরদিকে দেলজানের প্রণয় বজায় রাখা, এই উভয় সঙ্কটে পোড়ে টানাটানিতে প্রাণ-সংশয় হলো! দেলজানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা আমার বড় বলা।

বেগম বলতে লাগলেন, “তুমি বাহলক সত্য করার করবে, কি করে দিবা কোরে শপথ করবে, আমি তোমাকে আপাততঃ সে জন্তে ডাকি নি। আমি জানি, আজকাল তোমার সময় বড় হ্রাস, তুমি এক্ষণে বিদায় হয়ে বাড়ী যাও, কাল রাত্রে ফের এই বিষয় নিয়ে আমাদের কথোপকথন হবে।” এই কথা বোলে বেগম করতালির শব্দ করলেন, বুদ্ধা এসে হাজির হলো। সে আমাকে সঙ্গে কোরে উঠান পর্যন্ত নিঃসাড়ে পৌছিয়ে দিলে। সেখান থেকে ঘরে না গিয়ে সরাসর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলেম। আমার বুদ্ধিওদ্ধি সব ঘুরে গেছে, এখন আমি প্রায় উন্মাদ। হাঁফাতে হাঁফাতে, দৌড়তে দৌড়তে, রাজপথ দিয়ে ছুটে চোলেম। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে উপনীত হয়ে দেখ্লেম, একজন লোক বোসে রয়েছেন, একখানি মোটা রক্তবর্ণ সালে তাঁর আপাদমস্তক ঢাকা। তিনি আমার পিতা জানতে পেরে আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাড়ালাম।

বাবা আমাকে দেখে বল্লেন, “কে ও, সাদক? সাদক। তোমার কিকিৎ বল্ল হয়েছে। তা হোক, আমার সঙ্গে এস।” এই বোলে বাবা গাঝাড়া দিয়ে উঠে বল্লেন “এখন বেশ অন্ধকার হয়েছে, আমাদের কেহই দেখতে পাবে না, চলো, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া যাক।” বাবা তাড়াতাড়ি কোরে একটা নির্জন আধারে বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন, আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেম। একটা মস্ত সড়ঙ্গে গলীপথের এক টেরে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢকে, কতকগুলি সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে, একটা কামরার মধ্যে উপস্থিত হোলেম। একটি আলো সেখানে মিট-মিট কোরে জ্বল্ছিল। বাবা দরজা বন্ধ কোরে আমাকে বোসতে বোল্লেন, আমি বোস্লেম, তার পর তিনিও এসে আমার পাশে বোস্লেন।

বাবা বল্লেন, “সাদক! দেখ, বাদশাহ বৃষ্টিধারার স্থায় তোমার উপর অহুগ্রহ বর্ষণ কোরেছেন, সেরূপ অহুগ্রহের কথা পূর্বে কেউ কখন শুনেনি। অশ্রুতপূর্ব অহুগ্রহ তুমি

যেন তোমাকে ঢহান্ত দিয়ে ঢেলে দিয়েছেন। সে সকল আমারই প্রসাদাৎ। কিন্তু তাই বোলে তুমি এ বিবেচনা করো না, যাতে তুমি বিলাস-স্বপ্নে মত্ত হয়ে আমোদ-প্রমোদ কোত্তে পার, কি যাতে তুমি তোমার সমকক্ষ আমীরদের চেয়ে মহাস্বপ্নে বিমোহিত হয়ে থাকতে পার, তারি একটা উপায় কোরে দিবার নিমিত্ত তোমাকে এই উচ্চপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। তুমি যদি তাই মনে কোরে থাক, সে তোমার মত্ত ভ্রম। আমাদের সে অভিপ্রায় নয়, আমাদের অল্প কোন মৎসব আছে। আমি জানি, তুমি আমাকে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি কর, মহারাজেরও বেশ বিশ্বাস হয়েছে, তুমি তাঁর নিতান্ত অনুগত ও বাধ্য। কিন্তু তুমি যে আমাদের ষথার্থই বিশ্বাসের পাত্র, আমরা যে ভুলে অপাত্রে বিশ্বাস করিনি, সেইটিই এখন তুমি সপ্তমাণ কোরে দাও, তা হোলে আমাদের মনে আর কোন গোল থাকে না।” আমি যুখে কোন কথা না বোলে শির নত কোলেম। তার পর পিতা বোলতে লাগলেন, “একশে আর রাজপুত্রদিগের অভিপ্রায় অপ্রকাশ্য নাই; সিংহাসনের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য, পাছে সম্রাট বর্তমান থাকতে থাকতে তাঁদের আপনাপনির মধ্যে একটা লড়াই-ঝগড়া বেধে উঠে, পাছে শেষে রক্তারক্তি হোতে আরম্ভ হয়, এখন আমাদের সেই আশঙ্কা বড় হোচ্ছে। সেই কাটাকাটি মারামারি যাতে না হোতে পারে, এখন আমাদের সেই চেষ্টা। বিশেষতঃ রাজপুত্রদের মধ্যে পরস্পর চিত্তবাধ হওয়ায় এক এক পক্ষের একটি একটি স্বাপক্ষ দল হয়ে চারিদিক্ ছেয়ে আছে। রাজকুমারদের পরস্পর মন ভারাক্রান্তি না থাকে, সব দিক্ মিটে মাটে যায়, তন্নির ছোট বড় তাবৎ লোক মহাবল শাজাহান ভিন্ন অল্প কাহারও নিকট জালু অবনত না করে, সেই জন্তে শাজাহাদের গুত করবার মন্ত্রণা স্থির হয়েছে।”

আমি বোলেম, “আমি তা জানি।” পিতার চমৎকার জ্ঞান হলো যে, আমি তা কেমন কোরে জান্তে পেলেম? তাঁর বিশ্বয় দর্শনে আমি পুনরায় বোলেম, “আমি তা জানি।” যে স্বত্বে

হতে জানি, তাও বোলেম। আরও এই কথা বোলেম, যিনি বাদশাহকে এ কাজ কোত্তে পরামর্শ দিছেন, তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হবে, অনেক দায়ে ঠেকতে হবে, অনেক ভোগাভোগ ভুগতে হবে।

পিতা বলিলেন, “আমিই পরামর্শ-দাতা। বিবেচনা কোলেম, এই উপায়ে যদি রাজ্যের শান্তি, বাদশাহের নিরাপদ এবং আমার প্রাণ-রক্ষা হয়, তবে—” আমি অমনি চমকে উঠ্লেম, আমার গায় যেন কাঁটা দিলে। পিতা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে নিজমুষ্টি ধোলে, বোলেম, “তুমি বালক,—তোমার অভিপ্রায়, আর তোমার জ্ঞান জগতের অল্প অল্প বালকের অভিপ্রায় আমি তৎপজ্ঞানও করি নে। আমরা যা হুকুম কোরবো, তুমি সেই হুকুমমত চোলবো, তাঁবেদারি করাই তোমার কৰ্ম, তন্নির তোমার আর কোন কাজ নাই। অতএব যে পথ আমি নির্দেশ কোরে দেব, সেই পথ ধরে তোমাকে চোলতে হবে, খবরদার! তার বাঁয়ে কি ডাইনে কদাচ যেও না, গেলে তোমার ভাল হবে না।” মুনিবওয়ারি কৰ্ম, চারা কি! হুকুমমত আমার চোলতেই হবে, এই বিবেচনা কোরে আমি বোলেম, “রাজ-আদেশ আমি অবশ্যই পালন করবো,—আমায় তা কত্তেই হবে, সেটি করা আমার কৰ্ত্তব্য।”

পিতা বলিলেন, “তা সত্য, কিন্তু তোমার পিতার প্রাণরক্ষা করাও তোমার সেইরূপ কৰ্ত্তব্য। তুমি যেন সেই পবিত্র কৰ্ত্তব্যালুষ্ঠানে পরাজুথ হয়ে অধর্মাচরণ করো না।”

“আমার হাত কি? আমি হতে তা কি-প্রকারে নির্ঝাঁহ হতে পারে?” আমি এই উত্তর করিলাম

পিতা বলিলেন, “তুমি যদি বাকী রাজপুত্র-দেব কয়েদ কোরে আরজজেবকে ছেড়ে দাও, তবেই সকল দিক্ রক্ষা পায়।”

“আরজজেব”, ঐ নাম শুনে আমি উচ্চস্বরে বোলেম, “কি বোলেম? আরজজেব?—বাবা! আপনি দারার নাম কত্তে ভুলে আরজজেবের নাম করেছেন, তার সন্দেহ নাই।”

বাবা বোলেম, “কি! দারা? সেই বুদ্ধ

ভাটা ? তার ভো দানোর মত ভয়ঙ্কর জ্বলে  
চারি, দেখলে লোকের ঘৃণা জন্মে । আমি  
রক্তজেরই নাম করেছি । যেখানে প্রাণ  
য়ে টানটানি, যেখানে মৃত্যু আর জীবন  
য়ে বিচার, সে স্থলে আমার ভ্রম হলো ! তাও  
কখন হোতে পারে, তুমি বোধ কর ? আমি  
এতই উন্নত ? আমার মনে হচ্ছে, তুমি সেই  
রা—সেই দানোর দিকেই ঝুঁকছে, তার  
ক্লেই তোমার মনে মনে অধিক টান । দারা  
কেবল অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছে, একবার  
দিপত্য পেলে হয়, তখন একটবার মাত্র  
জুলী হেলিয়ে আমার চেপে চটকে ঠেসে  
মরে ফেলবে । বালক ! আমার এই কথাগুলি  
তোমার মনে যেন গাঁথা পাকে । আরক্তজেকে  
চাও, তা হোলে তুমি তোমার পিতাকেও  
চালে ।”

মথকোড় লোকেরা কাহারকও চুকে কথা কর  
ন, গুরুজনকেও রেয়াত করে না । আমি বলি-  
ম, “বাবা ! আপনি সিধে লোক নন, আপনি  
পেঁচাল মানুষ, ফের-ঘোরের কথা বৈ  
ন না । আপনার বাঁকাগুলি নিবিড় আবরণে  
কা, আমি অনেক চেষ্টা কোরেও তার মধ্যে  
ক আছে, দেখতে পাচ্চিনে । আমি আপনার  
গিয়ে ধোচ্ছি, আমার স্পষ্ট কোরে বলুন, সংশয়ে  
রথে আর আমার যন্ত্রণা দেবেন না ।”

বাবা বলিলেন, “তবে শুন, আমার এই হস্ত  
একটি কার্য্য কোরেছে, তাতে কোরে এ  
পর্গন্ত এক লহমার নিমিত্তেও আমার মনে স্পৃহ  
নেই, আমার মহাপ্রাণী, আমার আত্মাপুরুষ  
এক তিলও স্তম্ভির নয় । শাজাহান আমার  
প্রলোভ দেখান, সেই প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে  
আমি তৈমুরবংশের শেষাবশিষ্ট সন্তানকে  
হস্তে নিপাত করি । তার পর সম্রাটের  
মন্তকে যখন রাজচ্ছত্র শোভিত করা হয়, আমরা  
কয়েকজন একত্র হয়ে তাঁর ললাটে রাজ-টীকা  
প্রদান করি । শাজাহানকে রাজ্যাপহারক জ্ঞান  
কোরে প্রজার মনে অতিশয় ক্রোধ জন্মিল, আপা-  
নার সাধারণ সকলেই তাঁকে বিদেহ করিতে  
লাগিল, লোকে পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে  
তাঁর ছন্থার কথা বোলে বোলে বেড়াতে

লাগিল, সকলেরি মনে বিশ্বাস হলো যে, শাজা-  
হানের কৌশলেই, তাঁর হকুমই ঐ ভয়ানক  
হত্যা কাণ্ড নির্মল হয়েছ । আত্মপাপ স্বীকার  
কোন্তে বাদশাহের সাহস হলো না, বরং তিনি  
যে নিরপরাধ, সেইটিই সপ্রমাণ করবার জ্ঞে  
রাজ-সভার মধ্যে ঘোর ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা কোরে  
বোলেন, যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অমৃতের  
সাংঘাতিক প্রহারে সেই শেষাবশিষ্ট সন্তানের  
প্রাণসংহার হয়েছে, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেই  
ঘাতককে আপামর সাধারণের কোথের মধ্যে  
বলি প্রদান করিবেন । আমি এক কথার বাস্পও  
জানতেম না, একদিন বাদশাহের সহিত নিরি-  
বিলি সাক্ষাৎ কোরে বোলেম, ‘মহারাজ ! আমি  
আপনার অষ্টম ষষ্ঠম মিটিয়ে নষ্টকোঙ্গী উদ্ধার  
কোরে দিয়েছি, এখন আমার প্রতি কি বিবে-  
চনা করবেন করুন । আমাকে অশ্রমার অর্থ  
দিন, বড় পায়্য দেখে একটা চাকরী দিন, আর  
আমাকে আমীর বা ওমরাও কোরে দিন ।’  
বাদশাহ শুনে বলেন, ‘আমি তোমার প্রার্থনা  
অমাত্য কোন্তে চাই না, কিন্তু সভার মধ্যে  
প্রতিজ্ঞা করেছি যে, ঘাতক, সে যেই হোক,  
আমি তার শিরশ্ছেদন করবো । তুমি যে  
হত্যা করেছ, তা কিন্তু কখনই প্রমাণ হবে না,  
সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাক । কিন্তু সাদ্ধা !  
তুমি যদি আমার পরামর্শ শোনো, তবে স্থানা-  
ন্তরে গমন করাই তোমার উচিত, তা না কোরে  
তুমি যদি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কোন্তে বল,  
আমি তা করবো, তবে তোমার সঙ্গে আমার  
এই কথা স্থির, যদি সাক্ষ্য কখন প্রমাণ হয় যে,  
তুমিই হত্যা কোরেছ, আমার দ্বিবি,—  
মহম্মদের দোহাই, আমি তোমাকে ঘোর  
যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণে নষ্ট করবো, আমার  
উপকার করেছ বোলে তখন তোমায় রেয়াত  
কোরব না ।’

আহা ! তখন যদি বাদশাহের কথা শুনে  
আগ্রা পরিত্যাগ কন্তম, তবে বিজের মতই  
কার্য্য করা হইত । তখন ভাবলেম, বড় পায়্য  
হবে, প্রচুর অর্থ পাব, আমীর হব, এই  
সকল লোভের প্ররোচনায় আমি আমার  
প্রার্থনা পরিত্যাগ কল্লেম না । সব প্রথমে

আমি খাজাকীর পদে নিযুক্ত হলেম, এই খাজাকী-গিরী থেকে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদস্থ হয়ে এক্ষণে উজীরের পদে অভিষিক্ত হয়েছি, মানসসম্মতও বঞ্চিত হয়েছি। আমার পরামর্শ, আমার যুক্তির প্রভাবে বাদশাহেরও বিস্তর উপকার হয়েছে। মহারাজ! আমার গুণের মর্যাদা বৃদ্ধিতে পেরেছেন, তার সমাদরও কোরে থাকেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আমি তাঁর দুই চক্ষের বিষ হয়ে পড়েছি, আমার পানে মুখ তুলে চেয়ে দেখতে তাঁর স্থণা হয়। আমি যেন ধর্মের ঢোল হয়ে তাঁর দুর্নামটি হাতে বাজারে চেঁড়রা মেরে দিয়েছি। তার তাৎপর্য্য এই, আমাকে দেখলে তাঁর সেই দুর্কর্মটি মনে না পোড়ে যায় না। বিধাতার কি কৌশল! বাদশাহ যে এত আশ্চর্য্য, এত ধূম-পাম, এত জাঁকজমকের মধ্যে ফুলবান হয়ে বেড়াচ্ছেন তথাচ সেই দুর্ভাবনাটি তাঁর মন থেকে যায় না, তার হাত থেকে তাঁর পার পাবার যো নাই, সেটি যেন মনে লেগেই আছে, এক লহ-মার নিমিত্তেও তাঁর অন্তঃকরণে সুখ নেই। হাসছেন, আমোদ আনন্দ কোচ্ছেন, বিষয়-কর্ম দেখছেন, কিন্তু সে মহাপাতকের ভাবনাটি মনে জাগছে, সেটি কোন মতেই ভুলতে পারেন না। তাঁর মনে যে কত কষ্ট, তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমারও যে কি কষ্টে দিন যাচ্ছে, তাও কেউ জানে না,—যে দুর্ভাবনার আমি কাল কাটাকি, তা আমিই জানি আর জগদীশ্বরই জানেন! আহা—নিজ প্রায় ত্যাগ হয়েছে, হাত আর মুখে উঠে না, পেটে আর অন্ন যায় না,—ভেবে ভেবে আধখান হয়ে গেলেম। উঃ! এ কি যাতনা! কি জানি, কি বিপদ ঘটে, সেই আশঙ্কাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হোচ্ছে, যত্ন যেন মুখ বাড়িয়ে আছে, না জানি কখন গ্রাস করে! না খেয়ে সুখ, না গুয়ে সুখ, মনের সন্দেহ কিছুতেই যায় না।—পাপ-বুদ্ধির চক্রে পোড়ে যে দিন থেকে সেই বোর দুর্কর্মটি নিষ্পন্ন করি, সেই দিন থেকেই পদে পদে বিপদের আশঙ্কা! যত্ন যেন সঙ্গে সঙ্গে ফিচ্ছে, চিন্তা সর্ব্বদাই অস্থির, মন সর্ব্বদাই উদ্ভাস, প্রাণ থেকে থেকে চমকে উঠে, কেহ

যদি একটি চুপে চুপে কথা কয় কি কেউ যদি গোপনে পরামর্শ করে, আমার গাটা অমনি দলুকে উঠে, চম্চমে ভাবে চারিদিকে ফ্যাল-ফ্যাল কোরে চেয়ে দেখি; ভাবি, হয় ত আমার কি কথা বলাবলি কচ্ছে! বড় গুরুবল, তাই এখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেটে যাচ্ছে। নচেৎ এত দিনে একটা উন্মুখুন্মু ব্যাপার বেধে উঠত! শেষে অঁতুঠে কি আছে, তাই বা এখন কে বলতে পারে?

ও কথা যাক, আপাততঃ তোমাকে বা বোল্ছিলাম। রাজকুমারেরা ক্রমে শৈশব-বস্থা উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে পদার্পণ কোলেন। তরুণ বয়সে, বিশেষতঃ রাজারাজড়াদের ঘরে যে সকল দোষ জন্মিয়া থাকে, রাজপুত্রদের তার অসচ্ছল ছিল না। অধিকন্তু তাঁরা সঙ্গদোষে আরও বিপ্ড়ে উঠলেন। যেমন মিষ্টির গন্ধে ময়রার দোকানে মাছির আমদানী হয়, তেমনি শাজাদাদের কাছে বদমাশ মোসাহেবের আমদানী হোতে লাগল। বত বেটা মায়ে-তাড়ান, বাপে-খেদান, হতভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়া, খোসামুদে পিপড়ের সারের ভায় পিল পিল কোরে যুটে গেল। তাদের কর্মের মধ্যে রাজকুমারেরা হাই তুলে ভুড়ি দেয়, হাঁচলে ‘জীব’ বলে, আর দেদার ইয়ার্কী করে। কত বেটা রুকচুলো, শুকনো-পেটা, তলা-খাঁকতির কপাল ফিরে গেল, রাজ-কুমারদের বেহুদো খরচের হেঁপায় রাতারাতি আশ্তিল হয়ে উঠল। রাজপুত্রেরা বে-আড়া ধমধাম, বে-আড়া ইয়ার্কী, বে-আড়া আমোদ কোত্তে আরম্ভ কোলেন, আমোদের যেন ফোয়ারা খুলে দিলেন। দিনরাত নৃত্যগীত, হাসিখুসি একাদিক্রমে চলতে লাগল। পাখো-য়াজের চাটি, আতরগোলাপের ছড়াছড়ি, কালিয়াপোলাওয়ার ফেলাফেলি হোতে লাগল। ঠাট্টা, তামাসা, নকল, ভাঁড়ামি, আমোদের ঠেলাঠেলি, ইয়ার্কীর জড়াছড়ি চকিবশ ঘটাই সমান। রাজকুমারদের বায়ের লেখাজোখা ছিল না, কিসে কি, কতকে কত খরচ হতো, তার খোঁজখবর রাখতেন না, রাখবারই বা গরজ কি? কিসের অভাব? চেয়ে পাঠালেই টাঁকা। বড় খরের ছেলেরা বে-আন্দাজ ইয়ার



হোলে তাঁদের কাছে ভদ্রস্বভাবের লোক প্রায়  
 বেশে না। ইয়ারদের মধ্যে অনেকেই জুয়া-  
 চোরের বাদশা ছিল, বাদশাজাদাদের এলো-  
 মেলা স্বভাব পেয়ে তারা যেন মাহেজ্জফ  
 পেলেন; বেধড়ক লুটতে আরম্ভ কোলেন। ও  
 দরের লোকের অল্পে তৃষ্ণা মেটে না, হিন্দুর  
 ভট্টাচার্যব্রাহ্মণদের গ্রায় দিবারাত্রি কেবল খাই  
 খাই, লই লই শব্দ মুখে লেগেই আছে। ইয়া-  
 রেরা এই মনে কোলেন, রাজকুমারদের কখন  
 চিরদিন একভাবে থাকবে না, এর পর তাঁরা  
 সেখানে হবেন, তখন দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি!  
 হয় ত কোন দিন লাভের জাহাজ ধুপুস কোরে  
 ডুবে যাবে, এত এব এই বেলা নে খোর সময়,  
 এমন দিন আর হবে না। পরের স্বন্ধে ভোগ  
 করাই তাদের স্বভাব। যারা পরের গলায় ছুরি  
 দিয়ে আপনার আপনার পেট ভোন্তে চায়,  
 রাজকুমারদের কাছে তাদেরই চৌচাপটে জিত।  
 কিসে একটা ধুমধাম বেধে দশ টাকা হবে,  
 ইয়ারেরা কেবল সেই পন্থায় ফিল্ডো, তা হোলে  
 তারা কৰ্ত্তব্য ফলিয়ে বিলক্ষণ দশ টাকার মুখ  
 দেখতে পাবে। ঐ সকল ইয়ারের স্বভাব আর  
 পাতী মোক্তার—পাতী উকীলের স্বভাব ঠিক  
 এক সমান, একেবারে নিজের ভৌল বলিলেই  
 হয়। মোসাহেব ভট্টাচার্যব্রাহ্মণদের গ্রায় তারা  
 কেবল দাঁড় খোঁজে, আর পশ্চাৎ দেখে বেড়ায়।  
 কখন বা একটা আকাশফোঁড়া কি একটা  
 আফিয়া তুলতাম বাধিয়ে দিয়ে, যেমন না  
 চিল পড়ে, সেইরূপ ছোঁ মেরে মেরে আপনা-  
 দের পেট মোটা কোন্তো; কি কোরে কি  
 কোরবে, কার মাথা থাকে, দিবারাত্রি সেই  
 চিন্তা। এর মুখ তার ঘাড়ে, তার মুখ ওর  
 ঘাড়ে, এইরূপ গোলমাল কোরে উপর চাল  
 চলে মংলব হাসিল কোরে লইত। অতের  
 সঙ্গে ত কথাই নাই, সে সকল শোক পতনে  
 পেলেন আপনার গুরুকেও রেয়াত করে না।  
 তারা যেন বর্ণচোরা আঁব, তাদের হাড়ে ভেলুক  
 খেলে। রাজপুত্রেরা যাতে ফুলে উঠেন,  
 তাঁদের মন যাতে বেশ ভিজে যেতো, মংলব-বাজ  
 ইয়ারেরা সেইরূপ ঝাড়-বুটো কেটে মুনসী;  
 আনা খরচ কোরে খোসামোদের কথাবার্তা

কইত। ভট্টাচার্যমোসাহেবদের গ্রায় তারাও  
 খোসামোদের তাক-বাক বেশ বৃদ্ধিত।  
 আপনাদের কাজ হাত কবুবার নিমিত্ত  
 এমনি লগ্ন-মত কথা কইত যে, রাজকুমার-  
 দের মনে চৌচাপটে লেগে যেত। কখন  
 পানসে চোক কোরে মায়াকান্না কাঁদিত;  
 কখন বলিত, “হজুর, আপনি রাজার বেটা  
 রাজা, এ সব কর্ম না কোলেন আপনাদের শোভা  
 পায় না, লোকের কাছে মুখ থাকে না।” মাম-  
 সম্ম কি বানের জলে ভেসে যাবে? সামান্য  
 লোকেও দশটাকা গেরেস্তার হয়ে লোকের মুখ  
 থেকে উদ্ধার হয়। আপনি ত মহারাজ-চক্র-  
 বর্তী, আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।  
 আপনি সুমেরু-পর্বত, আপনার চিন্তা কি?  
 আপাততঃ যদি খরচপত্র হাতে না থাকে, নাই  
 নাই, রাজারাজড়াদের ঘরে কবে কোথায়  
 নগদা কারবার হয়ে থাকে? সরকারে এক  
 দিছে আর নিচ্ছে, এইরূপ চাল-সুমায়েই চোলে  
 যায়। কত বাড়ীতে দেখেছি, খুচরা খুচরা মহা-  
 জনেরা চাইবামাত্র জিনিস দেয়, কিন্তু শেষে  
 টাকার জন্তে হেঁটে হেঁটে তাদের পায়ের বাঁধন  
 ছিঁড়ে যায়, দোকানপাট বন্ধ হয়, মাগছেলে  
 শুকিয়ে মরে, বৎসর ধোরে ছই বেলা আনা-  
 গোন্য করে, তবু সকল টাকা ধেরে পায় না,  
 আবার জিনিস চাইলেই জিনিস দিচ্ছে।—  
 কখন বলে, ‘হজুর! আপনার কতই বয়স্ক্রম  
 হবে, এ বয়সে কি শিশুপরামর্শিকের মত হওয়া  
 ভাল দেখায়? যার কিছু নাই, সে ব্যক্তিও এ  
 বয়সে দশটাকা খরচপত্র কোরে থাকে, নিদেন  
 ধার কোরেও করে। আমরা যে এত পরাব,  
 আজ খাই এমন যোত্র নেই, আমরাও এককালে  
 বাধ্যদে অনেক টাকা উড়িয়ে দিছি। আপনা-  
 দের এখন নবীন বয়স, ফিট্‌কার্টের উপর  
 থেকে ফুল্লারবিন্দ হয়ে বেড়াবেন, আমোদ  
 আহ্লাদ কোরবেন, এখন কি বিবয়কর্ম দেখ-  
 বার সময়?’ ইয়ারদের যখন পরসার দরকার  
 হতো, এমনি ফেরেকারে খোসামোদের কথা  
 বলিত, কেউ ধোন্তে ছুঁতে পাত্তো না, তাদের  
 কথাগুলি আসুমান উড়ে বেড়াত, জমী ছোঁয়  
 ছোঁয় কোরে ছুঁত না!—বলিত, ‘হজুর!



আপনি ক্ষণ-জন্মা পুরুষ! বুদ্ধিব্যবচনা দিক-পালের মত, সিংহের সন্তান, না হবেই বা কেন? ইয়ারদের মধ্যে প্রায় তাবতেই নিরেট মূর্থ, কারো পেটে কালীর অঙ্কর ছিল না। কিন্তু তারা যুগে বেশ শক্ত, মাংসায় খুব টুকো, আপনাদের কাজ ভোলে না, তারা কেবল দম্বাজি, ধড়িবাঁজি করে বড় মাহুষদের ছেলে ভুলিয়ে খায়।—বলে, ‘হজুর! এই কথটি কোন্নে আপনাব নাম টিচি বেঞ্জে উঠবে। তবে দশটাকা বায়, তাতে আপনাব ভাবনা কি? আপনি পরেরের আডালে আছেন, আপনাব অচলা লক্ষ্মী, অক্ষয় ভাণ্ডার, তার কখনই ক্ষয় নেই, আপনি কত খরচ কোরবেন করুন না, তবে ঝগাট বড়, তা কি কোরবেন, আপনি কেবল বোসে যুগে হুকুমজারি কোরবেন, দেখা শোনা, কি করা কর্ম্মার ভার আমাদেব উপর!’ রাজকুমারেরা যদি কখনো বোলতেন, ‘মিয়া দিবা দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার জল বড় ভারি!’—মোসাহেবেরা অমনি বোলতেন, ‘হজুর! সে জল এত ভারি যে, তার এক ঘটি টেনে তোলা ভার। হজুর যে দিবা দিয়েছেন, তার জল এত হালকা যে, কুঁ দিলে উড়ে যায়।’ ইয়ারেরা এই প্রকারে রাজপুত্রদের নাচিয়ে দিয়ে আপনারা দুহাত দিয়ে লুটিত! তারা দিবারাত্র কেবল ঐ ফিকিরে থাকত, ঐ মংলবে ফিতো। যুবরাজ যদি কখন হাতে কোরে কাকে কিছু দিতে চাইতেন, মংলববাজ ইয়ারেরা অমনি বোলে উঠতেন, ‘আপনাদের বড় চক্ষুলজ্জা, কারো কাছে যুগ যুগুতে পায়ের না, যখন যারে ‘দতে হবে, আমাদের হুকুম কোরবেন, আমরা লোক বিবেচনায় কারে কারে টেলেও দিতে পারবো। যে এসে ধোরবে, তাকেই যে কিছু দিতে হবে, এই বোলে কেউ খত লিখে দেয় নি; দান করা ভাল বটে, কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা কোন্নে হবে!’ মংলববাজ লোকেরা যখন এসে ঢোকে, তারা এমনি কোণলে কথা-বার্তা কয়, শুনে বোধ হয় যেন তারা কোন স্পৃহা রাখে না, কিন্তু তাদের আসল মংলব ষ্টেপায়ন হুদে ডোবান থাকে, সময় বুকে উঠে।

“রাজকুমারেরা ক্রমে আরও বড় হোলেন, যৌবন-সীমা ছাড়িয়ে উঠলেন। যুবাকালের ধুমধাম ও আমোদ আহ্লাদ কুরিয়ে গেল। এখন তাঁদের মনের অবস্থা স্বতন্ত্র। বালক-কালের মত বালকবৃন্দের সঙ্গে না ছুটাছুটি করেন; না সমবয়সীর সঙ্গে হাত ধরাধরি, গলা জড়াজড়ি কোরে বেড়ান; না তাঁদের এখন তরুণ বয়সের তরল আমোদে রুচি আছে। তাঁদের আর সে কাল নাই, মনের ধাঁচা ফিরে গেছে। এখন আর এক প্রকার বুদ্ধি, আর এক প্রকার মেজাজ, আর এক প্রকার স্বভাব হয়ে দাড়িয়েছে। মজলিস, যুগয়া, শীকার ইত্যাদি আমোদ প্রমোদে রাজকুমারেরা মত্ত হোলেন। তাঁহাদের বিবাহ আদি পরিণয়-সংস্কারও ক্রমে নিব্বাহ হলো। মহারাজ শাজাহান শাহজাদাদের সম্মানের নিমিত্ত এক এক পুত্রের নিকট এত ফৌজ নিযুক্ত কোরে দিলেন, চাই কি তাদের এক এক কাফেলা লয়ে এক একটা লড়াই ফতে করা যায়। এ কার্যটি বাদশাহ আমার অপরাধমর্শে করেন, আমি বিস্তর নিষেধ কোরেছিলাম, কিন্তু শ্রীমান্ আমার সে কথা গ্রাহ্য কোলেন না! পূর্বাপেক্ষা রাজপুত্রেরা আরও অজ্ঞচ্ছল ব্যয় কোন্নে লাগলেন, কি খরচ করেন, তার হিসাব নাই; কেবল ওড়সাই কোরে খাজানাখানা তখনচ কোরে দিলেন। টাকার উপর টাকা পাচ্ছেন, কিন্তু যত দাও, ততই নেই, খরচ দিয়ে আর কুলিয়ে উঠা যায় না; এই দাও, এই নেই! তারা যেন তপ্তখোলা চোড়িয়ে বোসে আছেন; তাতে যত পড়ে, ততই শুকিয়ে যায়। রাজপুত্রেরা এইরূপে ক্রমিক আত্মপক্ষা পেয়ে, এখন তাঁদের বুক বেড়ে গেছে, মস্ত খাঁই হয়েছে। আপাততঃ তাতে যে ফল দাড়িয়েছে, তা তুমি জানুতেই পাচ্ছে। এখন তাঁদের সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য, তার কমে তাঁদের আশা নিব্বত্তি হয় না।

অনেক বোলে বোলে, বিস্তর বুদ্ধিয়ে, বিস্তর কষ্ট কোরে মোগলরাজের চোক-কান ফুটিয়ে দিয়েছি। এক্ষণে তাঁর চৈতন্য জন্মেছে, তিনি এখন রাজপুত্রদের ছুরুভিলাষ পরিকার চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। তাগরূপ অগ্রিকণা এক

বার যখন বাদশাহের দয় স্পর্শ কোরে তাতে অনল জ্বলে দিয়েছে, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। এক্ষণে রাজকুমারেরা যা কিছু করেন, তাতেই শ্রীমানের মনে দারুণ সংশয় জন্মে। তাঁদের চালচলনের উপর সর্বদা দৃষ্টি রেখে চলেন। রাজপুত্রেরা যে কর্মই করুন, বাদশাহের মনে ভয় হয়; ভাবেন, হয় ত তাঁরা কি একটা চক্রান্ত কোরেছেন। মহারাজ যখন আমার মুখে শুনলেন, মুক্তার খাঁ রাজকুমার মুরাদবাকীকে ২০০০ হাজার নাগরিক সৈন্য প্রদান কোরেছে, শুনে সেই হতভাগাকে একেবারে প্রাণে মেরেই ফেলেন। তিনি যে একটা প্রমাদ উপস্থিত কোরবেন, আমি তা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেম। তোমাকে তার পদটি দেবেন বোলেই তাকে জন্মের মত সাংলেন। অতএব তুমি ভেবে দেখ, এখনও বাকী আমাদের হাতে আছে, চাই কি, মাত কোলে কোতে পারব। বাদশাহ আমাদের স্বাপক্ষ, ফৌজেরাও সহায়তা করবে; তত্ত্বিন্ন বাকী যা থাকবে, গোয়ালীরের কারাবাসে পোস্তের সববতের \* দ্বারা তাহা সম্পন্ন হবে।”

‘হা ভগবান্! তবে কি মহারাজ তাঁর পুত্রদের কারাবাসে পাঠাবেন মনন কোরেছেন?’ এই কথা আমি সভয়ে উচ্চস্বরে বলিলাম।

“না বাবা! সে মনন বাদশাহ করেন নি, আমিই কোরেছি।” পিতা এই উত্তর করিলেন।

শুনে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল, বেজায় ভয় হলো, এত ভয় হলো যে, বাবার পানে তাকিয়ে থরথর কোরে কাঁপতে লাগলেন। কিন্তু বাবার মন তাতে নরম হলো না, তিনি যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন, দম্বলেন।

\* আক্ষিপের ঢেঁড়ীর নাম পোস্ত। ঐ পোস্ত বেঁটে কোরে জলে ভিজিয়ে রাখলে তাতে যে কাথ বেরায়, তার নাম “পোস্তোর সরবৎ।” এক এক পেয়লা ঐ সরবৎ কারাবাসীদেরকে নিত্য প্রাতে পান কোতে দেওয়া হইত। তারা যতক্ষণ তা পান না করিত, ততক্ষণ কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী পাইত না। ঐ সরবৎ পান কারাবাসীদের শরীর ক্রমে শুষ্ক ক্ষীণ হইত, বল-বুদ্ধিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়ে পড়িত, অবশেষে হতবুদ্ধি ও হতশক্তি হয়ে কিছুকাল জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া গড়ত পাইত।

না। শেষে আমি বোল্লেম, “বাবা! তবে আরঙ্গজেবকে ধোন্তে মানা কোচেন কেন? তার তাৎপর্য কি?”

বাবা উত্তর কোল্লেম, “আমি তার হাতের মধ্যে আছি, সে আমার অপরাধ সপ্রমাণ কোতে পারে।”

আবার আমি শিউরে উঠে, ভয়ে বাবার দিকে শূন্যদৃষ্টি চেয়ে থেকে, বোল্লেম, যদি তাই হয়, তবে আরঙ্গজেবকে আগে কয়েদ না করেন কেন?”

বাবা বলিলেন, “সে এত পৃষ্ঠ, এত শঠ, আমার সম্বন্ধে সে এত বিষয় অবগত আছে যে, কয়েদ থেকেও সে আমার অপরাধ সাব্যস্ত কোতে পারে, সে ক্ষমতা তার বেশ আছে।” সে যে সকল প্রমান-পত্র হস্তগত কোরে রেখেছে, তা দর্শালেই আমার প্রাণদণ্ড হবে। তবে তাকে কয়েদ করা না করা উভয়ই সমান। পাকচক্র কোরে যদি তাকে প্রাণে নষ্টও করি, তথাচ আমার পরিগ্রাণ নাই। অনেকে আরঙ্গজেবের স্বাপক্ষ; তারা তাঁর পরম বন্ধু, তাঁর ক্রোধে তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত পণ। আমি যদি ফিকির কোরে আরঙ্গজেবের প্রাণ নাশ করি, সেই সকল স্বাপক্ষ লোকের কাছে আমার পাপকর্ম ছাপা থাকবে না, তারা তা সন্ধানে সন্ধানে জানতে পারবেই পারবে, তখন তারা আমাকে অল্পে ভাড়বে না; আমার ছুর্নাম কোরে কোরে বেড়াবে। শুধু তাতেও কোন ক্ষান্ত থাকবে? আমার পূর্বকৃত অপরাধ সপ্রমাণ করবার চেষ্টা কোরবে; চেষ্টা কেন, তারা তা প্রমাণ কোরেও দেবে। তখন আমার কি দশা হবে! তখন আপনার যুহা আপনি ডেকে আন্ব! অতএব তা না কোরে, যদি আরঙ্গজেবের সঙ্গে বোগ দিগে প্রাণপণে তাঁর স্বাপক্ষতা করি, তবে আর প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকবে না, সে ছুর্ত সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইব। তার পর তিনি যখন তক্তে বসবেন, তখন কত মান, কত সম্মান, কত পুরস্কার আশাদের জগে ধরা থাকবে। এই সকল বিবেচনায় আরঙ্গজেবের অতুগত হওয়া আমার মনোগত অভিপ্রায়। কিছু দিন পরে তিনি যখন মনে মনে নিশ্চিন্ত হবেন আর

আমাদের কোন শঙ্কা নাই, আমি এখন নিষ্কটক হয়েছি, সেই সময়ে, সেই অসাধারণ সময়ে, যে কাল করাল বাহ একবার সাংঘাতিক প্রহার কোড়ে সঙ্কুচিত হয় নি, তিনি যে সেই ভীম বাহুর ঘোর আঘাতে বিদলিত হবেন না, সে কথা এখন কে বলতে পারে?”

এই সময়ে বাবা আমার হাত দুটি ধরে চেপে ঠেসে রাখিলেন। তিনি যখন ঐ কথাগুলি বলেন, তখন মনে মনে মহা সন্তুষ্ট, মহা প্রফুল্লিত হোচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর নয়নে সেই অন্তর-আনন্দের ঐশ্বর্য তরঙ্গ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছিল। বলতে কি, কি কোশলে আপাততঃ তাঁর নিস্তার লাভ হবে, শেষেই বা কি ফিকিরে তর্জিন বিস্তার রাজ্য হস্তগত করবেন, বাবার মুখে সেই সকল কল্পনা, সেই সকল নক্সার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হলো। আমি তাঁর মুখের উপর স্পষ্ট বল্লাম, “বাবা! বাতে আপনার প্রাণরক্ষা হয়, তার চেষ্ঠা করিব, কিন্তু রাজ্য-সম্পদের সম্বন্ধে আমি আপনার সহকারী হতে পারিব না, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।”

বাবা বলিলেন, “আচ্ছা, সে বিষয় তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তাই করো, কিন্তু আমি এই চাই, কদাচ তুমি আরঙ্গজেবের গায়ে হাত দিও না, তার গায় হাত দিয়েচো কি, অমনি আমার দফা নিকেশ করেচো; তখন আর আমার নিস্তার থাকবে না, অমনি সিল-মোহর পোড়ে আমার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হয়ে যাবে; অতএব তুমি চেষ্ঠা পেয়ে সে বিষয়ে কাস্ত থেকো।”

এখন কারো মুখে কথা নাই, আমরা পিতা পুত্র উভয়ই নীরব হলেম। তার পর ভাব্লাম, পিতা জাহ্নন বা না জাহ্নন, আমাকে একবার শোনাতেই হবে, যা থাকে অদৃষ্টে বলি ত, এই ভেবে বল্লাম, “বাবা! বাদশাহ প্রথমতঃ সকল রাজপুত্রকেই ধৃত কোর্তে অহুমতি করেন, শেষে আবার বিবেচনা করে আমাকে ডেকে বলেন, ‘সাদক! তুমি মুরাদবাকীকে ধরো না, তার উপর যেন কোন উৎপাত না হয়, তাকে তুমি ছেড়ে দিও।’

পিতা ঐ কথা শুনে মুখ বিকট-বিকট করে

শুন্মুখে উঠে বলেন, “বাদশাহ ত একটা আন্ত উন্মাদ, তাঁর কোন জ্ঞান নাই! তিনি মনে করেছেন, মুরাদ সতরঞ্চ খেলাতেই বাস্ত, সেই আমোদেই উন্মত্ত, তার আর রাজ্যাভ্যর্থের প্রতি দৃষ্টি নাই, সে যেন তা স্বপ্নেও কখন মনে কোরে থাকে না, সতরঞ্চ খেলা ছেড়ে তার যেন আর উচ্চ খেলায় নজর নাই, বাদশাহের মনে সেই সাহস আছে, সেটি যে তাঁর ভ্রান্তি, তা তিনি বুঝছেন না। না না, সাদক! তা হবে না! ও কোন কাজের কথাই নয়, সে খেলোয়াড়কেও ফাঁদে ফেলতে হবে, তাকে অবশ্যই আমাদের কোশল-জালে জড়াতে হবে।”

আমি বলিলাম, “বাবা! আপনিই ত বাদশাহকে পরামর্শ দিয়ে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অনর্থপাত উপস্থিত করেছেন। এখন উপায় কি? কি কোশল কোরে বাদশাহের হুকুম বজায় রাখি? আপনার বিবেচনায় যা সদযুক্তি হয়, আমাকে তাই অহুমতি করুন।”

পিতা বলিলেন, “তুমি বেশ জেনো, সে গুরুতর বিষয়টি আমার মন থেকে অপস্থত হয়নি, সেটি আমি উল্লাস করি নাই। যা কন্তে হবে আমি তা আগে ভেবে চিন্তে ঠিক কোরে রেখেছি। তুমি যে আগে রাজপুত্রদিগের বাড়ী একে একে সমুদয় ভোপে উড়িয়ে দিয়ে, শেষে বোল্বে, তোমরা এখন ধরা দাও, সে কোশল কোন কাজের নয়, তুমি যে তা পেয়ে উঠ, আমার বিশ্বাস হয় না। তারা চার ব্যক্তি যুটে এককাটা হয়ে, আমাদের অপমান কোরে, ঘেরে, তাড়িয়ে দূর কোরে দেবে। লড়াই কোরে তাদের এঁটে উঠতে পারব না। তার চেয়ে আমি যে ফিকির ঠাউরেছি, সেইরূপ কাজে কাজ গোছাতে পার। তাতে কার্যসিদ্ধি হবে। বাদশাহ অতি দুরার সাধের যুগ্মা-কৌতুকের দিনাবধারিত কোরবেন। সেই উপলক্ষে রাজকুমারদিগকে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠান হবে, সে সময় মহারাজও সেখানে উপস্থিত থাকবেন -”

আমি বলিলাম, “মহারাজও সেখানে উপস্থিত থাকবেন?”

পিতা বলিলেন, “হাঁ! থাকবেন বৈ কি। রত্নভূমিতে বাদশাহের আগমন হোলে দৈন্ত

## উজীর পুত্র

সংগ্রহের দিকি একটি প্রয়োজন দেখান যাবে। আমরা বলবো, সম্রাটের সম্মানের নিমিত্ত যেখানে যত ফৌজ আছে, সব এক জায়গায় জড় করা হয়েছে। তবে আর রাজকুমারদের মনে কোন সন্দেহ জন্মিতে পারবে না। রাজকুমারেয়া যুগয়া-কৌতুকে মত্ত হবেন; তাঁরা হয় নীকার তাড়াতাড়ি কোরে বেড়াবেন, নয় তাদের মারবার বা ধরবার জন্তে পেছনে পেছনে দৌড়বেন। তুমি ঐ অবসরে তোমার সৈন্যদের দলে দলে বিভাগ কোরে, একটি একটি দল লয়ে একটি একটি রাজপুত্রকে ধৃত করবে। মহারাজের হেপাজতের নিমিত্তে শরীররক্ষকেরা তাঁকে বেড়ে ঘের-ঘেরাও কোরে রাখবে।”

আমি বলিলাম, “এ নক্সা মন্দ নয়, ভাল হয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে একটি কথা আছে, রাজকুমারদের মনে এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তাঁদের নিয়ে একটা কোন প্রমাদ উপস্থিত হবে; তাঁদের মনে যখন এরূপ সংশয় দাঁড়িয়েছে, তবে কি তাঁরা যুগয়া-কৌতুকে দর্শন দেখেন? তারা কি আমোদে হুল হঠাৎ আপনাদের মৃত্যু-কাঁদে ধরা দেবেন?”

বাবা বলিলেন, “সে আমাদের অদৃষ্ট, একবার দেখাই যাক না কেন। হবে না বোলে দাদায় গুন ঢেলে দিলে কি হবে? সুলতান ইজা না আসলে, না আসতে পারেন। হয় তিনি তখন মধুপানে চুরচুর হয়ে আপনার পাড়ীতেই থাকবেন। তা যদি হয়, তবে আর তনি হাতের মাথায় কারো বল বা সাহায্য পাবেন না, তখন তাঁকে চারিদিক বেড়ে কোটো ঘেরা কোরে ধরবার বাধা কি হবে?”

আমি বলিলাম, “বাবা! আরজজেবকে দ্বার কোলে রাজ-আজ্ঞা অমান্য করা হবে, এর কি ঠাউরেছেন? সে বিষয় আপনাকে নিয়ে রাখা আবশ্যিক।”

পিতা বলিলেন, “তোমাকেও এ কথা জানিয়ে রাখা আবশ্যিক, আরজজেবকে ধোরেছ কি মনি আমার মৃত্যু ডেকে এনেছ। যে মুহুর্তে তাঁকে ধরবে, সেই দণ্ডেই আমার মৃত্যু অবশ্যিক। আরজজের ধরা পড়লে নিঃশঙ্ক

গুনে বোধ হয়, বাদশাহ তোমার উপর রাগত হবেন; আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলবো, আমি তাঁকে শাস্ত কোরবো; সে ভার আমার উপর, তার জন্তে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তখন বোলব, এটি তার অপরাধ নয়; শুদ্ধ মনের ভ্রম! তার তখন মনে ছিল না যে, আরজজেবকে ধোতে হবে। মুরাদবাবীকে রক্ষা কোন্তে গিয়ে তার ত আর অণু দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই গোলমালে আরজজেবকে ধোন্তে বিশ্বস্ত হয়ে গেছে। অমন হলুতল বাপারে ওরূপ চুক-ভুল হয়েছে থাকে, সকলেরই হয়। তুমি বিপদে পোড়লে তোমার হয়ে আমি লোড়বো, কিন্তু আমার বিপদ হোলে কে আছে, যে আমার হয়ে লোড়বে? তখন কে আমাকে রক্ষা কোরবে? তুমি ত আর আমার হয়ে আরজজেবকে বোকাতে পারবে না, তোমার কথা সে গ্রাহ্য কোরবে কেন? কই? কে আমার সুহৃদ আছে? না, কেউ নাই। আমার পুত্র হতে যে প্রাণ রক্ষা হতে পারে, সেই প্রাণটি তখন আরজজেবের হস্তে আমাকে সমর্পণ কোন্তে হবে? চাই তিনি মারুন, চাই তিনি রাখুন। তখন শুদ্ধ তাঁর অগ্রহের উপর নির্ভর কোন্তে হবে। আমি ত আর তোমার শত্রু নই যে, আমাকে বৈরি-হস্তে নিষ্ক্ষেপ কোরে তুমি সুখী হবে কি নিশ্চিত থাকবে? আমি তোমায় সকল কথা খুলে বোল্লেম, এখন তোমার বিবেচনা তোমার কাছে।”

আমি কাঁপরে পোড়ে আমতা আমতা কোন্তে লাগ্লেম, ও কথার আর জবাব কোন্তে পাগ্লেম না। শাবনায় মহাপ্রাণী কেঁপে গেল, চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগ্লেম। মহারাজের হুকুম, বেগমের চোকরাদানী, পিতার প্রাণের দায়, এইগুলি একটির পর একটি এইরূপ পর পর আমার মনোমধ্যে মুহুর্তে উদয়-অস্ত হতে লাগ্লে। এখন করি কি? কোন্ দিক সামলাই, কার মন রাখি? সর্কাজে ষষ্ঠ দিই কোথায়? এক কুল গড়িতে গেলে আর এক কুল ভেঙ্গে যায়! কতই ভাবতে লাগ্লেম। কি কোরে কি কোরব, কিছুই কিনারা কোন্তে পাগ্লেম না! ভাবতে ভাবতে একটি সুদীর্ঘ গভীর

নিখাস পরিত্যাগ কোল্লেম! আমার দূরদর্শী চতুর পিতাকে সেটি ছাপাতে পাল্লেম না, তিনি তা লক্ষ্য কোল্লেন।

বাবা বলিলেন, “সাদক! তোমায় বড় ভাবনায়ুক্ত দেখছি, এ সামান্য ভাবনা নয়। মহারাজের অসন্তোষ কি পিতার প্রাণ রক্ষা—এ সে ভাবনা নয়, তার অপেক্ষা একটা গুরুতর, দুর্ভাবনা তোমার অন্তঃকরণে চেপে বোসেছে। আমি ত কোন বিষয় তোমার নিকট গোপন রাখিনি, তবে কেন তোমার মনের কথা আমার খুলে বোল্‌চো না? কেন তোমার অন্তঃকরণে ক্লেভ হচ্চে, বল! তুমি কি দারার সহায়তা কোরবে কথা দিয়েছ? না, অপর কোন রাজ-কুমারকে রক্ষা কোরবে প্রতিশ্রুত হয়েছ? আমার সব কথা ভেঙ্গে বল তা হোলে যেক্রপ যা কোল্লেন ভাল হয়, আমি তোমাকে সে পথ দেখিয়ে দেব।”

“আমি যে কোন রাজপুত্রকে বাঁচাব, এমন প্রতিজ্ঞা কারো কাছে করিনি। তবে মুরাদের কথা স্বতন্ত্র, সে রাজ-আজ্ঞা, আমাকে তা পালন কোত্তেই হবে। আমার নিত্যস্তু‘অভিলাষ যে, মোগলরাজের অগ্রগত, তাঁর বাধ্য হয়ে থাকি, তাতে আমার মনে বড় আনন্দ জন্মে। কিন্তু কি করি, অগ্রগতার বাধ্যবাধকতা—”

আমার কথা না ফুরাতেই বাবা অমনি বোলে উঠলেন, “সে বাধ্যবাধকতা কি, আমি তা শুনতে চাই।”

আমি বোল্লেম, “পিতার প্রাণ রক্ষা!”

বাবা বলিলেন, “সে কথা ভাল। আচ্ছা, ঐ একটা অহরোধ, আর কোথায় কত অহরোধ আছে, বল।” আমি শুনে চুপ কোরে রইলেম। পিতা বোল্‌তে লাগলেন “সাদক! আমাকে যে কীকি দিয়ে বুঝিয়ে যাবে, তা তুমি পারবে না, সে তোমার রূপা চেষ্টা। এর মধ্যে কোন বিশেষ নিগূঢ় কথা আছেই আছে; সে কি, কি বৃত্তান্ত, আপাততঃ, আমি তা বোল্‌তে পাচ্চিনে বটে, কিন্তু সাদক! তুমি নিশ্চিত জেনো, সে কথা আমার কাছে ছাপা থাকবে না, কোন দিন না কোন দিন আমি তা জানতে

পারবই পারব। তোমার চুপ কোরে থাকার কোন ফল নেই।”

তামি বলিলাম, “বাবা! আজ আমার ছেদে দিন, আজ রাতটুকু আমাকে ক্ষমা করুন আমি বিবেচনা কোরে দেখি; কাল আপনি সকল কথা শুনতে পাবেন।”

বাবা বলিলেন, “আচ্ছা, সেই কথাই ভাল কিন্তু যে পরামর্শ স্থির হয়ে আছে, সেই ব্যাপারটি যখন উপস্থিত হবে—তার আর বিলম্বও বড় নাই—সেই সময় কায়মনোবাক্যে সহায়তা করবার পক্ষে তোমার যে বাধাই থাকে আমার সঙ্গে তোমার কথা হোলে—আমার পরামর্শ শুনলে, তোমার কোন বাধাই থাকবে না, সব বাধাই কেটে যাবে। তবু তুমি যে ভ্রান্তিতে পড়েছ, সে ভ্রান্তিও থাকবে না, তারও প্রতীকার হবে। কাল রাত্রি দুই প্রহর দুটোর সময় এই স্থানে আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা করো। দেখো, যেন এ কথার অন্তর্থা না হয় তবে এখন তুমি বিদায় হও, রাত অনেক হয়েছে, বাড়ী যাও।”

পিতার নিকট বিদায় লয়ে, বড় বিষম, ব্যস্তান হয়ে রাজবাটীর দিকে চলেছি; কতই ভাবছি, মনে যেন একটা ভাবনার বোঝা চেপে পড়েছে, ভারে অন্তঃকরণ অতিশয় ভারাক্রান্ত। মনে মনে কোচ্ছি, ঘরে গিয়ে নিশ্চি হয়ে শোব, আর ভাবব না। ডাইনে বাঁয়ে সারি সারি ওমরাওদিগের অট্টালিকা, তার মধ্যে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গলী পথ, সেই পথ ধরে আমার মনে চলেছি, ভাবতে ভাবতে চলেছি। আমি তখন ভারি অগ্রমনহ। পিতার মুখে কথাগুলি শুনলেম, পথে যেতে যেতে সেই সকল কথা মনে মনে তোলাপাড়া কচ্ছিলেম। সম্মুখে একটা মস্ত গোলাকার খিলান দেখতে পেলেম তার নীচে দিয়ে যেমন চলে যাব, অমনি চাণি দিক্‌ থেকে একদল অস্ত্রধারী লোক এসে আমায় গ্রেপ্তার কল্লে। তারা ঐ খিলানের আড়ালে এদিকে, সেদিকে ছড়িয়ে ওৎ কোরে ছিল, এত শীঘ্র এসে আমাকে বেঁধে ফেল্লে, আর এর শক্ত কোরেও ধল্লে, আমি আর অবসরও পেলাম না, আমার আর ক্ষমতাও ছিল না যে, তলোয়ার

হার কোরে আপনাকে আপনি রক্ষা করি। বদ-  
মাসেরা একখানা কাপড় আমার মুখের উপর  
ঝুঁপে দিয়ে আমার চোক ঢেকে ফেলে,  
হাত দুখানিও বেশ কোরে রশী দিয়ে বাঁধলে,  
সেই রশী ধোরে আমাকে লোয়ে চোলো।  
প্রায় টেনে হিঁচড়েই লোয়ে চোলো। কতক  
দূর এসে তারা বলে, “এই সিঁড়ি,—এই  
সিঁড়ি দিয়ে উঠ।” আমি তাই কোলেব, সিঁড়ি  
বেয়ে উঠলেম। তার পর আর একটা সিঁড়ির  
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাপ বেয়ে নীচে নেমে  
একটা জলা, সঁাতসঁাত্তে গলীতে এলেম।  
তার একটু পরেই আমার চকের আচ্ছাদন  
খুলে দিলে। চেয়ে দেখি, দিকি একটি খিলা-  
নের ঘর, চারিদিকে আলো জ্বলচে, প্রায় ২০  
জন লোক সেই ঘর জুড়ে চক্র কোরে বোসে  
আছে, সকলেরি মুখে নতুন রকমের একটি  
একটি মুখস, তাতেই তাদের চোক মুখ ঢাকা  
রয়েচে। ফি-মুখস পরা গুণ্ডার সম্মুখে এক  
একখানা ছোরা ঝকঝক কোচ্ছিল, আর এক  
একখানি লেঙ্গা তলোয়ার ঘরা রয়েছে। তারা  
আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি কোচ্ছিল, আমি  
তার এক বর্ণও বুঝতে পারেন না ; গলার  
আওয়াজেই শোনা গেল না, তা কথা বুঝব  
কি ? বোঝবার যোই ছিল না, তারা মুখ চেপে  
চেপে কথা কোচ্ছিল, শেষে তাদের মধ্যে  
এক ব্যক্তি বোধ হয়, সে ঐ দলের সর্দার হবে,  
সকলকে চুপ কোত্তে বোলে, আমাকে সম্বোধন  
কোরে বোলে “সাদক ! তুমি আমাদের কাছে  
অপরিচিত নও, আমরা তোমাকে বেশ চিনি।  
তুমি একটি ভীম বিক্রান্ত ভয়ানক দুঃসাহসী  
ব্যক্তি, তোমাকে আমরা হস্তগত কোরে আপ-  
নাদের একতিয়ারের মধ্যে এনেছি সত্য, এখন  
তুমি আমাদের অধীন, কিন্তু অধীন হয়েও তুমি  
যে রূপ অসম সাহস, অসম তেজোমূর্তি দেখাচ্ছো,  
আমরা যদি পূর্বে তোমাকে নাই জানতাম,  
তখাচ তোমার ঐ বীরপ্রভাব দেখে আমাদের  
বেশ বিশ্বাস হতো যে, তুমি হঠাৎ ভয় পাবার  
লোক নও, তোমার প্রাণের মায়া নাই, তোমার  
অন্তঃকরণ দোমে যাবার নয়। তোমাদু  
কোন অনিষ্ট কোরবে, আমাদের সে মানস

নয়, আমরা তোমাকে নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌছিয়ে  
দিয়া আসিব। যে ক্ষত্রে তোমাকে এখানে  
এনেছি, তা বোলুচি, মনোযোগ কোরে শোন।  
বাদশাহের গোপনীয় কথা তুমি যে প্রাণান্তেও  
মুখের বাহির কোরবে না, আমরা তা নিশ্চয়ই  
জানি। আমরা তাতে দুঃখিতও নই, বরং  
তোমার রাজভক্তির নিমিত্ত আমরা তোমার  
বিস্তার গৌরব, বিস্তার প্রশংসাই কোরে থাকি।  
যে বিষয় প্রকাশ কোত্তে নাই, নিবেশ আছে,  
জোর-দবরদস্তি কোরে আমরা তোমার কাছে  
সে কথা শুনতে চাই না ; আমাদের সে মানস  
নাই। যে কয়েক ব্যক্তিকে এখানে উপস্থিত  
দেখতে পাচ্ছো, এরা সকলেই স্থলতান সুলতার  
অনুগত ও বাধ্য, আমরা সকলেই কায়মনো-  
রাকো রাজকুমারের মঙ্গল প্রার্থনা কোরে  
থাকি। আমরা শুনেছি, আর বোধ হয়, সে  
খবর মিথ্যাও না হবে, রাজপুত্রদিগকে হয়  
কয়েদ, নয় তাঁদের প্রাণবধ করবার নিমিত্ত  
নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার করা হয়েছে,  
কিরূপ কৌশল, তা আমরা অবগত নই। ভূমি  
নাকি আগরা সহর ও আগরা প্রদেশের সেনা-  
পতি, আমরা শুনলেম, সেই কুটিল নৃশংস অভি-  
সন্ধি সুসিদ্ধ করবার ভার তোমার উপর অর্পণ  
করা হয়েছে। মোগলরাজের এই দুর্কীসনার  
কথা শুনে আমরা যে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাই  
শুনার নিমিত্ত তোমাকে আমরা ধোরে  
এনেছি, আমরা ধর্মঘট কোরে একে একে তাব-  
তেই এই ঘোর সত্য প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি  
তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে স্থলতানসুলতার গাত্রস্পর্শ  
কোত্তে সাহসী হও, কি তোমার হুকুমে তোমার  
ফৌজেরা তাঁর অঙ্গস্পর্শ কত্তে সাহস করে,  
এই যে ছোরাগুলি সম্মুখে পোড়ে আছে দেখতে  
পাচ্ছো, এই অস্ত্রাশির মধ্যে হয় একখানি,  
নয় দুখানি, নয় সবকখানি তোমার শোণিত  
পান কোরে তোমার জীবনান্ত কোরবে। তুমি  
রাজপুরের মধ্যে বাস কর বোলে তোমার মনে  
যদি এ ভ্রান্তি হয়,—চারিদিক্ যে উচ্চ প্রাচীরে  
ঘেরা, কি সাধ্য তার মধ্যে আমরা তোমার কোন  
অনিষ্ট করি ; সেখানে আমাদের মাথা গলাবার  
ক্ষমতা নাই। ঐ গগনস্পর্শী প্রাচীরই তোমার

নির্বিঘ্নে রক্ষা করবে। অথবা তুমি যদি মনে মনে অভিমান কর, আমাদের কি ক্ষমতা আছে, আমরা তোমার কি কোত্তে পারি, তোমার যে মস্ত পদ, যে মস্ত আধিপত্য, তাতে কোরে তোমাকে আমরা পেয়ে উঠব না, তুমি আমাদের মংলব হাসিল কোত্তে দেবে না, আমাদের তাবৎ ফিকির, তাবৎ কৌশল বিফল হবে। ভক্তিম তুমি যদি এ বিবেচনাও কর, আমাদের মুখোত্র ভয় দেখান, চরমে কোন ফলদায়ক হবে না, আমরা তোমার কিছুই কোত্তে পারব না। তোমার মনে যদি এরূপ অহঙ্কার হয়, সে তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি, সে তোমার নিতান্ত কুগ্রহ। তোমার যতই ক্ষমতা, যতই প্রভুত্ব থাক, তুমি আমাদের এঁটে উঠতে পারবে না, কখনই পারবে না। আমরা মুখোত্র যেমন বিক্রম করি, কাঞ্চেও তেমনি পরাক্রম দেখাই; নিলজ্জ কাপুরুষের মত কেবল ফোতো জাঁক রংকোরে বেড়াই নে। দুপ্পার জলনিধি, কি তুরারোহ গিরিবরও আমাদের গতিশ্রোত রোধ কোত্তে পারে না। কি ধরাধর, কি পারাবার, আমাদের ভয়ে মস্তক অবনত বা কলেবর খর্ব্ব করে, পথ প্রদান করে। যুগ-প্রসয়ের তায় মহা অন্ধকার হয়ে মস্তকের উপর ভীষণ কড়কড় শব্দে ঝড়বৃষ্টি, অগ্নিপাত, বজ্রপাত আদি ঘোর অমঙ্গলের ঘন ঘন তুফান হোলেও আমরা স্থির-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি; আমাদের অভিপ্রায়ও স্থির থাকে; সংসার টলে ত আমাদের প্রতিজ্ঞা টলে না। তুমি যে কার পক্ষ, আমরা তা অবগত নই, আমরা তা অবগত হোতেও চাই না। বোধ করি, হয় ত তুমি সুলতানসুজার পক্ষই হবে। তা যদি হও, তবে তোমাকে সাবধান কোরে দেওয়া অনাবশ্যক। ফলে যাই হোক, আমরা তোমাকে এ অগ্ররোধ করব না যে তুমি আমাদের পক্ষ হও, আমাদের সে অভিপ্রায় নয়। আমরা যে তোমাকে অর্থ দিয়ে, কি এর পর তোমার ভাল কোরব, এই প্রলোভন দেখিয়ে তোমার স্বপক্ষতা ক্রয় কোরব, তা কখনই কোরব না। কি ফুসলিয়ে, কি ভয় দেখিয়ে, কি গায় হাত বুলিয়ে, তোমাকে আমাদের দিকে আনবার চেষ্টা কোরব, তাও

কোরব না। সে মনন আমাদের কোন কালেই নেই। তুমি অবশ্যই তোমার জীবনের মায়াকোরে থাক, তোমাকে সাবধান করবার নিমিত্ত আমরা এক্ষণে কেবল মুখোত্র আটুনি কোচ্ছি সাবধান! দেখো যেন, কোন কু-অভিপ্রায়ে সুলতান-সুজার গায় হাত দিও না, তাঁর নিকটেও যেও না। কিন্তু তোমাকে আমরা এ কথাও বোলছি, যদি রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়ে কখন ঘরাও লড়াই উপস্থিত হয়, তুমি এক্ষণে যার পক্ষ আছ, কি তৎকালীন যার পক্ষ হবে, তার হয়ে লড়াই করো, আল্লার দোহাই, তাতে আমরা তোমার উপর খড়্গহস্ত হব না। যুদ্ধস্থলে সুজার সঙ্গে সামনাসামনি হও ত দুজনে কাটাকাটি মাঝামাঝি কোরো, পার ত তাঁকে প্রাণে মেয়েই ফেলো, তাতে আমরা কোন কথা কব না, বাড়নিশ্পত্তি কোরব না, সুজা যদি মারা পড়েন পোড়বেন, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তাঁর ভাগো যা আছে, তিনি তাই ভোগ কোরবেন। কিন্তু শঠতা কোরে যদি তাঁকে ফাঁদে ফেল, তার ফল হাতে হাতে পাবে।”

আমি আর কি উত্তর কোরব, শুনে চুপ কোরে রইলাম। দেখে শুনে অবাক হোলেম। ভাব্লেম, এ একটি আজব কারখানা। বদ্মাসেরা আমাকে যেদ্রুপ কোড়কে নিলে, আমি ত তাদের তাড়াহুড়ি খেয়ে ভয়ে কতক দমে গেলেম। সুলতান সুজাকে ধরাপাকড়া কোলে আমার অদৃষ্টে যা ঘোট বে, তা ত স্বকর্ণে শুনেম। রাজকুমারের পক্ষে কতকগুলি স্থির-প্রতিজ্ঞা লোক আছে, তাঁকে ধৃত কোলেই তারা আমাকে প্রতিকল তখনি দেবে, তা না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না। এক্ষণে সেই সকল বদ্মাসের ভয়ে তাঁকে ধরাপাকড়া না কোরে ক্ষান্ত হয়ে চুপ কোরে থাকি, না আমার যা কর্তব্য, তা করি? এখন সে বিবেচনা আমার কাছে।

শুভারা ৪ কথাগুলি শেষ কোরে, আমার চক্ষুছটি ফের বাঁধলে, বেঁধে যেখান থেকে ধোরে এনেছিল, সেইখানে আবার রেখে গেল। থিলা-নের নীচে এসে চোকের কাপড়খানা টেনে



নিলে, হাতের বাঁদনও খলে দিলে, বোলে, 'এখন তুমি স্বচ্ছন্দে রাজবাটী চোলে যাও, আমরা আর তোমাকে বিরক্ত কোরব না।'

একে ত সেই ভয়ানক রজনী, রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি যে আজ এক লহমার নিমিত্তেও স্থখে নিদ্রা যাব, সেটা অনুমানের বার। ঘুম ত হলোই না, মনে কোলেম, চোক বুজে অমনি পোড়ে থাকি, তাও পাল্লেম না। সহস্র সহস্র সংশয় উপস্থিত হইবে অন্তঃকরণ তোলপাড় কোত্তে লাগল, সহস্র সহস্র বিকটাকার কালভয় মনে উদয় হওয়ায় বিভীষিকা দেখতে লাগ্লেম। • ঘুমুলে যে সকল দুর্ভাবনা ভুলে যেতেম, সে মিছে কথা, ভুলতে পার্লেম না। তবে বুঝা তার চেষ্ঠা পেয়ে সাধে সাধে সময় নষ্ট কোরব কেন? মনে যে কালান্বিত দুর্ভয় উপস্থিত, তাতে কি সময় মিছে মিছে নষ্ট করা যায়, এ অবস্থার • যে সময়, তার মূল্য নাই, সে অমূল্য।

হা আল্লা রহিম! আমার দশা হলো কি! কি অবস্থায় ফেলে আমাকে। সম্রাটের আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে গেলে নরাদকে ছেড়ে দিতে হবে; যদি দেলজানের প্রণয়ের অভিল্য করি, তবে বেগমের মনরক্ষার্থে দারাকে রেহাই দিতেই হবে; আরজ্জেকে পরিব্রাণ না কোলে পিতার পরিব্রাণ নাই, তাঁর তবে প্রাণ রক্ষা হয় না। আমার আপনার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সুলতানসুজাকে না বাঁচালে নয়; অথচ আমার চারিজনকেই ধোত্তে হবে চারিজনকেই কয়েদ কোত্তে হবে!!! এখন কোন্ দিক সন্ধানাই, কোন্ পথ ধরি, কার মন রাখি। সুলতানসুজার মুখস ধারী অশ্রুচরদের চোকরাঙ্গাণী বড় বড়ব্যের মধ্যে নয়, আমি তা গ্রাখই কোলেম না। তার চেয়ে বড় বড় দায়, বড় বড় জখম থাকি পাড়ে বুল্ছিল, সেই জন্মে তাদের তর্জ্জনপর্জ্জনে আমি ভয় পেলেম না। বেগমের সহিত কতক্ষণে সাক্ষাৎ হবে, সেই জন্মে ভারি ব্যস্ত হোলেম, বিবেচনা কোলেম, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি কি বলেন শুনে শেষে যা হয় • একটা স্থির কোব্বো।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

“যা ভেবেছ, তা নয়।”

আজ আমথাসের দরবারের পর বরকন্দাজ খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ইউসোফ আপনা হোতে আমার সহিত সাক্ষাৎ কোরে বিস্তর অমায়িকতা, বিস্তর আত্মীয়তা কোত্তে লাগলেন; যেন তাঁদের সঙ্গে আমার কত কালেরই ভার, প্রণয়। আমার ত চমৎকার জ্ঞান হলো, ভাবলেম, এ আবার কি ভাব! কিন্তু তাঁদের এই ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হলো, বেগম তাঁদের নিকট অবধারিত কোরে বোলেছেন, আমি নিশ্চয়ই দারার স্বপক্ষ হয়েছি। রাজবালার সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ কোত্তে ভয় হলো, ভাব্লেম, দেখা হোলেই তাঁর চোক খলে যাবে, তখন আর এ ভ্রম তাঁর থাকবে না। বেগমের মন রক্ষা কোরে চোল্তে পাল্লে, আমার প্রেমময়ী দেলজানের পাণিগ্রহণের পক্ষে সহজ হবে, অনেক সুবিধা হয়ে দাড়াবে। পক্ষান্তরে, রাজবালার সঙ্গে বিবাদ কোলে সব আশা-ভরসা পণ্ড হবে, তিনি আমার প্রতি কুপিতা বা বিদ্বেষ্টা হোলে উপকার না হয়ে বরং অপকার হবারই সম্ভাবনা।

বেগমের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতে গেলে, বাদশাহের অবাধ্য আমায় হতেই হবে; বিশেষতঃ আমার উপর যে ধর্মতঃ ভার আছে, আমি যদি তার মত কার্য্য নাই করি, বেগমের ভয়ে যদি পেছিয়েই যাই, তা হোলে সবে এই আমার প্রথম অধর্ম্মাচরণ করা হবে। তখাচ আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা কোলেম, যদি অধর্ম্মই করি, তবে লোকে যেন এ অপবাদ না কোত্তে পারে যে, বিলাস-সুখের অন্তরোধেই আমি ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়েছি। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোত্তে হোলে, আমার মনোময়ী দেলজানের আশা পরিভ্রাণ কোত্তে হয়, তাঁকে তবে বিস্মৃত হতেই হবে, আর কখনই বিধুযুধীর মুখচন্দ্র অবলোকন কোত্তে পারব না, তা করাও উচিত নয়। বরং আরজ্জেকে বক্ষা কোরে যদি পিতাকে বাঁচাতে পারি, তবে পিতার প্রাণ-



দান দিয়েছি, তখন তাই স্বরণ কোরে মনেরও কতক প্রবোধ হবে, অন্তঃকরণও অনেক সুস্থির থাকবে; যে ক দিন বাচব, নির্জনে বোসে দিনরাত কেবল সেই চিন্তাই করব,—সেই সম্বোধেই দিন কেটে যাবে।

এইরূপ সাত পাঁচ চিন্তা কোরে ঘোড়ার উপর সওয়ার হোলেম। সঙ্গে জনপ্রাণীও নাই, একাকী সহরের মধ্য দিয়ে চোলেম। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই শির নোয়ায়। গ্রহরীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে তারা মুখ ফিরিয়ে সেলাম কোন্তে লাগল, সকলেই মনে কলে, আমি বড় কপালে পুরুষ, আমার মত সুখী আর কেহই নাই! তারা কি অজ্ঞান! আমার অন্তঃকরণে যে কত বোঝা চেপে বোসে আছে, আমি যে কত দুর্ভাগ্যবান কচ্ছি তা তারা কিছুই অবগত নয়। আমার সর্বনাশ উপস্থিত, তা তারা স্বপ্নেও জানতো না।

একটা বৃহৎ প্রশস্ত বাড়ীর ধার দিয়ে চোলে যাচ্ছি, যেতে যেতে দেখলেম, অনেকগুলি লোক ভাড়াভাড়ি কোরে দ্রব্যসামগ্রী হানান্তর কোচ্ছে; কেহ কেহ বড় বড় লেপের ভারে কঁকড় হয়ে চলেছে, কেহ কেহ বা অতি বৃহৎ পুরাতন সিঁদুক ঘাড়ে কোরে কুঁতে কুঁতে লোয়ে যাচ্ছে। কতকগুলি পেতলের প্রদীপ, হুকো, লাগরনের মলিন মশারি, রত্নিন পর্দা—কিন্তু রং চোটে গেছে, পুরাতন বপেটা, তলোয়ারের গেলাপ ও খাপ ঝড়িতে পুরে, স্ত্রীলোকের হাতে কোরে চোলে যাচ্ছে। সদর-দরজার উপরেই একটি বারান্দায় দুটি বালক কাদো কাদো মুখ কোরে যে সকল সম্পত্তি তফাত হোচ্ছে, তাই দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমি বালক দুটিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেম। কতকক্ষণের পরে চিন্তে পালেম যে, তারা ভীমকর্মা যুক্তার ধার পুত্র। এই যুক্তার ধার পদে আমি সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছি। এখন আর আমার মনে কোন গোল রইল না; আমি সব বুঝতে পালেম। যুক্তারের স্ত্রী, সেই অমীরা, মৃত স্বামীর দ্রব্যজাত বিক্রয় কোচ্ছে। তার কষ্টের একশেষ হয়েছে; আজ খায়, এমন সঙ্গতি নাই। সে এখন দীনতা ও দারিদ্রতার

কোপদৃষ্টিতে পোড়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। অথচ আমি তার স্বামীর বেতন ও সুখসম্পদ আশ্রয় কোরে মনের ক্ষুধাভোগ কচ্ছি! আমার পিতা যদি বক্র না হোতেন, তবে আজ যুক্তার স্নেহবান্ন স্নিগ্ধমুখি পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত কোন্তে পাতেন।

আমি ঐ সকল দেখে শুনে ঘোড়া থেকে নামলেম, ভারবাহীদের বোলেম, ‘একটু অপেক্ষা কর, জিনিসপত্র সব রেখে, আমার এই ঘোড়াটি ধর, আমি উপরে গিয়ে বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, কোন কথা আছে, সেই কথা তাঁরে বোলে যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তোমরা এ ঘোড়াটি ছেড়ে কোথাও যেও না।’ তারা তাতে সম্মত হলো। আমি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে একেবারে সেই দুটি বালকের কোলের কাছেই উপস্থিত হোলেম। তারা হঠাৎ আমার দেখে চমকে উঠল, আমি সেলাম কোলেম, তারাও প্রতি-সেলাম কোলে, তন্নির ভদ্রবংশের গায় অতি শিষ্ট-শাস্ত্র হয়ে তারা আমার বিস্তর সমাদরও কোলে, তাই দেখে আমি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হোলেম। আমি বলিলাম, ‘আমরা তোমাদের চিরজীবী করুন। বীর বালক! তোমাদের মা কোথায় গেছেন, ডেকে আন, তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোন্তে চাই, কোন কথা আছে, বোলবো।’

বালকেরা আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোন্তে লাগল, শেষে আর থাকতে না পেরে কঁাদতে আরম্ভ কোলে। আমি বলিলাম, ‘এসো এসো, দুঃখের সময় কি অমন কোরে কঁাদতে আছে, দুঃখ সোয়ে থাকতে হয়, শোক-তাপ বরদাস্ত করা উচিত, দুঃখভার বহন কোন্তে শেখা আবশ্যক, তোমার পক্ষেও আবশ্যক, আমার পক্ষেও আবশ্যক, সুখ দুঃখ আমি বোলে নয়, সকলের পক্ষেই আবশ্যক; কিন্তু তোমরা বালক, বিশেষতঃ তোমাদের দুঃখের কারণ মনে হোলে, তোমাদের যে অশ্রুপাত হবে, সে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।’

‘কি বলেন মহাশয়! পিতা আমাদের কত

স্নেহ, কত আদর, কত যত্ন কোন্ডেন, আমরা তাঁকে কখনই ভুলতে পারব না। আমরা যে বড় হয়ে মাহুষের মত হয়েছি, সে তাঁরি প্রসাদ। তিনি আমাদের খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, আমাদের কত আবদার সয়েছেন। তিনি যত কাল বেঁচে ছিলেন, আমাদের কোন দুঃখই ছিল না, এখন পথের ভিকারী হয়ে দাঁড়িয়েছি। তেমন পুত্রবৎসল স্নেহবান পিতা কেহ কখন পাবে না, তাঁকে আমরা কখনই বিস্মৃত হোতে পারব না, আমরা যত কাল বাঁচব, তাঁর গুণ, তাঁর স্নেহ স্মরণ করুব।” ষোষ্ঠ ভ্রাতা এই উত্তর করিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোলে, “হায়! কি আক্ষেপ! সেই দিন থেকে তাঁর-ধনু কেমন, একবার চক্ষে দেখি নি, একবার ছুঁইও নি। আমার পাখীগুলি—” এই কথা বেলতেই ঝর ঝর কোরে চক্ষের জল পড়তে লাগল, তাই দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না, পাখীগুলি কোথায়, কেমন আছে, কি হয়েছে, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোতে লাগলুম। সে আর কোন উত্তর কোড়ে পারল না, কথা কইতে গোলই অমনি তার কান্না পায়, অমনি ফুলে ফুলে কঁদে উঠে, অশ্রু-জলে ধাস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জ্যেষ্ঠেরও দুই চক্ষু ঢল ঢল কোচ্ছিল, সে কিস্ত বোলে, “অন্য অন্ত্র ভ্রিনসপত্র যেমন বিক্রয় হয়েছে, সেই সঙ্গে পাখীগুলিও বিক্রয় গেছে।”

আমি বলিলাম, “বীরবালক! তোমাদের আর কাদতে হবে না, চক্ষের জল মুছে ফেল, তোমাদের বাজগুলি তোমরা ফিরে পাবে, তোমাদের তাঁরগুলি ময়দানে পূর্বের মত উড়ে বেড়াবে, এমন দিন আবার হবে। আমার এমন ভরসা আছে, সে দিন আমি চক্ষে দেখতে পাব।”

বালক কষ্টচিত্ত হয়ে বোলে, “কি বলেন মহাশয়! আমাদের কি এমন দিন আবার হবে? সেই আকাশগমী বাজ, আমার সেই প্রাণের সমান শীকারী আমার আজুলের উপর এসে বোসবে? মহাশয়! তা আর কেমন কোরে হবে? তার উপায় কি?”

আমি বলিলাম, “তবু কি? তার উপায়

আছে। তুমি গিয়ে তোমার মাতাকে সংবাদ কর যে, কে একটি বহুলোক এসেছেন; তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তোমার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে সব ঝিলি-বন্দোবস্ত হবে।” এই কথা শুনেই বালক-শীকারী অমনি উর্দ্ধ্বাশে দৌড়িল, আবার নিমেষের মধ্যে দুঃখিনী মাতার সঙ্গে ফিরে আসিল। দেখলুম, মুক্তারের স্ত্রীর আর সে তীক্ষ্ণদ নাই; অতি মলিন, অতি বিষন্ন। মুক-চোক সেহা হয়ে বোসে গেছে, সর্বদা উদাসভাব। আমাকে দেখেই অমনি শিউরে উঠলেন। তার তাৎপর্য এই, আমি যে তাঁর বাড়ীতে যাব, এটি অভাবনীয়, তাই তাঁর বিষয় বোধ হলো, চমকে উঠলেন। আমি বোলেম, “ওগো স্নেহময়ী মাতা, তোমার স্বর্গগত স্বামীর পদের উত্তরাধিকারীকে তোমার বাড়ী আসতে দেখে তোমার বিষয় হলো কেন?” মুক্তারের স্ত্রী বলিলেন, “ও সব কথা পরে হবে। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনি কি আমার স্বামীর নামে বাদশাহের কাছে চুকলি কোরেছিলেন? আপনি কি তাঁর পদ লইবার জন্যে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে যত্নমুখে লয়ে গিয়েছিলেন?”

আমি বলিলাম, “হবেকন আল্লা! তোবা!! তোবা!!! যা ভেবেছ, তা নয়! তাতে যে আমার কোন পাপ নাই, সেই সর্বসাক্ষী জগদীশ্বরই তার সাক্ষী! আমি সেই নৃশংস ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেম না। তাঁর কর্ণে আমার যত স্পৃহা ছিল, গুরুদেবই তা জানেন। সকলে ধোরে বেধে জোর-জবরদস্তি কোরে সম্প্রতি সেই কর্ণে আমায় বাহাল করেছেন। সে পদ মুক্তারের তুলা লোকেরই শোভা পায়, তন্নিম্ন আর কারো সাজে না। আমি কোন প্রকারেই তাঁর পদের যোগ্য নই। আমি অজ্ঞানত হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেম, তোমার পুত্রেরা অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছে, তাই দেখে ইচ্ছা হলো, বাতীর মধ্যে প্রবেশ কোরে জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি দ্রব্য-সামগ্রী হস্তান্তর কোচ্ছো?”

“হায় কি পরিভাপ! কারণ ত স্বতই ব্যক্ত হয়েছে!—অর্থ নাই, বন্ধু-বান্ধব নাই, এই

কারণ। তা ভিন্ন আর কি কারণ?” মুক্তারের দী এই উত্তর করিলেন।

আমি বললাম, “আচ্ছা, তোমার দ্রব্য-সামগ্রী সব ফিরিয়ে আন, তোমার পুত্রেরা বাজ শীকারী কি তীর ধরু লয়ে যেমন কেলি-কৌতুক কতো, যেমন আমোদ-আহ্লাদ কতো, তেমনি করুক, আমি যত কাল বাচব, আর যত দিন আমার ক্ষমতা থাকবে, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, কোন বিষয়ে তোমার অপ্রতুল হবে না।”

মুক্তারের স্বী উচ্চরব কোরে বোলেন, “আ! যে দিন থেকে আমি স্বামিহীনা হয়ে অনাথিনী হয়েছি, এরূপ সাত্ত্বনাবাক্য আমার কর্ণে প্রবেশ করে নি, আজ শুনে আমার অন্তঃকরণ ডুঙ্কলো, আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলেম, এতদিনের পর প্রাণধারণের উপায় হলো! আপনি আমার পূর্বজন্মের স্মৃদ্ধ ছিলেন, তাই আজ আপন হাতেই এ হতভাগিনীর অবলম্বন হলেন। কিন্তু মহাশয়! আমি আর এ ভিটেতে বাস কোরব না, এ বৃহৎ বাড়ী, আমার অবস্থানত নয়, বিশেষতঃ এ বাড়ীতে বাস কোরে ভ্রাপণার দান গ্রহণ কোলে, লোকে কলঙ্ক রটিয়ে দেবে, বোলবে, যে এত বড় বাড়ীতে বাস করে, তার কিসের দুঃখ, তবে কেন সে পরের দান গ্রহণ করে?”

তার কথাগুলি অপ্রামাণ্য কোন্তে পালেন না, কিন্তু আমি তাঁকে বোলেম, “তুমি এখানেই থাক, আমি কোন ফিকির কোরে চুপে চুপে কিছু কিছু খরচ দেব, তুমি তা মাসে মাসে পাবেই পাবে, তার অগ্রথা হবে না। যা দেব, তাতে তোমার অন্তঃকরণের দুঃখ থাকবে না, তা ছাড়া, ছেলে দুটির লেখা-পড়ারও খরচ চোলে যাবে।”

মুক্তারের স্বী অনেক আপত্তি কোলেন, এ বাড়ীতে থাকতে কোন মতে সম্মত হোতে চান না, বোলেন, “বাড়ী বেচে যে অর্থ পাব, তাতে আমার অনেক সুসার হবে।” আমি অনেক বোলে কোয়ে অনেক বুঝিয়ে শেষে তাঁকে কতক রাজি কোলেম, আপাততঃ তিনি স্কান্ত হোলেন। ঘরের বাবস্তায় তৈজসপত্র একটি দালালের বাড়ীতে লয়ে বাজিল, আমি দ্ব

আর্টক কোলেম। সেই সকল জিনিস বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হলো।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াসমিনের বাজ, তার শীকারী পুনরায় যখন তার হাতের উপর এসে বোসল, তার মুখে আর হাসি ধরে না; সে তখন আনন্দে পুলকিত হয়ে তুড়ি দিয়ে নাচতে আরম্ভ কোলে। তাই দেখে আমিও মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হোলেম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়ারমহম্মদও আহ্লাদে বগল বাজিয়ে উঠল। সে হাসতে হাসতে আপনার বড় যজ্ঞের কলমদানটি টেনে লোয়ে তা থেকে একটি কলম বার কোরে কবিতা লিখতে বোসল। তার মাতার দিকে আড়চোখে চেয়ে বোলে, “মা! দরিদ্র-বাকব, আমাদের আশ্রয়দাতা সাদকের নামে এই কবিতাগুলি লিখব মনন কোরেছি।”

আমি বোলেম, “আচ্ছা, লেখা হোলে আমার পাঠিয়ে দিও, তোমার স্বহস্তের রচনা পেয়ে আমি যত প্রাক্লিষ্ট হব, কেহ যদি আমার লক্ষ টাকা দেয়, তাতে আমার তার অর্ধেক আমোদ হবে না।” বালক ঐ কথা শুনে তাতার বাড়ি একটা কলম কেটে কাগজ ভাঁজতে আরম্ভ কোলে। ইয়াসমিন বোলে, “আমার বাজ প্রথম যে পাখী শীকার কোরবে, সেটি আপনাকে নজর দেব।” ঐ কথা বোলে, পাখীগুলির গায়ে হাত বুলিয়ে চুমুখুড়ি দিয়ে তাদের কত আদর কোতে, তাদের সঙ্গে কত কথা কইতে লাগল। পাখীগুলি তখন গা ফুলিয়ে, তেড়া-বাড় কোরে, মহাগর্জিতভাবে ইয়াসমিনের হাতের উপর বোসে ছিল।

ইয়াসমিন বোলতে লাগল, “ইয়া তেজ্জ-পরোয়ারজ! সাবাজ তোমাকে পরাস্ত কোরবে, আকাশগামী তাই দেখে তোমায় এত ঠাট্টা বিজ্রপ, এত উপহাস কোরবে যে, ময়দান থেকে তোমায় পালিয়ে যেতে হবে।” তার পর আমার দিকে চেয়ে বোলতে লাগল, “গরিব-পরোয়ার! আমার দিবা, আপনি সত্যি বলুন, আকাশগামী কি দেখতে খুব সুন্দর নয়? এই দেখুন, কেমন একটি বুটি, ঠোঁটটি কেমন ধারাল, এই চেয়ে দেখুন, পায়ের নখগুলি কেমন সুদৃশ্য, আর কি পাখীর রাজার মত দেখায় না?”

আমি বোল্লেম, “তা মিথ্যা নয়, ক্রাজার মতই দেখায় বটে। কিন্তু আমি দুটি বই পাখী দেখে-  
ছি, তার মধ্যে তেজপরোয়াজ কে?”

“মোল্লার ছেলে, ছোট মোবারক, তেজ-  
পরোয়াজ, তারি। তার সঙ্গে আমার কথা হয়,  
একদিন পাখীর লড়াই দিয়ে কৌতুক দেখে  
বাজিও রাখবার কথা ছিল, দেখি কে হারে,  
কে জেতে। ইতিমধ্যে সেই ভয়ঙ্কর কাল-দিন  
উপস্থিত হয়ে সে আমোদ আহ্লাদ বুচিয়ে দিলে,  
সব গোল্লায় গেল।”

এ সকল দেখে শুনে আমার মন দুঃখে গোল  
গেল, অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হলো। সেই  
অনাথা স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বোল্লেম, “জগদী-  
শ্বর তোমার মঙ্গল কোরবেন, তোমার এ কষ্ট  
চিরদিন থাকবে না।” তাকে এই সাহস-বাক্যে  
আশস্ত কোরে আমি সেখান থেকে বিদায়  
হয়ে চোল্লেম। আমি নাকি কিছু কিছু সাহায্য  
কোর্ব বোল্লেছি, দুঃখিনী মুক্তারের স্ত্রী তাই  
শুনে তখন অনেক সুস্থ হয়েছে। আমি বোল্লেম,  
“তোমরা যখন এ বাড়ী ছেড়ে অল্প একটা ছোট  
বাড়ীতে উঠে যাবে, তার পূর্বে আর একবার  
আমি এসে সাক্ষাৎ কোরে যাব।”

এখন বাড়ীর দিকে চোল্লেছি, সন্ধ্যাও হয়  
হয় হয়েছে, পথে যেতে যেতে মনে কোলেম, হয়  
ত এতক্ষণ সেই বৃদ্ধা এসে বোসে আছে। যা মনে  
কোরেছিলেম, তাই হলো। ঘরে গিয়ে দেখি, সেই  
বৃদ্ধা জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে  
বড় অধিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে থাকতে হয়নি।  
সে আসতেই আমি তখন গিয়ে জুট্লেম।  
তারে দেখে বোল্লেম, “তুমি আমাকে আর একটি-  
বার আমার প্রাণপ্রিয়তার ঘরে লোয়ে চল।” ঐ  
কথা শুনে সেই স্থবিরী নির্জঙ্ঘর স্বায় আমার  
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সেই সময় আমি  
যেন অহুমান কোলেম, সে একবার একটু  
মুচকে হাসলে, হাসির ভঙ্গীটু কেমন এক প্রকার  
বোধ হলো, তাতে যেন প্রতারণার গন্ধ  
ছিল। বাই হোক, আমি সংশয়ে দোলায়মান  
হয়ে বৃদ্ধার আগে আগে চোল্লেম। পথে যেতে  
যেতে মুহুমুহঃ তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে  
বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগ্লেম।

আমি যেরূপ আগ্রহভরে তার দিকে ঘন ঘন  
চেয়ে দেখতেছিলেম, তাতে বোধ হয়, স্থবিরী  
আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল, তাকে  
তা বুঝতেই হবে; তত আগ্রহ দেখে না বুঝে  
থাকবার যৌই ছিল না।

আমি যা ঠাওরোঁছিলাম।—আজ একটা  
নতুন কারখানা উপস্থিত না হয়ে যায় না।  
অল্প অল্প দিন যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেম,  
সেই সিঁড়ির নীচে দিয়ে অল্প একটি গৃহে প্রবেশ  
কোত্তে হলো। আমি গিয়ে কেবল বসেছি, এমন  
সময় একটি যুবতী অবজ্ঞাভিত্তি হয়ে, আর  
একটা দরজা দিয়ে ঐ কামরায় প্রবেশ  
কোলেন। যুগতঃ যেমন এসে পোসলেন, বৃদ্ধা  
অমনি সেই দরজা দিয়ে দোরো পোড়ল। এই  
অভাবনীয় অভিনব সাক্ষাতের কি ফল দর্শে,  
তাই জানবার জন্তে আমি মনে মনে মহাবাস্ত  
হোতে লাগ্লেম। যে রমণী আমার সম্মুখে উপ-  
স্থিত, তিনি যে বেগম নহেন, অথবা আমার  
প্রাণ-প্রতিমা দেলজানও নহেন, সেটি আমি  
স্পষ্টই জানতে পেরেছিলেম।

• যুবতী বলিলেন, “সাদক! তুমি একজন  
অপরচিতের কাছে উপস্থিত হয়েছে বোলে  
তোমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে; বিশেষতঃ ক্রমিক  
কয়েক দিবস ধোরে উপরতলায় তারি  
আমোদ-প্রমোদের দেখা-সাক্ষাৎ চোল্লেছিল,  
তার কাছে এ দেখা-সাক্ষাৎ অতি নীরস;  
তোমার প্রাণ যুল্বে কেন? এ কাষ্ঠ আলাপে  
তোমার মন উঠবে না, আমি তা জানি। কিন্তু  
আমি তোমাকে অবধারিত কোরে বোল্লেছি সে  
দেখা-সাক্ষাৎ যেরূপ চোল্লেছিল, সেইরূপই  
চোল্বে, তার কোন ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু  
এর পর উত্তরকালে পাছে তোমার সেই  
আমোদ আহ্লাদের প্রতিবন্ধক জন্মে, তাই  
বিবেচনা কোলেম, তোমার সঙ্গে একবার  
সাক্ষাৎ হয়ে থাকা ভাল। সে ব্যাঘাত যাতে  
না ঘোটতে পারে, তার পূর্বসূত্র, তার পূর্ব-  
ব্যবস্থা কোরে রাখ্লেম, তাতে হানি কিছু  
আছে, তা নয়। আমার কথা শুনে যেন ভয়  
পেও না, চম্কেও যেও না। বেগম সাহেবের  
কথাগুলি যেমন ভয়ানক, তার তরী রসিনার

কথা তার চেয়ে অধিক ভয়ানক নহে, আমার ত এই বিবেচনা হয় ।”

যিনি আমার সঙ্গে অপ্রকাশভাবে চুপে চুপে সাক্ষাৎ কোলেন, তিনি রাজপুত্রী রসিনারা । রাজবালার পরিচয় পেয়ে আমার বিষয় গোপন কোত্তে পারেন না । কিন্তু শাহজাদী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মনে মনে বিরক্ত হোলেন বোধ হলো । আমি যে দরের লোক, আমি যে অবস্থার মাল্লব, তাতে কোরে রাজ-বালা যে ডেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোলেন, এটি আমার পক্ষে মহা গৌরব, ভারি স্নাঘার বিষয়, সুতরাং আমায় বলতে হলো, “আর্যো ! আমি আজ ধন্য, আমি আজ কৃতকৃতার্থ হোলেম । আপনি যে উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্বেন, আমি তার যোগ্য নই, সেটি অভাব নীয়, স্বপ্নের অগোচর, আপনার কি অভিলাষ, আজ্ঞা করুন, আর তা কিরূপে সুসিদ্ধ হোতে পারে, তাও বলুন ; আমি আপনার কুসুম বরদার কোত্তে প্রস্তুত আছি ।”

বাদশাহ রাদা বোলেন, “আমি অনেক রুঁকি ষাড়ে কোরে নিয়োছি, আমি বিবাহিতা, আমার ভগ্নী অবিবাহিতা, সুতরাং আমার যতখানি লোক-লজ্জার ভয়, তাঁর তত নয় । কিয় কি ঠার, আজকাল সে কাল পোড়েছে, তাতে কোরে যে বিপদই হোক, আমাকে তা পোয়াতে হবে । কোন সহোদরের অন্তরোধে আমি কোন বিপদকে বিপদ জ্ঞান কোর্ব না । পরম্পরায় শুন্তে পেলেম, রাজকুমারেরা গুত হবেন ; আমার স্বামীর ভ্রাতৃপুত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে, সে কথাও আমি শুনেছি । কিন্তু সাদক, তুমি জেনো, তিনি অতি অল্পকালের নিমিত্তে বেগমের অধীন আছেন, তাঁর উপর অধিক কাল তাঁর আধিপত্য থাকবে না । তুমি যদি অকপট অথচ বলবান, প্রভুত্বশালী মিত্রের বাসনা রাখ, তবে আমি যে পরামর্শ দেব, তাতে কর্ণপাত কোলে তোমার বিজ্ঞের মত কার্য্য করা হবে ।” আমি নীরব হয়ে রইলেম, তখাচ আবার বোলতে লাগলেন, “যদি দেলজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা থাকে, তবে আরজজেব যেন গুত না হন, তাঁরে ছেড়ে দিতে হবে ।”

আমি বলিলাম, “ভদ্রে ! আমার প্রতি অবধান করুন । বেগম সাহেব বোলেছেন, যদি দেলজ্ঞানের প্রণয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকে, তবে রাজপুত্র দারাকে অবশ্যই বাচাতে হবে, তাতে কোরে আমি এই স্থির কোরেছিলাম, আপনি আর দেলজ্ঞান দারার পক্ষ হয়েছেন, আপনারা ঐ দারারই মঙ্গল কামনা কোরে থাকেন ।” রাজবালা বোলেন, “সেটি তোমার জুল, তুমি সে বিষয় তলিয়ে বুঝতে পার নি । আমরা উভয়েই আরজজেবের শুভামুখায়িনী ; কিন্তু আমাদের ভগ্নী বেগম মনে কোরে থাকেন, আমরা দারার পক্ষই আছি, মনে মনে তাঁরই মঙ্গল গেয়ে থাকি । কিন্তু তিনি যা ভেবেছেন, তা নয়, তিনি এ বিষয়ে যে অন্ধ আছেন, সেই অন্ধই থাকুন, এখন তাঁর চোখ খুলে দিলে তার প্রমাদ ঘোটবে, তা হোলে অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শীর গায় কার্য্য করা হবে । এই রাত্রেই বেগম তোমাকে ডেকে পাঠাবেন, তোমার সঙ্গে দেখা হোলে তিনি এই কথা বোলবেন, এ বিষয়ে দেলজ্ঞান যেমন যেমন বোলবেন, তুমি তাই কোর্বে, এই কথা তুমি স্বীকার কর । তোমার তাতে আপত্তি কি ? তুমি স্বচ্ছন্দে তাই স্বীকার কোরো । তিনি মনে কোরেছেন, দেলজ্ঞান দারার জগাই অন্তরোধ কোর্বেন, সাদক ! তা নয়, আমি তোমাকে একেবারে নিদ্ধারিত কোরে বোলছি, তা নয় ; দেলজ্ঞান তোমাকে শুদ্ধ আরজজেবের উদ্ধারের কথাই বোলবেন, তা ভিন্ন আর কারও জন্তে অন্তরোধ কোর্বেন না ।”

আমি বলিলাম, “ভাল, মনে করুন, আমিই যদি যুবরাজ দারার মিত্র হই ?”

“তুমি যে তা হবে, আমি এমন বিবেচনা করি নে, যেহেতু, তোমার পিতা আরজজেবের পক্ষে আছেন ।” রসিনারা এই উত্তর করিলেন ।

আমি বলিলাম, “তা হোলেও হোতে পারে, কিন্তু তাই বোলে যে আমিও—”

আমার কথায় চাপা দিয়ে, রসিনারা অমনি বোলে উঠলেন, “আমায় ক্ষমা কর, তাই বোলে যে, সে কথা রেখে দাও, তুমি যে আরজজেবের পক্ষ হবে, তার অনেক বলবৎ কারণ আছে, সে

কি তোমার পিতার প্রাণ আপনার মূঠোর মধ্যে  
রখেছে। আজ তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাৎ না  
হলেও কৃতি ছিল না। পাছে তুমি অগ্র-পশ্চাৎ  
না বিবেচনা কোরে বেগমের কথামত চোলে  
স্বীকার কর, সেই ভয়ে ডেকে পাঠিয়েছি।  
আমার ইচ্ছা যে, সেইটি না বটে, তা হোলে বেগম  
তোমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে এই দুর্নাম রটিয়ে  
দেবে যে, তোমরা—তুমি আর দেলজান—  
গোপনে-গোপনে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ কোরে  
পাক। আমি যে সে বিষয়ের কিছুই অবগত  
ছিলেম না, তুমি তা জানই, কিন্তু তুমি যদি তার  
দমতে চল, তা হোলে বেগম আমাকেও ছাড়বেন  
না, আমায় স্তব্ধ জড়াবেন। আমার নামে বদনাম  
ভুলে দিয়ে অত্যাতি কোরে বেড়াবেন। তা হোলে  
লোকের গল্পনায় আমি আর লজ্জায় মুখ দেখাতে  
পারব না। আর কিছুদিন পরেই দেলজান  
আমার সঙ্গে একত্রে বাস কৈরবেন, আমার  
অপীন হবেন, তখন আর তাঁর উপর আর  
কারণ ক্ষমতা থাকবে না। তাই জগে আমি  
যা বলি, তিনি তা শুনে, আমার মন বুঝে  
চলেন, কিন্তু লোক-দেখান বেগমের আজ্ঞাকারী  
হয়ে আছেন, তিনি যেন তাঁর শরণাগত।  
আমার ভগ্নীর বড় উগ্র স্বভাব, তাই তাঁকে ভয়  
কোরে চোলেতে হয়।

দেলজান এ কালের মত মেয়ে নয়, সে  
কাজকে প্রবঞ্চনা কোন্তে চায় না, তার সে স্বভাব  
বই নয়। কপট ব্যবহারের প্রতি তার আন্ত-  
রিক বিতর্ক। আমি বড় পেটেই পোড়েছি,  
এত কোরে বুঝছি, এত চেষ্টা পাচ্ছি, তবু তারে  
এ পথে আনতে পাচ্চিনে। তাকে বলি, তুমি  
মনের কথা কাকেও বলিস নে, ঢেকে ঢেকে  
নে বেড়াস, কিন্তু মুখে গুব আশ্রয়তা করিস,  
বেগম যেন তোমার কথায় ভুলে যায়, তাঁর মনে  
বেশ প্রত্যয় হয় যে, তুমি তারি লোক, আর  
ধারও নও, অথচ তোমার অন্তরে যা আছে, তা  
আছেই। কিন্তু দেলজান তাতে বড়, বিরক্ত,  
যদি করা তার পক্ষে যেন বাধ জ্ঞান হয়,  
তার নাম কোলে সে তেলে-বেগুনে জলে উঠে,  
তবু আমি না-ছোড় হয়ে অনেক ছরস্ত কোরে  
ভুলেছি।—আচ্ছা, তবে এখন আমি চোলেম,

ভূমিও বিদায় হও। আমি যে পরামর্শ দিয়েছি,  
সেইমত চোলো। তুমি যাকে ভালবাস মুখে  
বল, তার সঙ্গে যাতে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তার  
চেষ্টার ক্রটি হবে না। বেগম যে চোটবেন,  
সে আশঙ্কা কোরো না, তিনি চোটতে পারবেন  
না। তিনি যে আমাদের কুহকে পোড়েছেন,  
আমরা যে তাঁকে এ পর্যন্ত কেবল দম্‌সম দিয়ে  
ভুলিয়ে রেখেছি, তিনি যখন তাঁজানতে পারবেন,  
তখন আর তাঁর এ আধিপত্য থাকবে না, তখন  
আমাদেরই রায়রাজ্য হবে; তবে আর তাঁকে  
ভয় কি? তখন আর তিনি চোটে কি কোর-  
বেন? আমার ভয়ে তাঁকে তখন কৌকর্ড হয়ে  
থাকতে হবে। আমি যা বোলব, সেইমত  
তাঁকে চোলেতে হবে। সে সময় রাজপুরীর  
মধ্যে কেবল আমিই এক-মুখ-রুদ্ধাক্ষ হব, আমি  
যা করব, তাই হবে, আমার কথার উপর কারণ  
কথা কবার ক্ষমতা থাকবে না।”

আমি শুনে খানিক ক্ষণ চুপ কোরে রই-  
লেম, মনে মনে কত কি ভাবতে লাগলেম।  
পাঁচ রকম ভেবে চিন্তে শেষে বোলেম, “রাজ-  
বালা! আমি আর পক্ষ, আপনি আর সরলা  
দেলজানও যে তাঁরই পক্ষ, সে কথার প্রতি  
আর আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনারা যে  
আরদ্রজীবের দিকে আছেন, সে কথা কারণ  
কাছে অগ্রকাশ নাই। আমি শুনেছি, আপ-  
নারা তার পক্ষ আছেন বোলে বরকন্দাজ পী,  
আপনাদের উপর ভারি বিরক্ত।”

রাজপুত্রী বোলেন, “সে কথা মিথ্যা নয়,  
বিরক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু এখন নাই। দেখ-  
লেম যে, আমায় কেউ কোন কথা বলে না,  
রাজ্যতন্ত্রের সম্বন্ধে যে কোন পরামর্শ, যে কোন  
মন্ত্রণা হয়, আমি তার কিছুই জানতে পারি নে,  
আমার কাছে কেউ তা ভাগে না। তাই বিবে-  
চনা কোরে দেখলেম, আমায় খোলস না বদ-  
লালে চলো না। আমি যদি মুখে বলি, আমার  
স্বামী বোলে কয়ে আমার মত ফিরিয়েছেন, এখন  
তাঁর মতেই আমার মত, তিনি যে পক্ষ, আমিও  
সেই পক্ষ। এ ছাড়া আমি যদি লোকদেখান  
দারার প্রতি স্নেহ-মমতা করি, কি আমি যদি  
মুখে জানাই, তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক টান,

তা হোলে সকলে মনে কোববে, আমি সত্য সত্যই দারার পক্ষ হয়েছি ; তবে আমার কেউ কোন কথা ছাপাবে না। মনে যা ভেবে-ছিলেম, কাজেও তাই গোড়াল ; সেই অবধি আর আমার কাছে কেউ কোন কথা ভাঁড়া-ভাঁড়ি করে না, এখন আমার সকলে সকল কথা খুলে বলে। আমি মুখে বোলে বোলে বেড়াই, আমার মত ফিরে গেছে, এখন আর আমি আরঞ্জেরেবের দুঃখে দুঃখিত নই। বরং কেউ তাঁর নাম কোলে মুখ দেকট-বিকট কোরে মহাবিরজিতাব জানাই, কখন বা তাঁর নাম শুনে কানে হাত দি, তাদের বলি, ও নাম আমার কাছে কেউ কোরো না। কখন বা তাঁর নামে অগ্নি অবতারণ হয়ে, দুই চক্ষু লাল কোরে তাঁর উপর চোট্টে উঠি। যার তার কাছে বোলে বেড়াই, 'দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসন সেই পাবে ; আরঞ্জেরেব কে ?' যদি আরঞ্জেরেবের হয়ে কেউ কোন কথা বলে, অমনি রায়বাঘিনীর মত তার ঝড়ে পড়ি, খুব চোট্ট-পাট্ট কোরে দশ কথা শুনিয়া দিই, সে অমান মুখ-ছাপ পেয়ে থতমত খেয়ে চূপ কোরে থাকে। আমার কৌশল এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝতে পারে নি, দারার হয়ে যা করি, সব মৌখিক লোক-দেখান, আন্তরিক কিছুই নয়। আমার ঐ লোক-দেখান মত ফিরে যাবার পর, দুই তিন বিষয়ে আমার চালচলন, আমার কার্যের প্রণালী দেখে আমার স্বামী আর বেগম, উভয়েই মুগ্ধ হয়ে পোড়েছেন, তাঁরা একেবারে এঁকে ঠিক দিয়ে বোসে আছেন যে, আমি সত্য সত্যই দারার স্বপক্ষ হয়েছি। সেই অবধি তাঁরা যখন যে পরামর্শ, যখন যে মন্ত্রণা করেন, আমার সব খুলে বলেন। কিন্তু খবরদার সাদক। আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়ে কথাবার্তা হয়েছে, বেগম যেন এ কথা'র বাশ্পও না জানতে পারে। তোমার আকার ইঙ্গিত কি ভঙ্গী দেখে যেন 'ও' কথা'র আভাসও না পায়। সাবধান, সতর্ক হয়ে যত চোলেতে পার, চোলেবে, যথেষ্ট প্রত্যাশিতা কোরে মন ঢেকে রেখো, অন্যবেশ কথা কদাচ বাব করো না, দমবাজি, জাল কথা কয়ে, ফেবেববাজি কোরে

লোকের মন যত ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পার, রেখো।" এই কথা বোলে রাজবালা একটি অঙ্গুলী হেলিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন। এই রকম আমাকে বেগমের কাছে লোয়ে যাবার জন্তে ঐ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সঙ্গে কোরে আমি বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।

বেগম আমার দেখে বোল্লেন, "সাদক ! আজ তোমার আস্তে একটু বিলম্ব হয়েছে, তা হয়েছে হয়েছে। ফলে আমি তোমায় যে যে কথা শিখিয়ে দিয়েছি, সেগুলি অরণ আছে ত, বোধ করি, সেগুলি একবার মনে মনে তোল কোরেও দেখে থাকবে।" দেখো, শেষে যেন পাগলামী কোরে আমার অবাধ্য হয়ে চলো না, শুধু আমার কেন, তোমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানেরও বটে। আমাদের মতে না চোলে শেষে যে দুর্দশাগুলি ঘোটবে,—ঘোটবেই যে, তার সন্দেহ নাই,—সেগুলিও তুমি মনে মনে ঠাওরিয়ে দেখেছ বোধ হয়।"

আমি বলিলাম, "ভদ্রে ! দেলজান আমার অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি মাল্লে মরি, রাখলে থাকি ; আমার জীবন তিনি। দেলজান আমার শুভাশুভের নির্দেশকত্রী, তিনি যে পথ দেখিয়ে দেবেন, আমি সেই পথ ধোরে চোল্‌বো ; দেলজান আমার সংসার-যাত্রার পথ-প্রদর্শিকা। তাঁরও যে মত, আমারও সেই মত ; আমি তিনি ছাড়া নই।"

বেগম বলিলেন, "সাদক ! তবে তুমি দিন সন্ত্য কোরে করার কর, কিরে-দিব্যা কোরে, শপথ কোরে বল যে, দেলজান যা বোলবে, তুমি তাই কোববে। আমি তোমায় দিন সন্ত্য কোরে বোলছি, তুমি যদি আমার মিত্র হও, আমিও তোমার মিত্র হব, তুমি যদি আমার উপকার কর, আমিও তোমার উপকার কোব্ব। যখন সময় হবে, যখন সুবিধা দেখবো, তখন দেলজানের সঙ্গে তোমার মিলন হবার চেষ্টা করব।"

আমি বলিলাম, "রাজপুত্রি ! আমি দিব্যি কোবে বোল্‌ছি, আমি কখনও পেয়ে বোল্‌ছি, দোহাই ধর্ম্মের, আমি যদি মিথ্যা বলি, সর্ব্বনাশ হবে ; আমার গায় যেন মহাব্যাধি হয়, আমি



যেন খসে গলে মরি ; আমি যদি দাগাবাজি করি, আমার যেন নরকে বাস হয় ; এ বিষয়ে দেলজানের অভিপ্রায় লোয়ে চোলুব, তা তাঁর যে অভিপ্রায়ই হোক ।”

বেগম বলিলেন, “বশ, ঢের হয়েছে, এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো ।” আমি তাই কোলেম, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চল্লম । তিনি আমার দেলজানের ঘরে লোয়ে গেলেন । দেলজান যে অনেকক্ষণ ধরে আমার আগমনের প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন, তাঁর মুখ দেখে সেটি স্পষ্ট বোধ হলো । বেগম একটু অগ্রসর হয়ে বোলেন, “দেলজান ! আমি যে লোকটিকে সঙ্গে কোরে এনেছি, ইনি একটি বিষয়ে তোমার মতের অনুগত হয়ে চোলবেন স্বীকার কোরেছেন । তোমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে, উঠে যাবার সময় তোমার যা মনোগত অভিপ্রায়, তা তাঁকে অবগত করিও ।” এই কথা বোলে বেগম চোলে গেলেন ।

দেলজান অভিমান হয়ে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আক্ষেপ কোরে বোলেন, “হায় ! প্রাচীরে ঘেরা এই ঘণিত পুরীর মধ্যে ছল, প্রবঞ্চনা, চাতুরী প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম, কোন অধর্মের অনুষ্ঠান না হয় ! এ কি কম স্ফূটার কথা !” তার পর যুবতী বোলেন “সাদক ! বোধ করি, আপনি রসিনারার সঙ্গে দেখা কোরেছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কথাবার্তাও হয়ে থাকবে ।”

“হাঁ, তা হয়েছে ।” এই উত্তর কোরে আমি জিজ্ঞাসা কোলেম, “তুমিও কি তাঁর জায় আরঙ্গজেবের অনুকূল পক্ষ ?”

দেলজান একটু হেসে বোলেন, “বাস্তবিক আমি কারো পক্ষই নই, কিন্তু আমাকে না বিইয়ে কানায়ের মা তোতে হয়েছে । আমার যেমন পোড়া কপাল ! সম্প্রতি আমি বেগমের অধীনে আছি, এখন তাঁরই অভিপ্রায়মত আমার চোলতে হোচ্ছে, এর পর আবার যত দিন বাঁচব, হয় ত রসিনারার অনুগত হয়ে থাকতে হবে, তখন আবার তাঁরই মন যুগিয়ে চোলতে হবে । আমি কেবল পরাধীন হবার জন্তেই নারীদেহ ধারণ কোরেছিলেম, চিরকাল

পরের গোলাঘতি কোরেই জন্মটা কেটে গেল ! এমনি হতভাগিনী আমি ! সেই রসিনারার ভয়ে, তাঁরই কথাক্রমে, আমি আজ ছলনা কোত্তে বোসেছি । সে এখন আমার ধোরে বোসেছে, তুমি সাদককে বল, তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে তাঁর সহায়তা করেন, তোমার কথা তিনি ফেলতে পারবেন না, তাঁকে অবশ্যই তা শুনতে হবে । আমার মত আটকপালী—আমার মত চিরহুঃখিনী আর কে আছে বল ! আমার আর কোথাও দাঁড়াবার স্থান নাই, মুখের দিকে চায়, আমার বোলে স্নেহ করে, এমন দরদর লোক আমার কেউই নাই ! কাছেই নাচারে পোড়ে তাঁর কথা আমার শুনতে হয়েছে । সাদক ! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দেও, তোমার যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তবে আরঙ্গজেবের সহায়তা কোত্তে সাধ্যমতে ক্রটি করো না । কাজের গতিকে যদি দারার কাছে বাঁধা পড়ে থাক, আর সে বন্ধন ছিন্ন করা যদি উচিত-বিবেচনা না হয়, তবে আমাকে বিন্ধিত হইও, আর কখন ভুলেও আমার মনে করো না । তখন যা মন চায়, তাই কোরো ।”

আমি বোলেম, “দেলজান ! আজ কি সুপ্রভাত ! আজ অবধি আমি তোমার হোলেম ! আজ তুমি আমার আপনার লোক বোলে স্বীকার কোরেছ ! তোমার ঐ প্রাণ-সঞ্জীবনী অমরাগবাক্যে আমি সঞ্জীব হোলেম, আমার পরমায়ু অক্ষয় হলো, আমার মন-প্রাণ নবীন মূর্তি, নবীন শ্রী ধারণ কোলে । যে প্রণয়-বাসনা হৃদয়ান্তঃপুরে আবদ্ধ থেয়ে দিন দিন মলিন হোচ্ছিল, তোমার মুখে অভিমানের কথা শুনে আমার সে প্রণয় এখন ফুল্লমুখী হয়ে সরাগে নিজপ্রভা দীপ্ত কোছে, এখন সে প্রভা আর অপ্রকাশ থাকবার নয় । সুন্দরি ! তখাচ মনের কেমনই সংশয়, এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তুমি আমাতে অন্তরাগিনী হয়েছ । রস-ময়ি ! তবে কি সত্য সত্যই আমি তোমার হৃদয়ের কান্ত হয়েছি ? তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমাকে মনে মনে হৃদয়-দান কোরেছ ? এখন কি আর তোমার মন—তোমার প্রাণ



তোমার নয়? এখন কি সে সকল আমার হলো?”

দেলজান বোলেন, “এমন বিপদে পড়বো, তা কে জানে ভাই, এটি অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। আমি যখন কথায় ধরা পেড়েছি, তখন আর মনের ভাব কি কোরে ঢাকি, আর কি তা ঢাকা যায়? ফলে তা যাই হোক, আমি যে বিষয়ের অহরোধ কোচ্ছি, তার কি বিবেচনা কোলে বল?”

আমি বলিলাম, “দেলজান! রসিনারার উপরোধে পড়ে তুমি যার হয়ে অহরোধ কোচ্চো, আমিও সেই ব্যক্তির কাছে আবদ্ধ আছি, তাঁর কাছে আপনার বাধনে আপনিই বাধা পোড়েছি। উপস্থিত বিষয়ে যে সূত্র ধরে আমার চোলেতে ফিতে হোচ্ছে, সেই সূত্রেই আমি তাঁর কাছে বাধা পোড়েছি। এখন দেখতে পাচ্ছি, আমার নিতান্ত শুভগ্রহ, তাই ওরূপ ঘটনা হয়েছে। একে ত আমার নিজের গরজ, তার উপর আবার তোমার অহরোধ, আমি আরজঞ্জের কেনা গোলাম হয়ে থাকব, আজি অবধি আমি তাঁরই সেবায়—তাঁরই উপাসনায় নিযুক্ত রইলেম। যদি আমার নিজের গরজও না থাকত, তথাচ কি তোমার কথা ঠেলতে পার্তেম, তা কখনই পার্তেম না।”

দেলজান বোলেন, “তুমি যে আমার মান রাখবে না, আমি তা কখনই মনে করি নি। তবে কথা কি, তুমি যদি মনে জানতে, আমি সাধ কোরে কি আপনা হোতেই অহরোধ কোচ্ছি, কেহ মধ্যস্থ হয়ে আমার শিথিয়ে দেয় নি, তবে তুমি আমার কথা ঠেলতে পার্তে না। তা যখন নয়, তখন তুমি আমার কথা না শুন্লেও না শুন্তে পার, তাতে আমি তোমার উপর অভিমান কোন্ডে পারিনে; হিসাবমত তা করাও উচিত নয়। আমি যে লোকের কথা শুনে কি কারো অহরোধে পোড়ে তোমায়. ভুলিয়ে কি কুসুলিয়ে কুপথগামী কোরব, কেন কোরব? বিশেষ গরজ ভিন্ন সেকরূপ প্ররুতি, বিশেষতঃ আমার কখনই হবার নয়। তত বড় বিশেষ গরজ যে কারও কখন হয়, সেটি আমার স্বপ্নের অগোচর

ছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখছি, তত বড় বিশেষ গরজ আমারই হয়েছে; এখন তোমার বিবেচনা তোমার কাছে। তবে হয় আমি তোমার কাছে মিথ্যা গরজ জানাচ্ছি, কি তোমায় প্রবঞ্চনা কোচ্ছি, তুমি যদি এরূপ দেখ, আমার যদি তুমি তেমন অধর্ম্য—তেমন পাপী পাও, তখন নয় আমার কথায় তুমি কর্পাত কোরো না। যাতে তোমার অপযশ হয় কি তোমার নামে কলঙ্ক হয়, তেমন কথা তুমি কেন শুন্বে? জগদীশ্বর করুন, তুমি যেন তত নিরোধ না হও।”

আমার হৃদয়বাসিনী. দেলজানের মুখে ঐ কথা শুনে আমি আর মনোবেগ সংবরণ কোন্ডে পার্তেম না, আমি থাকতে না পেরে উচ্চনাদে বলিলাম, “সরলে! দেলজান! তুমি যখন আমার পরামর্শদাতা, তখন কি আমার ভ্রান্তি হোতে পারে? তখন কেন আমি সুপথ ছেড়ে কুপথে যাব?” এই কথা বোলে রসময়ীর একখানি হাত কোলে টেনে এনে, অনুরাগে মত্ত হয়ে অধর দিয়ে চেপে ধোলেম, হাতখানি মনোরাগের চিহ্নে চিহ্নিত কোলেম। আঃ! সুবতী যখন আমার হবেন, তখন কার সাধ্য কে আমাদের প্রেমসুখের প্রতিবাদী হয়? হায়! সে সময় কবে হবে, সে দিন কত দিনে পাব? এই ভেবে মন তখন কতই ব্যাকুল, প্রাণ তখন কতই আকুল হলো, বোলে উঠতে পারি নে। আমার এমনই জ্ঞান হোতে লাগল, সে দিন যেন এসেছে, সে সময় যেন হাতে পেয়েছি, আমি যেন সেই প্রেমময় স্ত্রধনীকে অবগাহন কোরে শরীর পবিত্র কোচ্ছি, আমি যেন সেই কোমল প্রেমের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে মন-প্রাণ স্ত্রীভল কোচ্ছি। এইরূপ কতক্ষণ প্রেমমদে বিহ্বল থেকে শেষে বোলেম, “দেলজান! আজ তোমায় অত য়ান, অত বিমর্ষ দেখছি কেন?”

প্রমোদিনী দেলজান আক্ষেপ কোরে বোলেন, “হায়! আমি যে দুঃখিত হব, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোচ্চো কেন? আমার যে কত ভাবনা, তা বোলে ফুরাতে পারিনে। আমি নিরুপায় হয়ে বেগমের সঙ্গে চাতুরী কোন্ডে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু রাজবালায় যখন চোখ

খুলে যাবে, তিনি যখন জানতে পারবেন, আমি তাঁর সঙ্গে শর্তা কোরেছি, মনে কর দেখি, তখন আমাদের কি দশা হবে ! তোমার সঙ্গে আর যে কখন দেখাসাক্ষাৎ হবে, সে পথ একবারে বন্ধ হয়ে যাবে ! আমার সেই ভয় বড় হচ্ছে । আমার খুল্লতাত এ কথা শুনে রাগে গরগরে হবেন, আমাদের দুজনের উপরেই ষড়্ভাষ্য হয়ে উঠবেন । তিনি রাগত হোলে আমার আর দাঁড়াবার স্থল থাকবে না, তখন কার দোহাই দিয়ে বাঁচব ? হয় ত খুড়ী রসিনারাও তখন ভাল মুখে আলাপ কোরবেন না । তবে একমাত্র ইউসোফের ভরসা, তিনি যদি বোলে করে পিতৃব্যকে নিরস্ত কোন্তে পারেন, তা হোলে কতক মঙ্গল বটে, ইউসোফ তোমার নিতান্ত মঙ্গলাকাজী ।”

আমি ইউসোফের নাম শুনে বিশ্বয় বোধে চেচিয়ে বোল্লেম, “বটে, সত্যি নাকি ! এমন ! তাঁকে ত পরম শত্রু বোলেই জ্ঞান ছিল !”

দেলজান বোল্লেম, “তবে তুমি তাঁকে চেন না, আমারও যে দশা, তাঁরও নাকি সেই দশা । কি করেন, উড়তে না পেরে তাঁকে পোষ মানতে হয়েছে ! আমার মনে হচ্ছে, তুমি যে পক্ষ আছ, হয় ত তিনিও সেই পক্ষ হবেন, একদিন যুদ্ধস্থলে হয় ত তুমি সেনাপতিতে পদ-স্পর দেখা-সাক্ষাৎও হবে । ইউসোফের অনেক মহৎ-গুণ, অনেক মহৎ স্বভাব আছে, সংগ্রাম-স্থলে আপনি সেগুলি লক্ষ্য কোন্তে পারবেন । তিনি যখন রাজদরবারে কি রাজ-অন্তঃপুরে থাকেন, তাঁকে দেখে বোধ হয়, তিনি সচ্চরিত্রের লোক নন, এ ইউসোফ যেন সে ইউসোফ নন, এ সকল স্থলে আপনার স্বভাবের মত চোলেতে তাঁর সাহস হয় না ।”

আমি বলিলাম, “বল কি ! তুমি যে আমাকে অবাক কোলে ! আচ্ছা, বল দেখি, আমি যে তোমার এখানে যাই আসি, তিনি কি তা জানেন ?”

দেলজান বোল্লেম, “স্পষ্ট জাম্বুন বা নাই জাম্বুন, কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছে । আমার সাক্ষাতে কখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি । বটে, কিন্তু তিনি প্রতি কথায়, প্রতি কাজে

আমাকে সাবধান হয়ে চোলেতে বলেন । শুধু একবার বোলে ক্লান্ত হোলেন যে, তা নয়, সাবধান হয়ে চলবার জন্তে খুব পেড়াপীড়িও করেন । সাদক ! এখানে যে রোজ রোজ যাতায়াত কোচো, তুমি যদি ধরা পড়, তবে দেখ দেখি, লোকে আমাকে কত গল্পনা দেবে, কত লাঞ্ছনা কোরবে, আমার তখন কত কষ্ট হবে, কত জ্বালা পোয়াতে হবে, তা একবার মনে কোরে দেখ দেখি । তাই বলি, দেখো ভাই, রাগ করো না, রাজপুত্রদের ধরাপাকড়া শেষ হয়ে গেলে তুমি আর আমার ঘরে এসো না, তখন এ আসা যাওয়া এককালে রহিত কোরে দিও । আমি তোমার হাতে ধোরে বোলছি, দেখো ভাই, আর যেন এখানে এসো না । তুমি যে এখানে যাতায়াত কর, আমার মনে লয়, আমার খুড়ো তা জানতে পেরেছেন, কিন্তু এখন তিনি জেনেও জানছেন না । তার তাৎপর্য আর কিছুই নয়, তিনি এই মনে কোরেছেন, আমি তোমাকে লইয়ে প্ররতি দিয়ে দারার স্বাপক্ষ কোরব । কিন্তু আমাদের চাতুরী যখন প্রকাশ হয়ে পোড়বে,—পোড়বেই যে তার সন্দেহ নাই,—তখন তিনি তোমায় অগ্নে ছেড়ে দেবেন না, তুমি যখন যেখানে যাবে, তাঁর নির্দয় ক্রোধ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে । হয় ত তোমাকে প্রাণে নষ্ট করবার নিমিত্ত বেগমের সঙ্গে পরামর্শ কোরে জেনানামহলের কোন একটা স্থানে ওং কোরে লুকিয়েও থাকবেন ।”

কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বটে, দেলজান আমাকে চেতনা কোরে দিয়ে ভালই কোল্লেম, এটি তাঁর অন্ডায় কার্য্য হয় নি । আমি তাঁকে প্রতিশ্রুত হয়ে বোল্লেম, “চাকুনত্রে ! তুমি যেক্ষণ উপদেশ দেবে, আমি সেইমত চোলব ।” তার পর আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “ভাল দেলজান ! রাজ-বাড়ী ছাড়া আর কারো সঙ্গে কি তোমার জানাওনা আছে ? সেখানে কি কখন গিয়ে থাক ? না কখন ঘরের বার হও না ?”

“সে দুঃখের কথা আর কেন তোলা ! আমি বড় হতভাগিনী ! আমি যে বিধাতার কাছে কতই অপরাধ কোরেছি, তিনি যে আমার অদৃষ্টে কতই কষ্ট লিখেছেন, তা বোলতে

পারি নে। সংসারের মধ্যে ভদ্রঘরের একটি স্মৃতি, সরলা জীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, সুধু আলাপ কেন, বেশ প্রীতি-প্রণয়ও ছিল। সে আমার স্মৃতির স্মৃতি, আমি তার হৃৎকেন্দ্রের হৃৎকেন্দ্র ছিলাম। আমার এমনি কপাল! সম্ভ্রান্তি সেও আমার স্মৃতি চিরহৃৎকেন্দ্রী হয়েছিল। এখন যে তার ওখানে গিয়ে ছুদিন থেকে মনের ভার দূর কোরব, কি অন্তঃকরণ স্মৃতির কোরব, সে পথ ঘুচে গেছে। আমার বাতাস তারও গায়ে লেগেছে। এক্ষণে হয় ত সে নিরাশ্রয় হয়ে কোথায় চোলে গেছে। কি যদি সহরেই থাকে, হয় ত সে এই মনে কোরেছে, ‘আমার এখন অতি হৃৎকেন্দ্রের সময়, আমি আর কারও সঙ্গে দেখা কোরব না, দেখা কোরে ফল কি? কেবল তার হৃৎকেন্দ্র বাড়ান বই ত নয়! তা না করাই ভাল।’ নিতান্ত নৈরাশ হয়েই সে আমার সঙ্গে দেখা কোচে না। ফলে অনেক দিন থেকে তার আর কোন খবর পাই নে।” কমলাক্ষ দেলজান এই উত্তর করিলেন।

আমি বলিলাম, ‘কে সে ব্যক্তি? তাঁর নাম কি, কোথায় থাকেন তিনি?’

দেলজান বলিলেন, “সে জীলোকটি দুর্ভাগা মুক্তারের স্ত্রী।”

‘মুক্তারের স্ত্রী’ ঐ কথা শুনে আমি অমনি বোলে উঠলুম, “বাঃ! তাঁকে যে আমি বেশ চিনি, তিনি আগরতেই আছেন। তোমাকে যে তিনি আদর কোরে বাড়ীতে রাখেন, এমন অবস্থা তাঁর শীঘ্রই হবে।”

চারুলোচনা দেলজান বোলেন, “সাদক! তুমি সে হৃৎকেন্দ্রী অবীরার এত খবর কোথা থেকে পেলে?”

সেই শোকাহত পরিবারগুলির সহিত বেক্সপে আমার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়, তাদের দুর্বস্থা দেখে আমার অন্তঃকরণে যে প্রকার করুণার সঞ্চার হয়, ততাবৎ দেলজানকে সংক্ষেপে বোল্লাম।

দেলজান তাই শুনে আমাকে সাধুবাদ দিয়ে বোলেন, “সাদক! তুমি অতি মহাশয় ব্যক্তি, তোমার চরিত্রে অতি মহৎ। তুমি কি সেই অনাথা জীলোকটিকে আশ্রয় কোরেছ?”

তুমি তার সাহায্য কোরবে বোলে স্বীকার কোরেছ কি? তা যদি কোরে থাক, তবে জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল কোরবেন, তোমার মানস সফল হবে, সেই করুণাময় অখিলনাথ তোমার মনস্কামনা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরবেন।”

আমি বলিলাম, “আহা দেলজান! আমার মনে কেবল একটিমাত্র বাসনা আছে, সেটি আমার বড় সাধের, বড় আদরের বাসনা। সে বাসনাটি আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা। করুণা-নিধি জগদীশ্বর যদি আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তবে তাঁর এ রূপা আমি কখনই বিস্মৃত হব না। সুবদমে! আমি যে বাসনার প্রসঙ্গ কোল্লাম, আমার দেহ, মন ও প্রাণের সঙ্গে তার জন্ম হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে দিন দিন তার পরিবর্ধনও হচ্ছে।”

দেলজান মন্তক অবনত কোলেন। তাঁর মনের ভাব উৎপল উঠল,—হৃদয়-বাধ ভেঙ্গে তার স্রোত চলিল, বিধুমুখী তা আটকিয়ে রাখতে পারেন না। তাঁর ঐ মনোবেগ সংবরণের নিমিত্ত হাত দুখানি লম্বা কোরে ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চাদ্ধিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। মুক্তারের স্ত্রীর অবস্থা শ্রবণ কোরে শশিমুখীর চক্ষু দিয়ে দরদর কোরে জল পড়তে লাগলো। তাঁকে দয়ায় আঁদ, পরহৃৎকেন্দ্র হৃৎকেন্দ্র হোতে দেখে আমি তাঁর ভাবে একেরারে মোহিত হয়ে গেলাম। কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেল। চারু-হাসিনী দেলজান বেমন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঐ কথা বোলে আমায় সতর্ক কোরবেন, আমি অমনি আছলামে উন্নত হয়ে নির্ভয়ে তাঁর জ্যোতিঃপ্রবাহিনী উজ্জ্বল কপোলে মনোরাগের সহিত চুপন কোল্লাম।

আমি বলিলাম, “কাল রাত্রে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়ে হয় ত সেই আমাদের শেষ দেখাসাক্ষাৎ হবে। দেলজান! আমার মুহূর্ত্ত ভয় হচ্ছে, না জানি, বাদশাহ কতক্ষণে পরোয়ানা পাঠিয়ে দেন। রাজাজ্ঞা পেয়ে আর ত আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না।”

প্রাণময়ী দেলজান ঐ কথা শুনে বোলেন, “আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। কাল রাত্রে আমরা একত্র বোসে কথাবার্তা কর। তবে এখন তুমি

বিদায় হও, নতুবা বেগম কি মনে কোরবেন ? আজ আমাদের এত দেরি হচ্ছে দেখে হয় ত ভাববেন, তাঁর সঙ্গে কোন চাতুরী কোরব, তারই পরামর্শ কোচ্ছি, এ সন্দেহ তিনি কোলেও কোত্তে পারেন। তবে এখন আমি উঠলেম, ভূমি যে কথা স্বীকার কোরেছ, তা যেন মনে থাকে।” বেগমকে শোনাবার নিমিত্ত এই কথা-গুলি দেলজান খুব বড় বড় কোরে বোলেন। তার তাৎপর্য্য এই, আমরা কি বলাবলি কোচ্ছি, তাই শোনাবার নিমিত্ত শাহজাদী যদি আড়ো-আবডালে লুকিয়ে থাকেন, তা হোলে ঐ কথা-গুলি তাঁর কর্ণগোচর হবে।

বেগমের স্বভাব দেলজান বেশ জানতেন বোধ হলো, কেন না, আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজার কাছে তাঁকে দেখতে পেলেম। আমাকে দেখে অপ্রস্তুতের মত হয়ে তিনি বলেন, “রাত অনেক হয়েছে, দুই প্রহর ছাড়িয়ে গেছে, তাই মনে কোলেম, রাত ঢের হয়েছে, এই কথা বোলে তোমায় সাবধান কোরে দিই—তাড়াতাড়ি বার কোরে দেবারও চেষ্টা করি।” ঐ কথা বোলে বেগম আমার সঙ্গে সন্-চোলেন, যেতে যেতে বোলেন, “দেলজান তাঁর অভিপ্রায় তোমায় বোলেছেনই, তার সন্দেহ নাই।” আমি বলিলাম, “হাঁ, তিনি তা বলেছেন। আমি বাদশাহের আদেশ লঙ্ঘন কোরব বটে, কিন্তু দেলজানের কথা নিষ্ফল হবে না।”

বেগম বলিলেন, “সাদক ! সেই কথাই ভাল। কাল রাত্রে আবার ঐ বিষয়ের কথোপ-কথন হবে,—ভূমি ত এ পথ চেনো, দেখে চোলে যাও, তবে এসো গিয়ে, আমি বিদায় হোলেম।” বেগমের গলার স্বরে যেন কিছু সন্দেহ সন্দেহ জ্ঞান হলো, আমার ত ভারি ভয় হলো, বড় দুর্ভাবনাতেই পোড়লেম, বেগম কি লুকিয়ে আমাদের কথোপকথন শুনেছেন ? না আমার ভ্রম হলো,—মনের অগোচর পাপ নাই—আমরা যে প্রবঞ্চনা কোত্তে বোসেছি, সেইটিই কি মনে উদয় হয়ে অসম্ভব কোচ্ছি, বেগম আমাদের সন্দেহ কোরেছেন ? যাই হোক, যে পথ দিয়ে আমার চোলে যেতে বোলেন, সে পথটি দেখে সন্দেহ না জন্মে গেল না,—আমার মনে ভারি

খট্কা হলো। অল্প অল্প দিন যে পথ দিয়ে যেতাম, এ সে পথ নয়। তন্নিম্ন বন্ধাকে ডাকবার নিমিত্ত বেগম যে আজ কুরতালির শব্দ করেন নি, সেটিও আমি লক্ষ্য কোলেম। আজ তিনি স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে বোলেন, “পথ ত তোমার জানাই আছে, তবে এস গিয়ে।” অদৃষ্টের বড় জোর, তাই আমার সে পথ জানা ছিল না। আবার একেবারে চোট-পায়ে চোলে না গিয়ে একটু থেমে থেমে চোল-ছিলেম, সেটিও আমার দোভাগ্য বোলতে হবে। কেন না, গোটা কয়েক ধাপ না পার হোতেই মল্লষ্যের গলার শব্দ শোনা গেল, তারা কখন ফিস্ফিস্, কখন বিড়বিড় কোরে আপনাদের মধ্যে বলাবলি কোচ্ছিল, সেই অস্পষ্ট শব্দটি আমি স্পষ্ট শুনেতে পেলেম। একটু থেমে কি ভাবলেম, গাটা আমার কাঁটা দিয়ে উঠল, অমনি ফিলেম। বেগমের ঘরের অতি নিকটেই অর্ধাং আমার সঙ্গে কোরে যে ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমি ফিরে সেই স্থানে যাচ্ছিলেম, এমন সময় কাঁা কাঁা শব্দ স্পষ্ট অস্ভব কোলেম। বেগমের নিশ্চয়ই জানা ছিল, আজ একটা খুনখারাবণ উপস্থিত হবে। সিঁড়ির উপর কাটাকাটি মারামারি হোচে কি না, তাই শোনাবার নিমিত্তে চুপে চুপে ঘরের দর-জাটি খুলে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কোন দিকে কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে রাজ-বালা পুনরায় দরজাটি বন্ধ কোলেন, তারই শব্দ হলো। আমি এখন বিষম ফাঁকরে পোড়লেম, এগুই কি পেছুই, কিছুই স্থির কোত্তে পায়েম না। আমার নিকটেই যে প্রতারণা ঘাঁটি আগ-লিয়ে আছে, সেটি প্রত্যক্ষ বোধ হো।। এক্ষণে আমার চতুর্দিক বিপদে ঘেরেছে, সে সম্বন্ধে থেকে যে উত্তীর্ণ হব, তার কোন আকার দেখি না। সেই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত স্থানটিতে একটি আলো জ্বলছিল, তার তেলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সুতরাং আলোটি মিড়নিড়ে হয়ে পড়েছে, তাতে কোরে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং আলো অঁধারের দোষে, আমার ধাঁধা লেগে গেল। আমি হুক-কাণা হোলেম, আমার যেন দিক্‌ভুল হোতে লাগল। তবে আমি নাকি রাজপুরীর

মধ্যে অনেকদিনাবধি যাতায়াত কোচ্ছি, পথ ঘাট ভালরূপ জানা ছিল, তাই রক্ষা। আমার হঠাৎ মনে পোড়ল, যেখানে আলোটি মিটমিট্ কোরে জল্ছিল, তার পাশেই বেগমের ঘরের দরজার নিকটেই একটি জানালা আছে, ঐ জানালার বার্দিকে আমথাসের উঠান। ঐ পথটিই এখন আমার পালাবার একমাত্র অবলম্বন; তন্নিম্ন উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না। এখন ভাবতে লাগলেম, জানালার কাছে যাই কেমন কোরে? আমার মনে বেশ সন্দেহ হলো, বেগম এখনও পর্য্যন্ত কপাটের আড়ালে লুকিয়ে আছেন, কোথায় কোন্ গোল হচ্ছে কি না, তাই শুনছেন। জানালার কাছে যেতে গেলেই তাঁর নজরে পোড়ে যাব, তা হোলে আমায় আর ফিরে বাড়ী যেতে হবে না, প্রাণটি এইখানেই যাবে। যাতে বেগমের দৃষ্টিপথে না পড়ি, তার উপায় কি? এতন্নিম্ন ঐ জানলা বারো মাস ত্রিশ দিন বন্ধই থাকে, কিরূপ কোরে তা খুলতে হয়, কোথায় তার আগড়, কোথায় থিল, সে সকল সন্ধান আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি ত ভারি পঁচে পোড়লেম। কেমন কোরে প্রাণটা রক্ষা হবে, কতই ভাবতে লাগলেম। এই ত ব্যাপার, বিপদের একশেষ বোলে হয়। কোথায় কি, কিছুই জানি নে, ঘোর দায় উপস্থিত; আঁধারে ঢিল মারার ভায় সকলই অনিশ্চিত। কিন্তু এত কঠিন ব্যাপারেও, এত সন্দেহের স্থলেও মনে বেশ সাহস হোতে লাগল যে, ঐ জানালা দিয়েই আমি প্রস্থান করবো, ঐ জানালা হোতেই আমি উদ্ধারের পথ কোরে লব। সিঁড়ির নীচে যে সকল খুনে জটলা কোরে বোসে আছে, তাদের হাত থেকে অন্যায়সে পালিয়ে বাঁচতে পারব। তারা যে ছোরা উঁচিয়ে আছে, কায়দায় পেলেই অমনি বুকে বোসিয়ে দেবে, দয়া কোরে ছেড়ে দেবে না, সেটি আমার বিশ্বাস হয়েছিল।

পাঠক! কিঞ্চিৎ কালের জ্ঞান আমায় বিশ্বস্ত হও, আমার নয়নের পুতুল দেলজানের কি দুর্দশা হলো, তাই একবার মনে কর। আমার ত এই দশা হলো, আমার দেলজানের দশা না জানি কি হয়েছে, তিনি এতক্ষণ আছেন কি

নাই, তাই মনে কোরে আমি ব্যাকুল হোলেম। পালাবার প্রতি আর আমার তাদৃশ যত্ন রহিল না। ভাবলেম, আমার প্রাণ যায় যাক, আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানের কোন যক্ষ খবর না শুনতে হয়, তা হোলে আমি মরেও জীবন পেলেম জ্ঞান করব। একবার মনে কোলেম, ফিরে বেগমের কাছে যাই, আমাদের মধ্যে যে সকল কথা হয়েছে, তাঁকে গিয়ে সব বলি, আমি আর দেলজান তাঁর পা দুখানি ধোরো কাঁদাকাটা করি, তাতে যদি দয়া কোরে আমাদের ছেড়ে দেন। এই কথা বোলবো, এখন আমরা আপনার শরণাগত হোলেম, চাই মারুন, চাই রাখুন, আপনার যেমন অভিপ্রায় হয়, করুন। আবার ভাবলেম, বেগমের কাছে কাঁদাকাটা কোরে লাভ কি? দয়া যে একটা কথা আছে, তা তিনি জানেন না। তবে আর তাঁর কাছে যেয়ে ফল কি? কোন ফলই নাই। যে জোন্মে পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর, তার শরীরে যে দয়া হবে, তার চিহ্ন কি? বিশেষতঃ রাজবালা এক্ষণে ক্রোধে ফেটে যাচ্ছেন, আমরা যে তাঁর সঙ্গে ছলনা করবার চেষ্টা পেয়েছি, তাতে কোবেও আমাদের উপর তাঁর বিজাতীয় কোপ জন্মেছে। তা যা হোক, আমার এক রকম কিছু না হয়ে গেলে, দেলজানের প্রতি যে তিনি আক্রোশ প্রকাশ কোরবেন, তা কখনই কোরবেন না। এইরূপ সাত রকম ভেবে চিন্তে সেই অর্দ্ধ-নির্বাক প্রদীপটি হাতে কোরে নিলেম। বেগমের ঘরের দরজা তখন বন্ধ হয়েছে; প্রদীপটি হাতে কোরে লোয়ে আশ্বে আশ্বে পা বাড়িয়ে এক ঝাঁকেই জানালার কাছে গেলেম। যেখানে যত বাঁধন ছিল, খুলেম; হাত তখন ধর ধর কোরে কাঁপচে, কপাট দু'বাল বার-দিকে ঠেলে দিয়ে খুলে ফেলেম। সেই সময় তাজা হাওয়া মুখে এসে লাগতে লাগল, তাতে কোরে শরীরে অনেক বলও পেলেম। বাতাসের জোরে প্রদীপটি নিবে গেল, এখন ঘোর অন্ধকার, এই সময় বেগমের ঘরের দরজার কাঁচ-কোঁচ শব্দ শুনতে পেলেম। তাই শুনে আমার মহাপ্রাণী উড়ে গেল, ভয়ে আড়ট হোতে লাগলেম। কি করি, কি কোন্নে ভাল হয়, এখন আর সে সব

বিবেচনার সময় নাই। আমি অমনি হামাগুড়ি দিয়ে জানালা গোলে বারদিকে ঝুলতে লাগলুম। জানালাটি যেমন ছোট, তেমনই সরু। তার মধ্যে দিয়ে পোলে যেতে অল্প কষ্ট হয়নি। চৌকাঠ ধোরে লহমাকালমাত্র ঝুলে ছিলাম। তার পরেই হাত ছেড়ে দিয়ে ঢিপ কোরে উঠানে গিয়ে পোড়লুম। যেখান থেকে পোড়লুম, সে স্থান বড় উচ্চ নয়, অতি সামান্য উচ্চ বোলেই হয়। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই ফের, পোড়লুম ত একটা বৃহৎ আবড়োখাবড়ো পাথরের উপরেই পোড়লুম। ভারি চোট খেলুম; পাথরের সন্ধিস্থানটি ঘোচকে গেল। স্থানটা ছড়েও গেল। আমি এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে ত্যাগচাতে ত্যাগচাতে উঠান পার হয়ে আপনার ঘরে গেলেম বটে, কিন্তু ভারি কষ্ট হলো। দরজা পর্যন্ত পৌঁছিতে না পৌঁছিতে দেখলেম, সামনের বাড়ীতে কারা আলো লোরে এদিক্ সেদিক্ কোরে ফিচে। যে জানালা দিয়ে আমি প্রস্থান কোরেছি, তার কবট দু'বাল ধড়াস কোরে পোড়ে বন্ধ হলো শুনতে পেলেম। কেহ কাকে জন্ম করবার কি প্রতিফল দেবার আশা কোরে, সে আশা সফল না হোলে সে যেমন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কেউটে সাপের মত ফুলতে থাকে, তার আর দিগবিদিগ্জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ ঘোর প্রচণ্ড ক্রোধবেগে কেহ যেন সেই জানালাটি বন্ধ কোলে, শব্দ শুনে এইরূপ বোধ হলো।

কি বাঁচাই বেঁচে গেলেম, কি পরিত্রাণই হলো! কোন অপরাধ নাই, অথচ একটি রাগোন্মত্ত, ক্রোধাক্ত নারীর কোপে পোড়ে প্রাণটা যাচ্ছিল আর কি! তা ত যা হবার, তা হয়েছে। সম্ভ্রতি আমার এ কি দুর্দশা হলো! বিধাতা আমায় কি বিড়ম্বনায় ফেলেন! চলবার শক্তি নাই, খোঁড়া হয়ে পোড়েছি। না আর রাত্রে পিতার কাছেই যেতে পারব, না কাল প্রাতে অধীশ্বরের সম্মুখে হাজির হোতে পারব। এ বিপদ কেমন কোরে ঘটল, জিজ্ঞাসা কোলে কি বোলেই বা বোঝাব? কোচের উপর গিয়ে শোব তার উদ্ভোগ করি, এমন সময় চেয়ে

দেখি, পেসকবজ নেই। আমি যখন জানালা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ি, সেই সময় বোধ হয়, কোমর থেকে খসে পোড়ে গেছে। তা যদি হয়, তবে কাল প্রাতেই তা পাওয়া যাবে, এইটি মনে কোরে আমি তার জন্ত উৎকণ্ঠিত হোলেম না। এখন দেলজানের অদৃষ্ট মনে হয়ে তাঁর চিন্তা আমার অন্তঃকরণে এসে চেপে বসল, বোধ হলো, কেহ যেন অন্তরে পাথর চাপিয়ে দিলে, এমনি দুর্ভার জ্ঞান হোতে লাগল। আমার ত যা হোক কোনরূপে পরিত্রাণ হলো, দেলজানের নিস্তারের পথ নাই, তিনি আর বেগমের কোপ থেকে বাঁচতে পারবেন না। কুকথা ভুলে দিয়ে দশজনের কাছে তাঁর অধ্যাতিকোরে বেড়াবেন, আমার সঙ্গে যোগ কোরে তাঁর সঙ্গে দাগাবাজি কোরেছে, এই কথা বোলে রাগও প্রকাশ কোরবেন।

আজ আমরা বেপরোয়া হয়ে কথাবার্তা কহিতেছিলাম, সেটি করা ভাল হয় নি। নিতান্তই পাগলামী প্রকাশ করা হয়েছে। রাজপুরীর প্রাচীরগুলিরও কান আছে, বিশেষতঃ আমাদের চারিদিকে শত্রু বেড়ে আছে, চারিদিকে চরু ফিরে বেড়াচ্ছে, এ সকল জেনেও আমরা সাবধান হইনি, কেউ যে শুনবে, সে তবু না কোরে নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়, কথাবার্তা কহিতে-ছিলাম, আমার বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শিকা সেই বৃদ্ধার দশা কি হলো! সে কোথায় গেল? তারে কেন সেখান থেকে তক্ষণ কোলে? আমরা যে তাঁর সঙ্গে চাতুরী কোরেছি, রাজবালা তা কি কোরে জানতে পালেন? কে তাঁর চোক ফুটিয়ে দিলে? আমি যে অসম সাহস কোরে রাজপুরীর মধ্যে যাতায়াত কোলেম, তারি বা কি ফল হলো? মনে মনে এই সকল আন্দোলন কোরে মহা অস্থখী হলেম, বাকী রাতটুকু কেবল বোসে কাটালেম। একে ত ঐ চিন্তা, তার উপর আবার আহত পায়ের অসহ্য যাতনা, এই দুই কারণে স্পষ্ট জ্বর উপস্থিত হলো, তার এত তেজ যে, চিকিৎসা ভিন্ন শান্তিলাভ কোন্ডে পালেম না।

বাকী যে কয়েক ঘণ্টা রাত ছিল, এমনি বিরক্ত বোধ হলো, বিবেচনা কোলেম, আর বৃদ্ধি

প্রভাত হবে না। অবশেষে যুদ্ধ যুদ্ধ আলোর অম্পষ্ট রেখা জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখা যেতে লাগল। আমি অমনি উঠে বোস্লেম, সলিমানকে ডাকবার উদ্যোগ কোল্লেম। কিন্তু চেয়ে দেখি যে, আমার পা বে-আড়া ফুলে পোড়েছে, বেদনাও এত হয়েছে, আমি ছুপা চোলে গিয়ে যে সলিমানকে ডাকব, সে ক্ষমতা ছিল না, তারে ডাকা হলো না। আমি এখন নিরুপায় হয়ে পোড়লেম; ভাবলেম, সলিমান যে সময় এসে থাকে, সে সেই সময় আসবে, তাই ভেবে কৌচের উপর পোড়ে রইলেম।

বেলা ক্রমে বেড়ে গেল, রৌদ্রের তেজ দেখে বোধ হলো, আমার উঠবার সময় অনেক ক্ষণ অতীত হয়েছে, কিন্তু সলিমান এখনও এলো না। বিবেচনা কোল্লেম বেটা আজ ভারি শূন্য। বেলা ক্রমে অধিক হলো, ঘরের মধ্যে রৌদ্রের তেজ অগ্নির তায় বোধ হোতে লাগল, তখাচ সলিমানের সঙ্গে দেখা নাই। আমার সন্দেহ হলো, মনে কোল্লেম, অবশ্যই তার মৃত্যু হয়েছে, নচেৎ এখনও আসছে না কেন? আবার ভাবলেম, ভাল, সেই যেন মরেছে, আমার চোপদার, জমাদার, হরকরা, ধাউড়ে, তারা সব কোথায়? তারাই বা আসছে না কেন? আর কোন কারণ না হোক, আমার কি হলো, আমি আছি কি মরেছি, একবার ত এসে তাদের দেখে যাওয়াও উচিত। কৈ, কেউ কোথাও নাই যে! সূর্য্যদেবের পর অন্যান্য দু'ঘণ্টা পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, কি করি, কৌচের উপর পড়েই আছি। তারি জ্বর, তারি দাহ, গায়ের আঙুনে সিঁদ্র হোচ্ছি, গাত্রদাহে অস্থির হয়ে এ পাশ ও পাশ কোচ্ছি, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্চিনে। বেদনার যাতনায় এক একবার চীৎকার কোরে উঠছি; না কেউ খবর করে, না কেউ একবার উঁকি মেরে দেখে। কতক্ষণের পর ধূর্ত সলিমান এসে দর্শন দিলে, সে যেমন দরজাটি ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোর্বে, আমি অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বোস্লেম, মনে যত রাগ ছিল, তার উপর ঝাড়তে আরম্ভ কোল্লেম, বে-আড়া গালু দিতে লাগ্লেম। সলি-

মান পুরাতন পাপী, বলকালাবধি রাজবাটীর ভৃত্য, রাজারাজড়াদিগের সংসর্গে বাস কোরে তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ভালরূপ অবগত আছে। সে বিষয়ে সলিমান একজন প্রকৃত ওস্তাদ। সে অধোবদনে, নীরব হয়ে, একমন একচিত্তে, আমার ক্রোধবাক্যগুলি সমুদায় শুন্লে, না রাম না গঙ্গা, কোন কথাই কইলে না। আমি যখন ক্ষান্ত হোলেম, সলিমান আফ্লাদে আফালন কোরে উঠে দাঁড়াল। যে সকল ধূর্ত ফকীর লোক ঠোকিয়ে বেড়ায়, ভণ্ডামী কোরে কোরে যাদের হাড় পেকে গেছে অথবা প্রবঞ্চনা করা যাদের সিদ্ধবিজ্ঞা, সলিমান তাদের তায় ভণ্ডী কোরে, দেবচক্ষুর তায় ছুই চোক আকাশে তুলে, উর্দ্ধবাহর মত হাত দুখানি উপরে উঠিয়ে চীৎকার-শব্দে বোলে, “হে জগদীশ্বর! তুমিই ধৃত, তোমার মহিমা বাড়ুক।”

আমি রেগে লাল হয়ে বোল্লেম, “তোরে এ ভাঁড়ামি কোত্তে কে বোলে? তুই এখন চুপ কোরে থাক! বজ্জাৎ বেটা, তোর আজ আস্তে এত দেরি হয়েছে কেন, এ কথাও জবাব কর।”

“ধর্ম্মবতার! আপনার সঙ্গে পুনর্বার আমার সাক্ষাৎ হবে, এ যদি আমি স্বপ্নেও জান্তেম, তবে এখন কি, তিন ঘণ্টা পূর্বে এসে হাজির হোতেম।” সলিমান এই উত্তর কোলে।

আমি বলিলাম, “বেটা! কি বলি? পুনরায় সাক্ষাৎ! কেন? ও কথা কেন বলি? আমার খুলে বল।”

“হজুর! কাল রাত্রে শুন্লেম, আমায় কেউ বোলে, আপনি অতি নির্দয়রূপে খুন হয়েছেন।”

আমি ঐ কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বোল্লেম, বটে! সত্যি নাকি, তোরে এ কথা কে বলে? না যা মনে এলো, তাই বলি? বিলম্ব হয়েছে বোলে, তাই একটা মিথ্যা ওজর কোরে দোষ কাটাচ্চিস্ বুঝি? তুই বেটা ভারি হারামজাদা!

“না, না, ধর্ম্মবতার! তা নয়, মিথ্যা কেন হবে? আর কি কোন ওজর ছিল না, এমন ওজর কেন কোন্সব? কাল তামাম রাত কেবল কঁদে পুইয়েছি। আমায় বোলে, আপনার নিশ্চয়ই



মৃত্যু হয়েছে। যার মুখে শুনলেম, সে যে মিথ্যা বলবে, তা কখনই নয়, আমি তার কথার প্রতি বৃহত্তরকালও সন্দেহ কোতে পারিনে।”

আমি বলিলাম “কে তোরে এ কথা বোলে? কে সে ব্যক্তি বল?”

“ধর্মাবতার! আমি একটি আত্মীয়ের বাড়ী হয়ে ফিরে ঘরে যাচ্ছি, পথে জীনার সঙ্গে দেখা, জীনাকে আপনি বেশ জানেন, আপনার সান্নেই এই অন্তর-মহলে সে থাকে।”

“হাঁ,” এই শব্দ কোরে বোলেম, “সলিমান! সে তত রাত্রে ও গলীতে কেন গিয়েছিল?”

সলিমান বলিল, “সে বড় দুঃখের কথা, অনেক কথার কথা সে। বেগম তাকে যত পেরেছেন, যথেষ্ট তাঁর যত এসেছে। গালাগালি কোরেছেন, শেষে তাকে ঘেরে বেদম কোরে বাড়ী থেকে বার কোরে দিয়েছেন। অপরাধের মধ্যে এই সে টাকা খেয়ে আপনাকে সঙ্গে কোরে রসিনারার ঘরে লয়ে গিয়েছিল। সে এই কথা বলে, আপনি নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন। কারণ, বেগম দুজন খোজাকে সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে থাকতে বোলে, আপনি যেমন নেমে যাবেন, অমনি যেন বুকে ছোঁা বোসিয়ে দেয়। জীনা বোলে, সে এ কথা স্বকর্ণে শুনেছে। তার পর এ কথাও বোলে, তাঁর আর বাচবার কোন উপায় নাই। ঐ সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে যেতেই হবে। বিশেষতঃ তিনি ত জানেন না যে বেগম তলে তলে এত কাণ্ড কোরেছে, সুতরাং তাঁর আর কোনমতেই রক্ষা নাই। কি যদি তিনি জানতেও পাতেন যে, বেগম এই কারখানা কোরেছে, তা হলেও তাঁর নিস্তার ছিল না কেন না, আর ত পথ নেই যে পালাবেন। তন্নিমিত্ত ঐ স্থবরা আরও বোলে, ‘তোমার যুনিব ও দেলজান বড় অসাবধানী। তাঁরা বেহুঁস, বেখবর হয়ে বড় বড় কোরে কথা কচ্ছিলেন, বেগম তা শুনে পেয়েছেন। তার প্রমাণ এই। তাঁরা কেবল গিয়ে বসেছেন, কথাবার্তাও চলেচে, এমন সময় বেগম রায় বাহিনীর মত ফুলতে ফুলতে খেয়ে আমার কাছে এসেছে। বেগমের আক্ষান, তাঁর হাত নাড়া, তাঁর চোক-মুখ ঘুরণী দেখে আমি

তখনই বুকেছি, কাজ পেকে উঠেছে। আমি তখন বোসে আছি, আমার ঠাণ্ড তগব হবে, তাই ভাবছি। সাহায্য এসেই বাবু বাবু কোরে ডাকলেন, খোজা এসে হাজির হলো, তারে বললেন, মারু বেটীকে, আচ্ছা কোরে চাবু-কিয়ে দে। বাবু খোজা যত পালে, আমার নির্দয় মাল্লো; হাতে, মুখে, চোকে সেখানে পেলো, পটাপট্ চাবুকাতে লাগল। বেগম সামনে দাঁড়িয়ে। আমি কত কঁদে-কোকিয়ে তাঁর পায়ে ধোলেম, তিনি তা ক্রক্ষেপও কোলেন না। তাঁর মুখে অল্প কথা ছিল না, কেবল বিশ্বাসঘাতিনী বিশ্বাসঘাতিনী কোচ্ছিলেন। তাঁর ভগ্নী রশিনারার ঘরে সাদককে লয়ে গিয়েছিলেম, সেই জন্তে আমি তাঁর কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছি। আচ্ছা কোরে ঘেরে খেঁতলিয়ে শেষে হুকুম কোলেন ‘বেটীকে গলাধাক দিতে দিতে বার কোরে দে, গলীপথে ছেড়ে দিয়ে আয়।’ আমার যখন বার কোরে দেয়, আমি শুনলেম, বেগম বাবু খোজাকে এই হুকুম কোলেন, ‘তোরা তাইকে ডেকে আন, খবরদার, দেরি না হয়, তাকে শীঘ্র ডেকে আন। বেইমান বজ্জাৎ সাদকের নিমিত্ত তোরা ছোরা লোয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক, সে যেমন নেমে যাবে, ঐ ছোরা অমনি তার বুকে বোসিয়ে দিবি, সে যেন প্রাণ লোয়ে ঘরে ফিরে না যেতে পারে। খবরদার, দেখিস, আমি এই হুকুম কোচ্ছি মনে থাকে যেন।’ জীনা এই কথা বোলে, ‘সলিমান! তুমি নিশ্চয় জেনো, সাদক নাই, তিনি এতক্ষণ মৃতের দলে মিশে গেছেন। হতভাগিনী জীনার দুরবস্থা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হোতে লাগল, আমি তাকে সঙ্গে কোরে সেই রাত্রে স্ত্রীর কাছে লোয়ে, তার হাতে হাতে সমর্পণ কোলেম। আমার স্ত্রী বড় মায়াশীলা, সে ঐ রাত্রে নানা প্রকার সেবাসুস্রসা কোস্তে লাগল, আমি ঘরে গিয়ে শয়ন কোলেম। আমার শরীরটা বড় স্বচ্ছন্দ ছিল না, ভারি ক্লান্ত হয়েছিলেম। শয়ন কোলেম বটে, কিন্তু নিদ্রা করে বলে, তার নামও একবার মনে উদয় হলো না। ধর্মাবতার! আমি কেবল আপনার অকাল-মৃত্যুর বিষয় ভাবতে লাগলেম।



প্রাণটা থেকে থেকে কঁদে কঁদে উঠতে লাগল। আফ্রিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যা উঠে এদিকে ওদিকে কোরে বেড়াচ্ছি, মনে কিছুই ভাল লাগছে না, বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে উপস্থিত হোলেন, কেন যে এদিকে এলেন, তা বোলতে পারিনে। কিন্তু ছজুর! আপনাকে যথার্থই বোলছি, আমার মনে বড় বিষয় জন্মেছে, কিন্তু তেমনই আবার খুসী হয়েছি, আপনি অতি আশ্চর্য্য বাঁচা বেঁচেছেন, জগদীশ্বর আপনাকে স্বয়ং রক্ষা কোরেছেন। তাঁর অপার করুণা মনে কোরে আমার অন্তঃকরণ তাঁর ভাবে মগ্ন হচ্ছে, আমি আল্লার নামে আর একটিবার সাধুবাদ দেই, আমি তা না দিয়ে ক্ষান্ত হোতে পারিচিনে, আল্লা! তুমি সত্য। তুমি ধন্য! তোমার কুদ্রত বাড়ুক। তোমার কেরদানি সকলে জানুক।” এই বোলে সলিমান পুনরায় চীৎকার কোরে উঠল।

সলিমান এত উল্লাস প্রকাশ কোতে লাগল, তা দেখে আমি আর তার উপর রাগত কি বিরক্ত হোতে পারেন না। গত রাত্রে যা যা ঘটেছিল, সলিমানকে অল্পের মধ্যে সে সকল বৃত্তান্ত বোলে, বোলে “তুই এখনি ছোরাখানা তল্লাস কোরে নিয়ে আয়, যা দেখবে যেখান থেকে আমি লাফিয়ে পোড়েছিলাম, হয় ত সেই জানালার নীচে উঠানে পোড়ে আছে।” সলিমান ঐ কথা শুনে চলে গেল। কিন্তু আবার তখনই ফিরে এসে আমার বোলে, “অনেক তল্লাস কোলেম, কিন্তু পাওয়া গেল না, আমার পরিশ্রমই বুঝা হলো।” আমি আর সে বিষয়ের কোন উচ্চবাচ্য না কোরে, তারে বোলেম, “তুই শীঘ্র একজন হাকিম ডেকে আন, আমার পায়ের বেদনা বড় বেড়েছে, অসহ্য হয়েছে। আমি আর যত্ননা বরদাশ্ত কোতে পারিচিনে; জরও ক্রমিক বৃদ্ধি হচ্ছে, তুই শীঘ্র যা, হাকিম থামুসাকে ডেকে নিয়ে আয়।” সলিমান তখন ঘরের বাহু হোতে পারে নি, আবার তাকে ডেকে বোলেম, “লেখবার সরঞ্জাম এনে দে, আর একজন হরকরা যেন দরজায় খাড়া থাকে, যখন যে দরকার হবে, সে তার আঞ্জাম কোরবে।” বত সংক্ষেপে পারেন, পিতাকে এই বর্ণনা লিখে জানালেম,

হঠাৎ একটা দৈব ব্যাঘাত ঘটতে গত রাত্রে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে পারি নাই, আপাততঃ জ্বর ও বেদনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি, চিকিৎসা ভিন্ন আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমথাসে হাজির হতে পারেন না, আমার হয়ে বাদশাহের নিকট অনুগ্রহ কোরে মাপ চাইবেন।” এই কটি কথা লিখে পত্র সমাপ্ত কোলেম। পত্রখানি রওনা কোরে দিয়ে সলিমান হাকিম থামুসাকে সঙ্গে কোরে কতকণে ফিরে আসবে, এখন বোসে বোসে তাই ভাবতে লাগ্লেম, বাস্তব হোতে লাগ্লেম। হাকিম থামুসা চিকিৎসাবিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত, তাঁর হাতে আমি সত্তর আরোগ্য হব, সে প্রত্যাশা বেশ ছিল।

একটু পরে হাকিম উপস্থিত হোলেন, পায়ের সন্ধিস্থলটি ( গুলফ ) বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখলেন, দেখে বোলেন, “পায়ের অবস্থা অতি ভয়ানক, অনান দেড় মাস বিছানায় পোড়ে থাকতে হবে, যার পর নাই অতি সাবধানে, অতি সতর্পণে সেবাশুশ্রূষা করা আবশ্যক।” ঐ কথা বোলে আবার বোলেন, “ভয় নাই, আপনি নিঃসন্দেহ আরোগ্য হবেন। প্রতীকারের কথা শুনে আমার অনেক সাহস হলো। কিন্তু আমার জ্বর দেখে হাকিমের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বোলেন, আমার এ জ্বর, পায়ের অপেক্ষা আরও ভয়ানক। জিহ্বার অবস্থা, নাড়ীর বেগ দেখে পূর্বেই স্থির কোলেম, আমায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হয়ে রোগভোগ কোতে হবে।” কি ভয়ঙ্করটেই পোড়্লেম—এখন আমার উপর দৃষ্টি, বাদশাহ আমার মুখ চেয়ে আছেন, আমার সাহায্য তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, আমার শুভ্রত যত্নের উপর পিতার জীবন অবলম্বন কোচে, এমন গুরুতর সময়ে হাকিমের ঐ কথাগুলি কদাচস্থময় হবার নহে। বরং তা শুনে অন্তঃকরণে কত প্রকার চূর্তাবনা উপস্থিত হোতে লাগল, তাতে কোরে আমার রোগের দমন হওয়া দূরে থাক, বরং বৃদ্ধি হবারই সম্ভাবনা হলো।

হাকিম থামুসা প্রতিশ্রুত হয়ে বোলেন, “আমার ভয়ানক অবস্থার বিষয় মোগলরাজকে জানান

করবেন, তা হোলে আর কোন চিন্তা নাই,সেটি সপ্রমাণ হবে। আরো বোলেন, আমার যাতে সস্তর আরোগ্যলাভ হয়, তার জন্তে তিনি বিজ্ঞা-বুদ্ধি কি ষড়ের ক্রটি করবেন না, কিন্তু তাঁর ও কথায় আমি তুষ্ট হোলো না, আমার চক্ষের উপর যে অনর্থপাতের সম্ভাবনা হয়ে আছে, তাই স্বরণ কোরে ভারি উদ্বেগ হোতে লাগলোম।

আমার একটু ঘুম, স্পষ্ট ঘুম নয়,তন্দ্রার ভ্রায় গোলমেলে রকম একটু নিজার আবেশ হয়ে-ছিল, তাতে কোরে শরীরে কতক আরামও পেয়েছিলোম, এমন সময় ধড়াস কোরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল, সেই গোলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি,পিতা দাঁড়িয়ে, কতক আশাতঙ্গ হবার হতাশে কতক বা দ্বৈকসেক হয়ে, মুখখানি আঁধার কোরে আছেন। পিতাকে অতিশয় বিস্ময় দেখলোম। মহা উৎ-কর্ষিত হয়ে পালঙ্কের এক পাশে এসে বোসলেন আমার পানে চেয়ে বোলেন,“সাদক! এ সকল কি কারণনা? কেন তুমি আপনার কর্মে ঐশাস্ত্র কোলে? কি ভাব তোমার? রে অকৃতজ্ঞ বালক! ওঠ, আলস্ত ঝেড়ে ফেল,আমি যা বলি, তা শোন্।” আমি ওঠবার চেষ্টা কোলোম, কিন্তু পালোম না। উঠতে গিয়ে বোধ হলো,সমস্ত সংসার যেন কৌস কৌস শব্দ কোরে আমার চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। কত আলাং পালাং বোক্তে লাগলোম; দুই চোক কটুমট কোরে পিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলোম, মুখে াবল থেকে থেকে ‘দেলজান দেলজান’ কোচ্ছিলোম। উম্মাদের ভ্রায় বলবান্ হয়ে পিতার একখান হাত জাপ্টে ধোলোম। জ্বরের যাতনায় কখন চীৎকার কোচ্ছি, কখন বা বিড়বিড় কোরে কত বিহ্বলের কথা বলছি, আর নিরবচ্ছিন্ন ছট্ফট্ কোচ্ছি। এই সকল বিভীষিকা দেখাচ্ছি, এমন সময় হাকিম এসে উপস্থিত। তিনি আফিম ব্যবস্থা কোলেন, তাতে কোরে আমি অনেক স্থস্থিরহোলোম। একটু পরেই গাঢ় নিজায় অচেতন হয়ে পড়লোম, কিন্তু বেদনার যাতনায় তখনি আবার চেতনা হলো। নিজা হলো বটে, কিন্তু তৃপ্তি কি

স্বাস্থ্যি বোধ হলো না। ঘুম ভেঙে দেখি,আমি একলা আছি, পিতা চোলে গেছেন। তাঁর মনে অবশ্যই বিশ্বাস হয়ে থাকবে যে, আমি যথার্থই পীড়িত, তাই তিনি হাকিমের হস্তে আমার সমর্পণ কোরে বাড়ী চোলে গেছেন। হাকিম আমার জর খাট করবার জন্তে দিন-রাত উঠে-পড়ে লাগলেন, সময় অসময় বিবেচনা ছিল না, যখন দরকার হয়েছে, তখনি এসে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা কোরেছেন, কোন রকমে কোন বিষয়ের ক্রটি করেন নি।

## বর্ষ পরিচ্ছেদ ।

“প্রণয় কি জোরের কাজ?”

ঐ দুর্ঘটনার তৃতীয় দিবসে, জ্বরের তেজ অনেক লাঘব হয়ে এলো। পিতা আমার দেখে যাবার পর সবে আজ আমি একটু উপ-শম পেয়ে সহজ মাতনের মত কথাবার্তা কহিতে পাচ্ছি। এর পূর্বে আমার জ্ঞান-চৈতন্ত্যও ছিল না,শরীরের শ্রানিও যায় নি। হাকিমের চিকিৎ-সার প্রভাবে পায়ের ফুলোও অনেক কোমে এসেছে, বেদনারও অনেক প্রতীকার হয়েছে। প্রতীকারও হয়েও তবু আমি এত দুর্বল, হাত একখানি উঠিয়ে যে মুখের কাছে লোয়ে যাব,সে ক্ষমতা ছিল না। হাকিমের আসা যাওয়া কি সেবাশ্রুতির জন্ত লোকজনের প্রয়োজন; সে সকল যেমন, তেমনই ছিল, প্রতিনিয়ত এক ভাবেই চোলতে লাগল।

সলিমান মনে মনে আমার যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা কস্তো, সেটি এইবার প্রকাশ পেলে। আমার ফেলে সে তিলার্দ্রও কোথাও যেতো না। পালঙ্কের এক পাশে বোসেই আছে, কখন গায় হাত বুলুচ্ছে, কখন বাতাস কোছে, কখন পা দাব্বে, তাতে তার বিরক্তি ছিল না। তবে আমার যখন একটু ঘুমের আবেশ হতো,সে সেই অবকাশে একটু এ দিক্ সে দিক্ ফিরে ঘুরে আসত, কি তখন খেতে যেতো, কি হাত পা

যুতে যেতো, নচেৎ এক পাও নড়ত না। যে দিন আমার একটু জ্ঞানের উদ্বেক হলো, ঐ দিন প্রাতে একখানি চিঠি এসেছিল, প্রভু-বৎসল সলিমান সে চিঠিও দেখায় নি, মখেও সে কথা আমায় জানায় নি। তার মনে এই ভয় হলো, কি জানি, পবের মর্শ্বাবগত হয়ে পাছে উৎকর্ষিত হই, তা হোলে ত আরো-গোর পক্ষে ভারি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এই ভেবে সে পত্রখানি দেবে রেখেছিল। এখন আমি একটু সবল হয়েছি। তাই দেখে সলিমান সেই চিঠিখানি এনে আমার হাতের উপর ধোরে দিলে। পত্রখানি খুলে পড়ে দেখি, অন্ত কোন বিষয় নয়, ইয়ার মহম্মদ যে পূর্বে অঙ্গীকার করেছিল, তাই সে কতকগুলি কবিতা রচনা কোরে পাঠিয়েছে। আমি পূর্বা-পেক্ষা অনেক স্তম্ভ হয়েছি বটে, কিন্তু এখনও খুব ক্ষীণ, খুব দুর্বল আছি, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট কোস্তে পারিনে, বিরক্তি বোধ হয়। একটু যদি পড়ি কি যদি উপরোপরি দুটো কথা কই, অমনি অন্ধকার দেখি, মাথা ঘেন বুঁদে পড়ে। এ অবস্থায় আমি যে কবিরিগের অদ্ভুত কল্পনায় তার ভরদেব মর্শ্বাবগত হই, আমার সে সাধ্য ছিল না, ততদূর বলাধাম এখনও হয়নি। আমি পত্রখানি হাতে কোরে লয়ে, একবার একটু তাতে চোক বুলিয়ে যেমন এক পাশে ফেলে রাখব, এমন সময় চেয়ে দেখি, কবিতাগুলির সব শেষে কয়েক পংক্তি গড়ে লেখা রয়েছে। সে লেখা এই,—

“আপনার মনের বাসনানুরূপ গোলাবের অঙ্কুর উত্তপ্ত টবে থেকে, তার কান্তি দিন দিন মলিন হচ্ছিল, এক্ষণে আমাদের সম্ভাব্য উদ্ভানে স্থানান্তর হইবার, পর সে পুনরায় নবীন তেজ, নবীন মূর্তি ধারণ কোরেছে।” বালক কোন্ বিষয় লক্ষ্য কোরে কথাগুলি লিখেছে? দেল-জানের আর একটি নাম গোলাব, গোলাব কি মুক্তার খাঁর স্ত্রীর গৃহে অবস্থিতি কোচেন? বালক কি সেই আভাস দিয়ে লিখেছে? তাই হবে, বরকন্দাজ খাঁর কুৎসিত অন্তঃপুর উত্তপ্ত টবের সঙ্গে, আর তার মাতার গৃহ সম্ভাব্যরূপ উদ্ভানের সহিত তুলনা দিয়েছে। আমার এই

অল্পমান ঠিক হইল কি না, তাই জান্বার নিমিত্ত সলিমানকে ভণনি পাঠালেম। তাকে বিশেষরূপে সতর্ক কোরে দিলেম, সে যেন সহসা অবীরার অন্তঃপুরে প্রবেশ না করে, বরং তাকে বোলে দিলেম যে, জ্ঞানার দ্বারা সন্ধান জেনে আমায় এসে বলে। এই কথা বলে তাকে কেবল বিদায় কোরে দিয়েছি, সে তখন ঘরের বার হয়েছিল কি না সন্দেহ, এমন সময় পিতা এসে উপস্থিত।

বাবা বলিলেন, “সাদক! তুমি পীড়িত হয়েছ স্বার্থ, তা মা বোল্তে পারিনে, কিন্তু তোমার উপর আমাদের কত আশা ভরসা রয়েছে তা জেনেও তুমি তোমার জীবনের প্রতি যত্ন কর নি, এ এ কটি মহা পাপ বল্তে হবে। বিশেষতঃ গুরুলোকের কথা অবহে— কোলে, অনেক কষ্ট পেতে হয়, অসংকর্ণের বিপরীত ফল ধরাই আছে, সেই পাপেই তোমার এত শ্রান্তি হলো। তা ভালই হয়েছে, যেমন কর্তব্য, তার মত ফল হাতে হাতে পেলে। আমরা তোমার মানসমুহুর কোলেম, লেখাপড়া শেখালেম, বড় পায়ার চাকুরী দিয়ে দিলেম, তার কি এই দক্ষিণে? আমাদের একটা কথাও রক্ষা কোলে না—এই কি তোমার ধর্ম? আমি কি পূর্বে তোমায় সাব-ধান কোরে দিই নি, না তোমায় নিষেধ করিনি? আমি যে তোমায় কতবার বারণ কোরে দিয়েছি যে, সামনের স্ত্রীলোকদের কোন কথায় তুমি থেকো না, তাদের ছায়াও মাড়িও না; তথাচ সে কথা তুমি শুনলে না, এ দুর্বুদ্ধি তোমার কেন হলো? আপনায় দোষ কেউ দেখতে পায় না, তোমার অপরাধ কি?”

আমি বলিলাম, “কি জা—লা! তবে কি সর্বত্র জ্ঞানাজানি হয়ে গেছে? আমার সম্বন্ধে যা যা ঘটেছে, সে সকল কি প্রকাশ হয়ে পড়েছে? কে তা এর মধ্যে ঢোল মেরে দিলে?”

পিতা বলিলেন, “তা কি কারও জ্ঞানতে আর বাকী আছে? হাটের দ্বারে কবাট কি! বরকন্দাজ খাঁ বেগমের সহায় পেয়ে বাদশাহের নিকট সরাসর এই দরখাস্ত কোরেছে যে, খুন করবার অভিপ্রায়ে তুমি তার অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ কোরেছ, সত্যি মিথ্যা

এই দেখুন, আমরা তার ছোরা কেড়ে রেখেছি। হয় সিঁড়ির উপর, নয় জীলোকেরা যেখানে বসে, তারি কোন স্থানে ঐ ছোরা পোড়েছিল, তারা তা কুড়িয়ে পেয়েছে।”

আমি বলিলাম, “বগম হদমুদ পাজী, বেটা বজ্ঞাতের একশেষ। কেবল আকারটি তার মানুষের মত, নচেৎ সে একটি ডাকিনী! ভাইনী সে! সেই ত আমার কুসুলিয়ে নিয়ে যায়। আমি ত আগে যেনেই চাই নি, বেগমই ত আমার মজাঙ্গে, সে আপনিই লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। আপনি বা শুনেছেন, সে সকলি মিথ্যা, বেগমও তা মনে মনে বেশ জানে। “এই কথা কয়ে যা যা ঘটেছিল, বাবাকে সব বোলেম, শেষে জিজ্ঞাসা কোলেম, “বাবা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এক্ষণে উপায় কি? আপনার যুক্তিতে বা ভাল হয় বলুন।”

বাবা বলিলেন, “তোমার মুখে যা শুনলেম, সেইটিই ঘটেছে সত্য, আমারও মনে তা হচ্ছে। কিন্তু বেগম তোমার কঁাসাবার নিমিত্ত, তার মছার কৌশল জালে তোমার চারিদিক বেড় দিয়েছে, তুমি কি এখনও তা জানতে পারো নি? বেগমই যে নষ্টের গোড়া, তারই কথাক্রমে তুমি যে অন্তরে গেছিলে, এ কথা কিন্তু বাদশাহের কাছে বলতে তোমার সাহস হবে না, বেগমও তা মনে মনে বেশ জেনেছে, তাই ঐ রাজ-বাগারই দমে পড়ে তুমি যে বাদশাহের হুকুম অমান্য কোত্তে চেয়েছিলে, সে কথাও স্বীকার কোত্তে তোমার ভরসা হবে না, তাও বেগম বেশ বুঝেছে। ভিতরে ভিতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে, সেগুলি ভেঙ্গে না বোলে তোমারে যে তারা সেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে, সে কথা লোকে বিশ্বাস কোরবে কেন? তুমি পীড়িত আছ ব’লে যুগয়া-কৌতুকের দিন পেছিয়ে গেছে, নচেৎ গত পরশু হবার কথা ছিল। হলে তার আয়োজনের কতই ধুম পড়ে যেত। এ আন, তা কর, একে ডাক, তাকে পাঠাও, আন, নে, দে, এতেই বাস্তব থাকতে হত। জান ত, বাদশাহ আমাদের চিরকালই ব্যস্তবাগীশ—আন বসে, টান সয় না। তোমার উপর, তিনি তারি নারাজ হয়েছেন। তোমার কাজের

চিন্তেমি দেখে মনে মনে চটে গেছেন। দিন নেই, রাত নেই, দেখা হলেই কেবল তোমারি নিন্দা মন্দ করেন, আমায় বিরক্ত কোরে যারেন। আজ তুমি এ কোলে, কাল তা কোলে। আজ ও হল না, কাল তা হ’ না, এইরূপ নিত্যই একটা না একটা তোমার মানির কথা উপস্থিত কোরে আমায় দেকশেক করেন। রাজপুত্রদের হস্তে পরিত্রাণ পাবার নিমিত্ত তিনি যে কৌশল কোরেছেন, তাতে না কি তোমার সহায়তা বড় দরকার কোচ্ছে, তুমি না হলে সেটি নাকি নিকাহ হতে পারে না, তাই তুমি বেঁচে যাচ্ছ, নচেৎ তোমার যে আচরণ, এত দিনে তুমি ভালরূপ প্রতিফল পেতে, বাদশাহ তোমায় আছা আক্কেল দিয়ে দিতেন, দিতেনই দিতেন, তার সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ তুমি রাজাস্তঃপুরের পবিত্রতার অনাদার কোরেছ। বেগম ঐ কথা নিয়ে বাদশাহকে তেজ-বিরক্ত কোরে মাছেন, তাঁরে যেন ছিঁড়ে পাচ্ছেন। ও দিকে বরকন্দাজ খাঁ গিয়ে জানাচ্ছে, তার প্রতি যেন অবিচার না হয়। এই ত তোমার অবস্থা। এক্ষণে তোমারে দূর কোরে দিয়ে ঐ কর্ণে অপর কেউ বাহাল না হয়, বাদশাহকে সেই অভিশ্রাব হতে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত আমার কাল খাম ছুটে যাচ্ছে। যোগলরাজের জান ত কোন ব্যক্তি ওমেন্দার আছে, সে তোমার মত উপযুক্ত, তোমার মত বিশ্বাসপাত্র, বিশেষতঃ বাদশাহ বলেন, তারে যখন প্রয়োজন হবে, সে ব্যক্তি তখন কদাচ আপনার জীবনের প্রতি অযত্ন কোরবে না কিম্বা মুনবের কর্তব্য ফেলে রেখে স্বীলোকের অনুসন্ধানও কিরবে না, অথবা জোর কোরে কারও অন্তরে ঢুকে ধুমধামও কোরবে না, তার সেরূপ প্রকৃতি নয়।

ঐ কথা শুনে আমি একটু হেসে জিজ্ঞাসা কোলেম, “সে ব্যক্তি কে? তার বাড়ী কোথায়? এমন উপযুক্ত লোক মহারাজ কোথায় পেলেন? সম্ভ্রতি আপনারা যে কল্পনা কোরেছেন, সে তা প্রতুল কোরে তুলতে পারবে তো?”

বাবার সব আশাতে বন্দোবস্ত, আমি আপনি

গেলেম বোল খেয়ে, এক ব্যক্তি উমী লোক এসে তাঁর প্রভুল কোরে দেবে! কামারের কুমোর-যুক্তি, কি আশ্চর্য্য। অতিবুদ্ধির হাতে দড়ি, সে কথা মিথ্যা নয়। বাবার কাছে যুড়ী-মুড়্কির এক দর, কাঁচ-কাঞ্চনের সমান আদর। আমি বোল্লেম, “বাবা! তা ভালই হয়েছে, আমার তাতে কোন ওজর আপত্তি নাই। সে ব্যক্তি যেই হোক, আল্লার দিবা, আমি তার উপর না রাগই কোরব, না ঘেবই কোরব। আপনি যাচলে বাপের নাম, আমি এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পাগ্লে বাঁচি।” মুখে এই আঁটনি কোরে শেষে সুলতান সুজার অঙ্গধারী লোকেরা আমায় যে পথে পেয়ে জোর কোরে ধোরে নিয়ে যায়, সেই বুভাস্তি সমুদার বাবাকে বোল্লেম। তা ছাড়া তাঁর নিজের প্রাণ রক্ষা কোরে দেব, কথা দিইছি, সিটিও বড় কম হাঙ্গামা হয়, তাতে বিস্তর ফিকির, বিস্তর কন্দি দরকার করে, স্রু তাতেও কোন পার পাওয়া যায়, আবার হুপ বকুও চাই, কিন্তু তা বলে চলে কই, পিতার অনুরোধ, ফেলতে পারিনে। এতেও কোন শেষ হল—আবার বাদশাহের হুকুম—সুদ বাকীকে ধোতে পারব না—তাকে ছেড়ে দিতে হবে, সে কথাও না শুনলে নয়, নচেৎ মাথা বাঁচে কই। রাজদরবারের বিস্তর লোক দারার পক্ষ, তাদের অনুরোধও রক্ষা করা চাই, না কোলে আমার নিস্তার নাই। এর মধ্যে এত মারপেচ, এত ফেরবার রয়েছে, কিন্তু বাবা তার অনেক খবরই জানতেন না। ঐ সকল মর্ম্মকথা বোলে তাঁর মনের ধাঁধা ভেঙ্গে দিলেম। শেষে বোল্লেম, “বাবা! আমি আকাশ-পাতাল ভাবছি, ভাবনার কুল কিনারা দেখিনে, আমার এ চাকুরিতে নমস্কার, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি। আমার যে জালা, তা আমিই জানি, আর গুরুদেবই জানেন। সহস্র বিছে কামড়ালে বোধ হয় তত জালা হয় না, যত জালা আমি পেয়েছি। আমার কণ্ঠে যিনি বাহাল হবেন, হোন, কিন্তু যে বিপদে আমি পোড়েছি, তার অর্ধেকও যদি তাঁকে ভোগ কোন্তে হয়, তখাচ লোকে যে তাঁরে সুখী মনে কোরবে, তা কোরবে না, কেউ তাঁর হিংসক

হয়ে তাঁর পদের অভিলাষী হবে, তাও কেউ হবে না। কেবল পিতার মুখ চেয়েই না এত দিন ক্ষান্ত হয়ে আছি, নচেৎ কবে এ ঝুম্মারি চাকুরীতে এন্তফা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। এত চাকুরী করা নয়, কুকুরী করা তবে করি কি, আমি যেন থোয়ে-বন্ধনে পোড়েছি, পিতার প্রাণ ত বাঁচান, চাই, তাই নিরন্তর হয়ে আছি।

পিতা বলিলেন, “সে কথা মিথ্যা নয়, তুমি যে ভারি ফেসাতে পোড়েছ, সেটি আমি স্বীকার করি। ফল কথা এক্ষণে এই, যে কাণ্ড-কারখানা হয়ে দাড়িয়েছে, তাতে কোরে তুমি দারার স্বপক্ষ কোন মতেই হোতে পার না। তার সঙ্গে যে তোমার আন্তরিক্তি হবে, তার অনুরোধ কই? দারার সঙ্গে তোমায় একত্রে বাবে, এমন সুত্রই নেই। আরদজ্জের স্বপক্ষে কিন্তু সে কথা নয়। সে স্থলে একটি ছেড়ে দুটি অনুরোধ উপস্থিত, তার পক্ষ তোমায় হোতেই হবে, তুমি তা না হোয়ে পারো কই; তবে সুজার পক্ষের লোকেরা তোমায় শাসিয়েছে। ঐয় দেখিয়েছে, তা হলেই বা, সেটা বড় ভারি কথা নয়। তুমি তাদের আঁকে আমলে এনো না, গ্রাহ্যই কোরো না। তারা বহুমান বই ত নয়, তোমায় তারা কি কোত্তে পারে, কি ক্ষমতা আছে। অজ্ঞার যুদ্ধে আঁটনি সার—তারা কেবল মুখে একবার তোমায় কোড়্কে নিলে, তোমার সঙ্গে বিবাদ করে, এত হেন্সাং তাদের কখনই হবে না, পেরে উঠবে কেন। বিশেষতঃ যেখানে বড় বড় দায়, বড় বড় ঝুঁকি ঘাড়ে বুলুচ্ছে, সেখানে ক্ষুদ্র প্রাণী, সামান্ত বহুমানদের কথায় শান দিতে নেই, তা ভুলেও মনে কোত্তে নেই, হেসে উড়িয়ে দিতে হয়।”

পিতার এ কথা বলবার তাৎপর্য্য আর কিছু নয়, যখন তাঁর নিজের প্রাণ লয়ে টানাটানি, তখন আমার প্রাণ থাকে থাক, যায় থাক, সে বড় ভারি কথা নয়। পরের ধনে কলুর নাট, বাবা আমার তাই কোল্লেন।

আমি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বোল্লেম, “খাচ্ছা, আমারই প্রাণ যেন অতি যৎ-সামান্ত থাকে ভাল, যায় ভাল, সেটা যেন বড় ঝুঁকবোর নয়। তা হোলেও আপনাদের কাজ

গোচায় কই। রাজপুত্রেরা যে এ খবর না শুনে অমনি আছেন, তা কখনই সম্ভব নয়, সে কথা কেউ না কেউ অবগতই তাদের কানে তুলে দেছে, তাঁহারাও তবে সাবধান হয়েছেন, তার সন্দেহ নেই। এ কথা শুনে তাঁরা কি বাঁচবার পথ না কোরে নিশ্চিত আছেন?”

পিতা বলিলেন, “সেটা সম্ভব বটে, কিন্তু তার মধ্যে কথা আছে। তাঁরা যদি শুনে থাকেন, তবে এই কথা শুনেছেন, আমরা তাঁদের রত করবার নিমিত্ত কোন কৌশল কোচ্ছি, এর বেশী যে কিছু শুনেছেন, তা আমার বোধ হয় না, কিন্তু কি কৌশল কোচ্ছি, তা আর তাঁরা শুনে নাই, জানেনও না। তবে আর তাঁরা উপস্থিত ব্যাপারে সাবধান হবেন কেন? তবে যদি দুদিন দেরি না কোরে তোমার আদ্যোগার পরেই যুগ্ম-কোতুকের আড়খর করা হয়, তা হোলে একদিন সন্দেহ কোল্লোও কোরে পারেন। ভাল, সে বিবেচনা পরে হবে, সম্ভ্রুতি তোমায় একটা ঘরাও কথা দ্বিজ্ঞাসা কোরে চাই, তুমি যেন শুনে ক্ষুব্ধ হও না।”

“বরকন্দাজ খাঁর প্রাতঃপুত্রীর সহস্র তোমার যোগেই অভিপ্রায় কি, আমায় তা ভেসে বোলতে হবে। তুমি কি একটা কলঙ্ক কোরে দিয়ে জ্বলের মত তার মাথা খেয়ে দেবে, তার পাকচক্র কোচো? তা হোলে ত ভারি বিপদ, তুমি আপনার ফাঁদে আপনি জড়িয়ে পোড়বে, তাতে হয় ত তোমারও প্রাণ যাবে, আমারও যাবে, তুমি কি তাই মনন কোরেছ? না তারে বিবাহ কোরুরে স্থির কোরেছ? তোমার মনের কথা কি, তা বল। যদি তার পাণিগ্রহণ করবার মানস থাকে, তবে সদয় হোয়ে, লোক জানা-জানি কোরে আমাদের যে শত্রু, তার হাতে-পায় ধোন্তে হবে, কেন না, তার অমতে এ বিবাহ ত হোতে পারবে না। তুমি কি তার হাতে-পায় ধোন্তে রাজি আছ?”

আমি বলিলাম, “আমার মনে কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই! নবে তা প্রকাশ কোরে বলতে লজ্জাই বা কি, বাধাই বা কি? দেলজানের প্রতি আমার প্রণয় জন্মেছে, তার কতকগুলি স্বভাব বড় চমৎ—”

এই পর্য্যন্ত বোলতেই বাবা অমনি রাগে ফুলতে লাগলেন, আমায় আর কথা কহিতে দিলেন না। তিনি বোল্লেন, “তুমি বালক বই ত নও, চূপ কোরে থাক, তোমায় আর বেহুদা বক্তৃতা হবে না, আবার যেন আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই বসে বসে তোমার প্রলাপের কথা শুনব। তুমি দেলজানের সকলই আশ্চর্য্য দেখে থাক, আমি তা বুঝতে পেরেছি, তোমার আর তা বলে কষ্ট পেতে হবে না, আমরাও এককালে তোমার মত সকলই আশ্চর্য্য দেখতেম! কিন্তু তুমি যে ভেবেছ, তারে বিবাহ কোরবে, তা মনেও কোরো না; সে খেলা পরিত্যাগ করো, সেটি হবে না। অস্ত্র কোন স্থানে তোমার বিবাহের কথা স্থির হোয়ে আছে। বিবেচনা কর, তাও যদি না হত, অস্ত্র আশ! যদি নাই থাকত, তখাচ দেলজানের সঙ্গে তোমার পরিণয় হওয়া কোনক্রমেই খটে উঠত না। বরকন্দাজ খাঁ কখনই তাতে মত দিত না। আমি যা বোলছি, আমার কথাগুলি তুমি ব্রহ্মজ্ঞান কোরে মেনে নিও। আর এক কথা এই, এ বিবাহে আমারও মত নেই, কেন না, বিবাহের প্রস্তাব কোন্তে আমাকেই হবে, তা হোলে বরকন্দাজ খাঁর কাছে আমার নানতা স্বীকার কোতে হয়, আমি যে তার কাছে খাট হই, সেটা তোমার অভিপ্রায় নয় বোধ হয়, কেনন, নয় ত বটে?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, তা নয় বটে, কিন্তু কি ফিকিরে বরকন্দাজ খাঁকে হস্তগত কোরব, আমি এ পর্য্যন্ত তা স্থির কোরে উঠতে পারি নি। তবে আমার পণ এই, দেলজানের সঙ্গে হয় ত বিবাহ কোরব, নচেৎ আমি বিবাহই কোরব না।

পিতা বলিলেন, “তুই বড় পাগল, তোর কি এরূপ পণ করা উচিত? না তোরে তা সাজে? তুই কি এখন আসল সোনা ফেলে দিয়ে মকল সোনা ধুব্বি!”

আমি বলিলাম, “বাধা! আপনি বেশ কথা বোল্লেন, আমার বিবেচনায় রাজ্য-সম্পদ নকল সোনার সদৃশ। লোকে নিম্নল, নিম্পাপ চরিত্র-রূপ আসল সোনা বদল দিয়ে ঐ নকল সোনা গ্রহণ কোন্তে চায়।”

“ইস্! কুস্! বালক! তোমার জরের যে তেজ দেখেছি, তার ধমক এখনও সামলাতে পার নি। ঐ জরই তোমায় হুবহু মেয়েমানুষ কোরে তুলেছে। তুমি এখন আমার পা ছুঁয়ে কিরে দিকি কোরে বল, দেলজানের সঙ্গে আর কখন সাক্ষাৎ কোরবে না।”

আমি বলিলাম, “আর কখনই না? দোহাই আল্লা! এ প্রতিজ্ঞা আমি কোন্তে পাব্ না। দেলজান যেখানেই থাকুন, অবকাশ পেলে আমি উড়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করুব, কারও কথা শুনব না, কেউ আমার ধোরে রাখতে পারবে না।”

পিতা মহা গরম হোয়ে বোলেন, “তুই তারি এক-রোখা, তোর আপনার মতেই মত, তোর মতন অবাদ্য, অকৃতজ্ঞ বালক কেউ কখন দেখেও নি, শোনেও নি। আমি তোর বাপ, কিন্তু তুই আমার মান রেখে বা মান্তমান কোরে কথা কস্নে, আমার সঙ্গে তুই মুখবরা-বরি করিস্, আর যা মুখে এসে, তাই বলিস্, এই কি উচিত? তোর কি একটু হায়্যা নেই? অরে মুখ! তবে শোন্। নফজালী খাঁ আরজ-জেবে; বড় বিশ্বাসপাত্র, তাঁর কথা মুরমহল। ঐ মুরমহলের সঙ্গে তোমার পরিণয় হোলে আমার সেই দুর্জয় অভিসন্ধিটি সুসিদ্ধ হয়। এ কথাগুলি তুমি কানে শুনে রাখ।”

আমি বলিলাম, “আপনি যদি কথা দিবে থাকেন, তবে এই বেলা তা খণ্ডিয়ে দিন, আমার যদি কেউ বলে, দেলজানকে পরিত্যাগ কর, তুমি সসাগরা পৃথিবীর একছত্রা রাজা হবে, তখাচ আমি তারে পরিত্যাগ কোন্তে পাব্ না। আরো এই কথা বোলেম, আপনি যখন দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার কথা আমার প্রকাশ কোরে বোলেন, মনে কোরে দেখুন, তখন আপনার সঙ্গে আমার কি কথা হয়। কেবল উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবার নিমিত্ত আমি আপনার সহায় হব, তন্নিমিত্ত অল্প কোন কথায় থাক্ না। আমি যে ক্ষতি, কি প্রত্যা-বায় স্বীকার কোরে আপনার উত্তরকালের উন্নতির পথ মুক্ত কোরে দেব, সে কথার প্রতি আমি কিছু ভরান্ডর দিই নি, সত্য মিথ্যা, মনে

ভেবে দেখুন, স্বরণ হবে।” আমি যখন ঐ কথাগুলি বোলছিলাম, বাবা তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি কোরে বেড়াচ্ছিলেন, আর আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে একবার রেগে রেগে উঠছিলেন, এক একবার মুখ ভেঙাচিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোচ্ছিলেন। এই কোন্তে কোন্তে সট কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় আমার একবার বোলেও গেলেন না।

সলিম্যান এতক্ষণ বাহিরে বোসে ছিল, পিতা ছিলেন বোলে ঘরে আসতে পাচ্ছিল না। তিনি যেমন চলে গেলেন, সে অমনি হাসতে হাসতে এসে সামনে দাঁড়াল। আমার বোলে, “হজুর! আপনি যার বিষয় জানুতে পাঠিয়েছি-লেন, তিনি সরদার মুক্তার খাঁর দ্বার আবাসেই বাস কোছেন, শরীরগতিক বেশ আছেন।”

ঐ কথা শুনে আমি আফ্রায়ে দূলে উঠে চেষ্টা কোয়ে বোলেম, আল্লা! তোমার কুদরত বাড়ুক! তবে আর চিন্তা কি, তার সঙ্গে এখন চোকেও দেখা হবে, মুখেরও আলাপ হবে। সলিম্যানকে বল্লম, “তুমি বিবিধে গিয়ে বল, জীনাতে যেন মাহিনে কোরে চাকর রাখা হয়, আর জীনাতেও এই কথা বোলো, তার কেবল স্থানের অদল-বদল হোলো এই মাত্র, তাতে তার লাভালাভের হানি হবে না।” সলিম্যান ‘যে আফ্রা’ বোলে, একটা লখা সেলা কোরে প্রস্থান কলে।

আজ তিন হপ্তা হোল, মোগলরাজের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা কোন্তে পারি নি। এখন তাঁর সম্মুখে যেতে যে কত প্রকার ত্রাস উপস্থিত হোচ্ছে, পাঠক তা বুঝতেই পাচ্ছ, আমি আর মুখে বোলে কি জানাব। এত কালের পর, কি বোলে তাঁরে মুখ দেখাব, এই কাল লজ্জার হাতে পোড়ে মনে মনে মহাকুণ্ঠিত হোতে লাগ্লেম। ভাব্লেম, বাদশাহ নিঃসন্দেহ এই মনে কোরে-ছেন, আমি প্রণয়চক্রে পোড়েই সব মাটী কোরে দিলেম, নচেৎ তিন যে মনন কোরে-ছিলেন, তা সফল হবার বাধা ছিল না। আরো এই আশঙ্কা হোতে লাগ্লে, বাদশাহ যে মনস্থ কোরেছিলেন, হয় ত আমার আলক্ষে বিরক্ত



হোয়ে সে মনন তিনি পরিত্যাগ কোরেছেন। তা যদি হয়, তবে আর আমার তাঁর দরকার কি? আমি আর তাঁর কোন কাজে লাগবো? মহারাজ স্বচ্ছন্দে জবাব দিয়ে বিদায় কোরে দেবেন, একবার ভাববেনও না। হয় ত একটা কলঙ্ক রটিয়ে, দাগ দিয়ে ছেড়ে দেবেন। আমার পা আজও তেমন শক্ত হয় নি, তার অনেক বিলম্ব আছে। তথাচ বাবাকে লিখে পাঠালেম, আজকাল আমি একটু সবল হয়েছি, দকের যুগয়া-কোতুকে উপস্থিত থাকতে পারব, সে সাহস বেশ হয়েছে, এক্ষণে বাদশাহকে বোলে একটা দিন অবধারিত করুন।

বাবা আমার চিঠিখানা ভাল কোরে পড়ে লেনও না, একবার দেখে অমনি ফলে রাখলেন। আমি আর এখন কি করি, আমখাসে চলে গেলেম। গিয়ে দেখি, বাদশাহ নাই, তাঁর পরিবার্তে দারা সিংহাসনে বসেছেন। তাই দেখে আমার ত ক্ষুণ্ণ হইল। হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। হুন্লেম, বাদশাহ অন্তরমহলে শয্যাগত হোয়ে যাচ্ছেন; ঘোর শঙ্কটাপন্ন, এখন তখন, এইরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন। এ সময় একটা ভারি গোল উঠল, যুখে কোন কথা কেউ ফোটে না, কিন্তু এতরে চোক ঠেঁরে ইসারা করে, কি, সে তারে মনে কানে বলে, কেবল “চুপ চুপ,” এই শব্দ ফলের যুখে শোনা যেতে লাগল। তাও আমার গলা চেপে চেপে আস্তে আস্তে বলা হাচ্ছিল, “গত রাত্রে জাঁহাপনা লীলাসম্বরণ কোরেছেন”, এই খবর এসেছে। এ সংবাদ গিরমধ্যে সর্বত্র প্রচার হোয়ে প্রজার মনে বড় আশঙ্কা, অল্প উদ্বিগ্ন জন্মে নি, নগরময় হা হুলুস্থুলু ব্যাপারের উপক্রম হয়ে উঠল।

দারা স্বতন্ত্র, চিকিৎসকেরা স্বতন্ত্র, এঁরা কিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হোয়ে বলতে লাগলেন “না না, বাদশাহের কোন অমঙ্গল ঘটে নি, জগদী-র তা না করুন। শাজাহান বেঁচে আছেন, কিন্তু বড় পীড়িত, তোমরা উতলা হইও না, আমরা সভ্যই বোলছি, তিনি জীবিত আছেন।” দারা অনেক বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, লোকে কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস গেল না, কেউ তা

কনেও ঠাঁই দিলে না। ভিড়ও এখন বেজায় বেড়ে গেল, লোকের আমদানিতে আমখাস থৈ থৈ কোতে লাগল। আর ত উপায় নেই, রাজ-পরিবারেরা লাচার হোয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে সেই পীড়িত অবস্থায় বাদশাহকে উপস্থিত কোল্লেন, তাঁরে স্বচক্ষে দর্শন কোরে সকলে তবে নিরস্ত হয়।

যে কথা রটে, সে কথা বটে। দেখলেম, বাদশাহের গায় রক্তের নামও নেই, একেবারে সাদা পাড়াস হয়ে গেছেন, অতিশয় শীর্ণ; কেবল অস্থি কথানি জিল্জিল কোচে। মাথাটা নিচু হোয়ে বুকের উপর ঝুলে পোড়েছে, এই অবস্থায় কতকগুলো সালে আর যেসময় বস্ত্রে জড়িয়ে মোগল-রাজকে অন্তঃপুর থেকে সভায় এনে হাজির করা হলো। তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন কোরে লোকের তখন প্রত্যয় হোল যে, জাঁহাপনা বেঁচে আছেন, মরেন নি। ভাগ্য-বানের বোঝা ভগবানে বয়। দারা এখন মহা পুলকিত হয়ে হাসতে হাসতে পুনরায় সিংহাসনে গিয়ে বোসলেন, ওমরাওরা এসে কারদা মত আলবাজাতে লাগল, দারাও তাঁদের যথোচিত সম্মান-সমাদর কোস্তে লাগলেন। আমি বড় কাঁপরে পোড়লেম। তাঁদের মত আমিও একটু এগিয়ে পেস হই কি না, ভাবতে লাগলেম। পিতার সঙ্গে একবার চকোচাকি হয়, এই জন্যে তাঁকে অনেক খুঁজে বেড়াইলেম, কিন্তু তাঁর দেখা পেলেম না। দারার কাছে শির নত করি কি না, সে বিষয়ে তাঁর কি অভип্রায়, তাঁর যুখ দেখলেই বুঝতে পার্লেম। দারার চোকে না পড়তে হয়, এই জন্তে আমি একটু পাশ কাটিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একটা লোক এক টুকরা কাগজ চুপে চুপে আমার হাতে গুঁজে দিয়েই তখনই সোরে পোড়ল। চিঠিখানি আমার পিতাই পাঠান, তাতে এই কটি কথা লেখা ছিল,—“এখান থেকে চোলে বাও, বাড়ীতে গিয়ে বসো, আমি যাচ্ছি।” আমি তাই কোল্লেম, সরাসর বাড়ীতে এলেম। ভাবলেম, ভালই হোল, আমার আর গর্কিত দারার কাছে মাথা হেঁট কোস্তে হোল না, একটা দায় এড়াইলেম, নচেৎ বড় অশুখীত



হোতে হতো। দরবারও যেমন শেষ হইয়াছে, দারাগও যেমন চোলে গেছেন, অমনি পিতা এসে বাড়ীতে উপস্থিত। বাবা বোলেন, সাদক, আমার বিবেচনায় আমবাঁস থেকে তোমার পোরে পড়া ভালই হয়েছে, তুমি আর দারার দরবারে যাতায়াত করো না, দিন কয়েক আমখাসে যাওয়া রহিত কোরে দাও, তুমি যেন আজও পীড়িত আছ, সেই ওজর কোরে ঘরে বোসে থাক। কেমন? এই পরামর্শই ভাল। যে কদিন বাদশাহ পীড়িত থাকেন, দরবারে বসিতে সক্ষম না হন, সে কদিন এইরূপ টালমাটাল কোরেই কাটাতে হবে। আজ কি, মহারাজ যখন পীড়িত হন নি, তখন আমি তাঁকে জানিয়ে রেখিছি যে, ‘আপনার রূপাবলে সাদক বেশ সেরে উঠেছে, আমাদের মানস পূর্ণ হবার পক্ষে আর কোন বাধা দেখিনে। এখন যুগয়া-কৌতুকের একটা দিন অবধারিত করুন, আমরা তার উদ্বোধন করি।’ আমার মুখে ঐ কথা শুনে মহারাজ যে দিন অবধারিত করেন, সে হিসাবে যুগয়া কৌতুক কাল হবার কথা। কিন্তু বাদশাহের উত্থানশক্তি রহিত, তাই আপাততঃ সে দিন স্থগিত রাখতে হয়েছে। তার কারণ এই, তুমি যে সেই উপলক্ষে ফৌজ জড় কোরবে, তার ত একটা ওজর চাই, নচেৎ তুমি কার দোহাই দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ কোন্তে চাও? বাদশাহ সেখানে উপস্থিত থাকলে, তখন এই কথা বলা যাবে, ‘মহারাজের সম্মানের নিমিত্তেই এই সমারোহ করা যাচ্ছে।’ কিন্তু আমি যে, দিন-রাত লেগে পড়ে এত যোগাড় কোলেম, শেষে বা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, আমার পরিশ্রমই বা পণ্ড হয়ে যায়, যাবে যে, সেই লক্ষণই হয়ে উঠেছে। কেন না, বাদশাহ হাতীর উপর বোসতে সক্ষম হন, এত দূর বল-সামর্থ্য হোলে তবে ত তিনি সেই কৌতুকস্থলে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর ততদূর বলাধান হোতে যদি বাসাবধির উপর হয়, তবে বর্ষা এসে পড়লে, সে সময় জলে জলে দেশ ছয়লাপ হয়ে যাবে, পথ-বাটও সঁয়াত-সঁয়াতে হয়ে পোড়বে, তখন যুগয়া-কৌতুকের প্রস্তাব করবার সময়ই নয়।

তা ছাড়া আর একটি ভারি বিপদ দেখছি।

হয় ত এইবারেই আমার সকল বল-বুদ্ধি ফুরিয়ে যাবে। ‘যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ভাবনে বাধ ঝাঁকে।’ দেলারাম হাকিম বাদশাহকে চিকিৎসা কোচ্ছে, এখন তার কথা মোগলরাজের ব্রহ্মজ্ঞান হবে। সে বুড় মাথা-পাগলা, হয় ত সে পরামর্শ দিয়ে আমার এত ষড়ের কৌশলগুলি মাটি কোরে দেবে। বাদশাহ ত আগে আমার অভিপ্রায়মত চোলতে স্বীকারই করেন নি আমি বিস্তর বোলে কোয়ে, অনেক ভয় দেখিয়ে তবে তাঁরে রাজি করি। এত কোরে বেয়ে চেয়ে শেষে বা আমার উলুবনে সঁতার দিচ্ছে হয়!”

একে মনস, তায় ধুনোর গন্ধ, একেত আমি রাজপুত্রদিগকে ধরা-পাকড়া কোতে ভারি নারাজ ছিলাম, বাবার মুখে আবার ঐ কথা শুনে একেবারে আফ্লাদে নেচে উঠেলাম মনে মনে বোলতে লাগেলাম, রাজপুত্রদের পোরে হলো না, ভালই হয়েছে, বেঁচে গেলেম, আমার হাড় জুড়ুল। এখন দেলারাম আর বাদশাহ যা ভাল বোঝেন করুন, আমি হাত পুরে থালাস। বাবার ত আর খেয়ে কাজ ছিল না, ভাল একটা গলগ্রহ কোরে আমার সেরে ছিলেন আর কি। যা হোক, পরমেশ্বর রক্ষা কোলেন! কথাই আছে, নিরাখালের খোদা রাখাল। আমি বল্লেম, “বাবা! বাদশাহ যদি দেলারামের কথামুসারে চলেন, সে ত আপনার পক্ষে ভালই হয়েছে, আপনি এখন নির্ভাবনায় বোসে থাকুন, আর ভয় ভয় কোরে চলতে হবে না।”

বাবা বলিলেন, “বাপু! তা নয়, দারাগ বেঁচে থাকতে আমাদের ভদ্রস্থ নেই, সে আমাদের উঠে-থানের পত্তি কোত্তে দেবে না, ঝাড়ে বংশে নির্মূল কোরবে। ভিটেয় ঘুঘু চরাবে, তবে ছাড়বে। দারাগ যতকাল জীবিত থেকে রাজ-কার্য্য কোরবেন, তত দিন আমাদের বিলক্ষণ আশঙ্কা রয়েছে, তত দিন সব বিষয়ে ভয় কোরে চলতে হবে।”

আমি বোল্লেম, “তবে উপায়? কি করা কর্তব্য এখন?”

পিতা বলিলেন, “দারাগ যাতে নিপাত হয়,

কাত্তেই হবে। শাস্ত্রেই আছে, আশ্র রেখে  
 যখন তাঁর মুখ দিয়ে ঐ কটি কথা বেরি  
 ১. অমনি দারার একজন চোপদার দরজা  
 ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোলে আমরা  
 তক্রমে দরজায় ধিল দিয়ে বসি নি। সে এসে  
 য় বোলে, “আপনার তলব, আপনাকে এখ-  
 উঠতে হবে।” তারে দেখে যখন না  
 কের মুখে চণ পড়ে, বাবা অমনি ভয়ে  
 হয়ে গেলেন, বালকের মত ধ্বংস  
 র কাপতে লাগলেন। চোপদার ঘরের  
 চুকেই তাঁর দিকে একবার একটু চেয়ে  
 ছিল, সেই চাউনির ভঙ্গীতেই বাবার মনে  
 বিবাস হলো, সে তাঁর কথাগুলি শুনে  
 ছে। বাবার ত ঐ দশা হলো, আমি নিজেও  
 দ্বি হয়ে হৃৎকবর মত হয়ে পোড়লেন।  
 বোসে আছি কে আমার ডেকে পাঠালে,  
 জন তখন ছিল কি না সন্দেহ। চোপদার  
 বোলে, “হুজুর! দেখি কোচেন কেন?  
 ২. আপনি যাবেন বোলে রাজকুমার বোসে  
 আপনার প্রতীক্ষা কোচেন,” আমার  
 চৈতন্য হলো, যেন ঘুমে থেকে উঠলেন।  
 “আচ্ছা, চল যাই” বোলে উঠে দাঁড়ালেন।  
 র দোসর নেই। পিতা পোড়ে ত্রাহি ত্রাহি  
 ও লাগলেন, তাঁরে ঐ অবস্থায় রেখে  
 দাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে চোল্লেন।  
 ৩. সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বল্লেন,  
 ৪. আমি ফিরে না এলে আপনি এখান  
 যাবেন না, আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা  
 রে থাকবেন।” চোপদার আগে আগে, আমি  
 গছনে পেছনে চোল্লেন। ভাবতে লাগ-  
 ৫. আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, অদৃষ্টে  
 আছে, বলা যায় না, যাই ত, কপাল ছাড়া পথ  
 ৬. ভাবলে কি হবে? গিয়ে দেখি, আমার  
 বিলম্ব হয়েছে বোলে দারা ব্যস্ত হয়ে ঘর-  
 কোরে বেড়াচেন? ইতিপূর্বে যে খাস-  
 মরায় বোসে বাদশাহ এক দিন আমার ডেকে  
 ৭. গান, দারাকেও দেখলেম সে কামরায় বোসে  
 ৮. হন। আমরা এখন নিরিবিলাি হোলেন। মনে  
 ৯. বড় আনন্দ হলো, ভাবলে, চোপদার যদি

সত্যি সত্যি পিতার কথাগুলি শুনে থাকে,  
 কিন্তু দারার কানে সেগুলি তুলে দিয়ে সে  
 চুকলি করবার অবকাশ পাই নি। বাবা ত  
 দারার কথা বলছিলেন, দারা যদি তা শুন-  
 তেন ত ভারি প্রমাদ পোড়ত। আমি হাত  
 ঘোড় কোরে, যে আজ্ঞার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে, রাজ  
 পুত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মূর্ত্তিমান ভক্তি দেখাতে  
 লাগলেম। “অতিভক্তি চোরের লক্ষণ”—বোধ  
 হয় ঐ প্রবাদ-কথাটি তখন মনে পোড়ে দারা  
 দুই চোক পাকিয়ে আমার আপাদমস্তক  
 ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখতে  
 লাগলেন। দেখতে লাগলেন ভালই, আমি তা  
 বুকপাতও কোলেম না, অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে  
 রইলেম। পূর্বে জান্তেম না যে, আমার তত  
 সাহস ছিল।

দারা আমার মুখপানে চেয়ে বোল্লেন,  
 “সাদক! তুমি আমার বিপক্ষ হোলে কেন?”

“বিপক্ষ আমি কারুরই নই। মহারাজের  
 বিশ্বস্ত পাত্র হব, ঠিক পথে থাকুব, এই আমার  
 মানস। হুজুর যদি কাল তক্তে বসেন, আর  
 আমি যদি হুজুরের অধীন হই, তখন যদি আপ-  
 নার জন্তে আমার প্রাণ দিতে হয়, তাও দিয়ে  
 আপনাকে রক্ষা করুবো, এই আমার  
 প্রতিজ্ঞা।” আমি এই উত্তর করিলাম।

দারা বলিলেন, “তুমি যা বোল্ছ, সে কথা  
 মিথ্যা নয়, আমি তা অবিবাস করি না। কিন্তু  
 আবার এ কথাও শুনে পাই, তুমিই বাদী হয়ে  
 যাতে আমি তক্তে না বসতে পারি, তার চেষ্টা  
 কোচ্ছো, সে কথা কি সত্যি?”

আমি বলিলাম, “আমি আপনার পক্ষ না  
 হোয়ে আরদজেবের পক্ষ হয়েছি সত্যি, কিন্তু তার  
 অনেক কারণ আছে। অনেকগুলি প্রতিবন্ধক  
 আছে বলেই আমি আপনার দলভুক্ত হোতে  
 পাচ্ছি না। আপনি যদি সেই সকল প্রতি-  
 বন্ধকের প্রতীকার করেন, তবে আমি এই দণ্ডেই  
 আপনার দলে মিশে যেতে প্রস্তুত আছি।”

দারা বলিলেন, “তোমার কি আপত্তি  
 আছে, আমি ত তা জানিনে, তোমার মনের  
 কথা আমি কি কোরে জানব? আগে আমার  
 তা বল, তবে ত তার প্রতীকার করুব।”

আমি বলিলাম “জজুর! আমি যোড় হাত কোচ্ছি, আমার মাপ করুন, সে কথা আমি মুখের বার কোত্তে পারব না। আমি যে তা ব্যক্ত করি, সে সাধা আমার নেই, না থাকবার বিশেষ কারণ আছে।”

ঐ কথা শুনে দারা একটু অজমনস্ক হোয়ে কি ভাবলেন, তার পর বোলেন “সাদক! তুমি যে দরের লোক, তোমার মত আমার যদি হাজার লোক থাকত, তবে কি রাজসিংহাসন আর কেউ পায়? সে আমারই হতো। তা হোলে তোমারে আমি এইদেখুই আমার কোলে টেনে নিতাম। সাদক! তোমার মনের কথা আমার বল্লেন না, না বোল্লেন, নাই নাই, আমি কিন্তু তা আন্দাজেই বুঝতে পেরেছি, কামারের কাছে ইস্পাত চুরি করা যায় না। যাই হোক, সে বাধা না ক-দিনের নিমিত্তে? অল্পে অল্পেই তা কেটে যেতে পারে। তার পর থেকে নয় তুমি আমার স্বাপক্ষ হবে।”

আমি মুখে কোন উত্তর না দিয়ে হাত এক-খানি এমনি ভঙ্গীতে রাখলুম, আমি যেন তাঁর কথায় সম্মত হয়েছি, এই ভাবটি তাতে বোধ হোল।

আমার ঐ ভঙ্গী দেখে দারা বল্লেন, “আচ্ছা, তবে সেই কথাই ভাল। সাদক! তোমারে আমি বন্ধুর মতন ভাবি, তুমি আমার প্রাণের দোসর বোল্লেন হয়, আমার সুখ-দুঃখের ভাগী তোমায় হোতে হবে। তুমি যেমন উপযুক্ত পাত্র, তার মত তোমার সম্মানও করা যাবে। তবে এখন তুমি বিদায় হও, আমি অনুমতি কোল্লেম।”

পিতা উৎকণ্ঠিত আছেন জানি, আমি বিদায় হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলুম। বাবা আমার দেখে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন “দারা তোমায় কেন ডেকেছিল? তোমাদের কি কথা হেল? কী বোল্লেন সে?” দারার সঙ্গে যে কথা হোয়েছিল, তাঁরে সব বোল্লুম। বাবা শুনে একটু হেসে বল্লেন, “সাবধান, সে কালসর্প। তার এক ছোবলেই তোমার প্রাণ যাবে। হায়! একবার তারে কায়দায় পেলে হয়, তখন আমি কে, কেমন ব্যক্তি, তারে শিখাই।”

আমি অমনি বলে উঠলুম, “কি ক আপনি! চুপ করুন। সেই ত একবার কথা বলে, এখন মাথায় হাত দিয়ে ভাব না জানি কি প্রমাদই ঘটে। আমার ঐ ক আপনি অত অধীর, অত অবিবেচক হবেন একটু স্থির হউন।”

পিতা বল্লেন, “সাদক! তুমি বড় কথা বোল্লেছ। জিহ্বা আর হাত, এদের কোরে বেঁধে আটক কোরে না রাখলে লোকের কাছে পার পাবার যো নাই। রাজে আমার বাড়ীতে গিয়ে দেখা কোরো এখন চল্লেম।” পিতা ঐ কথা বোল্লেন নুতন ফিকির, নুতন নুতন মতলব বার বাড়াই চল্লেন। কাল আমি যখন তাঁর সঙ্গে কোত্তে যাব, তখন সেইগুলি আমাকে বেন।”

পিতার মুখ দিয়ে যা বেরিয়েছিল, তিনি বোল্লেছিলেন, শেষে তাই ঘটল। সেই রাতে দেলারাম আপনার ক্ষমতাবলে বাদশ আরোগ্য কোরে তুলে বাবার সমুদয় কৌশল একেবারে উল্টে দিলে। সে বাদশ এই পরামর্শ দিলে, “শাজা দারা যেন গয়ার হোয়ে উঠেছেন, এখন অল্পে অল্পে তাদের বি কোরে দেওয়াই শ্রেয়, কিন্তু যা কোরবেন, হয়ে করাই ভাল, ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়। রাজপুত্রদের আর যত গুণ থাক বা থাক, অভিমানটি ষোল আনা হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁট হোতে চান না। নিশ্চয় পুরুষের তিন বিক্রম। তাঁদের সেই অভিমানের অনাদর হয়, সেইরূপ চলতে না পারলে কুরুক্ষেত্র উঠবে, শেষে পশ্চাতে হোবে, হায় হায় কে বেন! তার চেয়ে তাঁদের মানে মানে বি কোরে দেওয়াই ভাল। তাতে তাঁদেরও থাকবে, আপনারও মান বাঁচবে। এখন আপনার আত্মীয় বোলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁ মধ্যে অনেকেই মনে মনে কালীষাটের পাঠ কোরে থাকেন। তাঁদের কি, ভাগে মচকে? ফাটে না চটে? একখানা উঠলে, “মামার জয়” বোলে দাঁড়াবেন কেতে লোকের কোন কথায় থাকবেন

আত্মীয়তা, আর ইচ্ছা পুত্রের মায়ের  
র এক সমান । প্রাণের টান নেই, দরদ  
কিন্তু মুখে মায়া জানান আছে । যদি  
কথা-মত চলতে চান, তবে এক কাজ  
রাজপুত্রদিগকে দশজনের সাক্ষাতে  
মুখোমুখি স্বতন্ত্র কোরে দিন । এক এক রাজ-  
কি একটি একটি রাজহের ভার দিয়ে দূর  
প্রেরণ করুন । যে কারখানা বেধে  
হে, তাতে আপনার বিপদ হবার বড় দেৱী  
আগত প্রায় । এক্ষণে এই উপায় নি-  
বে নেই যে, তা নিবারণ করে ।" দেলা-  
কথা বাদশাহের মনে বেশ লেগে গেল,  
পরামর্শ-মত চলতে মোগলরাজ সম্মতও  
হলো । পরামর্শ মন্দ নয়, গঙ্গার জল গঙ্গায়  
পিতলোক উদ্ধার হলো । পিতা-পুত্রের  
মহত্তাও বজায় থাকুল, পৃথকও হওয়া হোল ।  
বল-বুদ্ধি ফুরিয়ে গেল, তাঁর যেন চোঁরার  
কাগী হোল, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না,  
শব্দ কম্কে গেল ।

আপনার বুদ্ধির দোষে আপনি ঠক-  
কিন্তু আল ঝাড়তে লাগলেন । আমার  
আমি যেন তাঁর ছাই ফেলতে ভাঙ্কা-  
আমি কিন্তু তাতে বিরক্ত হোলেম না,  
জানি, সংসারের দশাই ঐ । তার সাক্ষী  
একটা অভিলষিত উদ্দেশ্য সফল করবার  
জ লোকে কতরূপ কৌশল, কতরূপ  
করে । তারা কত কি ভাজে,  
কি গড়ে । হয় ত কখন সাগর পার  
হে, কখন বা পর্বত অতিক্রম কাচে,  
বাবের মুখে যাচে, কখন সাপের মুখে  
হে । কখন আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, কখন  
বিচ্ছেদ, কখন স্তম্ভভেদ কোচ্ছে । কখন  
সঙ্গে প্রণয় কোরে হয় ত আবার তারই  
বিচ্ছেদও কোচ্ছে । কখন চোর হোয়ে  
স্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, কখন বা সাধু  
সে উপদেশ দেয়, কখন বীর হোয়ে যুদ্ধ করে,  
দাস হোয়ে পায় ধরে । এইরূপ নানা  
য়, নানা কৌশল অবলম্বন কোরে কত  
বিষ, ব্যাঘাত, বিরোধ, বিপদতা থেকে  
হয় । অবশেষে সকল দিক সুপ্রভুল,

সকল দিক সুপ্রসন্ন হয়ে যখন সেই বহু যত্নের  
মনস্কামনাটি পূর্ণসিদ্ধ হবার সকল লক্ষণই হয়,  
কোথাও কোন চাক্ষুষ প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না,  
মনোভিলাষ সফল হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা মনে  
কোরে, যখন সেই অভিলষী পুরুষ আফ্লাদে  
উন্নত হয়, সেই সময়, ঠিক সেই সময়, একটি  
যৎসামান্য তুচ্ছ ঘটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হোয়ে  
সে সমুদয় কৌশল, সে সমুদয় মতলব উল্টে  
দেয়, সে সমুদয় পরিশ্রম রসাতল কোরে  
ফেলে । সেই অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব, যৎসামান্য  
তুচ্ছ ঘটনা ভিতরে যে এত শক্তি পরে, মন্তব্যের  
সাধ্য নাই, যে তা বুঝে উঠে, সেটি আমাদের  
জ্ঞানগোচরের বার । সংসারের গতিকই এইরূপ,  
তার নৈসর্গিক গতিশ্রোত আনিবাধ্য, কাবু  
সাধ্য তা নিবারণ করে ? আমাদের বিজ্ঞা-বুদ্ধিও  
প্রভাব যতই হোক না কেন, আমরা ভেবে  
চিন্তে, কি দেখে শুনে, নিশ্চয় অধ্যায়িত কোরে  
যতই রাধি না কেন, মনে মনে যতই মতলব, যতই  
ফিকির করি না কেন যে, এইরূপ কোরবে,  
তার ফল এই হবে, শেষ গিয়ে এই লাড়াবে ।  
কিন্তু সে অদৃষ্টচর তুচ্ছ ঘটনাটি ত হাত দিয়ে  
ঠেলে রাখা যায় না, সেটি বোট বেই ঘোটবে,  
তার মাহাত্ম্য, তার প্রভাব সে দেখাবেই  
দেখাবে । এইরূপে কত শত বড় বড় বিষয়-  
আকাজক্ষা ব্যক্তির অতি সুপারিপক্ব কৌশল-  
গুলি একেবারে সমূলে উচ্ছিন্ন হোয়ে গেছে ।  
অতএব সংসারের বিচিত্র গতি !!!

ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ এ যাত্রা রক্ষা পেলেন,  
তিনি নিরাময় হয়েছেন, এক্ষণে আর কোন  
অসুখ নেই, কিন্তু খুব কাহিল আছেন । আজ  
মোগলরাজ আমরাসে বার দিয়ে বোসেছেন ।  
পুত্রেরা এসে তাঁকে প্রণাম কোরে আপনার  
আপনার কর্তৃত্বভার গ্রহণ কোলেন । সুগতান  
সুজা বঙ্গদেশের, আরঙ্গজেব ডেকানের (দক্ষিণ),  
মুরাদ বাকী গুজরাটের, দারা শূগতান আর  
কাবুলের কর্তৃত্বভার পেলেন । কিন্তু দারা  
জ্যেষ্ঠপুত্র, সাজাহানের অবর্তমানে রাজকীরিট  
তাঁরই হবার সম্ভাবনা ; তিনি পিতার সঙ্গে  
একত্রে আগ্রায় বাস কোরবেন, এই অভিপ্রায়  
হিঁর কোলেন । অপর অপর রাজকুমারের

বিদায় হোয়ে বিদেশ-বাত্রা কোলেন, দারা আগ-রাতেই রইলেন। বাদশাহ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু ভারি দুর্বল, তার উপর দরবারের পরিশ্রম, তিনি একেবারে অবসন্ন হোয়ে পড়লেন, চোকে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। আমি তাঁকে অভিবাদন করবার অবসর পেলেম না। এখনও তাঁর সময় হয় নি, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি উঠে চোলে গেলেন।

আজকার দরবারে পিতা উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরে দেখতে না পেয়ে আমার বড় বিষমজ্ঞান হোল, মনে সংশয়ও হোতে লাগল। কেন তিনি এলেন না, কারণ কি, ভাবতে লাগলেন। মনে কোচ্ছিলেম, যাই, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, “আজ তিনি কেন আমথাসে উপস্থিত ছিলেন না।” এমন সময় দারার একজন চোপদার এসে বলে, “রাজ-কুমার হুকুম কোরে পাঠিয়েছেন, আপনি আজ খাস দরবারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন।” রাজপুত্র নিয়ম কোরেছেন, তিনি প্রতাহ একটি খাস দরবার কোরবেন। ঐ কথা শুনে আমার আর পিতার কাছে যাওয়া হলো না, সময়োচিত পরিচ্ছদ করবার জন্তে সরাসর বাড়ী চোলে গেলেম।

ঘরে এসে বারান্দায় পায়চারি কোচ্ছি, আর ভাবছি, “বাবা আজ আমথাসে কেন এলেন না?” এই সময় একটা শব্দ হোল, পেছন দিকে কি খট কোরে উঠল, বোধ হল এমন, এক টুকরো পাথর আয়নার উপর পড়ল। অমনি ফিরে দাঁড়ালেম, চেয়ে দেখি, একটা তীর গ্রাসে সংলগ্ন রয়েছে, গ্রাসখানা এমুড় ওমুড় ফেটে চৌচির হোয়ে গেছে। তীরের বাগ বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্লেম, আমায় লক্ষ্য কোরে সজ্জান করা হয় নি, সেটা বেশ বোধ হল, তার প্রতি কোন সন্দেহ নেই। তীরখানা হাতে কোরে নিলেম, মনে মনে মহাবিরক্ত হোতে লাগ্লেম, কেন সাধে সাধে আয়নাখানা ভেঙ্গে চুরমার কোলে, এ ক্ষতি কোরে তার কী লাভ হোল? ভারি রেগেছি, মনে কোচ্ছি, তীরখানা এক দিকে ছুড়ে ফেলে দি, এমন সময় দেখি, পালকের মধ্যে জড়ান, তাঁজ করা কাঁগজ

রয়েছে। তাই দ্বেষে ঘরের মধ্যে গিয়ে খানি খুলে পোড়লেম। তাতে এই গুলি লেখা ছিল—“সাবধান, দারার রাজপ্রদাদস্বরূপ যে পান পাবে, তা কদা দিও না, তোমার আপনার পান সঙ্গে কেউ যেন তা জানতে না পারে। প্রদাদ যে পান পাবে, তার পরিবর্তে আপনার খেও, এমনি চালাকি কোরে থাকে, কেউ টের না পায়। আরদজ্জেব ডেকানে উদ্যোগ কোচ্চেন, তোমাকে এই সেখানে যেতে হবে, তোমার ঘোড়া কোত্তে বল। বাদশাহ এক্ষণে স্বয়ং-সিদ্ধ বেগম আর দারা তাঁর মন্ত্রী হোয়েছে, তাঁর রূপোর কাটি সোণার কাটি। তারা যদিকে ফেরাচ্ছে, তিনি সেই দিকে ফি এই বেলা প্রস্থান কর, নচেৎ তোমার সংশয়। কিন্তু দারার দরবারে একবার এই তোমার শেষ বার্তা, আর সেখানে হবে না। ইতি। শ্রীমতী রসীনার

আহা! রসীনার এই মিত্রবৎ ব্যবহারে আমি কতই চরিতার্থ, কতই কৃতার্থ হোলেম। পূর্বে এরূপ সাবধান না দিলে আজ আমি প্রাণটি হারা আশ্ৰা! তুমি দয়াময়! যা হোক, রাজপুত্র পূর্বে স্থির কোরে রেখেছিলেন যে, আমি হোলে সবপ্রথম আমার সঙ্গে এইরূপ বাক্য কোরেন? বাবা ত ঠিক কথায় বলেন, “কুমার কেবল সময়ের মুখ চেয়ে আ অবসন্ন পেলই আমাদের চেপে মারুকে কিন্তু ষষ্ঠ মেয়ে রসীনারা! তাঁর গুণের বলে ফুরুতে পারিনে, তাঁকে শত শত ধর্ম দি। তাঁর কাছে রাজপুত্রের দুষ্টা খাটবে না। রসীনার কথামত পান কোরে সঙ্গে নিলেম, ঘোড়া তয়ের রাখেতে হুকুম দিলেম। সলিমানকে বো আবশ্যকমত কতক কতক তৈজসপত্র কোরে যুক্তারের স্ত্রী, সেই অবিরার বা নিয়ে যা, আমায় না বোলে, কি আমার কোন কথা না শুনে কোথাও যাসনে, নেই থাকিস্।”

নিয়মিত সময়ে দারার দরবারে উপস্থিত হোলেম । রাজপুত্রকে সেলাম কোরে কেবল গিয়ে বসেছি, কি বসতে পেরিছি কি না সন্দেহ, এমন সময় হুকুম হলো, “আমার সম্মানার্থ পান প্রদান করা হয় ।” হেঁট হোয়ে, মাটির দিকে শির তুলিয়ে, অতি নতভাবে রাজপ্রসাদ গ্রহণ কোলেম । কিন্তু আবার যেমন ষাড় উঁচু কোরে, উঠে বসলেম, ঐ সুযোগে রাজদত্ত বিষয় সম্মান আশ্রনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনার পান ফেলে দিলেম । এমনি চালাকি কোরে কাজটি নিকেশ কোলেম, আমার হস্তচাতুরী কেউ ধোতে পারে না, মহা চৌকশদৃষ্টি হোলেও আমার এ চাতুরী কারো চাক্ষুষ হবার বিষয় ছিল না । তার পরেই দরবার ভেঙ্গে গেল, আমি এখন ঘোড়সোয়ার হোয়ে পিতার নিকট গেলেম । মান, গৌরব, ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য্য আদি আমার যে কিছু স্মৃতিসম্পদ ছিল, আমার মনে যে কিছু বিনোদ সুখের বাসনা ছিল, এক্ষেপে সে সমুদায় বিদায় কোরে দিলেম, আমিও তাদের নিকট রোকসং নিলেম । আমার রাজস্বামী রাজাহানের অবস্থা অতি মন্দ, এ দুঃসময়ে আমি তাঁর উপকারে লাগলেম না, আমার এখন সে ক্ষমতা নেই যে, তাঁর উপকার করি, পথে যেতে যেতে এই দুঃখ মনে উদয় হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ফেটে যেতে লাগল, প্রাণ কেঁদে উঠতে লাগল । দারার অঙ্গপাতে যাক্, গোল্লায় যাক্, তার সর্বনাশ হোক্, তার যেন নরকে বাস হয়, ভগদৌধর করুন, সে যেন বজ্রবাতে শীঘ্র নিপাত হয়, তার যেন কোন কূলে কেউ বাতি দিতে না থাকে । রাজকুমারকে এইরূপ অভিসম্পাত কোত্তে কোত্তে চোলেছি, আর একবার একবার বোলছি, “দারার শরীরে দয়া মায়া নেই, আমার অপরাধ কি, আমি তার পক্ষ হইনি বোলে সে আমায় ইতর কারসাজি কোরে খুন কোত্তে উত্তত হয়েছিল ।” এই কোত্তে কোত্তে পিতার আবাসে পৌছিলাম । তাঁর কতকগুলি অস্থায়ী পারিষদ-লোককে জিজ্ঞাসা কোলেম, “কেমন, উজীর সাহেব কি বাড়ীতে আছেন বলতে পার ?” “তিনি আজ কোথাও যাননি, বাড়ীতেই আছেন,” তারা এই উত্তর কোলে ।

ঐ কথা শুনে বুকটো খড়াসু কোরে উঠলো, অমনি উর্দ্ধ্বাশ্রমে ছুটলেম, যেন উড়ে চলেম, পড়ি কি মরি, সে জ্ঞান ছিল না । হায় ! তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, জনপ্রাণীও নাই, বর খালি পড়ে রয়েছে, খাঁ খাঁ কোচে । কোচ, কেদারা, আর আর তৈজসপত্র ছড়াছড়ি হয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে । আমি একবার এ দিকে চাই, একবার সে দিকে চাই, একবার এ কোণে উঁকি মারি, একবার সে কোণে চেয়ে দেখি, কখন এ জিনিসটে নেড়ে দেখি, কখন সে জিনিসটে সরিয়ে রাখি, এইরূপ অহুসন্ধান কোরে দেখতে দেখতে অন্তরের দিকে একটা কামরার মধ্যে ঢক্লেম । ঐ ঘরের পেছন দিকে একটা চোরা সিঁড়ি আছে । এই ঘরের মধ্যে তাঁর সাল, আর একখানি লপেটা জুতো পাওয়া গেল । মনে আরো সন্দেহ হোল । এদিক্, সেদিক্, খুব তদন্ত কোরে দেখতে দেখতে ঘরের মেঝেতে কতকগুলি রক্তের দাগ দেখতে পেলেম । তাই দেখেই আমি চীৎকার কোরে উঠলেম, “কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! খুন ! খুন ! পিতা মারা পৌড়েছেন ! হত্যা হয়েছেন ! হা আল্লা, কি কোলে !”

আমার ত দেখে শুনে প্রাণ উড়ে গেল । মুচ্ছিতপ্রায় হলেম, চিত্রপুতুলের ভায় কতক্ষণ নিশুন্ধ হোয়ে দাড়িয়ে রইলেম । সব অন্ধকার, সব শূন্য দেখতে লাগলেম । তার পর একটু সামূলে পুনরায় অহুসন্ধান কোত্তে লাগলেম । রক্তের দাগ লক্ষ্য কোরে যেতে যেতে সেই পশ্চাৎ দিকের চোরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা বাগানে গিয়ে উপস্থিত হোলেম, সেখানে আর কোন চিহ্ন দেখতে পেলেম না । আমি মোর-ফুটে চোঁচাতে লাগলেম, “উজীর নাই, তাঁকে খুন কোরেছে,” এই ভয়ধ্বনি কোরে পরিজনবর্গকে সজ্ঞাপ কোলেম । পরিজনেরা আতঙ্কে বিহবল হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি কোত্তে লাগল । ভ্রান্ত পথিকেরা ব্যাকুল হয়ে যেমন চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করে, কোন পথে যাবে, তার নির্ণয় কোত্তে পারে না, এদেরও ঠিক সেই দশা হলো । ঠুতারা হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি হবে, একবার একদিকে দৌড়ে বায়, খানিক

দূর গিয়ে আবার ফেরে, পুনরায় আর দিকে ছুটে যায়, আবার সে দিকে না গিয়ে অল্প দিকে যায়, এইরূপ ব্যাকুল হয়ে বাড়ীময় দাপাদাপি কোন্ডে লাগল। কি কোরবে, কোথায় যাবে, কিছু স্থির কোন্ডে পাচ্ছিল না। উজীর বাড়ীতে ছিলেন, তবে তাঁরে এখন দেখিনে কেন? কোথায় গেলেন? কি হোলেন, একবার ভেদ কেহই বোলতে পারে না, কেউ তা জানেও না—আমার মনে বেশ সন্দেহ হোল, হয় দারা, নয় তার পারিষদ বরকন্দাজ খাঁর পপ্পরে পোড়ে তান মাথা পোড়েছেন। শোকে অধীর হয়ে পোড়েছি, মুখে যা আসতে লাগল, তাই বোলে দারারে গালাগালি দিতে লাগ্লেম। শেষে বোড়ার উপর সোয়ার হয়ে নক্ষত্রবেগে আরঙ্গজেবের চাউনিতে চোলেম। মনে মনে স্থির কোলেম, “আজ অবধি রাজপুত্রের হিলে ধোবে থাকব, পড়েহোড়ে, না খেয়ে না দেয়ে, তাঁর খোষামোদ কোরবো, তাঁর কেনাবেচার মনো হয়ে রব। দারা রাজক্ষমতা পেলে, সে রক্ত-পিশাচের সঙ্গে একদিন ভাল কোরে দেখা-সাক্ষাৎ কোন্ডে হবে। তখন সে যতই কাঁদাকাটা করুক, আমি কখন তাকে দয়া কোরে ছেড়ে দেব না! সে যখন আমার হতভাগ্য পিতাকে অগ্নে ছাড়ে নি, তখন আমি যে তারে দয়া কোরব, সে তার রথা অংশ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

“দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।”

আমি আর কালাবাজ না করে ধাওয়া—আরঙ্গজেবের দরবারে চলে গেলেম। রাজপুত্র আমার তেমন খাতির-যত্ন কেলে ন, বরং চোটপাট কোরে দেমাগের কথাবার্তা কোন্ডে লাগলেন। আমার লজ্জায় যেন মাথা কেটে ফেলে। কিন্তু কি করি, “উছটে পোড়ে সঙ্কটে প্রণাম”, একটা হিলে চাই, নচেৎ এ সিকন্ত অবস্থায় যাই কোথায়? দাঁড়াই কার

কাছে? আমি তাঁর সরকারে বাহাল হোলে বটে, কিন্তু রাজকুমার তাতে আত্মপ্রকাশ কোলে ন। আমার হাতে কোন কা-কর্মও দিলেন না। পিতার কোন খবরই পাই। তাঁর বরাতে কি ঘটল? কোথায় গেলেন? হোলেন? কেউ কিছু বোলতে পারে না। দারা জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে, “আমি তার কিছু জানিনে।” সহরে গিয়ে শুনলেম, “বিষ বে-আমার কোন অহিত হয় নি, আমি প্রাণ নি পালিয়ে প্রস্থান কোরেছিলাম। দারা এই সং-শুনে ক্রোধে অগ্নিসৃষ্টি হয়ে, হুকুম দিয়েছে: “যার উপর পান প্রস্তুত করবার ভার ছিল, তা গরদানটা ছিঁড়ে ধড় আলাহাদা, মাথা আ-দিহা করা হয়।” রাজপুত্রের মনে স্থিরবিন্দু হয়েছে, সে ব্যক্তি গাফিলিক্রমে পানের বোগ কোন্ডে ভুলেছে। দারা হুকুম দেন যে, কিন্তু তাঁর ঐ নৃশংস হুকুম আমলে আনা হ-ছিল কি না, সে কথা আমি বোলতে পারি-আমি তা শুনি নি। কিন্তু সেই দিনাবধি সে সেই ছুঁড়াগাকে রাজদরবারে কেউ দেখ-পায় নি, সে কথা সত্য।

এক্ষণে আমি বীরপ্রতাপ মুক্তার সহধর্মী আবাসে চোলেম। সলিমানকে পূর্বেই বো-রাখা হয়, সে আমার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকে। গিয়ে দেখি, সেই বিফ-কিঙ্করটি নিরমন হয়ে বসে আছে, আমি ক-কণে পৌঁছব, তাই ভাবছে। আমার কো-অনিষ্ট হয় নি, সমুদয় জিনিসপত্র সেই অবীর-হেঁপাজাতে রয়েছে। সুমতি পরিবারেরা কেমন আছেন, সকলেই ত প্রাণে প্রাণে ক-আছেন, এই সকল আত্মীয়তার কথা জিজ্ঞা-কোলেম। সলিমান উত্তর কোলে, “হাঁ, তাঁ-সকলেই ভাল আছেন। আমার প্রেমময়ী দে-জান এ পর্যন্ত সেই অবীরার সঙ্গে একত্র-বাস কোছেন।” ঐ কথা শুনে আর আর কা-কথা ফেলে অমনি তাড়াতাড়ি অন্তরের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যেখানে থাকেন, একেবারে সট-সেইখানে চলে গেলেম। সেই আবীর আ-তাঁর পুত্র ছুটি আমায় দেখে আহ্বাদে ভাস-লাগলেন। তাঁরা আমার বিস্তর আদর, বিস্তর



সমাদর কোলেন। শেষে মুক্তারের স্ত্রী জিজ্ঞাসা কোলেন, “গাপনার কাজকর্মের অবস্থা কিরূপ?” আমি বোলেম, “আমার অদৃষ্ট টলেছে, সর্বদাস হয়েছি, এক্ষণে পথের ভিকারী।” ঐ কথা শুনে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে অতিশয় বেদ কোন্ডে লাগলেন, এত কাতর হোলেন যে, চোক দিয়ে দব্ দব্ কোরে দল পড়তে লাগল। বালক দুটিও কলে কলে দাঁড়তে লাগল। আমরা বোসে দুঃখের স্থপের কথা বোলছি, এমন সময় দেলজান দেখানে উপস্থিত হোলেন। বিধুমুখী অন্তমনস্ক হয়ে আসছিলেন, আমার দেখেই চমকে উঠলেন, খতমত খেয়ে চিরার্পিতের আর শুক হয়ে পাড়া রইলেন। দেখলেম, দেলজান যে মনোমোহিনী, সেই মনোমোহিনীই আছেন, তাঁর চাকর্যোবনেও চোঁ মলিন হয় নি, তাঁকে দেখে লোকের মন তখনও মোহিত হত, এখনও হয়। তাঁর নয়নরাগ তেমনই আছে, কিছুমাত্র উদাস হয় নি। আমার প্রতি তাঁর প্রেমাতুরাগ পূর্বের মতই বলবৎ আছে। তাই দেখে আমার আনন্দের কক্ষকল ছিল না। যাতে শীর শীর দুই হাত একত্র হয়, সে অভিল্য, সে অভিপ্রায় আমি তাঁকে কতকালে জানাব, কতদিনেই বা তা জানাবার সুবিধা হবে? কবেই বা তা জানাবার অবসর পাব? তাই ভেবে মনে মনে লালসিত হোতে লাগলেম। সেই অবীর। আর তাঁর দুটি পুত্র তৎকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোলে আমাদের মুখ বেঁধে রাখতে হলো। তাঁদের সমুখে কোন কথাই হলো না। না হলো, নাই নাই, মুখই যেন বেঁধে রাখলেম, চোক ত খোলা ছিল, তারে ত আর বেঁধে কি ধরে রাখা গেল না। দেলজান এখন মুখ বন্ধ কোরে চোকের ভাষায় কথা কইতে লাগলেন। যখন অপর তিনজন কথায় কথায় অন্তমনস্ক হোলেন, সেই অবসরে প্রণয়িনী আখির ভক্তীতে কখন তাঁর কোমল হস্তধারা বৃহ বৃহ আমার গাত্রস্পর্শ কোরে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত কোলেন। বিধুমুখী উদারমনে স্পষ্ট বোলেন, “তুমি আমার যতখানি ভালবেসেছ, আমিও তোমায় ততখানি ভালবেসেছি। আমার

জন্তে যেমন তোমার মন অসুরাগে দগ্ন হোছে, তোমার জন্তেও তেমন আমার অন্তঃকরণ প্রেমরাগে গুড়ে যাচ্ছে, আমাদের উভয়েরই প্রণয়রাগ সমান।” সে দিন ঐ অবীরার বাড়ীতে সাক্ষাৎ কোন্ডে গিয়ে আমি মনে যে উল্লাস-তরঙ্গের কোলাহল হয়, আমার আজও তা স্মরণ আছে, বুকের মতো আনন্দের নৃত্য হোতে লাগল, আত্মাদ যেন কক্ষ বেড়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। আমার বেশ মনে হোছে, আমি যখন বিদায় হয়ে ফিরে বাড়ী গাই, পথে যেতে যেতে, মনে মনে এত কলা বোলতে বোলতে যাচ্ছিলেম, “কথা মিছে নয়, সত্যি বটে, দেলজান আমার নিতান্তই ভালবাসেন, চক্রমণী আমার একান্তই প্রণয়ভি-  
লাষিনী। দেলজান অতি সুশীলা, তাঁর স্বভাব অতি মধুর, তিনি অতি সাক্ষী, সেন স্বয়ং দাবিত্রী দেবী। রূপেরই বা কি প্রভা। দেহেরই বা কি ছটা। দেবকন্ডা বোলেই হয়। হৃদয় অতি সরল, মনে কোন চাহুরী নেই, রীত-প্রকৃতির গুণে তাঁর দেহকান্তির আরও অধিক গৌরব হয়েছে। বিধুমুখীর চিত্তহারিণী বৃহমন্দ হাসি, তাঁর মধুর কোমল ভাবভঙ্গী, তাঁর সরল প্রকৃতি, তাঁর নিরুপম উদার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি কোরে কার অন্তঃকরণ প্রকুল্লিত না হয়? আজ আমার সঙ্গে তিনি যেরূপ আমোদ আহ্লাদ, যেরূপ হাস্য-কৌতুক কোলেন, আমি তাঁর যেরূপ ভাব-ভঙ্গী দেখলেম, তাঁর কথাবার্তাও যেরূপ শুন-  
লেম, তাতে কোরে তিনি যে আমার অন্ত-রাগিনী হয়েছেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, আমি বই তাঁর আর কেউ নেহের পাত্র নেই।”

পরদিনও আবার তাড়াতাড়ি সেই অবীরার বাড়ীতে চোলে গেলেম। সে দিনও দেলজানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার কথা অবধারিত হয়ে থাকে। সেই কল্যাণী আর তাঁর পুত্র দুটি এবারও আমার যথেষ্ট সমাদর কোলেন। দেলজানকে তাঁহাদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমি ফুলকো চোকো হয়ে জিজ্ঞাসা কোলেম, “কই, দেলজান কোথায়? তাঁকে দিখাচিনে কেন? তিনি কোথায়



গেলেন ?” অবীরা কি একটা ওজর কোলেন,—কোথায় গেছেন, কি কাজে বাস্ত আছেন, কি, কি হয়েছে, এই ভাবের কি একটা কথা বোলেন, আমার মনে কিন্তু সে কথা লাগল না, আমার তা বিশ্বাস হল না। কি করি, শুনে চুপ কোরে থাকতে হোল। তীর্ণের কাকের ঝায় বোসেই আছি, কতক্ষণে আসবেন, এই ভাবতে লাগলুম। একটু পরে দেলজান এলেন, কি আশ্চর্য! কাল যে চেহারা ছিল, আজ তার কিছুই নেই, সব উলটে গেছে। তিনি আসতেই আমি তাঁরে সেলাম কোলুম। তিনি কিন্তু পূর্বের মত আমায় আদর-স্বর কোলেন না। অমনি এক রকম ফুলতোলা গোচ কোরে সেরে নিলেন, যেন বিরক্ত বিরক্ত ভাব জানালেন। আমি যে, ভাবনায় ভাবনায় শুকিয়ে গেছি, আমার মুখ দেখে তা বুঝতে পেরেও একবার জিজ্ঞাসা কোলেন না, “আমার কি হয়েছে, কি আমি এত স্নান কেন?” আমার জীবনের জ্যোতি, যার মধ্যে আমার প্রাণ, যার বলে আমি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি সেই ছুটি উজ্জ্বল আঁখি অবনত কোরে দেলজান অধোবদনে রইলেন, কখন বা মুখ ফিরিয়ে আস-পাশ চেয়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু ভুলেও আমায় একবার ফিরে দেখলেন না। দেখে শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেল, মনে বড় বিষয় হোল। নীরব, নিস্তর হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। যার আদরে আদর, যার মানে মান, সে আমার প্রতি আজ হঠাৎ বাম হোল, এ বর্ণচোরা ভাব আমি বুঝে উঠতে পারলুম না, ক্ষমতা হোল না যে, বাম—হার মানতে হল। সেই অবীরা আর তাঁর পুত্র ছুটি উঠে আর একটা ঘরে গেলেন, আমরা এখন দুজনে নির্জন হোলুম। এই অবসরে আমি মানিনী দেলজানকে জিজ্ঞাসা কোরব, “আজ তোমার হঠাৎ এরূপ মর্শ্বাতিক ভাবান্তর হবার কারণ কি? কেন তোমার অভিমান হোল? তোমার চন্দ্র-মুখে হাসি না দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পাচ্ছি।” কথাগুলি ভাল কোরে বলতে পাচ্চিনে, জো তো কোচ্ছি, জিব আড়িয়ে আড়িয়ে আসচে, কথা ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে, এমন সময়

দেলজান অঙ্গুলি হেলিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে বোলেন—“সামনের ঘরে পরিবারেরা আছেন, আহাির কোন্ডে বোসবেন, তার উত্তোগ হোচ্ছে।”

ঐ কথা শুনে আমি মরিয়া হয়ে বোললুম, “দেলজান! এ সকল কি কারখানা? আমি কি অপরাধ কোরেছি? কেন আজ আমি তোমার বিষয়নে পোড়লুম। কেন তুমি আমার প্রতি বাম হলে?”

দেলজান বোলেন, “মর্শ্বাবতার! আমি আপনার প্রতি ক্ষুণ্ণ হয় নি, কিন্তু এরূপ যাতায়াত, কি এরূপ দেখা সাক্ষাৎ করা আর হবে না, সিটি আজ থেকে রহিত কোন্ডে হবে। এখন অন্তিমতি করেন ত আমি বিদায় হই। আপনার মঙ্গল হোক, এই আমার বাসনা। সম্প্রতি রাজদরবারে যে গোলমাল হোয়ে গেছে, তার জন্তে আমি আন্তরিক দুঃখিত।” ঐ কথা বলে দেলজান সামনের ঘরের দরজার দিকে সরে গেলেন। আজ তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে যে অবস্থা, যে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন, সেই অবস্থা সেই অশ্রদ্ধার ভঙ্গীতে চন্দ্রাননী ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোলেন। আমায় অনাদর, আমায় হতশ্রদ্ধা করা দেলজানের যেন স্পষ্ট মনোগত অভিপ্রায় ছিল, বোধ হল। বাবার সময় আমার দিকে একবার একটু আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলেন। সিটি যে তাঁর অহুরাগের, কি স্নেহের চাউনি, তা বড় বোধ হল না, আমার দুঃখে যেন তিনি দুঃখিত হয়েছেন, অথচ নিরুপায়,—প্রতীকার করবার ক্ষমতা নেই, তাঁর সে চাউনিতে এই ভাবটিই অধিক বোধ হলো।

দেলজানের এই আচরণ দেখে আমি ত একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছি, আমার জ্ঞান-চৈতন্য ছিল না। সে অবস্থা কেটে গেলে একটু স্থগ্ন হয়ে, দৌড়ে, হুড়ু হুড়ু কোরে, সেই সামনের কামরার ভিতর উপস্থিত হলুম। অবীরা কে অনেক ধোরে কোরে, বিস্তর বিনয় কোরে বোললুম, “আজ যে কারখানা স্বচক্ষে দেখলুম, তাতে বড় ব্যথা পেয়েছি অন্তঃকরণ হুহ কোন্ডে, প্রাণ কেটে যাচ্ছে, ফুলে ফুলে উঠছে,

এরূপ ঘটনা হবার কারণ কি? কালও আমি এসেছিলাম, কই, তখন ত এ ভাব দেখি নি, এর মধ্যে হঠাৎ কি হল? এক রাত্রের মধ্যেই যে, সব উল্টে গেল, এর ভাং-পয়া কি? কেউ কি আমার নামে ঠকামি কোরে কান ভারি কোরে দিয়েছে? তা যদি না হয়, তবে আমি কি কোরে মনেতে প্রবোধ দিব? কি বোলে তারে বুঝাবো? কাল যে আমায় প্রাণের সমান ভালবেসেছে, আজ যেন সে, সে নয়, এরূপ অকস্মাৎ বিসদৃশ ভাবান্তর হবার কোন কারণ দেখিনে। অধিক নয়, পাঁচ সাত ঘণ্টা পূর্বে দেলজান যে আমায় প্রাণের সহিত ভালবাসতেন, এ কথা আমি দিব্যি কোরে বলতে পারি।”

অবীরা বলেন, “সে কথা মিছে নয়, এর পূর্বে আপনার দিব্যি করবার কোন বাধা ছিল না, তা অনায়াসেই পাতেন,” তাতে আপনি মিথ্যাবাদী হতেন না। এখনও কি দেলজান আপনাকে স্নেহ করেন না? তা করেন বৈকি। অমিত জ্ঞানি, আপনার প্রতি এখনও তাঁর বেশ মন আছে। তবে কথা কি, আপনি যখন প্রধান সেনাপতি, আর রাজশরীর-রক্ষকের প্রধান স্বামী ছিলেন, সেই সময় আপনাদের প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হয়। মনে কোরে দেখুন, তখন এক সময় ছিল, আর এখন এক সময়। এর মধ্যে কত কাণ্ড কত সৃষ্টি হয়েছে গেল। যাবেক বন্দেবস্ত সব উল্টে গেছে। দেলজান সন্ধানে সন্ধানে জানতে পেরেছেন, আপনি এক্ষণে রাজপরিবারের প্রিয়পাত্র নহেন, বাদশাহের প্রধান আমীরও নহেন, এ কথা কিছু আপনি অস্বীকার কোস্তে পারেন না।”

এ কথা শুনে ভারি চোটে গেলেম, তাঁরে বোলেম, “রও! রও! চুপ কর, আর ও কথা বোলতে হবে না, আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি, তুমি যা বোলবে, আমি যেন চক্ষের উপর তা দেখতে পাচ্ছি। তবে আর দেলজান আমায় ভালবাসতেন না? তবে আর আমার প্রতি তাঁর প্রণয় টান ছিল না? যুবতী তবে যুগে কেবল অমুরাগ জানাতেন, তার মনে অহা-ভাব ছিল। উঃ! হায়! হায়! কামিনি!

তোমার কি কঠিন প্রাণ! তুমি আমার সঙ্গে কি চাতুরীই খেলেছো! তবে যে দেলজানের ক্রোধোজ্জ্বল আঁধি দুটি বিকশিত কমল-দলের স্থায় প্রফুল্লছটায় আয়োদিত করে, সে কি শুদ্ধ ভোগভূষণ তৃপ্তি করবার মানসে? তিনি যে কমনীয় করপল্লব আমার অমুরাগাসক্ত হস্তের উপর রেখে মুছ মুছ কোমলস্পর্শ কোতেন, সে কি শুদ্ধ অর্থেরই লালসায়? প্রণয়ের কি কোন অমুরোধই নাই? সরল প্রণয় দেব-আরাধ্য, সুরাসুর প্রভৃতি সকলেই তা বাঙা করেন। সুবাসবাহী কুমুম-আদ্যাণে, প্রাতঃকালের মলয়া-হিল্লোলে, শরদের শশি-কিরণে, উষার স্নিগ্ধ প্রভায় অন্তঃকরণ যেমন প্রফুল্লিত হয়, পবিত্র প্রণয়েতেও মন তেমনই বিমল সুখে আয়োদিত হয়। পবিত্র প্রণয় করার বলে, সে পরিচয় কি দেলজান জানেন না? বিমল প্রণয়ের মধুর-তার স্নিগ্ধমূর্তি, তার অমুগ্ধ কোমল স্বভাব, তার উদার গুণ তিনি কি জন্মেও কখন অমুভব করেন নি? আহা! আমাদের উভয় হস্ত এক হয়ে চিরকাল আবদ্ধ থাকবার কথা ছিল, তা হলে আজ কি প্রমাদই পড়ত।”

আমি এখন শোকে আর মনস্তাপে অধীর হোয়ে পড়েছি, হায়! আমার এতদিনের আশা একদিনেই দুরিয়ে গেল। তাই ভেবে প্রাণে দারুণ ব্যথা পেলেম, ভারি কাতর হোলেম, জ্ঞান হল, কেউ যেন আমার হৃদয়পল্লব মুছে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। অন্তঃকরণ হুহ কোস্তে লাগল। সংসারের সকল সুখই যেন এককালে উঠে গেল, মরুভূমির স্থায় কেবল ধূম্রাময় দেখতে লাগলেম। চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল, কেবল লজ্জায় ডুকুরে কাঁদকে পাগ্লেম না। ইচ্ছা হতে লাগল, আগুনে কাঁপ দিই, কি রসাতলশায়ী হই, কি এক দিকে চলে যাই, দেশান্তরী হই, লোকালয়ে আর মুখ দেখাব না, বনে গিয়ে বাস করি। তাতে আমার তত কষ্ট বোধ হবে না, দেলজানের বিচ্ছেদ-যাতনা বিষম যাতনা, আমার প্রাণে তা সহ হয় না। সেই অবীরা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেন, “এক্ষণে এখানে যাতায়াত রহিত করাই আবশ্যক।” কেন আবশ্যক, সে কথাও বুঝিয়ে

বলেন। কিন্তু আমি যে এক্ষণে কেবল সাদক নামে একজন মোগল মাত্র আমার নামের সঙ্গে “আমীর” বা “ওমরা” ইত্যাদি কোন সম্মানের উপাধি সংযুক্ত নেই। সে কথাও আমার স্মরণ কোরে দিতে যুবতী বিস্মৃত হলেন না। ঐ কথা শুনে আমি বোল্লেম, “দেলজান আমার অদার জান কোরছে, অথচ আবার আমার জন্তে তাঁর দুঃখও জানান হয়। তা হোক, ফলে আমার সঙ্গে আর কখন তাঁর দেখাসাক্ষাৎ না হয়, এইটাই তাঁর বাসনা।”

দেলজানের হোয়ে অবীরা কত কথাই বোলতে লাগলেন। তাঁর বিচারে আমার সঙ্গে দেলজানের অপ্রণয় করা অত্যাচার কাজ হয় ন, বরং ভালই হয়েছে। তিনি বলেন “দরিদ্রতা একটি সাংঘাতিক পীড়ার স্বরূপ, তাই দেলজানের মনে বড় ভয় পাচ্ছে তাঁকে সেই দারিদ্র্য পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ কোতে হয়। তত্ত্বিহ্ন—”

আমি তাঁর আর কোন কথা কইনে না দিয়ে বল্লেম, “আপনি একটু ক্ষান্ত হোন! দেলজানের অসুযোগ মোখিক না হয়ে অকপট, অকৃত্রিম প্রণয়ে যেরূপ হয়ে থাকে, সেইরূপ যদি ঐশ্বরিক হত, তবে কি তিনি মনে কোলেই অপ্রণয় কোতে পারেন? তা কখনই পারেন না। প্রণয় কি খেলা করার পুতুল যে, তা নিয়ে কখন রক্তভঙ্গ কোলেম, আবার ইচ্ছা হল ত একপাশে ফেলে রাখ্লেম। প্রণয় অনাদরের বা উপহাসের বিষয় নয়, না তা বিস্মৃত হবার বস্তু, তাও নয়। রাজ্য-সম্পদের ভাবনাই হোক, অথবা কিসে মান-সম্মত হবে। সেই ভাবনাই হোক, অথবা ভাবনা যতই থাক না কেন, আর যত বড়ই হোক না কেন, প্রেম-চিন্তা সকলের প্রধান—সকলের উপর। প্রণয় একবার হৃদয় অধিকার কোলে কার সাধ্য তাঁর উচ্ছেদ করে? ফক্কনদীর অন্তঃসলিলের দ্বারা যার অন্তরে অন্তরে প্রণয়প্রবাহ চলেছে, সে প্রেমশ্রোত কি কখন অবরুদ্ধ হয়? তা কখনই হয় না। বলত প্রেম এক প্রকার দ্বিতীয় প্রাণ-পুরুষ, দেহ, মন আর প্রাণের সহিত প্রভেদ বা একাত্ম হয়ে তার জন্ম হয়, আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে তার পুষ্টিও হয়। শরীরের মর্মে মর্মে, তার

শিরে শিরে প্রণয়ের সঞ্চার আছে, তার প্রভাৱে দেহের তাবৎ ইন্দ্রিয় সবল, মনের তাবৎ শক্তি সতেজ হয়। দেলজান আমার যে ছিদ্র পেয়েছেন, তাতে কি অকৃত্রিম প্রণয়ের অনাদর হয়? না তার আরো গৌরব বাড়ে? ছুববহার সমগ্র যে প্রণয় ক্ষুদ্র না হয়ে এক অবস্থাতেই থাকে, সেই প্রণয়ই প্রণয়, আর মধুর প্রভাবে দিক্ উজ্জ্বল, মন পবিত্র, প্রাণ স্নিগ্ধ, স্বভাব বিমল হয়। আচ্ছা, তবে এখন আমি আঁসি, বিদায় হলেম। এক্ষণে আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে লড়াই কোতে চোলেম! আজ অবধি জান্লেম, ‘নারীর প্রণয় স্বপ্নের তুল্য, ইচ্ছামত হয়, আবার বায়ও ইচ্ছামত।’ আমার প্রতি দেলজানের অকৃপা হয়েছে, হোক, তবু তিনি সুখে থাক্লে সুখী হব। ভদ্রে! জগদীশ্বর করুন, তোমরা যেন দারার অত্যাচার থেকে পরিব্রাজ্য পাও। আমার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে এখান থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করাই বিধি।”

“হায়! পাণ্ডিয়ে আমি যাব কোথা, দাঁড়াই কার কাছে, কে আছে আমার যে, আমার বলে কোলে টানবে? আমার পুত্রেরা এক্ষণে অন্ত্র ধোতে শিখেছে। যে পক্ষ বিচার আর ধর্ম আছে, সেই পক্ষ হয়ে তারা লড়াই কোতে প্রস্তুত। একজনের ইচ্ছা আরঙ্গজেবের পক্ষ হয়, আর একটির ইচ্ছা, সুলতান সুলজার দরকারে বাহাল হয়। এত্থণে আপনার কি মত? কি অনুমতি করেন আপনি?” অবীরা এই উত্তর কোলেন।

এই সময় আমি শিরঃপীড়ায় অস্থির হয়ে পোড়েছি, এত কাতর হয়েছি যে, তাঁর ও কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা হল না। মাথা দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল, হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে অর্মান্বিত উঠ্লেম, আর তিলার্দ্ধও দেরি কোলেম না ছুটে বাহিরে এলেম। সদর রাস্তায় পোড়ে একটু ঘুরে যেমন একটা গলির মধ্যে যাব, চেয়ে দেখি না, দেলজান একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর অধর বেড়ে যুগ্ম হাসি নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে। আমার দেখে তিনি সরে গেলেন, গা-চাকা দিলেন। আমার

মতন লোক তাঁর স্বরণপথে উদয় না হয় ; মনে থেকে একবারে তারে নির্বাসিত করেন, এই তাঁর বাসনা ।

আমি পায় পায় আমার অভিনব স্বামীর ছাউনিতে চোলেম । পথে যেতে যেতে ভাবলেম, দেলজান প্রণয় ভঙ্গ কোরে মন্দ কাজ করেন নি । যে স্থলে মিলনের কোন আশাই নেই, সেখানে প্রণয় রেখে কি ফল । লাভের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অহুরাগ-অনলে নিরব-চ্ছিন্ন দগ্ধ হোতে থাকে, তার বিরাম নেই, তিলা-দগ্ধও বিচ্ছেদ নেই । ছিন্ন তরুর স্থায় উভয়েই দিন দিন শুক, দিন দিন শীর্ণ হয়ে যায় । তার চেয়ে অপ্রণয় করাই ভাল । মুখে ঐ কথা বললেম বটে, কিন্তু পোড়া মন কি তা বোঝে, অন্তঃকরণ কেটে যেতে লাগল । দেলজান আর আমার অহুরাগিণী নহেন, আমি আর তাঁর প্রণয়ের ভাজন নই, এই মস্তান্তিক দুঃখ আমায় যেন উন্মাদ কোরে তুলে । কিন্তু দেলজান মুখে যেরূপ প্রণয় জানাতেন, ততদূর অহুরাগিণী হয়ে তিনি যে আবার অবলীলাক্রমে সেই প্রণয় ভঙ্গ কোলেন, তাতে যে তাঁর মনে একটুও কষ্ট হল না, অন্যায়সেই তা কেড়ে ফেলে দিলেন, তাঁর ঐ নিশ্চিন্দ পান্দে ব্যবহারটি মরণ হয়ে আমার মন অনেক স্তম্ভিত হল । দেলজানের সেই উদারায়ত্ত বিরাগতাই আমার পক্ষে বর হল । আমি তাঁর প্রণয়ে নৈরাশ হয়েও তাদৃশ ক্লেণ বোধ কোলেম না । তাই আমি এখন নিরুদ্ধেগে, নির্ভাবনায় ছাউনিতে উপস্থিত হয়ে সৈন্তদের সঙ্গে ধুমধামে ব্যস্ত রইলেম, সেধানকার তাবৎ কর্ম প্রণালীপূর্বক নির্বাহও কোত্তে লাগলেম । নানা বরাতে, নানা ঝগাটে ব্যস্ত থেকে দিন কেটে যেতে লাগল সত্য, কিন্তু দেলজানের কোমল মূর্তি আমার অন্তরে বিরাজ কোত্তে লাগল, প্রণয়িনীকে একখানি অহুরাগ-আসন দিয়ে হৃদয়-মধ্যে বসিয়ে রাখলেম ।

ছাউনির মধ্যে ভারি গোল, গোলে কান পাতা যায় না । কত দিকে কত লোকে কল বল করে কথা কোছে, কেউ কোন দিকে হাঁকাহাঁকি কোছে, কেউ কারে মাছে, কেউ

কারে ধমকাচ্চ, কেউ হাস্চে, কেউ বাচ্ছে, কেউ হাস্চে, কেউ কাঁদ্চে, কোথাও কেউ নাচছে, কোথাও কেউ গাচ্ছে ! আমি কিন্তু তাক্ষেপও না কোরে একটা তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শয়ন কোলেম, শুয়ে নিরবচ্ছিন্ন দেলজানের বিষয় পান কোত্তে লাগলেম । আমি এই ভাবতে লাগলেম, হয় ত দেলজানের প্রতি আমি অবিচার কোচ্ছি, তিনি যে দেলজান, সেই দেলজানই আছে । বিধুমুখী অতি সরলজন্ম, তাঁর প্রতি উদার মন, তাঁর প্রণয়ও উদার । রসময়ী আমায় প্রাণের জ্যোতি । আমার সাধনের ধন । দেলজান যেন নববিকশিত অরুণ কমল, যেন অবিকল সুকোমল কুসুমপতিকা । তাঁর অন্তঃকরণ স্নেহ-ভারে এমন চাপ । তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে বোধ হয় যেন, কর্ণে অমৃত-ষণ হোচ্ছে, তাঁর রসনা যেন সুধার ভাণ্ডার । তাঁর মৃদু মূর্তির কোমল রাগে, তাঁর বদন চন্দ্রিমার বিনোদ-ছটায় মন যেতে উঠে, প্রাণ আকুল হয় । দেখলে বোধ হয় যেন, যুবতার ওষ্ঠাধর অনল-প্রভীর লোহিত রাগে রঞ্জিত । তাঁর হাব-ভাব, তাঁর বিলাস ভঙ্গী, তাঁর নয়নকটাক্ষ মদনের শর হয়ে পুরুষের প্রাণবধ করে । তাঁর পরিমলবাহী বোবন-কুসুমের আশ্রাণে মন মুগ্ধ হয় । প্রমদার ভূবনমোহিনী মূর্তি যে একবার দর্শন কোরেছে, সে আর জীবন-সঙ্গে সে সাধুরা ভুলতে পারবেনা । শরতের জ্যোৎস্না-রাতে নদীজলে শশিকিরণের ছটা পোড়েছে, বায়ুর মন্দ মন্দ হিল্লোলে অল্প অল্প চেঁটে হোচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ঝঝঝ ঝঝঝ কোচ্ছে, যেন মণিমাণিক্যে ঝচিত হয়ে নাচতে নাচতে চণেছে । তখন নদীর কি মনোহর শোভাই হয়, যত দেখি, ততই দেখতে বাসনা যায়, চক্ষের পলক ফেলতে ইচ্ছা করে না । আজ আমি দেলজানকে দেখে সেইরূপ প্রকুপ্লিত হয়েছিলেম । নীলাশ্বরী বস্ত্রখানিতে তাঁর লাবণ্যের ছটা পড়েছে । বাতাসে যখন বস্ত্র-খানি এক একবার আন্দোলিত হোচ্ছে, অমনি ঝলকে ঝলকে চারু কান্তির আভা বেরুচ্ছে, সুন্দরী যখন একটু হেলচেন, কি যখন একটু

হুলছেন, তাঁর নীলাম্বরী ফুড়ে রূপের তরঙ্গ দেখা দিচ্ছে। বিধাতা দেলজানের অধরে কি মধুর হাসিরই সৃষ্টি করেছেন! তাঁর সে ভুবনমোহিনী হাসিতে প্রাণের অশ্রুপাত হয়, হৃদয় গলে যায়। দেলজান! সুন্দরি! তোমার মধুর মৃতির কত মনোহারিনী শক্তি! তার স্নিগ্ধ প্রভাবে প্রণের উগ্রমূর্ত্তি মধুর জ্ঞান হয়। প্রাণে ভয় না হয়ে বরং মন প্রকল্লরসে ভাসতে থাকে। আমি যে সম্প্রতি আরঙ্গজেবের সঙ্গে রণমন্ডে মেতেছি, সে শুদ্ধ তোমারই অঙ্গগ্রহে, তোমার যৌবন-তরঙ্গের বিনোদচ্ছটা মনে কোরে আমার মনে দ্বিগুণ উৎসাহ, দ্বিগুণ সাহস হয়েছে। চারুনয়নে! তোমার দর্শন মাতেই আমি সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ হতে অবসর পাই, তখন আক্লাদে জ্ঞান হয় যেন, আমার হৃদয়গগনে একটি স্নেহস্বার্থের নবোদয় হয়েছে। প্রিয়ে! সাগর যেমন নদ-নদীর জল আকর্ষণ করে, তুমি তেমনি আমার মন-প্রাণ আকর্ষণ কোরেছ। পবিত্রে! লোকে যেমন একটি সুবাসবাহী চারুপুষ্প দর্শন কোরে মনে বড় প্রকল্লিত হয়, ইচ্ছা হয় যে, তারে আদরে যত্ন করে, তোমার দর্শন কোরে আমি সেইরূপ পুলকিত হই, মন আপনা হতেই তোমার প্রেমাদরে ভালবাসতে চায়। বাস্তবিক তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি সব দুঃখ ভুলে যাই।

আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তার ত কোন আকারই নেই, প্রণয় রেখে লাভ এই হবে, কেবল ক্ষোভে আর মনস্তাপে চিরকালটা কেঁদে মস্তে হবে। তাই বুঝি, দেলজান মনো-রাগ বাড়তে ভয় কোচ্চেন। দেলজান প্রণয়-মোহিতা, অপ্রণয়িনী নহেন। আমি অতি মৃদু, অতি পামর, তাই তাঁরে পাষণী, তাই তাঁরে অননুরাগিণী বলি, বাস্তবিক তিনি তা নন, সিটি তবে আমারই দোষ, তাঁর দোষ নয়। বলতে কি, দেলজান অতি ধীর, অতি বুদ্ধিমতী, আমিই নিকোষ, আমারই বিবেচনা শূন্য, আমি একটুতে অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। মদনরাগে মত্ত হয়ে আমি একেবারে অসার হয়ে পোড়েছি, আমাতে আর কোন পদার্থ নেই। আমার “এই বাহু” এক দিন সমুদ্র কণ্টক ছেঁদন কোরে অতুল সম্পদের

পথ পরিষ্কার কোরবে। যে দিন থেকে সেই শুভদিন সুপ্রভাত হবে, সেই দিনাবধি দেলজানের মৃণালতুল্য কোমল পার্শ্বের অবীশ্বর হবে। সেই দিনাবধি রসময়ীর মধুর প্রসঙ্গ অহরহ আমার রাগাসক্ত রসনায় নৃত্য কোরবে। সেই দিনাবধি প্রমদাকে প্রেমের প্রতিমা কোরে হৃদয়ে বরণ কোরব। তাঁর কোমল মাহিমা, কোমল গুণ, কোমল গৌরব, তাঁর কোমল স্বভাব হৃদয়পটে, রাজপথে, বৃক্ষশাখায়, গিরিগাত্রে লিখে রাখব। বিহঙ্গমকূলকে শিথিয়ে এই কথা বলে ছেড়ে দেব, “তোরা উড়ে উড়ে, দেশে দেশে গুণময়ী প্রণয়িনীর গুণ গেয়ে গেয়ে বেড়া।” আমি বাহুজ্ঞান-শূন্য হয়ে একমন, একচিন্তে দেলজানের বিনোদ মূর্ত্তি, তাঁর মুখকান্তির কোমল তরঙ্গ, তাঁর নির্মল চরিত্রে চিত্রপটে চিত্র কোচ্ছি, এমন সময় আরঙ্গজেবের লোক এসে আমার বাধা দিলে। রাজপুত্র আমার ডেকে পাঠিয়েছেন, এমন অসময়ে রাজকুমার কেন ডাকলেন? তবে বুঝি কি আবশ্যক হয়েছে, এই ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালেম। হরকরার সঙ্গে সঙ্গে চোলেম, সত্বরেই তাঁর তেজোজ্বল মনোহর বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হলেম।

## অফিম পরিচ্ছেদ ।



“যার যেমন মতি, তার তেমনি গতি।”

আরঙ্গজেবের সভায় এসে দেখি, কুমার ভাস্কর ধার্মিক হয়ে ভণ্ড প্রবঞ্চনা কোত্তে বসে-ছেন। মোল্লা, মোলবী, দরবেশ, ফকির, নবী, বুজুরগ—এই সকল পুণ্যাশ্রা মহাপুরুষেরা তাঁরে ঘেরে বসে আছেন। কুমার কেন তাঁদের আহ্বান কোরেছেন? ধর্ম্মনীতি শিক্ষা কোর-বেন বোলে? না, পরমার্থ বিষয় চিন্তা কর-বার মানসে? সে সকল কিছুই নয়। কুমা-রের আগাগোড়া হারামজাদ্গি, তাঁর সব কার-সাজি, সব বজ্জাতি। কেবল একটা ভেঁক

সেজে ভেলুকি দেখিয়ে সকল লোককে, বিশেষতঃ তাঁর ভ্রাতাদের অন্ধ কোরবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়। আরজ্জ্বেবের পেটে গেটে নষ্টামি, তাঁর মনের কথা এই, লোক মনে করুক, “আরজ্জ্বেব উদাসীন, আরজ্জ্বেব বিবেকী, আরজ্জ্বেব সংসারত্যাগী, বিষয়-বৈভবের প্রতি তাঁর লোভ নেই, ঐহিকের সূত্রে তিনি আসক্ত নহেন।” তা হলে তাঁর সোদরেরা মনে কোরবেন, আরজ্জ্বেব রাজপদের অভিলাষী নন, সেই খাতিরজন্মায় তাঁরা অসাবধান হবেন, কুমার তখন সুরোগ পেয়ে রাজসিংহাসন আল্টপ পাগ্ন আপনার হস্তগত কোত্তে পাববেন—এই তাঁর সার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি ত তাঁর নাড়ী-নক্ষত্রের সব খবরই রাখতেম, আমি ত জানতেম, আরজ্জ্বেব দুরন্ত বিষয়-অভিলাষী, সংসার-সূত্রে প্রতি তাঁর যতখানি নক্ষর, ততখানি তার ভ্রাতাদের নয়। হিন্দুস্থানের রাজসিংহাসনের উপরেই তাঁর লক্ষ্য, ফকিরের ছেড়া-কাটা টুপীর উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি যে রাজপদের সুরোগ পরিচয় কোরে তার পরিবর্তে জগদীশ্বরের চিন্তায় সন্নিবিষ্ট হবেন, তিনি সে ধোতের, সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। রাজকুমারের কপট উদাসীনতার প্রতি দৃষ্টি কোরে আমি একটু না হেসে থাকতে পারেন না।

আমি এক কোণে দাঁড়িয়েই আছি, রাজপুত্র একবার ফিরেও দেখেন না। কতক্ষণ পরে সাধুরা বিদায় হয়ে বার যে স্থানে চলে গেলেন। তখন আরজ্জ্বেব তাঁর দুটি ভীকু চক্ষু ঘুরুতে ঘুরুতে আমার দিকে চেয়ে বোলেন, “যুবা! তোমার তস্বি কোথায়?” আমি যথেষ্ট কোন উত্তর না দিয়ে, আমার একখানি হাত তলোয়ারের মুঠের উপর রাখলেন। তাই দেখে রাজকুমার ইসারা কোরে বোলেন, “একটু এগিয়ে এস। একদিন সে সময় হবে, তখন তোমার ঐ অস্ত্রের ভারি গুমর হয়ে দাঁড়াবে। এই তস্বি লও, আপাততঃ ফকিরদের চেলা হয়ে থাক।” আমি হাঁটু গেড়ে, নিচু হয়ে, ঘাড় বাড়িয়ে দিলেম, রাজপুত্র আমার গলায় তস্বি পরিয়ে দিলেন, আর বলেন, “চারিদিকে নজর

রেখে সাবধান হয়ে চলো। বিবাদক-লেহের দিকেও যেও না। তুমি যদি আমার অন্তঃগত হয়ে থাক, আমি ফকিরই হই, আর রাজাই হই, আমার অসময় হলে, আমি তোমারে ভুলব না। এক্ষণে তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, বল, সাধ্য হয় ত পূর্ণ কোরব।”

আমি বোলেন, “কুমার বাহাদুর! কেবল পিতার জ্ঞেই আমার দুর্ভাবনা।”

“তোমার পিতা! কোথা তিনি?”

“তা আমি জানিনে, ধর্মাবতার! বোধ হয়, তিনি দারার গ্রামে পোড়েছেন, আমার সেই ভয় বাড় হোচ্ছে।”

আরজ্জ্বেব বোলেন, “তবে তাঁরে কালে ধরেছে, এখন ভগবানের হাত, তিনি ভিন্ন আর কারও রক্ষা কববার ক্ষমতা নাই। তাঁর দফা নিকেশ হয়েছে, তাঁর বরাতে শীলমোহর পোড়ে তাঁর অদৃষ্টের দ্বার কুদ্ধ হয়ে গেছে। দেখো, সাবধান! আবার তুমি যেন তাঁর বেড়াফালে পোড়ে ধরা দিও না। সূর্য্যদেবের উদয়ান্ত যেমন অস্তান্ত সত্য, দারার খপ্পরে পোড়লে তোমার মৃত্যুও তেমনি অবধারিত সত্য। তখন জগৎস্বামী সাজাহানেরও সাধ্য নাই যে, তোমারে বাচান।”

আমি ঐ কথা শুনে, চোক-কান বুজে, মরি মরি কোরে, ভীকুক্রমে এই কথা বোলেন, “আরজ্জ্বেব যদি মনে করেন, তিনি যদি মধ্যবর্তী হয়ে প্রাণদান দেন, তবে আমার ততভাগ্য পিতা রক্ষা পেলোও পেতে পারেন।”

ঐ কথা শুনে আরজ্জ্বেব বোলেন, “আমি তোমারে নিশ্চয় বলছি, আমি তার মথো থেকে কিছুই কোত্তে পাব না, তাতে কোন ফলই হবে না। বিশেষতঃ তোমার পিতাকে যখন ধোরে নিয়ে যায়, তখন কিছু তিনি আমার কারপরদাজ ছিলেন না, তবে আমার দোহাই দারা শুনবে কেন, আমার কি অধিকার আছে যে, এ বিষয়ে হস্তপ্রদান করি, কোলে অনধিকারচর্চা করা হয়।” আমার আর অধিক কথা বোলতে ভরসা হল না। তার পর রাজকুমার আমায় ডেকে বোলেন, “ডেকানে

যেতে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক, যখন হুকুম করবো, তখন উঠতে হবে।” এই কথা বোলে হস্ত চলিয়ে দ্বৈত কোলেন, আমি সে সঙ্কেতের অর্থ জান্তেম, তাই বিদায় হয়ে আপনার ডেরায় এলেম, এসে দেখি, সলিমান আমার প্রতীক্ষায় বোসে আছে।

সলিমানেব ভাব-ভঙ্গী, তার চোক-মুখের চেহারা ভারি ভারি দেখে আমি বুঝতে পার্লেম, সে আমায় কোন বিশেষ কথা বোলবে। তারে জিজ্ঞাসা কোলেম, “কেমন, কোন খবর আছে না কি?” সলিমান তার বুকের ভিতর থেকে একখানি চিঠি বার কোরে আমার হাতে দিলে। আমার আর দেরি সইল না, পত্রখানি তাড়া-তাড়ি খুল্লেম, খুলে দেখি, দেলজানের হস্তাক্ষর। আমি অমনি আফ্লাদে নেচে উঠ্লেম। আমার আমোদিনী এই কথাগুলি লিখেছেন।—

“সখে! যে দিন থেকে রাজপুরে গোলমাল বেধেছে, সেই দিনাবধি তোমার ছায় আমার মনেও দারুণ কষ্ট হোচে, আমরা উভয়েই বিচ্ছেদ-ভলাহল আশ্বাদন কোচ্ছি। আমি আপনাকে অনাদর, অবজ্ঞা কোরছি, আপনি তাতে দুঃখিত হয়েছেন, হতে পারেন, কিন্তু আপনি কি মনে কোরেছেন সভ্য সভাই আমার মনের ভাবান্তর হয়েছে, আপনি কি বিবেচনা করেন নি, অবস্থা কি? সেই অবস্থার দোষেই যে আমার মুখ বন্ধ কোত্তে হয়েছে। নচেৎ তোমার মনে কষ্ট দিয়ে আমি কি কখন সুখী হতে পারি? যে অবধি তুমি আমার অভিমানে অপমান বোধ কোরে ফিরে গেছ, সেই দিন থেকে আমি অত্যন্ত অসুখী, খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, কারও সঙ্গে কথা কয়েও সুখ হয় না, মন ছুঁ কোচে, প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে। সখে! সে দিন তুমি এখান থেকে চলে গেলে, মুজারের স্ত্রী তোমার হয়ে আমায় বিস্তর প্রণয়-ভৎসনা কোলেন, কিন্তু আমি তাঁরে পাঁচরকম বুঝিয়ে বোলেম, শুনে কতক নিরস্ত হলেন। অবীরা বোলেম, ‘দেলজান! তোমার কি কঠিন প্রাণ! কি কোরে উজীর-পুত্রকে অমন নিষ্ঠুর কথাগুলি বোলে ভাই? তোমার কি একটু দয়া হল না, প্রাণে কি একটু দুঃখও হল না,

সাদক অতি সুজন, তিনি তোমাকে এত ভাল-বাসেন যে, তোমার জন্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, একে ত তিনি পুরুষ, তার আবার তোমা বই জানেন না, ছি! তারে কি অমন নিষ্ঠুর বাক্যে, আরজুনয়নে বিদায় কোত্তে হয়?’

আমি বোলেম ‘সখি! ঐ জনোই ত তাঁরে তত অহযোগ কোলেম, ভালবাসেন বলেই ত তাঁর উপর তত অভিমানিনী হলেম। তাঁর সুকোমল কুসুমসদৃশ নবীন আকৃতি, তাঁর মধুর স্বভাব, তাঁর সরল হৃদয়, তাঁর অকপট অহুরাগ, এরা সকলে চক্রান্ত কোরে আমারে তাঁর প্রণয়ের পক্ষপাতিনা কোরেছে। সখি! উজীর-পুত্র যখন আমার নয়ন পথের পথিক হন, আমি তখন আফ্লাদে দিগন্ধ হয়ে আপনাকে হারাই, কোথায় আছি, কি কোচ্ছি, কিছুই জান থাকে না।’

অবীরা বলেন, ‘সখি! উজীর-পুত্রের প্রতি তুমি যদি এতই অহুরাগিনী, তবে মৌখিক ছলনা কোরে সে সুধাময় প্রণয়রাগ গোপন কর কেন? কেনই বা সেই মনোময় চিন্তচোরের নিকট তোমার প্রেমোদিত হৃদয়ের পরিচয় না দাও?’

আমি বলিলাম, ‘সখি! সে কি কথা, সাদকের এই ধোর বিপদ, আমিও যে কষ্টে পোড়েছি, তাও তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছো, এখন কি আমার প্রণয়সুখে আমোদিনী হবার সময়? তাতেও কি কখন চিন্তের বিনোদ জন্মে? না হৃদয় বিকসিত, না মন প্রফুল্লিত হয়? সে প্রণয় ত আর সুখের প্রণয় নয়, আমার পক্ষে তা এখন ছলনা মাত্র। লোকে যেমন স্বপ্নে কত প্রকার সুখে আমোদী হয়, অথচ সকলই প্রতারণা, সখি! এও ঠিক তাই আর কি।’

তাই বলি, সখে! সে দিন তোমার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কইনি বোলে তুমি মনে কোরেছ, সত্যি সত্যিই আমার মনে ভাবান্তর হয়েছে? সময়গুণে যে সব সহিতে হয়, সব কোত্তে হয়, তা কি জান না? আমাদের অবস্থার দোষেই যে আমাকে মুখবন্ধ কোরে থাকতে হয়েছে, সেট কি তুমি বিবেচনা কোত্তে পার নি?



‘মিত অজ্ঞান নও, জান ত, লোকের কিরূপ হুজুর, তিল হয় ত তাল কোরে তোলে, একটু কিছুর গন্ধ পেলে অমনি নেচে ওঠে। লোকে যদি একটা কুকথা রটিয়ে দেয়, তখন তুমি কার মঞ্চ হাত দিয়ে চেপে রাখবে? তোমায় না দেখতে পেয়ে প্রাণে যে কি হোচ্ছে, তা প্রাণই জানে, মুখে তা কত বোলব, বল্লো তুমি তা বিশ্বাস কোরবে কেন? মুখ যেশন দেখা যায়, ভেতর যদি অন্তঃকরণ দেখা যেত, তবে আমি তোমাকে বুক চিরে দেখাতেম। তোমার অদর্শনে আমার অন্তঃকরণ পুড়ে পাক হয়ে যাচ্ছে কি না, তুমি তা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। তা হোক, পুড়ছে, পুড়ুক, তবু আমি সঙ্গে আছি, মোকের কুড়র হাত থেকে যে বেঁচে গেছি, সেই আমার পরম লাভ—সেইটিই আমার প্রবোধের ফল হয়েছে! কিন্তু সখে! অল্পরাগের কেমনই প্রজাব, এত যে লোকলজ্জার ভয়, তবু অবোধ মন তা বোনে না, পোড়া আঁধি একবার তোমায় দেখতে বাসনা করে। ও সখে! যে পর্যন্ত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোয়ে মনের বোকা খালাস কোত্তে না পারি, সে পর্যন্ত মনের দুঃখ মনেই থাকবে। অজ্ঞ আত্রে, যে সময় আমার সাধন, সজাগ প্রহরীরা নিদ্রা যাবে, সেই সময় হিরাবাগে এসে এ অদিনীকে একবার দেখা দিয়ে চরিতার্থ করো। আমার সেখানে যাওয়া বড় দুঃসাহসের কাজ সত্য, তখাচ আমি আঁকসারে বুক বেঁধেছি, তোমার পাদপদ্ম স্মরণ কোরে আমি ঘরের বাহির হব। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার সব কষ্ট দূর হবে—আমি স্বাধী হব। এক্ষণে আমার কোন কৰ্ম-কাজ নেই, কেবল বসে বসে দিন গুন্ছি, আর একাকিনী থাকতে পারিনে, নিঃশব্দে থেকে থেকে বিরক্ত হয়েছি। ইতি

আশ্রিতা—

শ্রীমতী দেলজান।”

পত্রখানি পোড়তে পোড়তে আনন্দের তুফান উঠল, আমি সেই তরঙ্গে ভেসে জোলেম। একবার, দুবার, তিনবার পোড়লেম, তাতেও ভুগ্ন হলেম না। শেষে ফিরে পোড়তে লাগলেম, যত পড়ি, ততই পড়বার তৃষ্ণা

বাড়ে। তবে দেলজান অধর্মী নন, আমারই অজ্ঞায় সন্দেহ। তাঁর এ মনান্তর কেবল মৌখিক লোক-দেখান, আন্তরিক নয়। যুবতী বড় চতুরা, লোকের মুখ থেকে তরবার নিমিত্তে কাজে কাজেই তাঁকে মোনব্রত অবলম্বন কোত্তে হয়েছে। যুক্তারের স্ত্রী আমাদের পর নন, পরমাত্মীয় বটেন, কিন্তু তাঁকেও বিশ্বাস করা উচিত হয় না। তাঁরও ত আত্মীয়-বন্ধু আছে, কি জানি, যদি কথায় কথায় তাদের কাছে প্রকাশ কোরে ফেলেন, দেলজানের মনে মনে সেই ভয়। পত্রখানি বাহাত দিয়ে ধরে, তাতে বারংবার চুষন কোরে বোলেম, “সলিমান! দেখেছ, দেলজানের বুদ্ধির কত দৌড়, তিনি কত বিবেচনা, কত হিসেব কোরে চলেন।”

সলিমান বল্লো, “হজুর! দেলজান ভারি তুখোড় দরের লোক, সে ভারি চলে চলে। আমি তারে অনেক দিন থেকে জানি, সে ভারি ঘাচি, ভারি ঝাড় মেয়ে সে, আচ্ছা লেফাফা দোরস্ত। দেখতেও দিকিটি, দেখে চোক টাটায়, কথাগুলিও পাকা পাকা, রসাল রসাল। তার চাতরে পোড়ে কত হজুর হিম সিম খেয়ে গেলেন। হজুর! আর ও আঙুন তুলে কাজ নেই, তার সকের প্রাণ, সকের প্রীতি। তার মন কেউ আঁকড়ে পায় না। হজুর! গোস্তাকি মাপ কোরবেন, সেটা হানা মেয়ে, তার সঙ্গে প্রীতি কোরে কেউ তরে আসতে পারে না। আমি অনেক মাথাল মাথাল, সারাল সারাল যুবতী দেখেছি, কিন্তু দেলজান একলা একশ যুবতীর মণ্ডা নিতে পারে। যত বয়স হোচ্ছে, তার যৌবন যেন আরো গজিয়ে উঠছে। দেহখানি আরো জমাট বাঁধছে। কত শত বড় বড় আত্মীয়, বড় বড় ওমরা সেধে সেধে হালাক হয়ে গেল, তবু তার মন হাতড়িয়ে পায় না। দেলজান বড় পীরিত-ছেঁচড়া, জিটিই তার ভারি যোগ, নচেৎ তার আর সব গুণ ভাল। লোকে বলে, তার সঙ্গে প্রণয় কোলে ছাঁকা আমোদ



হয় না। আর একবার যদি আস্থার পাশ, অমনি মাথায় চড়ে বসে।”

তার ঐ ভাড়াটির কথা শুনে আমি চোটে একটা ভাড়া দিলেম, “বেটা! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! তুই সমস্ত কথাতেই ঠোকর মারিস! আমার সঙ্গে তোর ঠাট্টা-তামাস! চুপ কোরে থাক!” সলিমান ঐ ভাড়া খেয়ে কঁকড় দৌকড় হয়ে চুপ কোরে রহল।

‘আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লেম। কখন রাত হবে, কতক্ষণে হিরাবাগে গিয়ে দেলজানের মুখচন্দ্রিমা’ দর্শন করুব, তাই বসে বসে এক দুই কোরে কেবল সময় গুণতে লাগলেম। আজ বড় অপ্রসন্ন দিন, মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আকাশ ঘোর ঘোর হয়ে আছে। বর্ষাকাল উপস্থিত, বৃষ্টি আরম্ভের বড় দেরি নেই, আজ না হয়, কাল হবে, এইরূপ সম্ভাবনা। এখন সন্ধ্যা, তার প্রাক্কালেই ঘোরতর অন্ধকার হয়ে প্রকৃতির ভ্রমোন্মী ভীষণমূর্তিতে চতুর্দিক ঢেকে ফেলেছে। যেরূপ আড়ম্বর, যেরূপ মেঘের ঘটা, একটা ভারি ঝড়-বৃষ্টি হবে, তার আকার বটে। কিন্তু তবু আমি মনে কোচ্ছি, “এখন হচ্ছে না, এখনও বিলম্ব আছে। ঝড়ের পূর্বেই হিরাবাগে পৌঁছিতে পারব, আমাদের সাধের দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারবে, তার কোন ব্যাঘাত হবে না।” আমার নিজের জন্তে বড় চিন্তা ছিল না, দেলজানের নিমিত্তেই আমার ভাবনা। সাংকেতিক স্থানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে পাড়ে পথের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হয়ে দেলজানের কাপড় চোপড় ভিজ়ে যায়। তা হলে ত ভারি পঁচা-পঁচি, তখন কোথায় গেছিলে, কেন ভিজ়লে, এইরূপ কত কথা লোকে উপস্থিত করুব।

আজ কাল আরজঞ্জবের সঙ্গে দুই শত অল্পচর। তারা যে যেখানে সুবিধা পেয়েছে, যার যেখানে ইচ্ছা হয়েছে, তামাম মাঠে ছড়া-ছড়ি হয়ে কানাত বিছিয়ে আছে। স্বয়ং রাজ-কুমারের তাঁবু মহা সমারোহ কোরে শতমধ্যস্থলে খাটান হয়েছে। তাঁবুর সামনে একটা ঝণ্ডা গাড়া, তার মাথায় একটা পতাকা উড়ছে। ঝণ্ডাটি এত লম্বা যেন, আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এই নিশানটি রাজতাঁবুর পরিচয়। রাত্রিকালে একটা

আলো জ্বলে ঐ ঝণ্ডার মাথায় বেধে বুলিয়ে দেওয়া হয়। লণ্ডনের উজ্জ্বল আলো দেখে লোক মনে কোতো, ঐ ঝণ্ডার নীচে ছাউনির সেনা-পতি কুমার বাহাদুর সুখে অবস্থান কোচ্চেন।

রাজপুত্রের যে তাঁবু, তার চারিদিকে পাহা-রাওয়ালারা খাড়া পাহারা দিত। তোষাখানার, দপ্তাখানার, বাবুরচিখানার একরূপ আরো অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু রাজতাঁবুর আশে পাশে ছড় ছড়ি হুগে খাটান থাকত। ভারি রোগাল রোগাল, যমদূতের তায় মূর্ত্ত, হুটো-কুকুর তামাম রাত্রি যেউ যেউ কতো, তাদের ডাকের দাপটে কানে তালি লেগে যেতো। গুণপ্রণয়ের তায় আজ একটা ভারি দুর্ঘ্যোগের আশঙ্কা। এখন সন্ধ্যা, অরুণ সারথি পশ্চিমাচলে চোলে গেছেন। ধার্মিক যুসলমানেরা দঙ্গল বেধে সাহসকালের নেমাজ কোলেন। সকলে সন্ধ্যা-খেয়ে দেবে যে যার স্থানে গিয়ে শুয়েছে। সংসার নিষ্ঠুর, কোন দিকে শব্দটি নাই, সব নীরব, সব নিস্তব্ধ। কেবল পশ্চিম উত্তর কোণথেকে একটা হাওয়া উঠে হ হ কোচ্ছে, এক একটা দমকা খুব জোরে জোরে আসছে। বাতাস ক্রমে প্রবল হলো, ঝড়ের আকার হয়ে উঠল। জাহাজের মাস্তুলের তায় তাঁবুর খুঁটিগুলি ভয়ে পোড়ছে, যেন শুয়ে যাচ্ছে, আর এক একবার চড়চড় কোরে উঠছে, যেন ভেঙ্গে গেল। তাঁবুতে তাঁবুতে বেধে বাতাস ঘুরে ফিরে ছাউনিময় যেন মাতায়ে বেড়াতে লাগল, আর কেবল সঁ সঁ, গৌ গৌ, ভৌ ভৌ শব্দ হোচ্ছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘের আড়ম্বর দেখে পূর্বাভাসে সাব-ধান হওয়া হয়। ঝড়ে কোন আনিষ্ট না কোরে পারে, তাঁবুগুলি যাতে টেকে থাকে, তার উপা-য়ও করা হয়েছিল। রাত ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছে, এখন কেউই জেগে নাই, সকলেই নিদ্রায় অভিভূত কেবল আমাদেরই চক্ষে ঘুম নেই, আমরাই কেবল জেগে, বুঝাবার চেষ্টাও করিনি।

দিন যায়, রাত হয়, রাত যায়, দিন হয়, সংসারচক্রের তায় ফিছে। আমার আশাবাসুও একবার যাচ্ছে, একবার আসছে, কুলালচক্রের তায় ফিরে ফিরে গভায়াত কোচ্ছে। দিন যায়, থাকে না। রাতও যায়, থাকে না—সময় কাঁও

বাধা নয়, কারও মুখ চেয়ে থাকে না, আমি কিছু ভাবছি, আমার আশা এবার যাবে না, আমার বাধা হয়ে থাকবে। এক, দুই, তিন, ঠন ঠন কোরে বারোটা বাজল, প্রকৃতি বোষণা কোলেন, রাত দুই প্রহর হলো, আমি অমনি গাঝড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আন্তে আন্তে পা টিপে টিপে, চুপি সাড়ে তাঁবুর বাহিরে এলুম। কেউ কি আমায় ধেঁধেতে পেলে না? রাত ঢের হয়েছে, সকলেই ঘুমে অচেতন, এখন কে জেগে আছে যে দেখবে? যদিও কেউ থাকে, যে অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা যায় না, আমায় চিনবে কেমন কোরে? তবে সকলেই কি ঘুমিয়েছে? না। একজন জেগে আছে, সে অন্ধকারে দেখতেও পায়, চিনতেও পারে। কে সে? “মন্ডভাগা!” হা মন্ডভাগা! তোমার কি প্রতাপ! তুমি বড়কে ছোট কোছো, থাকে দুঃখী কোছো, আশ্রয়কে নিরাশ কোছো। আমার অসাধ্য কি? এই গভীর রাত, এখনও জেগে আছে? আমার জন্মেই বুঝি? এই বার অন্ধকার, তবু আমার চিনতে পেরেছ!— হিরে এসে একটু থমকে দাঁড়ালাম, একটু দম লেন। গাটা একবার কাঁটা দিয়ে উঠল, মনটা দলকে গেল। দূরে মেঘগজ্জন হোচ্ছে, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে, কড় কড়, গড় গড়, গড় গড়। দূরে দেবতা ডাকছে, মধো মধো বিহুং চম-কাচ্ছে, প্রলয়ের ঘোষণা হোচ্ছে বুঝতে পারেন, দুঃপাতও কোলেন না। এই মনে কোলেন, ঝড়-তুফানের পূর্বেই দেলজানের সঙ্গে দেখা কোরে ফিরে আসতে পারব। এখন যুঁ-যুঁটে অন্ধকার, আমি সেই অন্ধকারে চোলেছি, মন্ডমন্ড কোরে চলেছি। যেতে যেতে কান-তর দড়ি বেধে, ঠোঁকর ধেয়ে, এক দিকে ঠিকরে পোড়-গেম। এক জন তাঁবুর মধ্যে থেকে ‘কে ও’ বোলে সাড়া দিয়ে উঠল, আমি উত্তর দিলেম না, চুপ কোরে রইলুম। আর পা বাড়াতে সাহস হোচ্ছে না, কি জানি, যদি আবার ঠোঁকর খাই। এই সময় এক ঝলক উড়ি-আলো ঝকঝক ঝক কোরে উঠল, তাতে আমার অনেকখানি উপকার হলো— একটি চলাপথ দেখে নিলুম। ঐ পথ ধোরে

চলতে চলতে কানাং, তাঁবু, ঘোড়াশালা, হাতীশালা পার হয়ে ক্রমে ছাউনি ছাড়িয়ে পোড়লুম।

এখন মেঘের ডাক তত কঠোর নয়, তত চড়াও নয়, কেবল বন বন গুড় গুড়, হড় হড়, শব্দ হোচ্ছে, তাও তত জোরে নয়। বৃষ্টি পোড়তে শুরু হয়েছে, খুব মোটা ধারে পড়ছে, পূর্বে হাওয়া গরম ছিল জল পড়াতে অনেক ঠাণ্ডা হোল—বসুমতী স্নিগ্ধ হোলেন। আমার দেলজান এখন কোথায়? পাঠক! আমার দেলজান কোথায় বলতে পার? তিনি কি রাস্তায় পড়ে ভিজছেন? হুর্যোগ দেখে কি তিনি বরের বার হয়েছেন? জগদীশ্বর! আমার প্রাণের প্রতিমা, আমার নয়নের পুতুলী দেলজানকে রক্ষা করো, তাঁকে একটা আশ্রয় দেখিয়ে দিও, তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয়, তিনি যেন একটা দাঁড়াবার স্থান পান। আমাকে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণাকুণি যেতে হবে, হিরাবাগ সেই দিকে। বাতাসের ভারি জোর, দম্কার উপর দম্কা, তুফানের উপর তুফান হয়ে মঠিময় তোলাপাড় কোত্তে লাগল। পৃথিবী যেন উল্টিয়ে ফেলে, সব যেন রসাতলে শুইয়ে দিলে। চতুর্দিকে কেবল গাঁ গাঁ, শাঁ শাঁ, গৌ গৌ, ভৌ ভৌ এই ঘোর শব্দ নিরাবিচ্ছিন্ন একটানা শোনা যেতে লাগল। আমি যে ছপা এগোব, সে ক্ষমতা নেই, পা বাড়ালেই বাতাসে ধাক্কা মেরে উল্টিয়ে ফেলে দেয়। একবার ঘাড় উঁচু কোরে ছাউনির দিকে চেয়ে দেখ-লুম। রাজকুমারের তাঁবু সম্মুখে ঝণ্ডার মাথায় সেই লঠনটি জ্বলচে দেখা গেল, বাতাসে ভুলে হুগে পোড়ছে, যেন দোল খাচ্ছে। ঘোড়া-গুলো চিহিঁহিঁ কোচে শুন্তে পেলুম। তারপর ফিরে চেয়ে দেখি, আর সে আলো দেখা যায় না, লঠনটা হয় ত ছিঁড়ে পোড় গেছে। অনেক গুলি লোক এককালে বিপদাপন্ন হোলে যেমন গোলমাল কোরে চোঁচিয়ে উঠে, সেইরূপ চীৎকারধ্বনি অল্প অল্প শোনা গেল। গেলুম রে, আর, নে, পর, সামলা, এইরূপ হাঁকাহাঁকি, ডাকা-ডাকি কোচ্ছিল। অশ্বগুলি আতঙ্কে উন্মত্ত হয়ে, তত ঝড়ে কখন চিঁহিঁহিঁ কোরে, কখন চীৎকার

কোরে, পায়ের খুঁটি মাতে মাতে, লাফাতে লাফাতে আমার স্রুখ দিয়ে ছুটে যেতে লাগল। একরূপ ধোরূপা তিমিরময়ী তমস্বিনী আমার জানেও কখন দেখি নি। আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পার্লেম, ছাউনির তাঁবু, কাণাত, ঘর দ্বার উড়ে পোড়ে ছিঁড়ে সমভূম হয়েছে। অখণ্ডলি পায়ের দাপটে আস্তাবল ভেঙ্গে চারিদিকে ছুটে পালিয়েছে। আমার নিজের কিছুই ছিল না যে, মোকশানহবে, তবে ছাউনিতে বড় বিভ্রাট বটে, তাতে আমার কি ক্ষতি, আমি তা মনেও কোল্লেম না। যত পার্লেম, বাতাস ঠেলে ঠেলে চোটপায় চোলে তাড়াতাড়ি সেই মনোরথ স্থানে পৌঁছিলেম, সেখানে পৌঁছে একটা বাগানে গিয়ে গাছের তলায় আশ্রয় নিলেম। আশ্রয় পেলেম বটে, কিন্তু অনেক বিলম্বে, পোষাকের ত কথাই নেই, তখন শরীর পর্যাস্ত ভিক্রে চব্বে হয়েছিল। সে রাত্রে যে দেলজানের সঙ্গে দেখা হবে, সেটা কাজের কথা নয়, সে আশা করাই বুঝা। তবে যদি আমার বেরোবার অনেক পূর্বে তিনি বেরিয়ে থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা, তবে সাক্ষাৎ হোলেও হোতে পারে। ঐ বাগানের এক পাশে, তার শেষ সীমায় একটা পড়ো বাড়ী ছিল, সেইটি মনে পোড়ে, তাড়াতাড়ি সেইখানে চোলেম। যেতে যেতে বোধ হলো যেন, একটা চেহারা আমার স্রুখ দিয়ে দৌড়ে গেল, আমি ভাবল্লেম, দেলজান, গেলেন। আমার এখন বল হলো, সাহস হলো। সেই বলে, সেই সাহসে আরো চোট পয়ে চোলেতে লাগল্লেম। ঘন ঘন বিজলীর হিলোল হচ্ছিল, সেই আলোতে দেখল্লেম, সেই ভগ্ন বাড়ীটি এখনও দূরে আছে। একে ত এ স্থানে সর্বদা গতিবিধি ছিল না, প্রায় অচেনা, তাতে আবার খুটখুটে অন্ধকার, কে জানে বন, কে জানে জঙ্গল, যে দিকে স্রুবিধা পেলেম, সেই দিক দিয়ে চল্লেম। যেতে যেতে আমার পায়ের কি ঠেকল, নিকটেই কি খড়্‌খড়্‌ কোরে উঠল, আমি অবনি শিউরে উঠল্লেম। ভাবল্লেম, আর কি, এইবার আসন্নমৃত্যু, একটা নাগ পায়ের নীচে চাপা পোড়ে একে বোকে

ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছিল, তার চেষ্ঠা যে পালায়। আমি একটু পশ্চাতে সোরে দাঁড়ালেম। সেই অবসরে সর্পটি খাঁ খাঁ কোরে, তীরের ভায় ছুটে, ঘাস-বন দিয়ে ছোট ছোট কোপের মধ্যে প্রবেশ কোলে, আমি তার শব্দ শুনেতে পেলেম। এহ সময় একবার তড়িৎছটা চক্‌মক্‌ চক্‌মক্‌ কোরে উঠল, মল্লধোর মত একটি মৃন্ডি একটা গাছ ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলেম। আমি তা খবরে আন্লেম না, মনে কোলেম, দেলজান অতি বুদ্ধিমতী, তিনি একাকিনী না এসে, কোন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁর সঙ্গে এসেছে, হয় ত সেই লোকটি ঐ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে আমার দেখতে পেয়েছিল, তার সন্দেহ নেই। কেন না, পুনরায় আর একবার যখন বিহ্বল আলো প্রকাশ হলো, তখন দেখল্লেম সে-সেখানে নাই, সোরে গেছে। পক্ষান্তরে, যেমন আমি সেই ভগ্ন বাড়ীতে প্রবেশ করুব, ঐ বাড়ীর পশ্চাদিক্‌ থেকে একদল অনুধারী লোক উদ্গমসে দৌড়ে আমার এসে ধোকে। দেখে আমি ত একেবারে স্পন্দহীন। কিছুই জানিনে, যথেষ্ট মনে করি নাই যে, আমি একরূপ প্রতারণা কান্দে পড়ব, আমি যে তাদের হাত থেকে বাঁচি, তার মত আমার কোন সজ্ঞাও ছিল না। প্রথমতঃ আমার ভয় না হয়ে “এ কি অধৃত ব্যাপার!” এই ভেবেই আমি প্রস্তুতমুন্ডির নায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল্লেম। তারা আমার পিছ-মোড়া কোরে বাধলে, বাধে বাধুক, আমি তাদের বাধতে দিলেম, হা হা কিছুই কোল্লেম না। আমি কি তখন আমাতে ছিলেম যে, হা হা করুব? খানিক পরে আমার চৈতন্য হলো, কিঞ্চিৎ সাহসও হলো, আমি দস্যুদের জিজ্ঞাসা কোলেম, “তোরা কার হুকুমে বাধলি? আর কেনই বা বাধিস, তা বল? তোরা আমার কোথায় নে বাবি? কোথা আমার যেতে হবে?”

“আমরা তোকে রাজার হুকুমে বেঁধেছি, আর যে স্থানে তোকে নিয়ে যাব, সেখান থেকে বিশ্বাসঘাতীরা কখন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে না।” দস্যুরা এই উত্তর কোলে। ঐ কথা শুনে আমি মরিবন্তে চোঁচিয়ে বোলেম, “হা জগদীশ্বর!

অবশ্যই এদের ভয় হয়েছে, কারে বাঁধতে পারে—”

যারে এই দলের সরদারবোলে জ্ঞান হলো, সে অমনি বোলে উঠল, “চূপ চূপ, ভুল-তোরই হয়েছে, আমাদের হয় নি।”

আমি বোলেম “আচ্ছা, বল দেখি, এবার কি বরকন্দাজ খাঁই আমার সঙ্গে বাধ সাধলে? তাঁর হুকুমই কি আমি শুন হোলেম?”

দলের এক ব্যক্তি বোলে “কার কোঁপে পোড়ে বন্দী হলে, সে কথায় এখন দরকার কি? তোকে মতে হবে, এখন মরুবি চল, আর কথায় কাজ কি, এখন চূপ কোরে থাক। এই চলির মধ্যে প্রবেশ কর। দেখিস, ধরদার, তুই যদি বর্ণাকরে পালাবার চেষ্টা করিস, তবে তখনই প্রাণটি যাবে। আমি যা বলি, তা শোন—ভিড়ি চড়িস নে, অমনি জড়সড় হয়ে পোড়ে থাক, তা হোলে স্তম্ভে মতে পারবি।”

এই নির্দয় বাক্যগুলির পর হা হা, হো হো শব্দে একটি হাসির গরুরা উঠল। ডুলি-খানিজমী থেকে উঠিয়ে যেমন আমার লয়ে যাবে, সেই সময় দলের কতকগুলি লোক আমার বর্ণ বর্ণনা, আকারগুণ কীর্তন কোরে চোচয়ে আকাশ ফাটাতে লাগল, আমার নাম উচ্চারণ কোরে স্তবস্তুতিও কোন্তে লাগল, আবার যেন আমার সম্পদের সময় ফিরে এলো। কিন্তু সরদার তাদের একটা তড়া দিয়ে নিষেধ কোরে দিল। বাহকেরা আমাকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে নিয়ে চলো, খুব তড়াতড়া নিয়ে চলো। কেবল মাঝে মাঝে এক এক স্থানে ডুলি নামিয়ে, তারা হয় গায়ের ভিজে কাপড়গুলো একবার নিংড়িয়ে কেড়ে বুড়ে নিলে, নয় একবার তামাক খেলে। অথের পায়ের শব্দে জান্লেম, এদের মধ্যে অনেকেই সোয়ার, কিন্তু আমার এমন সাহস হলো না যে, একবার উঁকি মেরে দেখি, তারা কে, কি বৃত্তান্ত। কি জানি, আমার অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে পাছে সেই নির্ভর ষাতকদের মধ্যে কেউ মনে করে, আমি পালাবার পন্থা দেখছি, আমার তখন সেই ভয় হলো।

আমি এখন প্রচুর সময় পেয়েছি। এই

অবসরে আপনার অবস্থাটি, আর তার ফলা-ফল যা হবে, আর কি কোরেই বা এ বিপদ ঘটলো, মনে মনে তারি তোলাপাড়া কোন্তে লাগ্লেম। আমি এখন সন্ধিযোগে পড়েছি, অদৃষ্টে কি লেখা আছে, বলতে পারি নে। যমে ধরেছে, এ যাত্রা যে রক্ষা পাই, তার সম্ভাবনা নাই। এরা কি কোরে জানতে পাল্লেন, আমি আজ এই দুর্যোগে হিরাবাগে আসব? দেলজান কি চক্রান্ত কোরে আমায় ধোরিয়ে দিলেন? তিনি কি তত দূর বিশ্বাস-ঘাতিনীর কাজ কোরবেন? না, তিনি যে পত্র-খানি আমার লেখেন, তাঁর খুলতাত জোর কোরে তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে? না প্রণয়িনী অবলা বালা কোথায় কখন যান আসেন, কি করেন, কাকে কি লেখেন, বরকন্দাজ খাঁর লোকেরা তারই সন্ধান নিত? হয় ত তারা দেলজানের চাকরের সঙ্গে বড় কোরে কথা বার কোরে নিয়েছে, ঐ চাকরই হয় ত পেটের ছুরী হয়ে পত্রের কথা বোলে দিয়েছে। তাই হবে, চাকর হতেই এ কাজ হয়েছে। কি সে চিঠি লয়ে আসছিল, বরকন্দাজ খাঁর লোক টের পেয়ে তার হাত থেকে পত্রখানি ছিনিয়ে নিয়েছে। গোয়েন্দার ত অপ্রতুল নাই, গোয়েন্দায় গোয়েন্দায় দেলজানকে ছেয়ে ফেলেছে, তাঁকে আর দম নিতে দেয় না।

পাকী থামল, সদর গেটে হুম্ হুম্ কোরে যা পোড়ছে, তার শব্দ শুনে পেলেম। দ্বারটি কেউ খুলে দিলে, আমরা ভিতরে প্রবেশ কোলেম। এখন সহরে এলেম, কি সহরের নিকট কোন পুরাতন বাটী, কি কোন পুরাতন ছাউনির মধ্যে এলেম, কিছুই বুঝতে পার্লেম না। ডুলি থেকে নামাবার পূর্বে একখানা কাপড় দিয়ে আমার চোক দুটি বাঁধলে, তার পর একটা সন্ধ্যা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিম্ন পিটে একটা ধাক্কা মেরে একটা এঁধো, সঁয়াতস্যাতে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেখা কি সেই ঘরে আমায় ফেলে রেখে তা দুটি হাত গেল। তখন মনে কোলেম, এ ঘরে দিকে মুখ নেই, আমি একলাই থাক্লেম। ১ দিয়ে শূন্য ফেলতে আস্ছে, এই মেরে ফেলতে দেখিয়ে

এইরূপ প্রতিমূহুর্তে যত্ন আর আশঙ্কা হোতে লাগল। ইতিমধ্যে একটি লোক আলো হাতে কোরে উপস্থিত হলো। আলোটি ধক্ ধক্ কোরে জ্বলছিল, তাতেই দেখো গেল, আমার ভায় হতভাগ্য আরও একটি লোক এই ঘরে বন্দী আছেন, একটু দূরে এক কোণে বোসে হাপুস-নয়নে, কাঁদাছিলেন। আমি তাঁর ত্রিণীমা-নায়ও গেলেম না, গিয়ে হবে কি? সাধুনা কোত্তে পারব না। খানিক পরে জেলখানার দারগা কতকগুলি শুকন শুকন মোটা কুঁটী, চারুটি ভাত আর একপাত্র জল এনে উপস্থিত কোলে, কোন কথাবাণী না করে, সেইগুলি আমার সামনে রেখে সে চোলে গেল। যে কোণে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষটি বোসে আছেন, সেই দিকে গিয়ে বোল্লে, “বাবা! কাল প্রভাত হতে না হতে তোমায় প্রস্থান কোত্তে হবে, প্রস্তুত হয়ে থাক, আমাদের করুণানিধান স্বামীর ইচ্ছাই যে, তোমাকে ছেড়ে দেন।” বন্দী কোন উত্তর কোলেন না, কারামোচনের কথা শুনে তাঁর মনে আফ্লাদ হলো না—তাঁর সুখের দিন অব-সান হয়েছে—তিনি কেবল ঘন ঘন দাঁড়াই ফেলে পঠীরনাদে গোঁ গোঁ কোলেন। তাঁর সেই কাতরাণি দেখে আমার অন্তঃ-করণ বিদীর্ণ হোতে লাগল। আমি ভারি কাতর হোলেম, চোকের কাপড় খুলে, আলোটি হাতে কোরে তাঁর কাছে গেলেম, মনে কল্লেম, যদি বোলে বুঝিয়ে সাধুনা কোত্তে পারি, একবার চেষ্টা পেয়ে দেখি। নিঃকটে গিয়ে দেখি, আমার সহবন্দী বিনি, তিনি আমার পিতা সাহুলা !! আমি তাঁরে চিন্তে পেরেই অমনি চম্কে গেলেম, আতঙ্কে সর্কাক্ষ শিউরে উঠল, কণ্ঠ রোধ হল, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, নীরব, নিস্তর হয়ে ভেবা-গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে থাকলেম।

কে! একি অধর্মের ভোগ! একি দুর্দশা! সেই চক্ষুে কি দেখলেম! একি অদ্ভুত পায়ে কি ভয়ে আর বিশ্বয়ে আত্মপুরুষ কেঁপে উঠল, কাতার দুর্বস্থা দেখে অন্তঃকরণ ফুলে লেম, আঁ কেঁদে উঠতে লাগল বুক ফেটে সাপ সাপ, দম্ কেটে প্রাণ বেরোয় হল।

উজীরের অদৃষ্টে এত দুর্গতি ছিল, স্বপ্নের অগোচর। কারাবাসের যে স্বপ্না, তার ত কথাই নেই, কিন্তু এ কি ভগবানের খেলা। উঃ! এ কি ঘোর দুর্গতি! এ কি ভয়ঙ্কর দুর্দশা! বাবা অনাথা হয়ে, বাবা নিরুপায় হয়ে, আপনার ললাটের লেখা সপ্রমাণ কোলেন !!—ইনিই সেই দুর্দান্ত দুর্ভাগ্য সাহুলা খাঁ বাহাজুর! ইনি সেই তিনিই বটেন। এঁহারি আকাশ পাতাল খাঁই ছিল! এঁহারি ঘোর সঙ্গিপাতের তৃষ্ণা ছিল! ইনিই হিন্দু-স্থানের রাজসিংহাসন কঁকুতালে সাত করবার চেষ্টায় ছিলেন! সম্প্রতি সেই সাহুলা খাঁ অনাথার ভায় আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে!—বাক! রোধ !! দৃষ্টি রোধ !! এক্ষণে তাঁর পক্ষে মরণ মঙ্গল, এক্ষণে তাঁর পক্ষে মৃত্যুই প্রার্থনীয়! রে দুর্বৃত্ত! রে পাপিষ্ঠ! তোর একি অদ্ভুত লীলা! তোর একি চরিত্র! কাল যে ব্যক্তি অটালিকায় বসে সুগন্ধি রসের আশ্রাণে আত্মাকে প্রফুল্লিত কোরেছে, আজ তুই তারে মেথোর কোরে টাটি সাফ করাচ্ছিস। কাল যে তেজঃপুঞ্জ খরতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে নিজ আধিপত্যের বিষ নিবারণ কোরেছে, আজ তুই তারে নেত্রহীন কোরে অন্ধরূপে ফেনে রাখছিস! কাল যে যুক্তিবল, বাঞ্ছাক্তির প্রভাবে সর্কাক্ষে জয়ী হয়ে সকল প্রয়োজন সফল কোরেছে, আজ কি না, তুই তারে হাবা আর বাবা কোরে তার মস্তকে পদাঘাত কোচ্ছিস! রে দুর্হৃদয়! তোর অসাধা, তোর অকর্তব্য কিছু নাই !!

আমি পিতাকে দেখে বাবা বাবা বোলে ডাক-লেম, বাবা আমার গলার সাড়া পেয়ে, আমার দিকে চেয়ে দেখবার ভঙ্গী কোরে মুখ তুলে সঙ্কোচ কোত্তে লাগলেন। দেখলেম, চক্ষুঃ-কোটরে চক্ষু নাই!! বাবা কথা কবার জন্তে ব্যগ্র হলেন, কিন্তু পাল্লেন না! মুখের ভিতর জিব নেই!! কেবল হাঁ কোরে খাবি খাবার মত ঘনঘন ঠোঁট মুখ নাড়তে লাগলেন!! আমি বাবা বাবা বলে আবার ডাকলেম, বাবা আমার হাতের উপর একখানি হাত রেখে দেবে বলেন, আর একখানি হাত দিয়ে

দিকে দেখিয়ে দিলেন। দেখলেম, পশুবাৎ  
নিষ্ঠুরের কায় মুখের ভিতর থেকে জ্বলে  
টেনে ছিড়ে ফেলেছে! সেই হাতখানি দিয়ে  
আবার চোক দেখিয়ে দিলেন। যে স্থানে তাঁর  
তীক্ষ্ণ চক্ষু ছুটি চক্রেণ হায় সুতো-ফিতো, সে  
খানে সে চক্ষু নাই, খুড়ে বার কোরে লয়েছে!!  
কেবল দীনের মত শূণ্য গহ্বর পড়ে রয়েছে!!  
বাবা গভীররবে আর্তনাদ কোরে গেজাতে  
লাগলেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জ, তাঁর অভিমান-  
পূর্ণ অন্তঃকরণ কুলে কুলে, গুমরে গুমরে  
উঠতে লাগল। শীকারের মুখ থেকে বঞ্চিত  
কোরে সিংহকে কয়েক কোলে, সে যেমন  
করাল ক্রোধে কুলে দিগুণ হয়ে ঘন ঘন গর্জনে,  
গন ঘন আফালন করে, বাবাও সেইরূপ ক্রোধে  
অধীর হয়ে গাঁগাঁ, গাঁগাঁ করে ঘন ঘন গর্জাতে  
লাগলেন, কুলে কুলে কৌস কৌস কোরে  
নিখাসের উপর নিখাস ফেলতে লাগলেন,  
বড় বড় বর্ষাবিন্দু গাল বেয়ে স্রোতের জায়  
পড়তে লাগল।

কি ভয়ঙ্কর লাগুনাই আমায় স্বচক্ষে দর্শন  
কোত্তে হল! আমি একেকালে কি অক্ষমই  
হয়ে পড়লেম! সর্কপ্রকারেই অক্ষম! আমা  
হতে কোন প্রতিকার, কোন উপকার হল না।  
বাবা গাঁগাঁ কোরে গোজরাতে লাগলেন,  
আমি ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে লাগলেম।

আমি জিজ্ঞাসা কোলেম, “বাবা! আপ-  
নার এ দুর্গতি কে কোলে? ইটি কি দারারই  
নির্দয় ব্যবহার?” বাবা ঘাড় নেড়ে সাই  
দিলেন।

আমি রেগে লাল হয়ে গেলেম। বড় বড়  
কোরে, চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বোলেম, “হে লোক-  
পাল! আপনারা শুনে রাখুন, আমি প্রাতজ্ঞা  
কোছি, আমি যদি এই ভয়ঙ্কর কারাবাস  
থেকে মুক্ত হতে পারি, তবে দারার এই  
দ্রষ্ট নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দেবই দেব। পিতৃ-  
বৈরির শাস্তি করুবই করুব!!” পিতারও ইচ্ছা  
ন, কিছু বলেন, কিন্তু কথা কবার শক্তি নেই,  
সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি যেন কিছু  
লিখবেন, ইশারায় এই অভিপ্রায়টি জানানেন।  
লেখবার সরঞ্জাম কিছুই ছিল না। করুণা-

নিধান রূপায় দারা তাঁরে জেলমুক্ত কোরে  
গলা ধাক্কা দিতে দিতে লোকালয়ে ছেড়ে  
দেবেন, বাবা এখন বাবা আর অক্ষ হয়ে অনা-  
থার জায় পথে পথে ভেসে বেড়াবেন,—তারও  
সময় হয়ে এলো, আর বড় বিলম্ব নেই।

এর মধ্যে আমার একটা কৌশল কোলেম।  
যে কথা বলবার জগে বাবার প্রাণ ছটফট  
কোচ্ছিল, যে কথা না প্রকাশ কোত্তে পেরে  
তাঁর অন্তঃকরণ বিষাদে বিদীর্ণ হোচ্ছিল, সে  
কথা লিখে জানাবার উপায় হল। যে ঘরে  
আমরা বন্দী হয়ে ছিলাম, তার মেন্জে কাঁচা।  
এই সময় লোহার গরাদের ছিদ্র দিয়ে প্রভা-  
তের ঈষদৃষ্ণল শ্বেতচ্ছবি অল্প অল্প দেখা যেতে  
লাগল। এই সুযোগে বাবা একটা চোঁচাড়ি  
লয়ে মোজর মাটিতে আঁচড়ে আঁচড়ে এই  
কটি কথা লিখলেন, “আমি তোমার পিতা  
না।” ঘরের মধ্যে তখন তেমন আলো যায়  
নি, অনেক কষ্টে কথা কটি পড়লেম।

“আপনি আমার পিতা না, তবে আমি  
কে? এককাল এ প্রবঞ্চনা, এ চাতুরী কেন  
কোঁচেন?” আমি বড় বড় কোরে এই উত্তর  
কোলেম।

যে পুরুষটি আমার অগ্রে দাঁড়িয়ে, যার  
চক্ষু নেই, জিহ্বা নেই—তিনি আমার মুখে ঐ  
কথা শুনে মাথা নেড়ে কেবল গাঁগাঁ কোত্তে  
লাগলেন, ভাবে বোধ হল, “না না, আমি  
তোমার পিতা না।” এই কটি কথা তিনি যেন  
পুনরায় আমায় বলেন। তার পর দরজা দেখিয়ে  
দিয়ে, আপনার গায়ের পরিচ্ছদ খুলে ফেলে  
আমায় ইশারা কোরে ডাকলেন, আমি তাঁর  
ইঙ্গিতের অতিপ্রায় ব্যতীত পায়েম—“আমি  
তাঁর বেশ কোরে তাঁর স্থানে বাস, তিনি  
আমার পরিচ্ছদপরে আমার স্থানে বসেন,”  
এই তাঁর মনের কথা—এই ফিকির কোলে  
আমার উদ্ধারের পথ হবে।

আমি বলেম, “তবে আপনার দশা কি  
হবে?” ঐ কথা শুনে বৃকের উপর ছুটি হাত  
বেঁধে, ঘাড় উচু করে অকাশের দিকে মুখ  
কোলেম। তার পরে একটি অঙ্গুলী দিয়ে শূণ্য  
অক্ষিকোটর, শূণ্য বদনকোটর দেখিয়ে

দিলেন। তার তাৎপর্য এই, “আর তাঁর বেঁচে  
স্থখ কি? জীবন ভারের স্বরূপ হয়েছে, এখন  
মৃত্যু হলোই বাচেন।”

যিনি আমার নিকটে বসে, তিনি আমার  
পিঠা নন, নাই গোন, তাই বণে যে আমার  
ঘাড়ের গোঁবা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে, আমার  
অদৃষ্টের ভোগাভোগ তাঁকে ভোগ কোত্তে দিয়ে  
আমি চুপে চুপে সরে পড়ব,—পালিয়ে গ্রস্থান  
কোব্ব, তা পারব না, সে কান্না আমা হতে  
হবে না, আমি তত নরাধম, তত কাপুরুষ  
নই। আমি বল্লেখ, “না, তা হবে না, আপনার  
বোকা পরের মাথায় রেখে জেলখানা থেকে  
বেঁচে এসেছি,—এ কথা যেন কারও মুখে  
শুনতে না হয়, যেমন আছি, এমনই থাকব,  
এইখানেই মরব।”

ঐ কথা শুনে সেই দীনহীন অনাথা  
সাহুল্লা খাঁ গোঁ গোঁ কোরে আরো কাতরাতে  
লাগলেন, আমার পায়ের উপর পড়ে হাঁটু  
জড়িয়ে ধোলেন। শেষে গায় থেকে চাপকানটা  
খুলে আঙ্গুল দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে  
দিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অক্ষুণ্ণ নীরব  
প্রার্থনা আমি কানেও স্থান দিলেম না,  
আমি তা শুনেও শুনলেম না, তাঁর কথা-  
মত চোলে কোন মতেই রাজি হোলেম না।  
আমায় অবাধ্য দেখে অভাগা সাহুল্লা একে-  
বারে শোকে গা চলে দিলেন, তাঁর যাতন্য  
আরো বাড়ল, মাথাযুড় কুটে খুনোখুনি হোতে  
লাগলেন। শেষে আকার-ঈজিতে বোলেন,  
“আমি যদি তাঁর কথার অবাধ্য হই, তিনি  
আত্মঘাতী হবেন।”

আমি বোল্লেখ, “তবে আপনার প্রাণটিকে  
বিসর্জন দিতে হবে, সেটা বিবেচনা করুন।”

তিনি মাথা নাড়লেন, “না, তা হবে না,”  
এই ভাবটি বোধ হলো। পুনরায় পায়ের নীচে  
পড়ে লুটতে লাগলেন, ইঙ্গিত কোরে বোলেন,  
তাঁর একান্ত ইচ্ছা, আমি পালিয়ে গ্রস্থান করি।  
অগত্যা তাঁর কথামত চোলে আমি সম্মত  
হোলেম। সাহুল্লা খাঁ এখন নিঃশব্দ হোলেন, তার  
মন স্থির হলো। পূর্বদিক কেবল কসাঁ হয়ে  
আসছে। বর্ষাকালের প্রভাত, বোর বোর

ছাড়ার না। আকাশে কাণামেঘ কোরে আছে,  
চারিদিকে কাকুড়িমে কাকুড়িমে রকম অতি অল্প  
অল্প মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে, মনে কোল্লেখ,  
এ দায় থেকে অন্যায়সে পার পাব, এ অন্ধকারে  
আমাদের চাতুরী প্রকাশ হোতে পারবে  
না, সে পক্ষে কোন শঙ্কা নেই।

বাস্তবিক আমি কে, কোথায়, কবে, কার  
ওরসে, কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করি, জন্মে অবধি  
কোথায় ছিলাম, কি কি কাজ কোরেছি,  
আমার এই সকল জ্ঞানস্বাস্থ—আর যে ব্যক্তিকে  
আমি অবধারিত সূহ্মমুখে ছেড়ে যাচ্ছি বোধ  
হলো, সেই বর্ণচোরা লোকটাই বা কে, তার  
পূর্বাপর বৃত্তান্ত যে কেহ আমায় বলতে পারবে,  
আমি তার কেনাবেচার মধ্যে হয়ে থাকব,  
প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে এ উপকারের প্রতাপ্রকার  
কোব্ব। আর ত সময় নাই যে, কাঠের লেখনী  
দিয়ে পুনরায় মেজোঁতে বর্ণপাত করা হবে, মুখে  
ত বলবারই ক্ষমতা ছিল না, তার ত কথাই নেই,  
তবে আমার এ আক্ষেপ, এ উদ্বেগ কি কোরে  
যাবে? আমি থাকে পিতা বোলে ডাক্তেম, সেই  
অনাথ দীন-দরিদ্র লোকটিকে ঐ সকল কথা  
জিজ্ঞাসা কোল্লেখ, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয়  
হলো না। তিনি প্রত্যুত্তর কোব্বেন কি, শুনে  
কেবল গোঁ গোঁ কোরে গেজাতে লাগলেন,  
তাঁর সেই গেজানিই প্রত্যুত্তর হলো। সাহুল্লা  
আমার পিতা না, এখন তাঁর প্রতি স্নেহ নাই  
যে, তাঁর দুখে দুঃখিত হয়ে কাঁদব, কিন্তু তথ্য  
তাঁর সেই গেজানি, তাঁর সেই কাতরানিদেখে  
আমার চক্ষু জল এলো—টস টস কোবে অশ্রু-  
পাত হোতে লাগল।

সাহুল্লার কথা কবার ক্ষমতা নাই যে, আমার  
প্রশ্নের সত্ত্বের কোব্বেন। তিনি হাতছানি দিয়ে  
নিকটে ডাকলেন, আমি তাঁর কাছে ঘেঁসে  
দাঁড়ালেম। একটি চুণির অঙ্গুরী তিনি আমার  
প্রদান কোল্লেখ। আমার হাতে সেইটি পোরিয়ে  
দিয়ে হাতখানি সজোরে চেপে ধোলেন, তাৎ-  
পর্য্য এই—কথা কবার ক্ষমতা থাকলে, তিনি  
যেন এই কথা বোলতেন “এই আংটিটি যত  
কোরে রেখো। আমার জিজ্ঞা নেই বোলে  
যে কথা আমি তোমায় মুখে বলতে পারিনি।



এই আংটিটি এক দিন সেই কথা তোমার অব-  
গত করাবে।”

আমি বোল্লেম, “এই অঙ্গুরী হতেই কি সেই  
নিগূঢ় কথাটি প্রকাশ পাবে?” তিনি খাড় নেড়ে  
সায় দিলেন। চেহারা দেখে বোধ হল, সাহুল্লা  
এখন অনেক সঙ্কল্প হলেন।

আমি সাহুল্লার বেশ কোরে, তাঁর সেই  
কোণে গিয়ে কেবল বসেছি, এমন সময় জেলের  
দরজা খুলে গেল। একটি জোক ঘরের মধ্যে  
প্রবেশ কোরে আমার হাত ধোরে টেনে বলে,  
“আয়, বাহিরে আয়, এখন তোরে লোকালয়ে  
ছেড়ে দিতে কোন আশঙ্কা নেই—এখন  
চোক নেই যে, লোকের ভাল দেখে টাটাবে,  
জিবও নেই যে, কারও নামে ঠকামি কোরবি,  
কি কারও পেটের কথা হাতে বাজারে বলে  
বলে বেড়াবি।”

আমি হুবহু কান্না আর বোবা সাজ্লেম,  
এমনি ভাগ কোন্তে লাগ্লেম, যেন সত্য সত্যই  
আমার জিব সেই। চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলে,  
ধপ্ ধপ্ কোরে চলছি, এক একবার হেলে  
চলে, টলে টলে পোড়ছি, বেদনায় আর  
জালায় যেন কঁা কঁা গোঁ গোঁ কোচ্ছি, এইরূপ  
কঁাকাতে কঁাকাতে, গেগ্নাতে গেগ্নাতে, আর  
এক একবার সাধ কোরে টকর খেতে খেতে  
চলতে লাগ্লেম। যখন সেই এঁধো গলীতে এসে  
পড়্লেম, তখন নিশ্চিন্ত হলেম, এখন আর সে  
ভয় নেই, যে ধরা পোড়ব, কি আমার ধর্ম্মি  
তার বুকতে পারবে। আমার পশ্চাতে বানাৎ  
কোরে কবাট পোড়ুল শোনা গেল, দুর্ভাগা  
সাহুল্লার অদৃষ্ট শিলমোহর পড়ে রুদ্ধ হল, তিনি  
আমার প্রতিনিধি হয়ে আমার ললাটের  
ভোগাভোগ ভোগ কোন্তে াক্লেম। দরজাটি  
খড়াস কোরে পড়ল, শক্তি খুব সজোরে হল।  
কিন্তু সে শব্দ যতই উচ্চ হোক, সাহুল্লার গোদ-  
রানির শব্দ সে শব্দ ছাপিয়ে উঠল। সাহুল্লা  
খাঁ সকল প্রকার ঘৃণিত রিপূর মূর্ত্তিমাম্ প্রতি-  
মূর্ত্তি, সম্ভোষচিন্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়  
ছিল না, চিত্তপ্রসাদ কি পদার্থ, তা তিনি চিন্তেন  
না। মোতই তাঁর কাল হল, অতি আকাজ্কার  
দোষেই তিনি বিপদগ্রস্ত হলেন। :

আমার পথবাহক কতকগুলি ছোট ছোট  
ধাপ পার হয়ে, একটা লম্বা জুলি-পথ দিয়ে  
অতি সাবধানে আমার লয়ে চলো, আমি যেন  
আন্দাজে আন্দাজে চলেছি, চক্ষে যেন কিছুই  
দেখতে পাচ্ছিলে, প্রতি ধাপেই, প্রতিপদেই  
ধম্কে ধম্কে দাঁড়াছি, চকে কাপড় বাঁধা ছিল,  
তাতে কোরে কানার মত চলতে বড় কষ্টও হল  
না। একবার আমি ধরা পড়ি পড়ি হয়েছিলেম,  
ঈশ্বরেচ্ছায় সে ধাক্কা কেটে গেল—একবার  
বিস্মৃতিক্রমে পথবাহকের কোন কথার উত্তর  
দিয়ে ফেলিছি! কিসে আমারে ঠিক অন্ধের  
মত দেখাবে, তাতেই মন নিবিষ্ট থাকে, কাণা  
হওয়া যেমন আবশ্যক, বোবা হওয়াও যে  
তেমনই আবশ্যক ছিল, সে কথাটা প্রায় ভুলেই  
গেছিলেম। তাতেই হোক, আর যাতেই যা  
হোক, বাস্তবিক এক বার একটা কথা  
আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভগবানের  
ইচ্ছায় সেই সময় এক দিক্কার একটা দরজা  
ঝন্ ঝন্ কোরে বেজে উঠল, দরজাটা কেউ বন্ধ  
কোলে, তার বন্ধনায় আমার গলার আওয়াজ  
ঢেংক গেল, তাতেই বেঁচে গেলেম, নচেৎ  
আমাকে ভারি বিপদেই পড়তে হত। তাব-  
লেম, কি কুকর্ম্মই কোরেছি! ভাগ্যিস পথ-  
বাহক শুনতে পায় নি, তাই রক্ষা। উঃ! মস্ত  
ফাঁড়া কেটে গেল! সব শেষে গলীর এক টেরে  
একটা ছোট চোরা-দরজা খুলে পথদর্শক আমার  
বলে, “যা, এখন চলে যা, যদি কথা কইতে না  
পারিস, আকারে ইঙ্গীতে লোককে জানাস যে,  
পাপিষ্ঠদিগকে দারূ এইরূপ লাঞ্ছনা করেন।”

এখন তাজা হাওয়া আমার মুখে লাগতে  
লাগল। পাছে আমি ধরা পড়ি, পাছে পথ-  
বাহক আমার কারসাজি বুঝতে পারে, কি  
জানি, সে যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই থাকে,  
কানারা কিরূপ কোরে চলে, সেই কৌতুক  
দেখতে তার যদি ইচ্ছাই হয়ে থাকে, তা হলে  
ত বড় পেঁচাপোঁচ, সেই ভয়েতে রাস্তায় এসেও  
কিছু দূর পর্যন্ত কানার মত থেমে থেমে, হেলে  
জলে চলতে লাগ্লেম।

একটু পরেই বুঝতে পাঠ্লেম, আমি বন্দী  
হয়ে সহরের মধ্যেই ছিলেম, কিন্তু কোন



বাড়ীতে ছিলেম, সেটা আর চেয়ে দেখ্‌লেম না। একটা মোড় ফিরে যেমন সদর-রাস্তায় পড়ব, সে বাড়ীটি যেমনি অদৃশ্য হল, আর তার চিহ্নও দেখতে পেলেম না। যে কাপড় দিয়ে বাধা আর চোক বাধা ছিল, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেম, সাংলখানা কাঁধের উপর ফেলে তাঁরের ঝায় ছুট্‌লেম, একদমে আরজজেবের ছাউনিতে এসে উপস্থিত। আমার “ন ভূত ন ভবিষ্যত” এই অপূর্ণ উদ্ধারের নিমিত্ত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম।

দেখ্‌লেম, গত রাত্ৰের ঝড়ের দৌরাণ্যে ছাউনিটি লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, তাঁবুর ষাঁট-গুলি ভেঙ্গে গেছে, ষোড়াগুলো ভয়ে ভড়কে গিয়ে কে কোন্ দিকে ছুটে পালিয়েছে, বাবুর চিখানার তৈজসপত্রগুলি মাঠময় ছড়াছড়ি হয়ে আছে, পুরুষেরা অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে রস্নাই কোচ্ছে, স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কোরে সেই সকল নানাস্থানে-ছড়াছড়ি-জিনিসপত্রগুলি কুড়িয়ে এক স্থানে জমা কোচ্ছে। এক একবার ঝনাৎ ঝনাৎ কোরে ঘটিবাটীগুলি ফেলছে, মাঝে মাঝে চোক-মুখ ঘুরিয়ে, মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে পরস্পর বগড়া কোচ্ছে। আমার নিজের তাঁবুটি কাদায় পোড়ে লিটপিট হোচ্ছিল, কেউ তা উঠবার চেষ্টাও করে নি, ভিজ্‌ছে ঢবঢবে হয়ে গেছে। ধূর্ত সলিমান আমার একটা সিক্কের উপর বোসে পায়ের উপর পা রেখে ভড়র ভড়র কোরে তামাক খাচ্ছে আর ধোঁয়া-বুড়ি কোচ্ছে; মাঝে মাঝে পা নাচাচ্ছে আর গুন্ গুন্ কোরে গান গাচ্ছে,— “বাবুলার ফুল লো কানে দোলালি ধনী।” আমার দেখে চমকে উঠে বোলে, “আল্লাহ কি কেব্দানি আমি মনে কোরেছিলেম, কালকের ঝড়ে আপনাকে কোন্ দেশে উড়িয়ে নে ফেলেছে।”

আমি বোলেম, “আমি যদি উড়েই যেতাম ত বেতম, তাই বোলে আমার তাঁবুটি কোন কাদায় পড়ে গড়াগড়ি যাবে ? তাঁবুটি খাটান হয় নি কেন, তোরা নিজের জন্তেও ত দরকার ছিল।”

সলিমান বোলে, “হজুর ! সে কথা সত্য, কিন্তু

লোকের একটা এমনি আচম্কা জাস হয়েছিল, কারও বুদ্ধির ঠিক ছিল না, তাঁবু বোলে কেউ মনেও করে নি।”

আমি বোলেম, “আচ্চা, তখন যেন মনে ছিল না, এখন ত সকলেই আপনার কাণাৎগুলি খাড়া কোরেছে, কেবল আমারই তাঁবুটি পোড়ে আছে, আমি এখানে ছিলেম না, তাই বোলে বুঝি তোরা ত সকলেই ছিলি, সলিমান অপ্রতিভ হলো, আর কথা কাটাকাটি না কোরে লোক ষোটাবার জন্তে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কোত্তে লাগল।

খবর ভালই হোক আর মন্দই হোক, বাতাসের আগে দৌড়ে। ছাউনিয়র জনরব হয়েছে, দারা আরজজেবের কোন আমার কারপদা-জকে ধোরে নিয়ে কয়েদ কোরেছে, কে সেব্যক্তি, কেউ ঠিক কোত্তে পাল্লে না। আজ প্রাতে অল্প অল্প আমারেরা যখন রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যান, সেই সঙ্গে নাকি আমিও ছিলেম, তাই আর কেউ হির কোরে উঠতে পাল্লে না। বে, কার কপাল ভেঙ্গেছে, দারা কাকে কয়েদ কোরেছে। গত রাত্ৰের ঘটনাগুলি প্রকাশ করা পরামর্শের কাজ নয়, এইটি হির কোরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোলেম, এবার অবধি খুব সাবধান খুব সতর্ক হয়ে চলবো, আর যেন ওরূপ প্রতারণাকান্দে না পড়তে হয়। এবার যেন মা-বাপের পুণ্যপ্রতাপে কোনরূপে বেঁচে গেলেম, আবার যদি কারও দমে পড়ি, তাতে যে নিষ্ফল পাব, সে কথা হিসেবের বার। আমার ত যা হোক এক রকম চুকে গেল, দুর্ভাগা সাহুল্লার নিমিত্তেই মনে বড় কষ্ট হোতে লাগল; হয় ত সে এতক্ষণে যুতের সামিল হয়েছে, আমার জন্তে যে বিষ প্রস্তুত হয়, সে বিষ হয় ত তাঁরই উদরে পড়েছে, আবার ভাব্‌লেম, তাদের যে ভ্রম হয়েছে, সেটি যদি জানতে পেরে থাকে, তবে আর তাঁকে প্রাণে নষ্ট করবে না, যে নুশংস হয় উচান রয়েছে, তার উপর না খেঁকে হয় ত তারা ক্ষান্ত হয়ে আপনাদের কোলের দিকে টেনে নেবে, সেই অনাধ অন্ধকে না মেরে ফেলে তাড়িয়ে লোকালয়-বার কোরে দেব, পূর্বে তাদের ঐ মননই ছিল, গোড়াতেই সেই পরা মর্শই হির হয়।

সাহুল্লা খাঁ মনে কোরেছিলেন, হয় ত পরি-  
ণামে রাজ-সিংহাসন তাঁরই ভোগে হবে। বাগে  
বাগে তাকে তাকে ফিভেন,টোপের উপর টোপ,  
চারের উপর চার ফেলে ফেলে বেড়াতে। অদৃষ্ট  
নাই বলেই মাছটি বড়সিতে গাঁধতে পারেন নি,  
নচেৎ তাঁর বড়ের ক্রটি ছিল না, সাহুল্লা জান-  
তেন না যে,মহুযোর কল-কৌশল,মহুযোর বল-  
বুদ্ধি মহুযোর স্বয়ং কোন কাজেরই নয়, ঈশ্বরের  
মনে ষিটি থাকে, তাই হয়। অবশেষে কোথায়  
“রাম রাজা, কোথায় রাম বনে।” সাহুল্লা  
আশা-চাঁদ নৈরাশ্র-মেঘে ঢেকে ফেলে, খাঁ  
বাহাদুর আপনার পাণ্ডে জড়িয়ে পোড়লেন।

সাহুল্লা আর যে অধিককাল বাঁচেন, এমন  
বোধ হয় না। তাঁর পরমায়ু যে শেষ হয়ে  
এসেছে, কেবল যে এক খেই মৃত্যুর উপর  
বুলছে, সেটা অসম্ভব নয়, হলেও হতে পারে।  
দ্বারা তাঁকে লাজনা কোত্তে, কষ্ট দিতে ক্রটি  
করেন নি, মনঃকোভ, মনঃপীড়া মহুযোর স্বত  
পেতে হয়, সাহুল্লা তা পেয়েছেন, পাচ্ছেনও।  
বিশেষতঃ পূর্বকৃত ঘোর দুর্কর্মগুলি স্মরণ হয়ে  
তাঁর জীবাত্মা কল্পিত হোচ্ছে, সেই পাপত্রাস  
তাঁর হৃদয়ে শেল প্রহার কোচ্ছে, শকুনীর জ্বর  
মজ্জা পর্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে থাকে।  
এতগুলি ঘোর উপসর্গ একত্র যুটেছে, তারা যে  
পাকচক্র কোরে, তাড়াতে তাড়াতে তাঁরে  
কদরে নিয়ে ফেলবে, সেটা বিচিহ্ন নয়।

আমি বড় উদ্ভিগ্ন হলেম।—দ্বারা কেন  
আমার মরণ প্রার্থনা করে? আমি তার কি  
কোরেছি যে, সে আমার মৃত্যু বাঞ্ছা করে? বড়  
শ্রুৎবল ছিল, তাই একবার তার হাত থেকে  
নিষ্কৃতি পেলেম। পুনরায় পাকচক্র কোরে সে  
আমারে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে, ভাতেই যে  
তার মনোভাব স্পষ্ট জানা যাচ্ছে। আগরা  
পরিভ্যাগ করবার পূর্বেই শুন্তে পেলেম,  
সাহুল্লা খাঁর প্রতি ভয়ানক নির্দয় ব্যবহার  
হয়েছে বলে সাজাহান মহা ক্রুপিত হয়েছেন,  
পুলের ঐ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনে  
খোগল-রাজের প্রাণ কঁপে গেছে, মনে মনে  
মহা আতঙ্ক হয়েছে, যুগা আর রাগে দ্বারার  
প্রতি তাঁর ভারি হতভ্রম জন্মেছে।

সম্রাট কিমা কোরবেন না, দুর্কর্মের প্রতিফল  
দেবেন বলেছেন। সাহুল্লা খাঁ এক জন সম্রাট  
লোক, রাজকার্যে, রাজধর্ম্যে অতিশয় কুশল।  
তাঁর প্রতি বাদশাহের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাক বা  
নাই থাক, কিন্তু মুখে কখন তাঁর অনাদর  
কোত্তেন না, বরং ভালবাসাই জানাতেন।  
উজীরের প্রকৃত অপরাধ কি দ্বারা কেন তাঁরে  
এরূপ ঘোর শাস্তি দিলেন? রাজকুমার-কিসে  
তাঁরে ঐ নির্দারুণ নিষ্ঠুর শাস্তির যোগ্য-বিবেচনা  
কোলেন? কোন্ অপরাধে অপরাধী তিনি?  
কেউই একধার সহস্তর কোত্তে পালেন না,কেহই  
তা নিশ্চয় কোরে বলতে পারেন না, কিন্তু আমি  
এই বিবেচনা কোল্লেম,দ্বারার চোপদার যে দিন  
আমার বাড়ীতে আমায় ডাক্তে যায়, “দ্বারা  
অবশ্যই নিপাত হবে”, সাহুল্লার মুখনিঃসৃত এই  
কথাগুলি সে শুন্তে পেয়েছিল, সেই জন্তেই  
হোক, কি দ্বারার মনে মনে ভয় ছিল, উজীরের  
যেক্ষণ একাধিপত্য,তাঁর যেক্ষণ একচ্ছত্রা ক্ষমতা,  
সাজাহানের মৃত্যুর পর তিনি যারে সিংহাসনে  
বসাবেন,সেই বসতে পাবে। সাহুল্লা আর যাকে  
রাজা করুন আর না করুন, দ্বারাকে ত কখনই  
রাজতক্তে বসতে দিতেন না। তাই হোক, কি  
উজীর জোর কোরে, বাহুবলে স্বয়ং বাদশাহ  
হবেন, আমি তাঁর পালিত-পুত্র, আমায় সিংহা-  
সন দিয়ে দেবেন, এইই হোক, যাতে যা হোক,  
দ্বারার মনে বড় ভয় হয়েছিল যে, উজীর স্বপদে  
থাক্তে তাঁর ভদ্রত্ব নাই। শেষে যে কথাটি  
বোল্লেম, সেইটিই কাজের কথা। আমি ত বেশ  
জান্তেম, উজীরের নিতান্ত বাসনা ছিল, রাজ-  
সিংহাসন তাঁরই হয়,তিনিই একেশ্বর হয়ে একা-  
ধিপত্য করেন। বাদশাহ হবার নিমিত্তে তিনি  
লালায়িতাছিলেন, সেই জন্তে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর  
লোকের সঙ্গে ভাব-প্রণয়ও রাখেতেন। কিন্তু  
শেষকালে আপনিই রসাতলে তলিয়ে গেলেন,  
আর তাঁরে উঠতে হল না, আর যে মাথা উঁচু  
কোরবেন, সে পথ ঘুচে গেল।

এক্ষণে আমি একজন প্রকৃত উদাসীন  
পথিক, কেবল অদৃষ্ট পরীক্ষা কোরে এ দেশ  
সে দেশ টো টো কোরে বেড়াব, দেশ পর্যটন  
করাই আমার ব্যবসা হলো। আমি কে, তা

জানিনে!—আপনার কাছে আপনি অপরি-  
চিত !! আমার কেউই নেই, মাতা নেই, পিতা  
নেই, ভাই নেই, ভগ্নী নেই, আমার কেউই  
নেই! আমি অনাথ! আমি নির্দ্বন্দ্ব! একটা  
নাম পর্যন্ত আমার নাই। উদরারের যে সংস্থান  
আছে, তার প্রতি বিশ্বাস নাই,—চাকুরী ভাল-  
পাতার ছার', আজ আছে, কাল নেই, তার  
ভরসা কি? রাজকপারূপ রবির চিরোদয়ের  
আশা করা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা আমি  
নিজে ভুঙ্কভোগী হয়ে জানি, ঠিক পথে থেকে,  
সরল সদ্যবহার কোলেও সে উদয় চিরদিন এক  
সমান থাকে না, একভাবে যায় না, আমি আপনা  
দিয়েই তা পরখ কোরেছি। এত অল্পকালের  
মধ্যেই যে তত অদ্ভুত অদ্ভুত গুপ্ত কথাগুলি  
বেরিয়ে পড়লো, তাই পোড়ে পোড়ে ভাবতে  
লাগলেম, সেই চিন্তাতেই আজ আমার সমস্ত  
দিন কেটে গেল। “সাদুল্লা আমার পিতা না,”  
টৌলে টৌলে বেড়াচ্ছি, আর বলছি, “সাদুল্লা  
আমার পিতা না”, যেখানে যেখানে পা ফেলছি,  
আমি বেন দেখতে পাচ্ছি, পায়ের নীচে মৃত্তিকার  
উপর লেখা রয়েছে—সাদুল্লা আমার পিতা না,  
—আমার তখন এইরূপ জ্ঞান হোতে লাগল।  
তবে আমি কে? তবে আমি কে? দিনের মধ্যে  
অতি কম একশত বার কেবল ঐ কথা টেঁচিয়ে

টেঁচিয়ে বোলতে লাগলেম, কেউ কোথাও নেই  
আপনি আপনিই বলি, আর আপনি আপনিই  
শুনি। তবে আমি কে? একবার মুখে ঐ কথা  
বলি, একবার অংটিটির দিকে চেয়ে দেখি, এই-  
রূপে যতবার ঐ কথা মুখে বলেম, ততবার অংটি-  
টিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেম। মনে কোলেম,  
মাতা রসমাতাবে যে কথা আমার বলতে পারেন  
না, এই অংটি তাঁর রসনা হয়ে সেই কথাটি  
আমায় বোলে দেবে। অংটিটির পাথরখানি  
বহুমূল্যের বটে, কিন্তু বসাবার দোষে সূত্রী  
দেখাচ্ছিল না। তার এমন গুণ কিছুই ছিল না,  
কি তাতে এমন কোন বস্তু নাই যে, দেখে  
লোকের ভক্তি হয়, কি হাতে কোরে হৃদয় চেয়ে  
চেয়ে দেখে। আমি যারে তারে অংটিটি  
দেখাতেম, কিন্তু কেউই তা হৃদয়ের কোরে  
দেখত না। ভাবলেম, তবে যেমন আছে,  
তেমনিই থাক। যে বিষয় জানবার নিমিত্তে  
মন ব্যাকুল হয়েছে, দেখি, যদি কালে  
দৈবাৎ কোন দিন তার দ্বারা সেই কথার  
সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলি ভেবে চিন্তে  
আমি তাঁর মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম কোরে  
লাগলেম। সলিমান আমার ঐ স্বগত চিন্তার  
অবকাশে তাঁরুটি খাটিয়ে ঠিকঠাক কোরে  
রেখেছিল।

# ডজীর-পুল

## দ্বিতীয় পর্ষ।

### নবম পরিচ্ছেদ।



আমার ভরাভাতে দাগা দিতে চায়।

প্রদিন শুনলেম, দারা বে-আড়া রেগেছেন, রাগে কালমূর্তি হয়ে রাজপুরী তোলপাড় কোচ্ছেন। কারণ কি, কেউ ভাগ্যরূপ অমুভব কোঁতে পাচ্ছে না। আমি কিন্তু সাক্ষ্য বুঝতে পার্লেম যে, কেন তিনি তত রেগেছেন।

কাল রাত্রে ঝড়ের সময় আমি কোথায় ছিলেম, কি কোচ্ছিলেম, আরজ্জ্বেব আমায় খুঁটে খুঁটে, একটি একটি কোরে ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা কোঁতে লাগলেন। আমার ত ভারি বিষয় জ্ঞান হল যে, এ সকল সন্ধান রাজকুমার কেন জিজ্ঞাসা করেন। বাই হোক, যিনি এক্ষণে আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশাতর-সার হল, তাঁর কাছে ষোরফেরের কথা বলতে সাহস হলো না, কি আসল কথা চেপে রেখে একটা মনগড়া মিথ্যা বলে যে বুঝিয়ে দেব, সে ভরসাও হল না। যেক্ষণে যা হয়েছিল, যা যা ঘটেছিল, আমি তাঁরে সকল কথাই ভেঙ্গে বল্লেম, মনে কোন কোরকার রাখ্লেম না। সাহুজার হৃদশার কথা শোনার সময় আরজ্জ্বে-বের মনে যেন কষ্ট হতে লাগল, এইরূপ অজ্ঞান হল। আমি বিলাপ কোঁতে লাগ্লেম, আমার সঙ্গে রাজকুমারও আক্ষেপ কোঁতে লাগলেন। সাহুজার সঙ্গে যে নিঃসম্পর্ক হয়েছি, সে কথা রাজ-পুত্রের নিকট আমি প্রকাশ কোঁলেম না, অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্লেম, প্রকাশ করাতে কোন লাভ নেই।

আরজ্জ্বেব ক্ষণেককাল অগম্যনুক হয়ে কি ভাবলেন, তার পর আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কোলেন, “তোমার সহো-দর কেউ আছে?”

“আমার জানত ত কেউই নেই, পিতার মুখেও কখন শুনি নি যে, আমার সহোদর আছে, তিনি আমায় সে কথা কখন বলেন নি। আমি জানি, আমার আর কেহই নেই, কেবল এক পিতাই আছেন, তিনি ভিন্ন আমারে আপনার বলে শ্বেহ করে, এমন লোক নাই।” আমি এই উত্তর করিলাম।

রাজকুমার বল্লেন, “সে রাত্রে তোমার পিতা কি তোমায় বলেছেন, তোমার সহোদর কেউ নেই? ওঃ! হাঁ ত বটে! আমার ভুল হয়েছে, তুমি না বোল্লে, তাঁর জিব ছিঁড়ে নিয়েছে, সাহুজা কথা কহিতে পার্লেম না?—সেটা মজল—না, না, তা নয়, তোমার পক্ষে অমজল বলতে হবে। আহা! কি দুর্ভাগ্য! গরিব বেচারাকে দারা হক্নাহক্ বৎপরোনাশি পীড়ন করেছেন। তুমি না বোল্ছ, তোমারেও নষ্ট করবার তাঁর অভিপ্রায় ছিল?”

“জেলের পাহারাওয়ালারা আমায় ত ঐ কথা বল্লে।” আমি এই উত্তর করিলাম।

“হাঁ, হাঁ! বটে! আমি তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তোমার স্থানে তোমার পিতাকে রেখে তুমি সরে পোড়েছ, মারা যান তিনি যাবেন, তুমি না মরে তিনি মরবেন। কেমন? এই না কথা?”

আমি কি উত্তর কোরব, তাই ভাবছি, দেখ্লেম, আরজ্জ্বেব তাঁর ধোরোজ্জল

চক্ষু দুটি স্থির কোরে আমার দিকে এক-  
দৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমি বল্লম, “আমি  
নিকৃতি পাই, সেইটিই পিতার মানস, সেইটিই  
তার বাসনা ছিল। তাঁর শত্রুদের অভিপ্রায়  
নয় যে, তাঁরে প্রাণে নষ্ট করে, বোবা আর  
কাণা কোরে লোকালয়ে বিদায় কোরে দেয়,  
এই তাদের মনন। বিশেষতঃ তারা যখন আমার  
কিছু কোত্তে পাল্লেন না, তখন যে পিতাকে প্রাণে  
নষ্ট কোরবে, আমার তা বিবেচনা হয় না।”

আরজজেব বল্লেন, “তা বাই হোক, কিন্তু  
আমার মনে এই হোচ্ছে, তোমার পিতার জন্ত  
তুমি হুঃখিত নও, তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত  
তোমার মনোযোগ নেই। যাঁদের শত্রু বাঘে  
মারুক্, এই তোমার মনের কথা, কেমন, এই  
ত?”

আমি বোল্লম, “পিতা যদি বেঁচে ফিরে  
আসেন, আমি তাতে হুঃখিত হব না, বরং  
আত্মদ্রবিত হব, কিন্তু তাঁর আর বেঁচে থাকার  
কোন সুখ নেই, জীবন এখন তাঁর পক্ষে অসহ  
ভয়ের স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

আরজজেব আর দ্বিকুস্তি কোল্লেন না,  
চুপ কোরে থাকলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীমুখে ঈর্ষা  
আড় হাসির ছটা দেখতে পেলেম। সে হাসি-  
টুকুর অগাধ অর্থ। তাই দেখে আমার স্পষ্ট  
বোধ হল, সাহুলা যে আমার পিতা না, সে কথা  
আরজজেব ভালরূপ অবগত আছেন, আমিও  
যে তা স্পষ্ট জানতে পেরেছি, রাজপুত্রের মনে  
সে সন্দেহও হয়েছে। আজকুমার বল্লেন,  
“আচ্ছা, তুমি এখন বিদায় হলে হতে পার,  
তোমার উপর আমাদের চোক থাকবে।  
আরজজেবের দুই গুণ আছে, অবিচলিত  
মিত্রও হতে পারেন, আবার অবাধ্য শত্রুও  
হতে পারেন।”

আমি বলিলাম, “হজুরের বিষদৃষ্টে পোড়ব,  
কি অরূপার পাত্র হব, এমন কর্ম কখনই  
করিব না, কিছুতেই আমার সে প্রবৃত্তি হবে  
না, আমি তেমন অভাজন নই।”

“সাদক! ঐ কথাই ভাল, কথাগুলি যেন  
স্মরণ থাকে। তবে এখন তুমি বিদায় হও।”

রাজকুমারকে প্রণাম কোরে আমি আপনার

ডেরায় এলেম। তার পরেই হুকুম এলো, আমা-  
দের ডেকানে কুঁচ কোত্তে হবে, আমরা তার  
উত্তোগ কোত্তে লাগলেম। দক্ষিণ দেশের  
শাশনতার আরজজেবের উপর সমর্পণ করা হয়,  
সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

আগরা ত্যাগ কোত্তে হল বলে আমি  
হুঃখিত হলেম না। দেলখানের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ  
হল না, তাতেই প্রাণে বড় ব্যথা পেলেম, আমার  
বুকে যেন খেল বিদ্ধে লাগল। আমার এখন  
এই দুর্ভাবনা হল, তাঁর খুড়া না জানি, তাঁরে কত  
যত্নপাই দিচ্চেন, কত লাঞ্ছনাই কোচ্চেন। প্রাণে-  
খরী আমার যে পত্র লেখেন, সে পত্র তাঁর খুড়ী  
ত পথে আটক কোরে, খুলে পড়ে দেখে, তাতে  
কি লেখা ছিল, সে কথা আমি পরস্পর শুনে  
পেয়েছি। সেই জন্তে আমি মনে মনে স্থির  
কোলেম, একখানি পত্র লিখে সলিমানের জিহ্বে  
কোরে দিয়ে তারে আগরায় রেখে বাই, সলি-  
মান যেক্রপ চতুর, সে অনারাদে পত্রখানি দেল-  
খানকে পৌছে দেবে, কেউ জানতেও পারবে  
না। পত্রের প্রভাস্তর লয়ে সে শেষে ছাউনির  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসবে। তবে আর দেরি করা  
নয়, আগে পত্রখানি লিখি, আর আর কত  
কথা পরে হবে, তবে পত্রখানি লিখে সমাপ্ত  
কোলেম।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকতে পারে, মীরে  
আমি পূর্বে পিতা বোলে জানুতম, সেই সাহুলা  
এক দিবস নজফালী খাঁর নাম উল্লেখ করেন।  
নজফালী আরজজেবের সচিব, তাঁর কস্তা নুর-  
মহলের সঙ্গে আমার বিবাহ হবার নিমিত্ত  
সাহুলা ভারি ব্যগ্র হন। নজফালী এখানে  
ছিলেন না বোলেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ  
করা হয় নি। আজ তিনি এসেছেন শুনে আমি  
আর দেরি কোলেম না, অমনি তাড়াতাড়ি তাঁর  
ডেরায় চোলে গেলেম। দেখল্লম, তাঁরুটি  
শোভা সৌন্দর্য্যে রাজপুত্রের তাঁরুর চেয়ে নূন  
নয়, প্রায় তুল্যায়তুল্য। নজফালী বয়সে পঞ্চাশ  
গত কোরেছেন, দীর্ঘাকার, প্রকাণ্ড মূর্তি, মর-  
দানা চেহারা, সরসারি মেজাজ, কাকেও দুষ্-  
পাত নেই, তাঁর উপরপারার লোককেও ভূচ্চ-  
তাচ্ছল্য করেন। ভারি দাবারব, রাস বড়

ভারি। রাজপুত্রকেও তাঁর কথার উপর কথা  
হাতে দেন না। তাঁর ঐ সরলার মেজাজের  
ন্যে দেখসেই হোয়ে আরজজেব কখন কখন  
রগে জ্বলে পুড়ে উঠেন। বল-বীর্থা, সাহসে,  
ক পরিশ্রম দৃষ্টিতে নজফালী একজন অধিতীয়  
পুত্র, তাতেই রাজকুমার সচিবের আশ্রয়  
যায় আছেন, আপনার কাজ উদ্ধার করবার  
জন্যে তাঁকে হাতে রেখেছেন। নজফালীতে  
মার প্রয়োজন নাই, সে দিন যখন রাজ-  
কুমারের হবে, তখন তাঁরে হয় বিদায় দিয়ে  
বের কোরে দেবেন, নয় তাঁর মাথাটা কেটে  
চুক্কুরো কোরবেন।

এই ব্যক্তি, আর সাহুল্লা, এরা নিঃসন্দেহ  
কোন মৎলবে ফিস্তো, এরা অবশ্যই আপনাদের  
মধ্যে কোন একটা অন্তরা বন্দোবস্ত করেছিল।  
উভয়েরই এক চেষ্টা, এক উদ্দেশ্য, হিন্দুস্থানের  
রাজসিংহাসনের প্রতিই তাদের লক্ষ্য ছিল,  
আমার এই অহুমান হয়। সাহুল্লার চেষ্টা  
যে, নজফালীকে বঞ্চিত কোরে সমুদায় সাম্রাজ্য  
তিনি আপনি ভোগ করেন, আবার নজফালীর  
চেষ্টা যে, সাহুল্লাকে নৈরাশ কোরে রাজসিংহা-  
সন তিনি একলা গ্রাস করেন। সিয়ানায়  
দখানায় কোলাকুলির ন্যায় মুখে প্রীতি-প্রণয়  
রেখে এ তাঁরে ফাকি, সে তাঁরে ভোগা দেবার  
নিমিত্ত পরস্পর দাও-পেঁচ খেলে বেড়াতেন,  
কেন্দ্র কোরে মনের কথা ভাঙতেন না। কিন্তু  
সে বাই হোক, এক্ষণে নজফালী আমার  
পিতৃপুত্রাতির-মুগ্ধ কোরবেন, আমি তা ঠাওরে  
উঠতে পার্শ্বম না। যখন দরবার কেবল শুরু  
হয়েছে, সেই সময় কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত  
হোলেম, কায়দা-মত আদাব তসলিম কোরে  
আদব বাজালেম। নকীব আমার নাম ডেকে  
বলে। নজফালী ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ কোরে  
কটমট কোরে একবার চেয়ে দেখলেন, আমি  
বেন তাঁর স্মৃতির কণ্টক হোলেম, সচিব যেন  
সুখশস্যায় অবস্থান কোরেও অন্তরী হোলেন।  
হাঁ হাঁ কিছুই কোলেন না, কেবল একবার চেয়ে  
দেখে, আবার পূর্বের মত মেজাজ ভারি কোরে  
দেমাগের উপর চুপ কোরে রইলেন, কিন্তু  
তখনই একটি পারিষদের কানে কানে কি কিস্-

কিস্ কোলেন, আমার নির্জনে ডেকে কথা-  
বার্তা কইবেন, সেই কথাই বোলেন, আমার  
যেন তখন এই জ্ঞান হয়। আমার অহুমান  
কিন্তু নিফল হয় নি, কেন না, সে ব্যক্তি তখনই  
এসে আমার বজ্রে, “আপনি একটু অপেক্ষা  
করুন, দরবার ভেঙ্গে গেলে নজফালী আপ-  
নাকে নির্জনে ডেকে আলাপ কোরবেন।” দর-  
বার শেষ হল, ডেরা ক্রমে খালি হয়ে পড়ল,  
আমাকে ডাকিয়ে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন,  
সেখানে আর জনপ্রাণীও ছিল না, কেবল  
একলা নজফালী বসে আলবোলা টানছিলেন।

দাণ্ডিক সচিব আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা  
কোলেন, “বালক! তোমার পিতা কোথায়?”  
আমি বোলেম, “হজুর! সে হুংখের কথা কি  
বল্বে, তাঁর দফা শেষ হয়েছে, তিনি জগের  
মত গেছেন।”

“কি! তাঁর কাল হয়েছে?” সচিব হঠাৎ  
এই কথা বোলে উঠলেন।

আমি বোলেম, “সে কথা আমি বলতে  
পারি নে, তাঁর চক্ষু বার কোরে লয়েছে, তাঁর  
জিব গোড়াসুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।”

“কি সর্বনাশ! তবে!”—এই বলে কি  
বিজির বিজির কোলেন, আমি তার কতক  
শুনতে পেলেম, কতক পেলেম না। দেখলেম,  
সচিব সন্তুষ্ট হয়ে অল্প একটু হাসলেন, সে হাসি-  
টুকু কিন্তু মুহূর্তকাল বই স্থায়ী ছিল না। তার  
পরেই তিনি যে, সেই হোলেন—সেই পূর্বের  
মত অহঙ্কারপূর্ণ নীরস-নিষ্ঠুর মুক্তি ধারণ  
কোলেন।

সচিব বলেন, “যুবা! এখন তুমি কি কছো?”

“সৌভাগ্যক্রমে আরজজেবের পরিচারক  
হয়েছি।” আমি এই উত্তর কোলেম।

নজফালী বোলেন, “বটে! রাজপুত্রের বড়  
বাস্তব স্বভাব, ভাল-মন্দ বিচার না কোরে বারে  
তায়ে চাকর রাখেন,—কার সুপারিসে হল?”

“আজ্ঞা, সুপারিস আমার কেউ কোরেন  
নি, আমি আপনাই এসে রাজকুমারের পা  
জড়িয়ে ধোলেম, তাতেই—”

“ধাক্ ধাক্, আর বোলতে হবে না। তুমি  
কি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছ, রাজপুত্রের

একান্ত অজ্ঞগত হোয়ে থাকবে, অবিখ্যাসের কাজ কোরবে না?” দুর্গুণ নিষ্ঠুর সচিব এই প্রস্তাব কোলেন।

আমি বোলেম, “আজ্ঞা, তা কোরেছি।”

“হুঁ! বটে! তোমার পিতাও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা কোলেন, আবার তখনই কিন্তু সে সমস্ত উল্টে যেতো। তোমারও বুঝি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করা।”

“আজ্ঞার দোহাই, আমার সেক্ষেপ নয়।”

“ভাল, সে কথা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা, বল দেখি, কোন কথার প্রসঙ্গে তোমার পিতা আমার নাম কোলেন, কি কখন কোরেছেন?” সচিব এই কথা জিজ্ঞাসা কোলেন।

“আজ্ঞা হাঁ, কোরেছেন বৈকি, আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন আপনার কখন অগোরব না করি, আপনার একটি কন্যা আছে, সে কথাও বলেছেন।”

“তোমার সঙ্গে তার বিবাহ হবে—এই কথা বোলেছেন বুঝি?”—আমি আর ও কথার কোন উত্তর দিলেম না।

সচিব বলেন, “আমারও সে মনস ছিল বটে, কিন্তু সাদক! সে সব দিন উল্টে গেছে। তুমি আর নরমহলের বিষয় মনে করো না, তার আশা পরিত্যাগ করো।”

আমি বোলেম, “আজ্ঞা, এ বিবাহ আমার পক্ষে সৌভাগ্য, তাতে আমার সম্মান বাড়বে। তত উচ্চ গৌরবের সম্পর্ক মনে উদয়ও হলে আমার মাথা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকে।” কথাগুলি বলবার সময় জিব জড়িয়ে জড়িয়ে আসছিল, আমাকে তোতলার মতন তো তো কোন্ডে হয়েছিল।

ঐ স্ততিবাক্যগুলি শুনে নজফালী সম্বৃত্ত হলেন। সাহুল্লা খাঁর সহক্রে তিনি অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোলেন। আমি সাহুল্লাকে বরাবর পিতা বলে সম্বোধন কোরে আসচি, তাঁকে পিতা বলবার সময় আমার মনের মধ্যে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, সচিব সেইটি অবগত হবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন। আর এই একটি ভাষা দেখলেম, সাহুল্লাকে পিতা বলে উক্তি করবার সময় কোন একটি গুরুতর কথা

নজফালীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পড়ে হচ্ছিল, তিনি তা জোর কোরে চেপে চেপে রাখছিলেন, একবার বলে নয়, কতবার সে কথাটি তাঁকে চেপে রাখতে হয়েছিল। আমি কিন্তু তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলুম, আরঙ্গজেবের শ্রায় সচিবও অবগত ছিলেন যে, “সাহুল্লা আমার পিতা না,” তিনি সেই কথাটি বলেন বলেন কোরে বোলেন না, আমার ত এই অনুমান হল, তবে তাঁর মনে যদি আর কিছু থাকে ত আছে। সাহুল্লা আমার পিতা না—একথা আমি অবগত আছি কিনা, তাই জানিবার জন্যে নজফালী শশব্যস্ত হন। তিনি এত ব্যস্ত কেন? কোতুল তপ্তির জন্যেই হোক, কি তাঁর মনে অল্প কোন অভিপ্রায়ই থাক, তা আমি বলতে পারিনে, ফলে সাহুল্লা যে আমার পিতা না, সে বিষয় আমি অবগত আছি কিনা, সেই সন্ধান জানিবার নিমিত্তে নজফালী ভাবি ব্যস্ত দেখলেম। সাহুল্লা-বচনিত কত কথাই জিজ্ঞাসা কোলেন, আমি বাক্যে কথা করে কাটিয়ে দিলেম, অসল কথা গায়েও গেলেম না। আমার মনে মনে স্থির ছিল, “আমি যে জেনেছি, সাহুল্লা আমার পিতা না,” সে কথা আমি প্রাণান্তেও প্রকাশ কোরো না। আমি তখন ভাবলেম, কেন ভাবলেম, তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমি তখন ভাবলেম, এ কথা গোপন রাখলে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল হবে। আমার কেউ জিজ্ঞাসা কোলে আমি যদি বলতে পারতুম, ‘অমর আমার পিতা’ তবে বোধ হয়, সাহুল্লা যে আমার কেউ নয়, তাঁর সঙ্গে যে আমার কোন সম্পর্কই নাই, একথা স্পষ্ট স্বীকার কোন্ডে আমি সংশয় জ্ঞান কোন্ডেম না। আমার জন্মদাতা কে, সে সন্ধান আমি যত দিন না জান্বে পারব, তত দিন শিলমোহর কোরে আমার মুখ বন্ধ রাখব—এই প্রতিজ্ঞা কোলেম, আর তত দিন কি কার্যোতে, কি কথোতে, এমনি ভাবভক্তি দেখাব যে, দেখে লোকে অনুভব করুক, শাজাহান বাদশাহের প্রিয়পাত্র, সম্ভ্রতি যিনি উজীরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই সাহুল্লা খাঁ সত্য সত্যই আমার পিতা, সত্য



সত্যই আমি তাঁকে পিতা বলেই জ্ঞান কোরে থাকি । তার পর নজফালী আমার বিদায় লতে অমুমতি কোলেন, আমি উঠে আসবাব সময় তাঁকে অভিশয় বিমর্ষ, অভিশয় নিরানন্দ দেখ-  
লেম । কতকগুলি তাঁবু পার হয়ে আপনার আড্ডায় আস্চি, সে সকল তাঁবুতে নজফালীর পরিজনরাই বাস কোন্তেন । আস্তে আস্তে দেখ্লেম, একটি চটপটে চালুক মেয়ে, দেখ-  
তেও দিবি স্বরূপা হস্তী, পর্দা তুলে চুল বুল কোরে উঁকি মাচ্ছে, আর ফিক্ ফিক্ কোরে হাস্চে । একটি লোক—গলার আওয়াজে বোধ হলো, অর্ধ-বয়সী স্ত্রীলোকের বামাস্বর ডেকে বোলে, ‘নূরমহল ! এই দিকে ।’ আমি অমনি মনে মনে বোলে উঠ্লেম, ‘নূরমহল, তবে কি ইনিই নজফালীর কন্যা ? এঁহারি সঙ্গে কি আমার পরিণয় হবার কথা হয় ? ইনি ত পরমাসুন্দরী !’ সেই সময় দেলজানকে মনে পড়ে বলেম, ‘দেলজান ! তুমি আমার প্রাণের তুল্য ; তোমায় কি আমি বিস্মৃত হতে পারি ? কথা নই না । আমি যেমন ঘুরে স্নুখে আসব, দেখি না, নূরমহল পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন । আমি চলে যাচ্ছি, সুন্দরী আমার এক-  
দুটে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন । কিন্তু যেমন আমি বাড়ি ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখব, অমনি তিনি সরে আড়ালে গিয়ে অদৃশ্য হোলেন ।

আমি ডেরায় এসে দেখি, দেলজানের সহো-  
দর ইউসোফ আমার প্রতীক্ষা কোচেন, তাঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো ।

আমি বলেম, “আরে কণ্ড ইউসোফ যে ! কি মনে কোরে, তুমি যে এখানে ? আজ আমি কান্ বাটে মুখ ধুয়েছি, ব তে পারিনে ।”

ইউসোফ বোলেন, “সাদক ! আমাকে সহসা এখানে আস্তে দেখে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হতেই পারে, কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি, আমার খুড় বরকন্দাজ খাঁ শুনতে পেলে তেলে-  
বেগুনে জলে যাবেন, তাঁর সে বে-আড়া রাগ অরণ কোন্তেও ভয় হয় । কেন আমি এসেছি, সিটি তুমি মনে ঠাওরে দেখো, দেলজান আমায় পাঠিয়েছেন । এবার আর পত্র লিখতে তাঁর

ভরসা হলো না । দেলজান এখন খুড়ের বাড়ী-  
তেই আছেন । তিনি যে পত্র তোমাকে লেখেন, ঐ পত্র লয়ে পত্রবাহক যেমন বাড়ীর বার হয়েছে, অমনি সে বরকন্দাজ খাঁর চোকে পড়ে গেল । বরকন্দাজ খাঁর মনে অনেক দিন থেকে সন্দেহ জন্মেছে । তিনি তাকে দেখতে পেয়ে ভারি পীড়াপীড়ি কোন্তে লাগলেন, তারে বলেন, ‘তুই কোথায় যাচ্ছিস্, কি কাজে যাচ্ছিস্ ব , তোকে তা বলতেই হবে ।’ সে বেটা ভয়ে জড়সড় হয়ে পত্রখানি বার কোরে দিলে । পত্রের মর্ম্মাবগত হয়ে তোমাকে কঁাদে ফেলবার নিমিত্ত লোভের ছলনা করা হয় । দারা ধর্ম্মত: প্রতিজ্ঞা করেন, তোমার প্রাণের উপর আঘাত কোরবেন না, খুড়া মশায় তাতেই ভুলে গেলেন । কিন্তু সাদক ! তোমার বড় পুণ্য-  
বল, তাই দারার হাত থেকে বেঁচে এসেছ । দারা অভয়-বাক্য দিয়েছিলেন বটে যে, তোমার প্রাণ নষ্ট কোরবেন না, কিন্তু তাঁর মনে মনে ছিল যে, তোমায় মেরে ফেলেন, তুমি কখনই প্রাণ লয়ে ফিরে আসতে পারবে না । দারা যে তোমাকে প্রাণে নষ্ট কোন্তেন, তাঁর যে সে অতিপ্রাণ ছিল, এ কথা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে আমি শুনেছি, বিবেচনা কর, তাঁর মুখে যদি নাই শুনতেম, তথাচ সে কথা বিশ্বাস হতো, কেন না, তুমি পালিয়ে প্রস্থান কোরেছ শুনে দারা একেবারে ক্রোধে কালাগ্নি হলেন, রাগে পৃথক্ কোবে কাঁপতে লাগলেন, তাঁর যদি ছুই অভিপ্রায়ই না থাক্বে, তবে তুমি পলায়ন কোরেছ শুনে তিনি তত অগ্নি-জ্বলন্ত হবেন কেন ? তাতেই যে বেশ বোকা যাচ্ছে, তাঁর মনে অসৎ অভিপ্রায় ছিল ।”

আমি বলেম, “তুমি ত আমার সেই লোকেরই চাকুরী কছো ?”

ইউসোফ বোলেন, “চূপ্ ! চূপ্ ! স্থির হও, আমি তার চাকুরী করি না । আমার খুড় রাগত হন হবেন, আমার যথাসর্ব্বস্ব ক্ষতি হয় হবে, তবু তাঁর চাকুরী কোরব না । আমি আর কোন লোকের অঙ্গুগত হয়ে—”

আমি অমনি বোলেম, “কার, আরক-  
জেবের ?”



“আরদজেবের না, সুলতান সুজার। তাঁর সঙ্গে আমি বদে চলেছি।”

আমি বোল্লেম, “আহা! তা কোন্নে কেন? তার চেয়ে আর কোন রকম কল্লে ভাল হতো, সিটি হোলে দুই বন্ধু একত্রে থেকে পাশাপাশি যুদ্ধ কোন্নে পাত্তেম। এখন তার উল্টো হয়ে দাঁড়ালো, এখন হয় ত বিপক্ষের স্বরূপ রণক্ষেত্রে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হবে।”

ইউসোফ বোল্লেম, “শেষে হয় ত তাই ঘটবে। কিন্তু সিটি হোলে আমারই পক্ষে অধিক মন্দ। আমাদেরই যদি তলোয়ারে তলোয়ারে সাক্ষাৎ হয়, তোমাকে আমি পেয়ে উঠব না, আমার চেয়ে তোমার বল, বিক্রম, তোমার তৎপরতা অনেক শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতের সাক্ষাৎ আমার চেয়ে অনেক ভাল, সে কথা আমি আপনাই স্বীকার কোচ্ছি। আপনাকে আপনার স্বামীর মঙ্গল হয়, এ প্রার্থনা উভয়েরই বটে, তবে যে তুমি আমাকে বন্ধু বোলে রেয়াত কোরবে, তা কোরবে না। অপরাপর রাজপুত্রের অপেক্ষা সুজার চরিত্রে আমি অধিক সন্তুষ্ট। আপনি আরদজেব-ভক্ত, কিন্তু দেখো, যেন সাবধানে থাকা হয়, তুমি যে রাজপুত্রের চাকরী কোন্নে কোমর বেঁধেছ, যে সকল লোক তাঁকে অষ্টগ্রহের ঘেরে থাকে, তাদের যেন বিশ্বাস কোরে চলো না, কাঁদে পা দিও না, কারও কুকথায়, কুমন্ত্রণায় থেকে না, কারও চাতুরে পড়ে কুকাঁজ করো না, তোমাকে যেন কেউ ফুসলিয়ে, গায় হাত বুলিয়ে আরদজেবের বিরুদ্ধে নাচিয়ে তোলে না। তারা যদি বলে তোমাকে ‘রাজ্য দেব, রাজ্য কোরব,’ তখাচ তুমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে চলো না। আমি সুজার পক্ষ হয়েছি বটে, কিন্তু মনে মনে জানি, সুজা তাদৃশ বলবান্ কি ক্ষমতাবান্ নন। আরদজেবের সদৃশ বুদ্ধিমান্ কি বলবান্ কেউই নহেন, রাজকিরীট তাঁরই কপালে নৃত্য কচ্ছে, অপরাপর সহোদরদের পরাস্ত কোরে শেষকালে তিনিই রাজত্বকে বসবেন। সাদক! আমার এই বাক্যগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখো, সত্য মিথ্যা শেষে টের পাবে। আরদজেব যুধে জানিয়ে থাকেন যে, ফকিরের ছেঁড়া টুপী

পেলেই তিনি সন্তুষ্ট, ফলে সেটা কাজের কথা নয়, সিংহাসনের প্রতিই তাঁর লোভ।”

আমি বলিলাম, “তুমি যদি তাই মনে নিশ্চয় জেনেছ, তবে আরদজেবের পক্ষে না হয়ে সুজার পক্ষ হয়েছ কেন?”

ইউসোফ বোল্লেম, “তার কারণ এই, আরদজেবের চরিত্র দেখে আমার মনে বড় ঘৃণা জন্মেছে, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা নাই, বিশেষতঃ তিনি যে বিভ্রাল-তপস্বীর স্তায় মনে এক ভাব, যুধে আর এক ভাব জ্ঞানান তাঁর সেই বিটলেমি আমার সহ্য হয় না, তোমার সঙ্গে যদি পূর্বে দেখা হতো, তুমি যখন এ চাকুর স্বীকারী করনি, তখন যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো, তবে তোমায় নিষেধ কোন্নেম যে, এমন কুর্কর্ম করো না, আরদজেবের পদানত হইও না।”

আমি বোল্লেম, “সে ত হয়ে গেছে, এখন তার চারা কি, এখন সে আক্ষেপ কোন্নে কি হবে। অভাগা সাহসী ধাঁর কি দশা হয়েছে, বলতে পার? তাঁর কি কোন খবর রাখ?”

ইউসোফ বোল্লেম, “গোড়ায় যে পরামর্শ স্থির হয়, তারা তাই কোরেছে, তাঁকে দুর্গতি আর লাঞ্ছিত কোরে সেই দীনহীন অনাথ অবস্থায় বিদায় কোরে দিয়েছে। তোমার পিতাকে ঐরূপ নিষ্ঠুর পীড়ন কোরেছে বোলে শাজাহান অগ্নি-অবতার হয়েছেন, দারার উপর তাঁর ভারি ক্রোধ জন্মেছে, সেই অনাথকে আপনার কাছে রেখে বাদশাহ লালন-পালন কোচ্ছেন।”

“আহা! বাবা! আপনার কি ছতদৃষ্ট! এ যাত্রা আর যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সে সম্ভাবনা নাই, তার আশাও করি না।” আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

ইউসোফ বোল্লেম, “তাঁর জন্তে আমারও ভারি হৃৎ হয়। সাদক! আর সময় নেই, পিঠে চাবুক পোড়ছে, দেরি কোন্নে পারিনে। ভগ্নী যে জন্তে আমায় পাঠিয়েছেন, তা বলি, শুন। তাঁর সেই চিঠি ধরা পড়তে যে প্রমাদ উপস্থিত হইয়, তিনি তাহা শুনে একেবারে মূচ্ছাপন্ন হোলেন, সে ত হবারই কথা, তুমিও কোন্ তা

না বুঝতে পাচ্ছো। আমার খুঁড়োর শরীরে দয়ামায়া নেই, দেলজানের সর্বদা জ্বাস, কবে তাঁর প্রতি নির্দয় হন। রকিনারাও তাঁর প্রতি পাষণ হয়েছেন। যেন যমদণ্ড হাতে কোরে আছেন, কেবল শাসাচ্ছেন, আর চোক রাঙ্গা-চ্ছেন। এই ত তাঁর অবস্থা। দেলজান স্থির-সকল কোরেছেন, আমার সঙ্গে বঙ্গদেশে যাত্রা কোরবেন।” শুনে আমি শিউরে উঠলেম। “সাদক! সত্যিই বোলছি, ঐ কথাই তাঁর স্থির বটে, তিনি যে দিকে যাকেন, তুমি ঠিক তারি উল্টদিকে, কি ঠিক তার বিপরীত অভিমুখে গমন কচ্ছো। দেলজান যদি বঙ্গে যান, তুমি তবে স্রজ্জার পক্ষ হয়ে বঙ্গে যাবে কি না, বল।”

আমি বলিলাম, “ইউসোফ! দেলজানকে আমি প্রাণের সমান ভালবাসি, তাঁর প্রতি আমার বড় স্নেহ, সে সকলই সত্য বটে, কিন্তু তাঁর অপেক্ষাও আমার কথা বড়, অতএব তুমি আর ও কথা মুখে এনো না, আমাকে আর ও প্ররুতি দিও না। যখন এক রাজপুত্রের কাছে শপথ কোরে বলেছি, তাঁর অঙ্গত হয়ে থাকব, তখন আমি প্রাণান্তেও তাঁকে পরিত্যাগ কোত্তে পারব না। তবে যদি তিনি এমন কোন কার্য করেন যে, আমার প্রাণের উপর আঘাত পড়ে, সে কথা স্বতন্ত্র। যে স্থলে প্রাণ বাচান অবশ্যক, সেখানে কোন কথাই নেই। তদ্বিষয় অত কোন ছলনায় আমি রাজপুত্রের আশ্রয় অনাদর কোত্তে পারব না, দেলজান যদি আমার আদর কোরে পতিত বরণ কোত্তে চান, তখাচ না।”

ইউসোফ বলিলেন, “সাদক! তোমার এ সাধু প্রতিজ্ঞা বটে, এর উপর আর আমার কথা নেই। আচ্ছা, তবে এখন আমি চোল্লেম, হয় ত আরও একবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে।”

“তবে এসো ভাই, কিছু মনে করো না। ইউসোফ! দেলজানকে এই কথা বোলো, যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আরঙ্গজেবের দাস সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে আমি প্রেমের দাস।”

“চের হয়েছে, আর বলতে হবে না। আরঙ্গজেবের প্রতি তোমার যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি দেখছি, দেলজানের প্রতি তোমার যদি সেই-

রূপ মন, সেইরূপ নির্ভাব থাকে, তবে তুমি ভিন্ন যোগ্যপাত্র আর কে আছে যে, তাকে ভ্রাতা বোলে সম্বোধন কোরবো।—তবে আমি চোল্লেম, পরমেশ্বর তোমায় নির্বিশেষে রাখুন।” আমি বোল্লেম, “আমারও ভাই ঐ কথা। জগদীশ্বর তোমায় চিরজীবী কোরে স্বচ্ছন্দে রাখুন।” এই শিষ্টাচারের পর আমরা বিদায় হোলেম, এই আমাদের যা দেখা-সাক্ষাৎ হলো, আর যে আমাদের কখন দেখা হবে, এমন বোধ হয় না।

ডেকানে যাত্রা কোত্তে হবে, তাই পরদিন সকলে এ চহানে সমবেত হওয়া গেছে। এমন সময় মুক্তারের পুত্র ইয়াস্মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে আরঙ্গজেবের প্রধান শরীররক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছে। ইয়াস্মিনও আমার দেহতে পেয়েছে, দেহতে পেয়েই আন্তে আন্তে আমার নিকটে এলো। সে আমার মুখের দিকে চাই, আমি তার মুখের দিকে চাই, আমরা উভয়েই বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি কোন্তে লাগলেম। ইয়াস্মিন অতি ভক্তির সহিত একটি সেলা। কোরে বোল্লে, “হজুর! আপনি যে পক্ষ, আমিও সেই পক্ষ, এতে আমি যে কত আনন্দিত হলেম, তা বোলে উঠতে পারিনে।” আমি বোল্লেম, “ইয়াস্মিন! তুমি উচ্চপদ পেয়েছে দেখে আমার বিস্ময় হয়েছে বটে, কিন্তু গোমার যে তত বড় পদ হয়েছে, তাতে আমি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হয়েছি।”

ইয়াস্মিন বলে, “হজুর! কদিনের জগ্গেই বা! আমার এ পদ অতি অল্পকালের নিমিত্তে, পথে যেতে যে ক’দিন হয়, সেই ক’দিন মাত্র। ডেকানে পৌঁছে যখন সৈন্যসংগ্রহ হবে, তখন যে এ পদ থাকে, এমন বোধ হয় না।” আমি বলিলাম, “সে কথা আমি বোলতে পারিনে, তুমি যদি রাজপুত্রকে সন্তুষ্ট কোত্তে পার, তবে কেনই বা না থাকবে?”

ইয়াস্মিন বলিল, “বল-বীৰ্য্য-সাহসের ক্রটি হবে না, যে তার পেয়েছি, তারও অবশ্য কোরব না, তাতে তাঁকে যতদূর খুসি কোত্তে পারি, তা কোরব, কিন্তু আরঙ্গজেব শুধু তা চান না, তাঁর আরো কিছু দরকার—তিনি চান, আমরা

যত ব্যক্তি আছি, সকলকেই এক একখানি ভলোয়ার সঙ্গে আনতে হবে, তন্নিম্ন এটি ধর্ম, এটি অধর্ম, কি এটি ন্যায়, এটি অন্যায়, এ বিচার কেউ কোত্তে পারবেন না, যখন যেমন আবশ্যক হবে, তখন সকলকেই সেইরূপ চোজ্ঞতে হবে, কেউ ওজর কোত্তে পারবেন না।”

আমি বোল্লেম, “ইয়াস্মিন, তুমি যা বোল্লেছো, সত্য, আমি তা মানি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ নিয়ম স্বীকার কোরে অনেকেই তাঁর অধীনতা কোত্তে প্রস্তুত আছে।” ইয়াস্মিন বোল্লেম, “আরজ্জেব যদি মনে কোরে থাকেন আমার ধর্মধর্ম জ্ঞান নেই, আমি অতি পামর, সেটি তাঁর ভুল। আমি কেবল দুঃখের খাতিরেই, কেবল পেটের জ্বালাতেই তাঁর দাস হয়েছি, কিন্তু তাই বোলে যে আমি অধর্মের দাস হব, তা কখনই হব না।”

আমি বোল্লেম, “ইয়াস্মিন, তুমি বেশ কথা বোলেছ, আমিও তাই মনে মনে স্থির কোরে রেখেছি।”

সৈন্তেরা কুচ কোত্তে আরম্ভ কোরেছে, হু'পা এক পা অগ্রসরও হয়েছে, আমাদের আর সময় নাই যে, আরও দুদণ্ড আলাপ করি। বিজয়-যাত্রা কোরে আগরা থেকে দশ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে পৌঁছিয়ে সন্ধ্যা হলো। সে রাত্রে সেইখানেই তাঁর ফেলে আড্ডা করা গেল। পথকষ্ট নিবারণের নিমিত্তে ব্যয়ভূষণ কোত্তে ক্রটি হয় নি, তথাচ বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে সমস্ত দিনের পর আমরা যেন ভূত সাজ্তম, চেহারা বদলে যেতো, অতিশয় কদাকার দেখাতো—শুকনো, রোগা, চিক্চিকে, পেটে পেট লেগে যেতো, যেন কতকাল খাইনি। তৎকালীন আরজ্জেবের লোকজনকে যেমন কুৎসিত কদাকার দেখাত, জঙ্গলী চোয়াড়দেরও তেমন দেখায় না। কষ্ট হতো বোলে যে, কেউ কোন কথা বলবেন, আরজ্জেব সে পথ রাখেন নি। কেন না, বর্ষাকালে বিদেশযাত্রার সময় দ্বিগুণ বেতন অবধারিত ছিল। নজফালী খাঁ আরজ্জেবের প্রধান মিজ, আর প্রধান সেনানী, তাঁর কস্তা নুরমহল তাঁর সঙ্গেই

ছিলেন, কোন গতিকে ঐ নুরমহলের তাঁবুর ২০ হাত অন্তরে মাত্র আমার ডেরা পড়ে। নজফালী খাঁর তাঁবুর পশ্চাতেই নুরমহলের তাঁবু। যখন আমরা কুঁচে ছিলাম, পথে যেতে যেতে যুবতী পাল্কির ঝিলমিলি ভুলে এদিক্ সেদিক্ উকি মেয়ে উকি মেয়ে দেখেছিলেন, সেই সময় একবার চোকোচোকি হয়ে আমাদের চারি চক্ষে চাক্ষুষ হয়। তাঁকে দেখে মাটির দিকে কুঁকে, সরস মনোহর ভঙ্গীতে একবার একটা মস্ত লম্বাচোঁড় সেলাম কোরেছিলাম, সেই সময় যেন বোধ হলো যুবতী একটু ফিক্ কোরে হাসলেন। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবলেম, আমার ভ্রম হয়েছে। সুন্দরী হাসেন নি। যদি নিশ্চয় জানতাম যে, যুবতী আমায় দেখে হেসেছেন, অমনই অহকারে পাঁচ হাত ফুলে উঠতাম। শুধু আমি বোলেও নয়, একবার বোলেও নয়, যুবতীদের হাসি দেখে কত লোকের কতবার ঐরূপ অসার অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহে শেষকালে যা ঘটেছে, পাঠক তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, আমার সে ভ্রম ভ্রম নয়। বরং আমি এখন এ কথাও বোল্তে পারি, নুরমহলের সে হাসি রহিত হয় নি। যুগে লেগেই ছিল, সেটি আমি বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখেছি। অত কথায়ই বা কাজ কি, একটা সামান্ত মোটা কথা বোল্লেই সকল সন্দেহ ফুরিয়ে যাবে,—নুরমহল গোপনে গোপনে আমার চাল-চলন-গুলির প্রতি নজর রাখতে লাগলেন—কোথায় যাই, কোথায় বসি, কোথায় শুই, এই সকলের সন্ধান নিতেন—কানাতের দোরে যেন গ্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমি সে দিকে ফিঙেম, সেই দিকেই তাঁর মনোহারিণী হাসি চক্ষে দর্শন কোত্তেম।

আজ এই স্থানে আড্ডা কোরে দিনরাত অবস্থিতি করা হলো। বৃষ্টি পড়া ক্রান্ত হয়েছে, এখন রাক্ষসী-বেলা। আমি গ্রামটি প্রদক্ষিণ কোরে একটা পুষ্করিণীর ধারে এলেম। পুষ্করিণীটি প্রকাণ্ড, বর্ষাকাল, কূলে কূলে জল থৈ থৈ কোচ্ছে, একদিকে একটি বাঁধা ঘাট, আমি সেই ঘাটে গিয়ে বেসেলেম, আর একদিকে একটি

আত্মের বাগান। পক্ষীরা সারি বেধে, কাতার দিয়ে উড়ে উড়ে সেই বাগানে গিয়ে জমা হচ্ছে, অনেকগুলি একত্র হয়েছে, কিচির-মিচির কোরে ডাকছে, এক একবার দুহুৎ দুহুৎ কোরে উড়ে এ ডাল থেকে সে ডালে যাচ্ছে, একবার গাছের তলায় জমীতে এসে উড়ে পড়ছে, আবার উড়ে গিয়ে ডালে বসছে। কোনটি ঠোঁটে কোরে আধার লয়ে শিশু শাবকের মুখে তুলে দিচ্ছে, কোনটি বা পক্ষপুটে চঞ্চু ঢেকে নীরব হয়ে রয়েছে। কোনটা ধলার উপর-পড়ে লিটপিট ছোচ্ছে, যেন স্নান কোচ্ছে, আবার উল্টি পাল্টি পাখা খাড়া দিয়ে সেই ধুলো ঝেড়ে ফেলছে। কোনটা কোনটা ডালের একবার এ পাশে, একবার সে পাশে ঘন ঘন ঠোঁট পুঁচছে, যেন আহার কোরে আচমন কোচ্ছে। কোনটা বা আপনার চঞ্চু দিয়ে আর একটার গা চুল্কিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুরা সিঁড়ির ধাপে বোসে বিড় বিড় কোরে মন্ত্র পড়ছে, আরা মায়ংসক্যা কোচ্ছে। স্ত্রীলোকেরা কলসী কঁাকে কোরে পরকল্পার কথা বলতে বলতে চলেছে। কেহ বলছে, ‘দিদি! আমার মাথা চুলকোবার অবকাশ নেই, এই কেবল দুটো ভাত মুখে দে, কলসী কঁাকে কোরে অমনি ছুটেছি।’ কেহ বলিল, ‘ওদের বড় বউয়ের বড় ঠেকার, ভাতার ভালবাসে বলে অহঙ্কারে ভাল কোরে কথা কয় না।’ কেহ বলিল, ‘ভাই! পোড়া যম আমাকে ভুলে গেছে, আমার আর বাঁচবার মাথা নেই, মেয়েটার দশা ঐ হলো, মিন্বে একটা মাগী নিয়ে রাজ্যদিন সেখানে পড়ে আছে, ঘর-সংসারের দিকে একবার ফিরেও দেখে না। দিদি! মাগী কি গুণ জানে, মিন্বেকে ভেড়া কোরে রেখেছে!’ আর একজন বোলে, ‘বামার মার কি পোড়া কপাল, বউ ছুঁড়ি ছুঁপা দিয়ে থেঁতলায়, ছোঁড়া কিছুই বলে না!’ কেউ বোলে, ‘পাপ ঠাকুরঝির জালায় হাড় ভাজা ভাজা হলো, হৃদয় বোসে যে কারও সঙ্গে দুটো কথা কব, সে যো নেই, অমনি যেন রায়বাঘিনী এসে পড়ে।’ আর একজন বলে, ‘শত্রুর মুখে ছাই দে, যেটের কোলে আমার কামিনী

দশ বছরে পোড়েছে, তুমি আর কি কথা বল, এখন কি আর বিয়ে না দিলে ভাল দেখায়? লোকে যে মুখে চুণকাসী দেবে।’ আর একজন বোলে, ‘ওলো সেজো-বউ! বেলাটা যে গেছে একেবারে, তুই এত বেলা গেলে খাস কেন?’ সে বোলে, ‘ভাই! সে দুঃখের কথা আর বলো না। আমার কি আর চারটে হাত, চারটে পা, সেই ঝুঁজকোর বেলায় উঠব, বাসি পাটগুলি সারব, ঘর নিকোতে, আর উঠান কাঁট দিতেই বেলা হয়ে পড়ে, তার পর নাব, ধোব, কুটনো কোটব, বাটনা বাটবো, এর পর রান্নাবাড়া আছে, এই কান্তে কোন্সেই বেলা থাকে না, বেলা ত আর আমার হাত-ধরা নয়। মিন্বেকে যদি বলি, ছেলেটাকে একটু ধরো, তার জালায় কোন কাজের থা পাইনে, সে অমনি বোলে উঠে, ‘আমি কি তোমার ছেলে-ধরা ভাতার?’ কথা শুনে গায় জর আসে, সর্বাঙ্গ জলে যায়।’ আর একজন বলে, ‘পোড়া সতীনের জালায় জলে-পুড়ে মলেম, আমার বুকে বসে ভাত রাধে, আর ছুবেলা নেখোয়। দিদি! সতীন মাগী তারে কি কোরেছে।’ আর একজন বোলে, ‘শামার মা রামার মা! বড় বউকঁটিকি, বউ ছুঁড়ির সঙ্গে রাতদিন খিবুখিবু খিবুখিবু করে।’ শামার মা বোলে, ‘বউটোও ভাল না, অমনি কটকট কোরে মুখের উপর জবাব করে, একটু লাজলজ্জা নেই, শাশুড়ীকে একটু মন্তমান কোরে কথা কয় না।’ আর একজন বোলে, ‘স্বামীর চোপার জালায় পাড়ার আর তিষ্ঠান যায় না।’

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো, একে একে সকলেই চলে গেল, কেবল আমি আর একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, এই ছুটি মাত্র সেখানে বোসে আছি। স্ত্রীলোকটা আমায় একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল, বোধ হলো, সে কোন কথা বোলবে। সে কি বলে, তাই শোনবার নিমিত্তে আমি আগেই তারে ডাকলেম, অনেক পথ চলতে হয়েছে, রুগ্মিতে বড় কষ্ট দিয়েছে, এই সকল ফাল্গুত কথা নিয়ে তার সঙ্গে গল্প কৈদে দিলেম।

বৃদ্ধা বলিল, ‘হ্যাঁ, সে কথা সত্যি বটে, কিন্তু আরজাবাদে পৌঁছিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, আরো যে কত দিন আমাদের

বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হতে হয়, তারই বা ঠিকানা কি ?”

“আমাদের—এ কথা বাছা কেন বোলে ? তবে কি আপনিও ছাটনির সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন ?” এই কথা আমি বড় বড় কোরে বোলেম ।

রুদ্রা বলিল, “হাঁ, আমিও চলেছি । বড় দূর নয়, আপনার তাঁবুর নিকটেই আমি আছি । আপনি ত আর বুড়ীদের চেয়ে দেখেন না, কেবল ছুড়ির উপরেই আপনার চোক, সেটা আমি বেশ জেনেছি । আমি আরো একটি লোককে জানি, তুমি তারে সেলামের উপর সেলাম করো, সে যেন তার মর্শ্ব বুঝতে পারে না । আমি কিন্তু আপনাকে নিশ্চয়ই বলছি, নজফালীর কথা নূরমহলকে সামান্য হেঁজিপেজি মেয়ে জ্ঞান কোরবেন না । যা হোক, ধর্মি তোমার ছাতি ! তোমার সাহস, তোমার ভরসা দেখে অবাক হয়ে গেছি ।”

“হে ভগবান ! তবে কি আমি তাঁর কাছে অপরাধী হয়েছি ।” আমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরিয়ে পড়ল ।

রুদ্রা বলিল, “হাঁ, তা হয়েছেন ত বটে, অবশ্যই হয়েছেন, এখন সেধে পেড়ে তাঁকে ঠাণ্ডা কোত্তে হয় ।” আমি বোলেম, “তবে তুমি আমার হয়ে তাঁকে পাঁচ কথা বুলিয়ে বলো ।”

রুদ্রা বলিল, “সাধতে হয়, তুমি আপনি গিয়ে সাধো, আমার গরজ কি ? আমি কারেও সাধতে পারিনে । একবার তোমার কথা তাঁকে গিয়ে বলি, আবার তাঁর কথা তোমায় এসে বলি, এত কি কার্টানা কার্টা দায় পড়েছে ?”

আমি বোলেম, “কি বালাই, আমি কি কোরে তাঁকে সাধব ? এ কি একটা কথা ! তাও কি কখন হোতে পারে ?” বুড়ী বোলে, “তোমার রাত পুহুরের ধারে পেড়ে গড়াগড়ি দিলে, তাতে সাধাপাড়া চলে না, তবে যদি তিনি দেবকন্নার ভায় জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ দেখা দেন, তা হোলে হোতে পারে । তুমি যদি বল, ‘আমার অপরাধ হয়েছে, তাঁর পায় ধোন্তে রাজি আছি,’ তবে আমি

গিয়ে নূরমহলকে ঐ কথা বলি, তা হোলে তোমাকে তিনি ডেকে পাঠাবেন ।”

“ডেকে পাঠাবেন ! সে কি ? আমার প্রতি তিনি কি এত রূপা কোরবেন ? আমার যে তত সৌভাগ্য হবে, তা কি কোরে বিশ্বাস কোত্তে পারি ? আমি এই কথা বোলেম ।

“হু”, তা বটে, আপনি সে কথা বোলতে পারেন । নূরমহল আপনাকে কখন দেখেন নি সত্য, কিন্তু আপনার নাম শুনেছেন, একবার তাঁকে বলা হয়, আপনি “তাঁর স্বামী হবেন ।” রুদ্রা এই উত্তর কুরিল ।

“তা যদি হয়, তবে বাছা আমায় সেখানে লয়ে চল, আমি তোমার পায় পড়ি ।” রুদ্রা বলিল, “আমি তা কি কোরে পারি, কত আবাবিষে, কত বাবা-ব্যাঘাত রয়েছে, শে গোগাভোগও কহ আছে, শেষে আমার দশাই বা কি হবে, তুমি ছেলেমানুষ, সেগুলি আগে বিবেচনা কোরে দেখতে হয় ।” আমি বলি লাম, “ভয় কি ? কি হবে ? নয় শেষে যা থাকে অদৃষ্টে ঘটবে, তাতে ভয় কি ? আমা হোতে তোমার যে প্রতাপকার হবে,—এই ধরে তার প্রথম মনুনা (রুদ্রার হস্তে কাকন মূল্যে স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিলাম ) যদিষ্ঠাৎ”— এই সময় আমার পশ্চাতে বাগান থেকে একটা আকৃতি বেরিয়ে এলো, দেখতে পেলেম । তাই দেখে রুদ্রা একটা ভাণ কোরে সোরে পড়ল, যাবার সময় বোলে গেল, “রাত দুই প্রহরের সময় প্রস্তুত হয়ে থেকো ।” সে আর পেছন দিকে ফিরে দেখলে না, অমনি তাড়াতাড়ি চোশে গেল । আমরা মনে করিনি, এ সময় এখানে কেউ আসবে, আমাদের ইচ্ছাও ছিল না যে, কেউ আসে । যাই হোক, ঐ আকৃতিটি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে পুষ্করিণীতে নামল, গায়ের সালখানা আরো গোটাঘোটে কোরে গায় দিয়ে, জলের কিনারার কাছে শেষ ধাপে গিয়ে বসলো, বোধ হয়, আর কারও আসবার কথা আছে, তারই প্রতীক কোত্তে লাগল । আমি আর সেখানে অধিকক্ষণ দেরি কোলেম না, যেখান থেকে ঐ মানুষটি বেরিয়ে এলো, সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ কোলেম, তাবলেম

এই বেলা আন্তে আন্তে আপনার আড়-  
ভাঙে যাই। পথে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বৃষ্টির  
তোড়ই বা কেমন, যেন কলসীর কাণায় জল  
মলতে লাগল। আমি আর কোন উপায় না  
দেখে ঐ বাগানের মধ্যে রামকুড়ের মত এক-  
খানা মেটে ঘর ছিঁ, তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয়  
নিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, কাঁপ বন্ধ,  
কিন্তু তেমন শক্ত কোরে বাঁধা ছিল না, জোরে  
একটা লাখি মাল্লেম, তাতেই কাঁপটা খুলে  
গিয়ে কাঁক হয়ে পড়ল। ভিতরে প্রবেশ  
কোলেম। দেখলেম, কোথাও কেউ নেই,  
ঘরখানি খালি পড়ে আছে, কিন্তু ঘোর অন্ধ-  
কার, যেন যমালয়। ভাবলেম, কি জানি, যদি  
বাশের কোন ঘরে কি এক কোণে বাড়ীও-  
খানা ঘুমিয়ে থাকে, সেই জন্তে “ঘরে কে  
আছে, ঘরে কে আছে,” বার কয়েক এই শব্দ  
কোলেম, কারও সাড়া পেলেম না। আমি  
একটি কোণে গিয়ে বসলেম, ভাবছি, কলটা  
একটি পোরে গেলে বাসায় যাব। এখন যেমন  
হুই, তেমনি ঝড়। বাতাসের আর জলের  
লাগটা লেগে ঘরখানা এক একবার ঢলছে,  
এক একবার ঘরের মধ্যে হাওয়া গিয়ে হু হু  
কোন্তে লাগল। বাহিরে ক্রমিক সোঁ সোঁ,  
ভোঁ ভোঁ শব্দ হোচ্ছিল, একবার হুড়ুম হুড়ুম,  
হুড়ুম হুড়ুম কোরে মেঘের গর্জন হতে লাগল,  
গাছের ডালগুলো বাতাসের জোরে ছুয়ে  
যায় পোড়ে মড় মড় কোন্তে লাগল।  
এখন দেখলেম, আর বৃষ্টি বাতাসের তুফান  
কমে বেড়ে উঠল, ঝড়ের গোঁ গোঁ, জলের  
হুড়ু হুড়ু শব্দে চারিদিকে যখন তোলপাড়  
কার তুলে, তখন আমি আন্তে আন্তে উঠে  
মাগড়টি যত পাল্লেম কদে বাঁধলেম, বেঁধে  
চুঁদে আবার সেই কোণে গিয়ে বসেছি মাত্র,  
এমন সময় গলার আওয়াজ শুনতে পেলেম,  
গাছের কাণা ‘কথা কোচ্ছে। তারা যেই  
শব্দ, বৃষ্টিতে আমার ছায় দেকশেক হয়েছিল।  
শেষে তারা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ  
কালে। ঘরখানি অন্ধকারে বুট-বুট কোচ্ছিল,  
গাছেরও ঘোর অন্ধকার, তামাম আকাশ  
মধ্যে ঢেকে ফেলেছে, ঐ ঘর আর বার অত-

কূল হওয়াতে তারা আর আমাকে দেখতে  
পেলে না। এখন কেবল নাক আর মুখ বন্ধ  
কোরে মড়ার মতন পোড়ে থাকতে পাল্লে  
আমি যে এখানে আছি, তারা তা টেরও  
পাবে না। শেষে তাই কোন্তে হলো, মুখ বন্ধ  
কোলেম, নিশাসও আন্তে আন্তে ফেলতে লাগ-  
লেম। কান কিন্তু খোলা ছিল, ছিল ছিল,  
তাতে আর ভয় কি, কানের সে দোষ নেই  
যে বলে দিবে, কি ধরিয়ে দিবে। তারা মনে  
কোলে, এ ঘরে তারাই যে কজন আছে, তা  
ছাড়া আর কেউ নেই। শেষে তারা চলিত  
ষপাবিৎ গলার দরে এই সকল অশ্রুপ কোন্তে  
লাগল।

প্রথম ঘর বোলে, “কলমবেগ! পালকীখানা  
এখনও পৌঁছালো না, দেরি দেখে আমার মনে  
বড় ভাবনা হোচ্ছে।”

দ্বিতীয় ঘর, “রশ্মম ভাই! ভয় কি! বৃষ্টি  
হওয়াতে খাল, বিল, নদী, নালা সব ভেসে  
গেছে, রাস্তার উপরেও এক হাঁটু জল দাঁড়ি-  
য়েছে, তাতেই দেরি হোচ্ছে, তার জন্তে ভয়  
কি! সে পাখীটি যেমন আমাদের হাতের  
মধ্যে এসেছে, এখন বক্সিসটি সেইরূপ হাতে  
লাগলে হয়, তা হোলে বক্সলেম, একটা কাজ  
হলো।”

প্রথম ঘর—ছি! ও কি! কথা! নজফালীকে  
কে না জানে? সে কি কখনও কাকেও ঝাঁকি  
দিয়ে থাকে? না দেবো বলে দেয় না? দানাই-  
শক্তি তার বেশ আছে। আবার একথাও  
বলি, সে যা কোন্তে বলে, তা যদি না করা  
হয়, তবে তার ভয়েতে না কাঁপে, এমন লোক  
নেই, এমন তাঁর রাস, এমন তাঁর দব্দবা।

দ্বিতীয় ঘর—আচ্ছা, আচ্ছা, আমাদের  
সে ভয় কোন্তে হবে না, ঐ শোনো, আমি যেন  
বেহারাদের গুন গুন শব্দ শুনতে পাচ্ছি,—না,  
তা নয়, ও বুঝি বাতাস, গাছে বেধে বেধে  
যাচ্ছে, তাই হু হু, গোঁ গো শব্দ হোচ্ছে, যেন  
গেদাচ্ছে।

প্রথম ঘর—“কলমবেগ! এ কুঁড়ে কার?  
কে থাকে এতে?”

দ্বিতীয় ঘর। কেউই না, গ্রামের লোক

এই কুঁড়ের সম্বন্ধে আনুখ্য আনুখ্য গল্প করে। তারা বলে, এই ঘরে একটি বুড়ী বাস কতো, সে ডাইনী ছিল, জাদুটো আসটাও জানতো। সে সত্যি ডাইনী ছিল কি না, তাই জানবার জন্তে সকলে তার পরীক্ষা করে, সেই পরীক্ষাতেই সে মারা পড়ে, সেই অবধি কেউ আর এ ঘরের নিকট আসে না।

প্রথম স্বর—কি কোরে পরীক্ষা কোলে ? সে শাকচুর্ণী খুসুনী বুড়ীকে নিয়ে তারা কি কোলে ?

দ্বিতীয় স্বর—পুকুরের পাড়ে এক জন লোক তীর-ধনুক লয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর জনকয়েক লোক ধরাধরি কোরে বুড়ীকে ঐ পুষ্করিণীর জলে চুবিয়ে ধোলে। যেমন তারে জলে এনে ফেলেছে, অমনি পাড়ের সেই লোকটি খুব জোরে তীরটি ছুড়ে ওপারে নিয়ে ফেলে, তীরটি ছুড়েই সে তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লো, সে সেই তীরটি লয়ে ফিরে এসে দেখলো যে, বুড়ী মরে নি, বেঁচে আছে, তবে সে সত্যি সত্যিই ডান। কিন্তু সেটি ঘটে নি, সে ফিরে এসে দেখে, বুড়ী ঘোরে জলের উপর ভাসছে, তাই দেখে সকলে ফতোয়া দিলে “সে ডান ছিল না।” অনেকে আবার এ কথাও বলে, সে যদি ডান না হবে, তবে জলের মধ্যে তলিয়ে কি কোরে অনেকক্ষণ বেঁচে ছিল। ডান ভিন্ন অস্ত্র কেউ জলের মধ্যে ডুবে থেকে ততক্ষণ বাঁচ না। বুড়ীকে শেষে গোর দেওয়া হয়। গ্রামের লোক বুড়ীর কুঁড়ের কি তার কবরের নিকট দিয়েও চলে না, সে মুখেই হয় না। দেখো, সাবধান! তোমার ভয় হয় নি ? বাহবা ! বাহবা ! রস্তুম ! তুমি যে পাতার মত ধরুধর কোরে কাঁপছো !

প্রথম—স্বরনা, না, তা নয়, যেন ঐ দিক্কার কোণে কি নড়ে উঠল শুনলেম, তুমি কি শুনতে পাওনি ?

দ্বিতীয় স্বর “হায়, হায় ! কি ভায়াসা !” সেই শাকচুর্ণী বুঝি তোমাকে নিতে আবার বেঁচে উঠল ! রস্তুম ! তোমার কি সাহস ! বলহারি বাই ! কি লজ্জা ! অনেক দাঙ্গা কোরে বেড়াও, অনেক জাঁক কোরে থাকো,

আমি যানে কোন্তেম, তুমি একজন মানুষের মত মাহুম, অনেক খুনও—” রস্তুম বলিল, “চুপ্ করো ভাই, আল্লার দোহাই, একটু চুপ্ করে; সে সকল কথায় দরকার কি ? পাপ তোমারও আছে, আমারও আছে, এর পর সেখানে ছ’জনকেই জবাব দিতে হবে। ঐ শুন, পাল্‌কী আসচে, আমি বেহারাদের গলার শব্দ পেয়েছি, আলোও দেখতে পাচ্ছি।”

কলমবেগ—আমাদের এখানে আলোর দরদরকার নেই, দৌড়ে যাও, গিরে বল, আলো নিবিয়ে ফেলে।

রস্তুম—আচ্ছা, আমি এগিয়ে বাই, তুমি তোমার সালখানা বিছিয়ে একটি বিছানা কোরে রাধো।

কলমবেগ—ছি ! বিছানার দরকার কি, পাল্‌কী শুদ্ধ ঘরের ভিতরে আনা যাবে। এই বেলা দৌড়ে যাও, আলো এসে মুখের উপর পোড়ছে। দৌড়ে গিয়ে নিবিয়ে দাও !

রস্তুম দৌড়ে গেল, কলমবেগ ঘরে বোসেই পক্ষীটির আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগল, এখন সে পক্ষীটি যিনিই হোন। পাল্‌কী এসে পৌঁছিল, অতি কষ্টে সঠি, আস্তে আস্তে, নিশ্চেষ্ট, তত অন্ধকারে, ঘরের ভিতরে নিয়ে এলো। আমি যেন শুনতে পেলেম, পাল্‌কীর মধ্যে অগ্নি অগ্নি অগ্নি, একটি একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হোচ্ছে, নিশ্বাসটি কোন স্থালোকের হৃদয় ভেদ হয়ে বার হোচ্ছে, তাও বুঝতে পারলেম। কান অদৃষ্ট পুড়ল ? কে সে সুন্দরী নজফালীর কান্দে গেরেণ্ডার হোলেন ? সেই ফকান জানবার জন্তে তারি ব্যগ্র হোলেম, মনটা ছটফট, কোত্তে লাগল। এক্ষণে কারও নখে কথা নেই, সকলেই নীরব হয়ে আছে, এর মধ্যে কলমবেগ হঠাৎ কথা কোয়ে উঠল, সে বেহারাদের ডেকে বোলে, “তোরা পুষ্করিণীতে হাত-পা ধুয়ে পুষ্করিণীর আড়-পারে যে ধর্মানালা আছে, সেইখানে গিয়ে থাক, ধোতে হয়, রস্তুই কোরে খা, কাল প্রাতেই বিদায় হয়ে চোলে যা স।” রস্তুম বোলে, “চল, আমি তাদের সঙ্গে যাচ্ছি।” ঐ কথা শুনে বেহারারা চোলে গেল। এই অবসরে কলমবেগ পাল্‌কীর ঝিলিমিলি তুলে, সেই



বামা বন্দিনীকে সন্ধান কোরে বলতে লাগল, “ভয় কি, কোন চিন্তা নেই, কোন কষ্ট হবে না, যখন যা চাই, তখন তা পাবে, বেশ সুখে অভ্যস্ত থাকবে, এতেও যদি অসন্তুষ্ট হও, তবে তোমারই দোষ।” সেই যুবতীটি এই বাক্যের কোন জবাব না কোরে কেবল ফুলে ফুলে, ফোস্ ফোস্ কোরে কাঁদতে লাগলেন, মাঝে মাঝে একটি একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে লাগলেন। কলমবেগ বলতে লাগল, “স্বন্দরি! কিছু মনে করো না ভাই, যে রসীতে পালকির সঙ্গে বাঁধা আছে, সেইটি আরো একটু টেনে কসে বেঁধে দি, যেন খুলে না যায়, তাই কোরে আমি চলে যাই। তোমার একলা থাকতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, একলাই থাকো। আমার স্থানান্তরে বরাতে আছে, সেখানে একবার না গেলে নয়, আবার দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি, আমি যার দাস, তিনি কি বলেন, তাই মনে আসি।” এই কথা বলে যে রসী দিয়ে যুবতী বাঁধা ছিলেন, তাই একবার নেড়ে নেড়ে দেখে, আরো একটু কসে বেঁধে দিলে, আর পর দরের কাঁপটা বন্ধ কোরে সে চলে গেল। খানিক পরে যুবতী শোকের প্রোহানা খুলে দিলেন। বড় বড় কোরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, করুণস্বরে বিলাপ কোতে লাগলেন, “হায়! আমার এ পোড়া অদৃষ্টে তত লাঞ্ছনাই আছে! বিধাতা আমাকে কত শাস্তিই কোচ্ছেন! আমার জোর কোরে, কোন ছিঁড়ে বাড়ী থেকে বার কোরে দিলে, শেষকালে এই চক্রে, এই চাতরে এসে পড়তে হল! ভাই! আঃ ভাই! তুমি কোথায়? আহা! তোমার ভগ্নী দেলজান চির-হুঃখিনী, চির-অনাধিনী হল।” দেলজানের নাম শুনেই আমি চমকে উঠ্লেম, ভয়ে আর বিষয়ে সর্কাজ নিউরে উঠে আমার মোহ হল। তখন যদি বজ্রাবাত হয়, তাতে আমার তত ভয়, তত মোহ হতো না। আমি লুকিয়ে ছিলাম, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেম, আস্তে আস্তে এসে পালকির দরজা খুলে উচ্চনাদে বল্লেম, “দেলজান! আমি তোমার সেই সাদক, তোমার এই ভগ্নী!” আমার গলার আওয়াজ পেয়ে, “অ্যা

সাদক! এই অজ্ঞান-ধ্বনি অতি ক্লীণ, চাপা-স্বরে দেলজানের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে পড়লো, প্রাণহীনী তার পর বল্লেম, “আম্ভার কি মহিমা, নিকটেই একটি বন্ধু মিলিয়ে দিলেন।”

আমি বল্লেম, “বন্ধু তুমি পেয়েছ সত্য, সে এমন বন্ধু যে, প্রাণ দিয়েও তোমার উপকার, তোমার উদ্ধার করবে। দেলজান! আর সময় নষ্ট করো না, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র পালাও।” এই কথা যুখে বলছি, আর তলোয়ারের আগা দিয়ে টুক টুক কোরে রেসমের বাধনগুলি কাটছি।

দেলজান বল্লেম, “উঃ! এখন আমি যাই কোথায়? আগরায় ফিরে যাবার উপায় কি?” আমি বল্লেম, “তা আমি জানিনে, কিন্তু আর এখানে থাকা উচিত নয়, চলো, তোমারে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাই, তুমি আমার সঙ্গে এসো। পেটেলকে \* বলে তোমায় আশ্রয় দিয়ে দেব, কিন্তু সিটি আমাকে বড় সাবধান হয়ে কোতে হবে, উঠ উঠ, আর দেরি কোরো না।” এই কথা শুনে দেলজান বেরিয়ে এলেন, আমি স্বরের কাঁপ খুলে দেখ্লেম, বাহিরে জনপ্রাণীও নাই, কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, সব নিরুদ্ভাষ, কেবল গাছ থেকে টপ টপ কোরে ফোটাফোটা বৃষ্টির জল পড়ছে, তারই শব্দ হোচ্ছিল। দেলজান কতক ভয়ে, কতক লীতে থর থর কোরে কাঁপতে লাগলেন, আমার সালখানা তাঁর গায় বেঁপে দিলেম, আর তাঁর নিজের সালখানা লয়ে পাকুড়ীর মত কোরে তাঁর মাথায় জড়িয়ে দিলেম, আমার মতলবটা এই, লোকে যেন তাঁরে পুরুষ জ্ঞান করে, স্ত্রীলোক বলে চিন্তে না পারে। পেটেল যেখানে বাস কস্তো, আমি তা জান্তেম, সেইটিই স্মৃথের বিষয় হলো। যে পথ দিয়ে লীঘ্র লীঘ্র তার বাড়ীতে যাওয়া যায়, আমরা সেই পথ ধোরে চল্লেম। পথে যেতে যেতে বল্লেম, “দেলজান!

\*তৎকালীন গ্রামে গ্রামে একটি কারপদাজ নিযুক্ত থাকিত, তারা রাজস্ব পত্র আদায় করিত, আর ক্ষুদ্র প্রজার প্রজার ঝকড়া হলে স্বকাল নিষ্পত্তি করিয়া দিত। এই কারপদাজকে পেটেল কহে।



সকল কি কারণনা? আমার দিব্য, সব কথা আমার ভেঙ্গে বল।”

দেলজান বলেন, “আমার এখন কথা কবার তাক নেই, তাড়াতাড়ি কোরে চলো, ভয়ে প্রাণ কাঁপচে, পথে এসে আরো দ্বিগুণ ত্রাস হয়েছে, সেখানে পৌঁছে আমি তোমাকে সকল কথা খুলে বলব, এখন একটু চলে চল।” এই কথা বলতে বলতে মনোময়ী মানিনী দেলজানের চোক দিয়ে বর বর কোরে অশ্রুপাত হতে লাগল।

দেলজান ভয়ে কঁপে কঁপে এক একবার পড়ে যান পড়ে যান হন, আমি অমনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরি, একটু বসে, জিরিয়ে, তাঁরে সুস্থ কোরে আবার চলি। একবার নয়, তামাম পথই এইরূপ কোরে চলতে হয়েছিল— একবার ধরি, একবার বসি, একবার জিরুই, এই প্রকারে ঘো যা কোরে কোন মতে পেটেলের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছন গেল। আমরা যখন পৌঁছিলেম, তখন সে সপরিবারে দরজা বন্ধ কোরে শুয়েছে, সকলেই ঘুমে অধোর। “আমি ঘরের ভিতর যাব”, এই শব্দ কোরে দরজায় থা মাতে লাগলেম। সেই গোলমালে পেটেল তখন জেগে উঠে বলে, “কে তুমি এত রাত্রে চোঁচোঁচি কোচ্চো?” আমি বলেম, “আমি আরজজ্জবের ডেরা থেকে এসেছি, দোহাই রাজপুত্রের, আমারে ভিতরে নেও।”

পেটেল বলে, “আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন, আমি আপনাদের দাস।” এই অচুনয় কোরে সে দরজা খুলে দিলে, আমরা ঘরের ভিতর গিয়ে বসলেম। দেলজানের এখন নিখাস ফেলবার স্থান হল।

পেটেলকে বোল্লেম, “তোমারে বেশ খুসী কোরব, কিন্তু একটি কাজ কোত্তে হবে,—এই দণ্ডেই জন কয়েক বেহারা, আর একখানি পালকি আনিয়া দিতে হবে, এই সুবাটি আগরায় যাবেন, তারা সেইখানে তাঁকে রেখে আসবে।”

পেটেল বলে, “আরে খোদাবন্দ, এ ক্ষুদ্র-গ্রামে এত রাত্রে বেহারা কোথা পাব? তবে একবার চেষ্টা কোরে দেখি। আপনার কখন দরকার?”

“এই রাত্রেই চাই, অন্ধকার থাকতে থাকতে গ্রাম পার কোরে দিতে হবে। তাঁকে যেন এখানে সূর্য্যোদয় না দেখতে হয়।”

পেটেল বেহারা ডাকতে গেল। দেলজান এই অবসরে বলতে লাগলেন, তাঁর খুড়ী রসী-নারা ধোকা দিয়ে তাঁরে নক্ষালীর হস্তে সম-র্পণ কোরেছেন। নক্ষালীর অনেক দিনাবধি চেষ্টা, দেলজানকে তাঁর বিলাস-মহলের পরি-বার করে রাখেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী খুড়ী দম দিয়ে সহরের বাহিরে একটা খাগানে তাঁরে পাঠিয়ে দেন, সেইখানে একদল বদমাস লোক রেখে দেওয়া হয়, তারা তাঁরে ধরে, পাল্কির মধ্যে পুরে, ঐ পাল্কির সঙ্গে তাঁরে রসী দিয়ে আঁছা কোরে বাঁধলে, যেন কোন প্রকারে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে না পারেন। সেই পাল-কিতে তারা তাঁরে এইখানে নিয়ে এসেছে। এই অভাবনীয় বিপদটি না ঘটলে, তার পর দিবস দেলজান তাঁর সহোদর ইউনুকের সঙ্গে বাঙ্গালায় যাত্রা কোতেন।

দেলজান বলতে লাগলেন, “আমি তখন ভাবলেম, আমি ত জন্মের মত গেছি, আর যে কখন এ দায় থেকে মুক্ত হব, তা হবো না, সে আশায় হাত ধুলেম। মুখ শুকিয়ে গেল, একেবারে বুক-ভাঙ্গা হয়ে পড়লেম। তোমার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি যেন অবু-ল সাগরে কুল পেলেম, মূর্নবাস্যের স্থানে হঠাৎ আশার সঞ্চার হল, ভয় নুচে উল্লাসের উদয় হল, এখন আমার যেন সব স্বপ্ন বোধ হোচ্ছে। সাদক! আজ কি আনন্দের দিন! আজ কি সুপ্রভাত! আজ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমার হৃদয়ে আনন্দের তুফান হোচ্ছে। সাদক! তোমার হাত দাও দেখি, আমি একটু তার উপর মাথা দিয়ে শুই, একে ত ভাবনায় ভাবনায় শরীর শীর্ণ হয়েছে, তার উপর এই আচ্ছাদের তরঙ্গ, আমার থরকাজ অবশ হল। প্রাণ অস্থির হয়েছে, উপরোপরি আনন্দের বেগ এসে আমাকে আরো শক্তিশীন কোরে ফেলেছে, আমি আর বসতে পারিনে, সাদক! আমাকে ধরো, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে, ধরা-ধরি কোরে আমাকে শুইয়ে দাও, আমার হৃদয়

প্রকল্প ভাবে অবনত হল। সাদক ! তোমার রূপকান্দে পোড়ে আমি তোমার প্রেমের কাঙ্ক্ষা-পূর্ণাঙ্গী হয়েছি।”

আমি বল্লেম, “দেলজান ! বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এত দোভাগ্য লিখেছেন ? কি পুণ্য কোরেছি যে, তার প্রভাবে আমি তোমার প্রেমাস্পদ হব ? ভয় হচ্ছে, পাছে আমাকে ক্ষুধা হয়ে শেষে অন্ত্যাপ কৌন্তে হয়, পাছে আকাশ-কুসুমের স্নায়, পাছে স্বপ্না বদ্বিত স্নেহের স্নায় আমার এই অপার আনন্দাশ্রুত মিত্যা হয়ে পড়ে ! অদৃষ্ট ! তুমি যেমন আমার প্রতি পূর্বে পূর্বে করুণাশ্রুত হয়েছিলে, এক্ষণে আবার স্নায়কুল হয়ে তেমনি স্নায়ী, তেমনি প্রকল্পিত কোলে। এত দিনের পব আমার গ্রহশান্তি হল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল, অদৃষ্ট প্রসন্ন হল। নজফালী এখন আস-বুদ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হোন, আমার তাতে কোন বেদ নাই। একা দেলজান আমার শাস্রাজ্য, আমি মাত্র সেই বিধুমুখীর হৃদয়-বিহারী হই, তা হলে ইন্দ্রের ইন্দ্র পেলেম জান করব।” যিনি আমার হৃদয়ের মণি, নয়নের আনন্দ, এক্ষণে সেই চন্দ্রাননী আমার সম্মুখে বসে, সেই ক্ষুধিতে আমার অন্তঃকরণে আশ্রা-দেব স্রোত চলতে লাগল।

দেলজান বল্লেম, “সাদক ! তুমি এখানে কি কোরে উপস্থিত হলে ?”

আমি বল্লেম, “ইটি বিধাতার কৌশল, দৈব আশ্র আমায় কোন গতিকে ঐ কুণ্ডে ঘরে এনে আশ্রয় দিলেন। নজফালীর লোকেরা দেখে কথা বলা-কওয়া কোরেছে, ঐ ঘরে বসে সে সমুদায় আমি শুনেছি। নজফালী আজকাল আমার সরদার, আমি তাঁর তাঁবে-দার। আমি যে মধ্যস্থ হয়ে তোমাকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দিলেম, সেটি যেন সে স্বপ্নেও না জানতে পারে, সেই যোগাড়টি আগে চাই, মিটি বড় আবশ্যক।”

দেলজান বল্লেম, “সাদক ! তবে ত তোমার সাবধান হওয়া উচিত, আপনার বাঁচবার পথ ত কোরে রাখা চাই, তুমি নয় এক কাজ করো, আমি থাকি, তুমি আপনার ডেরায় চলে যাও,

পেটেলকে বলে যাও, সে আমায় রওনা কোরে দেয়।”

আমি বল্লেম, “না, না, তা হবে না। আমি কি তোমারে পেটেলের ভরসায় রেখে যেতে পারি ? তাও কি কখন হয় ? তুমি যে একলা আগরায় চলে, আমি তোমার সঙ্গে যেতে পাল্লেম না, তাতেই আমার মনে কত কষ্ট হচ্ছে, আবার তোমারে একলা ফেলে যাব ? এও একটা কথা ? তা যা হোক, তোমার খুড়ী জিজ্ঞাসা কোলে তুমি তাঁরে কি বলবে ? তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, এত শীঘ্র কি কোরে ফিরে এলে, তখন তুমি কি জবাব দেবে ?”

দেলজান বল্লেম, “আমায় তখন মিথ্যা-কথা বলতে হবে, তা কি করবো ?”

আমি বল্লেম, “তবে তুমি এই কথা বলো, বিস্তর কাঁদাকাটা করাতো, অনেক হাতে পায়ে ধরাতো নজফালী দয়া কোরে আমায় ছেড়ে দিয়েছেন। তোমার ভাই ত তোমার সঙ্গেই নিতে স্বীকৃত আছেন, তবে ভবিষ্যতে আর কখন রসীনারার চাতরে পড়তে হবে না। তা ত হলো, কিন্তু প্রাণময়ি ! আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ কবে হবে ? আর আমাদের ছাড়াছাড়ি না হয়, সেরূপ দেখা-সাক্ষাৎ কত কালে হবে ?”

দেলজান বল্লেম, “আহা ! সাদক ! অদৃষ্টই সব বিষয়ের গোড়া জান্বে। আমাদের অদৃষ্টে যে কি আছে, তা কে জানে ? বোধ হয়, চির-দিন কিছু এ হঃসময় থাকবে না, দিন অবশ্যই পাব, তখন আমাদের মিলন হবার কোন বাধা হবে না, তখন কেউই তার প্রতিবাদী হবে না।”

এই সময় পেটেল একখানি পাল্কি আর জন কয়েক বেহারা এনে উপস্থিত কোলে, তাই দেখে আমরা চুপ কোল্লেম, আর কথাবার্তা চলো না। গ্রামের দুজন চৌকিদারকেও আনান হল, তারা হেপাজাতের নিমিত্তে সঙ্গে যাবে। যা যা গোছাবার ছিল, সব ঠিক ঠাক কোরে দেলজান পার্জিতে উঠলেন, আমি তাঁর হাতখানি ধরে বোল্লেম, “দেলজান ! তুমি আমার আঁখার ঘরের মণিক, দেখো, যেন

ভুলো না, আচ্ছা, তবে এখন এসো, মনে রেখো।” মসালচিরা মসাল জ্বলে নিলে, বেহারা পাল্কি উঠিয়ে “হংগো বিসপা, সে যিবে মথুরা”, গুন্ গুন্ কোরে এই গান গাইতে গাইতে চলো। আমার জীবনভারা দেখতে দেখতে দৃষ্টির বার হলেন। পেটেলকে পুর-কার দেবার কথা ছিল, তাকে যথাসম্মতি কিছু বকসিস দিয়ে তাড়াতাড়ি আড়ডায় চলেম।

পুষ্করিণীর ধারে যে যুক্তিটি দেখেছিলাম, পথের মধ্যে আবার সেই আকৃতিটি দেখতে পেলেম, সে তখন সেই কুঁড়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, তাতেই মনে কোলেম, এ কলমবেগ হবেই, তার সন্দেহ নেই। ভাবলেম, যাচ্ছে যাক, গিয়ে দেখবে যে, পক্ষীটি পিঁজারা ভেঙ্গে পালিয়েছে। তত অন্ধকার, তবু সে আমার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যদি চিন্তে পারে। ভাবলেম, চেনে চিনুক, এত কি তারে ভয়। আমি আপন মনেই চলেছি, একটু পরেই আপনার ডেরায় এসে পৌঁছিলাম, পথে আর একটি প্রাণীও দেখতে পেলেম না।

নরমহলের তরফ সেই বৃদ্ধটির আসবার কথা ছিল, রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, আর তার আসবার সময় নেই, সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার উচিত ছিল, ডেরা ছেড়ে কোথাও না বাই। কিন্তু দৈব বশত সেটা ঘটে উঠিল না। এত রাত্রে আর তার আশায় থাকা বুধা, এই ভেবে আমি গিয়ে শয়ন কোলেম, এক ঘুমেরই রাত্র প্রভাত হলো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে যদি কিছু ক্ষেপে থাকি, সে শুদ্ধ দেলজানের বিষয়, তিনি যে কীদে পোড়তে পোড়তে বেঁচে গেছেন, সেই স্বপ্নই অধিক দেখলেম।

রাতও প্রভাত হ’ল, বৃষ্টিও ধরে গেল, তামান দিনের জন্যে না হোক, আপাতত কিছু ক্ষণের নিমিত্তে ত ধোরে গেল। উট আর ছাতীর উপর লয়াজিমে লটবহর বোঝাই করা গেল, লোকজন তার উপর সোয়ার হল, আমরা এখন সেখান থেকে রওনা হলেম। পথে যেতে যেতে ভাবলেম, বিদেশে আসাতে আর স্বত লাভ হোক বা না হোক, আমাকে

আর আগরার চাতল্লও পোড়তে হবে না, কুচক্র, কুমন্ত্রণার মধ্যেও আর থাকতে হবে না, সে সকল দায় থেকে বেঁচে গেলেম, এখন এক প্রকার নিরাক্রান্ত হলেম। আমাদের উপর হুকুম ছিল, যে যেমন সুবিধা বুঝবে, যার যেমন ইচ্ছা হবে, সে সেই দিক দিয়ে চোলবে, তার পথাপথ বিচার নাই। আমরা ঠিক সিঁধে রাস্তায় না গিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পোড়লেম, রাজপথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরে চোলেম। আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি, চিকুতে চিকুতে চোলেছি, ভাবলেম, আমিই সকলের শেষে পোড়েছি, আমার পশ্চাতে আর লোক নাই। একটু পরেই কিন্তু আমার পেছনে চটাচট শব্দ, পটাপট শব্দ হোচে শুনতে পেলেম, দিগে দেখি, একটি লোক একটা টাটুর উপর সোয়ার হয়ে আসচে। জানোয়ারটিকে এক একবার সপাসপ, পটাপট চাবুক মাচ্ছে, এক একবার দমাদম পায়ের গুত মাচ্ছে। টাটুটি টঙ্গ টঙ্গ কোরে টলতে টলতে চোলেছে, একবার পিঠে চাবুক পোড়ছে, আর এক পা কোরে এগোছে, আবার দাঁড়াচ্ছে, আবার চাবুক পেটা কোচে, আবার ছপা এগোছে, এইরূপ কোরে চোলেছে। সোয়ারটি এক একবার চটাস চটাস, পটাস পটাস চাবুক মাচ্ছে, আর মুখে বা আসচে, দেদার ভণ্ড কথা বলে গালা-গালি কোচে, টাটুটির মা, মাসি, ভগ্নী, ভাইবির নাম কোরে কোরে যেন নবমীর খেউর গেয়ে দিচ্ছে। খুড়ো খুড়ী, পিসে পিসি পর্যন্ত তার যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল, সকলকেই তা বেঁটে, ভাগাভাগি কোরে নিতে হয়েছিল। সোয়ার যখন আমার ঘোড়ার পাশা-পাশি হল, তখন তার খেউড়ের তহবিল খালি হয়ে পড়েছে, আর তাতে মজুত মাল কিছুই ছিল না। সে আমায় দেখে, মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বে-আড়া মন্ত লম্বা সেলাম বাজালে। এ ব্যক্তি নজফালীর পরামাণিক। ভাবলেম, হল ভাল, মন্ত একটা দাঁও হাতে এল, এ ব্যক্তি দ্বারা নজফালীর ঘর-সন্ধানের কথা সব শুনতে পাব। সেই অভিপ্রায়ে আমি তার সঙ্গে কথা কইতে প্রবৃত্ত হলেম।

আমি বল্লম, “অন্তরি ! তোমার যে ব্যবসা, তা ত আমার জানাই আছে এখন তোমার নামটি কি, বল দেখি ?”

“খোদাবন্দ ! আমার নাম লুচার ।\* আমার বাবা চোর ছিলেন, সেই জন্তে তিনি আমার এই নামটি রেখেছেন, । নাম শুনেই বংশের পরিচয় জানা যায়, বংশ-মর্যাদার অভিমান কলেই কোরে থাকেন, সুধু আমি বলে নয় ।”

আমি মনে মনে বল্লম, এতে অভিমানের বিষয় কি আছে ? “তোমার কি ঐ নামটি ভিন্ন আর কোন নাম নেই ?” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেম ।

“আজ্ঞা আছে বৈ কি, খোদাবন্দ ! আমার আরো একটি নাম আছে, আমার বাবা আপনার ব্যবসায়ে ভারি চটপটে, ভারি তুখোড় ছিলেন, সেই জন্যে লোকে তাঁরে ‘শালা লুচার’ বলে ডাকতো, কাজে কাজেই আমারও আর একটি নাম ‘শালা লুচার’ ।”

“তুমি কোন্ ব্যবসার কথা বলছো, চুরি না ক্ষেউরী ?”

“কেন, দুইই হজুর ! চুরিও ছিল, আবার ক্ষেউরীও ছিল । “চল ! তুই বড় সুস্তি, বড় কুড়ে বড় গন্তজ্ঞান্য তুই ! তোর যেন আঠার মাসে বজ্বর ।” এই কথা বলে সেই দুর্ভাগা টাটু-র উপর পুনরায় চাবুক ঝাঁকতে আর পায়ের দ্বারা মাতে লাগল । সে গরিবের পিটের বাড়ীটা বেরিয়ে পড়েছে, ঠিক যেন ঐ বেটার ক্রুর মতন ধারাল দেখাচ্ছিল, তার উপর পুরাতন ঝাঁতলার জিনপোষ বিছান হয়েছে, তাও প্রায় ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে । পরামণিক বোলে, “ধর্ম্মাবতার ! আমার বাবা বে-আড়া চালাক ছিলেন, যে কাজে হাত দিতেন, তাতেই বাহবা পেতেন, তাঁর চালাকি দেখে সকলেই তারিফ কতো । তাঁর অনেক গল্প আছে, বলেন তো আপনাকে ছচারটে শোনাতে পারি ।”

আমি বল্লম, “তবে কি চুরি আর ক্ষেউরী ছাড়া আরো তার ব্যবসা ছিল ?”

“খোদাবন্দ ! তা ছিল না ? ছিল বৈ কি ।”

\* লুচার—বদমাস, বজ্রাত, চোর, ষাটপাড় ।

একটু একটু বেহালা বাজাতে, একটু একটু মাছ ধোতে জানতেন, একটু একটু আব-কারীর দোকানও রাখতেন, আবার দোড়া তৈয়ারিও কতেন ।”

“বোধ হয়, তাও একটু একটু !” আমি এই কথা বল্লম ।

“খোদাবন্দ ! ঠিক কথা, একেবারে আঁতে যা দিয়ে বলেছেন । যে দিন থেকে সেরীজ-জকে ফেলে দেন, সেই দিন অবধি আর কেউ তাঁরে দোড়া দিয়ে বিশ্বাস কোতো না । ‘সের-জঙ্গ’ সাহুলা খাঁর বড় পেয়ারের মাল; সেটি তাঁর লড়ায়ের দোড়া । সাহুলা খাঁ আপনার পিতা, না মহাশয় ?” আমি বাড়-নেড়ে সাগ দিলেম । লুচর বলতে লাগল, “হজুর ! আপনি ত কাল-কের ছেলে, তখন কেবল ছোকরা সেরীজ-জকে তয়ার কোরে দেছেন বলে, একদিন বাবা আপনার পিতার কাছে বক্‌সিস চেতে যান । গিয়ে কেবল দোচোকা কাঁপর দালালি কোরে আপনার চালাকি আর বাহাজুরী জানাচ্ছিলেন । খাঁ বাহাজুর বক্‌সিসের বদলে কেবল কতকগুলি বেধড়ক চোকরাঙ্গানি, আর কতকগুলি এলো-পাহাড়ী তাড়া দিয়ে বিদায় কোরে দিলেন । বাবা সেই তাড়া খেয়ে ফা ফা কোতে লাগ-লেন । আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, আপনি যদি সে সময় উপস্থিত থাকতেন, তবে দেখতেন, আপনার মহাহুত্তব পিতার কিরূপ হ্রস্ত রাগ, একবার দেখলে সে কালান্তক চেহারা আর কখন ভুলতে পাতেন না । পরমেশ্বর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, সেই দিন থেকে আমার আক্কেল জমেছে, তাঁর সেই ভুতুড়ে রাগ দেখে আমি নাকে কানে খত দিইছি যে, ঘোড়ার ব্যবসা কখনই কোরব না, সে দিকেও যাব না, তার নামও মুখে আনব না ।”

আমি বল্লম, “তুমি তা ভালই কোরেছ । আচ্ছা, তোমার পিতা কি ওজর কোরে কাটা\* লেন ?”

“কেন হজুর ! ওজরের অভাব কি ? মিথ্যা, আংগাগোড়া মিথ্যা বল্লেন । তিনি বল্লেন, বাছা, ঘোড়াটির নালবন্দী কোরে হাওয়া এনে আস্তে আস্তে টোলিয়ে নে বেড়াচ্ছি, টোলতে টোলতে

হঠাৎ বেহোস হল, কেন বেহোস হল, গোলাম তা বলতে পারে না—যেমন বেহোস হল, অমনি ধড়াস কোরে একটা পাথরের উপর পোড়ল, তাতে গোলামের কসুর কি,” হজুর ! সেটা কিন্তু কাজের কথা নয়, সব রুট-মুট । যা হয়েছিল, বলছি । নালবাধা আদৌ হয় নি, বাবা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলেন, সেই মাতাল অবস্থায় ঐ ঘোড়াটির উপর সোয়ার হয়ে সহরময় লাফালাফি, ছুটোছুটি কোচ্ছিলেন, লোককে দেখাচ্ছিলেন যে, দেখ, আমি কেমন পাকা সোয়ার ! নাল না বেঁধে ঘোড়া ছুটুতে পারি । এই কোণ্ডে কোণ্ডে একটা টকর লেগে ঘোড়াটা হুমুড়ি খেয়ে পড়ে গেল ।”

আবি বল্লেন, “তার ত ভারি সাহস ! সরা-সর মিথ্যা বলতে প্রাণে একটু ভয় হল না ?”

“কেন ধর্ম্মবতার, তাতে আর বাহাদুরী কি ? সব প্রথমে একবার একটা বড় গোচের মিথ্যা সাজিয়ে শুব কোরে দিতে হয়, সেই সময় হাত মথ নেড়ে, দাড়ী-গোঁপ কেড়ে, আফা-লন কোরে মুখবাজি করা চাই, একবার যদি ভয় ভাঙ্গা হল, তবে আর পায় কে, ক্ষুদ্রগোচের মিথ্যা কথার জন্তে ভাবতে হয় না, সেগুলি শ্রোতের ঠায় আপনা আপনিই হড়-হড় কোরে বেরিয়ে পড়ে ।”

লুচার যা বল্লেন, তাতে অনেক সার কথা আছে, আমি তারে দ্বিজ্ঞাসা কোল্লেন, “তুমি ত বাপের উপযুক্ত পুত্র, তার নাম রাখতে পারবে, কিন্তু তোমার কি কি ব্যবসা আছে, বল দেখি ?”

লুচার বল্লেন, “আমি নজফালী খাঁকে ফ্লেউরী করি, পোষাক পরাই, গা-হাত-পা দাবি, তাঁর নখগুলি টেচে ছুলে দি,—এই কটি কর্ম বাধা, নিত্য বরাওন্দ আছে ।”

• আমি বল্লেন, “আজ প্রাতে কি সে সকল কাজ সারা হয়েছে ?”

“আজ প্রাতে ? তোবা ! সোবানান্না ! কার সাধ্য ! আমি বরং জঙ্গল থেকে একটা রাগাল বাঘ, কি রোখাল সিঙ্গিধোরে তার গোঁপ-দাড়ী ওপড়াব, তাও ভাল, তবু নজফালীর কাছে

যেতে হেমন্ত হয় না, কার সাধ্য আজ দেদিকে ঘেঁসে ?”

“বটে ! এমন ! কেন বল দেখি ?”

“কেন হজুর ! কারো যদি মাথা বাচাবার ইচ্ছা থাকে, তবে ঠিক এই জন্তে এই ঘটছে, একথা স্পষ্ট না বলে, একটা আন্দাজে আন্দাজে এঁচে বলা ভাল । কোন একটা স্থল বিষয় লয়ে গোলমাল বেধে গেছে, তাতে তাঁর আঁতে যা পড়েছে, আমার ত এই আন্দাজ ।”

“তুমি কি বল্লেন, আমি কিছুই বুঝতে পারেন না ।”

“বুঝতে পারেন না ? আচ্ছা, ফের বলছি । এ কথার মধ্যে একটি বিবি আছেন, বিবিটি পিজারার বাহিরে সটকে পোড়েছেন !”

“তার মানে কি ?”

“ধোদাবন্দ ! মানে এই, আগরার পরমা-সুন্দরী বিনি, তিনি আমার মুনিবের মুটোর মধ্যে এসেছিলেন, ইটি গত রাজের কথা—হজুর এই দেখুন—আমার ঘোড়াটি একটি লক্ষ দিয়ে আপনার ঘোড়ার আগে যাবেই যাবে, একথাটি যেমন সত্য, আমার মুনিবও তেমনি মনে কোরেছিলেন, সে রূপসী হাতের মধ্যে আসবেই আসবে, তার সন্দেহ নেই ।” এই কথা বলেই পরামাণিক ভায়া খাঁ কোরে টাটুর পেটে পারের এক ধাক্কা মাল্লেন, সেরীজঙ্গকে যেমন তার বাপ ফেলে দিছিল, টাটুটিও সেইরূপ ধুপুস কোরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল । পরা-মাণিক ঠিকরে গিয়ে কাদায় পোড়ে লিট্-পিট্ হতে লাগলো, লুচারের তামাম দাড়িতে, তামাম গোঁপে কাদায় কাদা হয়ে গেল । সে যখন আবার দাড়ি গোঁপ নেড়ে, মুখ উচু কোরে মিট মিট কোরে চেয়ে দেখতে লাগল, আমি তার চেহারা দেখে হাসি রাখতে পারলেন না, হাসতে হাসতে নাড়ী ব্যথা হল । অন্যথা টাটুটি তখনই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাড়াণো, ভাঙ্গা পাখানি নেংচ নেংচ কোরে নাড়তে লাগল, তার দুঃখ দেখে প্রাণে কষ্ট হতে লাগল । লুচার উঠেই ঝড়ের মত হুহু শব্দে একচোট তারে গালাগালি দ্বিয়ে নিলে, তার পর আপনার

গায়ে কোথায় কোন চোটে লেগেছে' কি না, কি কেটে ছিঁড়ে গেছে কি না, সেইগুলি তদারক করে দেখলে, তার টাটুর গা ছড়ে গেছে কি না, হাড় টাড় ভাঙল কি না, তাও নিরীক্ষণ করে দেখলে, নিকটে একটা ডোবা ছিল, তার মধ্যে পড়ে গায়ের মাটি কাদাগুলি ধুয়ে ফেলে গোঁপ দাড়িগুলি পরিষ্কার কলে, টাটুটিকেও সেই জলে ফেলে-ধুয়ে ধেয়ে সাফ কোলে, কোমরে ক্ষুরভাঁর ছিল, তা থেকে একখানা পটি বার করে তার হাঁটুতে বসিয়ে কাপড় দিয়ে কসে বেঁধে দিলে। এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে টাটুটি লয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি দাড়িয়েই আছি, নজফালী আর তার পরিবার ষটিত অমরো যদি কোন কথা থাকে, আমাকে ত শুন্তে হবে, সেই জন্তে আমি তার সঙ্গ ছাড়লেম না।

লুচার বলে, “হুজুর! ঘোড়াটা আমায় ভারি দ্রেক শেক করেছে, আমার ইচ্ছা যে, দ্রুতল দেখুক, আমি কেমন পাকা সওয়ার। কখন মনে করি এবার তার পিটের উপর ঠিক খাড়া হয়ে বসে থাকব, সে লাফাক, নাচুক, ছুটুক, আমি নোড়ব চোড়ব না, কিন্তু ঘোড়াটা এমনি বজ্জাৎ, সে যেন সেই সময় ভুড়ি খেয়ে পড়ে যাবেই যাবে, সিটি যেন তার কৌলিক কৰ্ম্ম, এতে রাগ হয় না মশায়?”

আমি বল্লেম, “একটা সুন্দরী বিবি নিয়ে গোল হয়েছে, সেই কথা বলছিলে, ঐ সময় তুমি পড়ে গেলে। সে কথাটা কি?”

লুচার বলে, “তা বেশ হয়েছে, যেমন কৰ্ম্ম, তেমনি ফল, হাতে হাতে কলে গেছে, বড় মুখ করে মুনিবের কথা বলতে গেছিলেব, তার উপযুক্তই সাজা পেয়েছি। আমায় আর সে কথা মুখে আনতে বলবেন না। কি জানি, আবার একটা বিপদ ঘটবার আটক কি?”

আমি বল্লেম, “লুচার! তুমি পণ্ডিত বট, তোমার সাবধানের ক্রটি নেই, তুমি একটি অগাধ সাবধানী, তুমি বা জানতে, সে সকল আমার বলা হয়েছে, তাতে আমার ক্ষোভ নেই। তা বা হোক, পরামাণিক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সেনাপতির মাকি একটি কত্তা আছে?”

“হাঁ, আছে ত বটে, সে বিষয় পরামাণিককে জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই ত আপনি জানতে পেরেছেন। আপনি সে বিষয়টি চোচাপটে হাজির জেনেছেন।”

আমি বল্লেম, “যে একটি পেতনীর মত বুড়ী তাঁর কাছে দিবারাত্র থাকে, সে কে?”

“বুড়ি! বুড়ি! বুড়ি!” লুচার এই বলে বিড় বিড় কোত্তে লাগলো, যেন কে সে মনে হচ্ছিল না, তাই স্বরণ কোচ্ছে।

আমি বল্লেম, “সেই যে কুঁজো ত্রপণ্ড কল্লা বুড়ী, তারে কখন তাঁর বাইরে, কখন তাঁর ভিতরেও দেখতে পাই।”

লুচার বলে “ও হো! ধর্ম্ম্যবতার! সেই ত্রিবন্ধ শাকচূড়ির কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন? কেন, সে আপনার এই খানাজাত গোলাম, লুচার পরামাণিকের মা।”

আমি শিউরে উঠে বল্লেম, “সে তোমার মা? কই, সে কথা ত কখন বলোনি।”

লুচার বলে, “আজ্ঞা না, সে কথা বলিনি সত্য, আমি যে বুক ফুলিয়ে, জাঁক করে তার নাম করবো, সে তার যোগ্য নয়, সেই জন্তে চুপ করে ছিলাম। আপনার উপরেই ভার দিয়েছিলাম—সে যে আমার মা, তা আপনিই স্থির করে লবেন, এইটিই ভেবেছিলাম।”

আমি বল্লেম, “তবে নিঃসন্দেহ তারি অমরোথে তুমি সেনাপতির বাড়ীর পরামাণিক হয়েছো!” “স্বধু তাঁর বাড়ীর কেন, স্বয়ং সেনাপতিরও বটে।” আমার কথার উপর লুচার ঐ কটি কথা বসিয়ে দিলে।

আমি বল্লেম, “হাঁ হাঁ, বটেই ত, আমার এমন ইচ্ছা না যে, তুমি মান-ছাটা হয়ে, নেড়া-মুড় হয়ে থাকো। আচ্ছা, বল দেখি, সেনাপতির কত্তার বয়স কত।”

লুচার বলে, “সোবানাল্লা! আমি তা কি জানি, তাঁর বাপ আছে, তাঁরে জিজ্ঞাসা করুন। তা না হোক, আপনার সঙ্গে যে যাওয়াই ভার হল, ঘোড়াটা পোড়ে গিয়ে অবধি ভাল চোলতে পাচ্ছে না। আজ প্রাতে নজফালীকে কেউরি করা হয় নি, তিনি ঠিকানায় পৌঁছে আমায় যদি ডেকে পাঠান, ডাকবেন যে, তার সন্দেহ

নেই, তবে ত আমি ঠায় মায়া গেলেম, তা হলে আমার চাকুরিটি বাবে ।” আমি বল্লেম, “অধিক নয়, আর একটু আমার সঙ্গে সঙ্গে চোলে এসো, সন্মুখে ঐ গ্রাম অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে, ঐ গ্রামে পৌঁছে একটা নতুন টাটু খরিদ কোরে দেব, এটা ঐখানে রেখে সেইটে চড়ে যেও । এ টাটুর যা সাধ্য, তা কোরেছে, আর সে পেরে ওঠে না ।”

“ধর্ম্মাবতার! আমার উপর আপনার নেহাত অল্পগ্রহ । এ টাটুটি ছেড়ে দিতে বল্লেম, তা আমি দেবই দেব, আমার তাতে একটুও হুঃখ হবে না । এটা খোঁড়া, চোলতে পারে না, আধপেটা খেয়ে খেয়ে নড়ার মত হয়ে গেছে, আপনাকে দিবা কোরে বোলতে পারি, আধমড়া খোঁড়ার উপর আমার মায়া-দয়া নেই ।”

আমি বোল্লেম, “খোঁড়া হওয়া তার দোষ বটে, কিন্তু আধপেটা খোরাকের দোষ আর খোঁড়ায় নয়, সেটি তোমারই দোষ ।”

পরমাণিক বোল্লে, “আমি যে আমার নড়া টাটুর মত পাতলা ছিপছিপে, সে কার দোষ হজুর? সে কি আমার দোষ? তবে আমাকে রোগার মত দেখায় কেন?”

ও কথার আর কি উত্তর কোরব? শুনে চুপ কোরে রইলেম । পরমাণিক মনে মনে খুসী হল, ভাবলে, এইবার আমি জন্ম হয়েছি, কথার উত্তর দিতে পার্লেম না । আমার কথা-বার্তায় গ্রামে পৌঁছিলেম, পরমাণিকের জন্তে একটা টাটু ক্রয় করা গেল, সাবেকটিকে ঐ গ্রামে বিদায় কোরে দেওয়া হল; সে গরিব বেচে গেল । এক্ষণে যে লোকটিকে হস্তগত কোল্লেম, তার দ্বারা সেনাপতির ঘরের সকল খবরই শুনতে পার । নর-মহলের ঘরে নিয়ে যাবার জন্তে পরমাণিকের মা যে আমার কাছে এসেছিল, এখন সে কথা লুচারকে নির্ভয় হয়ে বল্লেম ।

লুচার শুনে বোল্লে, “আপনি তবে যান্নি কেন? উপস্থিত কি ত্যাগ কোন্তে আছে?”

আমি বোল্লেম, “যে সময় বাবার কথা ছিল, সে সময় আমি ডেরায় ছিল না ।” লুচার বল্লে,

“ছি ছি হজুর! এই রকম কোরে ত যুবতীদের মন রক্ষা কোরবেন । তবেই হয়েছে । আপনার কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা আছে, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয়, কেমন হজুর! ঠিক ত?”

আমি বোল্লেম, “হাঁ, তা আছে বৈ কি ।” লুচার বল্লে, “তবে কি তাঁরে বিবাহ করবার মানস কোরেছেন?”

ঐ কথা শুনে আমি যেন গাছে থেকে পোড়লেম, তারে বল্লেম, “না, তা নাই ।”

“তবে তারে মজাবেন, তার পরকাল খাবেন, আপনার সেই মতলব ।” লুচার ঐ কথা বল্লে ।

আমি বল্লেম, “তাও না ।” লুচার বল্লে, “তবে সেখানে যেতে চাচ্ছেন কেন?”

আমি বল্লেম, “তোর সে সকল কথায় দরকার কি?”

লুচার ও কথায় কান না দিয়া হঠাৎ বলে উঠল, “আমি গেছি ধর্ম্মাবতার! আমার দফা শেষ হয়েছে! ঐ দেখুন, আপনার নতুন টাটুও হুন্ডি খেয়ে পড়ে গেল! আপনি যখন খরিদ করেন, তখন আমি সকল না হোক, প্রায় আধা আধি ঠাও রেছিলেম যে, সাবেকটার মত এটাও নেংড়া, আপনি কি সেটা লক্ষ্য করেন নি? আঃ! আমার এ দশা, খোঁড়া আর স্ত্রীলোক—এরা ভারি বালাই ।” আমি বল্লেম, “তা বটে, কিন্তু যাদের সঙ্গে তোমার জানা-শুনো আছে, তাদেরই পক্ষে সে কথা, তারা নিঃসন্দেহ ভুলে কোথায় পা ফেলতে কোথায় ফেলেছে, কি তারা পা ঠিক রাখতে পারে নি, তাই হাড়কে নরদামায় গিয়ে পোড়োছে ।”

লুচার বল্লে, “হজুর! তা যদি বলেন, তবে বড় ঘরের স্ত্রীলোকদেরই পা ঠিক থাকে না, কথায় বলে—“বড় ঘরের বড় কথা”—আমি বল্লেম, “সকল নয়, কোন কোন ঘরে সেইরূপ বটে, সে স্থলে আমরা কিন্তু তাদের পশ্চাতে ফেলে চলে যাই, তা ভিন্ন আর কি কোত্তে পারি? তুমি যেন তোমার বড়ো টাটুটি ফেলে বাচ্চ, সেইরূপ কোরে আমরাও তাদের ফেলে বাই । আর —”



“আর তার চেয়ে আরও একটা বেগড়া সওয়া খরিদ করেন।” আমার কথা শেষ না হইতেই ধূর্ত লুচার এই উত্তর করিল।

আমি বল্লেম, “আমি দেখছি, স্বীলোকের সঙ্কে তোমার বড় ভাল রায় নয়। নূরমহলের সঙ্গে কারও বিবাহের কথা স্থির হয়েছে কি না, বলতে পার?”

“না, আমি তা জানি নে, তবে আমার এট অসম্মান হয়, যদি কারও সঙ্গে লগপত্র হয়ে থাকে, যুবতী তা অনায়াসেই উলটে দেবেন, একবার ভাববেনও না। আপনি স্বচ্ছন্দে গিয়ে বলুন—আমি তোমারে বিবাহ কবুব,—তিনি তাতে রাজি হবেন, পূর্বে যদি কোথাও কথা স্থির হয়ে থাকে ত হয়েছে, তিনি তখন গিয়ে দেবেন। আপনি সে ভয় কোরে পছোবেন না।”

“কে! আমি! আমার সে মনন নেই।” আমি এই উত্তর কোল্লেম।

“আপনি ত মুখে ঐ কথা বলেন হজুর, কিন্তু মনের কথা কে জানে? আমি কারও অন্তরের কথা শুনতে চাইনে, আমার সে স্বভাব নয়। রান চলুন, ভাড়াভাড়া ছাউনিতে পৌঁছন যাক, সেনাপতির সঙ্গে দেখা কোতে ভয় গোছে, তবে যদি কোন গাতকে সেই বিবিট আবার হাত লেগে থাকে, তা হলে অনেক বাচোওয়া হটে।”

আমি মনে মনে বল্লেম, “জগদীশ্বর তা না করুন।” তার পরেই ষোড়া ছুটিয়ে দিলেম, সে চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে দৌড়ল। পরামর্শিক নূতন টাট্টাটির উপর সোয়ার হয়ে পেছনে পেছনে ছুটল, টাট্টাটি অক্কেশেই আমার ষোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। কোন বিষয়-কার্যের কথা লয়ে রাজকুমারের সঙ্গে নজফালী তারি বচসা হয়ে মন ভাড়াভাড়া হয়েছে, ছাউনিতে পৌঁছেই সবপ্রথম এই খোস খবর শুনলেম। নজফালী অতিশয় বদমেজাজি, তাই সাহস কোরে কেউ তাঁর নকটে যেতে পাচ্ছে না। যেরূপ মনাস্তর হয়েছে, সকলেই বল্ছে, আর তাঁদের কখন মনের মিল হবে না, তা ভেদেছে, জন্মের মত ভেদেছে, আর তা

যোড়া লাগবে না—শুনে বড় খুসী হলেম, মনে মনে মানছি, পরমেশ্বর যেন তাই করেন, আর যেন তাদের তাবপ্রণয় না হয়। তার কারণ এই, আমার মনে ভারি সন্দেহ জন্মেছিল, যাতে রাজপুত্রের স্বার্থের অনিষ্ট হয়, নজফালী তলে তলে সেই ফিকির, সেই কৌশল কোচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ এই, তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, আমার উত্তর উত্তর ভাল হয়, আমার উন্নতির প্রতি তিনি একান্ত প্রতিবাদী ছিলেন, সেটি আমি প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছিলেম। তদ্বিধি তিনি যদি কোন স্বত্রে সন্ধান পান যে, আমিই মূলভূত হয়ে দেলজানকে সরিয়ে তফাত কোরে দিয়েছি, তবে আর আমাকে অল্লে ছাড়বেন না, তাঁর কোপে পোড়লে আমার কি না ক্ষতি হবে। লোকের মুখে যে, সে বিষয়ের কাণাশ্রু শুনতে পাবেন না, তা ত আমার বিশ্বাস হয় না। সেই রজ্জার সঙ্গে যে কথা ছিল তা রক্ষা কোতে পারিনি, সে আজ সন্ধ্যা না হতেই, ঘরে বাতি না জ্বালতেই জোর কোরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বসল। কেন যাইনি, কোথায় গেছিলেম, কি কাকে ছিলেম, সে এই সকল কথা পেড়ে গোলমাল কোরে লাগল, আমি আবার তারে যত পাল্লেম, নানা প্রকার কোরে বোঝাতে লাগল্লেম, এতে যে দেলজানের সঙ্কে লোকে আমাকে সন্দেহ কোরবে না, সে কথার প্রতি বিশ্বাস কি?

রক্তা বোল্লে, “হজুর! আপনি যে বেঁচে আছেন, তাই দেখে আমি খুসী হলেম, সেই যে তালগাছের মতন দিক্‌সড়িঙ্গে আকৃতিতে কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল গেল, আমি মনে কোরেছিলেম, সেই বুঝি জলে ডুডুডু খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলে।” আমি বল্লেম, “সত্য না কি, কেন, তুমি তা মনে কোলে কেন?”

“কেন ধর্ম্মবতার! কাল কি একটা ভারি বিপদ ঘটতে পাজো না? এমন কি কোন কারণ ছিল না?” আমি বল্লেম, “না, বিপদ ঘটবে কেন? আমার বিপদ হবে, তুমি তা কিসে বোধ কোলে? স্থানান্তরে বিষয়-কর্ম্মের বরাত ছিল, তাই আমার কথার ব্যতিক্রম



হয়েছে, তাতে বিপদের কথা কেন ?” আমি ঢোক গিলতে গিলতে এই উত্তর কোলেম।

“হজুর! একি শাক দিয়ে যাছ ঢাকা? আপনার বেশ রাত বেড়ান রোগ আছে, এই রকম কোরে না জানি, কত যুবতীকে জলিয়ে পুড়িয়ে মেরেছেন, ছি। ঘেলায় মরি আর কি।” বুড়ী এই ঠাট্টা কোলে।

আমি বলেম, “তা নয় বাছা, বারফটকা রোগ আমার নেই।”

বুড়ী বলে, “আপনার ধ্যান দেখে আর বাচিনে, মাছ খায় না যতনী, পাতে তিনটে খোলসে, কি করে যতনী, না কোণে তিনটে মিন্বে, বড় সতী আপনি। “বড় মুখখান কোরে এসেছিলেম, আপনি তারমত বেশ মান রেখেছেন বা হোক। যোলকলায় পূর্ণ একটি যুবতী আপনাকে ডেকেছিলেন, আপনি তারে আশ্বাস দিয়ে নৈরাশ কোলেন, সে যুবতী হয়ে তার এত অপমান। তাও কি পোড়া প্রাণে সময়? আমি বড় নির্মিয়ে, তাই আবার আপনার সঙ্গে কথা কোচ্ছি।” আমি বোলেম, “তুমি না জেনে না শুনে সুধু সুধু আমার মণি-চোরা বদনাম দিচ্ছো, আমার যেন নষ্টচন্দ্রের কলঙ্ক হল।”

বুড়ী বলে, “বেশ হয়েছে, যেমন গায় পড়ে সাধতে এসেছিলেম, তার মত আকেশ সেলামি পেয়েছি। ঘাটে গেছিল যায়ের মা, দেখে এলো বাঘের পা, সে বলে, আমি শুন্লেম, মরি-বস্তি বাঘ দেখলেম। লাভের মধ্যে আমাদের কেবল কাটনা কামাই।”

আমি বোলেম, “আমারে বাছা সাধে সাধে তিরস্কার কোছো কেন? আমার মনে কোন পাপ নেই, সত্যি বলছি, কোন কাজের বরাত ছিল, তাই সেখানে গেছিলেম, তুমি—”

বুড়ী অমনি বলে, “তা বুকেছি আসতে যেতে হল বেলা, তোমার কর্ণে আমার হেলা! আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড সব জানতে পেরিছি, আপনি দিনে ডাকাতি কোণ্ডে পারেন, এখন কাণের জল কান দিয়ে বেরুলে বাঁচি। বারফটকা রোগে খোলে তার কি কাজ কথার ঠিক থাকে? সে থাক, আপনার যে দুর্জয় বরাত ছিল, বোধ হয়

একপে তা মিটে গেছে। এখন ত আর কোন গুজর-আপত্তি নেই, তবে আমার সঙ্গে চলুন, আজ আপনাকে যেতেই হবে। আমি বাড়ি নেড়ে সায় দিলেম, “আচ্ছা, চল যাই, মিট্ট খেতে কার অরুচি?”

বুড়ী বলে, “আপনি কি মনে কোরেছেন যুবতী আপনার হুকুম-মত চোলবেন? তাই আপনি যখন সুবিধা হবে যাবেন, না হয়, না যাবেন? মনে বড় সাধ, চোড়বো বাঘের কাঁধ—হজুর! সেটি হবে না, মেগের কাছে পেকের বড়াই খাটবে না—আপনাকেই উমেদারি কোন্তে হবে, আপনিই তাঁরে সাধবেন, খোষামদ কববেন, তবে যদি কোন গতিকে যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ত হলো, না হয়, হলো না। আপনাকে একটি চূড়ান্ত কথা বলি, হজুর! আপনি সচিব-কন্ডার সঙ্গে বেগড়াবেগড়ি কোরবেন না, অগ্রণয় না কোরে, তাঁর সঙ্গে ভাব-প্রণয় রাখলে আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ কোরবেন।”

আমি বোলেম, “আমি যে তাঁর সঙ্গে ভাব-প্রণয় কোরব, সে অবকাশ আমাকে তিনি দেন কই? মন চায় ধন, দেয় কোন জন?”

বুড়ী বলিল, “কেন, অবকাশ ত একবার আপনাকে দেছেন, আপনিই না তার অনাদর কোলেন। তার চেয়ে না কি একটা ভারি গুরুতর বরাতের অনুরোধ ছিল, তাই আর এ গরিবের দিকে হেলেন না, হেলাশ্রদ্ধা কোরে অগ্রাহ্য কোলেন; আপনার শরীরে মায়াও নেই, দয়াও নেই, আপনি কোন্ প্রাণে অমন সুন্দরী যুবতীকে কঁাদালেন বলুন দেখি?”

আমি বোলেম, “বাছা। তোমার হাসি-কান্না বোঝা যায় না, চল কোরে, কি তামাসা কোরে বলছো, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।”

বুড়ী বলিল, “আঃ আমার দশা, এখন তামাসা বলবেন বৈ কি, আপনার দিন ত কিনে বসে-ছেন, মতলব ত হাসিল হয়েছে, তা হলেই হলো, কথায় বলে, আড় নয়ান বাঁকা ক্র, সে জন নাটের গুরু। আপনি এতও নাট ভিরুক্টি শিখেছেন! হজুর সেলাম।”—এই বলে বুড়ী চলে গেল, আমি এখন কাঁপরে পড়লেম,

ভেবেই অস্থির, যে জন্তু সে দিন আমি কথা রক্ষা কোত্তে পারি নি, তার মর্থ কি রক্ষা যথার্থই টের পেয়েছে? না পায় নি, কেবল আন্দাজে আন্দাজে উঠন-চালাকি কোরে গেল? এখন আমার স্পষ্ট অভিসন্ধি এই, নূরমহলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়, তাঁর প্রতি যে বাহ্যিক ঐদাশ প্রকাশ করা হয়েছে, একবার দেখা কোরে, তাঁর হাতে পায়ে ধোরে প্রাণপণে চেষ্টা পেয়ে দেখি, যদি অপরাধের মার্জনা হয়।

### দশম পবিচ্ছেদ ।

অনাথার দৈব সখা। অসৎকর্মের বিপরীত ফল। রাত কিঞ্চিৎ অধিক হয়েছে, আমি দুমিয়ে ছিলেম, চোঁচাচোঁচিতে জেগে উঠলেম। গেলেম রে, মলম রে, মালি রে, সালি রে, নক্ষত্রালীর তাঁবুর মধ্যে এই ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি হোচ্চে শুনতে পেলেম। যনে কোয়েম, এত রাত্রে তাঁর তাঁবুতে যখন কান্নাঘাটির তুফান উঠেছে, তখন ঐ নক্ষত্রালী ধর্ম্মাব্যবস্থায় দেখেন—হয় ত দূরপরিবারকে খানখান কোরে কেটে তামাসা দেখছেন। বারবার চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে তামাম ছাউনি অস্থির কোরে তুলছে, তখন কেউ একবার বেরিয়ে উকি মেয়ে দেখলে না যে, কি হোচ্চে, কেন কাঁদছে, একটু উঠে গিয়ে যে আরজকেবের সেনাপতিকে নিষেধ করে, এমন একটি প্রাণীও দেখলেন না, কেউ নড়লোও না। আমি শুয়ে কান খাড়া কোরে আছি, এমন সময়ে একটি লোক বার থেকে ডেকে বলে, “হজুর! দরজা খুলে দিন, আমি তাঁবুর মধ্যে যাব।” এ ব্যক্তি আর কেউ নয়—পরামণিক লুচার।

পর। দোহাই আল্লাহ—আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না? ওদিকে যে কান পাতা যায় না, তারি রগড় উঠেছে, চীৎকারের তারি ধুম বেধে গেছে যে।

আমি বোলেম, “হাঁ, পাচ্ছি বৈ কি। কেন এত কাঁদাকাটা হোচ্চে? কে কাঁদছে?”

পর। আর কে কাঁদবে, আমার মা, সেই হতভাগিনী কাঁদছে। তার বুড় আঙ্গুল মোড়া দিয়ে যুচড়িয়ে ভাদছে, তাই সে তত চীৎকার কোচ্ছে।

আমি বোলেম, “লুচার! তোর মাকেই কি তত পীড়ন কোচ্ছে? কেন, কি কোরেছে সে?”

পর। ওঃ! তা কি আপনি জানেন না? সেই যে, সকলের শেষে যে গ্রাম ফেলে এসেছি, ঐ গ্রামে যে রাত্রে সেই বিবিটি, লুকিয়ে প্রস্থান করেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুহুরের ধারে সে কার সঙ্গে কথা কোচ্ছিল, সেই কথা তাকে বলতে বলে।

ঐ কথা শুনে আমার ভারি দুর্ভাবনা হলো, ভাবলেন, তবে হয় ত আমাকেই লয়ে টানা-টানি পোড়বে। বুড়ী যত চীৎকার কোত্তে লাগল, আমার প্রাণ চমকে চমকে উঠতে লাগল, বুঝা যে আমার নাম কোর্বে, সে বিষয়ে আমার তিলাঙ্কও সন্দেহ ছিল না। আমি বোলেম, “ভাল, লুচার! তোর মা যে সে রাত্রে ঘাটে বসে কারও সঙ্গে কথা কয়েছিল, এ কথা তারা কেমন করে জানতে পারে।”

পর। সে অনেক কথা। কলমবেগ একটি আভাঙ্গা কেউটে সাপ, তারি ধূর্ত, তারি বজ্রাৎ সে তাকেই আগে সন্দেহ কোরে সেনাপতি রাগপ্রকাশ করেন, কলমবেগ বোলে, “আমি এ বিষয়ের কিছুই জানিনে, তবে আচ্ছা, যে ব্যক্তি সেই বিবিকে ভাগিয়ে দেছে, আর যে প্রকারে সে পালিয়েছে, আমি তা সন্ধান কোরে বার কোরে দেব, যদি না পারি, তখন যা ভাল হয় কোর্বেন।” এই কথা বলে সে আপনার ধূর্তমি বুদ্ধি খাটাতে লাগল। অনেককণ বোসে বোসে কি ভাবলে, শেষে তার মনে পড়ল, সেই দিন সন্ধ্যার সময় পুহুরের ধারে আমার মা কার সঙ্গে চুপে চুপে ফিসফাস কোরে কথা কোচ্ছিল, কিন্তু কে সে ব্যক্তি; সে তা বলতে পারে না, বলে, আমার মাকে মোড়া দিয়ে, মারপিট কোরে সে কথা বার কোরে নেবে। ধর্ম্মাবতার! আমার মা বার নাম কোর্বে, জগদীশ্বর যেন তাকে রক্ষা করেন, নচেৎ তার

নিষ্ঠার নেই—হজুর! ঐ! ঐ শুভ্রন, মা চীৎকার কোচ্ছে, আর সে কতক্ষণ না বলে থাকতে পারে?

আমি বোলেম, “কেন, তার বামিনী কোথায়? তিনি এসে নিবেদন করেন না কেন? তাঁর উচিত, বুক দিয়ে পড়ে গরিব বৃদ্ধাকে রক্ষা করেন। আমার ত আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে, কি কোরে সে এতক্ষণ তত যত্নগা সঙ্গে আছে।” ঐ কপাল বলে, “কাঁদো কাঁদো হয়ে, মুখ কাঁচো-মচো বসে, ভাবতে লাগলেম, হয় ত বুড়ী পেটের ছুরী হোয়ে সব কথা বোলে দেবে।

পর। হজুর! আমার মাকে চেনেন না, সে মাগী তারি বাগী, সে পাহাড়ে হারাম-জাদা, তার কাছ থেকে যে কথা বার কোরে লয়, সে আমার হরির খড়। হজুর! তার প্রাণে একটু ভয় নেই, কার সাধ্য তার পেটের কথা বার কোরে? বেদিনীয়ে বোলে থাকে, ‘আমি এমন দয় লাগাই, ভেল্কিতে ভেড়া বানাই, দিনে তারা দেখাই।’ আমার মাও একজন সেই দরের লোক, তাতে তার বেশ হাত-বশ আছে। সে মনে মনে পাকচক্র কোরে এমনি একটা ফেরেব সাজাচ্ছে যে, তার তুলনা নেই, সে অমূল্য! মার খেতে খেতে শেষে সেই কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোড়বে। হজুর! এ যদি না হয় তো কি বলেছি! কি ফেরেব কোরবে, তার তাকবাক পাচ্ছে না, তাতেই দেরি হোচ্ছে। হজুর! এ যদি না হয়, আমার মুখ দেখবেন না। আমি আমার মার কারসাজী দেখে দেখে হৃদ হোয়েছি, কি বোলবে, ঠাউরে উঠতে পাচ্ছে না, তাই এতক্ষণ পোড়ে মার খাচ্ছে, আর হতগজ কোচ্ছে।

আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সেইটিই ঘটে, বৃদ্ধা যেন মিথ্যা কথাই বলে। তার পরেই কান পেতে শুনি, আর সে চোঁচাচোঁচি নেই, বৃদ্ধা আর চীৎকার কোচ্ছে না। তারে বুঝি কবুল কোরিয়ে লয়েছে, তবে আমিই বুঝি নজফালীর জ্বোধের ভাজন হোলেম, আমার এখন সেই ভয় হলো। আমি পরামাণিককে বোলেম, “পরামাণিক! তুমি একবার সেখানে যাও, শুনে

এসো দেখি, সে কার নাম কোলে? পরামাণিক রাজধূর্ত, সে কি আর সে রাত্রে আমার তাঁবুর মধ্যে মাথা গলায়—সে, যে গেল, সে রাত্রে আর ফিলো না। আমি পোড়ে পোড়ে কত কি ভাবতে লাগলেম, কত কি মনে উদয় হোতে লাগল, কখন ভয় হোচে ভাবছি হয় ত মাগী আমারই নাম কোরেছে, আবার কখন সাহসও হোচ্ছে। যদি কোরেই থাকে, তাতেই বা আমার ভয় কি? এইরূপ কখন ভয়, কখন সাহস হোতে হোতে বাকী রাতিটুকু কেটে গেল। তার পরদিনও উদয়-অস্ত পর্যন্ত ঐ গ্রামে আমাদের থাকতে হোয়েছিল, তাতেই নজফালী তাঁর নিজের বিষয়কার্য্য দেখবার নিমিত্তে অজচ্ছল অবকাশ পেয়েছিলেন। প্রভাতও হলো, তার সঙ্গে পরামাণিকও দেখা দিলে। ক্ষেউরী কোরবার সময় লুচারের হাত মুখ সমান চলতো। আমি বোলেম, “লুচার! খবর কি বল, তোর মা কি কারও নাম কোবেছে?”

পরামাণিক একটু ভেবে, থেমে বোলে, “হাঁ, কোবেছে বৈ কি, কিন্তু যারই নাম করুক, আসল ব্যক্তি যিনি, যিনি এ কানের গুরু, তার নাম সে কখনই কোরে নি, তা আমার নিশ্চয় জানা আছে।”

আমি বোলেম, “তবে সে কার নাম কোলে?”

পর। কেন, সে বার নাম কোরেছে, শুনে সকলে অবাক হোয়ে গেল। বুড়ী বোলে, ‘কলম-বেগের সহকারী রস্তমের সঙ্গে কথা কোছি-লেম। আমার মা একটি মস্ত ডাকুশাইটে বহুলে, সে সচ্ছন্দে কোরান ছুঁয়ে শপথ কোরে বোলে, ‘রস্তম আমাকে বোলে, আমি এই রাত্রেই বিবিকে সরিয়ে তফাৎ কোরে দেব, তুই এতে মদত দিস, এত টাকা পাবি।’ এ কথা অপর কেউ হোলে গ্রাহ্য কতো না সত্য, কিন্তু নজফালীর মনে বেশ লেগে গেল। সচিব বড় সন্দিগ্ধ-চিত্ত, আপনার কারপরদাজকে বিশ্বাস কোন্তেন না—তাঁর সে অশাব ছিল না। মা যে যে কথা-গুলি বোলে, নজফালী সে সমুদয় মেনে নিলে। সেনাপতি আগে মনে কোরেছিলেন—কলম-বেগের গাফিলেতেই মেয়ে মানুষটি হাত-ছাড়ি

হোয়ে গেছে, কিন্তু মার মুখে শেষে ঐ কথা শুনে তার বেশ বিশ্বাস হলো যে, শুধু গাফিলি নয়, এর মধ্যে তার কারসাজিও আছে, তাতে ক'জেই কলমবেগের অপরাধ সপ্রমাণ হলো। হুজুর! ঐ যে একটু তফাতে পুরান কেল্লা দেখা যাচ্ছে, কলমবেগ আর রক্তম—ঐ দুটি তালেবর বজ্জাৎকে ঐ কেল্লায় রওনা কোরে দেওয়া হোয়েছে তাদের দফা কিরূপে নিকেশ কোন্তে হবে, সে হুকুম কেল্লাদার গোপনে গোপনে তখনই পেয়েছে, পেয়েছে যে, তার সম্মুখে নেই, হুজুর! সে ধরা কথা। বেটারা যেমন আমার মাকে কাঁসাতে গেছিল, এখন তেমনই জব্দ হোয়েছে, এখন বেটারা আপন চরকার তেল দিক্। উল্টে চোরা গৃহস্থ বাধে, ঐ টিক তাই হোয়েছে।

আমি বোল্লেম, “পরামাণিক! তোর মা চিরকালই কেরেব আর দাগাবাজির কথা বোলে বেড়ায়, এইবার হয় ত সে সত্য কথাই বোলেছে।”

পরামাণিক। আজ্ঞা, আমি যদি ভিতরের খবর না জান্তেম, তবে একদিন সেকথা বোল্লেও বোল্তে পাতেন। মা এবার যেমন বুদ্ধি পরচ কোরে মিথ্যা ফন্দী বার কোরেছে, এমন তার বয়সে কখন হয় নি—এবার সে টেকা দিয়েছে, এমন ফেরেব সাজাতে কেউ পারে না। এক বড়িতে সাত সাপ মারা—এ ছবছ তাই হোয়েছে।

আমি বোল্লেম, “আচ্ছা, যদি রক্তমের অজ্ঞাতে এ ঘটনা হয়ে থাকে, সে যদি তার কিছুই না জানে, তবে কার সহায় পেয়ে বিবি পালিয়ে গেল? কে তাঁরে ভাগিয়ে দিলে?”

পরামাণিক। কেন, হুজুরই ত তার মূল্য-ধার, আপনিই ত তাঁরে সোরিয়ে দেছেন। হুজুর! আর নাটভিরকুটি কেন? আমি সব জানি।”

আমি ত শুনে অজ্ঞান, তাঁরে বোল্লেম, “কি? আমি! তোর এত বড় কথা! তুই কি সাহসে ও কথা বল্লি? আমি যে তাঁরে তফাৎ কোরে দিইছি, তার প্রমাণ কি?”

আমার কথা না ফুরাতে না ফুরাতে

পরামাণিক বোল্লে, “হুজুর! ক্ষান্ত হোন, কাছ ছাড়া কীর্তন নেই, আপনিই ত নাটের গুরু”— এই কথা বোলে লুচার আঙ্গুল দিয়ে নাটার মত কটাচক্ষু দুটি, আর কুলোর মতন চেহারার কান দুটি দেখিয়ে দিলে। আমি বোল্লেম, “অবশ্য, তুই যদি কানে শুনে থাকিস, আর চোকে দেখে থাকিস, তবে তোর কথা মানি, তা হলে আর প্রমাণ চাই না, কিন্তু কেমন কোরে দেখলি, আর কোথায় শুন্লি, তা তোকে বল্তে হবে।”

পরামাণিক। হুজুর! কেন আব্রু ঠকেন, আমি সকলই জানি, চক্ষু দেখিছি, কানে শুনেছি, কিন্তু দেখন হুজুর! লুচার কেমন বিশ্বাসী, মার কাছে এ কথা বার বার বলি নি, এ কথা লোয়ে একবার বিশ্বাসও কোলি নি। তার সঙ্গে একবার দখলও করি নি যে, ছদ্ম বোসে কথাবাতা কই।

আমি বোল্লেম, “তা ত বোল্লেম, কিন্তু কি কোরে দেখলি, আর কি কোরেই বা শুন্লি, সে কথা আমার আগে বল্তে হবে। তখন তুই কোথা লুকিয়ে ছিলি?”

পরামাণিক। লুকিয়ে আর কোথা থাকব, আপনার বিছানাতাই ছিলাম। আমি পেটেলের বাড়ীতে শুয়ে আছি, আপনি রাজপুত্রের দোহাই দিয়ে দোর খুলে দে, দোর খুলে দে বোলে ডাকাডাকি কোচ্ছিলেন, সেই চোঁচোঁচিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।”

আমি বোল্লেম, “আজ্ঞার দিবা, যদি ভাঁড়াস, তুই সে রাতে পেটেলের বাড়ীতে কেন গেছিলি?”

পরামাণিক। ধর্ম্মবতার! আমি ভিজ্জে কাপড়ে, আর ভিজ্জে বিছানায় শুতে ভারি নারাজ, আমি তাতে বড় বিরক্ত, যদি ভাল বাড়ী, আর ভাল বিছানা পাই, তা হোলে বেশ আরামে নিদ্রা বাই, কোন কষ্ট হয় না। এ পাড়া ও পাড়া কোরে গ্রামময় দাঁড়ড়ে বেড়া-লেম, কোনখানেই মনের মতন স্থান মিলে না যে, রাতটুকু শুয়ে থাকি, শেষে বালু পেটেলের সঙ্গে পথে দেখা হলো, তার সঙ্গে আমার পুরন আলাপ, তাই তার ঘরে শুয়েছিলাম।”

আমি বোল্লেম, “লুচার! খবরদার! পেটেলের

কথা যেন পেটেই থাকে, মুখের বার করো না। আমি তোমারে বেশ খুসী কোব্ব।”

পরামাণিক। যে আজ্ঞা হজুর! আপনার কথা কি আমি অমাত্য কোত্তে পারি। কিন্তু হজুর! একটা কথা বোলতে চাই, অনুমতি করেন ত বলি, আমার মাকে যেন বিস্মৃত না হন, দেখুন, কত নির্ধাৎ পীড়ন তার শরীরের উপর দিয়ে গেছে, তবু সে আপনার নাম করে নি, স্বধু সে কেমন চালাকি খেলেছ দেখুন, ‘আঁপিনীকেও বাঁচালে, যারা রক্ষক ছিল, উল্টে আবার তাঁদেরই শান্তি দিয়ে দিলে।” সে কথা মিথ্যা নয়, এই ভেবে আমি তার হাতে দশ ধান মোহর দিলেম, বোলেম, “তোর মাকে দিস, আর বলিস, তার সঙ্গে যেন একবার অবশ্য অন্ত দেখা হয়।”

পরামাণিক। হজুর! উত্তলা হবেন না, এ সকল কাজ তাড়াতাড়ির নয়—যার সঙ্গে দেখা এখন কোন যত্নেই হতে পারবে না। দিন কয়েক চুপচাপ কোরে থাকুন। সে আগে ধাক্কা সামলাক, শেষে যক্ষয় নে যাবে। কাল যখন ফেউরী কোত্তে যাব, সেই সময় এই মোহরগুলি তাকে দেব। এই কথা বলে ধূর্ত পরামাণিক শির বুকিয়ে সেলাম কোরে অস্ত্র ধ্যান হল।

দুই দিবস অমনি টায় টায় কেটে গেল, তার মধ্যে আর কোন নূতন ঘটনা হয় নি। একে বর্ষাকাল, তাতে আবার অনেক পথ চলতে হচ্ছে, লোক তেজ বিরক্ত হতে লাগল। পথ চলে চলে আর পেরে উঠে না, ক্লান্ত হয়ে পোড়েছে, “এসে এমন ঝঁকুমারিও কোরেছি, এর চেয়ে না আসাই ভাল ছিল, হাঁটতে হাঁটতে নাড়ী ব্যথা হল, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল।” ছাউনি শুদ্ধ সকলে এইরূপ গজর গজর কোত্তে লাগল। বিশেষতঃ পরামাণিকের মা সকলের চেয়ে জেয়াদা অস্থখী হল। একটা ফেরেব ফনী ভিন্ন তার পেটের ভাত হজম হয় না। হয় ঠকামি, নয় চুকলি, নয় এখানকার কথা সেখানে, সেখানকার কথা এখানে, এইরূপ একটা না একটা ফেরেকা লয়ে সে থাকতেই চায়, তার দিন কঁাক যায় না, এ দুদিন কিন্তু সে সকল কিছুই নেই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন বসে

আছে, একরূপ নিশ্চল, বিশেষতঃ এত দিন সে কোন কালেই ছিল না, সেই জুখে লুচারের মত মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে। যে দিন বুড় আঙ্গুর মোড়া হয়ে তাকে সাজা দেওয়া হয়, তার তিন দিনের দিন বৃদ্ধা না বলে না কোরে হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত, আমি তখন আমার আড়ডায় বসে আছি, তাতেই বেশ বোধ হল, সে একটা পাকচক্র ভিন্ন থাকতে পারে না। আঙ্গুলটি তখনও বাঁধা আছে, মুখটি শুকিয়ে তুবড়িয়ে গেছে, পূর্বে যেমন দেখে ছিলেম, তার চেয়ে যেন আরো দশ বৎসরের বুড়ী হয়েছে, তার চেহারা দেখে এমনি জ্ঞান হতে লাগল। আমি তারে দেখে বল্লম, “আরে কে ও! এ যে দেখি, মেঘ চাইতে জল! বাছা! খবর কি বল, কেমন আছ এখন?”

“কেমন আছি, এখন সে কথা বলবেই তো! কথায় বলে, আপনার মান আপনি রাখো, কাটাকাণ চুল দিয়ে ঢাকো। আমার তার হয়েছে—এই দেখো আমার হাল,—এ শুধু আপনারই জ্ঞে।” বুড়ী এই উত্তর কোলে।

আমি বল্লম, “না না, আমার জ্ঞে কেন ও তোমার দোকানদারী কথা।”

বৃদ্ধা। কি! আপনার জ্ঞে না?—বেশ ভাল বল্লেন!—অবাক কলি পাপে ভরা! আপনার দোষ কেউ দেখে না—আপনার ষোল কেউ টক বলে না—কালে কালে কতই হবে! আঃ আমার পোড়াকপাল—যার জ্ঞে চুরি করি, সেই বলে চোর—আপনাকে কি পুকুরের ধারে খুঁজতে যাই নি? তাতেই ত সেই বজ্জাৎ বেটা কলমবেগ আমার দেখে চিনে ফেলে। আমি আপনাকে বলছি, আঙ্গুল মোড়ার বেজায় যাতনা, আমি বোলে সয়ে ছিলেম, অল্প কেউ হলে কখনই পাত্তো না। একবার একটু কষে মোড়া দিলে বেদনার জালায় সে ধড়ফড় কোরে আপনার নাম বলে ফেলতো।

আমি বল্লম, “সে কথা মিথ্যা নয়, তুমি কিন্তু আমার বেশ বাঁচিয়ে দেছো, ধন্নি মেয়ে তুমি বাছা! ধন্নি তোমার বকের পাটা! তোমার বেশ তারিফ আছে। বকসিসের

দিসাবে কিছু দিইছি, লুচারের হাতে, তুমি তা পেয়েছো বোধ হয় ?”

রুদ্রা। কই, সে তো আমায় কিছু দেয় নি! আজ তিন দিন তার সঙ্গে আমার দেখা নেই।

আমি বল্লম, “সে কি! দেখা হয় নি? দশ-দান মোহর তুমি পাও নি? সে তোমায় দেয় নি?”

রুদ্রা। আল্লাকরীম! দশদান মোহর! তোরা! যে অবধি ক্ষুর ভাঁড় ধোতে শিখেছে, দশকড়া কড়িও কখন হাত তুলে দেয় নি, তা দশদান মোহর দেবে! আমার ছেলে তাতে বেশ মজবুত, উবুড় হস্ত কাকে বলে, সে তা ধানে না, তার আঙ্গুল দিয়ে জল গলে না। ওহর! আমি তার মা, কিন্তু সে আমারে হাটের হাড়িনী কোরে রেখেছে।

মি বল্লম, “কি করবো বাছা! আমি যার হাতে দিয়ে বল্লম, তোর মাকে দিস, সে বলে, ‘যে আজ্ঞা, দেব’। তবে তুমি তাকামো কোরে কি সত্য কোরে বোল্ছো, তা জানিনে, তোমাদের হাসি-কান্না বোঝা ভার।”

“কি লজ্জা! কি ঘেন্নার কথা! ও মা, আমি কথটা বাব! আমি পেয়ে কি মিথ্যা বল্ছি? ধর্মাবতার! আমার যে ঐ ছেলেটি দেখছেন, উটি ভারি জোয়ারি, মিথ্যা কথায় তার নাড়ী কাটা, তার বাপও ঐরূপ ছিল, মিথ্যা না বলে তার পেটের ভাত হজম হতো না, আবাগে ছেলেও কি ঠিক বাপের মত হবে না! সে পেন উগরিয়ে দে গেছে! আহা হোক! সে ঠক বসুলে হয়ে বেঁচে থাক্, আল্লা তারে বাঁচিয়ে রাখুন।” বুড়ী এই কাঁদুনি গাইলে।

আমি বল্লম, “তোমার ছেলে শুধু বহুলে নয়, তার বাপের মতন একটু একটু হাতটানও আছে।”

রুদ্রা। হজুর! বড় একটু একটু নয়, চোরা পডাবটা তার বেশ আছে, তার বাপের চেয়ে এক গ্রাম উপরে চলে। টাকা কড়ি দিয়ে তারে বড় বিশ্বাস কোরবেন না। কিন্তু যদি কোন গোপনীয় বিষয় থাকে, সে কথা তাকে বলবেন, তাতে তারে অবিশ্বাস নাই, সে তা প্রাণান্তেও

মুখে বার কোরবে না, কেউ যে দম দিয়ে, কি টাকার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে কথা লবেন, সে অনেক দূরের কথা। লুচার আমার তেমন ছেলে নয়, ঝিল্লকের মধ্যে যেমন না মতী থাকে, কেউ জানতে পারে না, সে গোপনীয় কথা সেইরূপ যত কোরে রাখে, কারও জ্ঞানার সাধ্য নেই।

আমি বল্লম, “সে কথা মিথ্যা নয়, আমারও তা বিশ্বাস হয়। কিন্তু মোহরের কথাটা একবার তারে জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে!” সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পার পেতে পান্ধুর্বা না।

রুদ্রা। জিজ্ঞাসা কোত্তে চান করুন, কিন্তু তাতে লাভ কি? সে বোল্বে, “আমি দিইছি।” আমি যে আপনাকে বল্ছি,—ঐ কথা তার মুখে শুন্বেন। ছর হোক গে, ও কথা যেতে দাও। আপনার কাছে আমি বকুসিসের জন্যে অসিনি,—একটা কথা বল্বে তাই একবার বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এলেম, বলি যাই; দেখেও আসি আপনি কেমন আছেন। কাল নজফালী খাঁ পাশাডের উপর একটা কেলা দেখতে যাবেন, সে দিন আর ফিরবেন না, সেইখানেই থাকবেন। কেলাটা বড় নিকট নয়, আমাদের কুচের সররাঙা থেকে দশ কোশ দূরে। এই একটি সুযোগ, আপনার অন্তঃকরণ যদি পাষাণের মতন শক্ত না হয়, তবে এই সুযোগে একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে,—তেমন সুন্দরী কখন চক্ষে দেখো নি,—যতক্ষণ ইচ্ছা হয়, বোসে আমোদ-আহ্লাদ কোরবেন।

আমি বল্লম, “সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা বাজে খেয়ে দেয় প্রস্তুত হয়ে থাক্বে।”

রুদ্রা। আচ্ছা, ঐ কথাই স্থির, তবে এখন আমি যাই।” এই কথা বলে সে খুন্দনী বুড়ী চলে গেল।

হয় ত আমার উপর নূরমহলের অন্তঃকরণ চলেছে, তাই যুবতী ব্যাও হয়ে বেড়াচ্ছেন, কবে একবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে। অথবা কি একটা ভারি প্রয়োজনের কথা আছে, যুবতী সেইটি আমায় বোলবেন। পূর্বে যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথাবার্তা স্থির হয়, সে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই উল্টে গেছে, তাই হয় ত সুন্দরী একটি

মনোমত পাত্রেঃসন্ধানে ফিচ্চেন,—এইরূপ কত খেয়ালই মনে উদয় হতে লাগল। নূরমহল ডেকেছেন, সেখানে কি কৌতুক হয়, দেখবো—ঐ অসার গৌরবাভিমানের উৎসাহে আর আমোদে প্রক্লিষ্ট হয়ে, সচিব কন্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে কোমর বাঁধলেম, কাল সন্ধ্যার পর নিরুপিত সময়ে তাঁর ডেরায় গিয়ে দেখা করবো। পরদিন যথাকালে আমি কেবল খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত হয়ে বসেছি মাত্র, এমন সময়ে খিরাবানিকের মা চুপে চুপে তাঁর ঘর মধ্যে এসে বলে, “ভদ্র! আর বিলম্ব কেন? উঠুন, আমার সঙ্গে যাবেন এই বেলা চলুন।”

আমি তাঁর সঙ্গে চলেম। বুদ্ধা কানবিসের পর্দা তুলে নূরমহলের ঘরের ভিতর আমায় প্রবেশ করিয়ে দিলে। খুবতী সেই পর্দার আড়ালেই ছিলেন। তাঁর চাক চেহারাখানি খোঁটায় ঢাকা ছিল, সাত থাকবারই কথা। আমি নিকটে গিয়ে একটি মদন-কথার আলাপ কোলেম—পূর্বে আমি মনে মনে ঠিক কোরে রেখেছিলাম যে, দেখা কোবেই সবপ্রথম এই কথাগুলি বলব। সুন্দরী তা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হলেন বোধ হল। পাশে একখানি চৌকি ছিল, আমায় ইশারা কোরে সেই চৌকিতে বসতে বলেন। অনেক পথ চলতে হোচ্ছে, লোকজন আর হেঁটে উঠতে পারে না, দেকশেক হয়েছে। গরিব বেচারী বুড়ী বড় লাগুন। পেয়েছে, তাকে বেজায় পীড়ন করা হয়েছে, সে কিন্তু খব চালাকি খেলেছে, কলম্বেগকে আর রক্তমকে ভারি জ্বদ কোরেছে—আমাদের এই সকল আলাপ হতে লাগল—আমি বোলেম,—“সে যদি আমার নাম কস্তো, কস্তো কস্তো, তাতে আমার ভয় কি? সনাপতিক বোলতেম, ‘আমি যে আপনার বিরুদ্ধে চলবো, এ কথা কখনই সম্ভব নয়—আপনার বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি, এত সাহস আমার কখনই হতে পারে না। এই রকম পাঁচ কথা বলে তাঁকে বুঝিয়ে দিতেম যে, সে কাজ আমা হতে হয় নি।

“আপনি ঘুরে ফিরে এখানে কি কোত্তে

গেছিলেন?” নূরমহল এই কথা আমার জিজ্ঞাসা কোলেন।

আমি বোলেম, “সে শুদ্ধ দৈব ঘটনা। সে বিবিট কে? তোমার পিতা সে কথা কিছু বোলেছেন?”

নূর। না, তিনি তেমন গোলা মাসুখ নন। কিন্তু আমার মনে বড় সন্দেহ হয়েছে, পরা-মাণিকের মা বিয়ে বলে, তার ছেলে সকল খবরই জানে, কোথা থেকে কি হল, সে সব বলতে পারে। কিন্তু তার কাছ থেকে কথা বার কোরে লওয়া, আর তার কোমর থেকে ক্ষুর ভাঁড় ছিনিয়ে লওয়া সম্ভব কথা, কারও সাধ্য নাই যে, তা পারে। কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে—যদি প্রকাশ না করবার বিশেষ হেতু থাকে, তবেই সে কথা, নচেৎ সে সকলকেই সকল কথা বোলে থাকে।

অনেক বিনয় কোরে বলাতে, বিস্তর স্তুতি মিনতি করাতে নূরমহল মুখের ঘোমটা খুলে বসলেন, আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ একটু হাসলেন, যেন মধু ছড়িয়ে দিলেন। তার একখানি হাত কোলের কাছে টেনে এনে অধর দিয়ে চাপলেম, সুন্দরী ভাল-মন্দ কিছুই বলেন না। বরং হাতখানি অমনই এলিয়ে দিলেন, তাঁর বিমল আঁখি দুটি প্রকল্পরাগে হাসতে লাগল। চাকহাসিনীর আকার ইন্দীতে স্পষ্ট বুঝতে পায়েম, আমি যদি তাঁর পানোরত প্রক্লিষ্ট বিখাপরেরও ঐরূপ আতিথা কোত্তেম, তাতেও রশময়ী বিরক্ত হতেন না, বরং উল্টে আমি তাঁর অতিরিক্ত অঙ্কুরাগের ভাজন হতাম।

নূরমহল একটু একটু কোরে ক্রমে লজ্জা ভাজা হলেন, ক্রমশঃ প্রক্লিষ্ট হতে লাগলেন, শেষে মত্ত হয়ে উদার আমোদে মেতে উঠলেন। তাঁর সেই হাতখানি আমার কোলের উপরেই ছিল, সুন্দরী আর তা শরিয়ে লন্নি, আমিটুলেই হাতখানি দাবছি আর মনে মনে বলছি, “আমি যেমন সুখী, আমি যেমন কপালে পুরুষ, তেমন আর কে আছে? সুখের একশেষ কোলেম।” এই অবকাশে চাকনয়না একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন,—ঘরে কেবল আমরাই আছি, আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না, বাধা কি প্রতিবন্ধকের

মাশঙ্কা কিছুই নেই, নূরমহল ঘোড়শী, পরমা  
সুন্দরী, আমারও যৌবনকাল—তরুণ বয়স,  
আমরা উভয়েই মদনরাগে মত্ত হলেম,—ঐ  
উন্নত অবস্থায় বিহ্বল হয়ে যুগান্তকাল দেল-  
জানের প্রণয় ভুলে গেলেম,—আমি সেই অব-  
কাশে নূরমহলের পাপময় অপবিত্র প্রেমের গুপ্ত  
নাগর হলেম। উঃ! আমার মনে একটি দাগ  
চোড়ে আছে। যে সময় নূরমহলের আমোদ-  
কৌতুকের বিলাস-রসে মুগ্ধ হয়ে আমি তার  
গুপ্তপতি হলেম, আমার ইচ্ছা যে, সেই কাল  
রূপ অপবিত্র সময়টুকু বিস্মৃত হই, আমি যেন  
তা জন্মের মতন ভুলে যাই। এমন দুঃখ কেন  
কোলেম, তখন আমি সেই অতুতাপে দগ্ধ হতে  
লাগলেম। আমি অতি পায়র, অতি ইতর  
নরাধম, আমি অতি নিবোধ, আমার কোন  
জ্ঞান নেই! এমন হাল্কা আমি, এমন ইতরমি  
কেন কোলেম? আমার চরিত্রে বাঁটা  
পোড়ল, দিক এ জীবনে! আমার কলামুখ  
করা উচিত—এইরূপ আপনাকে আপনি  
ধিকার কোত্তে কোত্তে আমার কলঙ্কের  
ভাগিনী সেই পাপীয়সী নূরমহলের নিকট  
তাড়াতাড়ি বিদায় হয়ে এক চোঁচা দৌড়ে  
আপনার ডেরায় এসে উপস্থিত হলেম। ঘরে  
নফর চাকর ভিন্ন আর কেউ নেই যে, হৃদয়  
বসে তার সঙ্গে কথাবার্তা কর, আমি এসেই  
সরাসর আপনার কামরায় গিয়ে নিরিবিলি  
হয়ে শয়ন কোলেম বটে। কিন্তু তৃপ্তিমত ঘুম  
হলো না। এক একবার চোকের পাতা বুজে  
আসে, অমনি দুঃস্থপ দেখে জেগে উঠি,—ঘুম  
ভেঙ্গে ভেঙ্গে জেতে লাগল—স্বপ্নে কেএল নূর-  
মহল, আর দেলজানকে দর্শন কোত্তে লাগ-  
লম, এই রকমে সেই অগুভঙ্কণে রাতটুকু কোন  
মতে কেটে গেল। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখ-  
লেম, সুগন্ধবাহী কুসুম-দাম-বিরচিত, নবলতা-  
পল্লব-আচ্ছাদিত একটি অপূর্ব কুঞ্জে দেলজান  
সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাঁর পায়ের কাছে একটি  
প্রকাণ্ড সর্প কুণ্ডলাকার হয়ে আছে, সেই ভীমা-  
কার বিষধর হঠাৎ একবার ফণা বিস্তার করে  
নিদ্রিতের বক্ষঃস্থলে দংশন করবার উপক্রম  
কোলে, আমি অমনি ছুটে গিয়ে তার স্রুমুখে

দাঁড়ালেম, সে আমাকে দেখে চক্কের নিমিয়ে  
সর্পরূপ পরিভাগ কোরে নূরমহলের মূর্তি  
ধারণ কোলে, আমি দেলজানের পালাঙ্কের পাশে  
যেতে না যেতে ঐ নূরমহল যেন একখানি  
ছোঁরা লয়ে আমার প্রাণমণী দেলজানের বুকে  
বসিয়ে দিলে, আমি তাঁরে রক্ষা কোত্তে পায়েম  
না। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটনার সময় আমার নিজা  
ভক্ত হল, চেয়ে দেখি, লুচার পরামাণিক ক্ষেউরী  
করবার ভেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। তারে দেখে  
বলেম, “এ কি! তুই আজ এত সকালে এসে-  
ছিস কেন?”

পরামাণিক। ক্ষেউরীর সময় অনেকরূপ  
হয়েছে, নিত্য যে সময় এসে থাকি, আজও সেই  
সময় এসেছি, আমি বড় ঠিক ঠাকের লোক,  
আমার কাছে সময় ফাঁক যায় না।

আমি বলেম, “ঠিক ঠাকের লোক বটে, কিন্তু  
ক্ষেউরী করবার সময়, টাকা দেবার সময় নয়।”

পরামাণিক। হজুর কি আজ্ঞা কোলেন,  
বুঝতে পায়েম না।

আমি বলেম, “যদি বুঝতে না পেরে  
থাকো, তবে নয় পুনরায় বলছি শুনো, টাকা  
দেবার বেলায় তোমার কাজ-কথার বড় ঠিক  
থাকি না, নচেৎ যে বখসিদের টাকা আমি  
তোমার মাকে দিতে দিইছি, তা তুমি এত  
দিনে কবে দিয়ে ফেলতে।”

পরামাণিক। আজ্ঞা, আমি ত হজুরের  
নিকট পূর্বেই নিবেদন কোরে রেখেছি যে,  
আমার মাকে বিশ্বাস কোরবেন না, সে যা  
বলে, তার মোল কড়াই কাণা, মিথ্যা কথা  
তার জন্ম, তথাচ মোহরের কথা সে যা বলেছে,  
আপনি তা বিশ্বাস কোরেছেন। কি আশ্চর্য্য!  
মন ভাল না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।  
হজুর! আমার মার মন ভাল না।

আমি বোলেম, “হাঁ, আমি তার কথা বিশ্বাস  
কোরেছি বটে, কিন্তু তোর মাও বলে, তুই বড়  
মিথ্যাবাদী, ভুলেও সত্যি কথা বলিস নে, তোর  
সব ফাঁকি, সব কলিকার, তুই যে তার নামে  
ঠকামি করবি, তোর মা তা আমাকে আগেই  
বলে রেখেছে, আমার বেশ মনে লোছে, তুই  
তারে মোহর কটি দিস নি।”



পরমাণিক। মোহর দিইছি কি না, সেই কথা বলছেন হজুর! তোবা! তাই বলুন না। না তা দিইনি, এ ঠিক কথা বটে, যথার্থই আমি তা দিই নি।

আমি বোল্লেম, “তবে মিথ্যা মিথ্যা তার হুনার্ম কোচ্চিস কেন? এবার ত সে দোষী নয়। তোর মা বলে, তুই কুর ধোন্তে শিখে অবধি কখন একটা পয়সা দিয়েও তারে জিজ্ঞাসা করিস নি।”

“ও খোদা! ও আল্লা, এ কি অধর্ম! সরাসর মুখের উপর মিথ্যা কথা! এ কি বেহায়াপনা! বাবার কাল হওয়াবধি সে এখনও আমার কাছে আট মোহর ধারে, সেই জন্তেই আপনার দেওয়া সেই ক-ধান মোহর তারে না দিয়ে আপনার কাছেই রেখে দিইছি, তবে কথা কি না, দু-ধান জেয়াদা রেখেছি, ধর্মাবতার! তা শুদে কাটা যাবে,—হজুর, অল্পই হোক, বিস্তরই হোক, মোট্ কথটা এই, এর জন্তে এত হাদাম হজ্জুত কেন?”

আমি বোল্লেম, “বটে! হাটে কলা নৈবেগায় নমঃ। তোর কাছে রেখে দিলেই বুঝি তোর মার পাওয়া হল? কই, তোর মা তো সে কথার প্রশঙ্গও করে নি। সে বরং আরও কত দুঃখের কান্না কাঁদলে, কত কাঁদোনি গাইলে।”

পরমাণিক। আজ্ঞা না, সে তা বলে নি, আমি দ্বিবি কোরে বোল্তে পারি, সে যে আমার ধারে, এ কথা সে বলে নি। আমি যে আপনাকে বল্ছি, আপনি ঠিক জানবেন, সে মাগি ভারি ধুর্ন্ত, কিন্তু হজুর! ধর্মের দোরে কবাট নেই, ধর্মের ঢোল আপনি বাজে, সে না বলেছে, আমি বল্ছি!

আমি বোল্লেম, “কেন, সে কথা বল্তে তার হানি কি ছিল?”

পরমাণিক। খোদাবন্দ! তার লাজও নেই, লজ্জাও নেই, পাক চক্র কোরে, সুরিয়ে কিরিয়ে কেবল আমাকেই কাঁদে ফেলবার তার চেষ্টা। সে মুখে বলে, আমি তার মুখ চাওয়া ছেলে, তুমিও যেমন হজুর! বামণ গেল ঘর ত লাজল তুলে ধর, যখন চোকের উপর থাকি, তখন তার মুখ চাওয়া ছেলে হই, চোকের

আড় হলে আর সে কথা থাকে না—“চোক-চোকি যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।”

আমি বোল্লেম, “সে কি, তুই বই আর তার ছেলে নেই, তবে তুই ও কথা বলিস কেন?”

পরমাণিক। হজুর! ভাগ্য জানি লাভে, আর মানুষ চিনি ভাবে। তার শরীরে দয়াও নেই, মায়াও নেই, তার মুখখানি সর্ব্বদা, কেবল বচনে পুড়িয়ে মারে, কথায় তারে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। হজুর! সে মুখে কত কথাই বলে, কিন্তু কাজে মেলে কই? কথা ত বলেই হয় না, ধোপে টেঁকলে হয়। হজুর! আমার মা মাগী যমের অরুচি, যেন ঝোড়ো কাক।

আমি এখন ক্ষেউরী হতে বোস্লেম, পরমাণিক ক্ষেউরী কোত্তে কোত্তে “আরে আমার মা, আরে আমার মা” বোলে টেঁচাতে লাগল। মায়েরও যেমন ধর্মজ্ঞান, ছেলেরও তথৈবচ, বরং ছেলে আরো এক গ্রাম বেড়ে চলে। পরমাণিক তার মার নিন্দামন্দ না করে, আমাকে আর তা শুনতে না হয়, সেই জন্তে অল্প কথা এনে ফেল্লেম, তারে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “কেনম লুচার! আজ ছাউনীর খবর কি, বল্তে পারো?”

পরমাণিক। আজ্ঞা, ভাল কথা বটে, একটা খবর আছে, সেটা কিন্তু খোস খবর নয়। আহা! যাই হোক, ছেলে মানুষ সে, বোধ হয় মারা পোড়বে না—তা হলেই মঙ্গল।

আমি বল্লেম, “তুই কার কথা বল্ছিস? কে সে?”

পরমাণিক। একটি ভদ্র কারপন্নদাজ—তার নাম ইয়াস্মিন, বীরপুরুষ মুক্তারের পুত্র, যে মুক্তার প্রাণ দিলে, তবু তলোয়ার ছাড়লে না।

আমি বল্লেম, “কি! ইয়াস্মিন! সে কি? তার কি হয়েছে? তুই আমার সত্য কোরে বল।”

পরমাণিক। কেন ধর্মাবতার! যারা বালক, তারা বালকই থাকে, তারা কখন বিবেচনা কোরে চলে না, শেষে কি ঘটবে, তা ভাবে না, হঠাৎ পীরিতে পোড়ে যায়, আবার দেখুন, যারে পাবে না, তারি জন্তে আকিঞ্চন

করে, আপনি দশজন যুবীর মধ্যে নয়জনকে  
ঐরূপ পাবেন। আমি নিজে যে তা ভুগে জানি,  
আমি একবার—”

আমি বল্লম, “তোমার সে বাহাদুরী পরে  
শোনা যাবে, যে কথা হোজে, এখন তাই  
চলুক।”

পরমাণিক। তার পর, হজুর! ঐ ইয়াস-  
মিন পথে যেতে যেতে কতমা নামে অন্তঃ-  
পুরের একটি বিবিকে কেমন কোরে দেখতে  
পেয়েছিল। আপনি ত জানেনই—স্বীলোকেরা  
যে হাতীর উপর সোয়ার হন, তার নিকটে যে  
যায়, তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে—সে মারা  
পোড়বেই পোড়বে! কাল যখন পথ চলা প্রায়  
শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় যে হাওদায়  
কতমা বিবি ছিলেন, ইয়াসমিন খোড়সোয়ার  
হয়ে তার এত নিকটে দিয়ে চলেন যে, মাহত  
তাই দেখে তাঁকে পিস্তল ছুঁড়ে গুলী কোলে—  
সে তা না কোরে করে কি? তার উপর যে  
দখতঃ ভার রয়েছে, তাকে যে তা কোতেই  
হয়। ইয়াসমিন সেই গুলী খেয়ে অমনি ঘোঁটি-  
ভেঙ্গে নীচে পোড়ে গেলেন। সুরের মধ্যে হল,  
তিনি যখন পোড়ে যান, সেই সময় হাওদাদার  
বিবির ঝিলঝিল কোরে হেসে উঠেছিলেন,  
সেই শব্দ হয় ত তার কানে গিছিল—যা হোক,  
আশার অর্ধেক ফল তো হল! তারপর বিলা-  
সিনীরা হাসতে হাসতে আমোদ কোত্তে কোত্তে  
আপনাদের আড্ডায় চলে গেলেন। হজুর!  
সেই ইয়াসমিনের কথাই বল্ছিলাম্, একটুখানি  
ছোঁড়া, তার অঘটা দেখুন, বামন হয়ে চাঁদে  
হাত বাড়াতো চায়,—“আসল ঘরে মুশল নেই,  
ঢেকশেলে চাঁদোয়।” আমি বল্লম, “পর-  
মাণিক! শীঘ্র শীঘ্র সেরে নেও, দুর্ভাগা বালক-  
টিকে দেখতে যাব, মর্যাদানে গুলীটে না লেগে  
থাকে ত ভাল—মারাত্মক না হইলেই হল।”

পরমাণিক। বিশ্বর রক্তপাত হয়েছে,  
কিন্তু হাকিম বলেছেন, ভয়ের সম্ভাবনা কিছুই  
নেই।

আমি বল্লম, “গুলী কোথায় লেগেছে?”

পরমাণিক। হয় ঘাড়, নয় কাঁধে, এই  
বোধ হয়।

আমি বল্লম, “সে গুলী কি শরীরে আছে?”  
পরমাণিক। বার কোরে ফেলা হয়েছে,  
কিন্তু প্রায় আধসের মাংস কাটতে হয়েছিল,  
তবে বার হয়। তত মাংস না কাটলে  
হাকিমের সেই গাব্দো আঙ্গুল ঢুকবে  
কেন?

আমি পরমাণিককে বিদায় কোরে দিয়ে  
ইয়াসমিনকে দেখতে দৌড়িলেম—গিয়ে দেখি,  
ইয়াসমিন বেদনায় কেঁকা কেঁকা কোচ্ছে, কিন্তু  
স্বরাহা বটে, বেঁচে উঠলেও উঠতে পারে।

আমি বল্লম, “বালক! এমন কুর্কম আর না  
করো, তারই শিক্ষা পেলে,—যে হাতীতে  
জেনেন! সোয়ারী থাকে, তার নিকটে আর  
কখনই যেও না।”

ইয়াসমিন। আমি যেমন দুঃসাহসের কাজ  
কোত্তে গেছিলাম, তার মত ফল বেশ পেয়েছি।  
আমার প্রাণ যায়, লোকে তাতে দুঃখিত না হয়ে  
কেবল গ্লেশ আর উপহাস কোচ্ছে।

আমি বল্লম, “এ সংবাদ বুঝি রাজপুত্র  
এখনও পান নি?”

ইয়াসমিন। কি জানি, তিনি যদি শুনে  
থাকেন, তাই তাঁর সন্মুখে কেমন কোরে  
যাব ভয় হচ্ছে—বরং মাহতের হাতে মৃত্যু  
ভাল ছিল, রাজপুত্রের সে চোকরাজানি  
দেখে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আমি  
বল্লম, “না না, সে ভয় কেন কোচ্ছো? এটা  
যে বড় গুরুতর অপরাধ হয়েছে, তা তিনি না  
বিবেচনা কোত্তে পারেন, কি যদি গুরুতর বলেই  
মনে করেন, তাতেই বা ভয় কি? তবে কথা এই,  
কোন সময় একটা বাহাদুরীর কাজ কোরে  
তোমাকে নাম কিনতে হবে, তা হলে তোমার  
অপরাধ যত বড়ই হোক, রাজকুমার তা  
ভুলে যাবেন।”—এই কথা বলে বল্লম, “তবে  
এখন আমি চোলেম, আরও একদিন এসে দেখে  
যাব। সেই দিন তোমার জন্ত একখান সুপা-  
রিস চিঠি আনবো।” ইয়াসমিন বোল্লো, “হাকিম  
বলেছেন, যেখানে আছি, এইখানে আরও দুদিন  
থেকে আরোগ্য হতে হবে, আমাকে কিন্তু  
আবার ছাউনীর সঙ্গে সঙ্গে না গেলেও নয়।”  
আমি যে কাছে থেকে সেবাশ্রম কোত্তে পারি

না, তার জন্তে তারি দুঃখ হতে লাগল। ছুটি চলে নড়ফালী যে ছুটি দেবেন, তা দেবেন না, তিনি সে মেজাজের লোক নন। ইয়াসমিনকে বোলেম, “আমি হাকিমের সঙ্গে দেখা কোরে যাতে কোন কষ্ট না হয়, তার বন্দোবস্ত আগে কোরে, তবে এখান থেকে কচ্ কোরবো।”

আমি ওখান থেকে বিদায় হয়ে ফিরে আড-ডায় যাচ্ছি, পথে ইয়াসমিনের কথা স্মরণ হয়ে মনে মনে খেদ কোত্তে লাগলেম যে, হয়! ইয়াসমিনের ঘেদশা হয়েছে, আমারও কেন সেই দশা হলো না? আমি যখন নূরমহলের ঘরে প্রবেশ কোত্তে যাই, তখন যদি কোন অমূল্য খোজা বৃকে গুলী মেরে আমাকে ফেরাতো, তবে ত আর তার ঘরে প্রবেশ কোত্তে পাত্তেম না—সে যে আমার পক্ষে উত্তমই হতো। এখন মনে যে কষ্ট হচ্ছে, তা হলে ত আর এক কষ্ট ভোগ কোত্তে হতো না—নূরমহল আমায় বোলে ছোলে তার ফাঁদে এনে ফেলেছেন, উদ্ধার হতে পারি কি না, বলতে পারিনে। এখন “শ্রাম রাখি, কি কুল রাখি?” আমার ঘেন “শিয়ালের সমুদ্র পার হওয়া” হয়েছে—আমি যদি কুকাঙ্গ বিবেচনা কোরে স্বর্গায় নূরমহলের ঘরে যাতায়ত না করি, যুবতী তবে আন্তরিক চেটে যাবেন, আমি তাঁর বিঘনয়নে পোড়ব, আমার যাতে অনিষ্ট হয়, নূরমহল তার চেষ্টা কোরবেন। আর তা না হয়ে আমি যদি সেই পাপময় অপবিত্র প্রণয় বজায় রেখে তাঁর কাছে গতিবিধি করি, তা হলে একদিন না একদিন ধরা পোড়তে হবে, পাপকর্ম ছাপা থাকিবার নয়, আপনি ঢোল বাজিয়ে দেবে, ধরা পোড়লেই প্রাণটি হারাব, নিশ্চয়ই মারা পোড়ব, তার সন্দেহ নেই—তাও যদি না হয় যদি ধরাই না পোড়ি, মারাই না যাই, তা হলেও যে আমি সেই ইতর গুপ্তপ্রণয়ে প্রফুল্লিত হয়ে তাঁর সঙ্গে ক্রমিক বিলাস-বিহার করবো,—তা পারব না—কেন না, একে ত কুমারী-গমনে পাপ, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, বিশেষতঃ একবার যে কুকাঙ্গ কোরেছি, তাতেই লজ্জায় আর স্বর্গায় মুখ তুলতে পাচ্ছি, মনের অশুখ যে কত, তা বলে উঠতে পারিনে, বৃকের মধ্যে

যেন বজ্রবাত হচ্ছে, তার উপর আবার দেল-জানের প্রণয় স্মরণ হলে আমার কোনো আশোদিই ভাল লাগবে না, সব উদ্দাস জ্ঞান হবে, তখন আমার মনের ভাব ছাপা থাকবে না, প্রকাশ হয়ে পোড়বে, তবে নূরমহল যে আশা কোরেছেন, আমি তার সঙ্গে প্রাণ থুলে আমোদ আহ্লাদ কোরব, সিটি বটে উঠবে না, সে আশায় তাঁকে নৈরাশ হতে হবে, প্রণয়িনী দেলজানকে মনে পোড়লে আমার মনের সেরূপ আনন্দ, সেরূপ স্মৃতি কখনই থাকবে না। আকাশে ফাঁদ পাতলে কি বনের পাখী ধরা দেয়? নূরমহলের উচিত, এখন শামায়ুর্জি হন—আপনার মান আপনার ঠাঁই—তা হলে তাঁর মান থাকবে, অতি বাড়াবাড়ি ভাল না, অতি শকই কিছু নয়। এত বয়স হয়েছে, তখাচ পাপকর্মের নিমিত্ত আমাকে কখন দুঃখিত হয়ে অহুতাপ কোত্তে হয় নি, এই আমার প্রথম দুঃখ, এই কেবল প্রথম লজ্জায় মুখ চোক আমার কালী হয়ে গেছে, সে কালী আর যাবার নয়, জন্মের মত দাগ হয়ে রইল। লজ্জা কালায়ি হয়ে আমায় দক্ষ কোচ্ছে, আমি ঘেন দাবানলে দাহন হোচ্ছি—এই কেবল প্রথম বন্ধ-বান্ধবের মুখের দিকে চেয়ে কথা কইতে আমার লজ্জা হোচ্ছে, এই কেবল প্রথম আমি মুখ তুলে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি চেয়ে দেখতে কুণ্ঠিত হোচ্ছি। আমি আর পূর্বের মত কারও সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করি না, না প্রফুল্লিত হয়ে আমোদ-প্রমোদ করে বেড়াই? তাও করি না, আমার সে সকল ভাব উল্টে গেছে, আমার স্বভাব এখন আর এক প্রকার হয়ে পোড়েছে, লজ্জায় আর স্বর্গায় ত্রিয়মাণ হয়ে, নির্জনে বসে কেবল কত কি ভাবতেম, তামাম দিন এইরূপ দীনা-স্থায় কাটাতেম, সন্ধ্যা হলে অর্থাৎ যখন লোকালয় অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত হতো, সেই সময় অনাথার ভায় একাকী এখানে সেখানে টো টো কোরে বেড়াতেম, আমার যেন বোবার স্বপ্নের গায় হল, মনের কথা কাকেও বলতে পাত্তেম না, কেবল মনে মনে গুমরে মোত্তেম। এক একবার ইচ্ছা হত যে, ছুটে দেলজানের কাছে যাই, সুলতান সুলজার চাকুরিতে নাম লিখিয়ে তাঁর

পরিচায়ক হই, পাছে লোকে বিশ্বাসঘাতক বোলে অপবাদ করে, সেই কালভয়ে সজ্জিত হয়ে সে সজ্জন আবার পরিত্যাগ কোত্তেম । একবার নয়, এমন কি, হাজারও বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোলেম, নূরমহলের ত্রিদীমানায় যাব না, তার মুখও দর্শন কোরব না, তার ছায়াও মাড়াব না । এদানী তার নাম মনে হলে ঘুণায় গা ধিন ধিন কস্তো । একবার নয়, কত শত বার মাথামড় কুটে খুনো খুনি হয়েছি, কতবার আপনাকে দিকার দিয়ে বলেছি, আমি অতি অবোধ, আমার অতি হীনবুদ্ধি, তাই নূরমহলের চলনাক্রে বেধে জড়িয়ে পোড়লেম, আমি বুদ্ধির নাথে আপনিই মজ্জলেম ।

নজফালী কেল্লাদর্শন কোরে ফিরে এসে কটা দিন অবধারিত কোরে চকুম দিলেন যে, যেক দিন কুচ কোত্তে হবে । রস্তির বিরাম ছিল যেন মুসলধারায় জল ঢালতে লাগল । আমার আজ অধিক পথ চলতে পার্লেম না, ততক পথ চলেই আডডা লতে হল । একটি ঘরের নিকট ছাউনি কোলেম, সহরটা বড়, বহু লোকের সমাগম । কানবিসের তাঁবুগুলি তিজে উঠবে হয়েছে, তার মধ্যে না বাস কোরে এক রাত্রের নিমিত্ত সহরে বাসা লইবার অন্তত পাওয়া গেল । যারা ছোলা, মটর, গম প্রাদির কারবার করে, তাদের একটি ঘরে গাঙ্গা কোলেম, মনে মনে মহা সন্তুষ্ট যে, আজ রাত্রের মত বেঁচে গেলেম, নূরমহলের তাঁবু অনেক দূরে আছে, সে আমায় খুঁজে পাবে না । কোন কার্যান্তরে যাবার মনন কোরে যেমন ঘরে থেকে বার হয়েছি, দেখি না, কুলটা নূরমহলের কুটনী পরামাণিকের মা সেই বাড়ীতে ঢুকছে । বুড়ী আমায় দেখে স্পষ্ট চোক ঠেঁরে ইশারা কোলে, তার সেই শুকনো তোবড়ান রুগ চেহারা আফ্লাদের ছটায় যেন ঝলক মাস্তে লাগল । আমায় দেখে বলে, “মধ্যবর্তার ! আপনি বেশ স্থানটুকু পেয়েছেন, এখানে থাকার শোবার অপ্রতুল নেই, তা এখানে অনেক আছে, আপনি বেশ কপালে পুরুষ !” আমি ও কথার কোন উত্তর না কোরে তুই জাহানবে যা, তোার কুটনীপনার মুখে

আশুন—এইরূপ গজর গজর কোত্তে কোত্তে আর সেই সর্বনাশী শাকচূর্ণকে গাঙ্গাগুলি দিতে দিতে আপনার কর্ণে গেলেম ।

আরম্ভেব আর নজফালীতে বিবাদ হয়ে যে, মন-ভারাভারি হয়, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তাঁদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হয়ে সে অকৌশল মিটে গেছে, আর সে মনোমালিন্য নেই, এখন সাবেক মত ভাবপ্রণয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এক্ষণে নজফালীরও মেজাজ বেশ নরম, তিনি মাঝে যরূপ কড়া, যেরূপ গরম হয়ে উঠেছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ ভাব নেই, খুব স্থির শান্ত হয়ে আছেন—তবে দেলজান যে হাতে থেকে ফরে গেছে, তাতেই মনটা কতক ভার ভার আছে, তাঁর মত স্বভাবের ব্যক্তি সে শোকে একেবারে কোড়ে ফেলতে পারেন না, তা পারবার সাধ্য কি ? আমি মনে মনে জগদীশ্বরকে ডাকতে লাগলেম, হে কৃপাময় ! আমার দশাটা হবে কি ? নজফালী যদি সকান পান যে, আমিই কৌশল কোরে দেলজানকে সে ঘরে সোরিয়ে তফাত কোরে দিইছি, আবার আমিই তাঁর কন্ঠাকে ফুসলিয়ে কুপথপামিনী কোরেছি, তা হলে সচিব বাবের মতন পোড়ে টুকুরো টুকুরো কোরে ছিঁরে থাকবেন । আমি বুঝি লাভে মূলে হাতাত হোলেম । সে কথা সচিবের জানতে কতই বা বিলম্ব হবে ? ক-দিন তিনি না শুনে থাকবেন ? পরামাণিক আর পরামাণিকের মার যেরূপ চরিত্র তারা তাঁকে সে কথা না বলে কতকাল চুপ কোরে থাকবে ? হা পরমেশ্বর ! শুকনো কাটে ব্রহ্মশাপ কেন ? এক্ষণে তাদেরই হাতে আমার জীবন—আমার জীবনের সুত্র তাদের হাতের উপর ঝুলছে, তারা তা হাতে কোরে ধোরে আছে । সিয়ানা ঠোঁকলে বাপকেও বলে না, সেয়ানা ঘুঘু ফাঁদে পা দেয় না,—আমি কিন্তু যে দুটি কর্ণ কোরেছি, তার একটির ত পরামাণিক প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সে তা স্বচক্ষে দেখেছে, পরামাণিকের মা সহায় হয়ে যে ঘোর হুমকি জোড়িয়েছে, অর্থাৎ সেই রাক্ষসী বুড়ী মধ্যবর্তিনী হয়ে যে লজ্জার বরণডালী আমার মাথায় তুলে দেছে, তার আর অস্ত প্রমাণ চাই না, ঐ বুড়ীই সাক্ষ

হয়ে প্রমাণ করিয়ে দেবে। শতের কথায় সত্যী ভোলে, সে যদি আমার নামে দশ কথা লাগায় ভাঙ্গায়, নজ্জাকালী তা বিশ্বাস কোরবেন, তবেই আমাকে কালও হেগে মোত্তে হবে। যদি বুড়ী তার আপনার বাঁচোয়ার নিমিত্ত সে কথার উচ্চবাচ্চা না করে, সেই ভরসা আছে। তখাচ হলে কি হয় যে তুই আমার ব্যক্তির হাতে পোড়েছি, তাদের বিশ্বাস কি? তাদের মুখে একখান, পেটে একখান,—হাতেই ধরো, আর পায়েই ধরো, তারা শিকলি কাটা টিয়ে, পোষ মানাবার নয়।—এই সকল দুর্ভাবনায় এক লহমাও মনে সুখ ছিল না, আমি অতিশয় রান, অতিশয় গ্লিয়মান হলেম, সে ভাব কিছুতেই নিবারণ কোত্তে পাল্লেন না।

আপনার কাজ সেরে সন্ধ্যার পরেই দোকানে ফিরে গেলেম। একে পথের ক্রেশ, তার মনের অসুখ, সকাল সকাল শয়ন কোল্লেন, ভাবলেম, প্রকট গুম হলে শরীরের তত কষ্ট থাকবে না, অন্তঃকরণও অনেক স্থস্থির হবে। কিন্তু গলাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে? কপাল যখন মন্দ হয়, স্বপ্নে গেলেও সুখ হয় না—গত রাত্রের সেই ভয়ানক কালরপ, পুনরায় এসে দেখা দিলে—সেই সরস-কোমল-মূর্তি দেলজান, সেই কালসর্প, সেই কুলটা রাক্ষসী নূরমহল—স্বমিয়ে স্বমিয়ে সেই সকল দর্শন কোত্তে লাগলেম, আমি মনের ব্যগ্রতায় ব্যাকুল হয়ে যেমন সেই নিরুদ্ধি নিরীহ দেলজানকে রক্ষা কোত্তে যাব, এমন সময় চৈতন্য হল। চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি, পালঙ্কের পাশে স্রীলোকে রমত একটি আকৃতি দাঁড়িয়ে! “ভাল! ভাল! বেশ! সাদক বেশ অকাতরে স্বপ্নে নিজা যাচ্ছেন! যে তার জগে সর্বস্বত্যাগী হয়ে লজ্জা-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়েছে, সাদক তারে স্বপ্নে দেখছেন না, তার স্বপ্নে দেখবার অজ্ঞ লোক আছে।” এই কথার শব্দ পেয়ে বুঝতে পাল্লেন—নূরমহল দাঁড়িয়ে,—এ তাঁরই কণ্ঠস্বর।

আমি অমনি চোক মুছতে মুছতে বলে উঠলেম, “হাঁ, তোমাকেও দেখছিলাম বৈ কি। উঃ! কি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! কও! তুমি এত

রাত্রে কোথা থেকে? এখানে কেমন কোরে এলে? তোমার প্রাণে কি ভয় নেই?”

নূরমহল। না, তা নেই। সাদক! আমি যেমন মজ্জিছি, এত দূর যে মজ্জতে পারে, সে না পারে কি? সে গভীর রাত্রে একাকিনী ঘরে থেকে বেরিয়ে, এ রাস্তা, সে রাস্তা এ গলী, সে গলী ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে, সব এখানে আজ নতুন এসেছে, পথ-বাট কিছুই জানা নাই, সব অপরিচিত; তখাচ তার প্রাণোত্তর হয় নি! বিদেশী দোশমন চেহারার লোকের হাতে পোড়ে সে অপমানিতা হোতে পাত্তো, সে ভয়ও সে করে নি! সে যারে ভালবেসেছে, তার কাছে যাবে বলেই সে এত কষ্ট করেছে—তার জগেই সে কুল-লজ্জা কুল-কলঙ্কের পসরা আপনি মাথায় কোত্তে নিয়েছে। আমি যে এত দুঃখ পেয়ে, এত বেশ কোরে এখানে এলেম, তার দক্ষিণে তার সমাদর কি এই হলো!—কেবল একবার মুখে দিকে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে রইলে! যত্নে একটু আহ্লাদও হল না! কি আশ্চর্য! কোথায় আমায় দেখে প্রকুল্লিত হয়ে আমোদে গলে যাবে, আমার আদর-গৌরব কোরবে, মান বাড়াবে, তার কিছুই না! প্রথম কোরে প্রথম যে মনোরাগ দেখালে, তোমার সে প্রেমরাগ, সে মনোরাগ এখন কোথায় গেল? প্রথম যে মনের, যে প্রণয়ের মুখপাত দেখিয়ে আমার মন ভুলালে, প্রাণ ছোলে নিলে, তোমার সে মন, সে প্রণয় কোথায় এখন? সে অনুরাগের ছটা, সে সর্ব অনুরক্তির কথা কি মনে নাই? এখন কি প্রাণে বড় ভয় হল? তাই একবার ডেকে জিজ্ঞাস কোল্লেন না? এত তাচ্ছল্য! এত ঔদাস্য! বিবেহায়া তুমি! আমাকে লজ্জার তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে চাও তুমি ভারি শঠ, ভারি লম্পট, নচেৎ কে কোথ অবলা কুলবালাকে এমন কোরে মজিয়ে শেখে তুফানে ভাসিয়ে দেয়? ভেবে দেখো, তোমার আশাক্রমে আমি কুলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি তা জেনে শুনেও আমার সঙ্গে চলল কোচ্ছো! ধিক তোমায়! তোমার প্রণয়ের

দিক্ ! শঠের প্রীতি ক্ষুরের ধার,যো পেনে কেউ নয় কার ।”

আমি কথা কইতে গেলেম,নূরমহল আমার নিবেশ কোরে বলেন, “কথা আমি ঢের জানি, তার অভাব নেই,কিন্তু তুমি কি নিলজ্জ বেহায়া কাপুরুষ ! কি ইতর বিধব্রী তুমি ! হা আল্লা ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ?—এই পামরের হাতে পোড়ে কুলটা হলেম ! এই নরাধমের সঙ্গে আমার কুল গেল ! মান গেল ! লজ্জা গেল ! ধর্ম নষ্ট হল ! আমার কি লাগুনাই না হল ! এই কল্যাণীরের কুহকে পোড়ে আমার পিতৃকুলে বাটা পড়ল ! পিতৃনামে কলঙ্ক হল ! পিতৃগোরবে দাগ চোড়ল !” আমি বল্লম, “এটি তোমার বড় লম, আমি দিবি্য কোরে বলছি, তোমার প্রতি আমার বেশ মন আছে, আমি তোমার প্রমাণও কোরে দিতে পারি ।”

নূরমহল । তোমার ও সব দাগাবাজির কথা —তোমার ভালবাসার আর কেউ আছে,যুমিয়ে ঘুমিয়েও তুমি তার নাম করো । আমি যেন তোমার খেলেনা পুতুল, কুচে নাকি অনেক দিন কাটাতে হবে, তাই আমারে লয়ে পথে রাস-লীলা কোরবে মনে কোরেছ, আমি না হলে আর কাকে লয়ে আনোদ প্রমোদ চোলবে ? এমন আকোড়ে আনোদ আর কোথা পাবে ? আমার সঙ্গে তুমি যেরূপ কুবাবহার কোলে, এর ফলে তোমাকে বিলক্ষণ ভুগতে হবে— আমি তোমাকে আচ্ছা শিক্ষা দেব, সিটি কিন্তু বড় ভয়ানক হয়ে উঠবে, এ কথা যেন স্মরণ থাকে ।”

আমি ভারি অপ্রতিভ হলেম, মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, শেষে কুঁখে কুঁখে, টিটি কোত্তে কোত্তে বোল্লম, “সুন্দরি ! তুমি বুঝতে পাচ্ছো না, তোমার ভ্রম হয়েছে ।”

নূরমহল । আচ্ছা, আমি যে তোমার প্রণয়িনী,তার প্রমাণ কি ? মাথার উপর খোদা আছেন, মহম্মদ আছেন, দাদশ ইমাম আছেন, তাঁদের নাম লয়ে, আর পৃথিবীতে যত ধর্ম্মায়া মহাপুরুষ আছেন, তাঁদেরও নাম উচ্চারণ কোরে তুমি দিবি্য কোরে বল যে, দেলজান তোমার মন চুরি করোনি, সে তোমার চিন্তাচার

নয়, তুমি তোমার মন-প্রাণ নূরমহলকে সমর্পণ কোরেছো, দেলজানকে কোনো নি, আর আরদাবাদে পৌঁছে তুমি আমারে বিবাহ কোরবে—এইগুলি শপথ কোরে বল, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস যাই ।

বরং জুমুখো ধারাল তলোয়ার একখানা অনায়াসে গিলে ফেলতে পারি, তখাচ একপ পদ-প্রতিজ্ঞা কোত্তে পারি নেন, যাতে সে প্রতিজ্ঞা না কোত্তে হয়, পাকচক্র কোরে তারই কৌশল কোত্তে লাগলেম, আমি বল্লম, “নূরমহল ! তুমি ভেবে দেখো,কিরে দিশি কর-বার প্রয়োজন কি ? ভদ্রলোকে কে কোথায় প্রতিজ্ঞা কোরে থাকে ? তাদের কথাই প্রতিজ্ঞা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না ?” এই চাতুরীর কথা শুনে নূরমহল আরও দ্বিগুণ রেগে গেলেন । সালখানা ভাল কোরে ঝেঁপে ঝেঁপে গায় দিয়ে যখন ঠমক কোরে দাড়াইলেন, কালনাগিনীর হায়ে তাঁর সেই ভয়ানক উগ্রমুখি নিরীক্ষণ কোরে আমার প্রাণ ঝেঁপে গেল । নূরমহল বলেন, “তবে তুমি শপথ কোরবে না ? আচ্ছা, না করো, নাই নাই, এর পর কিন্তু মহা প্রমাদ হবে, আমার জাতক্রোধ তোমার মনে থাকে যেন, বাস্তবিক সেটি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে ।”

আমি তাঁরে নিরন্তর কব্বার ফলে বোঝাতে গেলেম, কিন্তু নূরমহল আর দাড়াইলেন না, এই কথাগুলি বলেই অমনি চোটপায় প্রস্থান কোল্লেন । তার পর অবশিষ্ট রাতটুকু আমি যে কিরূপে কাটালেম, পাঠক বন্ধু তা অক্লেশেই অনুভব কোত্তে পারবেন—সেই বোর ভয়ঙ্কর কালস্বপ্নটি, আর সেই সঙ্গে তার অসুস্থরূপ ফলটি মনে উদয় হয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধরু ধরু কোরে কাঁপতে লাগল, প্রাণ উড়ে গেল, কণ্ঠ শুক হল, ঘন ঘন মোহ যেতে লাগলেম—কি হবে ! সর্ব্বনাশ হল, দেলজানের প্রাণ লয়েই টানাটানি পোড়ল, আমার বুদ্ধির দোষেই, শুধু তাঁও নয়—আমি আমার দোষ ঢাকতে চাইনে—আমার মনে মনে ছুঁইমিইও ছিল,—সেই ছুঁইবুদ্ধির দোষেই নিরপরাধিনী দেলজান প্রাণে মারা পোড়লেন, হয় ত তাঁরে দারুণ

যন্ত্রণা দিয়ে অপহৃত্য। কোরবে! হায়! আমি  
ত বড় পামর! এমন কুবুদ্ধি আমার কেন হল!  
এমন কুবর্খ কেন কোল্লেম? আমার অদৃষ্টে  
এত নিগ্রহও ছিল! এই বলে আশ্বত্থসনা  
কোতে লাগলেম,—আর বড় বড় কোরে  
বলতে লাগলেম, “নূরমহল! অধম, পামর আমি  
ত হয়েছি, যে কাজ কোরেছি, তাতে তুমি  
আমার প্রতি কোপ কোতে পারো, আমি যথা-  
র্থই তোমার করালকোপের উপযুক্ত পাত্র  
হয়েছি, কিন্তু এখন তোমার কাছে আমার  
এই জিজ্ঞাস্য, কেবল আমার উপরই সেই কাল-  
রূপ ঘোর আক্রোশসম্পূর্ণ পরিভূষণ করো—  
কেবল আমাকে নিগ্রহ কোরেই তুমি ক্ষান্ত  
হও—আমার দেলজানের উপর কোন  
প্রকার অত্যাচার না হয়, আমার প্রার্থনা—  
আমাকে তুমি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করো, কেটে  
টুকরো টুকরো করো, কিম্বা তোমার  
যেকোন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ শাস্তি দাও,  
কিন্তু সে নিরপরাধিনীকে কিছু বলো না,  
অনাথা দেলজানের প্রাণের উপর হস্তারক  
হইও না, তারে তুমি ক্ষমা করো, তার পবিত্র  
শোণিতে তোমার কোমল হস্ত কলঙ্কিত করো  
না; কিন্তু কারে বলছি? কে তা শুচ্ছে?  
যারে বলবো, সে এখানে উপস্থিত নেই, সে  
অনেকক্ষণ চলে গেছে। তবে এখন সেই দেব-  
পুরুষ বিধিকর্ত্তা বিধাতাকে উদ্দেশ্যে ডেকে  
বোল্লেম, “হে বিধে! নূরমহলের সেই ঘোর  
দুর্দান্ত কালদণ্ড কেবল যেন আমার মন্তকো-  
পরেই পতিত হয়।”

পরদিবস প্রাতে আমরা কুচ করবার উদ্-  
যোগ কোছি, দেখি না, সলিমান এসে উপ-  
স্থিত। তাকে সহসা দেখতে পেয়ে আমি চমকে  
উঠলেম। দেলজানের নামে পত্র দিয়ে তারে  
আগরায় রেখে এসেছিলেম, আজ সে ফিরে  
এসেছে। এখানে অনেকেই কান খাড়া কোরে  
আছে, বিশেষতঃ পরামাণিক লুচার মস্ত দুটো  
কান লয়ে এখানে সেখানে এক একবার উর্কি  
মাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। শুন কি বলে, কে  
কি করে, সেই সকল বিষয় শুনে আর দেখে  
বেড়াচ্ছে। তাই দেখে সলিমানকে শিথিয়ে

দিলেম, “তুই সকলের পেছনে থাকিস, আমি  
কোন আছিলায় তোমার কাছে এসে যা শুনে  
হয় শুনবো।”

তার পর অবসর পেয়েই সলিমানের কাছে  
এসে শুনলেম, সে দেলজানের হাতে পত্র দিতে  
পারেনি, অনেক চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু সে  
যোগাযোগ হয়ে উঠেনি, শেষে সে শুনলে,  
বিবি সেখানে নেই, নিরুদ্দেশ হয়েছেন, কোথায়  
গেলেন, কি, কি হলেন, সে কথা কেউ কিছু  
বলতে পারেন না, তাই কাজে কাজেই তাকে  
ফিরে আসতে হয়েছে। আমি বল্লেম, “তবে  
পত্র কই? দাও, ছিঁড়ে ফেলে দা।” সলিমান  
একবার জেবে হাত দেয়, একবার পাগরি খুলে  
দেখে, একবার এদিকে হাতড়ায়, একবার সে-  
দিকে তল্লাস করে, কখন চাপকান ঝাড়ে, কখন  
বুকের মধ্যে হাত দেয়,—অনেক খুঁজে দেখলে  
পত্রখানি পাওয়া গেল না, সুতরাং তাকে শেষে  
বলতে হল, “চিঠিখানি কেমন কোরে খোঁজ  
গেছে।” আমি তারে কতকটা তিরস্কার কোরে  
যে, এতো গাফিল তোমার! তাই কোরেই ক্ষান্ত  
হলেম,—পত্রের বিষয় আর মনেও কোল্লেম না  
ভাবলেম, না পাওয়া গেল, নাই নাই, তাতে  
আর হবে কি?

সলিমানের মুখে শুনলেম, ইয়াসমিন অনেক  
সেরে উঠেছেন। শুনে সন্তুষ্ট হলেম। ঐ কথা  
বলে সলিমান বল্লেন, “আজ প্রাতে দুপানা  
সোয়ারি আগরা মুখো যেতে দেখেছি, জজুর  
সে কার সোয়ারি? পালকীর সঙ্গে যে দুটি  
সোয়ার চলেছে, তারা এই ছাউনির লোক,  
আমার বোধ হল, তারা যেন হেপাজাতের জন্তে  
চলেছে।” আমি শিউরে উঠে বল্লেম, “কি! দুটি  
জীলোক যাচ্ছে?”

সলিমান। আজ্ঞা, তা আমি জানিনে—  
জজুর! ঐ দেখুন, একটি লোক এই দিকে  
আসচে, কোথায় কি হোচ্ছে, কে কি বোলছে,  
সেই সন্ধান কোড়ে বেড়ানই ওর কর্ম বোধ  
হয়, আমাদের কি কথা হোচ্ছে, তাই শুনেও  
দৌড়েছে।

পাঠক! আপনি বুঝতেই পেরেছেন যে  
কে আসচে—আমাদের লুচার পরামাণিক। যে



টাটু আমি তারে কিনে দি, সেই টাটুর উপর সোয়ার হয়ে আছে। একটা সামান্য বাহানা কোরে আমাদের দলে এসে জুটল।

আমি বল্লেম “লুচার! আজ প্রাতে ছুটি দ্বীলোক ছাউনি থেকে চলে গেছে, তারা কে কততে পারো?”

পরামাণিক। একজন আমার মা—সেই দুড়ী, তার জন্তে আল্লাকে সাধুবাদ দি, আর একজন নূরমহল, আমার মার স্বামিনী, সেজন্তে ওপর কোন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দি।” শেষের কথাগুলি বলে লুচার আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল।

আমি বল্লেম, “ছাউনি ছেড়ে তারা কোথায় গেল?”

পরামাণিক। কেন? যাবার কি খায়গা? সেই? আমার বোধ হয়, তারা জাহান্নামে গেল। ছড়র! আপনি কেন উতলা হোচ্ছেন? আপনার কি কিছু ক্ষতি হলো?

আমি বল্লেম, “না, তা নয়, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্ছি, তারা কোথায় গেল? এত পথ পরিভ্রম কোরে এসে শেষে আবার আগরায় ফিরে গেল কেন? বিশেষ সরকার ত কিছুই দেখতে পাইনে।”

পরামাণিক আর কোন কথা বলে না, চুপ কোরে রইল। আমি মনে কোয়েম, সলিমানকে দেখে সে সাবধান হয়েছে, তাই চুপ কোরে আছে। সলিমানকে বল্লেম, “সলিমান! একটু এগিয়ে দেখো দেখি, জিনিস পত্র লয়ে উটগুলো এসে পৌছিল কি না?” সলিমানও চলে গেল, পরামাণিকও মুখ খুলে দিল। সে বলে, “আমার মার, আর তার স্বামিনীর অভিপ্রায় আপনি বুঝতে পারেন নি—তারা একটি মতলব হাসিল কোরেছে, কিন্তু আর একটি বাকী আছে, সেটি এখনও সিদ্ধ কোরে তুলতে পারেনি,—এদিকে যা বোগাড় করবার, তা কোরে, এখন তারা ওদিকে রওনা হয়েছে।”

আমি বল্লেম, “তাদের কোন মনস্কামনাটি পূর্ণ হল?”

পরামাণিক। কেন ধর্ম্মাবতার! সে কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি কদাচ কারও

পেটের কথা যথের বারু করিনে, তবে কথা এই—এ বিষয়ের যা জানি, আমি আপনি তা সন্ধান কোরে বার কোরেছি, না কেউ আমার তা বলেছে, না আমি কারও মুখে তা শুনেছি, তাই সে কথা প্রকাশ কোলেও কোতে পারি, তবে বাকী রহিল—আমার ইচ্ছা—সে স্বত্ত্ব কথা,—ইচ্ছা হয় বোলবো, না হয়, না বোলবো, তার জন্তে আমাকে কেউ পেয়াদা দিতে পারেন না—হাঁ, তবে আমাকে যদি কেউ বলে, “লুচার! তোমায় একটি বিশেষ গোপনীয় কথা বলবো, কিন্তু তোমাকে দিয়া কোন্তে হবে, সে কথা যেন আর কাকেও না বলো, খবরদার, অতঃ কেউ যেন তা না শোনে।” আমি যদি দিয়া কোরে বলি সে, না, সে কথা কাকেও বলবো না, তবে সে বিষয় আমি প্রাণান্তেও মুখে আনব না, আমাকে যদি কেউ কেটে ফেলে, তবু সে কথা আমি কাকেও বলব না,—কিন্তু এম্বলে সে হিসেব নয়—আমি কিছু এমন কথা কাকেও বলিনি যে সে বিষয় কাকেও বলব না, তবে তা বল্ হান্ কি আছে? ধর্ম্মাবতার! সেই বুদ্ধা বাদিনী, আর সেই নবীনা শাকচুন্নি এখান থেকে চলে গেছে, তাদের বিষয় আমি যা জানি, আপনাকে সঙ্গ বলছি, শুভন। তারা যে রস্তমের হাত এড়িয়েছে—তাতেই তারা একটি মতলব হাসিল কোরেছে।

আমি বল্লেম, “কেন, রস্তম কি কোরেছে? কিসে তার হাত থেকে বেঁচে গেল? এ কথার মানে কি, বুঝতে পার্লেম না।”

পরামাণিক। ধর্ম্মাবতার! ঐ ত কথা! রস্তম মাইনের চাকরও নয়, কি যোটপাট করবার জন্তে তারে ঠিকে কোরেও রাখা হয়নি। রস্তম যুবা পুরুষ, মস্ত বরাণা লোকের ছেলে, শাহজাহান বাদশাহের কোপে পোড়ে তারা এখন ফতুর হয়ে গেছে, আজ খায় এমন সমস্থান নাই। সেই অছিলায় আরজ্জেব তাঁরে হস্তগত কোরে নজফালীর মুন্সী কোরে দেয়েছেন। রস্তম এখন সুখে সচ্ছন্দে আছেন। রস্তম লেখাপড়ায় আছা মজবুত, চালাক চতুরও বেশ, দেখতেও খুব সুপুরুষ। জীমান্



হয়েই ত তার কপাল পড়েছে। দেখতে শুন্তেও যেমন, বয়সও অল্প—নবীন নরর জ্যোতান। নূরমহল চিরকালই এসকল পুরুষের বড় পোঁড়া, ঐ প্রকার সুচোয়ার পুরুষ সে দেখতে বড় ভালবাসে—তার সজাবই ঐ—তার পর যা বসেছিলেম—রস্তমের শীকার্তিকের মত শীছাঁদ দেখে নূরমহলের চোক টাটিয়ে উঠল, সচিব-কত্থা তারে বরাবর এক-নজরে দেখতে লাগলেন, আমার মা সেই সর্বনাশী ডান—এসকল কথ্যে ভারি পটু, সেই তারে সুন্দে কোরে নূরমহলের খাস কাম-রায় লয়ে যায়। দুদিন পাঁচ দিন যাতায়াত কোরে রস্তমের কমিক বুক বেড়ে গেল, শেষে সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন তাঁর ঘরে গতিবিধি কোন্তে লাগল। এক দিন অসাবধান হোয়ে নূরমহলের সঙ্গে গলা ঝড়াজড়ি কোরে শুয়ে আছে, এমন সময় কলমবেগ গিয়ে ধোরে ফেলে।

আমি বল্লম, “গুচার! তুমি বলে বটে কিন্তু কথাগুলি অসম্ভব জ্ঞান হোচ্ছে, কলমবেগ কি কোরে অন্তঃপুরে প্রবেশ কালে?”

পরামর্শিক। ওং, বটে বটে! আমার বলতে একটু কঠিন হয়েচে—এ ঘটনাটি একটা বাগানে হয়, নজফালী মাকে মাঝে সেই বাগানে যেতন, দুদিন দশ দিন সেখানে বাসও কোন্তেন। বাগানে গিয়ে শীকারের আমোদ কোরে বেড়াওন। একদিন রস্তম বোলে, ‘আজ আমি শীকার কোন্তে সঙ্গে যাব না, তার চেয়ে অল্প কোন আমোদ লয়ে বাগানে থাকব।’ কলমবেগ সেনাপতির একজন অঙ্গুত ব্যক্তি, অলদাস বলেই হয়, খায় দার থাকে, আর ফাই ফরমাস খাটে, সে ঐ কথা শুনে তার মনে কিছু সন্দেহ হল, সেও সে দিন শীকারে গেল না। কলমবেগ সেই চুপে চুপে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ কোরে যে কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কোলে, তাতে আর তার মনে কোন সন্দেহ রইল না, সে বুঝতে পালে যে, সেনাপতির কত্থার মহলে রস্তম এই পদে দাঁড়িয়েছেন। নূরমহল কলমবেগকে দেখতে পেয়ে কতক ভয়ে, কতক রাগে চীৎকার শব্দে চোঁচাতে লাগলেন। আমি

সেই সময় ডেরার পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াছি। বড়ী আমারে দেখে কত হল, কত বাহানা কোন্তে লাগল, অর্থাৎ কোন মতে তাঁবুর কাছে না যাই, তফাতে তফাতে থাকি, এইটি তার মানস। তার কথার আভাসে বুঝতে পাল্লেন, এর মধ্যে একটা কোন ভারি কাণ্ড আছেই আছে, আমি আরো ডেরা বেঁসে বেঁসে বেড়াতে লাগলুম। নূরমহল আর রস্তম বলছে, ‘তুমি একথা প্রকাশ করো না, তোমাকে এত টাকা দেব, তুমি যদি কারেও বল, তোমার এ দিব্যি মে দিব্যি—’আবার কলমবেগ বসেছিল, ‘না, আমি কারেও বলবো না, আমি দিব্যি কোছি, ও কথা প্রকাশ হবে না, কিন্তু আমাকে এত টাকা দিতে হবে, তা না দিলে প্রকাশ কোরে দেবো—’এইরূপ উভয় পক্ষে টাকা দেবার নেবার, আর কিরে দিব্যির কথা হোচ্ছিল, আমি বার থেকে সব শুন্তে গেলুম। এসকল কথা শুনে কি ঘটেছে, তা কি আর বুঝতে বাকী থাকে? ‘ওং হো, তবে এই পেলাই বটে’—মনে মনে ঐ কথা বলে আমি ঝড়ি ঝড়ি সেখানে থেকে সোরে পোড়লুম, যা জানলুম, যা শুন্লুম, মনে মনেই রইল, কারও কাছে সে কথা প্রসঙ্গও কোয়েম না।

আমি বল্লম, “আহা! এ কথা আমার দুদিন আগে কেন বলে না?”

পরামর্শিক। কেন ধখাবতার! আমি আপনাকে সে কথা বলতাম, তবে আপনি না বলেন, ‘আমি নূরমহলকে বিবাহও কোন্তে চাইনে, না তার এককালে আখের খেয়ে দিতে চাই, তাও চাইনে।’ তাই না আমি চুপ কোরে ছিলুম। যৎকালীন আগরার সেই বিবিটি পালিয়ে যান, আমার মাকে ধোরে অনেক মারপিট করাতে সে শেষে রস্তমের নাম করে। পূর্বে নূরমহল তার সঙ্গে গোড়েপিটে ঠিক কোরে রেখেছিল যে, ‘তুই রস্তমের নাম করিস, কিন্তু হঠাৎ না,—অনেক ধস্তাধতি কোলে তবে তুই তার নাম করিস।’ আমার মা, আর তার স্বামিনী নূরমহল—এরা দুটি ধর্মের বাদশা, তারা জানত যে, রস্তমের নাম কোলেই কলমবেগ সেই সঙ্গে জোড়িয়ে

পোড়বে। কলমবেগ ঢাকা ততো, না দিলে  
 এর দেখাতো যে, নূরমহলের অসং চরিত্রের  
 কথা সেনাপতির কাণে তুলে দেবে।  
 তাদের মনে মনে সেই রাগ ছিল, কলমবেগকে  
 কিসে জব্দ করবে, তারা শুধু সেই  
 ভাগ্যবাণ্ দেখে বেড়াচ্ছিল, সেই সঙ্গে যে  
 রক্তমুকোও গোঁথে ফেলবে, সেটাও তাদের মতলব  
 ছিল। পীরিত বাসি হোলে তেমন আমোদ  
 হয় না—ইদানিং রক্তমের প্রতি নূরমহলের  
 অকুচি জন্মেছিল। ধর্ষাবতার, আপনি ত সকল  
 বা শুনলেন, আপনার বড় চোরের কপালই,  
 এই নূরমহলের হাত থেকে বেঁচে গেছেন, সে  
 নেক পাক চক কোরেছিল, কিন্তু আপ  
 নাকে বাগাতে পারেন না—তাই বলছিলাম  
 তাদের একটা মতলব সিদ্ধ হয় নি, আপনি  
 বাবান, খুব চোর, তার এ কথা  
 বন্ধ হয়ে বড়সিতে ধরা  
 মনে খুশী হলেন তো ?

পরামানিক ত তত বড় বু  
 জানই ছিল না, কিন্তু অ কথা  
 কনুত না, কি জেনে জানাত যে, সে তা জানে  
 না। যাই হোক, যদি কেউ এক লংঘার নিমি  
 ত্তও আমার মনে থেকে সেই পাপ কথাটি  
 মূলিয়ে দিতে পারতো, আমি তারে একটি রাজ্য  
 দ্বয়েও সন্তুষ্ট হোতাম না। পরামানিকের ঐ  
 সকল কথা শুনে মৌন হয়ে রইলেন, আর  
 কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না কোরে নিঃশব্দে পথ  
 চললই আমাদের ডেরা পোড়ল। ছাউনিতে  
 গিয়ে শুনলেন, নজফালী ইয়াসমিনকে আগে  
 ডেকে পাঠান, তার আস্তে বিলম্ব দেখে  
 আমাকে ডেকেছেন। আমি গিয়ে বাইরের  
 ঘরে প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি, তার পর  
 সেনাপতি ডেকে পাঠালেন। আমার বলেন,  
 “সাদক ! এই পুলিশটি অমুক কেল্লাদারের  
 হাতে তোমাকে স্বয়ং গিয়ে দিতে হবে, এতে  
 বড় জরুরি খবর আছে, আগে মনে কোরে  
 ছিলেন, ইয়াসমিনকে পাঠাব, তাকে ডেকেও  
 পাঠাব হয়, শুনলেন, সে আজও আপনার কর্ণে  
 বসে নি, তাই ভূমি ভিন্ন আর কারও হাতে এ  
 কাগজগুলি বিশ্বাস কোয়ে দিতে পারি নে।

কাল প্রাতেই তোমাকে রওনা হতে হবে, সঙ্গে  
 এক কাফেলা সোয়ার যাবে, সন্ধ্যা না হতেই  
 জবাব লয়ে ফিরে আসতে চাও।” “যে আজ্ঞা”  
 বলে পুলিশটি হাতে কোরে লগলম। পুলিশ  
 নাটি কিংখাপে মোড়া, যে ডুরীতে বাধা ছিল,  
 তার উপর একটি রহৎ শিলমোহর রয়েছে,  
 তাতে নজফালীর এই উপাধি লেখা ছিল,  
 “হুজুর প্রতাপবান্ মহামহান্ নজফালী খাঁ  
 বাহাদুর।” আরম্ভের পথে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
 রাজা রাজড়া আর তাদের কেল্লাদার, জায়গির-  
 দার, এই সকল লোকের সঙ্গে ভাবপ্রণয়  
 কোরে কোতে চললেন, সে খবর আমি আল-  
 রূপ অনুভব, সেই জন্তে এ কিসের পুলিশ, কি,  
 রক্তান্ত, সে বিষয় খেরাল না কোরে তাড়াতাড়ি  
 সোয়ার হলেন, সঙ্গে ও জন সোয়ার ছিল,  
 আর ইয়াকুব ন ম এ টিনীচের পায়ার কার-  
 পরদাঙ্গ আমার সঙ্গে চলেন। ইয়াকুবের সঙ্গে  
 আমার পক্ষ তে প্রীতপ্রণয় ছিল। পাছে  
 অসম্ম। এই জন্তে সোয়ারেরা পাশাপাশি  
 হলে। যে ঘোঁসে যেতে লাগল, তাই  
 দেবের দ্বায়যপিক কোন কথাবাত্তা কহিতে,  
 কি যে। রাজি রাজকীয় শঠতাচক্রে লিপ্ত  
 আছেন। দের নাম কোরে আমাদের সাহস  
 হল না, ভয় ভয়, কি জানি, যদি তারা শুনতে  
 পায়। একটি পীছে সানাহার কোরে  
 বিশ্রাম কোলেন, তার পর ইয়াকুব মুখ খুলে  
 দিলেন—তিনি বলেন, “মহাশয় ! রাজপুত্রের  
 অভিপ্রায়টি কি বলতে পারেন ? সম্প্রতি যে  
 রাজত্ব পেয়েছেন, তাতেই কি তিনি সন্তুষ্ট হয়ে  
 শান্তভাবে থাকবেন ? না তঁার ঐ শান্তমূর্তি  
 কেবল ছলনার প্রবাহ ?”

আমি বলেন, “প্রতারণা যে, তার সন্দেহ  
 নেই, আমার বোধ হয়, সে কথা সকলেই  
 জেনেছে, কিন্তু রাজপুত্রের কোন কথা লয়ে  
 আমাদের আন্দোলন কব্বার আকলক নেই,  
 শেষ বিপদ ঘটলেও ঘটতে পারে।”

ইয়াকুব। আপনি ঠিক কথা বলেছেন—  
 আমার কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে—  
 নজফালীর কথা যে, ছাউনি থেকে চলে গেল,  
 কেন ? কি অভিপ্রায়ে গেল ?

আমি বল্লম, “তাদের কখন কি অস্তিত্ব প্রায় হয়, তারা কখন কি করে, তা আমি কি কোরে জানব? আমার সাধ্য কি যে, তা জানি, তবে আমি এইমাত্র বলতে পারি, তারা কিরে গিয়ে ভাল কোরেছে, তারা যে সঙ্গে এসেছিল, সেই-টিই আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে—তাদের না আসাই উচিত ছিল।”

ইয়াকুব। এতদূর সঙ্গে কোরে এনে, নজ-ফালী যে পুনরায় তাদের কিরে যেতে বল্লেন, আমার মনে সেইটিই বড় সন্দেহ হচ্ছে।

বর্ষারন্ত হয়ে অবধি আজ কেবল প্রথম সূর্য্যের মুখ দেখা গেল, রৌদ্রের এত তেজ, যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে জান হোতে লাগল, গ্রীষ্ম অসহ হয়ে উঠল। একে পাষণফাটা রোদ্দ, তার আবার কাল ভালরূপ নিদ্রা হয় নি, ভামাম রাত ছট্‌ফট কোরেছি, আমি আর চলতে না পেয়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌছে আড্ডা কোল্লেম, ভাবল্লেম, এখানে একটু আরাম কোরে ঠাণ্ডা হতে পারলে শরীর অনেক সুস্থ হবে। কিন্তু সিটি আমার বেঞ্চবার ভুল, যেমন শীত, তেমনি কম্প, আবার তেমনি উত্তাপ হয়ে ভারি জ্বর হল, কেলা পর্য্যন্ত পৌছি। এমন শক্তি নাই, ভারি কাবু হয়ে পোড়ল্লেম। পিপাসায় ছাতি কেটে যেতে লাগল, তৃষ্ণা পুরে জল খেতে পারি নে, পেটে এক ধার জল তলায় না, অমনি বমি হয়ে পড়ে, থেকে থেকে কঁপে কঁপে উঠছিলাম, রোদ্দে যেন বাঘ দেখতে লাগল্লেম। শিরঃপীড়ায় অস্থির হল্লম—এই উৎপাতে পোড়ে ইয়াকুবকে ডাকল্লম। পুলিশ্‌দাটি তার হাতে দিয়ে বল্লম, “তুমি এই পুলিশ্‌দাটি লয়ে কেলাদারকে পৌছে দাও, শীঘ্র যাও, বিলম্ব করো না, কেবল দুজন মাত্র সোয়ার আমার কাছে থাকবে, বাকী তোমার সঙ্গে যাবে।” ইয়াকুব এই সম্মানের ভারটি পেয়ে সৌভাগ্য মানলেন, এক্ষণটি তাঁর জাথার বিষয়—তিনি তখনই রওনা হয়ে গেলেন। সলিমান সঙ্গেই ছিলো, সে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা কোত্তে লাগল। অনেক কষ্টে একখানি পুরাতন পাল্কি, আর জন কয়েক বেহারী এনে উপস্থিত কোল্লেন। তারা সাবধান হোয়ে, অতি ধীরে

ধীরে আমাদের ছাউনির দিকে লয়ে চল্লো। ছাউনির এ দিকে ১২ কোশ তফাতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একজন বিচক্ষণ হাকিম ছিলেন, ইয়াকুবের ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানেই থাকব স্থির কোল্লম। পাল্কির ঝাঁকানিতে ভারি কষ্ট হল আমার অবস্থা আরো মন্দ হয়ে পোড়ল। গ্রামে পৌছে হাকিম দেখে বল্লেন, আমি নিদান শকটাপন্ন, মুহূঁহু ঔষধ পত্র আর সেবা-শুশ্রূষার আবশ্যক। আমার তখন জ্ঞান চৈতন্য নেই, কখন দত্ত কড়মড় কোছি, কখন জিব বার কোছি, কখন সোরে সোরে পাশুলার এসে পোড়ছি, আর জল দে, জল দে কোছি। কখন দেবচক্ষু কোরে চোক দুটো কপালে তুলছি, কখন বা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছি, আর ক্রমাগত প্রলাপ বলছি, ঐ প্রলাপের মুখে কেবল দেলজান আর নূরমহলের নাম কোছি, সে সময় তারাই আমার অন্তর গ্রাস কোরে রেখেছিল। মাঝে মাঝে অতিভূত হোছি, আর ঘন ঘন মোহ যাছি। হাকিম দেখে শুনে অবাক, তিনি বল্লেন, “এ কি আশ্চর্য্য!” ইয়াকুবের সোম্মারেরা যে দিন ফিরে এলো, তখন আমার জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু আচ্ছন্ন হোয়ে আছি। আমি বল্লম, “ইয়াকুবকে একবার আমার কাছে আসতে বল।” তারা বল্লেন, “কেলাদার তাঁকে কয়েদ কোরে রেখেছে।” কেলাদার সোম্মারের হাতে পুলিশ্‌দার জবাবও লিখে পাঠায়নি—“ইয়াকুবকে কয়েদ কোরেছে,” ঐ কথা শুনে যেমন না বিদ্রোহ চম্কে, তেমনি যেন আমার মনে নিগূঢ় অভিসন্ধিটি দপ্‌ কোরে জ্বলে উঠল—আমি বল্লম, “ওঃ! বোকা গেছে, ভারি কারসাজি খেলেছে! নজফালী আমাকে প্রতারণা কোরেছে, তার অভিপ্রায় ছিল, আমাকে কয়েদ করে, দৈবাৎ অসুস্থ হয়ে পোড়ল্লম, তাই বেঁচে গেছি, দুর্ভাগ্য ইয়াকুবকে আমার ভোগ-ভোগ ভুগতে হল। মনে মনে অনেক আঁচাআঁচি কোরে শেষ এই স্থির কোল্লম, রাজসংক্রান্ত চিঠি পাঠান কেবল একটা অছিলো—যাত্র, ফলে সেটা সর্ব্বৈব মিথ্যা—আসল কথা এই, কেলাদারকে একটা ছকুম লিখে পাঠান

হয় যে, এই পত্রবাহককে ধোরে কয়েক রাখবে, পত্রবাহক আর কে? সে তো আমিই! তবে যে জন্তে আমি পত্র লয়ে যায় নি, সে কথা ত লম্বাই হয়েছে। ঐ বিষয় মনে মনে আন্দোলন কোত্তে কোত্তে বঠাৎ মনে উদয় হল, হয় ত আমাকে খুন কোরে ফেলবারই হুকুম দিছিল—দুর্ভাগ্য অমনি শিউরে উঠল, ভাবলেম, তবে ইয়াকুবের অদৃষ্টে কি প্রমাদই ঘটেছে না জানি, সে ত কিছুই জানে না, কোন খবরই রাখে না, একে তো আমি পীড়িত, না শরীরই ভাল আছে, না মনই সুস্থ হয়েছে, তার উপর আবার এই ধোর অসুখ উপস্থিত, আমি মৃতপ্রায় হলেম। অনেক ভেবে চিন্তে লেখবার সরঞ্জাম আনতে বোলেম, কেল্লাদারকে আত্মপূর্বিক সব বস্তান্ত লে লিখে দিলেম যে, এই এই কারণে আমি শাপনি না গিয়ে ইয়াকুবের হাতে দিয়ে ঐ তুলিন্দা পাঠান হয়েছে, আর বিশ্বর বিনয় কোরে বল্লেম, যে পর্যন্ত নজফালীর নিকট ঐটনি দ্বিতীয় হুকুম না পান, সে পর্যন্ত তাঁর দ্বন্দ্বী ইয়াকুবের উপর কোন অত্যাহিত না করেন। এই কথা কটি লিখতে লিখতে আমার সদশরীর ঘুস্তে লাগল, অমনি তাকিয়ার উপর মাথা রেখে শুয়ে পোড়লেম, তখন এমনি জ্ঞান হল যে, এইবার বুঝি মলেম, আর বাঁচলেম না, তখনও আমি এত ক্লিণ, এত দুর্বল। শেষে যো যা কোরে আঁচড়ে পাঁচড়ে কোন রকমে পত্র-গনি সমাপ্ত কোলেম, চিঠিখানি একটি সোয়া-রের হাতে দিয়ে তখনি রওনা কোরে দিলেম। আর হওয়াবধি আমার কাছে যে দুজন সোয়ার অষ্ট প্রহর হাজির থাকত, তাদেরই একজনকে পাঠালেম, তারে বল্লেম, “দৌড়ে যা, শীঘ্র শীঘ্র কবাব লয়ে আয়, বকসিস পাবি।” মুখের কথা বলতে না বলতে সে পত্র লয়ে তখনি দৌড়ল। একে জ্বরের কষ্ট, তার উপর আবার ইয়াকুবের জন্তে দুর্ভাবনা, পত্র রওনা কোরে দিয়েই আমার মোহ হলো, মুর্ছিত হয়ে পোড়লেম, যদিও বা একটু পরে সে অবস্থা কেটে গেল, কিন্তু আবার জ্বর, আবার উন্মাদের মতন বিহ্বল বলতে লাগলেম, হাকিম এসে সলিমানকে তিরস্কার কোত্তে লাগলেন যে, কেন সে লেখ-

বার সরঞ্জাম এনে দিলে, কেন সে নিষেধ না কোল্লেন, শেষে তিনি আফিম-খটিত ঔষধ ব্যবস্থা কোল্লেন, তাতে আরো উল্টট ক্রী হয়ে দাঁড়াল—শরীর গরম হয়ে গেল, ঘুম হল না, প্রকৃত উন্মাদের জ্বায় প্রায় তামাম রাত ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগলেম, আমাকে ধোরে নিরস্ত কোরে রাখতে অনেক লোকের দরকার হয়েছিল। হাত বাগড়া বাগড়ি আর লাফালাফি দাপাপাপি কোত্তে কোত্তে শেষে ক্লান্ত হয়ে পোড়লেম, ক্রমে ক্রমে নির্জীবপ্রায় হয়ে অবশেষে নিজায় অভিভূত হোলেম, বিন্দ্রা থেকে উঠেই জিজ্ঞাসা কোলেম, “কেমন, সোয়ার কিরে এয়েছে কি?” সলিমান বলে, “আজ্ঞা এসেছে।” ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হল, আমার পত্রখানি তার হাতে আছে দেখতে পেলেম, কেল্লাদার তা গ্রহণ করেন নি। আমি একটি নিশ্বাস ফেলে বল্লেম, “আহা! ইয়াকুবের কি দুর্ভাগ্য!” সোয়ারকে জিজ্ঞাসা কোলেম, “ইয়াকুবের কোন কথা সেখানে শুনে পেয়েছো কি?”

“কেল্লার সদর ফটকে যে সোয়ার থাকে, সে বলে যে, তিনি—” এই পর্যন্ত বলেই সোয়ার চুপ কোলে।

আমি অমনি বলে উঠলেম, “কি বলতে চাস, বল, আর আমার যন্ত্রণা বাড়াসনে।”

সোয়ার। আজ্ঞা, তাঁরে খুন কোরেছে।

ঐ কথা শুনে চীৎকার শব্দ কোরে বোলেম, “কি! তারে খুন কোরেছে! তবে তারা ডাকাত! তারা খুন! অতি নিষ্ঠুর তারা! তাদের শরীরে দয়ামায়া নেই।” রাজপুত্রকে এ বিষয় জানাতে হবে, তারা তয়ের হ, আজিই তাঁর ছাউনিতে চোলে যাব, পীড়িত আছি আছি, তথাচ আজ সেখানে যেতেই হবে, কুমার বাহাদুরকে এ কথা না বলে জলগ্রহণ কোরব না। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মুক্তকণ্ঠে বলব, ধর্ম-অবতার, বিচার কোত্তে হবে—আ! ইয়াকুব! আ! ইয়াকুব! তোমার কি দুর্ভাগ্য! এরূপ দুর্জয় প্রতারণা-কাণ্ডে পোড়ে তুমি যে মারা যাবে, এ কথা কেউ স্বপ্নেও জান্ত না।” হাকিম বিজ্ঞর বোঝাতে লাগল যে, “আর তুদিশ-

কাল থেকে যাও, তা হলে সুন্দররূপে আরোগ্য হতে পারবে, নচেৎ এখনও ভয় আছে—পুনরায় পীড়িত হোলেও হতে পারো, তখন কিন্তু আরও ভয়ানক হবে।” তাঁর কথা শুনলেম না। ভাবলেম, কপাল টুঁকে ত বেরিয়ে পড়ি, তার পর যা থাকে অদৃষ্টে হবে, বিপদ সম্পদ সকলই বিধাতার হাত। এই ভেবে কোমর বাধলেম, আমার ধরাধরি কোরে পাল্কিতে তুলে দিলে, সোয়ারেরা সঙ্গেসঙ্গে চলো।—সূর্য উদয় না হতে না হতে ছাউনিতে পৌঁছিলেম। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াই, এমন শক্তি নেই, শরীর টোলে টোলে পোড়ছে, বেহারাদের বোলেম, “তোরা আমার ধরাধরি কোরে রাজপুত্রের তাঁবুর মধ্যে নিয়ে চল।” তখন অসময়, বিস্তর অল্পনয় বিনয় কোত্তে কোত্তে পাহারাওয়ালারা আমার ভিতরে যেতে অনুমতি কোলে। চোক মুখ বসে গেছে, যেন মড়ার মতন হয়ে গেছি, শরীর পাকপেয়ে, গেছে, কঠোর হাড় বেরিয়ে পোড়ছে, অস্থিচঞ্চ সার হয়েছে, এত দুর্বল যে, কথা কহিতে পাচ্ছি নে, কেবল চিঁচিঁ কোচ্ছি। রাজপুত্র আমার সেই বেশী চেহারা দেখে চমকে উঠলেন। আমি হামাগুড়ি দিতে দিতে তাঁর পায়ের উপর গিয়ে পোড়লেম, পোষাকের দামান চুখন কোরে অসীম বীরপরাক্রম রাজকুমারকে বল্লম, “কুমার বাহাদুর! আমি বিচার চাই। যাঁর অপার প্রসাদ বলে আপনি জীবনধারণ কোচ্ছেন, যাঁর অপারমেয় রূপা, অলঙ্কিত করুণা, আর অসাধারণ দয়ার আধার হয়ে সর্বপ্রকার কুশল প্রত্যাশা করেন, সেই করুণা-নিধান জগৎপাতার দোহাই, আপনি বিচার করুন।”

রাজকুমার বল্লেন, “আমরা তোমাকে অনুমতি কোচ্ছি, তোমার কি নালিশ আছে, বল।”

“খুন!! খুন!! হক না হক খুন!! অতি নিষ্ঠুর, অতি ঘৃণেয় খুন!!” আমি মরেফুটে এই কটি কথা চোঁচিয়ে বোলে সেই পরিশ্রমে নিজীবপ্রায় হলেম। রাজপুত্র চমকে গেলেন, বল্লেন, “আরো যদি কোন কথা থাকে, বল।” নজফালীর উপর হত্যাপনাদের দাবি দিয়ে তার প্রতারণার যত্নস্ত আহুর্পূর্বক সব বল্লেন,

রাজকুমার শুনে অতিশয় দুঃখিত হয়ে বল্লেন, “আলার দোহাই, নজফালী খীয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম কোরেছে। তা যা হোক, সাদক! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—নজফালী তোমার প্রাণবধ কোত্তে উদ্যত হয়েছে কেন?”

“আমি বল্লম, “কুমার বাহাদুর! আমি তা বলতে পারিনে, তবে আমার অপরাধের মধ্যে এই, আমি সরকারের নিতান্ত অমুগত, অষ্টপ্রহর আমার কর্মে হাজির থাকি, ধর্মাবতার! তা ছাড়া আর ত কোন ক্রটি দেখিনে।”

আরদগ্গেব বল্লেন, “তুমি বেলা ডুই প্রহরের সময় হাজির থেকো, নজফালী কেন এমন কুকাঙ্ক কোলেন, তাঁকে একথার জবাব কোত্তে হবে, তোমাকে নিশ্চয়ই বোল্চি, তাঁকে একথার জবাব কোত্তেই হবে। আমি অনুমতি কোচ্ছি, এখন তুমি বিদায় হও।”

আমি পুনরায় রাজকুমারের বঙ্গের কিনারা ধোরে চুখন কোরে বিদায় হোলেম, ফিরে আসবার সময় বৃকের উপর হাত বেঁধে নৃপকুমারের প্রতি অগাধ ভক্তি প্রদর্শন কোলেম।

নজফালী মনে কোরেছিলেন, আমি তাঁর কোশলনিশ্চিত যত্নাফাদে ধরা পোড়ছি, আমার এখন দেখতে পেয়ে তাঁর চক্ষুর হল, বল-বুদ্ধি সব ঘুরে গেল, ভাবলেন, একি ব্যাপার! এ আবার কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল! কি কোরেই বা বেঁচে এলো! রাজপুত্র সাহস্কারে জিজ্ঞাসা কোলেন, “নজফালী, তুমি এমন কুকাঙ্ক কেন কোলে? তোমাকে জবাবদিহি কোত্তে হবে।” দাস্তিক নজফালী রাজপুত্রের মুখে ঐ কথা শুনে ক্ষণেককাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শেষে বল্লেন, “বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে প্রাণবধ কি উচিত দণ্ড নয়?”

রাজপুত্র বল্লেন, “আচ্ছা, আমি তোমার ও কথা মান্লেম, কিন্তু প্রথমতঃ সে বিশ্বাস-ঘাতী কি না, তার প্রমাণ আমি চাই। দ্বিতীয়তঃ যত্নার পরোয়ানায় আমার দস্তখতের প্রয়োজন, সে বিষয় তুমি উদাস্য কোরেছ, কিন্তু নজফালী! আমি তোমায় অবধারিত বল্ছি, কেহা-দার যদি ইয়াজুবের প্রাণসংহার কোরে থাকে,

তবে তার নিস্তার নেই, তুমি হুকুম দিয়েছ বলে এ অপরাধ থেকে সে অব্যাহতি পাবে না।”

নজফালী বলেন, “আমি যে হুকুম দিইছি, তারই বা প্রমাণ কি? কেলাদার কিছু আপনার এলাকার মধ্যে নয়, সে সত্ৰাটের অধীন, অথবা আপনার রাজস্বাভা দারার অধীন বলেও বলা যায়, সে সমানই কথা।”

নজফালীর মুখে ঐ সগর্ষ ব্যক্তোক্তি শুনে আরঙ্গজেবের সর্বশরীরে যেন দাবানল জ্বলে দিলে। রাজকুমার ক্রোধে ঘেরাপ ভয়ঙ্কর কাল-মুষ্টি হলেন, আমার সাধা কি যে, সে করাল আকৃতির প্রতিরূপ চিত্র কোরে পাঠকের কোঁঠে তুলি করি—রাগে তাঁর দাড়ি পণ্যস্ত কঁপে উঠল, মুখাবয়বে কত প্রকারই বিকটভঙ্গীর উদয়ান্ত দেখতে পেলেন। দাঁতে দাঁতে কড়-মড় শব্দ হতে লাগল, বক্ষঃস্থল ফুলে ফুলে উচু হয়ে হয়ে উঠতে লাগল, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ঝলকে ঝলকে যেন অগ্নি নির্গত হতে লাগল, ঠোঁট দুটি ধ্বংসকোরে কাঁপতে লাগল। নজফালীর এখন জ্ঞান হল যে, তাঁর নামা অতিক্রম করা ভাল কাজ হয় নি, তিনি দেখলেন, একটি মহাপ্রলয় নিকটাগত, তাই দেখে ভয়ে কঁকড় হয়ে পোড়লেন, মুখ-চক সেমাই হয়ে গেল। আরঙ্গজেব সিংহের জায় গজিয়ে বলেন, “কি! সে আমার অধিকারের ব্যাপ? সে আমার অধীন নয়? দোহাই আমার। এত আশঙ্কা, এত অহঙ্কার বরদাস্ত করা যায় না। আচ্ছা, কেন্ বাক্তি বলে, কেলাদার আমার এলাকার মধ্যে নয়? কে সে বাক্তি? তারে দেখিয়ে দাও। নজফালী! আমি দেখছি, তুমিই তার কালের স্বরূপ হলে, তুমিই তার মাথা খেয়ে দিলে, আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, কেলাদার যদি বালক ইয়াকুবকে সচ্ছন্দপ্রাণে হাঙ্গির না করে, তবে আমি তার শির না লয়ে কখনই ক্ষান্ত হব না, তার মস্তক ছেদ না কোরে কখনই নিশ্চিন্ত থাকব না। রে মদগর্ষিত দাস্তিক! শোন, আমি তোরে সংকথাই বলছি, তোরে আপনার মস্তকের উপরেও দৃষ্টি রাখিস, তুমি মনে কোরেছিল, তোরে ও মাথা, কাণের উপর শক্ত হয়ে বসে আছে, তা যাবার

নয়, সে তোরে ভ্রম, কলে তা নয়।” নজফালী উত্তর কোরবেন, তারই উপক্রম কোরেছেন, আরঙ্গজেব তাই দেখে বলতে লাগলেন, “চূপ, চূপ, যে জবান আমাকে বারবার বিরক্ত, বারবার অসন্তুষ্ট কোরেছে—কের যদি তুমি কথা কস, তবে আর তাকে পুনরায় বিরক্ত কোত্তে দেবো না। আল্লাকরীম! তুমি কি জানিস্‌নে—আমি কে?”

নজফালী দেখলেন, এখন কথা কইতে গেলে খাটমি করা হয়, তাতে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। তা না কোরে বুকের উপর হাত বেঁধে বলেন, “শ্রীপন্থন” আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন। আমি মনে কোরেছিলাম যেখানে জজুরের জীবন শক্তটা পন্ন, এমন স্থলে আমার ততদূর ক্ষমতা জারি করবার অধিকার আছে, তাতেই আমি স্বাধীন হয়ে চলেছি, দোহাই ধর্মাবতার! তা ভিন্ন আমার অন্য কোন মতলব ছিল না।”

আরঙ্গজেব বলেন, “আমার জীবনের কি আশঙ্কা, তা শুন্তে চাই। সাদকের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে ত বল। আমি দেখতে পাচ্ছি, তার প্রাণের উপরই তোমার লক্ষ্য।”

নজফালী। ধর্মাবতার! আমাদের কুচ বরুবার পূর্বে এই সাদক সকলকে ছাপিয়ে ছাপিয়ে স্থলতান স্রজার লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরেছে, আগরার অনেকের সঙ্গে গোপনে গোপনে চিঠিপত্রও লেখা লেখি হয়, সে সকল লোক যে আপনার মিত্র নয়, শত্রু,—সে তা বেশ অবগত আছে। সম্প্রতি একটা চক্র কোরেছে, আমার একজন ইতার চাকর, তার জয় কর্থের ঠিকানা নেই সেই নাকি তার যোজকতা কোচ্ছে শুনলেন, তার নাম লুচার। প্রতিদিন যখন কুচ আরম্ভ হয়, ঐ বাক্তি লিট-পিট কোরে চোলে, সকলের পেছনে থাকে, সাদক তার সঙ্গে শেষে গিয়ে যোটে—তুমি জনে একত্র হয়ে আপনাদের বতলব পাকায়, ফৌজেরা তার কিছুই জানে না। জজুরের বিরুদ্ধে যে ঘোর আততায়ীর চক্র হয়েছে, লুচার একজন তার কারিন্দা, আমার অভি-প্রায় ছিল, সোয়ারেরা কেলাদারের জবাব লয়ে ফিরে আসলে, ঐ লুচারকে জবরদাস্ত মার-

পিট কোরে তার কাছ থেকে বেরূপ যা হয়েছে, সেই সকল কথা বার কোরে লয়ে, আর তাদের সেই রাজদ্রোহিতা সমূলে উচ্ছেদ কোরে দিয়ে, সেই সকল রক্তান্ত আত্মপূর্বিক হজুরের নিকট লিখে পেশ কোন্তেম ।

আমার প্রতিবাদী এই পর্য্যন্ত বলে চূপ কোলেন । কতক মিথ্যা, কতক সত্যের সূত্র দিয়ে এরূপ অপূর্ব কৌশলের অপবাদ প্রস্তুত কোন্তে আমি জন্মেও কখন শুনিমি । আমি একজন চাকরকে গোরে দাঁড়িয়ে আছি, রাজকুমার আমার দিকে ফিরে চেয়ে দেখতে লাগলেন, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগলেম— “ধর্ম্মাবতার ! আপনি আমার প্রভু, আর রাজ্যও বটেন, আপনি যা শুনলেন, সর্ব্বৈব মিথ্যা, পরমেশ্বর মাধার উপর আছেন, যদি মিথ্যা বলি—আমার কোন দোষ নাই, আমি নিরীহ নিরপরাধী, কি কথায়, কি কার্য্যে, কি মননে আমি কখন হজুরের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করি নি । তেমন অকৃতজ্ঞ,—অকৃতজ্ঞ কেন, তেমন উন্মাদ আমি কখনই নই—মনে করুন, আমি একজন সামান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমি যে রাজ্যবিরুদ্ধে একটা চক্র কোরে সুসিদ্ধ কোরে তুলব, তার সম্ভাবনা কি ? ধর্ম্মাবতার ! একটা পিপড়ে কি কখন সিংহের অনিষ্ট কোন্তে পারে ? তাও কি সম্ভব হয় ? তবে আমি যে অতি অকিঞ্চিৎকর সামান্ত প্রাণী হয়ে হজুরের বিরুদ্ধে চক্র কোরব, এ কথা কি কখন বিশ্বাস হয় ? আমার প্রাণে কি ভয় নেই ? আমি আমার প্রতিবাদীকে বলতে চাই যে, তিনি লুচারকে হাজির করুন, সে যদি—” নজফালী একটু ব্যঙ্গভাবে মুচ্কে হেসে বলেন, “হাঁ হাঁ, জানি জানি ।” রাজকুমার বলেন, “তারে এখনই হাজির করো ।”

নজফালীর বড় ইচ্ছা ছিল না যে, লুচার হাজির হয়, কিন্তু রাজকুমারও নাছোড় হলেন, কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না, তাঁর প্রতিজ্ঞা যে, তারে হাজির কোরবেন । লুচার পরামাণিক অষ্টমীর পাটার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল । আঙ্গুলমোড়া দিয়ে তারে অভ্যন্ত বহুশ্রী দেওয়া হয়েছিল, সেই ক্ষণে তার এক-

খামি হাত কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল । লুচার আমার দিকে চেয়ে ইশারায় জিজ্ঞাসা কোলে, ‘সংবাদ কি ?’ অর্থাৎ আমি কি বলেছি, তাই যেন শুনতে চায় ।

রাজকুমার বলেন, “ওরে কৃত্যাকা বাচ্ছা ! শোন, সাদক রাজদ্রোহিতার কাজ কোরেছে তুই তার কি জানিস বল, আমি তোরে এই হুকুম কোচ্ছি,” লুচার বলে, “হজুর ! গোলাম তার কিছুই জানে না ।”

নজফালী বলে, “তবে পথে যেতে যেতে সর্ব্বদা একত্র হয়ে কথাবার্তা কইতিস্ কেন ?”

পরামাণিক । ধর্ম্মাবতার ? সে সাদকে ইচ্ছা, আমি একজন সামান্ত দুঃখী লোক, তাঁর গোলাম বলেই হয়, তিনি আলাপ কোরে চাইলে আমি কি বলব, ‘না, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না ?’

“তোদের কি কথা হতো ?”

“হজুর ! অত্ৰ বিষয় নয়, কেবল আমার বৃদ্ধ মায়ের কথা বলতেম ।” আরজজেব বলেন “ছো ! তুই কি মনে কোরেছিস, তাঁর ঐ কথা আমরা বিশ্বাস করবো ?”

“আল্লার দোহাই, হজুর ! আমি সত্য কথা বলেছি—আমরা কেবল প্রীলোকদের কথা আর তাদের দৃষ্টিমির বিষয় লয়েই হস্তপরিহাতি কোন্তেম ।”

নজফালী মেথের তায় গর্জিয়ে বলেন “বজ্জাৎ ! পাজী ! আচ্ছা, কোন প্রীলোকে কথা বলাবলি কোতিস্, আর তারা কি দৃষ্টি কোরেছে ? তা বল ।”

পরামাণিক একটু চূপ কোরে থেকে, শেষে বলে, “ধর্ম্মাবতার ! আপনি যদি বলতে বলেন ত বলি । আমি কিছু খত লিখে দিই নি যে সে কথা গোপন রাখব । যা জানি, আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি, কারও মুখে শুনি নি ।”

রাজপুত্র বলেন, “আচ্ছা, কি বলতে চাও বল ।”

পাঠক বন্ধু ! আপনি বলে প্রত্যয় যাবেন না, লুচারের মুখ দিয়ে যে সকল কথা প্রকাশ হল, শুনে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল । রাজপুত্র আর স্বয়ং নজফালী—এই দুজনের সম্মুখে অস্ফা-



দেনে নরমহলের অসতীত্বপনার বিষয় আন্তো-পাস্ত সমুদায় যেন স্রোতের জায় বর্গে চলো, মুখে একটুও আট্‌কাল না, তত্তির রক্তম আর কলমবেগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জগে তার মাকে সহায় কোরে নরমহল যে ষষ্ঠতার চক্র করে, সে সকল কথাও প্রকাশ কোরে দিলে, শেষে বল্লে, “ধর্মাবতার ! সাদকের সঙ্গে এই সকল বিষয়ের কথাবার্তা হতো।” ছাউনির স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি যে কোন সংস্রব রাখ-তেন না, সেই জগে আমি তাঁকে কত প্রশংসা কোন্তেম।”

নজফালী রেপে লাল হয়ে ছুই চক্ষু কপালে তুলে বল্লেন, “তবে রে বজ্জাং ! হারামজাদা ! আমার কত্তার যে ছুর্নাম করে, তুঁরে আমি এই শাস্তি করি।”—এই বলে ছুটে গিয়ে, ছুই হাত দিয়ে লুচারের টুঁটি দেবে ধোলেন, চেপে মেরে কেলেন আর কি ! যাই প্রহরীরা পোড়ে ছারিয়ে দিলে, তাই রক্ষা পেল, তারা অনেক কষ্ট পেয়ে, বিস্তর টানা-ছেড়া কোরে নজফালীকে তফাৎ কোরে দিলে।

রাজপুত্র বল্লেন, “নজফালী ! আমার সম্মুখে তোমার এ প্রকার ধাষ্ট্যামি করা ভাল কাজ হয় নি, এত প্রশ্রয় চক্ষু দেখে সহ কখন করা যায় না। ও ব্যক্তি তোমার মানত সাক্ষী, ও বা বল্বে, ওর মুখ দিয়ে যে কথা বার হবে, তোমাকে তা যেনে লতে হবে—এখন আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর করো—সাদক যে বিশ্বাসঘাতক, সে যে অবিশ্বাসের কাজ কোরেছে, একথা তুমি কি তোমার কত্তার মুখে শুনো নি ? তুমি যে বল্ছো, সাদক রাজজোহের চক্র কোরেছে, এ ধবর তুমি কোথায় পেলো ? তোমার কত্তাই না তোমাকে বলেছে ?”

নজফালী বল্লেন, “আচ্ছা মান্লেম, আমার কত্তাই যেন বলেছে, কিন্তু সে কথা যে সত্য, মিথ্যা নয়, তার প্রতি সন্দেহ নেই, কেন না, কত্তার চাকরাণীও ত ঐ কথা বল্ছে।”

রাজকুমার বল্লেন, “তোমার যদি সন্দেহ না থাকে নাই, কিন্তু আমার মনে বিস্তর সন্দেহ আছে, তবে স্জ্জার কারপরদাজের সঙ্গে গোপনে

গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করা আর আগরায় পত্র-চালাচলি করা, এই দুইটি অপবাদ থেকে সাদক যদি মুক্ত হতে পারে, আমি তারে একেবারে অব্যাহতি দেবো।”

আমি নির্ভয় হয়ে বল্লেম, “এক লহমার জন্যে ইউসোফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু আমি তখন জানুতম না যে, সে কার পক্ষ, আমার সঙ্গে তার বান্ধবতা আছে, তাই বিদায়ের দেখা কোন্তে এসেছিলেন, আগরায়ই হোক, কি স্থানান্তরে হোক, আমি কখন কারেও চিঠিপত্র লিখে থাকি নে, সে কথা আমি অস্বীকার কোচ্ছি।” নজফালী বল্লেন, “আমাদের প্রথম কুচের পর যে গ্রামে ডেরা পড়ে, সেই গ্রাম থেকে কোন্ ব্যক্তিকে পালাকি কোরে চুপে চুপে আগরায় রওয়ানা কোরে দাও, তখন রাত্র অনেক, সকলে খেয়ে দেয়ে শুয়েছে—তুমি এ কথাও অস্বীকার করো বোধ হয় ?”

আমি নজফালীর প্রতি কটমট কোরে চেয়ে বল্লেম, “ধর্মাবতার ! সে ব্যক্তিকে এখানে কে এনেছিল ? আপনি কি আনেন নি ?” নজফালী বল্লেন, “না, আমি আনি নি।” আমি বল্লেম, “তবে তারা আপনার নাম কোরেছে, তাদেরই দোষ।” রাজপুত্রকে সম্বোধন কোরে বল্লেম, “হজুর, আপনি আমার মুনিব, আর রাজা ; আপনার সম্মুখে মিথ্যা বল্লে আমার পরকাল নষ্ট হবে। যে কথা আমার পরিবাদের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, সে কথা আমি প্রকাশ কোন্তে চাই না, তবে হজুরের কানে নাকি তুলে দেছে,—আমার তাঁবে বদমাস লোক আছে, আমি তাদের নিশীথ রাঙে চুপে চুপে সরিয়ে তফাত কোরে দিইছি, এই জন্যে আমাকে আদ্যোপাস্ত সকল কথা ভেঙ্গে বলতে হয়েছে, তা হলে হজুর বুঝতে পার্বরেন যে, কাকে পাঠিয়েছি, কে সে ব্যক্তি। ধর্মাবতার ! সে একটি স্ত্রীলোক, আমার বন্ধ ইউসোফের ভগ্নী, কোন ব্যক্তি তারে ধোরে বেঁধে, জোর জবরদস্তি কোরে এখানে এনেছিলেন, যিনি তারে এই নিগ্রহ করেন, তাঁর নাম করা আমার উচিত নয়, যে লোক তারে এখানে লয়ে আসে, তাদেরই মুখে তাঁর নাম শুনেছি,



আমিই সহায় হয়ে ঐ রাত্রে সেই ত্রীলোকটিকে পুনরায় আগরায় পাঠিয়ে দি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি এখন নির্ঝিয়ে সেখানে পৌঁছিয়েছেন। ধর্মাবতীর! এ ছাড়া আরো কিছু নিবেদন কোচ্ছি, অবধান করুন, আমি যে বিশ্বাসঘাতী নই, আমার যে সে অভিপ্রায়ই নয়, তাতে তা সপ্রমাণ হবে। আপনার রাজদ্রোহী সুলতান সুলতান পক্ষ গ্রহণ কোত্তে ইউসোফ আমায় বিস্তর অল্পরোধ করেন, আমি তাঁর ভয়গর প্রণয়াকাজী, আমার বন্ধু তা জানেন, ইউসোফ সেই প্রেলোভ দেখিয়ে বলেন, তুমি যদি সুলতান সুলতান পক্ষ হও, তবে আমি আর ভয়গর দেল-জান, আমরা রাজদ্রোহী তোমার কাছে হাজির থাকবো। আমি বল্লম, আমি যখন একবার শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি যে, আরদজ্জের উপাসনা কোরব, তাঁর অল্পগত হয়ে থাকবো, তখন তুমি সহস্র অল্পরোধ কোয়েও সে পক্ষ পরিত্যাগ কোত্তে পারবো না।” রাজপুত্রের মনে আর কোন সংশয় রইল না, আমি যা বল্লম, শুনে খুসী হলেন, আমারে সম্পূর্ণ বেহাই দিয়ে বলেন, “এর কোন অপরোধ নাই, আমি একে খালাস দিলেম।”

নজফালী সগর্ভস্বরে বলেন, “হুজুর! তবে আমাকেও অল্পমতি করুন, আমিও যাই।” রাজপুত্র বলেন, “হাঁ, আমি অল্পমতি কোচ্ছি, তুমিও যাও, কিন্তু না ডেকে পাঠালে তুমি আর আমার হৃদয়ে এসো না।”

এ বড় শক্ত চোট, তার অনুষ্টে যে এত আপমান ছিল, পাশা দান্তিক নজফালী তা স্বপ্নেও জানতে পারে নি—কেউই মনে করেনি যে, এতো পর্যাপ্ত হবে। সচিব স্পষ্টই বুঝতে পাল্লেন, তার উপর রাজপুত্রের আর সেরূপ প্রকা যত্ন নেই—তিনি এখন বিব-পুত্র সর্প হয়ে পোড়েছেন। তস্তির তিনি দেখ-লেন, লোকে তাঁকে স্বর্গজষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় জান কোচ্ছে, এই পতনেই অধঃপতন, আর তাঁকে উর্দ্ধে উঠতে হবে না।

কেল্লাবারের কাছে পরোয়ানা গেল যে, ইয়াকুবকে হাজির করে। দোয়ার ফিরে এসে কি বলে, সেই কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা কোচ্ছি,

এমন সময় পরামাণিক লুচার এসে উপস্থিত। রাজপুত্রের দরবারে তাকে যেরূপ শুকনো মড়ার মতন দেখেছিলেন, এখন তার সে চেহারা নেই, এখন তারে বেশ সজীব প্রফুল্লিত দেখ-লেম।

আমি বল্লম, “লুচার! দোহাই আল্লাহ, যদি মিথ্যা বলিস! নূরমহলের ধূর্তমিগুলি রাজ-পুত্রের কাছে তুই কি সাহসে বলি? বিশেষতঃ তার বাপ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে, তোর ভরসা তো হল? তুই যে হাতে হাঁড়ি ভাঙলি, তোর প্রাণে কি একটু ভয় হলো না?”

লুচার বলে, “হাঁ, সেটা বড় দুঃসাহসের কাজ কোরেছি বটে, কিন্তু সে আমার যে নিগ্রহ কোরেছে, তাতেই আমার ভারি রাগ হয়। তখাচ ওরূপ কোরে দশজনের স্মৃখে—বিশেষতঃ রাজদরবারে তার কন্যার গুণাগুণ বলতে আমার সাহস হতো না, কিন্তু রাজপুত্রের হৃথের চেহারা দেখে আমার ঠিক বোধ হল যে, নজফালীর গৌরব-স্বর্ধা পাটে বসে বসে হয়েছে, আমার সে অল্পমান কিন্তু মিথ্যা নয়, আমি যা এঁচেছিলেম, তাই হল, আর আমাদের ভয় কোরে চোলেতে হবে না, আর তাঁকে কাকেও বিরক্ত কোত্তে হবে না—এ কথা ঠিক জান-বেন; বেটাকে হাতে না মেরে ভাতে মেরেছি। হাতী হাঁড়োলে পোড়েছে, দর্পহারী ভগবান তার দর্পচূর্ণ কোরেছেন।”

আমি বল্লম, “কেন! তার মানে কি? তুমি যে হেসেই গা পাতলা কোলে।”

পরামাণিক। নজফালী কাল প্রাতে আগ-রায় যাবেন, নক্ষর-চাকরকে ভয়ের হয়ে থাকতে হুকুম দিয়েছেন। আর কথায় কাজ কি, হাতে পাঁজি মজলবার—কালই জানা যাবে। বেটা মাধার লক্ষী পা দিয়ে ঠেলে ফেললে!

“তবে সেনানায়ক কে হবে?”

পরামাণিক। আমি তা কি জানি, এবার ত আপনি কত্তে মত্তে বেঁচে গেলেন, ভাগ্যস-জর হয়েছিল, তাই রক্ষা। ঐ জরই আপনার প্রাণদাতা।

আমি বোল্লম, “সে কথা মিথ্যা নয়। সে যা হোক, ইয়াকুবের জন্তে মনে বড় কষ্ট হোচ্ছে।

আ! ইয়াকুব! তুমি সেই কাল নিষাদের হস্তে প্রাণটি হারিয়েছ! পৃথিবীর বাবতীয় কেল্লাদারদের খুন কোরে ফেল্লে এ ছত্রুহ পাপের প্রায়-চিন্তিত হয় না। লুচার! তুমি দেখে এসো দেখি, সোয়ার কেল্লা থেকে ফিরে এলো কি না?”

পরামাণিক চোলে গেলো, আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কোল্লেম, কিন্তু ঘুম হলো না। সন্ধ্যার সময় ইয়াকুবকে সঙ্গে কোরে লুচার এসে উপস্থিত। ইয়াকুবকে দেখে আমি আহ্লাদে উঠে বস্লেম, বল্লেম, “ইয়াকুব! আল্লার দিব্যি, তোমাকে দেখে আমি যে কত খুশী হলেম, তা যুখে বলে উঠতে পারিনে, ভেবেছিলাম, আমিই যদি তোমার মৃত্যুর অজ্ঞাত মূল্যধার হলেম, আমার মনে সেই আশঙ্কা বড় হোচ্ছিল—তুমি কেমন কোরে বেঁচে গেলে?”

ইয়াকুব বল্লেম, “সাদক! তুমি যদি অমন কোরে বুক দিয়ে না পোড়তে, তবে যে আমার আদৃষ্টে কি ঘটতো, তা বলতে পারিনে। আপনাদের সেই পুলিশদা কেল্লাদারের হাতে দিতেই, কেল্লাদার চিঠি পোড়ে তার নিকটে যে সকল লোক ছিল, তাদের কি ইশারা কোরে বল্লে, তার পর দেখি, আমি কয়েদ হয়েছি। কেল্লাদার শেষে আমায় পত্রখনি দেখালে, তাতে এই কথা লেখা ছিল—‘নজফালীর দ্বিতীয় চক্রম পর্যন্ত এ ব্যক্তিকে ধোরে কয়েদ রেখো।’ আমি কেল্লাদারকে পুনঃ পুনঃ বল্লেম, যারে কয়েদ কোরবে, আমি সে ব্যক্তি নই, আপনি পাড়িত হয়ে পথে থেকে ফিরে ছাউনিতে গেছেন, সে কথা তারে বল্লেম। ঐ কথা শুনে সে আমার সঙ্গে সদ্যবহার কোস্তে লাগল, কিন্তু কয়েদের অবস্থায় রাখলে, রাজপুত্রের পরোয়ানা পেয়ে শেষে ছেড়ে দিলে।”

আমি বল্লেম, “আমরা তোমার নামে খরচ লিখে বসে ছিলাম, আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তা আর মনে করেনি, আমি একখানা চিঠি লিখে কেল্লাদারের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সোয়ার সে চিঠি তার হাতে দিতে পারে নি, সে কিন্তু ফিরে এসে বল্লে, তোমারে খুন কোরে ফেলেছে—কি দুঃখ!”

ইয়াকুব বল্লেম, “সেটা কাজের কথা নয়,

চক্ষেই দেখতে পাচেন, এখন তবে মনটা স্থির করুন।” এই কথা বলে ইয়াকুব চলে গেলেন, আমি এখন নির্ভরনার অকাতরে নিদ্রা যেতে লাগ্লেম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।  
জেলা বরুয়া

বাড়াতাতে ছাই পোড়ল।

পরামাণিকের কথা সত্য হল, সে ঠিক ধর-রই বোলেছিল। নজফালী ছাউনী পরিত্যাগ কোরে, আরজকেবকে পরিত্যাগ কোরে, তাঁর স্ববর্ণময় আশাভরসা পরি-ত্যাগ কোরে আগরায় চোলে গেলেন। যদি সুবিধা হয়ে উঠে, রাজপুত্র দারার অধীনে একটা ভাল পদ দেখে শুনে লবেন—এই কথা ত লোকে বলাবলি কোচ্ছে, এখন তাঁর মনে যাই থাকুক। সেলাবত খাঁ একজন প্রাচীন প্রবীণ যোদ্ধা, কিন্তু মন্ত্রীর কার্যে তাদৃশ পারদর্শী নন, রাজপুত্রের যে অল্প-বিস্তর সৈন্য আছে, এই ব্যক্তি তাদের নায়ক হলেন, তাঁরে ঐ পদে অভিষেক করাতে ছোট বড় সকলেই সন্তুষ্ট হল। নজফালী থাকে বিদায় কোরে দিয়ে রাজপুত্র এখন হাত-পা ছড়িয়ে নিখাস ফেলে বাচ্চলেন। রাজপুত্রের সন্ধান যদি একটি ভাল লোক না থাকত, তবে নজফালীর সঙ্গে বিবাদ কোস্তে কখনই তাঁর সাহস হত না। ধীর কথা উল্লেখ কোচ্ছি, এ ব্যক্তি কি তেজ-বুদ্ধিতে, কি বীরমহিমায় নজফালীর অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ এ ব্যক্তি বৈরাগ্য অসমসাহসী, তাতে কোরে রাজপুত্রের অনেক প্রত্যাশা যে, তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকার সাধন হবে। এঁহার নাম জেমলা, গোলকন্দার রাজসভাসদের একজন প্রসিদ্ধ আমীর, রাজপুত্রের সঙ্গে অনেকদিন অবধি গোপনে চিঠিপত্র লেখালেখি চোলেছে।

গোলকন্দা, বিসিয়াপুর, বঙ্গদেশ, আর বর-নিও উপদ্বীপ, এই চারটি প্রদেশে হীরার খান আছে। হীরক উৎপত্তির চারটি মাত্র আকর, তার মধ্যে দুটি খনি বা মন্ডল, আর দুটি নদী।

রাওলখণ্ডেব আকর, গেনায়ের আকর, বঙ্গদেশের মধ্যে সোলেমপুরের আকর, আর বর-নিও উপবীপের সুখদার আকর—এই চারটি আকরস্থান হতে সকল প্রকার হীরার আমদানী হয়! শেবোল্লিখিত আকরটিকে খনি বলেও হয়, নদী বলেও হয়।

আরদাবাদে পৌছে আরদজ্জেব ১২ হাজার কোজের বন্দবস্ত কোরে ঠিক ঠাক হয়ে রইলেন। আমীর একখানি পত্র লিখে পাঠালেন, ঐ পত্র পেয়ে আমাদের উপর হুকুম হলো যে, এই যুদ্ধেই গোলকন্দায় কুচ কোতে হবে। আমরা সকলেই রওনা হলো। জেমলার আগন্তু বৃত্তান্ত এর পর বাহুল্যরূপে কীর্তন করা যাবে, আপাততঃ এইমাত্র বলছি, পারসী-কূলে তাঁর জন্ম, এ ব্যক্তির পরিচয় না জানে, এমন লোকই নেই, হিন্দুস্থানের সর্বত্রই সকলেই তাঁর নাম শ্রুত আছে। আমীর ঘরানার সম্ভান ছিলেন না বটে, বুদ্ধিবিচক্ষণতায় তাঁর সমযোগ্য ব্যক্তি তৎকালীন কেহই ছিল না। তাঁর যেকোন বুদ্ধির তেজ, তদতিরিক্ত তেজবুদ্ধি মনুষ্যের হয় না। প্রকৃত যোদ্ধার যে সকল লক্ষণ থাকে আবশ্যিক, তাঁতে সে সকলই বিদ্যমান ছিল। এতদ্বির আমীর দুর্জয় কর্মকুশল ছিলেন। তাঁর বৈভবের উপমা ছিল না। তিনি একটি বৃহৎ ঐশ্বর্যবান রাজ্যের রাজমন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাই বলে যে তিনি তত অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হন, তা নয়, তাঁর আরও অনেক প্রকার উপার্জনের পথ ছিল। পৃথিবীর মধ্যে এমন সহর, কি কারকারবারের স্থান ছিল না যে, সেখানে আমীর জেমলার কুঠী নাই। হীরার খনিগুলি পরের নাম কোরে আপনি জমা কোরে লতেন, এই সকল সূত্রে আমীর অল্পদিনের মধ্যে কৈপে উঠলেন। অতুল বৈভবের প্রভাবে তাঁর এত প্রাহুর্ভাব, আর এত ক্ষমতা হয় যে, তাই দেখে গোলকন্ডার অধিপতির হিংসা জন্মিল। বাদশাহ মুখে কিছুই বোলতেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলের অলক্ষ্যে আমীরের ছিদ্রাঙ্গসন্ধান কোতে লাগলেন, একটা ছল পেলে হয় ত তাঁরে প্রাণে নষ্টই কোতেন, নয় রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দূর কোরেই দিতেন।

কিছুদিন এই ভাবে যায়, এক দিন বাদশাহ জানতে পালেন যে, জেমলা চক্র কোরে রাণী-মহলে অধিপত্য করবার চেষ্টা পাচ্ছে। সে দিন আর ক্রোধ সঞ্চরণ কোতে না পেরে, সেই তেজীয়ান্ অপরাধীর অসমক্ষে গর্জন কোরে বোলতে লাগলেন, “তারে জাহান্নাবে দেবো, তার সর্বনাশ কোরবো, তার এত শাস্তি কোরবো, লোকের যেন চিরকাল তা স্মরণ থাকে, তার এত বড় আশ্পর্কা, নেমকহারাম! বজ্রাং!” জেমলা রণ্ডে রণ্ডে বাদশাহের ক্রোধের কথা শুনতে পেলেন, সকলে উয় দেখালে যে, বাদশাহ প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, আপনাকে ঝাড়ে বংশে নির্মূল কোরবেন। ঐ কথা শুনে আমীর রাজপুত্র আরদজ্জেবকে এক পত্র লেখেন। ইয়াকুব তৎকালীন রাজপুত্রের মির মুনসী হয়েছেন, তিনি আমাদের সেই পত্রখানি দেখালেন, তাতে এই লেখা ছিল:—

“আমা কর্তৃক গোলকন্ড রাজ্যর যে অপরিমিত উপকার হয়েছে, এ জগতীতলে সে বিষয় সকলেই অবগত আছেন। তার পরিবর্তে কি পুরস্কার পাইলাম? না, পরিবার সূদ্ধ আমাকে জাহান্নাবে দেবেন, রাজা এক্ষণে সেই চক্র করিতেছেন! তিনি মনন করিয়াছেন, আমাকে সপরিবারে সংহার করিবেন। অতএব আপনি যদি রূপা কোরে আশ্রয় প্রদান করেন, আমি আপনার চিহ্নিত শরণাগত হয়ে থাকিব—আমি আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাকে রূপাদান করিবেন স্থির জানিয়া, সেই ভাবি উপকারের পরিবর্তে পূর্বেই একটি কৌশলের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ কৌশলের প্রভাবে আপনি সহজেই গোলকন্ডের অধীশ্বরকে হৃত আর তাঁর রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। উত্তম জ্ঞানশিক্ষিত অখারোহী সৈন্য ৪৫ হাজার সংগ্রহ পূর্বক দিনরাত কুচ করিয়া গোলকন্দায় আসিবেন, এখানে পৌছিতে ১৪ দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন আপনার অভিপ্রায় জানিতে না পারে।

এই জনরব করিয়া দেবেন যে, গোলকন্ডার রাজ্যর সঙ্গে সন্ধি করবার বিশেষ প্রয়োজন

হইয়াছে, তাই শাজাহান বাদশাহ উকীল পাঠাইয়াছেন, তাঁরই সমভিব্যাহারে এই সকল সোয়ার চলিয়াছে। দাবীরের \*ঘারা প্রথম সংবাদ রাজ-সমীপে পৌঁছিয়া থাকে, দাবীর আমার পরমাত্মীয়, তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কোরে চলিয়া থাকি। তবে বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইবেন। রাজা বাবু নগরেই সর্বদা বাস করিয়া থাকেন, আগনি যাহাতে ঐ বাবু নগরের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন, আমি তার বন্দবস্ত করিব অঙ্গীকার করিতেছি। আমার তদ্বিধে এখানকার লোকে এই মাত্র জানবে যে, আপনি শাজাহান বাদশাহের তরফ একজন উকীল মাত্র, এ ভিন্ন তাদের মনে অল্প কোন প্রকার সন্দেহ জন্মিতে দেবো না। রাজা যৎকালীন অগ্রসর হইয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সেই সময় তাঁহাকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিবেন, তার পর তাঁকে মারুন, আর রাখুন, সে আপনার ইচ্ছা, আপনার যেমন বিবেচনা হয়, তাই কোরবেন। এতদ্ব্যাপারে যে ব্যয় হইবে, আমি নিজ হইতে সরবরাহ করিব।”

আমীর জেমলার উপদেশ অনুসারে আমরা দিনরাত কুচ কোরে যখন এত নিকটে এসে পৌঁছিলাম যে, সেখান থেকে বাগ নগর অল্প অল্প দেখা যায়, সেই সময় গোলকন্দার রাজ-বাড়ীতে একটি নিষ্ঠুর রক্তপাতের অভিনয় হোয়ে কেবল মাত্র শেষ হোয়ে গেছে, ঐ শোণিতময় অনর্থপাতের পূর্বে কতকগুলি ঘটনা উপস্থিত হয়, সেই ঘটনাগুলি বর্ণনা কোলে জেমলার আর গোলকন্দ রাজার রীতি-চরিত্র এবং স্বভাব ব্যক্ত হোয়ে পোড়বে। আমাদের সঙ্গে একটি পদস্থ কর্মচারী ফৌজের সরদার হোয়ে আসেন, তাঁর মুখে নিম্নের চুখুই ইতিহাসটি অবগত হোয়ে আমি তা নির্ভয়ে এই গল্পের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিলাম। আমার বন্ধু বিশ্বর ক্রেশ, বিশ্বর পরিশ্রম স্বীকার কোরে এই উপাখ্যানের সমুদায় বস্তু সংগ্রহ করেন। উপাখ্যানটি অনেকগুলি শোকাবহ বিষাদপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ।

\* সফর হুন্সী।

পারহানের অন্তর্গত ইম্পাহানের নিকটে আবুদিহান নামে একটি ক্ষুদ্র সহর আছে, ঐ সহরে ভদ্রকূলে জন্ম একটি বৃদ্ধের বাস ছিল। তিনি শেষ দশায় বিষয়কর্ম পরিত্যাগ কোরে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরে বসে কেবল বিশ্রাম কোতেন। ঐ মহাহুতবের এক স্ত্রী, আর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম জেমলা, কনিষ্ঠের নাম মালেক। জেমলা যখন অতি বালক, কেবল অল্প অল্প জ্ঞানের উদ্রেক হোয়েছে, তখনাবধি তিনি চতুর বুদ্ধির আর রাগত স্বভাবের পরিচয় দিতে শুরু কোলেন। জেমলা মৃত বড় হোয়ে যৌবনাবস্থায় পৌঁছিতে লাগলেন, ততই তাঁর রাগ, ততই তাঁর অবাধ্যতা বাড়তে লাগলো, আর ততই তিনি উন্মাদগামী হোয়ে উঠলেন। যখন ১৬বৎসর বয়স, তখন তিনি অত্যন্ত অবাধ্য, অত্যন্ত শঠ, অত্যন্ত ফিচেল, আর অত্যন্ত কর্মশূর হোলেন। কেহ যে তাঁরে দমন, কি শাসন কোরবেন, তা পাশ্বে নাই, জেমলার সে অপমান বরদাস্ত হতো না, তিনি কারও কথার বাধ্য ছিলেন না। পিতামাতার যা বোলতেন, তিনি তা কানেও ঠাঁই দিতেন না। বন্ধু-বান্ধব, কি বয়স্কদের গ্রাহই কোতেন না, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ কোরে দূর ছাই বলে তাড়িয়ে দিতেন, কখন কখন তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কোরে তাদের প্রতি উপহাস কোতেন। এদিকে মালেকের স্বভাব ঠিক তার উল্ট হোয়ে উঠল। তিনি যেমন নয়, তেমনি সদয়চিত ছিলেন, কিন্তু বীরের মত সাহসী হলেন। জেমলার বুদ্ধিপ্রভাবের সঙ্গে তুলনা কোলে মালেকের বিভাবুদ্ধি ও ক্ষমতা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে, তথাচ সে সময় কি কোরাণের ব্যুৎপত্তিতে, কি অল্প অল্প শাস্ত্রদর্শনে মালেকের জ্ঞান পণ্ডিত অতি অল্প লোকই ছিলেন। মালেক পিতামাতার যথেষ্ট গৌরব কোতেন, তাঁদের অনুগতও ছিলেন, বুদ্ধিগুরু-জনের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিত, মালেক তার ক্রটি কোতেন না। জেমলা কিন্তু মালেকের সঙ্গে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার কোতেন। কনিষ্ঠকে নিগ্রহ করবার অবকাশ পেলে তাঁর মনে ভারি আনন্দ হতো। বোধ হয়, মালেকের পিতৃভক্তি ছিল বলেই তাঁর প্রতি

জেমলার তাদৃশ মনের ভাব হোয়ে দাঁড়ায়।  
বাল্যকাল হতে ঐরূপ নির্দিয় ব্যবহার চোলে  
আসাতে সহোদরদের মধ্যে পরস্পর  
কারও প্রতি কারও স্নেহ-মমতা জন্মে নি।  
তাদের মনের মিল কখনই ছিল না। জেমলা  
যে বিশ্বজয়ী বুদ্ধিমান, সেটা তিনি মনে  
মনে বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, কবে এক-  
বার শুভ অবসর পেয়ে সেই ভীম বুদ্ধিকে  
সার্থসম্পাদনে পরিণত কোরবেন, এখন  
সেই জন্মে তিনি তারি উত্তলা হোতে  
লাগলেন। তাঁর পিতা যখন তাঁকে বোঝা-  
তেন, “তুমি স্থির শাস্ত হোয়ে ঘরে থাকো,  
আমার ত শেষকাল উপস্থিত, কখন আছি, কখন  
নাই, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি, আমার মৃত্যুর  
পর তোমার বুদ্ধ মাতা যতদিন বেঁচে থাকবেন,  
তোমাকেই প্রতিপালন কোত্তে হবে।” ঐ কথা  
শুনে জেমলা কেবল এইমাত্র বলতেন, “যে বীর,  
কমলা তাকেই রূপা করেন।” ঐ তাঁর বোলই  
ছিল, যার তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ঐ কথাই  
বোলতেন। অস্থির পুত্রকে নিবৃত্ত করবার  
নিমিত্ত নিরীহ বৃদ্ধ পিতা তাঁর বিবাহের প্রস্তাব  
কোলেন। বৃদ্ধ বোলেন, “অমুক আমার বাল্য-  
কালের বন্ধু, তাঁর একটি পরমাসুন্দরী কন্যা  
আছে, সে বাপের অনেক অর্থও পাবে, তারই  
সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।” বৃদ্ধ মনে কোলেন,  
যদি বিবাহের কথা শুনে পুত্র স্থির শাস্ত হোয়ে  
ঘরে থাকে।

জেমল ছরস্তু অবাধ্য, তিনি সে কথায় ভুল-  
তেন না, তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব কোলে  
তলোয়ারখানি দেখিয়ে বলতেন, “আমার  
বিবাহের প্রয়োজন নেই, ইনিই আনার গৃহিণী,  
ইহারই রূপায় আমি রাজসিংহাসন অধিকার  
কোরবো মানস কোরেছি।”

যুবার পিতা মনে কোলেন, পুত্র উন্মাদ  
হোয়েছে, তাঁর ছবুজির নিমিত্ত তামাম দিন  
তাঁরে ধমক ঠামক দিশে ভৎসনা কোলেন,  
শেষে বোলেন, “আবার কাল সকালে অবশ্যই  
তোমাকে সংপরাশর্শের কথা বোলে বোঝাতে  
হবো।”

বৃদ্ধের উপদেশ আর না শুনতে হয়, তাই

জেমলা প্রভাত না হোতেই, কারেও না বোলে  
না কোয়ে অকস্মাৎ নিরুদ্ধ হোলেন। যাতে  
একটা মন্তনাম-খ্যাতি হোয়ে দেশ-বিদেশে অধি-  
তীরূপে পরিচিত হন, যুবা তারই অন্তসন্ধান  
কোরে ফিস্তে লাগলেন, শেষে দেখলেন, পরা-  
স্থানের মধ্যে তলোয়ারের কোন আদর গৌরব  
নেই, তাই একজন জহরীর সহিত পথে সাক্ষাৎ  
হোয়ে তার সঙ্গে গোলকন্দায় চোলে গেলেন।  
জেমলার বুদ্ধির প্রভাব দেখে জহরী তারে কার-  
বার সম্পর্কীয় দেওয়ানী পদে নিযুক্ত কোত্তে  
চাইলেন। জেমলা আপাততঃ সে কর্ম স্বীকার  
কোলেন বটে, কিন্তু মনে মনে মহা বিরক্ত  
হোলেন, তত উচ্চ চাকরীতে তাঁর ঘণাই ছিল।  
জেমলা কিন্তু তখন এই বিবেচনা কোলেন যে,  
উপস্থিত এই পদ হোতেই তিনি উচ্চ পদে  
আরুঢ় হবেন—তিনি যে এর পর বড় লোক  
হবেন, তারি সোপান হল। তাঁর এ বিবেচনা  
অযথার্থ হয়নি।

জেমলার মাতা শোকে আচ্ছন্ন হোয়ে  
হাহাকার কোত্তে লাগলেন, পুত্র হঠাৎ চোলে  
গেল, হয় ত কোন্ দিন সে প্রাণটি হারাবে,  
জননীর মনে আশঙ্কা হোতে লাগলো। বৃদ্ধা  
সর্দঙ্গাই বোলতেন, “জেমলা নিশ্চয়ই মারা  
পোড়বে।” বৃদ্ধ স্বামী তাঁরে এই কথা বোলে  
অনেক বোঝাতে লাগলেন, “তুমি শোক করো  
কেন? জেমলা ভূমিষ্ট হোলে আচার্য্যেরা গণনা  
কোরে যে কথা বোলেছেন, তাই কেন এখন  
মনে করো না? সে যেমন কপালে পুরুষ হবে,  
এমন কেউ কখন হয় না, তার অন্তঃস্থে বিধাতা  
এত সুখ, এত সম্পদ লিখে রেখেছেন যে, লোক  
শুনে সে কথায় বিশ্বাস যাবে না।” বৃদ্ধের  
প্রবোধ দানের কোন ফল হলো না, তিনি যত  
বোঝাতে লাগলেন, জেমলার মাতা সে সকল  
কথা কর্ণেও স্থান দিলেন না, কেবল মাথা  
নেড়ে না না কোরে বোলেন, “ওগো, না,  
‘আমার জেমলা কোথায় বিধোরে মারা  
পোড়বে, সে যে ছরস্তু, কবে কোন্ গোঁয়ারের  
হাতে পোড়ে প্রাণটি হারাবে।’ এই কথা  
ধোলে বুক করাখাত কোরে রোদন কোত্তে  
লাগলেন। তার কারণ এই, জেমলার তত

দোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মায়ের প্রিয়পুত্র ছিলেন। জেমলার অদৃষ্টের বিষয় আচার্য্যেরা ভূত গণনা করেন বটে, কিন্তু মালেকের বিষয় সেরূপ নয়, তাঁর অদৃষ্ট আর জেমলার অদৃষ্ট বিস্তর বিভিন্ন। মালেকের অদৃষ্টের বিষয় আচার্য্যেরা এই কথা বোলে গেছেন যে, মালেক জন্মিয়া অবধি কষ্ট পাবেন। তাঁর অদৃষ্টে বিধাতা কেবল দুঃখ, বিপদ আর বিডলনা লিখে রেখেছেন, তার পর তাঁর অকালমৃত্যু হবে, মানুষের কি ক্ষমতা যে পূর্নাঙ্কে সাবধান হোয়ে সে অকল্যাণ ঘটনা নিবারণ করে ?

মালেক যত বড় হোতে লাগলেন, তাঁর কোমল স্বভাব আর নব প্রকৃতি দিন দিন আরও অমৃতবৎ হোতে লাগল। বুদ্ধ পিতা মাতা মৃত্যুনের সেই চারু চরিত্র দর্শন কোরে মায়াময় মগ্ন হোলেন। মালেকের ভদ্রাভদ্র সম্বন্ধে তাঁদের অন্তঃকরণে যে একটি মহা আশঙ্কা ছিল, তেহের অমুরোধে সেটি তাঁরা একেবারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন, অর্থাৎ আচার্য্যেরা লক্ষণালক্ষণ বিচার কোরে মালেকের সম্বন্ধে যে ঘোর ভয়ঙ্কর কথাগুলি ব্যক্ত করেন, সে কথাগুলি তাঁদের মনে আর উদয় হতো না, এক্ষণে কেবল জেমলার নিমিত্তেই তাঁরা ভাবিত হোলেন। তাঁরা জান্তে পাল্লেন না যে, পুত্র কোথায় গেলেন ? কি তাঁর অভিপ্রায় ? কোথায় কি কোচ্ছেন, কি কেমন আছেন, সে সকল বিষয় জেমলা কখন তাঁদের লিখে জানাতেন না, তাতেই তাঁরা আরও কাতর হোলেন। শেষে এমনি হলো, কেউ যেন তাঁদের অন্তঃকরণ ছুরী দিয়ে ছেদ কোন্তে লাগল।

জেমলা যে একবার হিন্দুস্থানের রত্নভূমিতে দর্শন দেন, এ মানস তাঁর অনেক দিনাবধি ছিল। গোলকন্দায় পৌছে এত যত্ন আর পরিশ্রম কোরে আপনার কর্ম্মালয়ে কাজকর্ম্ম কোন্তে লাগলেন যে, তাই দেখে তাঁর জহরী বনিব ভারি সম্বষ্ট হোলেন—জেমলার উপর তাঁর ভারি অমুরাধ হলো—জহরী কিন্তু স্বপ্নেও জান্তে পরেননি যে, তাঁর চতুর দেওয়ান, আকাতি কোরে তাঁর সর্ব্বস্ব লুটে নিচ্ছেন, আর

তাঁর তুল্যাতুল্য বৈভব তিনি আপনি সঞ্চয় কোচ্ছেন।

এই সময় সম্রাট শাহজাহান হিন্দুস্থানের ছত্রদণ্ডধর। তাঁর চার পুত্র ভারত-রাজ্যের রাজসিংহাসন পাবার মানসে গোপনে নানা-প্রকার উপায় কল্পনা কোচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ কারও কাছে আপনার গতি-প্রবৃতি প্রকাশ কোতেন না। তৎকালীন গোলকন্দ রাজ্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন অধিকার ; সে সময় কমলার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হোয়ে সে প্রদেশের প্রজাদের সুখ-সম্পদের গরিমা গগন স্পর্শ করে। গোলকন্দারাজ্যে অনেকগুলি সতেজ ফলশালিনী রত্নের খনি আছে, সেই সকল খনি হোতেই অপরিমিত অর্থের আমদানি হতো। সে দেশের লোকেরা আহা-নিদ্রা পরিত্যাগ কোরে দিবা-রাত্র কেবল খনির কাজেই ব্যস্ত থাকত। জহরী মহাজনেরা সে সকল খনি ইজারা লয়ে ধামার মাপে হার। মেগে লইত। অভিনব দেওয়ান জেমলার চক্ষে এই ব্যাপারটি অতি মনোহর বোধ হলো, তিনি মনে মনে স্থির কোলেন যে, কিছু কিছু রত্ন তাঁরও হস্তগত হওয়া আবশ্যক, তাঁর সে অভিলাষ শেষে ভাল-রূপে সফলও হয়। হারার ব্যবসা ভিন্ন জেমলা পশম প্রভৃতি অগ্ন অগ্ন বিশকিম্মতি দ্রব্যেরও কারবার আরম্ভ কোলেন, এমন কি, তিন বৎসরের মধ্যে অতুল বৈভবের অধিকারী হলেন। অবশেষে তাঁর জহরী মুনিবকে পরিত্যাগ কোরে অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে এজমালিতে খনির ইজারা লইলেন। এই কারবারে জেমলা আশার অতিরিক্ত কৈপে উঠলেন, তিনি এক্ষণে একজন মন্ত্র নামজাদা ধনবান হোয়ে পোড়লেন। যত অর্থের আমদানি হোতে লাগল, সেই সঙ্গে তাঁর বাসনাও বাড়তে লাগল, এক্ষণে তাঁর প্রবৃতি হলো যে, গোলকন্দার অধীশ্বর কুতুবের রাজদরবারে প্রবেশ করেন। কুতুব মহা সাধুসী, মহা তেজস্বী, আর অতিশয় কর্ম্মচতুর, তাঁর স্বভাব অতি তীক্ষ্ণ ছিল, হঠাৎ রাগ উপস্থিত হতো। কয়েক বৎসর অবধি গোলকন্দ রাজ্যে রাজস্ব কোচ্ছিলেন। এ ব্যক্তি যখন সে অভিলাষ

কোরেনে, তাই নাকি পূর্ণ হয়ে এসেছে, কখন কোন বাসনা নাকি অপূর্ণ থাকে নি, তাই তাঁকে লোকবিরুদ্ধ নিষ্ঠুরতা অপরাধে কখন অপবাদগ্রস্ত হোতে হয় নি, বরং প্রজারা তাঁর অতিশয় গৌরব, অতিশয় অনুরাগ কন্তো। পূর্ব-দ্বীর সহবাসে গোলকন্দ রাজের একটি পুত্র জন্মে, তাঁর নাম গুর মাজ, বয়সক্রম ২০ বৎসরের মধ্যে, কুতুব রাজকুমারকে এত স্নেহ কোন্তেন যে, এক লহমা না দেখে থাকতে পান্তেন না। বাস্তবিক রাজকুমার রাঙপুরীর অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। কুতুবরাজ সম্ভ্রান্তি একটি পবমানন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন, তাঁর প্রতি অতিশয় সদয় ছিলেন, আর তাঁরে বেশ যত্নও কোন্তেন। কুতব অত্যন্ত গুণগাহী ছিলেন, সদ্গুণের বিস্তর সমাদর, বিস্তর অনুরাগ কোন্তেন। যারা পরিশ্রম কোরে দিনপাত কন্তো, রাজা তাদের শ্রমের পুরস্কার কোন্তেনই কোন্তেন, দুঃখীদের শ্রমজল কখন বুখা নষ্ট হতে দিতেন না। জেমলা এই সকল সুযোগ পেয়ে কুতুবের নিকট পরিচিত হলেন। তাঁর নাকি অভুল ঐশ্বর্যের শব্দ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল, তাই গোলকন্দরাজ তাঁরে খাজাকির পদে অভিনিক কোরে আমীর উপাধি প্রদান কোল্লেন, এক্ষণে সকলকেই তাঁর কাছে ঘোড়হাত কোরে থাকতে হলো।

জেমলার রাজকীয় ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগল, তার পরামর্শ ভিন্ন রফা-নিষ্পত্তি আদি কোন প্রকার রাজকর্মে অহু-ষ্ঠান হোতে পান্তো না। যুবাব বীর-পরাক্রমেরও অগৌরব হয় নি, কুতুবরাজ তাঁর শৌর্যগুণের বিস্তর সমাদর কোন্তেন। কোথাও একটি লড়াই উপস্থিত হলে লক্ষরদের মধ্যে যদি নিঃশব্দ দুঃসাহসী সেনানীর আবশ্যক হত, তবে আমীর জেমলাকে তাদের সরদার কোরে পাঠা-তেন, বোলতেন, “আমীর! তুমিই নায়ক হোয়ে যাও।” জেমলাও কিন্তু যতবার সেনাপতি হোয়ে গেছেন, ততবারই জয়ী হোয়ে ফিরেছেন, এক-টিবারও তাঁকে বিমুখ হোয়ে ফিতে হয় নি। জেমলা শত্রু জয় কোরে যখন রাজধানীতে ফিরে আসতেন, রাজা তাঁর গুণকীর্তন কোরে

বিস্তর সমাদর কোন্তেন, আর বহু মূল্যের মণি-ময় পুরস্কার কোরে তাঁর মান বাড়াতেন। আমীর জেমলা যখন এই প্রকার অবস্থায় পৌছিলেন, যখন এতদূর পর্যন্ত তাঁর মান-সম্মতির, পদের, ঐশ্বর্যের গৌরব হোয়ে উঠল, তখন তিনি এক-খানি চিঠি পাঠায়ে তাঁর পিতাকে জানালেন যে, তিনি এক্ষণে অভুল অর্থের অধিকারী হোয়েছেন, রাজদরবারে তাঁরই বিস্তর আধিপত্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে, রাজা তাঁরই পরামর্শ-মতে চলেন, তত্ত্বির বিস্তর দাস দাসী, অনুচর-পারিষদ তাঁরে শোভা কোরে আছে। বুদ্ধ পিতা মাতা ঐ পত্র পেয়ে যার পর নাই মহা আনন্দিত হোলেন, তা ত হবারই কথা। তাঁরা প্রত্যুত্তরে আলীর্ষাদ জানিয়ে লিখে পাঠালেন যে, উত্তর উত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি হোয়ে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন। তা ছাড়া অনেক হিত-উপদেশের কথাও লিখে পাঠালেন, পাপমতি জেমলা সেগুলি অগ্রাহ কোরে এক পাশে ফেলে রাখলেন।

জেমলার ঐ পত্র পেয়ে তার সহোদর মালেক দিন দিন দুঃখিত আর মান হতে লাগ-লেন। বুদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের ঐরূপ বিমুখ ভাব দেখে অতিশয় কাতর হলেন। এক দিন একথায় সে কথায় তাঁর বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, মালেক বেদ কোরে বোল্লেন, “হায়! আমার ণায় হতভাগ্য কে আছে, আমি দুঃখিত হব না ত কে হবে? আমি কি আমার পরমায়ু কেবল বসে বসে অনর্থক নষ্ট কোচ্ছিনে? এত বয়স হোয়েছে, আমায় কেউ জানলে না, চিন্লে না। দেখুন, আমার সহোদর কেমন ধনলাভ মানলাভ কোচ্ছেন। আমাকে অনুমতি করুন, আমিও একবার বিদেশে গিয়ে ঐরূপ লাভের উপায় দেখি, আমি ঘোড়হাত কোরে মিনতি কোছি, আপনারা বাধা দেবেন না, আমায় নিষেধ কোরবেন না, আমার নিতান্ত বাসনা হোয়েছে, একবার বিদেশে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করি। আমি যে কিছু দেখবো না, জানবো না, কি কোন উপায় চেষ্টা কোব্বো না, চিরকালই মূর্থ হোয়ে ঘরে বোসে থাকবো, আপনাদের কিছু এমন



## উজীর পুত্র ।

ইচ্ছা কখনই নয়, তবে একবার বিদেশে যেতে অল্পমতি না করেন কেন ?”

স্নেহাসক্ত বৃদ্ধ পিতা বলেন, “বাবা ! তুমি যে দেশ বিদেশ পর্য্যটন কোরবে, তাতে লাভ কি হবে ?”

যুবা বলেন, “অনেক দেখলে শুনলে জ্ঞান জন্মাবে, নূতন নূতন বিষয় দর্শন কোরে নূতন নূতন রসের স্বাদ গ্রহণ করবো। পণ্ডিত মাঝেই ত এই কথা বোলে থাকেন-যে, দেশ পর্য্যটন করাই জ্ঞানোপার্জনের প্রধান উপায়। বার তলোয়ার আছে, সে যদি সে তলোয়ার ব্যবহার না কোরে চিরকালই তুলে রাখে, তবে তার সে তলোয়ার রেখে কি লাভ ? তলোয়ার-ধারীর যে পরাক্রম আছে, কিসে তা সপ্রমাণ হবে ? বৃদ্ধ যদি সচল হতো, ইচ্ছামত সেখানে সেখানে চোলে বেড়াতে পারতো, তবে তার কি দরকার ছিল যে, ঠাকুরদের ভয় কোরবে ? অতএব আমি এই দণ্ডেই বিদেশ-যাত্রা কোরবো—আপনি অল্পমতি করুন। আমিও সেই গোলকন্দার যাব, সেখানে সহোদরের সেরূপ প্রাণ্ডীর্ভাব হয়েছে, তাঁর আবিপত্যের প্রভাবে আমার পদ, গৌরব, বৈভব আদি সকলই হবে তার সন্দেহ নেই।”

বৃদ্ধ পিতা বলেন, “মালেক ! বাবা ! আমার কথা অবহেলা কোরো না—দেশভ্রমণের অনেক দোষ—বিস্তর পর্য্যটন কোত্তে হয়, ভাবতে ভাবতে শরীর পাক পেয়ে যায়, বিষাদে আর হতাশে প্রাণ শুকিয়ে যায়, নৈরাশ্রে ভেসে বেড়াতে হয়, জালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, বিভ্রম। দেশ-ভ্রমণের অঙ্গ, সেগুলির হাত থেকে বাঁচবার উপায় নাই। তত্ত্বির পদে পদে ত্যক্ত বিরক্ত হোয়ে অসুখী হোতে হয়—এই সকল দেশভ্রমণের ফল,—হাজারের মধ্যে কদাচিৎ এক আশ্রয় ভাল হয়। জেমলার অতুল বৈভব হোয়েছে সত্য, কিন্তু তুমি মনে কোরে দেখ, তার ভ্রমের সময় আচার্য্যেরা পূর্কেই সে কথা বোলে রেখেছেন, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট সেরূপ নয়,—তোমার বিষয়ে তাঁরা স্বতন্ত্র কথা বোলে গেছেন।”

মালেক এই কথা শুনে ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা

কোলেন, “বাবা ! আচার্য্যেরা আমার অদৃষ্টের বিষয় কি বোলেছেন ? আমার তা শুনতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।”

“তাঁরা শুনে এই কথা বোলেছেন, তুমি দুঃখী হবে, অনেক কষ্ট পাবে, বিস্তর বিভ্রম। ভোগ কোরবে, আর অকালে তোমার পতন হবে। অতএব তুমি যে আমাদের স্নেহ-পাশ ছিন্ন কোরে বিদেশ-গমনের বাসনা কোচ্ছো, সে কথা শুনে আমাদের আত্ম-পুরুষ শুকিয়ে গেছে, শোকে অভিভূত হোচ্ছি, তুমি আমাদের অঙ্কের নড়ি, ক্রপণের ধন, তোমারে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা কি প্রাণ ধোরে ঘরে থাকতে পারবো ?”

মালেক বোলেন “আমার অদৃষ্টে যদি দুঃখই আছে, তবে ঘরে থাকলে কি কোরে তা নিবারণ হবে ? আমি ত আপনাদের এ ভাব বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে। আমার যদি জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য্যের গণনার প্রতি আমার কিন্তু শ্রদ্ধা নাই, বিশেষতঃ তাঁরা যখন আমার সহোদরের বিষয় শুভ গণনা কোরেছেন, তখন আমার সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবস্থা কোরবেনই ত, সে ত অবধারিত কথা।”

বৃদ্ধ পিতা সচিস্তিত হোয়ে বোলেন, “বাবা ! তুমি বিবেচনা কোরে দেখো, তোমার সহোদরের বিষয় পণ্ডিতেরা গণনা কোরে যে যে কথা বোলেছেন, একটি একটি কোরে তার সকল গুলি সপ্রমাণ হোচ্ছে, তাদের সে কথা-গুলি যেন অক্ষরে অক্ষরে গিলে যাচ্ছে, পরমেশ্বর করুন, তোমার সম্বন্ধে যেন সেরূপ না হয়।”

মালেকের মাতা এ যাবৎকাল বৃকে করাঘাত কোরে কেবল হাহাকার কোচ্ছিলেন, যুবা তা স্বচক্ষে দেখেও আপনার সঙ্কল্প পরিভাগ কোলেন না। বৃদ্ধ দেখলেন যে, মালেকের সঙ্গে আর তর্ক করা বৃথা, যুবা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হোয়েছেন, কারও কথাতে কর্ণপাত কোরবেন না, তখন নিরুপায় হোয়ে অতি কষ্টে পুত্রকে বিদেশ-গমনের অল্পমতি কোলেন। মালেক এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দুজন সহচর সঙ্গে কোরে হিন্দুস্থানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দর্শন দিলেন। যুবা



মনে কোন্ডেন,ঐ প্রদেশে একটি ফলোমুখ বৃহৎ স্বল্পক্লেত্র তাঁর জন্তে কেউ যেন প্রস্তুত কোরে রেখেছে, তিনি সেখানে উপস্থিত হোয়ে সেই সকল রত্ন-শস্ত্র কেটে নিয়ে গৃহজাত কোর্বেন।

মালেক যখন বিদেশ গমন করেন, তার পূর্বে মনে মনে স্থির কোরেছিলেন যে,বিদেশে গিয়ে সাবধান হোয়ে চোলবেন, সত্য পথে থাকবেন, সদ্ব্যবহার কোর্বেন, কারও সঙ্গে অত্যাচার আচরণ কোর্বেন না। মালেকের প্রকৃতি অতি কোমল ছিল, সকলের কাছে নম্র হোয়ে চোলতেন, আর সকলকে প্রিয় কথা কইতেন, তাঁর ঐ নরম প্রকৃতির গুণেই কেউ তাঁর মন্দ চেষ্টা কস্তো না, বরং সকলেই তাঁকে স্নেহ আদর কোস্তো। মালেকের ঐ স্বভাব-মাধুরী ইষ্ট-কবচের দ্বারা অনেক অনিষ্টপাতের অবরোধ হোয়ে তাঁকে রক্ষা কোরে নে বেড়াতো। যুবা দেখতেও বেশ সুপুরুষ ছিলেন। শরীরের গড়ন সুভোল; দিবি্য দীর্ঘছাঁদ চেহারা,মুখকান্তি অতি মনোহর। মালেক যেখানে যেতেন, তাঁর ঐ চাক চেহারা অমুরোধপত্র হোয়ে সকলের সঙ্গে পরিচিত কোরিয়ে দিতো, আর সেই অমুরোধে লোকে তাঁর সমাদরও কস্তো। মালেক যে দিন যাত্রা কোরে গৃহের বার হলেন,সেই দিন একটি সন্ধ্যাতে কতকগুলি মোসাকেরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তারা কেউ কাশ্মীরে, কেউ কাবুলে চোলছে, তাই শুনে যুবার মনে তারি আনন্দ হলো। মালেকের সঙ্গে অনেক পাথেয় ছিল, সেই সাহসে তাদের দলে অনায়াসে মিশে গেলেন। যুবা ধীরে ধীরে তাঁর অতিবাসনার মন্দিরাভিমুখে চোলেছেন, সেখানে পৌছিতে অনেক বিলম্ব আছে, আমরা এই অবসরে তাঁর সহোদর আমীর জেমলার প্রতি একবার নেত্রপাত করি।

জেমলা কমলার বরপুত্র হোয়ে একাল পর্যন্ত রাজকুপারূপ সূর্যের কোমলউত্তাপে রোদ্দ পোয়াচ্ছিলেন, আর রাশি রাশি অর্থ গৃহজাত কোরে আপনার মালখানা ক্রমিক কাঁপিয়ে তুলছিলেন। কিন্তু পরমন্ত ব্যক্তির যে শত্রু নেই, এমন কে কোথায় দেখতে? জেমলার আকার প্রকার দেখে বিপক্ষেয়া আঁচাআঁচি কোস্তে

লাগলো যে, আমীরের রাজসিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য, কিন্তু তাঁর প্রতি মহারাজ কুতুবের অগাধ অমুরহ ছিল,তাই কাররে সাধ্য হয় নি যে, স্পষ্ট হোয়ে গোলকন্দ রাজের কাছে তাঁর নিন্দা মন্দের কথা বলেন,অনেকের কিন্তু মনে মনে ছিল, একবার পতনে পেলোই তাঁরে চেপে ধোরবেন। কাশ্মীরের অদীশ্বর কুতুবরাজকে আহ্বান কোরে পাঠালেন যে, গ্রীষ্মের ক মাস তাঁর সেখানে আমোদ আশ্লাদ করেন। কাশ্মীর অতি মনোহর দেশ। মহারাজ কুতুব জেমলার উপর রাজ্যের ভার দিয়ে অমাত্যবর্গ সঙ্গে লয়ে কাশ্মীরে চোলে গেলেন, সেখানে কিন্তু অতি অল্পকাল-মাত্র বাস কোরে বিদায় হোলেন। ফিরে আসবার সময় পীরপঞ্চাল পার্বতের কাছে পৌছে কুতুবের বাসনা হলো যে, সেখানকার প্রসিদ্ধ ধাত্যাপন্ন পরমহংসের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন, ঐ পার্বতের শিখরদেশে সেই মহাপুরুষের আশ্রম-কুটার। রাজা একজন অমাত্যকে আদেশ কোরে বোলেন, “তুনি গিয়ে সেই যোগিবরকে পূজার্থে সংবাদ করো যে মহারাজ কুতুব আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোস্তে এসেছেন।” এই কথা বোলে স্বহস্তে একখানি পত্র লিখতে বসলেন। পত্রখানি অমাত্যের হাতে দিয়ে তাপসবরকে তাহা প্রদান কোস্তে অল্পমতি কোলেন। পারিষদেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তাঁরা মনে কোলেন, শ্রীমান্ নিঃসন্দেহ রাজ্যের ভদ্রাভ্যেদর বিষয় যোগিবরকে জিজ্ঞাসা কোর্বেন। এইটি স্থির জেনে অমাত্যেরা বিবেচনা কোলেন, তবে এই উপযুক্ত সময়, এই অবকাশে জেমলার অতি-বাসনার বিষয় রাজাকে অবগত করিয়ে তাঁর চক্ষুকর্ণের বিবাদ বুচিয়ে দেবেন। একজন ওমরাও পত্রখানি স্বয়ং বহন কোস্তে প্রস্তুত হোলেন। তিনি মনে কোলেন, যোগিবরকে নিদেন অর্থ করুল কোরেও রাজাকে চৈতন্য কোরিয়ে দিতে বোলবেন। একজন বিদেশীর হাতে তাঁর আসন্ন বিপদ, এই কথা গণনা কোরে বলতে তাঁরে অমুরোধ কোর্বেন। এই মন্তব্যের পর ওমরাও পত্র লয়ে চোলে গেলেন। উদাসীনের আশ্রমে প্রবেশ করবার

সময় অমাত্যের অতিশয় দ্রাস হলো, তিনি তখন কত কি ভাবতে লাগলেন। লোকে যোগিরাজকে বাড়িয়ে বৃহৎ কোরে তুলেছে, পত্রবাহক পরম্পরা শুনেছেন, উদাসীন অতি অদ্বিত, অতি ভয়ানক ব্যক্তি, তাঁর মায়া কেউ বন্ধে পারে না, তিনি যেকোন অদ্বিত অদ্বিত ক্রিয়া দেখান, লোকের বুদ্ধিবৈবেচনা তার কাছে পরাণ্ড হয়। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যক্তি তাঁর কথায় মনোযোগ কোরবেন কি না, সামান্য মর্ভালোকের তায় তিনি অর্ধের প্রয়াসী কি না—এই সকল তর্ক মনে উপস্থিত হোয়ে অমাত্য অনেক চিন্তা কোত্তে লাগলেন, ভাবলেন, একথা জিজ্ঞাসা কোত্তে গেলে অদ্বিষ্টে কি ঘটে, বলা যায় না। অনেক ভেবে চিন্তে দরজার দরজায় টোকা মালেন, দরজাটি তখন বন্ধ ছিল, কারও উত্তর পেলেন না, পুনরায় চক্ৰক্ক কোরে যা মাতে লাগলেন, এইবার বাঁচ কোঁচ শব্দ কোরে দ্বারটি আস্তে আস্তে খুলে গেল, তার পরক্ষণেই সেই গিরিবাসী পরমহংস অমাত্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। যোগীর আকৃতি দেখেই তাঁর প্রাণ উড়ে গেল, প্রস্তরমূর্তির ন্যায় আড়ষ্ট হোয়ে রইলেন, শেষে অনেক কষ্টে সন্ন্যাসীর স্বর কোল্লেন, কিন্তু কি কথাগুলি বোলেন, তা শোনা গেল না, ঠোঁট দুটি নড়ছিল, তাই কেবল দেখা গেল। যোগীর ব্যংক্রম অনেক হোচ্ছে—অতি রুদ্ধ দশা, দীর্ঘকায়, সাহসকার গভীর মূর্তি, দাড়িটি নিরেট স্থূল, শ্বেতবর্ণ, আলু-থালু হোয়ে শান্তি পর্যন্ত বুলে পোড়েছে। চেহারাখানিতে অসভ্য চোয়াড়ের মতন নিষ্ঠুরতার আভাস আছে, আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখলে বোধ হয়, যোগী অতি নির্দয়, স্বল্পে পশুচর্য, কোমরে চর্মদলের কোমরবন্ধ, তাতে একখানি লেঙ্গা পেশকবচ বাঁধা রয়েছে, সেখানি ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ কোচ্ছিল, দরজাটা খুলে যেতেই, স্বর্ঘ্যের তেজ তার উপর পড়াতে অমাত্যের চক্ষের উপর সেখানি আরো চক্‌মক্‌ চক্‌মক্‌ কোত্তে লাগল, তাই দেখে তাঁর দিগুণ ভয় হলো। অমাত্য আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন যে, কি কৃষ্ণই কোরেছেন, কেন তিনি একলা এখানে

মত্তে এলেন? এ ছঃসাহস কেন কোল্লেন? এ ব্যক্তি অজ্ঞাত পুরুষ, তার মনে কি আছে, কে বলতে পারে? যোগীর অনেক বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু চক্ষু দুটি যুবাব তায়, সেইরূপ দীর্ঘায়ত, সেইরূপ অলদাঘর তায় উজ্জ্বল, আর সেইরূপ তীক্ষ্ণ, দেখলে বোধ হয় যেন, মনুষ্যের অন্তর ভেদ কোরে কোথায় কি আছে, তাই নিরীক্ষণ কোচ্ছে। যোগীর সেই বিরাট মূর্তি দর্শন কোরে ভয়ে অমাত্যের মুখ শুকিয়ে গেল, কণ্ঠ নীরস হলো, জিহবা আড়ষ্ট হোয়ে রইল। না তাঁর মুখ দিয়ে বাক্যক্ষুর্ভি হলো না, সেই প্রলম্বাকার ভীম আকৃতির অন্তঃকরণভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষু একবার সাহস কোরে চেয়ে দেখতে পাল্লেন। যোগীবর অত্যন্ত অসম্ভষ্ট হোলেন, ভাবলেন, যদি কোন প্রয়োজনই নেই, তবে কেন মিথ্যা মিথ্যা গোলমাল কোরে তাঁরে বিরক্ত কোলে। কুটীরের দ্বারে একখানি বৃহৎ চৌরস চেটাল পাথরের উপর কতকগুলি মেটে পাত্রে জল রাখা ছিল, সন্ন্যাসী সেই জল দেখিয়ে দিয়ে বোলেন, “ঐ জল আছে, খেয়ে চোলে যাও।” ঐ কটি কথা যোগীরাজের মুখ দিয়ে যখন বার হলো, তাঁর গলায় গভীর স্বরের প্রতিধ্বনিতে গিরিচূড়া, গিরি-কন্দর, আর গিরি-তল বেন গুম্বিতে লাগল, বোধ হলো যেন, ঘন ঘন মেঘ নিনাদের গভীর শব্দ হোচ্ছে। গোলকন্দনাথ যে পত্র পাঠান, অমাত্যের তা স্বরণ ছিল না, এক্ষণে মনে হোয়ে, জামার ভিতর থেকে পত্রখানি বার কোরে কাঁপতে কাঁপতে যোগীবরের হাতে দিলেন, আর যে কারচবের থলীর ভিতর পত্রখানি ছিল, তাতে একটি রাজমোহর ঝুলছিল, পত্রখানি হাতে দিয়ে সেই মোহরটি দেখালেন। মোহরটি যেমন বড়, তেমন ভারি, সন্ন্যাসী তাই দেখে চমকে উঠলেন, কুটীরের দরজাটি আর একটু কাঁক কোরে বোলেন, “এই স্বরের মধ্যে এসে বসো, কিন্তু কথা কইও না।”

উদাসীন রাজপত্র পাঠ কোত্তে লাগলেন, অমাত্য বসে আছেন, মনে মনে ভাবছেন, কি বোলে তাঁর সঙ্গে আলাপারম্ভ কোরবেন। সন্ন্যাসীর যেকোন রূক্ষদৃষ্টি, যেকোন নিষ্ঠুর মূর্তি, তাঁর

সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হয়। অমাত্যের অনেক ছল-কৌশল জানা ছিল, রাজকীয় চক্রের কপট মারা, ভণ্ড চাতুরী বিস্তর অভ্যাস কোরেছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর শ্রমুখে দাঁড়িয়ে, তাঁতে এমনি কিছু অনির্বচনীয় ভয়ের পদার্থ আছে যে, তাঁর মূর্তি দেখলে মূগ্ধ খুলতে সাহস হয় না, আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অমাত্যের যদি রাজ্যপদের প্রতি লক্ষ্যও থাকত, তখাচ তিনি সাহস কোরে সে কথা, কি তৎসম্বন্ধে অল্প কোন কথা তাঁর কাছে উত্থাপন কত্রে তাঁর ভরসা হতো না, বাস্তবিক অমাত্যের কিছু সে অভিপ্রায় ছিল না, তিনি এক রাজার কর্মচারী মাত্র, সেই ভাবে থেকে দেখলেন, উদাসীন পত্র পাঠ কোচ্ছেন, তাই দেখে সেখান থেকে প্রস্থান করবার উদ্যোগ কোলেন। মোহন্তের পত্র পড়া শেষ হোল, পত্রখানি ভাঁজ কোরে বোলেন, “আচ্ছা, তাঁরে আসতে বলো, যেন নিঃশব্দে আসেন, কোন প্রকার গোলমাল না হয়,—এই কথা বোলো।” অমাত্য আর কোন কথার অপেক্ষা না কোরে একবারে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, যোগীবরকে কতকগুলি মোহর নজর দিয়ে, সেখান থেকে প্রস্থান কোলেন, যোগীবর সেগুলি গ্রহণ কোলেন। কতদূর চোলে এসে অমাত্য মনে মনে ভাবতে লাগলেন, উদাসীন যখন এ মোহরগুলি গ্রহণ কোরেছেন, তখন আরও কিছু মোহরের লোভ দেখালে হয় ত তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত হোতে পারেন, তিনি আপনা আপনি বোলেন, ‘আমি ত বড় নিরীক্ষ, কেন মিথ্যা মিথ্যা ভয় কোছি? সন্দেহ করবারি বা আবশ্যক কি? আবার ফিরে যাই, যে অভিপ্রায় কোরে এসিছি, সে কথা গিয়ে তাঁরে বলি। অমাত্যের তাই কোলেন, খানিক পথ এসে আবার ঠুকঠুক কোরে দরজায় থা মারতে লাগলেন, দরজাটি হুড়মুড় কোরে তখনি খুলে গেল, কিন্তু এ কি ভয়ানক ব্যাপার! দরজাটি খুলে যেতেই দেখেন, সেই ভয়ঙ্কর পেশকবচখানি তাঁর চক্ষের উপর দীপ্তি কোছে, পূর্বে সেখানি যোগীর কোষেরে ছিল, এবার তা নয়, দক্ষিণ হস্তে

ধোরে উঁচিয়ে রেখেছেন, রাগেতে সন্ন্যাসীর চোক মুখ দিয়ে অগ্নির হলকা বেরুচ্ছে, বোধ হলো, তাঁকে পুনরায় বিরক্ত কোরেছেন বোলে তিনি তত অগ্নি-অবতার হোয়েছেন। অমাত্য ভয়ে কোঁকর হোয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে একটি সেলান কোরে, গলা কাঁপাতে কাঁপাতে বোলেন, “ভগবন্! মহারাজের মানস যে, অদ্বিত ভবিষ্যৎ কথা আপনি ব্যক্ত করেন, তাঁর রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়ে কুশলে থাকবে কি না, সেই কথা তিনি আপনায় মুখে শুন্তে বাসনা করেন।” “আচ্ছা, তবে তাঁরে আসতে বলো, তিনি এখানে এলে সে কথা বলবো।” এই কথা বোলেই যোগিবর অমাত্যের মুখের উপরেই সজোরে দরজাটি রুদ্ধ কোলেন। এই সময় একটা বে-আড়া দমকা হাওয়া উঠে গাছগুলো দোলাতে লাগল, তার পর যেমন ঝড়, তেমনি ঝড়ি আরম্ভ হলো। দুর্ভাগ্য অমাত্য ভিড়ে চাপুর-চুপুর হোয়ে রাজ ছাউনিতে উপস্থিত হোলেন, তাঁরে দেখে তাবতেরই বিশ্বাস জ্ঞান হলো, তাঁরা সকলে একবাক্যে বোলে উঠলেন, “কই! এখানে তো ঝড়ির নাম-গন্ধও নেই, এদিকে বিন্দুপাতও হয় নি।” সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের কি ফল হলো, তাই শোণবার নিমিত্ত ওমরাওরা মহা আগ্রহ হয়ে অমাত্য-বরকে ঘেরে দাঁড়ালেন, কিন্তু অমাত্যের আতঙ্কে আর পথকষ্টে এত অবসন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁর কথা কবার শক্তি ছিল না, তিনি বোলেন, “আপনারা এখন যান, আমার ভারি কষ্ট হয়েছে, একটু স্নান হোতে দিন, তার পর সকল কথা শুন্তে পাবেন, আপাততঃ আমাকে ধোরে লয়ে আমার তাঁবুর মধ্যে রেখে এসো, আমার চলবার শক্তি নাই।”

দৈববিপাকে ওমরাওরা শ্রবণম্পূর্ণা তৃপ্তি কোন্তে পালেন না, কেন না, সেই দুর্ভাগ্য অমাত্যের এমনি সাংঘাতিক জ্বর হলো যে, সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়—মৃত্যুকালীন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয়েছিল। ছাউনি শুদ্ধ লোক মনে কোলে, সন্ন্যাসী কি গুণ কোরে অমাত্যকে ঘেরে ফেলেছে, তাই ওমরাওরা একপরামর্শী হয়ে রাজাকে বিস্তর বিনয় কোরে বোলেন, তিনি

যেন যোগীর আশ্রম-কুটীরের ত্রিসীমানায়ও না  
 গমন করি, বরং অন্য পথ দিয়ে গোলকন্দায় ফিরে  
 যাবেন, তথাচ যেন পীরপঞ্চালের পথে গমন  
 না করেন। কুতুব কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট  
 হলেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা কোলেন যে, পরম-  
 হৃদয়ের সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ কোরবেনই  
 কোরবেন, তাতে তাঁর অদৃষ্টে যে বিড়ম্বনাই  
 ঘটুক। সকলে নিষেধ কোন্তে লাগল, রাজা  
 কিন্তু কারও কথা না শুনে, পরদিন হাতীর  
 উপর সোয়ার হোয়ে মহা সমারোহে সন্ন্যাসীর  
 সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্তে চোলেন। এর পূর্বে তিনি  
 মোকের মুখে শুনেছেন, তাপসের কোন  
 প্রকার গোলমাল ভালবাসেন না, লোকের  
 কণ্ঠের শুনে ভাবি বিরক্ত হন, তাতেই কুতুব  
 কিছুকম দিলেন যে, “থবরদার! কেউ যেন  
 কখন না কয়, স্থির নিঃশব্দের প্রতি সকলেরই  
 যেন লক্ষ্য থাকে।” রাজা গভীর নীরব আড়ম্বরে  
 সকল সন্থিত উদাসীনের কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত  
 হোলেন। যোগিবর বাইরে এসে ঈষৎ একটু  
 নমস্কার নত কোরে কুতুবের সন্তাষণ কোলেন,  
 কুতুবও অল্প শির হুয়িয়ে যোগীর সমাদর  
 কোলেন। তাই দেখে সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান  
 হলো। যোগী কেবল রাজাকেই আহ্বান  
 কোরে কুটীরের অভ্যন্তরে লয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী  
 বিকট অসভ্য চেহারা দেখে অনেকের  
 হুঙ্কার ছিলনা যে, রাজা কুটীর মধ্যে প্রবেশ  
 করেন, কুতুব অমাত্যদের মুখভঙ্গী দেখে  
 তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর  
 মনে কিন্তু কোন শঙ্কা হয়নি, তাই তিনি  
 নির্ভয়ে মোহন্তের সঙ্গে নির্জনে চোলে  
 গেলেন।

রাজা বোলেন, “ভগবন্! আপনি সর্বজ্ঞ  
 ও ত্রিকালদর্শী। আমার রাজ্যের চরম  
 দশা কি হবে, সেইটিই আমি জানতে  
 বাসনা করি—আমার সিংহাসন অমাত্যদের  
 রাজভক্তির গুণে স্থির অচল হোয়ে আছে,  
 না তাদের বিশ্বাসঘাতী কৃতঘ্নতার টলমল  
 কোচ্ছে—শীঘ্র পতন হবার সম্ভাবনা? আপনি  
 রূপা কোরে আমার এই সন্দেহটি দূর  
 করুন।”

যোগী তাঁর কীর্ণমূর্ত্তি উন্নত কোরে বোলেন,  
 “নর-রক্তে সিক্ত হবে কুতুবের অঙ্গ,  
 হবে না করিতে রাজ্য সিংহাসনে বসি।”

কুতুব ঐ কটি কথা ভিন্ন সেই অরণ্যবাসী  
 তপস্বীর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বার  
 কোন্তে পালেন না, যে আশা কোরে সন্ন্যাসীর  
 নিকট গমন করেন, তা সফল না হওয়াতে  
 রাজা বিরক্ত হোয়ে উঠে চোলে এলেন।  
 তপস্বী যে তাঁর প্রস্তাবের স্পষ্ট উত্তর না  
 দিয়ে কেবল ষোরফেরের কথা বোলে তাঁরে  
 বিদায় কোরে দেছেন, সে কথা কুতুব অমাত্য-  
 দের কাছে প্রকাশ কোলেন না, মনে মনে চেপে  
 রাখলেন। রাজার কেবল কষ্ট পাওয়াই সার  
 হলো, লাভ কিছুই হলো না। তিনি যখন  
 ফিরে এসে হস্তিপুষ্ঠে আরোহণ কোন্তে যান,  
 সেই সময় দেখলেন, উদাসীনের কুটীরটি পূর্বে  
 যেরূপ বিবেচনা কোরেছিলেন, সেরূপ নয়,  
 তাঁর চেয়ে আরও অনেক লম্বা। নৃপাল বিস্মিত  
 হোয়ে সেই কথাটি পারিষদগণকে যেমন বল-  
 বার উপক্রম কোরেছেন, এমন সময় একটি  
 অপূর্ণ পদার্থ দর্শন কোরে চিত্তপুত্তলের ছায়  
 সেই স্থানে অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন,  
 কেউ যেন শলা দিয়ে এঁকোড় ওঁকোড় কোরে  
 তাঁরে সেই স্থানে পুতে রাখলে। সন্ন্যাসীর  
 আশ্রম-কুটীরের এক পার্শ্বে একটি মোটা  
 গোবদা জান্না ছিল, সেই জান্নার কপাট ছালা  
 আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে একটি যুবতীর মুখমণ্ড-  
 লের উজ্জ্বল ছটা নৃপতির চক্ষের উপর দপ-  
 কোরে জ্বলে উঠল, জান্নাটি তখনই আবার  
 পূর্বের ছায় রুদ্ধ হলো। রাজা সেরূপ  
 মুখকমলের প্রফুল্ল রাগ পূর্বে কখন অবলোকন  
 করেননি, সে ছটি নয়ন-জ্যোতির এত তেজ  
 যে, মর্ত্যালোকে তা সহ কোন্তে পারে না।  
 রাজার চক্ষু দুটি সেই অপরূপ জান্নার দিকে  
 অবিচল হোয়ে রইল, তিনি মনে কোলেন,  
 হয় ত সেই শ্রাণ-প্রজন্মকর চন্দ্রবদনখানি আর  
 একবার দেখতে পাবেন, কিন্তু কি পরিতাপ!  
 সে জান্নাটি চিরকালের জন্তে বন্ধ হোয়েছে,  
 আর কখন তা মুক্ত হবে না। সে নব মুকুলিত  
 প্রফুল্ল মুখের পরিবর্তে এক্ষণে কেবল পূর্বের

মত চতুর্দিকে ঘোর ভয়ঙ্কর জ শূন্য উদাস  
তরঙ্গ দেখতে গাল্গলেন । কতুবরা? চমৎকৃত  
হোয়ে এই কটি কথা বোলেন, “উদাসীন কারে  
এখানে বন্ধী কারে রেখেছেন ? এ স্বীকৃতি  
কে ? মামণী না অপ্সরা ?” অমাত্যেরা শুনে  
বিস্মিত হোলেন যে, রাজা আপনি আপনি কি  
বোলছেন ? কিন্তু তাঁরা ও কথার কোন উত্তর  
কোলেন না, রাজা জিজ্ঞাসা কোলেন, “চুপ  
কোরে রইলে যে, তোমরা কি কেউ দেখতে  
পাও নি ? ইজ্রপুর থেকে একটি অপ্সরা এসে  
ঐ জানালাটি একবার উদ্ঘাটন কোরেছেন ।”  
অমাত্যেরা বোলেন, “ঐ রামকুড়ের মধ্যে অপ-  
সরাতুলা রমণী—এ অতি অসম্ভব কথা—এ  
কথা কখনই সম্ভব হোতে পারে না ।”

রাজা বোলেন, “আমি যে বোলছি,—যথা-  
র্থই একটি ষোড়শী স্ত্রী,—এই ছফ্ ছটি তার  
বিকসিত মুখপদ্ম দর্শন কোরেছে, মুখপানির  
প্রভা এত উজ্জ্বল যে, তার তেজে আমি অন্ধ  
হোয়ে গেছি, শুধু অন্ধ নয়, তার প্রতি একবার  
দৃষ্টি কোরে আমার চক্ষু ছুটি পুড়ে কলসে  
গেছে । যে একদৃষ্টে মাধ্যাহ্নিক সূর্যের দিকে  
চেরে থাকে, আমি ঠিক তারই মতন হোয়েছি,  
যেমন দিকভ্রান্ত পথিকের, কি যেমন ব্যাগোয়ত  
জ্যোতির্বেতার। একটি জ্যোতির্গ্নয় নক্ষত্রের  
ঈষৎদীপ্তি কতক্ষণে আর একবার দর্শন কোর-  
বেন, সেই ক্ষণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হন, আমা-  
রও অবিকল তাঁদেরই দশা হোয়েছে, কতক্ষণে  
আর একবার সেই বদনকান্তির উজ্জ্বল ছবি  
মিরীক্ষণ কোরুব, তার নিমিত্ত আমার মন  
নিভান্ত ব্যাকুল হোয়েছে, তোমরা এতে কি  
পরামর্শ দাও ?” নিকটেই একটি নিমরক্ষ ছিল,  
সেটি বহুকালের, আর বহু দূর-প্রসারিত,  
অমাত্যেরা অমুমতি লয়ে ঐ নিমরক্ষের  
ছায়ায় বোসে কিং-কর্তব্য পরামর্শ কোন্ডে বস-  
লেন । কতুব হাতীর পাশে দাঁড়িয়ে সেই অব-  
রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে একদৃষ্টে চেরে রইলেন ।  
পারিষৎগণের মনে ভাবি সন্দেহ হলো যে, রাজার  
বুদ্ধির ব্যতিক্রম জন্মেছে—পাপযোগী তাঁরে  
কিঞ্চ কোরে ভুলেছে, সে কি মায়া জানে, তারই  
প্রভাবে আশাদের রাজ-স্বামীর মতিচ্ছন্ন হোয়েছে,

যোগী জাহ্ন কোরে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হরণ  
কোরে লয়েছে, এক্ষণে পরামর্শ কি ? কি করা  
কর্তব্য ? যোগীর মায়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার  
উপায় কি ? অমাত্যদের মধ্যে এক ব্যক্তি  
বোলেন, “ভাই ! এক যুক্তি আছে—পাঁচ রকম  
বোলে কোয়ে রাজাকে বোঝান যাক যে, এ  
সকল মায়ায় খেলা, মায়াতে অভিভূত হোয়ে  
কেবল ভ্রম দেখছেন ।” আর এক ব্যক্তি  
বোলেন, “তা নয়, তার চেয়ে আর এক পরামর্শ  
আছে—রাজ্যসংক্রান্ত তর্ক উঠিয়ে বাদামুগ্ধ  
আরস্ত কোরে দেওয়া যাক ।” তৃতীয় ব্যক্তি  
বোলেন, “তার চেয়ে আর এক কাজ কোয়ে  
ভাল হয়—বানশাহের মন যাতে প্রফুল্লিত হয়,  
সেইরূপ একটা ধোঁসগল্প আরস্ত কোরে দিলে  
ভাল হয় না ? তা হোলে হয় ত সেই আমোদে  
মেতে যোগীর কুটারের বিষয় বিস্মৃত হবেন, শেষে  
ক্রমে তাঁর নষ্ট-জ্ঞান উদ্ধার কোন্ডে পারবেন—  
যেমন ছিলেন, অবার তেমনই হবেন ।” ওমরাও  
দের মধ্যে একজন প্রবীণ বুদ্ধ ছিলেন, তিনি  
বোলেন, “ভাই রে ! তোমরা যে পরামর্শের  
কথা বোলছো, সে সকলি ভাল বটে, তার উপর  
আর কথা নেই সত্য, কিন্তু কি কোরেই বা  
তাঁরে হাতীর উপর বসান যায় ? আর এখান  
থেকে তাঁকে তফাৎ করা যায়ই বা কি কোরে ?  
তার উপায় কি ঠাউরেছো ?” এক ব্যক্তি ঐ  
কথা শুনে বোলেন, “চলুন, সকলে গিয়ে রাজাকে  
বলি, মহারাজ ! এখন চলুন, এর পর কোন  
সময় সেই মনোরমা যুবতীকে বিলাস-গৃহে  
পৌছে দেবো, প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, রাজধানীতে  
পৌছে রাজকার্যের বন্ধটের মধ্যে একবার প্রবেশ  
কোলে এ ভ্রম তাঁর কখনই থাকবে না, দেটি  
আপনি স্থিরই জানবেন, রাজা ভূভাগ্যক্রমে যে  
কুহকে পোড়ে জ্ঞানশূন্য হোয়েছেন, তখন আর  
তাঁর সে মায়াবুদ্ধি থাকবে না, সে ভাব একে-  
বারে উটে ষাবে ।” সকলেই এই মতে মত  
দিলেন । রাজার যে বুদ্ধির ভ্রম হোয়েছে, তিনি  
যে কেবল মায়া দেখছেন, এ কথা স্পষ্ট বোলে  
কতুব যদি বিশ্বাস না করেন, কি প্রত্যয় না যান,  
তখন তাঁরা ঐ উপায় অবলম্বন কোরবেন, এই  
পরামর্শ স্থির হলো । ওমরাওরা এই মন্ত্রণা স্থির

কোরে মতিহীন রাজার কাছে উপস্থিত হোলেন । একটি একটি কোরে সকল গুণাগুণ তিন তিনবার মুক্তিকার উপর শির নত কোরে উচ্চনাদে বোলেন,—“হজরত ! আদাব !” কুতুব বোলেন, “তোমাদের কি পরামর্শ স্থির হলো, আমায় বল, তাই শোনবার নিমিত্তে তারি নাক হোয়েছি—বলো, তোমাদের কি পরামর্শ স্থির হলো ?” ওমরাওদের মধ্যে কারুরি-ইচ্ছা না যে আগে কথা কন, সকলেই নীরব হোয়ে রইলেন । কারও মুখে বাক্য নাই, চতুর্দিকে সেনা উদাসের তরঙ্গ ধেলতে লাগল । রাজা বোলেন, “কি ! তোমরা কি কিছুই স্থির কোত্তে পারো নি ? তোরা এই মুখে রাজমন্ত্রী বোলিয়ে যেসাস ! তোদের কি লজ্জা নাই ? আপনা আপনি ঘণা হয় না ? নাদান মুখ ! হায় ! এ যদি আমীর জেনলা সঙ্গে থাকত !” জেম-শাহ নাম অন্তেই সেই প্রাচীন ওমরাও, যার কথা পূর্বে বলা হোয়েছে, মহারাগত হোয়ে সব প্রথম কথা কোয়ে সকলের নির্বাক্তরত ভক্ত বোলেন, তিনি বোলেন, “হজরত ! গোলাম যোড়হাত কোড়ে, হজুর ক্ষান্ত হোন, নিবেদন কোছি, অবধান করুন, আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত কোরেছি, হজুরের মতিভ্রান্তি হোয়েছে, বুদ্ধির প্রমাদ জন্মেছে, আপনি সকলি আকাশ-কুসুম দেখছেন, হজুর যেক্রপ রূপলাবণ্যের কথা বোলছেন, সেরূপ চাক্র মোহিনী যোগীর কুটীরমধ্যে বিজমান নাই ।”

বুদ্ধের মুখে ঐ কথা শুনে কুতুব ক্রোধে গলাবতার হোলেন, তলোয়ারখানি কোমর থেকে বার কোর বোলেন, “তুই যদি বুদ্ধ না হোতিস, তোর চুল যদি খেতবর্ণ না হতো ব এই তলোয়ার বুকে—” এই সময় সেই স্মিরের বিকট গোল চেহারা গবাক্ষের ছিদ দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে, রাজা দেখতে পেলেন, তিনি এ পর্যন্ত সেই জানলার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন, তাই দেখেই যোগীর কথাগুলি কুতুবের অরণপথে উপস্থিত হলো । তিনি তখন সেই খুনোদ্যাত হত্যারথানি গেলাপের মধ্যে ঢেকে পুনরায় কোমরে বেঁধে রাখলেন, তার পরক্ষণেই যোগীর

মুষ্টিটি অদৃশ্য হলো । কুতুব কিন্তু সেই জানলার দিকেই চেয়ে ছিলেন, তাঁর তারি বিষয় জ্ঞাতল যে, সেই এক গবাক্ষের পথে রস্পর ঘোর বিসংবাদী দুইপ্রকার চেহারা দ্বেষতে পেলেন ।

ওমরাওদের মধ্যে এক ব্যক্তি একপদ অগ্র বর্তী হয়ে বোলেন, “হজুর ! প্রাচীন ওমরাওর কথা শুনে রাজ-হৃদয়ে ক্রোধানল জাগবেন না, আপনার অন্তর যেন নিরাশে গ্রাস না করে, শৈলসুন্দরীর বিষয়ে নিকংসাহ হবেন না, তাঁর প্রতি যে রাজকুপা হোয়েছে, সেটি তাঁর জ্ঞানার বিষয় । এরপর কোন কৌশল কোরে সেই পক্ষ-নয়নাকে রাজ-অন্তঃপুরে উপস্থিত করা যাবে । সম্রাতি রাজধানীতে গমন কোলে ভাল হয় না ? সেখানে পৌঁছে জনেক দুজন বিশ্বস্ত লোকের উপর ঐ কর্ণের ভার দিয়ে কুটীর আশ্রমে পাঠান যাবে, তা হোলে কারুর মনে কোন সন্দেহ হোতে পারবে না, কেউ জানতে পারবে না যে, আমাদের অভিপ্রায় কি ?” কুতুব শুনে বোলেন, “ভূমি বিজের মত কথা বোলেছো, তবে চলো, এখন আমরা প্রস্থান করি ।” রাজহন্তী হকুম আমল করবার চিরপরিচিত সঙ্কেত কথা শুনে হাঁটু পেতে মূপালকে পিঠের উপর বসালে, কুতুব মহা ধুমধামের সহিত শঠৈঃ শঠৈঃ অগ্রসর হোতে লাগলেন, পারিষদেরা বাদশাহকে কোতুকী করবার নিষ্ঠা নানা প্রকার বেল্লীক গল্প সুরু কোরে দিলেন, কুতুবের কানে কিন্তু তার এক কথাও প্রবেশ করেনি, তিনি আপ-নার ধ্যানেই ভোর হোয়েছিলেন । সকলে ছাউনিতে পৌঁছিলে রাজার সম্মানার্থে তোপ-ধনি হলো, অনেকক্ষণ ধোরে জ্যেষ্ঠক বন্ধুকের আওয়াজ হোতে লাগল । রাজসভার প্রধান প্রধান কর্মচারী মাঝে কুতুবের সমভিব্যাহারে এসেছিলেন, শুষ্ক ৬০০০ লস্কর তাঁর সঙ্গে ছিল ।

রাজার আর দুদিন বিলম্ব সহিল না—ছাউ-নিতে এসেই স্থির হোলেন, একটি হাতী সুস-জ্জিত কোরে জনকয়েক লোক সঙ্গে দিয়ে পীরপকাল পর্বতের উপর পাঠান হোক, ঐ লোকের হাতে বাদশাহ স্বয়ং উদাসীনের নামে এই মর্মে এক পত্র লিখে দিলেন যে,

সেই পত্র পাবারাজেই যোগিবর গলকন্দার রাজ ছাউনিতে উপস্থিত হন, যে হেতু, রাজার একান্ত বাসনা যে, তিনি তাঁরে সৎপরা মর্শ আর সৎ উপদেশ প্রদান কোরে চরিতার্থ করেন। পীরপঞ্চাল পর্বত গলকন্দ-রাজ্যের অন্তর্গত নয়, সুতরাং রাজবাসস্থ। অল্পসারে যোগিরাজের উপর কুতুব ঠাণ্ড কোন হুকুমজারী কোন্তে পারেন না, না তাঁর উপর বল প্রকাশ কোন্তে পারেন, তাও পারেন না। বিশেষতঃ যোগিরাজের সাধু চরিত্রের গুণে অত্যন্ত পবিত্র-ধ্যাতি আছে, প্রতিবেশী রাজারা তাঁরে অভয় আশ্রয় দিয়ে নিকটে রেখেছেন, কুতুব কি দৈদৃশ ব্যক্তির প্রতি জ্বরদন্তি কোন্তে সাহস করেন? তবে যে স্থলে বল প্রকাশ করবার ক্ষমতা হলো না, সে স্থলে চাতুরীর আশ্রয় লওয়াই আবশ্যক হলো। পরমহংসকে একবার দরবারে এনে আটক কোন্তে পাল্পে হয়, তার পর গুট পুরুষ নিযুক্ত কোরে তাঁর কুটীর অভিযুখে পাঠান হবে, তাদের এই কথা শিখিয়ে দেওয়া যাবে যে, তারা যেন সেই গিরিসুন্দরীকে চুপে চুপে ধোরে লয়ে গলকন্দার রাজধানী সেই বাগ্নগরে নিয়ে উপস্থিত করে। সেখানে যুবতীর সমা-দরের নিমিত্ত বিলাস-মন্দিরের মধ্যে স্থান প্রস্তুত কোরে রাখা হবে। কুতুবের দরবারেতে এই পরামর্শ স্থির হলো। এদিকে যোগিবর রাজদর্শনে বেরুলেন, বাদশাহসদৃশ ব্যক্তি তাঁর পরামর্শের প্রার্থী হোয়ে অনেক জ্বতি-মিনতি কোরে লিখে পাঠিয়েছেন, সেই আক্লাদেই হোক, কি বাদশাহ কেন ডেকেছেন, এত কি তাঁর প্রয়োজন হোয়েছে, ঠাণ্ডাই না কেন, একবার দেখেই আসি ব্যাপারটা কি? এই কৌতূহল-কণ্ঠের জন্তই হোক—তা যে জন্তই হোক, ফলে যোগিরাজ পত্র পেয়েই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ কোরে ছাউনিতে চোলে গেলেন। তিনি সেখানে পৌছে যেমন তাঁর মধ্যে প্রবেশ কোরবেন, অমনি তোপ-ধ্বনি হলো, ত্রিতোপের ছুটি অর্ধ—যোগীর সম্মান করাও হলো, আবার প্রাণিদিগকে সঙ্কেত কোরে বোলে দেওয়াও হলো যে “তোমরা এই শুভ অবসরে সেই গিরিদেশে যাত্রা কর।”

একখানি ডুলি কাপড় দিয়ে ঘেরে কতক গুলি মুক্তমুখ বগা বেহারার ঘাড়ে দিয়ে সেই গিরিশিখরে পাঠান হলো, তাদের সঙ্গে তিন জন গুপ্ত পুরুষ গেল, তাদের কাটখোটার মা গোঁয়ারে গোঁয়ারে চেহারা, তাই দেখেই হোক কি যে কর্ম নির্বাহের জন্তে তারা গি-থোয়েছে, তাতে তারা বিখ্যাত কৃতকর্মী—সেই জন্তেই হোক, ফলে তাদের বেছে বেছে এ কাজের উপযুক্ত দেখে পাঠান হোয়ে যত শীঘ্র পাল্পে, অল্পচরেরা যোগীর আশ্রয় উপনীত হলো। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করার সময় কোন প্রকার ধুমধাম কি গোঁঘাম না কোরে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ভিত চোলে গেল। মুহূর্তকাল এদিক সেদিক তল কোরে একটা স্থল গোব্দা দরজা দেখা পেলো, দরজাটি হাত দিয়ে ঠেলাতে খুলে গিয়া একটি চতুষ্কোণ কামরা বেরিয়ে পোড়ল তা-র মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখে, একটি ভূবনমোহন মূর্তি শুয়ে আছে, অকাতরে নিদ্রা যা-ইনিই গোলকন্দারাজের মন চুরি কোরে অল্পচরের জ্ঞান হলো, যেন একটি পরী আছে, তারা অনেককাল পর্যন্ত যুবতীর ছবি দর্শন কোরে চক্ষের সার্থকতা লাগল, দেখলে, সুন্দরীর স্নানবদন জ্যোতিঃপ্রফুল্লিত করপল্লবের উপর আশ্রয় কোরে রয়েছে, মন্দ মন্দ বেগে নিশ্বাস পোড়ছে আরক্তিম অধর বেড়ে মুহু মুহু হাসি মুহু কোছে, অল্পচরেরা ত পার্বতীয় চোয়াড়, স্বভাবতঃ অতি নির্ভর, কিন্তু তাদেরও হৃদয় কঠিন নয় যে, সেই নিরুৎকণ্ঠ নিরীহ স্ত্রীলোকটির আনন্দময় পবিত্র বিরাম ভঙ্গ করে। যুবতীর কোমল নিদ্রার বিঘ্ন জন্মাতে তা-র সাহস হলো না, তারা একটু শোরে তকা-গিয়ে সুন্দরীর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা কো-লাগল। একটু পরে যুবতী পাশ-মোড়া দি-জাগলেন, অমনি রাজপুরুষেরা ঘরের মা-চুকলো, সুন্দরী তাই দেখে ভাড়াভা-একখানি আলম্বিত রক্তবর্ণের ধোমট মুখখানি ঢেকে হতাশ হোয়ে ঘোর চাঁ-কার কোরে উঠলেন। অল্পচরের ম-



এক ব্যক্তি বোলে, “বিবি! ভয় কি? আমরা তোমার অনিষ্ট কোত্তে আসিনি, তুমি আঁন্তা-কুড়ের মতন একটা কুস্থানে বাস কোচ্ছো, তাই এখান থেকে উঠিয়ে তোমার উপযুক্ত একটি মনোহর শোভাময় রাজাট্টালিকায় লয়ে যাব—আমরা সেই জন্তে এসেছি।” এই কথা বোলে সে ব্যক্তি তার খাটাশও হাত দিয়ে যুবতীর মধুর লাবণ্যময়ী শরীর বেড় দিয়ে বাথলে, তাই দেখে স্তন্দরী চকিত হোয়ে পুনর্বার ধোর চীৎকার কোরে উঠলেন—এ চীৎকার পূর্বাপেক্ষা আরও হৃদয়ভেদী। এই সময় আর একজন ছুরায়া অগ্রসর হলো, এখন দুজনে ধরাধরি কোরে চারু বালাকে কুটারের বাইরে লয়ে এলো, স্তন্দরী তাদের হাতের উপর মোহ গিয়ে অজ্ঞান হোলেন। কত আছড়া আছড়ি, টেঁচাটেঁচি কোরে লাগ লেন, দুর্জনেরা তা গ্রাহও কোলে না, তাঁর টেঁচানি কাতরাণি তারা কানেও ঠাঁই দিলে না। একটু দূরে পক্ষতের ঢালুতে ফুলিখানা রেখে এসেছিল, তাড়াতাড়ি সেই ডুলির কাছে লয়ে চলো, তারা তখন মনে কোলে, “আর ভয় কারে? মাল হাতের মধ্যে এসেছে।” এই সময় তিনজন সোয়ার সেই হতভাগিনী যুবতীর হৃদয়-বিদারক চীৎকারধ্বনি শুন্তে পেয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হলো। তারা তখনি বোড়া থেকে নেবেই তলোয়ার খুলে দাঁড়াল, চোয়াড় বদ্-মাসেদের ডেকে বোলে, “স্বীলোকটিকে ছেড়ে দে।” ছুরায়ারা ঐ কথা শুনে তারাও তলোয়ার লয়ে দাঁড়াল, গোলকন্দ-রাজার দোহাই দিয়ে সেই হঠাৎ উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে বলে, “তোরা কে? এখান থেকে চোলে যা, দূর হ, নচেৎ এই গোঁয়ারতামির জন্তে প্রাণটি এইখানে রেখে যেতে হবে।” এদিকে “আমাকে রক্ষা কর গো! আমাকে বাঁচাও গো! তোমরা দয়া কোরে ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে পরিদ্ধাপ কর পো! এরা আমার ধর্ম খেতে, আমার জাত খেতে বোৎসেছে,” এইরূপ বিলাপ কোরে গিরিসুন্দরী রোদন কোত্তে লাগলেন। আগন্তক ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে সকলের আগে দাঁড়াইয়াছিল, সে টেঁচিয়ে বোলে,

“আমার এই বাহর যদি বিক্রম থাকে, আর আমার এই পারসী তলোয়ারের যদি জোর থাকে, তুমি যেই হও, তোমাকে আমরা রক্ষা কোরব।” বদমানদের প্রতি চেয়ে, “ওরে নরাধম পাণ্ডি! আর! এগিয়ে আর! দেখি, তোর হিন্দুস্থানের তলোয়ারের কত বিক্রম।” রাজাপুত্রেরা তখন বেহারাদের হস্তে যুবতীকে সমর্পণ কোরে যুদ্ধ আরম্ভ কোরে। বেহারাদের মধ্যে কারুরই অস্ত্র ছিল না।

তিনজন হিন্দুস্থানী যোঁরয়ার মতন উন্নত হোয়ে লড়াই কোত্তে সুরু কোলে। পারসী তিনজন প্রশাস-মুর্তিতে, ধীরস্থিরচিত্তে, অতি সাবধান হোয়ে আঘাত-নিবারণে প্রবৃত্ত হলো। পারসীরা প্রথমতঃ হিন্দুস্থানীদের প্রতি প্রতি-প্রহার করবার প্রয়াস না কোরে কেবল আপনাদের শরীর বাঁচিয়ে শত্রুপক্ষের তলোয়ারের চোট্ নিষ্ফল কোত্তে লাগল, এই কৌশল উপলক্ষে পারসীরা এত চতুরতা প্রকাশ কোলে যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষেই এক ফোঁটা রক্তপাত হোতে পারেনি। ধূর্ত পারসীদের বেশ জানা ছিল যে, প্রথম উত্তমে মস্ত না হোয়ে আপনা বাঁচিয়ে চোলে রণোন্মত্ত হিন্দুস্থানীরা শীঘ্র অবসর হোয়ে পোড়বে, তখন তাদের বল-শক্তিও থাকবে না যে, স্থির হোয়ে অধিকক্ষণ লড়াই কোরবে, শেষে সেইটিই সত্য হলো—হিন্দুস্থানীদের স্থূল পীবর তলোয়ারের সতেজ প্রবল প্রহার অপ্রমত্ত পারসীরা সুপরীক্ষিত অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে নিবারণ কোত্তে লাগল। হিন্দুস্থানী শত্রুপক্ষেরা বেতালা ভীম-রব কোরে যত আফালন করে, পারসী বীর-পুরুষেরা কেবল মুচকে মুচকে হেসে উপহাস কোরে উড়িয়ে দেয়। হয় গিরিদেগে ঘন ঘন ঝড়-বৃষ্টি হয়ে থাকে, এইরূপ নিয়ম চিরকালই চোলে আসচে, নয় যোগিবর যে কথা প্রচার কোরে দেছেন, তাই সত্য হবে, অর্থাৎ এই গিরিদেগে অতিরিক্ত টেঁচাটেঁচি বা সোরসার হোলে ঝড়বৃষ্টি সেদিন হবেই হবে, সে স্থির কথা, অত্যা হবার নয়। এই দুই কথার মধ্যে কোন্ কথা সত্য, আমরা পাঠক মহাশয়ের উপর ভার দিলেম, তিনি তা স্থির কোরে



লবেন। ফলে ঐ ফরাসী আর হিন্দুস্থানীতে যে খোর লড়াই উপস্থিত হয়, তার অবসান হবার অনেক পূর্বে যে খোরতর খটা কোরে বৃষ্টি আর বড়ের তুফান আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা মিথ্যা নয়—খোর প্রবাহে বৃষ্টিপাত হোতে লাগল, আবার তেমনি বেগে বড়ের স্রোত চলতে লাগল। এক একটা দমকা বাতাস এসে ছ' ছ' গোঁ গোঁ শব্দে গিরিজাত বক্ষ-লতা ভেঙ্গে ছিঁড়ে একটাল কোরে ফেলে, গিরিদেশ ছিন্নভিন্ন হোয়ে গেল। পাহাড়তল ভিজে পেচল হলো। হিন্দুস্থানীদের ভারি অসুবিধা হোয়ে পোড়ল, তারা আপন আপন পা ঠিক রাখতে পারছিল না, সোরে সোরে যেতে লাগল। পারসীরা উচ্চস্থানে ছিল, সেটি তাদের পক্ষে মঙ্গল হয়ে দাঁড়াল। হিন্দুস্থানীদের বল-বিক্রম ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে আসতে লাগল, ক্রমে তারা ক্লান্ত হয়ে পোড়ল স্থির হোয়ে যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে ভার হোয়ে উঠল, ক্রমে তাদের লক্ষ-বম্প বিকট দমক ফুটিয়ে আসতে লাগল। এ যুদ্ধে শেষে যে ফল দাঁড়াবে, বেহারারা পূর্বে তা বুঝতে পেরে, সেই যুবতীকে ধোরে লয়ে পাহাড়ের নীচে চোলে গেল। পারসীরা এক্ষণে ভারি ব্যতিব্যস্ত হোয় পোড়ল, সেই তর্ভাগা পক্ষজ-নয়নার হৃদয়-ঘাতী চীৎকারধ্বনিতে তাদের কণ বধির হোতে লাগল, কিন্তু কি করে বিপক্ষদের ছেড়েও বেহারাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে পারে না। কিন্তু পারসীরা দেখলে, হিন্দুস্থানীদের বল-বীৰ্য্য ফুরিয়ে এসেছে, একজন ত মৃত্যুকায় পোড়ে রক্তের তরণে গড়াগড়ি দিচ্ছে, এক্ষণে আর সংখ্যাতত্ত্ব সমান নেই, বাকী দুজন হিন্দুস্থানী তিনজন পারসীর সঙ্গে সমকক্ষ হোয়ে কতকণ যুদ্ধে পারবে? তারাও ক্রমে ক্ষীণ হোয়ে পোড়ল পারসী যুবারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে লয়ে, হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে, বেঁধেই ডুলীর পেছনে পেছনে উর্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়ল, বেহারারা তখন একটি অতলস্পর্শ গহবরের ধারে ডুলী-ধানি তে থে বোসে আছে, দেখলে যে, পারসী তিনজন হন হন কোরে তাদের দিকে চোলে আসছে, তাই দেখে তারা মরিবস্তি কোরে

চৈচিয়ে বোলে, “আমাদের ছেড়ে দাও, প্রাণে মেরো না, নচেৎ দোহাই দৈবের, ডুলী-স্বক বিবিকে নীচে ফেলে দেবো।” এই কথা বোলেই তারা যেন ডুলী সমেত বিবিকে গহবরের ভিতর ফেলে দেয়, এইরূপ ভঙ্গী কোরে দাঁড়াল, তাই দেখে পারসীরা শপথ পূর্বক মহা ক্রিরে দিবি কোরে বলে, “না, আমরা তোদের প্রাণবধ কোব্ব না, ভয় নেই, তোরা ডুলী রেখে চোলে যা।” তার পরক্ষণেই সেই স্ত্রী লোকটি তাদের পায়ের উপর এসে পোড়লেন, তারা যে সময়মত উপস্থিত হোয়ে এই ভূমি বিখ্যাত মহৎ উপকার কোলেন, তার ভক্ত যুবতী ধন্বাদের উপর ধন্ববাদ কোরে তাঁদের আশ্রিত কোন্তে লাগলেন। এর পূর্বে নাকি অবশুষ্ঠনটি তাড়াতাড়ি অসাবধান পূর্বক যুগের উপর ঝেঁপে দেওয়া হয়, তাই সুন্দরী যখন উঠে দাঁড়ালেন, ঘোমটাটি খোসে পোড়ে গিয়ে একটি যেন পরীর মূর্তি বোয়য়ে পোড়ল, সে চন্দ্রবদনের নির্মল কান্তি একবার দর্শন কোলে, আর তা কদাচ বিস্মৃত হওয়া যায় না।

কৃত্বব্রাহ্মের অহুচরদের হাত থেকে যিনি সেই গিরিসুন্দরীকে মুক্ত কোলেন, তিনি কে? কার কাছে সেই রমণীর রূপটি পরিজ্ঞাপরূপ ঋণে আবদ্ধ হোলেন, এ কথা পাঠক মহোদয় আমা-দের জিজ্ঞাসা কোন্তে পারেন। সেটা খুব সম্ভাবনা বটে। সে ছঃসাহসী পুরুষ অত কেউ নয়, তিনি বীরমূর্তি মালেক, এক্ষণে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, সঙ্গে দুজন সহচর, কাশ্মীর হোয়ে গোল-কন্দায় চোলেছেন। সেই গিরিবাসিনী পদ্মিনীর কুসুম-কান্তির চারুছটা, আর তার কোকিলকণ্ঠ-নির্মিত অমিয় কণ্ঠস্বর মালেকের অন্তঃকরণে যুহুর্ভেকের মধ্যে প্রণয়ানল প্রজ্জলিত কোরে দিলে। যুবা সুন্দরীকে প্রিয়সম্বোধন কোরে স্নেহ-বচনে বোলেন, “রমণীরত্ন! বিধাতাই আমাদের সাধুবাদের ভাজন, তিনিই আপনার বিপৎকালে আমাদেরিগকে এই স্থানে উপস্থিত করেছেন। রমণীরত্ন! আমি আপনাকে বিনয় কোরে বোলছি, আপনার কি অহুমতি হয়, আজ্ঞা করুন, আপনি যেখানে বোলবেন, সেইখানে লয়ে যাব।” রমণী তত্বত্রে বোলেন, “হে

মহাপুরুষ ! আপনি দেবতুল্য মহাত্মা, যোগীর আশ্রম-কুটীর পর্য্যন্তই আমার বাসনা, সেই কুটীর থেকেই চোয়াড়েরা আমায় টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বার কোরেছে, আমায় সেইখানেই পৌঁছে দিন । আর যে পর্য্যন্ত সেই যোগিবর আপনার আশ্রমে ফিরে না আসেন, যে পর্য্যন্ত আপনি গ্রহরী গোয়ে আমার পরিরক্ষণ করুন ।” মালেক বোলেন, “তা অবগু-কোরবো, তবে আপনি ডুলীর মধ্যে প্রবেশ করুন—আমি আপনাকে রক্ষা কোরবো, কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকুন ।” বেহারারা সেই ডুলী লয়ে পর্ব্বতের উপর উঠল, সেই অমিয়-কমল কুমারী কুটীরে পৌঁছে আপনার পবিত্র পূজাক্ষেত্র কক্ষে প্রবেশ কোলেন, মালেক আর তার সহচর দুজন কুটীরের বাইরে চৌকী দিতে লাগলেন ।

রাজাহুচরদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধরাশায়ী হোয়েছিল, তাকে আর পুনরায় গাত্রোথান কোত্তে হলো না, বাকী দুজন অগ্ন্যধাতে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে, বিশবত অতিরিক্ত রক্ত-পাত হওয়ায় নির্জীবপ্রায় হয়ে, মাটিতে পোড়ে কেবল গৌ গৌ শব্দে গেজাতে লাগল, মালেক তাদের ক্ষতগুলি ধুয়ে পরিকার কোরে বৈধে দিলেন, নিকট থেকে জল এনে দিলেন, তারা পান কোলে, শেষে রক্তের শীতল ছায়াতলে পত্রের শয্যা কোরে, তার উপর তাদের শুইয়ে রাখলেন । মালেকের এখন আত্মলাদ হলো যে, তিনি জন্মভূমি আরুদ্রহান পরিত্যাগ কোরে এসে, এই একটি মহা উপকার কোরে জন্ম সার্থক কোলেন । যুবা মনে মনে বোলতে লাগলেন, “আমি যদি সেই লোক-অপরিত্ত অপ্রসিদ্ধ দেশে জীবন শেষ কোরে মৃত্যিকায় বিলুপ্ত হোতাম, তবে এ অনাধাকে কখনই উদ্ধার কোত্তে পাশ্বে না, তবে কখনই সেই ভুবনমোহিনীর কান্তিরূপ সূর্য্য আমার উপর বিমল জ্যোতি বিকাশ কোত্তে পাশ্বে না ।” আমাকে ভাগ্যবান পুরুষ বোলতে হবে, আমার যদি তাবৎ আয়াস, তাবৎ যত্ন এইরূপে সফল হয়, তবে যে কি শুভক্ষণেই আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ কোরেছিলেম, তা একমুখে বোলে উঠতে

পারিনে, কি বোলে যে সে মঙ্গলময় শুভ সময়ের শুভজন্মতি কোরবো, তাও বলতে পারিনে ।”

এই ঘটনাটি হোয়ে অবধি মালেকের মনে দৃঢ়প্রত্যয় হলো যে, তাঁর জন্মের সময় আচার্য্যেরা যাহা গণনা করেন, সে সকলি মিথ্যা, তাঁদের নিতান্ত ভ্রান্তি হোয়েছিল । “আমার ভাব সুখ-সম্পদের গ্রহদেবী এই সামান্য বহু কটীরেব মধ্যে বাস কোচ্ছেন, এই জনশূন্য উদাস স্থান নিবিড় মেঘ হোয়ে দেবীকে ঘোর ক্রুদ্ধ আবারণে ঢেকে রেখেছে, এক্ষণে যত্ন কোরে তাঁকে মেঘনিমুক্ত করাই আমার কার্য্য ।” এই কথাগুলি মালেক বড় বড় কোরে বোলেন, তার পর ভাবতে লাগলেন, “কে যে অজ্ঞাত বর্ণচোরা যাগী ? কে সে ব্যক্তি ? কে এমন অমূল্য নিপুণ, এমন নির্মল পবিত্ররত্নকে ছাপিয়ে রেখেছে ? কারও চক্ষুর্গোচর হতে দিচ্ছে না ?”

সন্ধ্যার রক্তছায়া সুপাকার হোয়ে, সমুদ্রে চতুর্দিকে সঞ্চারিত হলো, অচল গভীর কুঞ্জ-টিকায় গিরিপুর পরিব্যাপ্ত হলো । বায়ু প্রবাহ অশ্রুত সন্ সন্ শব্দে, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হোচ্ছে, রাজবাসের নিমিত্ত বিখন্ত পারসীরা ঐ স্থানে অবস্থিতি কোলেন, তাদের মস্তক উপর বৃক্ষ-শাখা, বৃক্ষপল্লবের অল্প অল্প মন্ মন্ শব্দ হোচ্ছে । মালেক লেঙ্গা তলোয়ার বুলিয়ে কুটীরদ্বারে প্রহরিতা কোলেন, তাঁর একজন সহচর আহতদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন সহচর কুটীরের পশ্চাৎদিকে টৌলিয়ে বেড়াচ্ছে, একবার সে মুড় থেকে এ মুড়র আসছে, আবার এ মুড় থেকে সে মুড়র যাচ্ছে । চক্রমা মাঝে মাঝে আপনার স্নেহকান্দি-পরাজিত হিন্দুস্থানীদের মুখমণ্ডলের উপর পূর্ণবর্ষণ কোলেন, তারা তৎকালীন রক্তের গাত্র চৈস দিয়ে অর্দ্ধশায়ী হোয়ে আছে, স্বপ্নের আর ললাটের বিকটদর্শন ক্ষতগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । এর মধ্যে ২৪টা একবার একখণ্ড ক্রুদ্ধমেঘ সঞ্চালিত হোয়ে রজনীনীধের রক্তচছটা ঢেকে ফেলে, আবার সমুদ্র গিবিদেশ অভেদ্য গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন হলো, আবার সে মেঘখানি সোরে গিয়ে প্রকৃতির সহায়্য মূর্ত্তি প্রক্ষুটিত হোতে লাগল । হস্ত-পদাদি সমুদ্র শরীর

শীতে যেন জল হোয়ে যাচ্ছে, তার উপর কোয়াশার ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে পারসী গ্রহরীদের সর্বাপেক্ষা অবশ্য হোচ্ছে। কতকণে রাজ শেষ হোয়ে প্রভাত-সূর্য্যের কোমল উজ্জ্বলে শরীর উত্তপ্ত কোরবে, তারা কেবল সেই চিন্তা কোত্তে লাগল। মধ্যে মধ্যে একবার একটা হাওয়া উঠে, মেঘগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হোয়ে চারদিকে ছোড়িয়ে পোড়ছে, বড় বড় বৃষ্টির শাখা ও পত্রদলের মধ্য দিয়ে শব্দধরের ধবল কান্না অতি প্রসন্নভাবে দেখা যেতে লাগল। এক্ষণে রাজ দ্বিপ্রহর। মালেক দেখলেন, একটি আকৃতি অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পার্শ্বীয় পথ দিয়ে কুটীর অভিমুখে আসচে, যে ব্যক্তি আঘাতী ব্যক্তিদের নিকটে দাঁড়িয়েছিল, সে ব্যক্তিও ঐ আকৃতিটি দেখতে পেলে, সে দেখেই “আল্লা! হো! আল্লা!” এই বোলে চীৎকার কোরে উঠল, চীৎকার কোরেই ভয়ে নিস্তব্ধ হলো। মালেক সাহসিক ছিলেন খটে, কিন্তু উপ-দেবতার ভয় কোতেন, সে কুসংস্কার থেকে তিনি বিমুক্ত ছিলেন না। মালেক আকৃতিটির শীর গভীর চলন দেখে একবার মাত্র মনে কোলেন, “এ আকৃতিটি হয় ত লোকান্তর হতে আগমন কোচ্ছে, এ দেহের নিবাস এ মর্ত্যলোকে নয়।” চন্দ্রমার খেতকান্তি মালেকের তলোয়ারের উপর পোড়োছে, তলোয়ারখানা বক্‌মক্‌ বক্‌মক্‌ কোচ্ছে, তাই দেখে আকৃতিটির গতি খানিক ক্ষণ স্থগিত হলো, এগিয়ে আস্‌চিল, থমকিয়ে দাঁড়াল, একটু দাঁড়িয়ে আবার তখনি কিন্তু অগ্রসর হোতে লাগল। গ্রহরী মালেক তাই দেখে আশ্চর্য্যন কোরে উচ্চরবে বোলেন, “কে তুমি এদিকে আস্‌চো?” তত্বতরে সেই দেহটি বোলে, “কে এ কথা জিজ্ঞাসা করে?” যেরূপ ঘোর গভীর শব্দে ও কথাগুলি নিনাদিত হলো, তাতে অমানুষেরই কর্ণধরের জায় জ্ঞান হতে লাগল, মালেক ভীত হোলেন, হঠাৎ পুনরুত্তর না দিয়ে, একটু সন্দিহান হোয়ে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু তার পরেই সাহসের উপর নির্ভর কোরে টেঁচিয়ে বোলেন “আমি দুর্জনের রক্ষক, শত্রুপীড়িত ব্যক্তির আশ্রয়দাতা এবং দীন-

দুঃখীদিগের বান্ধব। যিনি এই কুটীরের স্বামী, তাঁকেই কেবল আমার এই পদের ভার সমর্পণ কোরব।”

দেহটি বলে, “তবে এক্ষণে তুমি সমপণ কর, কুটীরস্বামী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।” এই কথা বোলতে বোলতে মৃতিটি এগিয়ে এসে এই উক্তি কোলেন, “এই শব্দকের মধ্যে যে রক্ত ছিল, তারে টেনে ছিঁড়ে বার কোরে নিয়ে গেছে, এখন কেবল দীন র জায় অনাথ হোয়ে আধারটি পোড়ে আছে; তবে আর তোমরা কেন বুঝা চৌকী দিচ্ছো?”

মালেক বোলেন, “হে পূজ্যপাদ যোগিবর! আপনি যার ভয় কোচেন, সেটি ঘটে নি, রক্তটি সাজীর মধ্যেই আছে, হয় না হয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে স্বচক্ষে দর্শন করুন, তখন বিশ্বাস হবে।”

“তুমি আশ্চর্য্য কথা বোল্‌ছো! এই কুটীর মধ্যে সে রক্তটি নির্ঝিয়ে আছে? হে মহাত্মাবর যুবা! এই বুদ্ধ তোমায় আশীর্বাদ কোচ্ছে, গ্রহণ করুন, আপনি কে, আমার বলুন? আপনার কথাগুলিতে যেন গৌরব মাখা, তাতে যেন মহত্ত্ব ভরা রয়েছে, আপনার কার্য্যই আপনার মহৎ আশ্রয় সম্ভ্রমণ কোচ্ছে, আমার শীঘ্র বলুন, আপনি কে? আপনি যদি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে থাকেন, আমি আপনাকে আর কি দিয়ে সম্বলিত কোরব, একমাত্র আশীর্বাদ আমার সঙ্গীল, গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোরব, তাঁর প্রসাদ-বলে আপনার মঙ্গল হবে, তিনি আপনার মঙ্গল কোরবেন।”

যোগিবরের অঙ্গপঙ্খিতে বা বা খোটেছিল, মালেক তাঁকে অবগত করালেন। বুদ্ধ মালেকের ছুটি হাত ধোরে নীরবে রোদন কোত্তে লাগলেন। বীর-অবতার পারসীদের যেরূপ দুর্দান্ত পরাক্রম, আর যেরূপে তাঁরা কুতুবের দুশ্চেষ্টা থেকে সুন্দরীকে রক্ষা কোরেছেন, সে সকল বৃত্তান্তও যোগিবর সেই রমণীর প্রেরণা-নিক অবগত হোলেন। যোগিরাজ মালেককে বোলতে লাগলেন, “রাজ-ছাউনিতে উপস্থিত হোলে যে তাঁরূতে বাদশাহ ছিলেন, সেইখানে আমার লগ্নে গেল, রাজা আমার

সেইরূপ সমাদর কোলেন, তা তিনি না কোলেনই  
পাশ্চাত্য; সেসকল গৌরব করবার কোন আব-  
শ্যক ছিল না। তাঁর মধ্য গিয়ে শুনলেম,  
রাজা পীড়িত, শুনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হলো।  
তখন সাক্ষাৎ না হোয়ে এক খণ্টা পরে দেখা  
হবে এই কথা আমার বোলে পাঠালেন, সেই  
নির্দিষ্ট সময়, পুনরায় সেখানে উপস্থিত  
হোলেম, রাজা ফের সেই অন্তঃকরণের ওজর  
ফের দেখা কোলেন না, অমাত্যেরা  
বোলে, আর এক খণ্টা পরে দেখা হবে।  
আমি আবার সেই সময় রাজ তাঁরুতে  
গিয়ে উপস্থিত হোলেম, এবার অনেককণ পর্য্যন্ত  
অপেক্ষা কোলেম, শেষে শুনলেম, স্রীমানের সঙ্গে  
আজ সাক্ষাৎ হবে না, কাল হবে। আমার মনে  
তখন দারুণ সন্দেহ হল, ভাবলেম, আর কিছু  
না, এদের মনে মনে কি একটা ভারি ছুরতি-  
কাজ আছে, ভিতরে ভিতরে কি একটা অগাধ  
দুবংগাহ চক্র কোরেছে, সেই সময় মনে  
শোড়ল, আমার হেহের হার সেই নবীন  
কালকে একাকিনী পরিত-কুটীরে ফেলে  
এসেছি—এই কথাটি আমার অন্তঃকরণের মধ্যে  
যেন দপ কোরে জ্বলে উঠল, কি আমার মন  
যেন ডেকে বোলে, আমি সেই মুহূর্ত্তে ছাউনি  
পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে রওনা হোলেম।  
তখন গিরিশিখরে পৌছিলেম, তখন রাজ দ্বিপ্র-  
হর, অত্যন্ত ক্লান্ত হোয়েছি, প্রায় নির্জীব হোয়ে  
পোড়েছি, চেয়ে দেখি, কুটীরের নিকটে আপ-  
নার দাঁড়িয়ে, লেঙ্গা তলোয়ারের উপর চন্দ্রা-  
কপ পতিত হোয়ে চক্ মক্ চক্ মক্ কোচ্ছে,  
যেন নৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে, যে ছুর্ত্ত ভয়  
কোচ্ছিলেম, সেই ভয় তখন আরও পরিপক  
হলো, শেষে যে প্রকারে সে ভ্রান্তির অবসান  
হোয়ে মহা আনন্দিত হোলেম, তা ত অবগতই  
আছেন।”

পরদিবস মালেক সেখান থেকে চোলে  
যাবার উদ্দেশ্যে কোলেন, বিদায়ের পূর্বে  
যোগিবরকে বিনয় কোরে বোলেন, “বাবা  
অতি দুর্ভয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এক্ষণে তিনি  
শারীরিক কেমন আছেন, এই কথাটি তাঁর  
সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে স্বয়ং জিজ্ঞাসা কোতে

বাসনা করি।” তাপসবর প্রথমতঃ সন্দেহ কোরে  
ইতস্ততঃ বিবেচনা কোতে লাগলেন, শেষে  
বোলেন, “তাঁবে এইখানেই গিয়ে আসি, তিনিও  
তাঁর মুক্তিদাতাকে সাধুবাদ করবার জন্তে ব্যগ্র  
হোয়েছেন।” এই কথা বোলে যোগী উঠে  
গেলেন, একটু পরেই যুবতীকে সঙ্গে কোরে  
ফিরে এলেন। বাবা দীর্ঘায়ত খেত ঘোমটার  
আপাদ-মস্তক ঢাকিয়াছেন, মালেকের একান্ত  
বাসনা যে, সুন্দরী ঘোমটা উন্মোচন করেন।  
যে কমল-নেত্রের উজ্জ্বল প্রভা অবগুর্গনের মধ্যে  
ঢাকা রয়েছে, যে বিনোদ-আঁখি একবার  
মালেক স্বচক্ষে দর্শন কোরেছেন, যে অমিয়  
বদনকান্তি এক্ষণে ছপ্পের ছায় শুভ্র মহামূল্যের  
মসলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত, যে ইস্ত্রুবদন একবার  
তিনি নিজ চক্ষে অবলোকন কোরেছেন,  
এক্ষণে মালেকের একান্ত ইচ্ছা, সেই সরল  
কোমল জ্যোতি পুনরায় তাঁর উপর বিকশিত  
হয়। যোগিরাজ মালেকের দেহ-মহিমার প্রতি  
একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, মালেক অতি কাতর  
হোয়ে জিজ্ঞাসা কোতে লাগলেন, “কেমন যুব-  
তার ত কোন অসুখ হয় নি? শরীরগতিকে  
স্বচ্ছন্দে আছেন ত?” যে সকল ভ্রাতা হৃদয়-  
ভঙ্গী হোয়ে সুন্দরীর কোমল হৃদয় ভয়ে আক-  
ম্পিত কোরেছিল, মালেক তাদের যৎপরোনাস্তি  
অভিসম্পাত কোতে লাগলেন, যুবতী মালেক  
কে সাধুবাদ কোলেন। সুন্দরীর পবিত্র কঠ-  
স্বর অমিয় সৌরভে পরিপূর্ণ, একবার শুনলে  
কশ্মিন্ কালেও কেউ বিস্মৃত হোতে পারেন না।  
যুবতী এক্ষণে বিদায় হোয়ে গাজোখান  
কোলেন।

প্রেমানন্দে মগ্ন সেই যুবা চোঁচিয়ে বোলেন,  
“কোথায় যাও, একটু বোসো, এই যা দেখা  
হলো, আর কি আমাদের সাক্ষাৎ হবে না?  
আর কি এ নির্জন দেশ দর্শন কোতে আসতে  
পাবো না? আর কি তোমার অমিয় কণ্ঠস্বর  
শোনার জন্তে এ নির্জন গিরিদেশ দর্শন  
কোরুব না? হে রমণীরাজ! আমাকে বনবাস  
দেবেন না, আমার উপর বিচ্ছেদ-দণ্ডের ব্যবস্থা  
কোরবেন না, তা যদি করেন, যে ক-দিন বেঁচে  
থাকুব, কেবল দীনহীন অনাথের হায় পথে

পথে কৈঁদে কৈঁদে বেড়াতে হবে, সে কষ্ট কি, তা মুখে বোলে উঠতে পারিনে।”

যুবতী বোলেন, “হে বীরপ্রধান পারদীবর! আপনার অগ্রে যে যোগিরাজ বসে আছেন, ঐ মহাপুরুষের আদেশানুসারে আমি চোলে থাকি, তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য, তাঁকেই আপনার প্রার্থনা অবগত করান, পরমেশ্বর করুন, আপনার মনোবাঞ্ছা সকল হোক।” তার পর সুন্দরী অতি যত্নস্বরে অধর কম্পিত কোরে বলেন, “তবে এক্ষণে বিদায় হোলেম।” ঐ কথা বোলে যুবতী উঠে চোলে গেলেন। মালেক কিছু জিজ্ঞাসার তুফায় যোগীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। যোগী মস্তক কম্পিত কোরে বোলেন, “না।” যুবী বোলেন, “কি! আর কি আমি এ কটীর দর্শন কোত্তে পাব না? মনের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমার ইচ্ছা যে, স্বয়ং এসে দেখে যাই, যুবতী নিরুিয়ে আছেন কি না, তাই জেনে যাই, আপনি কি আমায় সে সুখে বঞ্চিত কোত্তে চান?”

যোগী বলেন, “ইচ্ছা হয়, আসবেন, কিন্তু একলা আসবেন, আর আসবার সময় গোলমাল কোরবেন না, চুপে চুপে আসবেন, আবার এ কথাও বোলছি, এ স্থানে আপনি আগমন কোরবেন না। আচ্ছা, তবে এক্ষণে আসুন, আমি চোলেম।” যুবী বোলেন, “এ আহত ব্যক্তিদের দশা কি হবে? এদের ত একটা কিনারা করা চাই।” যোগী তাদের হস্ত-পদের বান্ধন খুলে দিয়ে পরীক্ষিতল দেখিয়ে দিয়ে বোলেন, “দূর হ কালায়ুধো, কালায়ুধ কর, আর কখন এ পথে আসিসনে।”

রাজপারিষদেরা যে দিবস বাগনগরে পৌঁছলেন, মালেক তার পরদিন গোলকন্দার রাজধানীতে উপনীত হোলেন। জেমলার অহুসঙ্কান করায় লোকের মুখে শুনলেন, তাঁর সহোদর বিস্তর সৈন্য সঙ্গে কোরে কর্ণাটে যুদ্ধযাত্রা কোরেছেন, কতদিনে কিরবেন, তার নিশ্চয় নেই। মালেক ঐ খবর পেয়ে অতিশয় ক্ষুব্ধ হোলেন। বাদশাহ যে কদিন রাজধানীতে ছিলেন না, জেমলা যেন মাহেজ্জফ পেয়ে বসে ছিলেন, আমীর সেই অবসরে অনেক অর্থ হস্ত-

গত করেন, তাঁর ঐখ্যের ভাণ্ডার ত পরিপূর্ণই ছিল, তার উপর আরও বিপুল বৈভব গোলাজাত কোলেন। জেমলার অশান্ত স্বভাবের নিমিত্ত, বিশেষতঃ তাঁর অসৎ প্রকৃতির জন্যে একবার কিন্তু তাঁর প্রাণ লয়ে টানাটানি পড়ে, সেই দিন অবধি রাজার মনে থেকে একেবারে জন্মের মত দূর হোয়েছেন, তাঁর প্রতি নৃপালের যে শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, সে সকল অমুগে উৎসন্ন হয়েছে। জেমলা এক দিন পাকে প্রকারে যুবতী মহিষীকে দেখতে পেয়ে নানা প্রকার অসৎ কল্পনা কোত্তে লাগলেন, যাতে রাজ-সীমন্তিনীর সঙ্গে একবার অন্তঃপুরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তার কোশল কোত্তে লাগলেন, ঐ অভিপ্রায়ে জেমলা অন্তঃপুররক্ষক খোজা প্রাণের সঙ্গে দেখা কোরে ভাবপ্রণয় কোলেন। খোজা আমীরের চাতুরীতে মুগ্ধ হয়ে, একখানি পত্র রাজ্ঞীর হস্তে প্রদান কোলে। পত্রখানি কতকগুলি উদ্গাদ, অসঙ্গত, প্রমোদবাক্যে পরিপূর্ণ ছিল, রাজপত্নীর প্রতি তিনি যে অনুরাগাক হোয়েছেন, শুদ্ধ সেই মর্ম্মই তাতে প্রকাশ। পত্র-সমাপ্তির সময় জেমলা অতি কাতর হয়ে বিস্তর স্ততিমিনতি কোরে লিখেছেন যে, একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎহোলে চরিতার্থ হবেন। খোজ একখানি তত্ত্বকুল উত্তর আমীরের হাতে দিয়ে বোলে, “আজ রাত্র দুই প্রহরের সময় বিলাস-মন্দিরের পার্শ্বস্থিত প্রমোদ-উদ্যানে রাজ্ঞী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন।” মুখের কথা বার কোত্তেই বেগম তখন তাঁর প্রস্তাবে সন্মত হোলেন, এতে কারমন না আশোদে যেতে উঠে জেমলা ঐ প্রত্যুত্তর পেয়ে আহ্লাদে ফুলে উঠলেন। আমীর এক দুই কোরে কেবল সময় গুনতে লাগলেন, কুড়ে সময়ও যেন আরও কুড়ে হয়ে পোড়ল, যেয়েও যায় না। দুই প্রহর বেঞ্চে বাজে না। কতক্ষণ ছটফট কোত্তে কোত্তে সেই মধুর সময় উপস্থিত হলো, পূর্বোক্ত খোজা প্রধান আমীরকে সঙ্গে কোরে সেই বাগানে লয়ে গেল। শামীর মনে কোলেন, তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন, মহিষী স্বয়ং তাঁর দিকে চোলে আসছেন, শশধরের উজ্জ্বল ষ্ঠেতজ্যোতিবে রাত্র প্রফুল্লিত, স্ততরাং তাঁর যে ভ্রম হবে,

তত প্রফুল্লিত খেত আলোতে আমীর বে রাজীকে চিন্তে পারবেন না, সে কথা কথাই নয়, তখাচ একবার খোজাকে জিজ্ঞাসা কোলেন, খোজা ষাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, “হাঁ, বেগমই বটেন।” এই কথা বোলে সে চোলে গেল। একটি স্থান অনেক কমলা বৃক্ষে সুশোভিত, পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌরভে স্থানটি অমোদিত হয়ে আছে, সেই পুষ্পকুঞ্জে নাগকনায়িকার পরস্পর স্বন্দর্শন হলো। জেমলা রমণীর হাত ধরে আপনার পাশে এনে আঙ্লাদে চোলে চোলে পোড়ে বড় বড় কোরে বোলতে লাগলেন, “আ! আমার হৃদয়েশ্বরী! আমার মনোময়ী প্রতিমা! এই মুহূর্তকালের সুখের নিমিস্ত আমি কতই লালারিত ছিলেম।” তাঁর সহচরী রমণী, “চূপ্ চূপ্, আস্তে আস্তে” এই কথা বোলে পায় পায় এগিয়ে গেলেন। জেমলা বাতুলের ভায় বিড় বিড় কোরে কত কি অসদ্বাক্য অর্থহীন এলো-মলো কথা বলতে বলতে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেন। রমণী তাঁর যথেষ্ট খাতির-যত্ন কোরে-ছেন, সেই সাহসে ফুলে উঠে জেমলা প্রণয়িনীর মধর আরক্তরাগে রঞ্জিত জ্ঞান কোরে প্রেম-রাগের চিহ্নে অঙ্কিত কোত্তে গেলেন, যেমন তাঁর অধরে অধর চেপেছেন, অমনি “তোবা তাবা” বলে তড়াক কোরে লাফিয়ে পাঁচ হাত পেছিয়ে পোড়লেন, কামিনী অমনি হি হি কোরে ঘোর বিকট শব্দে হেসে উঠল, আমীরের হৃৎকম্প উপস্থিত, আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে গোটাগোটা হয়ে রইলেন। জেমলা নব যুবতী বেগমের মুখে মুখ না দিয়ে, যৌবন-তরঙ্গের অমিয়-মাধুর্য্য-সৌরভের আচ্ছাদনে লোমাক্ষিত না হোয়ে, অন্তঃস্বহীন একটি অষ্ট-বক বৃদ্ধা কাকুরী রমণীর শুকনো তোবড়ান ফোগলা গালে মুখ দিয়েছেন, তার মুখের পচা ভাপসা গন্ধে নাড়ী পর্য্যন্ত বমি হোয়ে উঠে পড়ে। আমীরের আর ক্ষোভের সীমা নেই, একেবারে মাথার হাত দিয়ে বোসে পোড়লেন। কাকুরী রূপসী ঠাট্ ঠমক কোরে, হেলে হেলে, ভুলে ভুলে, কত রদ-ভদ কোত্তে লাগল, হেসে হেসে, ঢলে ঢলে পোড়তে পোড়তে কলাবনের মধ্যে দিয়ে প্রস্থান কোলেন।

একণে জেমলার অবস্থা অতিশয় অসুখের হোয়ে দাঁড়াল, বিলাস-উজানের খোজার হাতে অপমানিত হতে হবে। বে দরজা দিয়ে বাগ নে এসেছিলেন, আমীর ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে সেই ঘরের দাঁছে উপস্থিত হোলেন, কিন্তু দরজাটি বন্ধ আছে দেখলেন। একণে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা একমাত্র পরিহাণের ভরসা রইল, তাতে কিন্তু আমীর অপারগ হলেন না। দেওয়াল টোপ্কিয়ে চোলে গেলেন, বাগানের ভিতর থেকে কেউ তাঁরে দেখতে পেলেন না, সকলের অলক্ষ্যে প্রস্থান কোলেন। কিন্তু যেমন দেওয়াল পার হোয়ে ওপাশে পোড়ে নেমে যাবেন, সেই সময় একজন প্রহরী তাঁরে গুলী কোলে, সে প্রহরীর বাইরে চৌকী দিচ্ছিল, গুলীটে তাঁর বাহমূলে লেগে ঘেঁড়ে গেল, মাংস ভেদ কোরে ভিতরে প্রবেশ কোরে পারেন নি, স্থানটি ছোড়ে যাওয়াতে বিস্তর রক্তপাত হয়, আর ভারি টন্ টন্ ঝন্ ঝন্ কাছে লাগল, জেমলা তা ক্রম্পত্ত না কোরে তাড়াহাড় নেমে পোড়লেন। তাঁর মৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময় চন্দ্রমণ্ডল মেঘে আচ্ছাদিত কোলে, চারিদিকে অন্ধকার হলো, জেমলা ঐ সুযোগে আস্তে আস্তে সোরে পোড়লেন, প্রহরী যে পুনরায় গুলী লোবাবে, সে অবকাশ সে পেলেন না, বন্ধুকে বারুদ গাদতে গাদতে চম্পট কোলেন। আমীরের মনে ভারি আশঙ্কা হতে লাগল, এই ত কলির সন্ধা—অমঙ্গল ঘটনার এই কেবল শুরু হল, এখনো অনেক বাকী। বেগম অবশ্যই এ কুৎস কথা বাদশাহকে অবগত কোরবেন, রাজী অবশ্যই তাঁরে অধঃপাতে দেবেন। মান, সম্মান, দত্ত, আক্ষলেন—এ সকল বিষয়ের ত কথাই নাই, সে সকল চিরকালের মত বিদায় দিতে হবে, আমীরের প্রাণ পর্য্যন্ত লয়ে টানাটানি বেধে যাবে।

জেমলা শুন্লেন, বাদশাহ ফিরে আসছেন, রাজধানী থেকে হুদিনের পথ তফাতে আছেন। আমীর ঐ সংবাদ শুন্তে পেয়ে যেখানে যত ফৌজ ছিল, একত্র সম্মা কোরে বসলেন, “আমাকে একবার স্থানান্তরে না গেলেন নয়, বিশেষ প্রয়োজন হোয়েছে।”—এই আরোপিত

কথা বোলে, স্বয়ং সেনাপতি হোয়ে কর্ণাভি-  
যুখে চোলে গেলেন। গোলকন্দনাথের  
অনেক দিনাবধি বাসনা ছিল যে, কর্ণাটে  
একবার রণযাত্রা করেন, এইবার ফিরে এসে  
সেই অভিপ্রায় সফল কোন্তেন মনন কোরে-  
ছিলেন। বাদশাহ রাজধানীতে পৌঁছিলে পর  
রাজ-সম্মতোরা জেমলার নামে চুকলি পোরে  
তঁার কান ভাঙ্গি কোন্তে লাগলেন, তাঁরা  
বোলে, “এ কি অন্যায়! জেমলা না বোলে,  
না কোয়ে, রাজার অমরতি না লয়ে হঠাৎ  
রাজধানী ছেড়ে চোলে গেছে।” এই ব্যাপারের  
মর্মার্থ তাঁরা এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা কোরে লাগ-  
লেন যে, বাদশাহের মন ক্রমিক বিগড়ে উঠল,  
অবশেষে তাঁর অস্বস্তিকরণে দাক্ষিণ্য সংশয় উপস্থিত  
হলো, এর পূর্বে আমীরের বিরুদ্ধে তাঁর মনের  
ভাব একপ কখনই হয় নি। বাদশাহ মনে  
মনে সন্তুষ্ট কোলেন যে, ঐ ভয়ানক ঘৃণ্য ব্যক্তির  
হস্ত হতে আপনাকে মুক্ত কোরবেন, কিন্তু সে  
কথা তখন কারও নিকট প্রকাশ কোলেন না।  
তার পর বেগম যখন জেমলার দুষ্টাভিপ্রায়পূর্ণ  
স্বণিত পত্রখানি বাদশাহের নিকট উপস্থিত  
কোলেন, গোলকন্দ-রাজ তখন আর ধৈর্য্য  
সংবরণ কোন্তে পারলেন না, বাদশাহ সদর হোয়ে  
সকলের সাক্ষাতে জেমলার উপর মহাকোপ  
প্রকাশ কোন্তে লাগলেন, প্রতিজ্ঞা কোলেন,  
বিশ্বাসঘাতককে সমুচিত প্রতিফল দেবেনই  
দেবেন। রাজপারিষদেরা ঐ কথা শুনে সকলেই  
উল্লাসিত হোলেন, আমীর অহঙ্কার কোরে  
তাদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছল্য কোন্তেন, সে অপ-  
মান তাঁরা বহুকাল সয়ে ছিলেন, এক্ষণে সময়  
বুঝে মস্তক উন্নত কোলেন।

রাজসভায় কি ঘণ্টা হোচ্ছিল, মালেক  
তার কোন খবরই রাখতেন না, তাঁর সহোদরের  
যে আসন্ন বিপদ, তাও তিনি জানতেন না।  
জেমলা কতদিনে রাজধানীতে ফিরে আসবেন,  
তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে কেবল তাই ভাবছিলেন।  
আমীর ফিরে এলে তাঁর প্রচুর ক্ষমতা-বলে  
একটা বড় পদের চাকরী পাবেন, তাতে তাঁর  
মানসস্ত্রমও হবে, দশটাকা রাজস্বারও কোন্তে  
পারবেন, মালেক সেই আশাসে মুগ্ধ হোয়ে

কায়ক্রেপে দিনপাত কোচ্ছিলেন। সহোদর  
সহায়তায় তাঁর যে কপাল ফিরে যাবে, সে  
বিষয়ে তাঁর মনে একটুও সন্দেহ ছিল না। কিয়  
মালেক জানতেন না যে, “তিনিও ফকির হলেন  
দেশেও অকাল হলো।” জেমলা কতদিনে  
ফিরবেন, তার নিশ্চয় নেই, মালেক তাই দেহ  
সহোদরকে একখানি চিঠি পাঠালেন, তাতে  
অনেক স্তুতিমিনতি কোরে লিখলেন, রাজদর-  
বারে একটু বিষয়-কর্ম হয়, এই তাঁর প্রার্থনা  
জেমলা ঐ পত্রের এই উত্তর লিখে পাঠালেন  
“আমি তোমার উপকার কোন্তে পারবো না  
তবে আমি যেমন মুনসী ছিলাম, তুমিও সেই  
রূপ মুনসী হও। সওদাগর আবাসের নিকট  
গিয়ে ক্রোড়পত্র দেখালে তিনি তোমা-  
কে কর্ম দেবেন।” এই অস্বাভাবিক পত্র পেয়ে  
মালেক অতিশয় ক্ষোভ কোন্তে লাগলেন  
পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলতে উন্নত, এমন সময়  
“মুনসি পাঠ” তাঁর চক্ষে পোড়ল, তাতে এই  
কথা লেখা ছিল, “তুমি যদি জ্ঞানবান হও, তবে  
তুমি যে আমার ভাই, এ কথা যেন রাজদরবারে  
প্রকাশ না হয়—আমার অনেক শত্রু আছে  
ইতি।” মালেকের পক্ষে এ সকল কথার মধ্য  
অতিশয় দুঃখবোধ হলো, কিন্তু তথাচ তিনি এই  
মনে কোলেন, তাঁর সহোদর চুপকে যে কটি  
কথা লিখেছেন, সেই কথামত চলাই শেষ, এই  
ভেবে জেমলার মিত্র সেই পারসী সওদাগর  
আবাসের কাছে চোলে গেলেন। সওদাগর সেই  
পত্র পেয়ে মালেকের নিকট প্রতিশ্রুত হোলেন  
যে, তাঁরে রাওলখণ্ডের হীরার খনির মুসা  
কোরে দেবেন, সে স্থান রাজধানী থেকে  
তিন দিনের পথ। এ কার্য্যে মালেক অতি  
অপটু, কেবল নবচাত্রমাত্র, কাজকর্মের সন্ধান  
কিছুই জানেন না, তাতেই পারসী সওদাগর  
বোলেন, “কোন একটা প্রয়োজনের নিমিত্তে  
আপাততঃ আমাকে রাজধানীতে কতক দিন  
থাকতে হোয়েছে, এক মাস পরে আমি তোমার  
সঙ্গে কোরে কারবারের স্থানে লোয়ে যাব,  
তার পর কাজ আরম্ভ হবে।” মালেক আজ ১৫  
দিবস বাগনগরে এসেছেন, আর এক মাস-  
কাল তাঁকে নিরর্থক বোসে থাকতে হবে, তাই



ভবে স্থির কোলেন যে, এই অবকাশে পীর-পঞ্চাল পরিতোপরে সেই কুটীর দর্শন কোরে আসবেন, সেখানে যেতে যোগীর ত অস্বস্তিই আছে। মালেক এক্ষণে সেই গিরিদেশে রওনা হোলেন। সেখানে পৌঁছে দেখেন, সে কুটীরও নেই, যোগীও নেই, ঘরখানা ভেঙ্গে চুরে গেছে, সেই ভগ্নাবস্থায় পোড়ে রয়েছে। চতুর্দিক উদাস অরণ্যময় ঘোর নির্জন, নীরব নিস্তব্ধের ভয়ঙ্কর হিল্লোলে দিক সকল অনাথা হয়ে আছে, যোগিবরের, কি গিরিসন্ধ্যার কোন নিদর্শনই নেই, তাই দেখে যুবাব বনে অতিশয় ভ্রাস হলো।

মালেক আশাভঙ্গ হয়ে ভারি কাতর হলেন, অনঃক্ষেপে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল, বুকে পরাধাত কোত্তে লাগলেন, উদ্গারের আয় চায়ের বজ্রগুলি জ্বাঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোল্লেন, শোকে উদ্গনা হয়ে ঘন ঘন বিষাদ-বিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। সেখানে কে আছে যে, তাঁর রোদিন জনবে? কেবল প্রতিধ্বনিই তাঁর বিলাপের প্রত্যুত্তর দিতে লাগল। অবশেষে শিখর থেকে নামলেন, কিন্তু অতিশয় বিমর্ষ, অতিশয় বিষয়! যোগী এখানকার বাস উঠিয়ে চোলে গেছেন, মালেককে দয়া কোরে একবার জানানও হয় নি যে, তাঁদের মনে মনে এই অভিপ্রায় ছিল। যোগিবরের এই অকৃতজ্ঞতা স্বরণ কোরে মালেকের অন্তঃকরণে দীর্ঘ রাগের উদেক হলো। শেষে কিন্তু বিবেচনা কোরে দেখলেন, তাঁকে অবগত করান সহজ ব্যাপার ছিল না, তাতে অনেক সময় নষ্ট কোত্তে হতো, হয় ত সেই জন্তেই যোগী তাঁকে পূর্বাঙ্কে জ্ঞাত করাতে পারেন নি। এক্ষণে ক্রোধ গিয়ে আত্মতিরস্তার কোত্তে লাগলেন, যুবা বলতে লাগলেন, যোগীর কোন অপরাধ নেই, আমরাই দোষ, কেন আমি এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলাম? হুদিন পূর্বে আসাই উচিত ছিল, তা হলে এ অনঃক্ষেপ পতে হতো না, সেই অজ্ঞাত মহাপুরুষ না জানি কোথায়, কোন দিকে চোলে গেলেন। সেই রমণীর প্রতী তাঁর এত যত্ন, এত স্নেহই বা কেন? কি নিমিত্তে তিনি তাঁকে চক্ষের উপর রেখেছেন? যোগিবর যে অকস্মাৎ চিরকালের আশ্রম

পরিত্যাগ কোরে যাবেন, ইটি মনের অগোচর, কেন তিনি এমন কর্ম কোল্লেন? আমাদের স্পষ্ট অনুভব এই হচ্ছে, হয় ত তিনি ভেবেছেন যে, এখানে থাকলে তাঁর নিস্তার নাই, পূর্বা-পেক্ষা আরো দুরবগাহ চক্রে পোড়ে অধিক অত্যাচার ভোগ কোত্তে হবে, কি হয় ত তাঁকে সেই স্নেহের পাত্রী অমূল্যরত্নে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হতে হবে—এই সকল ভয় কোরেই যোগী নিঃসন্দেহ স্থানান্তরে চোলে গেছেন, এক্ষণে যে তিনি কোথায় গেলেন, কোথায় গিয়ে আশ্রম কোল্লেন, মালেক তার কিছুই স্থির কোত্তে পারেন না।

এই সকল চিন্তা কোত্তে কোত্তে মালেক ধীরে ধীরে ও পায় পায় রাজধানীতে চোলেছেন, মনে মনে সম্বল কোল্লেন, যে রমণীকুমারটির প্রণয়-সৌরভে তাঁর হৃদয় প্রকল্লিত হয়েছে, তিনি যেখানেই বাস করুন, অনুসন্ধান কোরে তাঁর বাসস্থান বার করবার চেষ্টা কোরবেন, সে বিষয়ে সাধ্য-মত ক্রটি কোরবেন না।

গোলকন্দের বাদশাহ আহত ব্যক্তিদের প্রমুখ্যৎ শুনলেন, তারা যে কর্ণের ভার লয়ে গেছিল, তা নিকাহ কোত্তে পারেনি, বাদশাহ ঐ কথা শুনে হুর্দমা ক্রোধে অধীর হোয়ে পোড়লেন, রাগে সেন ফেটে যেতে লাগলেন, কয়েক দিবস কেউ ভরসা কোরে তাঁর সন্মুখে যেতে পারেন নি। রাজ্য প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, পার্শ্বচরেরা যদি তাদের দেখিয়ে দিতে কি ধোরিয়ে দিতে পারে, বিশ্বর অর্থ দিয়ে তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার কোরবেন। বাদশাহ এর পূর্বেই সেই পীরপঞ্চাল পাহাড়ের উপর সন্ধান জানতে এক চর পাঠায়ে দেন, সে ব্যক্তি কত-দিনে ফিরে আসবে, সেই জন্তে গোলকন্দনাথ ভারি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন, সে কিন্তু ফিরে এসে বোলে, কুটীর আশ্রম সমভূম হোয়ে পাহাড়ের সঙ্গে একচাল হোয়ে গেছে, এক্ষণে যোগীর আশ্রমের চিহ্নও নেই—যোগী নিক-দেশ। ঐ সংবাদ কর্ণগোচর কোরে বাগ-নগরপতি পুনরায় ক্রোধে অগ্নি-অবতার হোলেন, গন্ধকের আগ্নেয়-পর্বতের আয় তাঁর চোক মুখ দিয়ে রাশি রাশি অগ্নির হলুকা



নির্গত হতে লাগল। সেই ক্রোধের মুখে যাহারা যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলকেই বোলেন, “যে ব্যক্তি সেই পারসীদের ধরিয়ে দিতে পারবে, তিনি তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সম্বলিত করবেন।”

মালেক নিরর্থক পরিশ্রম কোরে যোগি-রাজের অজ্ঞাত নিবাসের অনুসন্ধান কোন্তে লাগলেন—কোন সন্ধান কোন্তে পালেন না। শেষে শুনলেন, বাদশাহ প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, যারা সেই গিরিশুন্দরীকে রক্ষা কোরে রাজার অপকার কোরেছে, তাদের চরম শাস্তি দিয়ে তাঁর ক্রোধের প্রতিকার করবেন। ঐ খবর পেয়ে মালেক বিবেচনা কোলেন, কিঞ্চিৎ সতর্ক হোয়ে চলা আবশ্যক, সঙ্গে যে দুই সহচর ছিল, তাদের পরিস্থানে রওনা কোরে দিলেন, তাদের সঙ্গে পিতামাতার নামে একখানা পত্রও লিখে দিলেন। যাবার সময় বারবার সাবধান কোরে বোলেন যে, “যত দিন গোলকন্দার রাজ্য পার হোয়ে অস্তের রাজ্যে না পড়ে, ততদিন নিজ বেশ পরিচয় কোরে ছদ্মবেশে গমন করিও, নতুবা বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।” এই সকল উপদেশ দিয়ে তাদের বিদায় কোরে দিলেন। সঙ্গীরা বিদায় হোয়ে গেলে, মালেক সহরের একটি নির্জন প্রান্তে বাসা কোলেন, পরিস্থানের টুপীর পরিবর্তে হিন্দুস্থানের পাগড়ী ব্যবহার কোন্তে লাগলেন, কি পোষাক, কি আকার-প্রকার, মালেক সব পরিবর্তন কোরে নূতন মূর্তি ধারণ কোলেন, এমন কি, যুবা নিঃসন্দেহ হোলেন যে, কেউই অনুসন্ধান কোরে তাঁরে ধোন্তে পারবে না।

এক মাস অতীত হল। সওদাগর আবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোলেন, সওদাগর মালেককে সঙ্গে কোরে রাওলখণ্ডের খনিতে চোলে গেলেন, সেখানে পৌছিতে পথে তিন দিবস বাস কোন্তে হোয়েছিল। ছুটি বৃহৎ বৃহৎ বিরাট-আকার পর্বতের মধ্যস্থলে একটি অপূর্ণ মনোহর গহ্বরে সেই খনিটি অবস্থিত কন্তো, ঐ পর্বতের প্রান্তরময় পার্শ্ব দিয়ে শত শত খেত-বর্গের নিকর মধুর ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত, ঐ ঝরনীগুণি অনেকগুলি স্রোত হোয়ে, এঁকে

বেকে, ঘুরে ফিরে, পাক দিয়ে পাক দিয়ে একটি ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গে মিলেছে। রাওলখণ্ডের খনি অনেক দূর পর্যন্ত ভেদ কোরে অতি গভীর তলে প্রবেশ কোরেছে, অনেকেই মনে কোন্তেন, ইহার রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিত হোয়ে গেছে, এফণে কেবল শূন্যগহ্বর পোড়ে আছে, কিন্তু আবাস সওদাগর স্থানটির লক্ষণ নিরীক্ষণ কোরে একটি চিহ্ন পেয়েছিলেন, তাতেই তিনি আশ্বাসিত হোয়ে ঐ খনিটি ইজারা কোরে লয়েন। যে সকল খনি প্রচুর রত্নে পরিপূর্ণ, সে সকলের নিমিত্ত যত টাকা রাজসরকারে দিতে হয়, এ খনির সঙ্গে সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, তার চার হিন্দুর এক হিন্দু বই আবাসকে দিতে হয়নি। সূড়ঙ্গের কাছে খনকেরা দিবা রাত্রি নিযুক্ত থাকত, তারা খনির দেওয়ান আর মুনসীর অধীনে থেকে তাঁদের হুকুম মত চলত। মুনসী আর দেওয়ানের উপর এই ভার ছিল যে, অধীন অধীন লোকেরা কর্ম-কাজ করে কি না, তাই তাঁরা তদারক কোরবেন, আর যে যে শিরায় রত্ন থাকবার সম্ভাবনা, সেই শিরাগুলি খনকের দেখিয়ে দেখিয়ে দেবেন। আবাস আর নূতন মুন্সী সূড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ কোরে চোলে যেতে যেতে সওদাগর মালেককে বিভিন্ন প্রকার স্তর দেখাতে লাগলেন,—কোথা থেকেই বা কাজ শুরু কোন্তে হয়, আর কি লক্ষণ দেখেই বা কাজে প্রবর্ত হতে হয়, সে সমুদয় সন্ধান তাঁকে বলতে লাগলেন। যুবা একাগ্রচিত্তে প্রভুর উপদেশগুলি শুনলেন, শুনে বলেন, “এ খনিতে আর কিছু নাই, যা ছিল, নিঃশেষিত হোয়ে গেছে, তবে যদি কিছু থাকে, সে সকল রত্নের শিরা অনেক অনুসন্ধান কোরে বার কোন্তে হবে, তার জগে চেষ্টা কি যত্নের ক্রটি কোরবেন না, সাধ্যমত পরিশ্রম কোরে দেখবেন, যদি কিছু অদৃষ্টে ফলে ত ফলবে।” খনকেরা এ পর্যন্ত একটাও রত্নশিরার সন্ধান কোন্তে পারে নি, তাই সওদাগর ক্ষোভিত হোয়ে অনুতাপ কোন্তে লাগলেন যে, কেন তিনি এ অসাধারণ কার্যে হস্তক্ষেপ কোলেন, আবাস খেদ কোন্তে লাগলেন বটে, কিন্তু এককালীন

ক্ষরুৎসাহী হন নি, একেবারে যেকিছু লাভ হবে না, সপ্তদাগর সে বিবেচনা করেন নি। আবাস লোকজনের উপর হুকুম দিলেন, তারা কর্ম-কাজ যেরূপ কোচ্ছে, সেইরূপ কোব্বে, কিন্তু মালেকের আজ্ঞাব্যবস্থা হোয়ে চোলবে, আর তাদের এত অজ্ঞান পুরস্কার কোত্তে স্বীকার কোলেন যে, সেই উৎসাহে কুঠারের আর হাতুরীর শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যেতে লাগল। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, ঐ গ্রামে মালেক অবস্থিতি কোরে খনির কাজ-কর্ম দেখবেন শুনাবেন, এই কথা স্থির হল। এ বন্দোবস্ত মালেকের পক্ষে সকল রকমেই মঙ্গল। বাগ্নগর সহরে তাঁকে আর যেতে হবে না, সে আবশ্যক ফুরিয়ে গেল, সেখানে রাজার তরফ গোয়েন্দা অবশ্যই তাঁর অনুসন্ধান কোরে কিচ্ছে, স্তত্রাং সেখানে যেতে হোলে তাঁর মনের স্বাস্থ্য হত না। এই সকল বিলি ব্যবস্থা স্থির কোরে আবাস সপ্তদাগর রাজধানী ত চোলে গেলেন, বাবার সময় বোলে গেলেন, যদি কোন রক্ত-শিরার সন্ধান সন্ধান বেরিয়ে পড়ে, ধাউড়ে দ্বারা তাঁকে যেন তখনই সংবাদ পাঠান হয়। একদিন লোকজনেরা খাটাখাট-নির পর বার যে স্থানে চোলে গেছে, মালেক একটি মসাল লয়ে রক্তের খনির মধ্যে প্রবেশ কোরে চারিদিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখে বেড়া-ছেন, দেখতে দেখতে বহু দূর পর্যন্ত নীচে চোলে গেছেন। একবার সামলাতে না পেরে পা হোড়কে পোড়ে গেলেন, হাতের আলোটি নিবে গেল, চারিদিকে বোর অন্ধকারময় হল। মালেক যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর বোধ হল, যুথের উপর যেন আলোর আভা পোড়ছে, তিনি অমনি চমকে উঠে বিস্মিত হোয়ে ভাবতে লাগলেন—এ আলো কোথা থেকে এল, এগোবেন, কি পেছোবেন কিছু স্থির কোত্তে না পেরে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সময় কতকগুলি অল্প অল্প আলোর রেখা স্ত্রুড়ের নিম্নতল থেকে বার হোচ্ছে দেখতে পেলেন, এ আলো তত চপলা নয়। মালেক অনন্যমনা হোয়ে সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, তিনি মনে

কোলেন, আর কিছু নয়, কোন দম্ভা অপহরণ কোত্তে এসেছিল, সেই বৃষ্টি নীচে চাপা পোড়েছে, এই ভেবে এগিয়ে বাবার মনন কোলেন। আলোটি এখন সোরে গেল, যুথ-কালের জন্তে চাপা পোড়ে অদৃশ্য হল, যেন একটা ছায়া মধ্যবর্তী হোয়ে ঢেকে ফেল, আবাস কিন্তু তখনই পূর্ববৎ স্থির অচঞ্চল ক্রীণ রেখায় দেখা দিলে। মালেক ছুখানি হাতে স্রমকের দিকে লগা কোবে ছড়িয়ে দিয়ে, অতি সাবধান হোয়ে, আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে নীচের দিকে চোলে যেতে লাগলেন, যেতে যেতে একটা পাথরের দেওয়াল হাতে ঠেকল, ঐ খানে তাঁর গতিরোধ হল, আর এগোতে পারলেন না, হাতখানি দেওয়ালের গায় সংলগ্ন আছে। হঠাৎ সেই আলোটি নিস্ত্র হল, যেন বোর অন্ধকারে চাপা পোড়ল। মালেক এক্ষণে তাঁর হাত ছুখানি সেই পাথরের দেওয়াল থেকে উঠিয়ে নিলেন, উঠিয়ে লভেই হঠাৎ সেই আলোর ছটা এসে তাঁর চক্ষের উপর পোড়ল, এবার সে আলোটি এত নিকটে যে, তার পশ্চাতে একটা আকৃতির ছায়া আছে দেখতে পেলেন, আলোর ছটাটি পূর্বে যে জন্যে অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়েছিল, মালেক এখন তার মর্ম বৃদ্ধিতে পারলেন। মালেকের সম্মুখে যে প্রস্তরের প্রাচীর, তাতে ছিদ্র ছিল, দুখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেলে পাথর উপরোপরি হোয়ে থাকায় তাতেই মধ্যে কাঁক থাকে, সেই রক্ত দিয়ে ঐ আলোর রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মালেক আন্দাজে আন্দাজে যেমন সেই কাঁদের মুখটি হাত দিয়ে চাকলেন, অমনি সেই আলোটি চাপা পোড়ল, আর অমনি চারিদিক নিবিড় অন্ধকারময় হলো। যুবা এক্ষণে নিঃসন্দেহ হোলেন যে, এই প্রাচীরের বাইরের দিকে পর্বতের গহ্বর কি অজ্ঞাত স্ত্রুটির আছে, সেখানে কেউ বাস কোচ্ছে। অতি স্থিরচিত্ত হয়ে সেই দেওয়ালের ফাকের মুখে কান পেতে থাকলেন, একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ আর মহুব্যের কঠ-স্বর শুনে পেলেন, মালেক যে তা শুনেছেন, তাঁর মনে সেটি নিশ্চয়ই বিশ্বাস হলো। তার পর সেই আলোটি হয় কেউ সেখানখো তফাৎ

কোলে, নয় কেউ কিছু চাপা দিয়ে ঢেকে রাখলে, এক্ষণে শশানভূমির সদৃশ স্তূপটি নিবিড় অন্ধকারে গভীর উদাস মূর্তি হয়ে নিস্তব্ধ হলো, ধানিকক্ষণ পরে সেই ছিদ্র দিয়ে পুনরায় আলো-চ্ছটা দেখা যেতে লাগল, মালেক তাঁর তৃষ্ণাতুর চক্ষু দুটি সেই আলোর দিকে স্থির কোরে রাখলেন। একটু পরেই সৰ্বলোকমোহিনী পরম রমণীয় মাধুরী সেই গিরিসুন্দরী তাঁর দৃষ্টিপথে এসে বোসলেন, তাঁরে দেখে মালেক অনুরাগ মোহে অভিভূত হোলেন, তাঁর তৎকালিক বিশ্বাসের কল-কিনারা ছিল না। রমণী একখানি হাতের উপর মাথা রেখে একটু কাত হোয়ে আছেন, কুসুমদলনির্মিত অমল ঋতুখানি অতি মানচিত্তায় বিবর্ণচুলগুলি আলুথালু হয়ে ঝাড়ের চারিপাশে ছোড়িয়ে পোড়েছে, গলায় শুভ্র মক্তার হার, একখানি বচনুলোর ষেতবর্ণের ওড়না ঝেঁপে দিয়ে যুবতী কোমলাঙ্গ ঢেকে রেখেছেন, ঐ ওড়নার মধ্য দিয়ে অল্প অল্প আভরণের ছটা দেখা যাচ্ছিল। মালেক নিস্তব্ধজ্ঞান-শূন্য মুখে কথা নেই, অবাধ হয়ে সেই জ্যোতিঃ-প্রবাহিণী চার-মাধুরীর প্রতি একদৃষ্ট চেয়ে রইলেন, চক্ষের পলক ছিল না, তিনি যে রত্নের উদ্দেশে এই স্তূপের মধ্যে প্রবেশ কোরেছেন, সে সামান্য রত্নের পরিবর্তে একটি অমূল্য রত্ন লাভ কোলেন,—যে রত্ন লাভের জন্যে যুবা লজ্জায়িত ছিলেন, এ সেই অমূল্য রত্ন।

বিশ্বাভিভূত অথচ প্রফুল্লচিত্ত মালেক মনে মনে চিন্তা কোচ্ছেন, তিনি যে এখানে উপস্থিত আছেন, এ কথা তাঁর প্রণয়িনীকে কি কোরে অবগত করাবেন—এই সময় কণ্ঠস্বর শুন্তে পেলেন, সে স্বর তাঁর ভ্রম হবার বিষয় নয়, স্বরটি বোলে, “লীলা! তোমাকে এখানে রেখে কাল আমাকে যেতেই হবে, সাবধান, কদাচ ধরের বাইরে যেও না, আমি আবার শীঘ্র ফিরে আসছি।” যুবতী বোলেন, “হায়। আমার \*\*\*” মালেক যুবতীর অমিয় কণ্ঠস্বরের কোমল মাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে সুন্দরী “আমার” পর আর কি কথা বোলেন, তিনি তা শুন্তে পেলেন না। যোগিণীর যুবতীর বাক্যের যে উত্তর দিলেন, মালেক কিন্তু তা স্পষ্টাভিধানে বুঝতে পারেন,

যোগী বোলেন, “লীলা! আমি তোমাকে বিনা কোরে বোলছি, আমার এই কথাটি রেখে তুমি আর সে পারসী মহাত্মাকে মনে করে না, তিনি কখনই তোমার হতে পারবেন না, তবু তাঁর অবেষণ কোত্তে আমাকে কেন অনুরোধ কোচ্ছো? অচ্ছা, তবে কিন্তু তোমার অনুরোধের জন্তে নয়, তাঁর নিজের মহদুঃখের নিমিত্তই সে মহাপুরুষ কোথায় অবস্থিতি কোচেন, তার সন্ধান কোরবো, বিশেষতঃ এক্ষণে তাঁর জীবন শঙ্কটাপন্ন, সে জন্তেও আমাকে একবার তল্লাশ কোরে দেখা উচিত।” ঐ কথা শুনে সুন্দরী হাত দুখানি এমনি ভঙ্গীতে রাখলেন, যেন একমন একচিন্তে গুরুদেবের ধ্যান কোত্তে বসলেন, দুটি তেজঃস্বপ্ন-উজ্জ্বল বিকশিত চক্ষু উদ্গে উঠি রাখলেন, লোহিত-রাগ-রঞ্জিত বিনোদ গুহুটি ঘন ঘন নাড়তে লাগলেন। যত বড় কোরে কি উচ্চারণ কোত্তে লাগলেন, মালেক মনে কোলেন, “তবে বুঝি আমার নিস্তারের নিমিত্ত পরাৎপর জগদ্ধাণ্ডকে ডাকছেন যুবতীর প্রতি আমার অন্তঃকরণ বেক্রপ, যুবতীরও মন আমার প্রতি সেইরূপ; আমাদের পরস্পরের সমান অনুরাগ।” মালেক ডেকে বোলতে যাচ্ছিলেন, “সুন্দরি! ভাবনা কি? এই দেখো, আমি নিকটেই আছি।” এমন সময় বিবেচনা কোত্তে দেখলেন যে, এ সময় কেউ কোথাও নেই, প্রণয়িনী একাকিনী আছেন, এপন কারও গলার আওয়াজ শুনে পাছে আতঙ্কে মোহ যান, সেই ভয় কোরে ক্ষান্ত হোলেন। যোগিগাজ যুবতীকে ছোট ছোট কোরে কি বোলতে লাগলেন, মালেক তাঁর কথাপরস্পরা শুন্তে পেলেন না, স্তব্ধতা যে কথার পর যে কথা হল, তা তিনি বেছে লতে অক্ষম হলেন। যোগী বলেন, “লীলা, সে সময় উপস্থিত, তা জানি—এখন—বজ্রের সমান শব্দ,—বিপদ হাতের মাথায়, আমি ত দুর্বল দেখছো, তখাচ সে দুরাত্মা ভয়ে কাঁপছে। তখন কেবল আমার শেহরুপ পুষ্পটির অবলম্বনের নিমিত্ত—বিশ্রামের জন্তে।” লীলা ঐ কথা শুনে উঠে দাঁড়া-লেন, বাতীটি হাতে কোরে লয়ে একদিকে চোলে গেলেন। ঘরটি তামসীর ঘোর কক্ষ-

রায় আচ্ছন্ন হল, মালেক আন্তে আন্তে সুড়ঙ্গ  
কে বেরিয়ে বাইরে এগেল, ভাবতে লাগ-  
ল, যোগীর সেই ঘোর অনাগ নিবাসে  
কোরে প্রবেশ কোরবেন, তার উপায়  
কি কোরে তার সন্ধান পাবেন ?  
কমলময়ী লীলার স্নেহানুগ জন্মেছে,  
কি নিশ্চয়ই জন্মেছে, তার কোন সন্দেহ নেই।  
লেকের আনন্দের স্থল কূল ছিল না, তাঁর  
জ্বর ঘোর বিপদ উপস্থিত, তা একবার মনেও  
কর না, কি' সেই বৃদ্ধ ককিরের মখে যে  
নৈরাশ্যপূর্ণ নিরুৎসাহের কথা শুনলেন,  
প্রতিও একবার খেরাল কোয়েন না, লীলা  
তার প্রতি অতুরাগিনী হয়েছেন, কেবল  
আনন্দেই বিস্তার হোলেন।  
রমণীকুমারী তাঁর অন্তঃকরণে প্রকর-  
ণ বিকশিত হয়ে রইল। যুবতীর নব্বুর  
কেনীযুষ্টি তাঁর হৃদয়মধ্যে ডুবে থাকল,  
এক একবার ভেসে ভেসে উঠতে লাগল।  
এ থেকে উঠে মালেক প্রতিজ্ঞা কোয়েন,  
যে উদ্ভিত যোগিরাজের সেই নিজন প্রদে-  
শ দ্বারপথ অনুসন্ধান কোরে বার কোর-  
বেন।  
এতাত-ছটায় পূর্বাধর শোহিত রাগে আরক্ত  
এর অনেক পূর্বে মালেক নিদ্রা থেকে গাজো-  
কোরে সেই রক্তাকরের সন্নিকট অরণ্যময়  
গহবরের অন্তঃস্থানে বেরলেন। বন,  
পাহাড়, খাল, জঙ্গল, নদী, নালা, গহবর  
কোরে যেখানে যত গুপ্তহান, কি অজ্ঞাত-  
ছিল, সব পাতি পাতি কোরে উল্টে  
লটে খুঁজতে লাগলেন। একবার সুড়ঙ্গের  
মধ্যে নিরীক্ষণ কোতে কোতে গেলেন,  
তার সে পথ পরিত্যাগ কোরে যে সুড়ঙ্গ নিষ্ক-  
সেই অমলস্বচ্ছ বারি নদীগর্ভে প্রবাহিত  
জাছিল, সেই নিষ্করের জগপ্রবাহ লক্ষ্যাকোরে  
গেলেন, নদীর উভয় কূল অন্বেষণ কোতে লাগ-  
লেন, একবার একটি পর্বতের উপর আরোহণ  
করেন, সেখানে কোন সন্ধান না পেয়ে নেবে  
আর একটি শিখরে গিয়ে উঠেন, এই-  
কি নিষ্কল অন্বেষণ কোরে কোরে অতি  
দ্রুত হোয়ে পোড়লেন—নিজীববৎ অবসর

হোলেন,—শেষকালে অতি বিমদ হোয়ে  
ক্ষুন্নমনে মৃত্তিকার উপর বোসে পোড়লেন।  
এদিকে সুড়ঙ্গে যাবারও সময় হয়ে  
এসেছে, জন মজুরেরা পথ চেয়ে আছে, তিনি  
কতক্ষণে সেখানে যাবেন, তাই ভাবছে।  
মালেক আর অপেক্ষা কোতে পারেন না, উঠে  
চোলে গেলেন। যেমন সুড়ঙ্গের দ্বারে প্রবেশ  
কোরবেন, হঠাৎ একটা উপায় মনে পোড়ল,  
এক টুকরো কাগচে গুটি কয়েক কথা লিখে  
সুড়ঙ্গ খোঁড়বার জেহে মজুরদের হাতে যে  
লোহার বাড়ী থাকে, ঐ বাড়ী দিয়ে সেই চিহ্ন-  
খানি ছিঁদের ভিতর দিয়ে ঠেলে দিতে পারে,  
অবশ্যই লীলার চক্ষে পোড়বে, সেই কমলাক্ষী  
যে তাঁর কুটারেই আছেন, তার সন্দেহ নেই।  
তবে পত্রখানি তিনি অবশ্যই পাবেন। এত  
কৌশল স্থির কোরে, মালেক তখনি বাসা  
থেকে এই কটি কথা লিখে আনলেন।—

রমণীকুলের অমিয়মাদুরি! সমস্ত প্রাণের  
মঙ্গলকামনা অপেক্ষাও আমার কাছে তুমি  
দুগুণা, তোমার কাব্যিক কুশল, আর তোমার  
বাসস্থান অজ্ঞাত থাকায় অনাথার দার পথে  
পথে ভেসে বেড়াছি। দৈব অদৃষ্ট আমাকে  
এখানে বসে এসেছে, এখন বলাও দেখি—আমি  
কি তোমার সঙ্গে যোগাৎ কোতে পাবো না ?  
যে আগনার সৌভাগ্যবশে গিরিশিখরের উপর  
তোমার অমল চন্দ্রাননের কোমল কাঞ্চি দৃশ্যে  
দর্শন কোরেছে, সে অনাথ পারসী—তুমি  
বিস্মৃত হওনি ত ? যে তোমার সঙ্গে কথা  
কোছে, এ সেই নিরস-হৃদয় অনাথা পারসী, এ  
সেই ব্যক্তি, যে তোমার গুপ্তবাসের প্রবেশ-পথ  
জানবার জেহে অনর্থক পরিশ্রম কোরেছে, সেই  
গুপ্ত-কটীরে তার প্রাণের সমান প্রাণপ্রাতিমা  
একণে অবস্থিতি কোছেন। আমার আঁকিকম  
অবহেলা কোরে নৈরাশদণ্ড কোরো না। একণে  
তোমার কাছে এই ভিক্ষা কোচ্ছি—তোমার  
নব আবাসের পথটি আমায় দেখিয়ে দাও, আমি  
স্বয়ং উপস্থিত হোয়ে, আমার সমগ্র প্রাণ, আর  
সমুদায় অন্তঃকরণ তোমার অগ্রে ধোরে দেবো।  
তোমার অমল মধুর মূর্তি অহরহ আমার নয়নের  
উপর বিগ্ৰহান রয়েছে। আমি যে তোমার

প্রত্যুত্তরের জন্তে অধৈর্য্য হোয়ে অপেক্ষা কোচ্ছি, সে কথা কি বলবার আবশ্যক আছে ? মুখে কোন কথা বোলো না, তোমার একান্ত ভক্ত, একান্ত অনুরাগী, আর একান্ত শরণাপন্ন মালেককে একখানি পত্র লিখে পাঠিও ।”

পত্রখানি সমাপ্ত কোরে মালেক খনিতে ফিরে এলেন । সেই মিত্রবৎ অনুরূপ ছিদ্রটি অনুসন্ধান কোরে একখানি লোহার শিক দ্বারা তার মধ্যে ঐ পত্রখানি প্রবিষ্ট কোরে দিলেন । কৌশলটি সফল হল কি না, তা জানতে থানিকক্ষণ বিলম্ব কোত্তে হল, একটু পরে অন্ততঃ কোল্লেন লোহার বাড়ীগাছটি যেন অল্প অল্প কাঁপছে, তার পরক্ষণেই একটি ধাক্কা দিয়ে কেউ যেন তাঁর দিকে সেই বাড়ী গাছটা ঠেলে ফেলে দিলে । মালেক শিক গাছটি কোলের দিকে টেনে নিলেন, তার আগায় একখানি পত্র বাঁধা আছে দেখে ভারি আনন্দিত হয়ে পত্রখানি হাতে কোরে লয়ে বাসায় চোলে গেলেন । সেখানে গিয়ে খুলে এই কথাগুলি পোড়লেন ।

“মহাত্মবর পারসী পুরুষ !

আমি আপনাকে বিশ্বস্ত হোয়েছি, এ কথা বোলে মিথ্যাবাদিনী হব, আমার কিন্তু আর মনে কোরবেন না, আপনার সমুহ বিপদ উপস্থিত, পালিয়ে নিজ দেশে প্রস্থান করুন, যাবার সময় লীলার মঙ্গল-বাসনা সঙ্গে কোরে লবেন । আপনি এখানে আস্তে পারেন কি না, সে কথা যোগিরাজ বিবেচনা কোরে বোলবেন, আমি কিন্তু জানি, যোগিবরের ইচ্ছা আছে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন, কোন একটা আসন্ন বিপদে আপনাকে সতর্ক কোরে দেবেন এই তাঁর অভিপ্রায় । যে পর্তুগীজ সর্কলের অপেক্ষা উচ্চ, তার পার্শ্বে একটি ভগ্ন মসজিদ আছে, সূর্য্যদেব পাটে বোসলে সেই স্থানে গমন কোরবেন, যে আপনার মিত্র, তাঁর সঙ্গে ঐ স্থানে সাক্ষাৎ হবে । দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন, আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধ ফলবান হোক, ইতি ।

লীলা ।”

মালেক এই অমূল্য ক্ষুদ্র পত্রখানি পেয়ে এক একবার অধ্যয়ন দিয়ে চাপতে লাগলেন, আর

বড় বড় কোরে বোলতে লাগলেন, “বি আনন্দ ! আমাদের আরও একবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে । লীলা ! এবার দেখা হোলে আর আমার ছাড়াছাড়ি হবে না, তোমাকে যে যে অজ্ঞাত অন্ধকারে ঘেরে রেখেছে, সে অন্ধকার থেকে এইবার মুক্ত কোরবো, আমরা একত্রে বাস কোরে একত্রে দেহলীলা সঞ্চর কোরবো ।”

সূর্য্যদেবও পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হলেন, নব অনুরাগীও তাঁর প্রাণেশ্বরীর কঁথামত সেই ভগ্ন মন্দিরে চোলে গেলেন, সেখানে বোসে যোগীর আগমনের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেন । এ ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, এইরূপ কতঘণ্টাই গত হল, তথা যোগীর দর্শন নাই, মালেকের ব্যাকুলচিত্তে স্থস্থির হবে, তার কোন লক্ষণই দেখলেন না । যুবা বোসেই আছেন, রাজ্য দুই প্রহর অতীত হল, তথাচ যোগীর উদ্দেশ্য নেই । কিন্তু এই সময় মালেক মন্দ মন্দ সতর্ক পদশব্দ শুনে পেলেন, কারা যেন ঐ ভগ্ন বাটার দিকে আগমন কোচ্ছে । প্রেতভূমির ছায় স্থানটি তামসী ঘোর ক্রমঃ আবরণে ঘনরত, চতুর্দিকে পো নিস্তব্ধের তরঙ্গ, একটি শব্দ মাত্র নাই, কেবা মধ্যে মধ্যে বিকটদর্শন পেচকেরা অমঙ্গলসূচক ভীষণ কর্কশরব,আবার শেয়ালের দুঃস্বপ্ন ভয়ানক ছয়া ছয়া শব্দ কোরে রজনীর গভীর, নীরব, শান্তির বিঘ্ন জন্মাচ্ছে, মালেক স্থিরকর্ণে পাঠে শব্দ শুন্তে লাগলেন । শব্দ যত নিকট হো লাগল, যুবা আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা কোরবেন এই অভিপ্রায় কোরে কেবল মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে ছেন, কি দুপা একপা চোলেওছেন, এমন সময় দুটি কণ্ঠস্বরের বাক্যর তাঁর কর্ণে প্রবেশ কোলে, অমনি ফিল্লেন, আন্তে আন্তে নিঃশব্দে পেছিয়ে এসে ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন । দুটি লোক মন্দিরের দরজার কাছে এসে ধমুকিয়ে দাঁড়াল, মালেক তাদের উত্তর-প্রত্যুত্তর একটি একটি কোরে স্পষ্ট শুন্তে পেলেন ।

প্রথম স্বর বোলে, “আমি দিব্যি কোরে বোলতে পারি সে এই পাহাড়ের উপর উঠেছে দ্বিতীয় স্বর । তুমি কি নিশ্চয় জান, এ সেই ব্যক্তি ?

প্র. স্বর। নিশ্চয়ই জানি, তার সন্দেহ নই, বড় আশ্চর্য্য, সে এর মধ্যে কোথায় অদৃষ্ট, এসো, আমরা এইখানে বোসে থাকি, সে পারসী যেন কঁাকি দিয়ে না পালাতে পারে। আমি কিন্তু বোলেছো, যোগীর কুটারের চিহ্নও নই, সে কথা সত্যি নাকি ?

দ্বি. স্বর। তা না ত কি, একেবারে সমভূমিতে জমির সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু সে'য়ে সেই দীলোকটি লয়ে কোথা চলে গেল, সে কথা কেউই বোলতে পারে না।

প্রথম সঙ্গী বলে, “অতো ব্যস্ত হচ্ছে কেন ? দুদিন অপেক্ষা করো না, সে আমাদের হাত থেকে কদাচ বাঁচতে পারবে না।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোলে, “সে যদি আমাদের হাতে এসে পড়ে, তবে তাদের রাজধানীতে নিয়ে লয়ে যাব—প্রাণে মারব না—এ কথাটি দুলো না ভাই, মনে থাকে যেন, তবে তোমার পশকবচ ভুলে রাখো, তাতে আর দরকার নেই, রাজবলের উপর নির্ভর কোত্তে হবে।”

প্রথম ব্যক্তি। হাঁ! হাঁ! তা বৈ কি! তার ভাবি সাঁহস, গায় সামর্থ্যও বেশ আছে, মনে করো, যদি জ্বরে তারে পেরেই না উঠা যায়।

দ্বি. ব্যক্তি। চুপ্ চুপ্! কে আসচে না ? ও বাতাস গাছে বেধে শব্দ হচ্ছে। ঐ দেখো, চন্দ্রোদয় হবার বড় বিলম্ব নেই, চলো, আমরা যাই, আর এখানে থাকা নয়। দোস্ত! কাল রাত্রে কিন্তু আবার আসতে হবে, একটু সকাল কোরে আসব, তাদের পাহাড়ের উপর উঠবার পূর্বেই যেন আসতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই ধোস্তে পারব, তবে এখন যাওয়া যাক, কাল সন্ধ্যাও অস্তে যাবে, সে পারসীও আমাদের হাতে বন্দী হবে।

ঐ দুটি লোক এখন চোলে গেল, মালেকের অন্তঃকরণ স্থির হলো, হুঁচকানো থেকে অনেক অংশে পরিজ্ঞান পেলেন, তাদের ভয়ে এপর্যন্ত ভাল কোরে নিখাস ফেলতে পারেন নি। মালেক কিন্তু ঐ স্থানেই থাকলেন, যে হেতু যোগী এখনও এলে আসতে পারেন, যে যে কথাগুলি শুনেছেন, সেইগুলি তাঁকে জ্ঞাত করাবার নিমিত্ত তারি ব্যস্ত হোলেন, তিনি যেন

গ্রহরী হোয়ে সেইখানে বোসে রইলেন। ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত উপস্থিত, পক্ষীরা স্বরলহরী ভুলে মঙ্গল-আরতি কোত্তে লাগল—প্রভাত হল, প্রভাত হল—বোলে চতুর্দিক্ ঘোষণা কোরে দিলে। মালেক নির্ভরসা হোয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ কোচ্ছেন—এমন সময় একটি আকৃতি স্পষ্ট দর্শন কোলেন, দেখলেন, সেই অজ্ঞাত পুরুষ মন্দ মন্দ পাদসঞ্চারে পর্ত্তারোহণ কোচ্ছেন। উদাসীন মালেককে দেখতে পেয়ে চম্কে গেলেন। মালেক অতি ভক্তির সহিত একটি প্রণাম কোলেন, তাই দেখে যোগীর মনে প্রত্যয় হলো, কোন মিত্রবর দাঁড়িয়ে আছেন, যোগী তাঁরে দেখে বোলেন, “সুবা! তুমি মহাত্মা বটো, কিন্তু বড় অসমসাহসী, আমি কি তোমারে ক্রান্ত হতে পরামর্শ দিই নি ?” মালেক বোলেন, “আপনি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যখন এসেছি, আমায় একবার আপনার কুটার দর্শন কোত্তে অনুমতি করুন—সেখানে পূর্বেই—দৈবাবধীন আমার পদচিহ্ন পোড়েছে।” যোগী ইশারা কোরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে বোলেন। সেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, ঘরের মেঝের এক কোণ থেকে একখানা চৌকোণা পাথর উঠালেন সেখানা সেই মেঝেরই পাথর, তার নীচে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের সিঁড়ি চোলে গেছে, তাঁরা উভয়েই সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। খানিক দূর চোলে গিয়ে একটি সুপ্রশস্ত অথচ জলা অন্ধকারময় বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। বাড়ীটির চারি দিক পাথরের দেওয়াল, অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থল প্রস্তর-স্তম্ভের উপর গৃহটি অবলম্বন কোরে আছে। স্তম্ভগুলি সুন্দর, মার্জ্জিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পর্ত্তের উদর থেকে কেটে কুঁদে বার করা হোয়েছে। সন্মুখে একখানা পাথরের পাটাসন পোড়ে ছিল, যোগী মালেককে সেইখানি দেখিয়ে দিয়ে বসতে বোলেন, আপনিও তার একপাশে বোসলেন। মালেক যেরূপে এই অজ্ঞাত-বাসের সন্ধান পেরেছিলেন, সে কথা যোগিবরকে বোলেন, আর যেখানে গেলে আশ্রমপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পারবে, সে সন্ধান যে লীলা তাঁকে ইঙ্গিত করেন, সে কথাও তাঁকে

অবগত করালেন। যোগী গম্ভীর হোয়ে শুন্ডেন, সেই ভগবন্দিরের নিকট দুই জন লোক যে সকল কথা বলাবলি কোচ্ছিল, সে সমুদয় বুঝন্ত মালেক যোগীর কাছে শোনতে লাগলেন। যোগী শুনে বোলেন, “তবে আর এ নির্জন স্থান নির্ঝিয়ের হলো না, পুত্র! অনেক বিপদ বাচিয়ে চোলে হব—তোমার জীবনের উপর, আর আমার এই অনাথা কন্যার সত্য-ধর্মের উপর রাবার কোপ-দৃষ্টি পোড়েছে, তুমি নিরর্থক শরীর ঢেকে ঢেকে ছদ্মবেশে বেড়াচ্ছো, তাতে কোন ফলোদয় না হোতে পারে আমিও এই রকুটি সেরে সেরে নে বেড়াচ্ছি, আমারও সেটি রখা চেষ্টা। এক্ষণে প্রস্থান করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল, পালিয়ে বাচলেও বাচতে পারো, সেই এক মাত্র প্রাণরক্ষার উপায় আছে, তবে আর কালবিলম্ব করো না।” মালেক বোলেন, “ভগবন! একটা কথা বলি, শুন্ডন, লীলার অপমান বড় হলো, না আমার প্রাণ বড় হলো? তাঁর মানের উপর যখন এতো প্রমাদাডম্বর, তখন আমার প্রাণ থাকে ভাল, বায় ভাল—সেচ্ছো ভাবনা কি? আমি তা মনেও কোরি না—না মহাশয়, তা হবে না, আমি কোথাও যাব না—আমাকে এই স্থানে থাকতে অহুমতি করুন, লীলার মান, লীলার ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত যদি শত শত লোকের প্রাণবধ কোন্তে হয়—কোরবো, পূজ্যপাদ যোগীর লীলাকে আমি স্নেহ কোরে থাকি, তাঁর উপাসনাও কোরে থাকি, বালাকে আমার হস্তে প্রদান করুন, তাঁরে লয়ে দেশে চোলে যাই, আমার পিতা-মাতা অর্থের অহঙ্কার করেন না সত্য, কিন্তু বংশ গৌরবের অভিমান কোরে থাকেন, তাঁরা মহাত্মা, দেশের তাবৎ লোকেই তাঁদের অহুবাগ করেন, তাঁরা তাঁদের ভালও বাসেন।” যোগী বোলেন, “পারসীবর! লীলা যে তোমার প্রণয়ের অহুরাগিনী, সে বিষয় আমার সুন্দররূপে জানা আছে, তোমার বীর-মহিমার জ্ঞাত আমি যে তোমারে স্নেহ আর প্রশংসা কোরে থাকি, সে কথাও সত্য, কিন্তু লীলা রাজকন্যা, একটি রাজ-পুত্রের হস্তে তাঁকে তুল্য কোরবো, এ মানস আমার অনেক দিনাবধি আছে।”

মালেক শুনে চমকে উঠে বোলেন—“কি বোলেন ভগবন! লীলা রাজকন্যা?” যোগী বলেন, “পুত্র! তাই বটে, আমি তাঁর আত্মোপস্থ রক্তাত্ত বোলছি, আগনি প্রবণ করুন। আজ যেন বৎসর গত হলো, কতুব মিত্রতার তাবৎ সৌহার্দ্য বন্ধন ছিন্ন কোরে—আর প্রতিজ্ঞাপর হোয়ে যে সন্ধি করেন, সে সন্ধিবন্ধনের নিয়ম, আর অভিশ্রাণ সকল উল্লঙ্ঘন কোরে তাঁর পরমাত্মার আর মিত্র বিসিয়াপুরের বাদশাহের প্রতিবর্ত লড়াই শুরু কোলেন। আমি এককালে বিসিয়াপুরের অধীশ্বর ছিলাম, দুর্ভাগ্য মুস্কর আমার একমাত্র পুত্র, তাঁর উপর রাজ্যভার সমস্ত কোরে, নিজের সংসার-অহুবাগে অনান্য হয়ে অরণ্যবাস আশ্রয় কোলেন। মুস্কর প্রণয়িনী একটি কন্যা প্রসব করেন। কত দেবে সকলে বলত, সে তার হার পরমাত্মন্দরী হবে। সময় একটা জু হওয়ায় লোকের মনে এর আতঙ্ক উপস্থিত হলো—জনরব যেন, কতুব বিস্তর ভয় লয়ে রাজধানীর অভিমুখে আগমন কোলেন, আমি তৎকালীন রাজপুরে বাস কোন্তে মন্য, কতুবের দুর্ভাগ্যবাহের বখা সেক্ষণ শুনেছি, এই তোমারে অধঃ করাই। আমার পুত্র বেশ বুজ্জিনানু আর চতুর ছিলেন, তাঁর বীরত্বের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল, তিনি এক্ষণ প্রাণ লীতে রাজ্যশাসন কোন্তেন যে, প্রজারা তাঁর ভয়ও কোন্তো অথচ আবার তাঁর বিস্তর ভয় রাগও কন্তো, ভয় মিত্রতা দুইই রক্ষা কোরে রাজধর্ম প্রতিপালন কোন্তেন, বাস্তবিক আমার পুত্র বাবতায় প্রজার অতি স্নেহের পাত্র হইত ছিলেন। শত্রু আগমনের জনরব শুনে পুত্রের সৈন্ত সমবেত কোরে যুদ্ধ করবার মানসে কতক পথ অগ্রসর হোলেন, এর পূর্বে মুস্কর উজীর দ্বারা কতুবকে জিজ্ঞাসা কোরে পাঠান যে, কেন তিনি শত্রু-বেশে হঠাৎ তাঁর রাজ্যে দখল দিলেন, সেই কথা শুনে চান। উজীরকে কতুব যৎপরোনাস্তি অপমান করেন, তাকে সেগান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, নচেৎ তার প্রাণ রক্ষা হোতো না। আমার পুত্রের যে সকল লহর ছিল, তারা সাহসে কি পরাক্রমে ন্যূন ছিল



না, তাদের রাজভক্তিও বেশ ছিল—প্রাণপণে  
দুঃ কোতো। কিন্তু লোকবল অধিক ছিল না—  
তৎকালীন আরো এক স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়,  
সেটা নিকটে নয়, একটু দূরে, সেই যুদ্ধেতে  
সেই বেছে যত প্রবীণ বিচক্ষণ যোদ্ধাদের  
নাশন যায়, তাতেই আমাদের লক্ষ্যের অচিরাত  
দশদশ হোয়ে ছিল-ভিন্ন হয়ে পড়িলে।  
কুতুবের জয় হল, সেটা তার আশ্চর্য্য কি? লোক-  
বল কম হলে জয়ের সম্ভাবনা কোথা? আমার  
বীরপুত্র সে দিবসের সৌভাগ্য-স্রোত নিজাভি-  
মুখ প্রবাহিত করবার নিমিত্তে মরিয়ার  
দ্বার উন্মত্ত হন, মনে কোলেন, যদি কোন  
সে দিনকার জয়-প্রবাহ আপনার  
কোলের দিকে ফেরাতে পারেন এই ভেবে  
পুত্রবর বীরমদে মত্ত হোয়ে মহা আশ্রয়  
কোবে শত্রুদলের উপর যোঁর আক্রমণ  
কোয়েন, সেই তাঁর শেষবিক্রম, সেইবার তিনি  
নিজ বিরাট পরাক্রমের ালগ্রাসে কবলিত  
হোলেন। এই মস্তভেদী সংবাদ রাজধানীতে  
বেড়ি যেন উড়িয়ে নে গেল। আমার প্রিয়পুত্রের  
সম্বন্ধাধী কুতুবের নিদারুণ দৌরাঙ্গের ভয়ে  
হাতাভাড়ি শিশুসন্তানটিকে কোলে লোয়ে এক  
দুঃ বিখ্যস্ত সহচরীর সঙ্গে বিলাস-উজানের মধ্য  
দিয়ে পাগিয়ে প্রস্থান কোলেন। যন জঙ্গল  
পাহাড় পর্বত কিছুই মানলেন না, তামাম  
রাস্তা চোলে লাগলেন, ভয়ে আর আতঙ্কে  
অকারণ ধড়াস ধড়াস কোতে লাগল, কিন্তু এত  
কষ্টেও সন্তানটিকে বুকের উপর রেখে জাপটে  
ধরেছিলেন। বধুমাতা যখন আমার নির্জ্ঞন  
আশ্রমে পৌঁছিলেন, তখন তিনি পথশ্রান্তে  
অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পূর্বে যারে  
একান্ত বন্ধু আর সহায় জ্ঞান কোতেন, ঐ বধু-  
মাতার মুখেই সেই বান্ধবের বিশ্বাস-অপহরণের  
বস্তান্ত অবগত হোলেন।

কুতুবের অভিপ্রায় স্পষ্টই জানা গেল, আমা-  
দের বংশ ঝাড়ে মূলে নিখূল না কোরে তিনি  
ক্ষান্ত হবেন না। লোকেরা আমার আশ্রম  
জানতো, তাতেই ভয় হল, হয় ত কুতুব একদল  
মশরু হিন্দী ছুরাআ বদ্যাস পাঠায়ে আমাদের  
খোরেনিয়ে কয়েদ করবে, কি মেন্নেই ফেলবে।

হতভাগিনী বধুমাতা একটু বিশ্রাম কোরে  
শরীরে একটু বল সামর্থ্য হলে কুটীরে অগ্নি দিয়ে  
অপগুণ শিশুটি, তার মাতা, আর মাতার সহ-  
চরীকে সঙ্গে কোরে কাশ্মীরে চোলে গেলেন।  
সে দেশের রাজ্যের সঙ্গে কুতুবের চিরমনাস্তর,  
তাই মনে কোলেন, তাঁর কাছে গেলে আশ্রয়  
পাবো, সে দেশে তিন বৎসর বাস করি। সীলা  
যখন দুঃখপোষা বালিকা, তার মাতা জর-বিকারে  
দেহত্যাগ কোলেন। বধুমাতার মৃত্যুর কিছুদিন  
পরে তাঁর সহচরীটিও আমাদের পরিত্যাগ  
কোরে চোলে গেল, সে আর কত কাল স্বর-  
সাংসার ছেড়ে পথে পথে ভেসে বেড়াবে?  
ইদানীং সে ব্যক্তি আশ্রম-বাসে বিরক্ত হোয়ে-  
ছিল। অবশেষে একমাত্র আমি মধুরহাসিনী  
পৌত্রীর রক্ষক হোলেন, প্রতিজ্ঞা কোলেন, ঐ  
নিরীহ অনাথা মাতৃহীন শিশুটিকে আপনার  
কাছে রেখে-সাবধানে লালন পালন কোরব;  
এখনো পর্যন্ত ত সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরে—  
আস্ছি।”

মালেক জিজ্ঞাসা কোলেন, “দেব! আপনি  
কাশ্মীর পরিত্যাগ কোলেন কেন যোগী  
বলতে লাগলেন, “সে দেশের প্রাচীন রাজ্যটি  
অতি ভদ্র ছিলেন, তাঁর পরলোক হওয়ার তাঁর  
পুত্র তখন অতি যুবা-রাজা হোলেন। এ ব্যক্তি  
অতি দুর্দান্ত, আর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জিত।  
কুমার রাজা হোরেই গোলকন্দের অধীশ্বর  
কুতুবরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা কোলেন। ঐ  
কথা শুনে সেই যুহুর্ভেই সে রাজ্যটি পরিত্যাগ  
কোরে পীরপঞ্চাল পর্বত চূড়ার উপর কুটীর  
বৈধে বাস কোতে লাগলেন, তা তোমার বেশ  
স্মরণই আছে। সেখানে নিম্প্রাপ পবিত্র-শরীরে  
অতি শুচি হয়ে বাস কোতেন, অতি দুষ্কর  
কঠোর ব্রত অবলম্বন কোরে কালযাপন কোতে  
লাগলেন, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রভাবেই আমি  
সেখানে নির্ভয়ে আর নির্বিঘ্নে ছিলেম। নির্মল  
সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আর কঠোর অরণ্যবাসই আমার  
সকল বিপদ থেকে রক্ষা কোতে লাগল। কখন  
কখন দুই একটি পথিক পথশ্রান্তিতে কাতর  
হয়ে আশ্রমে উপস্থিত হত। আমার কাছে  
চাইতে না হয় অথচ তাদের কষ্টও দূর হয়, এই



জন্মে কুটীরের সম্মুখে পান্নপূর্ণ জল রেখে দিতেম, তাতে পথিকদেপও সুবিধা হতো, আমাকেও বারবার বিরক্ত হতে হতো না,—তারা ঐ জল পান কোরে যার যে স্থানে চোগে যেতো। আমার বোধ হয়, কুতুব এ সময় মনে কোচ্ছেন, আমি নাই—আমার যত্ন হয়েছে, তার কারণ এই যে, দাসীটি যখন আমাদিগকে ছেড়ে গেল, যাবার সময় সে করে দিবা কোরে শপথ করে যে, রাজধানী পৌঁছে এই জনরব কোরে দেবে,—আমার আর লীলার পক্ষই হয়েছে। মহম্মদের মধ্যে তুমিই জানতে পেরেছো যে, আমরা মরি নি, বেঁচে আছি। এখানে থাকলে আমাদের পরিজ্ঞান নাই, সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাকে দক-লেই মাল্য করে, কেউ ভরসা কোরে আমার পায় হাত তুলতে পারবে না, সেটা আমার বেশ জানা আছে, কিন্তু লীলার জন্মেই আমার ভীষণতা, তার অদৃষ্ট মনে কোরে প্রাণ কেঁপে কেঁপে উঠে।”

মালেক বোলেন, “ভগবন্! আপনি বোলেন, কোন রাজপুত্রকে গীলা সম্প্রদান কোরবেন, কিন্তু পাত্র স্থির হয়েছে কি? আপনি ত কারও কাছে বাগদান হন নি?” তাপস বোলেন, “তবে শোনো বলি। রাজকুমার মিরজা গীলার স্বামী হবেন,—তাকেই আমি যোনোনীত কোরেছি। ঐ মিরজা পিতাপিতামহের উত্তরাধিকারী হোয়ে বিসিয়াপুরের সিংহাসনের স্বয়ং প্রাপ্ত হবেন। কুতুবকে সে রাজ্য অধিককাল ভোগ কোস্তে হবে না। বিসিয়াপুরের রাজ্যের উপর কাবুলের রাজ-বংশের স্বত্বাধিকার জন্মেছে, ঐ রাজবংশকে সজ্জনেরা অহুরাগ আর দুর্জনেরা ভয় করেন। এই পরিণয়-সূত্রে আমার পৌত্রী বিসিয়াপুরের সিংহাসনের ভাগিনী হবেন, বাস্তবিকও সে সিংহাসন তাঁর নিজেরই সম্পত্তি। বিসিয়াপুরের রাজা, যিনি এক্ষণে কাবুলে অবস্থিত কোচ্ছেন, আপনাকে তাদৃশ বলবান্ জ্ঞান করেন না, তাই বিনা সহায়ে কুতুবের উপর চড়াও হাতে ভয় কোচ্ছেন। সম্প্রতি ডেকানের নবাব আরজ জেবের সঙ্গে কথা চালাচালি কোচ্ছেন, তাঁর

সঙ্গে মিলিত হোয়ে দুর্জন কুতুবকে অপদগ কোরে সিংহাসন হস্তগত করবার চেষ্টা করছেন। সেই কার্যটি নিশ্চয় হয়ে গেলে আপদের শান্তি হবে, তখন আর বিসিয়াপুর রাজ্য কুতুব কর্তৃক অধঃপাত হবার আশঙ্কা থাকবে না। সেই সময় কোমলাঙ্গী লীলার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবেন স্বীকৃত হোয়েছেন। এই কারণে আমি তোমাকে নিশ্চয় কোচ্ছি যে, এখানে বারংবার যাতায়াত করো না, আর এই নিমিত্তেই পীরপঞ্চাল পাঠ্য থেকে উঠে আসবার পূর্বে আমি তোমাকে সে কথা অবগত করি নি।”

মালেক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যোগী রাজকে জিজ্ঞাসা কোলেন, “ওরো! কুতুবের কু-অভিপ্রায় জেনেও কেন আপনি লীলাকে রাজ্যান্তঃপুরের এত নিকটে এনে রেখেছেন?” যোগী বলেন, “আর স্থান কোথায় যে, যাবো? ভেবেছিলাম, এই স্থানে এলেই রক্ষা পাবো, এইটাই নিজ্ঞারের মন্দির। দিনও সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, আর কোথায় যাব, যে কদিন বাস কোস্তে হয়, এইখানেই থাকব—এই মনঃ কোরেই এসেছিলাম, মনে কোরেছিলাম, গোয়েন্দারা এ স্থান খুঁজে পাবে না, তারা সন্ধান কোরে কোরে হয়রান হোয়ে শেষে বিরক্ত হোয়ে ক্ষান্ত দেবে। আপাততঃ আমি বিসিয়াপুরে যাবো, তারই উদ্যোগ কোচ্ছি। কিন্তু কোথায় কোথায় আমার গতিবিধি, কোন্ সময় কোন্ দিকে যাতায়াত করি, তাই নাকি গোয়েন্দারা চৌকি দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় আমার পদচিহ্ন পড়ে, তা পর্যন্তও নাকি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই নিশ্চিন্তে পলায়ন করা বড় দুষ্কর হোয়ে উঠবে, আমার মন যেন ডেকে বোলছে, আমাকে বিপদে পোড়তে হবে, পালিয়ে বাচতে পারবো না।”

মালেক আপনার বাহ প্রদর্শন কোরে বোলেন, “এ বাহ থাক ত আপনাকে বিপদে পোড়তে দেবো না, আমাকে সঙ্গে লাবেন, আপনি আমার উপর নির্ভর কোরে থাকবেন।”

যোগীবর বোলেন, “পুত্র! পায়ণ্ড কুতুব

তোমারও অহুস্কার কোচ্ছেন, সেটা একবার মনে করো, তুমি শীঘ্র স্বদেশে চোলে যাও, কালবিলম্ব কোরো না, আমাদের অদৃষ্টে যা পাকে ঘটবে, তুমি তার জন্তে চিন্তা করো না, দেশে পৌঁছলেই তুমি নিষ্কণ্টক হবে।”

মালেক বোলেন, “না, তা হবে না, লীলাই যদি সঙ্গে না গেলেন, তবে যুড়াই মঙ্গল। আমি আপনার হাতে ধরে বিনয় কোরে বোলছি, কেবার লীলার কাছে আমায় লয়ে চলুন, আমাদের অদৃষ্টের ফলাফল তাঁর নিজমুখে শুন্তে বাসনা করি।”

তাপসবর বোলেন, “বালক! আমি জানি, লীলার প্রতি তোমার বেশ প্রণয়-অন্তরাগ রয়েছে। কিন্তু পূর্বে মিরজাকে বাগদান করেছে, এক্ষণে যদি সে কথা খতিয়ে দি, তা হলে আমি আর লীলা বিসিয়াপুরের রাজকোষে পতিত হবো, তাতে আমাদের আফ্রাদময় কুবেরপুরুষ বিমল পদ্মটি শুকিয়ে মলিন হবে।”

মালেক বোলেন, “তবে আমাকে বিসিয়াপুর পর্য্যন্ত সঙ্গে যেতে অনুমতি করুন, যিনি আমার প্রাণের সঙ্গে একত্রে গাঁথা আছেন, তাঁকে চক্ষের উপর রেখে সতর্ক হোয়ে সাবধানে লয়ে যাবো।”

যোগী বোলেন, “পুত্র! তবে তোমার যেমন ইচ্ছা হয় করো, রাত্র প্রভাত না হতেই আমরা প্রস্থান করুবো, যে হেতু আমায় ধর্ম্ম-বার নিমিত্ত চারিদিকে পাহারা বোসেছে। তুমি তবে আজ এখানে থাকো, ইচ্ছা হয়ে থাকে ত আমাদের সঙ্গে যেও।”

তার পর বৃদ্ধ দুঃখিত-চিন্ত মালেককে সঙ্গে কোরে তাঁর প্রণয়িনীর কাছে উপস্থিত কোলেন, পাশা সে সময় অবগুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে বোসে-ছিলেন, মালেক বিস্তর জ্বতি-মিনতি কোরে অনেক কষ্টের পর পোম্‌টাটি মোচন করালেন। প্রণয়ী প্রণয়িনী আপনারদের নির্দয় অকরুণ অদৃষ্টের জন্তে কেবল রোদন কোরেই অবশিষ্ট দিনমানটুক অবসান কোলেন। যোগিবর রাজ-কুমার মিরজার সঙ্গে লীলার পাণিবন্ধনের যে ব্যবস্থা স্থির কোরেছেন, তাতেই যোয় মনস্তাপ

পেয়ে যুবক যুবতী অতিশয় আক্ষেপ” কোন্তে লাগলেন।

মালেক নিশ্চল, সরল, উদার স্বভাব, চলনা জানতেন না, মনে কোন দৃষ্ট অভিপ্রায়ও ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রণয়রাগ দ্রুত প্রবল, তাই মনোবেগ সঞ্চার কোন্তে না পেরে অকণ্ঠিত হোয়ে নির্ভয়চিত্তে লীলাকে পরামর্শ দিলেন যে, পথে উঠে পিতামহকে পরিত্যাগ কোরে তাঁর সঙ্গে পারস্থানে চোলে যান। ঐ কথা শুনে লীলার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, অতি অভি-মানিনী হোয়ে সক্রোধে ঘোমটা খোঁপে দিলে চার চক্ষানন ঢেকে নীরব হোয়ে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। দুর্দান্ত প্রণয়রাগের ওজর কোরে মালেক আপনার দোষ কাটাবার চেষ্টা কোর-বেন, এমন সময় যোগীকে প্রবেশ কোন্তে দেখে তাঁর রসনা নিশ্চল হলো। উদাসীন বোলেন, “প্রথম কোশে দূকোশ হেঁটে যেতে হবে, তাই লীলার বিশ্রাম দরকার হোচ্ছে, যে অল্প বেগটুক আছে, সেটুক তাঁকে ঘুমুতে দিন।” লীলাকে বোলেন, “তুমি প্রস্তুত হোয়ে থেকো, ডাকবামাত্রই উঠে এসো।” যুবতী তাই শুনে সকাল সকাল শয়ন কোলেন। ঐ পাতাল-গৃহের সব টেরে একটি কামরা ছিল, যোগী মালেককে সঙ্গে কোরে সেই ঘরে গিয়ে শয়ন কোলেন। রাত্রশেষে, সূর্য্যোদয়ের পূর্বে উদাসীন মালেককে আর লীলাকে ডেকে উঠা-লেন, তাঁরা পিত্তি-রন্ধার মত যৎকিঞ্চিৎ জল-যোগ কোরে নিলেন, সকলে যাত্রা কোরে পাতাল-বাস থেকে বার হয়ে লোকালয়ের বায়ু আশ্রাণ কোন্তে কোন্তে চোলেন। যোগী অতিদান, অতি বিষয়, থেকে থেকে চমকে চমকে উঠছিলেন, মাঝে মাঝে ফুলকো-চকো হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখছিলেন, কি একটা বিপদ এসে ঘাড়ে পোড়বে, কি পড়ে পড়ে হোয়েছে, তিনি যেন সেই ভয় কোছিলেন। পাছাড় থেকে নেমে আস্তে আস্তে চোলে যাচ্চেন, এমন সময় পাচহাতিয়ার বাঁধা একদল লোক এসে চক্ষের নিমিষে তাঁদের ধরে ফেলে, মালেক তাই দেখে তখনই তলোয়ার ধোলেন, মরিয়ে হোয়ে অনেককণ পর্য্যন্ত নির্ভয়ে যুদ্ধে

লাগলেন। বিপক্ষেরা দলে ভারি ছিল, তাতেই পরাস্ত হয়ে শেষে তাঁকে ধরা দিতে হলো। শত্রুপক্ষেরা তখন তাঁকে নিরস্ত্র কোরে বেঁধে ফেলেন। লীলা তাঁর পুত্রপাদ অভিভাবককে জোড়িয়ে ধোরে রইলেন, আর নিরবচ্ছিন্ন করুণায়ের কাতরাতে লাগলেন, “তোরা দয়া কোরে ছেড়ে দে।” এই কথা বোলে চেঁচাতেও লাগলেন। তাঁর সে সকাতির চীৎকারধ্বনি কে শোনে? কেউ তা কানেও ঠাঁই দিলে না। সেই কমনীয় কুসুম-কান্তির বিমল প্রতিমাখানি পাশেগেরা ঝিড় ঝিড় কোর টেনে একটি ঝোপের কাছে নিয়ে গেল, তাঁকে লয়ে বাবার নিমিত্ত সেখানে একখানি ডুলী রাখা ছিল। মালেক ঐ নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখে রাগে ফুলতে লাগলেন, যোগী দেখে শুনে উম্মাদের তায় হোলেন, দেবরাজ যেমন ভীমগর্জ্জন কোরে জলদগণের তাড়না করেন, যোগিবর সেইরূপ ঘোর বজ্রপাত শব্দে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোতে লাগলেন, আবার কখন বা বদমাসদের হাতে পায়ে ধোরে সাধা সাধনাও কোচ্ছিলেন, যদি তারা রূপাকটাক্ষ কোরে তাঁর স্নেহের হার, অন্ধের নিধি, সেই চারু বালাকে অব্যাহতি দেয়। ছরাত্তা পাশেও নর-হস্তারা কি কারও ভয়-প্রদর্শনে ভয় পায়? না কারও করুণাপূর্ণ কাতর উক্তিভে তাদের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হয়? দুর্জ্জন পাপিষ্ঠেরা জতি-মিনতির প্রতি একবার দৃকপাতও কোয়ে না, তাঁর বজ্রনির্ঘোষত্বা অভিসম্পাতের প্রতি লক্ষ্যপণ্ড না কোরে লীলাকে লয়ে গ্রহান কোলে, সেই ডুলীর মধ্যে বালাকে বসিয়ে তাড়াতাড়ি সোরে পোড়লো। মালেককে একটা ষোড়ার উপর সোয়ার কোরিয়া পাহারা দিয়ে লয়ে চলো, মালেক তাঁর অশ্রুযুথী লীলার পাশাপাশি হয়েই চোলেন। লীলা মালেকের নাম ধোরে কঁঁস কঁঁস করে ফুলে ফুলে কঁাদতে লাগলেন, আর মধ্যে মধ্যে সেই পারসীর আর যোগিবরের নাম কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন, “ওগো তোমরা আমাকে বাঁচাও, আমার জাত-কুল রক্ষা করো।” তাই শুনে পারসী বুবার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিদাহ হতে লাগল,

লীলার হতাশ উক্তিগুলি তাঁরে যেন দগ্ধে দগ্ধে ভাজা ভাজা কোতে লাগল, তাঁর কালক্রোধ ক্ষণ কেউ যেন মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলতে লাগল। যোগিবর শোক-বিষাদে স্তম্ভিত হয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সঙ্গে চোলেন, আর মধ্যে মধ্যে অল্পচ গম্ভীর-স্বরে “গোলকন্দ-রাজা অধঃপাতে যাক্, তাঁর সন্ন্যাস হোক্ জগদীশ্বর ধারে যেন জলন্ত অনলোদগ্ধ কোরে মারেন।” এই অভিসম্পাত কোচ্ছিলেন, অনেক পথ পর্যন্ত তাঁকে ঐরূপ অভিসম্পাত কোতে শোনা গেলিলো—যে পর্যন্ত বন্দী আর বন্দিনী একটা ক্ষুদ্র গ্রামে না পৌঁছেছিলেন, সে পর্যন্ত যোগীর অভিলাষ কথক কথক শোনা যাচ্ছিলো, ঐ ক্ষুদ্রগ্রামে নূতন একদল বেহারী অপেক্ষা কোচ্ছিল—বেহারার ডাক বোসেছিল। মালেক আর তাঁর প্রিয়তমা লীলা বাগনগরের দিকে চোলেন, ছেন, আমরা তাঁদের পথে বিদায় কোরে দিলো কুহবরাজের পার্শ্বচরেরা য় স্ত্রের ধোরে শীকার দুটি হস্তগত কোতে সক্ষম হয়েছিল, আর সে স্ত্রের সন্ধান তারা যেকপে জানতে পেরেছিল, পাঠক বন্ধুকে সেই অপূর্ণ রসান্তটি অবগত করাবো।

লীলাকে পীরগকাল পর্ত্তের কটীর থেকে অপহরণ কোরে আনবার মানসে যে কয়েকজন বেহারী ত্রয়া কোরে পাঠান হয়, তারই একজন বেহারী হীরকের সওদাগর আবাসের কাছে চাকর হয়, রাণয়েলথওই তার বাস ছিল। সে ব্যক্তি নূতন মুন্সীকে দেখেই তথ্য চিন্তে পাল্লো যে, এ ব্যক্তি সেই পারসী বীর-পুরুষ, আর এই ব্যক্তিই রাজার অল্পচরদের পরাস্ত করে। বেহারী পূর্বে শুনেছিল, যে ব্যক্তি ঐ পারসীকে ধরিয়ে দেবে, কি যে ব্যক্তি এমন সন্ধান বোলতে পারবে যে, অনায়াসেই সে ধরা পড়ে, সে বিস্তর পারিতোষিক পাবে। বেহারী সেই আশ্বাসে ক্রতসঙ্কল্প হল যে, পুরস্কারের সমুদয় অর্থটি সে আপনিই উদয়সাং কোরবে, তাই সে অপ্রকাশ হয়ে মালেককে চোকাচোকা নজরের উপর রাখতে লাগল। মালেক কখন কোথা যাওয়াত করেন, কখন কার সঙ্গে কথা কন,

কখন কি করেন—এই সকল সন্ধান, কোরে ফিবে লাগল। এক দিন সন্ধ্যায়, যখন একটি আলো লয়ে ওড়কের মধ্যে একলা চোলেছেন, সেই পাণ্ডিত্য বটা তাঁর দেখে নিঃশব্দে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চোলে, সে ভাবলে, মালেক যখন একলা যাচ্ছেন, অবশ্য কোন মতলব আছে, তাঁর মতলবটা জানতে হবে। মালেক যখন পোড়ে গিয়ে হাতের আলোটি নিবিরে ফেলেন, ঐ বজ্জাত ধূর্ত নরায়ণ বেহারী হাত কয়েক মাত্র তাকাই ছিল। সুরঙ্গের চরম সীমার একদেশ থেকে যে আলোর ছটা প্রকাশ পায়, তাই দেখে মালেকও যেমন বিস্মিত হন, তেমনি ঐ পায়ের বেটাও তাঁর স্তম্ভিত হয়। বেহারী কিন্তু তখন বুঝতে পারে, সেই গিরি-সুন্দরী এখানে অপ্ৰকাশভাবে আছেন, মালেকের কত রাতে এখানে আসবার কারণই সেই। পরদিন সে সন্ধ্যায়, নিঃশব্দে মালেক লোহার শিক চাচ্ছেন, আর সেই শিক লয়ে সুরঙ্গের কোচোলে গেলেন, তখন সে দেখলে, সে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়েই ছিল, যুব যত্নপূর্বক দেখছিল, তিনি শিক লয়ে কি করেন সে দেখলে, মালেক আসবার সময় একখানি চিঠি জেবের মধ্যে ঘুষ রাখলেন, তাঁর পরেই একেবারে সিধে বাড়ী চোলে গেলেন। বেহারী বা ঠাণ্ডেছিল, তাই ভাল-রূপ সপ্রমাণ করবার জন্তে ঐ ব্যক্তি সুরঙ্গের প্রান্তভাগে সেই প্রস্তরময় প্রাচীরের কাছে চোলে গেল, হাতে একগাছ লোহার শিক ছিল, শিকগাছটি সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে, বাড়ীগাছটি পুনরায় টেনে বার কোরে দেখে যে, তার অগ্রভাগে রেসমের সূত্রে একখানি পত্র বাধা রয়েছে, তাই দেখে সে আনন্দে নেচে উঠল, তারি পুলকিত হল। বেহারী লেখা-পড়া জানত না, কি লেখা আছে, কি বুঝবে? তাই সেই চিঠিখানি লয়ে সুরঙ্গের প্রধান ভ্রাতাবধারক যিনি, তাঁর কাছে চোলে গেল, তিনি তখন রাজধানীতে ছিলেন। প্রধান অধ্যক্ষ অত্যন্ত আগ্রহ হয়ে পত্রখানি পোড়লেন, তাতে এই কটি কথা লেখা ছিল।—

“আর অধিক কথা আমার কাছে শুনতে

চাচ্ছেন কেন? যোগীর কি অভিপ্রায়, তা আমি অবগত নই। আপনি নিশ্চয় জানবেন, আর অতি অল্পকাল মাত্র আমরা এখানে আছি, দুই এক দিবসের মধ্যেই এস্থান ত্যাগ করবো, আর যেন এখানে আসতে না হয়। আমি যে সময় আপনাকে বলে দিয়েছি, সেই সময় যোগীর সঙ্গে পর্বতের উপর সাক্ষাৎ হোতে পারবে তাঁর মুখেই সকল কথা শুনতে পাবেন। আমাদের আর একবার দেখা সাক্ষাৎ হোলে আশ্চর্য্য হই।

লীলা ।”

এই সন্ধানের বিষয় রাজাকে, তখন সংবাদ করা হোলো। রাজা বলেন, তাঁর চরণে যদি সেই গিরি-সুন্দরীকে, আর সেই পারসীকে তাঁর কাছে ধোরে আনতে পারে, তিনি তাদের অপরিমিত অর্থ পুরস্কার কোরবেন। দুজন লোক অলক্ষ্য হয়ে মালেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রইল। সেই দুটি লোকই তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে, পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য কোরে সেই ভগ্ন মন্দির পর্যন্ত যায়, সেখানে গিয়ে কিন্তু তাঁরে তারা দেখতে পেলেন না। তখণ্ড লীলার ঐ পত্রের উপর নিভর কোরে একদল বদমাশ এমনি স্থানে ওং কোরে বেধে দেওয়া হয়েছিল যে, কালে ভদ্রে কখন যদি সেই যোগী আর সেই যুবতী পর্বত-বাস পরিত্যাগ করেন, যদি কখন এস্থান থেকে উঠে অল্প স্থানে চোলে যান, সেই সময় তারা নিশ্চয়ই সেই সকল লোকের হাতে গেরেস্তার হবেন, সেটি কেউই পঙ্কতে পারবে না। কত উত্তম কোশলে সেই গেরেস্তারি কার্যটি তারা সিদ্ধ কোরেছে, পূর্বে সে কথা বলাই হয়েছে।

রাজধানীতে পৌছে মালেকের হাতে পায়ে জিজির দিয়ে রাজার সূত্রে হাজির কোরে দিলে। এদিকে তাপিত হৃদয়া লীলাকে বিলাস-মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তাঁর বাসের নিমিত্ত ঘর-দ্বার সুসজ্জিত কোরে রাখা হয়েছিল। রাজা মালেককে দেখে বোলেন, “ওরে বিটলে বজ্জাত! তুই বেটা কে? তোর এত সাহস যে, আমার হৃদয়ের বাহির্ভূত কাজ করিস?” আমার সঙ্গে আড়া-আড়ি কোরে আমার ইচ্ছার ব্যাঘাত করিস?”

মালেক বোলেন, “আমি চিরকাল যা, আজও তাই, আমি অত্যাচার পীড়িত অনাথা বাক্তিদের রক্ষা করবার জন্তে জীবন গ্রহণ কোচ্ছি।”

রাজা। বেটার ভারি অহঙ্কার, একে আমার সামনে থেকে তফাৎ কর, সেই পাতাল-পুরের অন্ধকূপে লয়ে যা, বেটার যেমন দস্ত, বিচার কোরে তার উপযুক্ত শাস্তি দেবো। যা, আমার স্মৃথ থেকে লয়ে যা।” এইবোলে চোঁচিয়ে সভা হল তোলাপাড় কোঁতে লাগলেন।

অনুগত দাসেরা মালেককে ঘেন উড়িয়ে লয়ে ছলো, মাটির ভিতর একটি ঘরে তাঁরে কয়েদ কোরে রাখলে, ঘরটির মধ্যে এমনি অন্ধকার, আর তার মেজেটি এমনি জলা-সাঁত-সাঁতে যে, তার মধ্যে মাথা দিতেই মালেকের সর্বাঙ্গ আতঙ্কে কেঁপে উঠল। যুবর ত ঐ অবস্থা হল, রাজা এখন অন্যরে চোলে গেলেন, সেখানে বিধুমুখী লীলা বোসে করুণস্বরে রোদন কোচ্ছিলেন, আর বচনাতীত শোক-বিষাদে অভিভূত হোয়ে করে করে নিপীড়ন কোচ্ছিলেন। রাজা মনে কোলেন, নয়—নত হোয়ে কথা-বার্তা কইলে, দুটো স্নেহ প্রকাশ কোলে, দুদিন আদর আফাদ কোলে লীলাকে বশ কোতে পারবেন, শেষে সুন্দরী আপনা হতেই আমার মন্দিরে থাকতে ভালবাসবেন, এই ভেবে বাগনগরপতি সেই শোকাত্তা হৃদয়দম্ভা কামনীর নিকট উপস্থিত হোয়ে বোলেন, “যুবতীরয়! তুমি কেঁদো না, শোক-উজ্জলিত স্ফারনয় অশ্রু দ্বারা তোমার উজ্জ্বল নয়নের বিমল জ্যোতি কেন মলিন কোছো? সুন্দরী! এই দেখো, একটি মহা বলবান রাজা পদানত হোয়ে তোমার অগ্রে ষোড়হাত কোরে দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমায় এত স্নেহ করে, তোমার জন্তে সে এত উন্মত্ত যে, তার রক্তময় উজ্জ্বল সিংহাসনের অর্দ্ধাংশ প্রদান কোতে প্রস্তুত হোয়েছে। পুরো-হির কৃতাজলি হোয়ে ঘারে অপেক্ষা কোচ্ছেন, তোমার অনুমতি হোলেই আজন্মের মত চির-অভেদ্য বন্ধন দ্বারা আমাদের পরস্পর আবদ্ধ করবেন। এক্ষণে তোমার প্রদীপ্তমান চার

নয়নের অশ্রু যোচন করো, আর একটিবার সেই প্রফুল্ল-বিকশিত বিনোদ আঁখির কোমল-ছটা চক্ষে দর্শন কোরবো।”

অশ্রুমুখী লীলা ফুলতে ফুলতে, ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কেবল এই কথা বোলেন, “আমাকে আমার বৃদ্ধ অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিন, আর যাঁকে ধোরে কয়েদ কোরেছেন, সেই মহাশয় বন্দাকে মুক্ত কোরে দিন।”

রাজা বোলেন, “কে? তাই বটে! সেই বজ্রাতের জন্তে অমুরোধ কোছো? তবে তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে, আল্লার দিকি।”

কোনলাঙ্গী লীলা ঐ কথা শুনে হ’হাকার শব্দে চীৎকার কোরে উঠলেন, অতি দীন দুঃখিনীর ন্যায় কাতর হোয়ে কঁদতে কঁদতে সেই দুর্জন নির্ধূরের দুখানি পা জোড়িয়ে ধোরে “ওগো, তারে প্রাণে ঘেরো না, ওগো তারে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার, তুমি তার প্রাণের উপর হস্তারক হইও না।” সুন্দরী এই বোলে অতি কাতরস্বরে চোঁচাতে লাগলেন। রাজা বোলেন, “আচ্ছা, তুমি যদি আমার হও, তবে তারে ছেড়ে দেবো, তোমার উপরেই সেই পারমী বালকের শুভাশুভ অদৃষ্ট নির্ভর কোছে।”

হৃদয়-তাপিতা লীলা বোলেন, “এক্ষণে শোকে-সন্তাপে অস্তঃকরণ দম্ভ হোচ্ছে, এ তাপিত অবস্থায় আমি কি তত গুরুতর প্রস্তাবের সহস্তর কোঁতে পরি? তবে আপনি এমন অনুচিত প্রস্তাব কেন কোচ্ছেন। বিশেষতঃ আপনার লোকজনেরা যে ভয় প্রদর্শন কোরেছে, সে আতঙ্ক আমার এখনও দূর হয় নি, তাই প্রার্থনা যে, আপনি অনুগ্রহ কোরে কিছু দিনের অবকাশ দিন, আগে বিবেচনা কোরে দেখি, শেষে সে কথার চূড়ান্ত জবাব দেবো।”

রাজা বোলেন, “সেই কথাই ভাল, আজ থেকে তোমাকে এক মাসের অবকাশ দেওয়া গেল, আচ্ছা দেখবো, ঐ মেয়াদ গত হলে তুমি কেমন কোরে আমার ক্রোধায় প্রজ্জলিত করো।” লীলা বোলেন, “তবে মালেক মারা পোড়বে না? তার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই?” কুতূহ বোলেন, “আপাততঃ সে মারা যাচ্ছে না বটে,

কল্প যে মেয়াদের কথা হল, ঐ মেয়াদ গত হলে কুম যদি প্রতিজ্ঞা কি অপ্রীতিকর জবাব দাও, তবে তুমিই তার প্রাণবাতি নী হবে, তোমা হতেই শিলমোহর পোড়ে তার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হবে।” এই কথা বোলে রাজা হুকম দিয়ে দিলেন, “জীলার যেন অগোরব না হয়, সকলেই যেন তাঁর সম্মান সমাদর করে, আর তিনি স্বয়ং যখন ইচ্ছা কোরবেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোস্তে আসবেন।”

এক্ষণে যোগীবরের আর কোন আশা নেই, তার পক্ষে কেবল বিপদেরই আশঙ্কা কোচ্ছেন, কি করেন, বিরূপায় দেখে আস্তে আস্তে বাগ-  
নরের দিকে চোলে গেলেন। সেখানে পৌছে

আর মালেকের অদৃষ্টে যা ঘটেছে শুন্-  
লেন, রাজার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্যে আশ্রয়িত হয়ে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর বাসনা সিদ্ধ হল না, গোলকন্দনধেব কোছে তাঁর কথা উপস্থিত করতে তিনি তা করা কোরে কানেও শুন্গেন না। যে যোগীবর কথা উত্থাপন কোরেছিল, তারে পরাস্ত সঙ্গ-  
লোক ভাঙিয়ে দিলেন, অবশেষে রক্ত যোগীকে বঙ্গবিক রাজপুরী থেকে বার কোরে দেওয়া হল। রাজাস্তম্ভের সম্মুখে একটা তুচ্ছ কথা কোলেও অদৃষ্টে সহায়ময় গোল হয়ে পড়ে। যোগী জনরবে শুন্লেন যে, রাজার প্রস্তাবের প্রথম উত্তর দেবার জন্যে জীলা এক মাসের অবসর চেয়ে লয়েছেন, শুনে বড় আনন্দিত হোলেন। এক মাসকাল গত হবার পূর্বে গুরু-  
দর ঘটনা উপস্থিত হয়ে অনেক কারখানা উদ্ভটে যেতে পারে, অনেক বিষয়ের পরিবর্তন হতে পারে—আবার অনেক হওয়া বিষয়ও নয়, আর না হওয়া বিষয়ও উপস্থিত হতে পারে। যোগী বিবেচনা কোলেন, তবে এই ত সুসময়, এই সুযোগে বিসিয়াপুরের রাজাকে একবার অভ্যর্থনা করি, তাঁদের যে চির অভিসন্ধি আছে, এই সময় সিটি পাকাপাকি কোরে তোলা যাক। হুৎখবিবাদপীড়িত তপসবর রওনা হয়ে বিসিয়া-  
পুরে চোলে গেলেন, তাঁর মনে মনে ভরসা ছিল যে, ফিরে এসে সর্বদমনকারী মহা বলবান্ সৈন্য সঙ্গে লয়ে বাগনগরে প্রবেশ কোরবেন,

গোলকন্দ রাজ দেখে কেঁপে যাবেন, তাঁর সিংহা-  
সনের আমূল পর্যাস্ত লোড়ে উঠবে, রাজ্য রক্ষার নিমিত্তে আহি আহি কোরবেন।

রজনীও প্রভাত হয়, আর হতভাগা যোগেক মনে করেন, হয় ত আশ্র আমার মাতুর পরো-  
য়ানা উপস্থিত হবে, যুবা এইরূপ নিতাই প্রাণের আশঙ্কা কোস্তে লাগলেন। এক দিন গত হলো, দুই দিন গত হল, তথাচ মালেক বেঁচে আছেন, নিতাই এইরূপ দেখছেন, একদিন যাচ্ছে, আর আসবে, কিন্তু তথাচ মালেক জীবিত আছেন, কেউ তাঁরে জিজ্ঞাসাও করে না। যুবার মনে সাহস হলো, তিনি এক্ষণে পালাবার যোগা-  
যোগ চিন্তা কোরে লাগলেন। জেমগার সাহায্যে কোন গতিকে তাঁর উপকার হতে পাববে, এ আশা তাঁর মন থেকে এখনও যায় নি, মালেক সেই আশা ধোরেই সাহসের উপর আছেন, তবে তিনি যে পোষ শব্দটি পোড়েন, এ খবর আমীরকে কি কোরে পাইল যায়, তাই ভেবেই উৎকণ্ঠিত হোতে লাগলেন। যুবার সঙ্গে কিছু অর্থ ছিল, জেমদারোগাকে বৃস করল কোরে লেখবার সরঞ্জাম আর একটা আলো আনালেন, মালেক এখন কালী কমল লয়ে দিখতে বোসলেন। পারসঙ্গান থেকে রওনা হওয়া অবধি এ পর্যাস্ত যে যে ঘটনা হয়েছে, একটি একটি কোরে খুঁটে খুঁটে সে সমুদায় বৃত্তান্তটি লিখলেন। প্রকারান্তরে ইশারা কোরে এ কথাও জানালেন যে, গোলকন্দ-  
রাজের অধঃপতন হবার বেশ সম্ভাবনা হোয়েছে, এ দল বলবান্ সৈন্য তাঁর অধিকার আক্রমণ করবার উদ্ভোগ কোছে, কিন্তু কোন্ দিক থেকে এ উদ্ভোগ হোছে, কতব তা স্পষ্টও জানেন না। দারোগাকে বৃস দিলেই কাজ পাওয়া যায় জেনে মালেক আরো কিছু মোহর করল কোরে, বিস্তর হাতে পায় ধোরে বোলেন যে, তিনি অল্পপ্রাণ কোবে এই পরখানি আমীর যেখানে আছেন, সেইখানে রওনা কোরে দেন, বিলম্ব না হয়। দারোগাও স্বীকৃত হলেন, এ উপ-  
কার তিনি অবশ্যই কোরবেন। কিন্তু কি পরি-  
তাপ! ঐ পষ্ট বাহু স্বীকারের অন্তঃকালে একটি

বিশ্বাসঘাতকের কালমুর্তি লুকিয়ে ছিল, মালেক তার কোন খবরই রাখতেন না।

প্রথমঃ যৎকালীন লেখবার উপকরণ চাওয়া হয়, দারোগা তখনই সে কথা রাজাকে অবগত করান। রাজা শুনে হুকুম দিলেন যে, কাগজ কলম দিয়ে মালেকের প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়, আর বোজেন, বন্দী যা কিছু লেখে, তিনি যেন তা দেখতে পান, পত্রখানি তাঁর হাতে যেন সমর্পণ করা হয়। কতুব চিঠি পোড়ে যখন জানতে পারেন, মালেক আমীরের সহোদর, তাঁর অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো। লীলার কাছে যে অবসরকাল স্বীকার করেছেন, তাঁর মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয়নি, তথাচ রাজার অর্দ্ধাঙ্গের অধিক প্রার্থনা হল যে, সে প্রতিশ্রুত অত্যাচার কোরে মালেকের প্রাণ বধ কোত্তে তখনই হুকুম দেন। পত্রের মধ্য অন্তর্ভাগেও কাছে প্রকাশ রাখলেন; রাজার মনে এই ভয় হলো, বন্দী আমীরের সহোদর, এ কথা শুনে মালেকের প্রাণদণ্ড করবার নিমিত্তে তারা তাঁকে সন্দেহা পীড়াপীড়ি কোরবে, শেষে হয় ত তাদের অন্তরোধ এড়াতে পারবেন না। কতুব যে বন্দীর প্রাণ নষ্ট কোত্তে আগ্রহ ছিলেন না, তার কারণ এই, মালেকের প্রাণ রক্ষা হোলে লীলা তাঁর যত্নাবে সম্মত হোলেও হোতে পারেন। পূর্বে আমীরের উপর কতুবের রাগ-দেষ-স্বণা ছিল বটে, কিন্তু তত বাড়াবাড়ি নয়, সম্প্রতি জেমলার প্রতি তাঁর আকোশ ভারি বেড়ে উঠছে, অতিশয় প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে অসম ছুঁসাহসী আমার জেমলা গোলকন্দ রাজার নাম কোরে রাজসেনা লয়ে কর্ণাটের যেখানে যত মন্দির, মসজিদ, আর বড় বড় সমৃদ্ধিমান সহর, নগর ছিল, লুটে ছারখার কোচ্ছেন। রাজধানীতে পুনরাগমন কোলে তাঁর অনুষ্টে যা ধরা রয়েছে, সিটি তিনি পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন, তাই জেনেই দিনে ডাকাতের জায় দোচাকো লুট-তরাজ কোরে হীরে মুক্ত প্রভৃতি নানা-প্রকার বিলকিন্মাত রত্নের চক্ষুদান দিচ্ছিলেন। আমীরের কি ক্ষতি, গোলকন্দের রাজাই দেশা-বজির লোকের আপদের স্বরূপ হোলেন, আমীরের অপরাধে তিনি বিস্তর রাজারাজড়ার শত্রু

হয়ে পোড়লেন। কতুবের মনে এই ভয় হলো, জেমলা যে সকল দেশ লুট কোরে উজাড় উদাস কোচ্ছেন, সেই সকল দেশের রাজারা এ অপকারের প্রতিশোধ না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, হয় ত তাঁরা সকলে একবাক্য হোয়ে প্রতিকারের চেষ্টা কোরবেন। পাছে তাঁরা সৈন্যবল লয়ে হঠাৎ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন, এই ভয়ে কতুব রণ সজ্জায় প্রস্তুত হোতে লাগলেন, যদি তেমন তেমন দেখেন ত সম্মুখীন হোয়ে যুদ্ধ কোরবেন। “একদল সৈন্য তাঁকে আক্রমণ কোত্তে আসচে, আর ধৈর্য দিগে আসচে, কতুব স্বপ্নেও ভাবেন না যে, সেদিকে ভয়ের সন্দেহ আছে।” মালেকের চিঠিতে আকার ভঙ্গীতে এই যে একটু ইশারা আছে, তাতেই কতুব দ্রুতাবনায় অন্তর হোলেন, বিষম ক্রীপরে পোড়লেন, ভারি উদ্বিগ্নে রইলেন, সান্নিধ্য চিন্তা তাঁর ব্যতিবাস্ত কোরে তুরো। তাঁর মনে স্পষ্ট বিশ্বাস হলো যে, এই সহোদর দুই বান্ধি এক যুড়ী বিশ্বাসঘাতী প্রতাবক, তাই তিনি মনে মনে দ্বিধ-সঙ্কল্প কোলেন যে, নিশ্চয়ই বন্দীর প্রাণ সংহাণ কোরবেন, কমলেন্দ্রা লীলা তার প্রস্তাবে সম্মত হোন আর নাই হোন, তাই জন্তে মালেকের মৃত্যু রক্ষা হবে না।

বিশাতার কি অপূর্ণ খেলা। যৎকালীন মালেক বিপুল আনন্দে পুলকিত হোয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, কপাল-গুণে সেই সমগ্র উদ্ধারের তাৎসম্ভাবনা, প্রাণরক্ষার তাৎসম্ভাবনা একেবারে উচ্ছিন্ন হোয়ে গেল। তার তিন দিবস গত হোলেই মাস পূর্ণ হয়। লীলা দেখলেন, মেয়াদ ত সূরিয়ে এসেছে, কিন্তু নিকটাত্মকুলোর কোন চিহ্নই নেই, তাই দেখে চারুদর্শনা মনে মনে ছটফট কোত্তে লাগলেন, তাঁর যেন মরণ-স্বপ্না উপস্থিত হলো। সুন্দরীর মনে বিশ্বাস ছিল, যোগী যদি বেঁচে থাকেন, তাঁ হোতে যত্নের ক্রটি হবে না, চেষ্টা পেতে, কষ্ট লতে, পরিশ্রম কোত্তে যোগী কিছুতেই পরাস্ত হবেন না, তাঁর উদ্ধারের নিমিত্ত তাপসবর কোন উপায় বাকী রাখবেন না। যোগী যে বিস্ময়াপূরের সঙ্গে মিলে একটা চক্রান্ত কোরবেন, সে খবরও লীলা না জানতেন তা নয়।



যুবতী এক্ষণে এই আক্ষেপ কোন্ডে লাগলেন যে, কেন তিনি গোলকন্দ-রাজের প্রস্তাব মীমাংসার জন্তে আরো অধিক সময়ের প্রার্থনা কোলেন না? সেই দুঃখে ক্ষুব্ধ হয়ে আরো দ্রিয়মাণা হ'তে লাগলেন, অধিক মেয়াদ চাইলে অবশ্যই পেতেন। মালেকের যে ঘোর দুর্গতি উপস্থিত, এক একবার তাই মনে পোড়ে তাঁর অন্তঃকরণ, কৈপে কৈপে উঠতে লাগল, যুবাকে বাঁচাবার নিমিত্ত যুবতী মনে মনে কুতুবের প্রস্তাবে সম্মত হতে আধা-আধির অধিক রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব অন্তরে উদয় হলে আতঙ্কে আর স্রণায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠতে।

একদিন ঘটনাক্রমে রাজা লীলার মন্দিরে হঠাৎ উপস্থিত হোলেন। 'ঐ গৃহে স্নানের জল পরমের নিমিত্ত একটি দুর্জয় তামার কটাহ ছিল। \* রাজা যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, লীলা শশবাস্ত হোয়ে তাড়াতাড়ি সেই কটাহের কাছ থেকে সোরে এলেন, কুতুব তাই দেখে অতিশয় বিস্ময়গ্ন হোলেন, তাঁর প্রবেশের সময় সুন্দরী চাকিনী দিয়ে ডেকের মুখটি বন্ধ কোচ্ছিলেন, ঐ চাকিনীটি অতিরহৎ, দুর্জয় স্থূল, ইঞ্জি-ক্সের দ্বারা চাপা থাকত। লীলা রাজাকে দেখে স্পষ্ট অপ্রস্তুতের ভায় তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যস্থলে আপনার স্থানে বোসতে যাচ্ছিলেন। যুবতীর এই বিসদৃশ অনিয়ম ব্যবহার যেন চক্ষে দেখেন নি, কি দেখেও যেন সে দিকে মনোযোগ করেন নি, কুতুব এইরূপ ভাণ কোরে যুবতীর পাশে গিয়ে বোসলেন, আর নানা বিষয়ের কথা-বার্তা কোয়ে তাঁরে অন্তমনস্ক কোলেন। বিলাস-গৃহের পার্শ্বে একটি উজান থাকবার নিয়ম আছে, রাজা বোলেন, "সুন্দরি! চলো, একবার ঐ বাগানে গিয়ে বেড়াই।" লীলা বোলেন, "চলুন

মহারাজ!" তাঁরা দুজনে ঘরের বার হোলেন, কুতুব বা চক্ষে দেখেছেন, তাতে তাঁর মনে অতিশয় সংশয় আর ক্রোধ জন্মে, সে ভাবটি কিন্তু অতি কষ্টে চপে রেখেছিলেন, নৃপতি মনে কোলেন, আর কিছু নয়, দুর্ভ লীলার অবশ্যই গুপ্ত নাগর আছে, তাকেই ঐ ডেকের মধ্যে ঢেকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সেই পাপিষ্ঠ অপরাধীকে, সে যেই হোক, সমুচিত শাস্তি দেবার নিমিত্ত গোলকন্দ-নাথ মনে মনে মন্ত্রণা কোরে একটা ঘোর কালান্তক নির্ভূর দণ্ড অবধারিত কোলেন। তার পর লহমা কয়েকের নিমিত্ত লীলাকে একাকিনী রেখে বাহিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোলেন, "কেমন রে, মালেক কয়েদখানার বেশ হেঁপাজাতে আছে ত?" "আজ্ঞা, খুব হেঁপাজাতেই আছে," জেলদারোগা এই উত্তর কোলে। তার পর কয়েকটি আবশ্যক আবশ্যক হুকুম জারি কোরে সরদার খোজাকে ডেকে বোলেন, "এক ঘটায় মধ্যে পারসী বন্দীর মাথা কেটে অন্তরে পাঠায়ে দাও, আমি সেইখানেই উপস্থিত থাকবো।"

সরদার খোজা "যে আজ্ঞা বোলে" শির নত কোরে স্বামীর আদেশ পালন কোন্ডে চোলে গেল, কুতুবরাজ ভিতরে গিয়ে লীলার পাশে বোসলেন, যুবতীকে একলা ফেলে গেয়েছিলেন বোলে বিস্তর কাতর হয়ে ক্ষমা চাইলেন, বোলেন, "আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই একবার বাহিরে গেয়েছিলাম, তার জন্তে কিছু মনে করো না সুন্দরি।" এক ঘটী, কি কিছু অধিককাল এদিক সেদিক বেড়িয়ে রাজা তাঁর প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে বোলেন, "তবে চলো, এখন ঘরে গিয়ে বসা থাক।" ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে কুতুব বোলেন, "রমণীরয়! তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি আজ ঔদাস্য কোরে স্নান করো নাই, মনে কোলেন, তবে বৃষ্টি, চাকরানীদের অমনোযোগেই তোমার স্নান হয় নি, তাই তোমার সঙ্গে বাগানে প্রবেশ কোরেই হুকুম দিয়েছি, শীঘ্র জল গরম হয়ে যেন প্রস্তুত থাকে, বেড়িয়ে চেড়িয়ে এসে স্নান কোলে শরীর-মন বেশ সুস্থ হয়, এখন এসো, জল গরম হয়েছে কি না দেখি গে!"

\* বিলাস-গৃহে নিত্য স্নানের প্রথা ছিল, সেটি অখণ্ডিত নিয়ম। ঐ গৃহের দুর্জয় বৃন্দাকারের তাম্র-ডেকগুলি এমন কৌশলে প্রস্তুত হইত যে, নল দ্বারা অলস্রোত চালিত হইয়া ভাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, নিরন্তরের একটি ঘরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঐ জল উত্তপ্ত করা হইত, সুতরাং জল গরম করিবার নিমিত্ত চাকরকে বিলাস-মন্দিরে প্রবেশ করিবার আবশ্যক হইত না।



ঐ কথা শুনে লীলা ঠক ঠক কোরে কাঁপতে কাঁপতে মুচ্ছিতা হয়ে ঘরের মেজের উপর পোড়ে গেলেন, রাজা যেন তাঁর দিকে চেয়ে দেখেন নি, এইরূপ কাচ কেচে, কে তাঁর ক্রোধের ভাজন হলো, তাই স্থির জানবার ক্ষমতা মহা হৃষ্টচিত্ত হয়ে ডেকের ঢাকনী তুলে ফেলেন। কার এমন কলমের তেজ যে, এ সময় কুতূবের হৃৎকম্প বর্ণনা করে। তিনি ডালা তুলে দেখেন যে, তাঁর প্রাণটি ক প্রিয়পুত্র ওর-মাজের নবীন দেহ শব হয়ে ডেকের মধ্যে অবস্থিতি করেছে !!!

আবার ঠিক সেই সময়েই দুজন খোজা উর্জখাসে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বোলে, “মালেক পারসী পালিয়ে প্রস্থান করেছে।” লীলা শুনে হাততালি দিয়ে উঠলেন, ভাবলেন, জগদীশ্বরের রূপায় একটি ত দুর্জনের গ্রাস থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা কোলো। খোজারা যা বোলে, কতুব কি তা শুনে পেয়েছিলেন? সে সময় সম্মুখস্থিত সেই ভয়ঙ্কর ঘোর শোক-মূর্তির উপর তাঁর মন আর চক্ষু অবনত হয়েছিল, রাজার তখন বাহুজ্ঞান শূন্য, সেটি কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর আদেশের প্রত্যক্ষ ফল। খোজা দুজন এগিয়ে বিকট ভয়ের স্বরে “ওরমাজ! ওরমাজ!” কোরে চৈচিয়ে উঠল, তারা সেই ঘোর বিকটাকার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন কোরে, আতঙ্কে গোটো-গোটে হয়ে ধরু ধরু কাঁপতে লাগল। পুত্রের নাম রাজাজ বর্ণে প্রবেশ করার মোহপ্রাপ্ত অবস্থা গিয়ে তাঁর চৈতন্য হলো, তখন তিনি শ্রাবণ-ধারার স্থায় অশ্রুপাত কোন্ডে কোন্ডে, ফুলে ফুলে, ডুকরে ডুকরে কঁদতে লাগলেন। মাথা থেকে টুপিটা টেনে ফেলে দিয়ে, পুত্রের মৃত শরীরের উপর কাঁপ দিয়ে পোড়লেন, আর “ওরমাজ ওরমাজ” কোরে চৈচিয়ে ডাকতে লাগলেন। এখন কালগি ক্রোধের পরিবর্তে শোক-সিদ্ধির তরঙ্গ উথলিয়ে উঠল। লীলার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, লীলা সেই হৃদয়গ্রাস ঘোররূপ ভয়ঙ্কর অভিনয় দর্শন কোরে অবশ্যিক হয়েছেন। যুবতী মেজের উপর হাঁটু অবনত কোরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আছেন, ব্যাকুল হয়ে অবসর

প্রতীক্ষা কোচ্ছেন, যে গতিকে রাজপুত্রের এই অকালমৃত্যু উপস্থিত, অবসর পেলেই যুবতী তৎক্ষণাত রাজাকে অবগত করাবেন, এই তাঁর অভিপ্রায়।

লীলাকে কথা কবার উপক্রম দে কুতুব ভয়ঙ্কর বিকট মুখ কোরে চীৎকারশব্দে বোলে, “চুপ! চুপ! তুই দেবনারী-বেশধারিণী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী!” পুত্রের-মৃতশরীরের দিকে অঙ্গুলী হেলিয়ে “ঐ দেখ, পিশাচিনী! ঐ দেখ, এ তোরই কর্ম! তোরই শোধ এই নে, এই নে।” এই কথা বলতে বলতে যুবতীর স্রুমাঝরু হৃদয়ে উপরোপরি ছবার ছোয়া বসিয়ে দিলেন, তার পরেই ঘরে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, গিরি-সুন্দরীর রুধির-প্লাবিত কোমল অঙ্গের দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না।

খোজারা রক্তের স্রোত অবরোধ করবার নিমিত্ত নিরর্থক পরিশ্রম কোন্ডে লাগল, হত-ভাগিনীর মর্মস্থল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রহারে ছিন্ন হয়ে গেছে, সে রুধির-তরঙ্গ অপ্রবাহিত হবার নয়। লীলার অন্তিমকাল উপস্থিত, মৃত্যুর চরম-কালে প্রাণবায়ু বেরূপ বকের মধ্যে ধুক ধুক কোরে নড়ে, সেইরূপ লীলার মহাপ্রাণী তখনও পর্যন্ত বকের মধ্যে এক একবার নড়ে নড়ে উঠছিল। এদিকে লোকজনেরা এগো রে, আর রে, দেখ রে, ধরু রে, এই প্রকার চীৎকার কোরে অন্তঃপুরের মধ্যে মহা কোলাহল কোন্ডে লাগল, তাদের চেঁচাচেঁচি হাঁকাহাঁকির গণ্ডগোলে রাজভবনে চলন্তল ব্যাপারের মহা তুফান উঠল। এই নিষ্ঠুর রক্তাভিনয় দর্শন কোরে কি নির্দয় পাষাণ, কি সাংসারিক মায়ামুগ্ধ উদাসীন, সকলেরই চক্ষে অশ্রুপাত হতে লাগল, নিরপরাধিনী লীলাকে বাঁচাবার নিমিত্ত সকলেই অশেষমতে যত্ন পেতে লাগল। কিম্ব তাঁর সে কালের যা, সে কাল রক্তস্রোত আর বন্ধ হলো না! হায়! যুবতীর চক্ষু দুটি ক্রমে বুজে এলো, গুঠ দুটি কঁপে কঁপে অশ্রু বিড়-বিড় শব্দে কি বোলতে লাগল, কেউ ত বুঝতে পারেন না, সে অক্ষুটধ্বনি কারও ক্রটি-গোচর হলো না, তার পর একটি গভীর অস্তি-দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ কোরে সরলা চাকরাল

গোয়ার-মারা বিসর্জন কোলেন। তাঁর সে জীব-  
নের না কোন ফলই হলো, না কোন সুখই  
ছিল।

পূর্বগত নির্দাণ বিবাদ-ঘটনাগুলি যেক্রমে  
নার যে জন্তে ঘটেছে, এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত-  
গুলি বর্ণপাত কোন্ডে প্রবৃত্ত হলেম।

যে দিন এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অভিনয় হয়,  
লীলা উদাসমনে বোসে কত চিন্তা কোঁচ্ছিলেন,  
'হায়! উপায় কি? দুর্ভাগ্য মালেককে কি  
কোরে বাঁচাবো? কি গতিকে তার প্রাণরক্ষা  
বে? উদ্ধারের কোন পথ দেখিনে, সময় ত  
প্রান্তের স্তায় চোলেছে, রাজার সঙ্গে যে কথা  
য়ে, তিনি যে প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ আছেন, তার  
সম্মতি ত শেষ হয়ে এসেছে, আজও উদ্ধারের  
কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তার কোন সুচ-  
াই নাই—' এমন সময় একজন খোজা চোরের  
ত চুপে চুপে এসে বোলে, "বেগম সাহেব!  
রাজকুমার অতি কাতর হয়ে বোলেন, যদি অমু-  
তি হয়, তবে একবার এসে সাক্ষাৎ করেন।"  
খোজা রাজা ভিন্ন তাঁর ঘরে অপর কেউ প্রবেশ  
কালে বে বিপদ ঘোটবে, লীলা তা জান-  
তন; তাই যুবতী খোজাকে ইশারায় বারণ  
করে বোলেন, "তুই এখান থেকে চোলে যা।"  
খোজা বোলে, "রাজপুত্র সেই গিরিবাসী  
যাগীর কি সংবাদ বোলবেন, আপনি কি তা  
জ্ঞতে বাসনা করেন না?" বোগীর নাম শুনে  
মন্দিরকুলিকের স্তায় লীলার নেত্রকোণ থেকে  
দাঙ্কাদের ছটা নির্গত হতে লাগল, আশার  
সংসাহে তাঁর নির্মল নিঃসন্দিগ্ধ অকপট চিত্ত  
তা কোন্ডে লাগল, যুবতী খোজাকে বোলেন,  
আজ্ঞা, তবে রাজকুমার আসতে পারেন।" ঐ  
বহুমতি পেয়ে সে যে আজ্ঞা বোলে প্রস্থান  
কালে। লীলার ভুবনমোহিনী মূর্তি, তাঁর  
হৃদবিজয়ী ভঙ্গী ওরমাজ পূর্বে একবার অব-  
লাকন কোরেছেন। রাজপুত্র বেশ বুকেছিপেন  
য, যুবতী সহজে তাঁকে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ  
কান্তে দিবেন না, তাই তাঁকে বকমা করবার  
নিসে এই কপট ছলনা কোলেন যে, তিনি আর্ধ্য  
যাগিবরের সংবাদবাহক হোরে এসেছেন।  
বরাজ যুবতীকে বকমা কোন্ডে গিয়ে শেষে

আপনিই প্রাণে বঞ্চিত হোলেন। রাজকুমার  
লীলার পালকের উপর কেবলমাত্র বসেছেন,  
কি বসতে পেরেছেন কি না সন্দেহ, এমন সময়  
রাজা আসছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল।  
লীলা ভয়ে চকিত হয়ে ডেকে দেখিয়ে দিয়ে  
বোলেন, "রাজপুত্র! ঐ কেবল একমাত্র পালা-  
বার স্থান আছে।" তখন কিন্তু ডেকের আধা-  
আধি জলে পূর্ণ ছিল; কুমার পিতৃ-কোণের ভয়ে  
সে বিবেচনা না কোরে, তাড়াতাড়ি তার মধ্যে  
প্রবেশ কোলেন, লীলা অমনি শশবাক্ত হয়ে  
চাকনীটা ফেলে দিয়ে ডেকের মুখটি বন্ধ কোরে  
ছিলেন, চাকনীটা স্পিণ্ডের মুখে পড়ে তার কোরে  
এঁটে বসে গেল, রাজপুত্রকে যেন কারাগারে  
পূরে চাবী দিয়ে রাখা হলো, অদৃষ্ট শেষে ফতয়া  
দিলে, আর পরিত্রাণ নাই, সেইখানেই তাঁর  
চিরকবর হবে। সরলস্বভাবা লীলা চাতুরী কি  
শঠতা-বিজ্ঞায় দীক্ষিত ছিলেন না, তিনি শীঘ্র শীঘ্র  
ডেকের মুখ বন্ধ কোরে, চটপটে হয়ে আপ-  
নার স্থানে গিয়ে যে বোসবেন, তা পালেন না,  
সে চাতুরী তিনি জানতেন না। চালাকী কোরে  
ডেকে নেওয়া ত অনেক দূরের কথা, বং  
রাজাকে দেখে যুবতী ভয়ে হতভম্ব হয়ে  
দাঁড়িয়ে রইলেন, তাতেই তাঁর মনের ভাব  
আরও প্রকাশ হয়ে পোড়ল, রাজার মনে  
ভারি সন্দেহ জন্মিল, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্বেই  
বলা হয়েছে।

কৃত্যব পুত্রের অকাল মৃত্যু-শোকে আত্ম  
হয়ে রোদিন কোচ্ছেন, এমন সময় খবর হলো  
যে, শাজাহান বাদশাহের উকীল, যার অনেক  
দিন থেকে আসবার কথা ছিল, এসে পৌঁছেছেন,  
ডেকান হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, সঙ্গে বিস্তর সৈন্ত,  
সহর থেকে এক ক্রোশ দূরে একটি বাগানের  
কাছে ছাউনি কোরে আছেন, সেইখানে আপ-  
নার গমনের প্রতীক্ষা কোচ্ছেন। গোলকন্দ-  
রাজের বাসনা যে, কার্যান্তরে ব্যস্ত থেকে  
খিলাস-গৃহের শোকাবহ দুর্ঘটনাটি বিস্মৃত হন,  
তাই ঐ সংবাদ পেয়ে লোকজনকে তৎক্ষণাৎ  
প্রস্তুত হোতে হুকুম দিলেন। কৃত্যব খুব ধূম-  
ধামের সহিত রাজ-উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ  
কোন্ডে পারেন, সেইরূপ আড়ম্বর হতে লাগল।

লোক-জনেরা সারি সারি কাতার দিয়ে মহা-সমারোহ কোরে চলেছে, খোদ কুতুব তাঁর হাতীর উপর সোয়ার হয়েছেন। কানো দিকে ডকা পিটছে, কোন দিকে ভেরী বাজছে, এক দিকে নিশান উড়ছে, নকীব ফুকারতে ফুকারতে আগে আগে চোলেছে, কেল্লার ভিতর থেকে তোপের উপর তোপধ্বনি হতে লাগল। লোকজনের কোলাহলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, কলরবের বন্ধারে কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। এত ধুমধামের মধ্যেও কুতুবের অন্তঃকরণের ভিতর একটি শব্দ হোচ্ছিল, সে একটি অতি অল্প অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তার অতিশয় পরাক্রম, বাইরে যে, রৈ রৈ, হৈ হৈ শব্দে কোলাহলের মহাতরঙ্গ উঠছিল, তাতে কিন্তু সে সামান্য ক্ষুদ্র স্বরটিকে ঢাকতে পারেনি, কুতুব সে স্বরটি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। ঐ শব্দটি নির্ভর নরহস্তা খুনে বোলে কুতুবকে বিকট তিরস্কার কোচ্ছিল, আর সেই কথা প্রতিপন্ন কব্বার নিমিত্ত তাঁর স্নেহের আধার, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের শব এবং নিরীহ নিরপরাধিনী লীলার মৃতদেহ তাঁর চক্ষের উপর ধোরে দিচ্ছিল। এক্ষণে কুতুবের ততত ঐশ্বর্য-অহঙ্কারের আড়ম্বর, তত অতুল বৈভবের সমারোহ, তথাচ সেই সকল শোভা, গৌরব-গরিমার শত মধ্যস্থলে যোগীর সেই অপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটি হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো, কে যেন তাঁকে ডেকে সে কথাগুলি শ্রবণ কোরে দিলে— কুতুবের অসি নর-রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে,— এই কথা শ্রবণ হয়ে গোলকন্দপতি মনে মনে বলে উঠলেন, “যোগী যে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলেন, সে কথা খাটলো কই, তাঁর ভবিষ্যদ্বাক্য শু সকল হলো না, এখন সে বিপদ কোথায়? বরং তিনি যে কথা বোলেছিলেন, তার উল্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, শাজাহানের প্রতিনিধিকে সমসাদরে আব্বান কোত্তে চোলেছি, সেই সম্রাট শাজাহান স্বয়ং কি আমাকে রাজ্যেশ্বর বোলে স্বীকার কোচ্ছেন না? তবে যোগীর প্রদর্শিত ভয়ের কোন অর্থ নাই, সেটি নিরর্থক বৃথা ভয়। রাজারা কখন

ভয় করেন না, ভয় কোত্তে ভীক কাপুরুষেরাই করে।”

রাজ-প্রতিনিধির ছাউনির নিকট সেই বাগানে পৌঁছে কুতুব হাতী থেকে নামলেন, প্রতিনিধিকে আগবাড়ার জন্যে অগ্রসর হবার উদ্যোগ কোচ্ছেন, এমন সময় একজন অমাত্য রাজার কানে ফিস্ ফিস্ কোরে বোলে, “তোমার আসন্ন বিপদ, জীবন লয়ে পলাও, ঘোর বিপদ, এ ব্যক্তি প্রতিনিধি নয়, খোদ আরঙ্গজেব, এই বেলা সোরে পড়ো, নতুবা জয়ের মত যাবে।” কুতুব ঐ কথা শুনে তদন্তে সোয়ার হয়ে মক্কাবন্দি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দৌলাতাবাদের কেল্লার দিকে চোলে গেলেন। এ দিকে আরঙ্গজেবকে নিষ্কণ্টক কোরে রেখে গেলেন, তিনি তাঁর সহর লুটে, রাজপুরী লুটে ছারখার কোত্তে লাগলেন। সম্রাট-তনয় লুটতরাজ কোরে সহর উদ্বাস কোলেন। উজাড় আর উচ্ছিন্নের তরঙ্গ সহরময় যেন নৃত্য কোরে ফিতে লাগল, এমুড় সেমুড় পর্যন্ত উচ্ছেদ আর ধ্বংসের একটানা সমান স্রোত চোলে গেল। সেই দিনাবধি বাগনগরের অশ্রদ্ধারণীয় পতনের দিন বোলে তারিখবন্দী হলো। আরঙ্গজেব যে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হবেন, কেউ কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেনি, তিনি বিনা আত্মায়ে সকলের অজান্তসারে অকস্মাৎ বাগনগরে কেন আগমন কোলেন? সে কথা আমরা পরে বোলুছি। তন্নিম্ন মন্তব্যচক্রের চাতরে পোড়ে গোলকন্দ-রাজ কেন শত্রুহস্তে প্রায় ধরা পোড়েছিলেন, সে বৃত্তান্তও বিশেষ কোরে ব্যক্ত কোরবো।

পলাতক রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে উর্দ্ধ্বাসে দৌড়িতে লাগলেন, কতক দূর গিয়ে অশ্বটি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পোড়ল, আর সে চোলতে পারে না, তবু তিনি না-ছোড় হয়ে মরিমরি করে চালাতে লাগলেন। শেষে যখন দেখলেন, আর তার চলবার ক্ষমতা নাই, দম্ ফেটে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, হস্তপদ অবশপ্রায় হয়ে এসেছে, তখন তারে ছেড়ে দিয়ে নীচে নামলেন। এখন সন্ধ্যা হয়েছে, রাশি রাশি কৃষ্ণাঙ্গারা মণ্ডলাকার হয়ে তাঁর চারিদিকে স্তূপাকার হতে লাগল, কুতুব অরু

কথটি পরিত্যাগ কোরে পদব্রজে চোলেন, বোলতে চোলতে একটি পর্বত-গুহার নিকট উপস্থিত হোলেন, গুহাটি দুটি উচ্চ উচ্চ নিরেট পুন পর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত, একটি মাত্র লোক চোলতে পারে, এমনি একটি ক্ষুদ্র অপ্র-শস্ত পথ সেখানে আছে পায়ের চিহ্নে বোধ হল, কেউ এইমাত্র সেই পথ দিয়ে চোলে গেছে, কুতুবরাজ ঐ পথ বেয়ে ভাড়াভাড়ি চোলেছেন, যেতে যেতে দেখলেন, সেই গিরি-যোগীর ক্ষীণ কৃশমূর্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। রাজা মনে জানছেন, নিজের ঘোর অপরাধী, তার উপর আবার রাজ্য-ব্রষ্ট হয়েছেন, উদাসীনের মুখের দিকে চাইতে তাঁর সাহস হলো না। যোগী কিন্তু তাঁর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তাঁর পাপাত্তঃকরণের ঘোর হুশিস্তা সকল অধ্যয়ন কোচ্ছিলেন, রাজার কিন্তু এমন ভরসা হলো না যে, যোগীর অন্তর্ভেদক চক্ষু দুটির দিকে একবার চেয়ে দেখেন। একজন খাউড়ে দৌলতাবাদে গাচ্ছিল, বাগনগরে যে যে কাণ্ড ঘটছে, তার মুখে যোগী সব শুনেছেন। তাপসবর পূর্বে কেবল কর্ণে শুনেছিলেন, তাঁর লীলা নাই, এক্ষণে চক্ষে দেখলেন, তাঁকে যে হত্যা কোরেছে, সে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। যোগী এখন ভাবতে লাগলেন, রাজার সহিত কিরূপ ব্যবহার কোরবেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরবেন, না সে ছুরাছুরাকে পথের মধ্যে দাঁড় কোরিয়ে রাখবেন। যদি দাঁড় করিয়ে রাখেন, শত্রুদল পোড়ে তাঁকে ধোর লয়ে যাবে, তারা তাঁকে ধরবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাড়া করে আসছিল। শেষে কথা কওয়াই স্থির কোরে অতি যত্ন-মন্দ গভীর-স্বরে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ কোরে যোগী রাজাকে বোলেন, “রে পাষণ্ড নরাধম পামর! তোর অসি নররক্তে কলঙ্কিত হয়েছে। হাঁ! হয়েছে সত্য, আমি তা জান্তে পেরেছি। রে পাপিষ্ঠ ছুরাছুরা, সে রক্ত পর্বতের শ্রোত অপেক্ষাও অতি পবিত্র, অতি নির্মল। আমি, কে দাঁড়িয়ে, চিমেছিস? তুই আমাকে চিনতে পারিসনে? মরকবুকে মনে পড়ে? তারই পিতা তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর যে অবলাকে তুই নির্ভর-প্রাণে নির্দয় হত্যা কোরেছিল, সে মর-

করের কত্ম। রে কুধিরপিশাচ! এখন ত শুনে সম্ভষ্ট হোলি! এতেও যদি তোর শোণিত-তৃষ্ণার তৃপ্তি না হয়ে থাকে, এই দেখ, এই প্রাচীন জরা-জীর্ণ শুক বুক তোকে পেতে দিচ্ছি, তুই ছুরী মেরে মর্দভেদ কর। কই! তোর ছোরা কোথায়? বার কর! তাতে এখনও লীলার রক্তের বাষ্প উদ্ভাবিত হোচ্ছ, বুকে বসিয়ে দে, ভেদ কোরে বিদার কর। যে ক্ষণে তুই তারে লম্পট-চোক্ষে দেখলি, তার পূর্বে সে এই অন্তরমধ্যে স্নেহে পালিত হোচ্ছিল। আর, আমি তোরে ডাকছি, আমার এই মর্দ-পীড়িত ব্যাধিত হৃদয়ে তুই ছুরী মার! কি! তোর কি সাহস হচ্ছে না? তুই কি এখন কাপুরুষ হয়ে পোড়েছিস?” ঐ কথা বোলতে বোলতে বুদ্ধ উদাসীনের আকৃষিত দৌল গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল শ্রোতের ত্রায় গোড়িয়ে পোড়তে লাগল। “লীলা! আঃ লীলা! তুমি নির্দয় হত্যা হয়েছে, পাষণ্ড নাকি তোমায় খুন কোরেছে! এ কথা কি বিশ্বাস হয়? কার এমন নির্দয় কঠিন প্রাণ যে, সুকোষল কুসুম-দলের ত্রায় তোমার ললিত অঙ্গে অস্ত্রপ্রহার কোরে? রে পাপিষ্ঠ নরাধম! এখনও বল, সত্যই কি লীলা প্রাণত্যাগ কোরেছে? সেই দুটি মধুর সহাস্ত প্রক্লিত মেত্র মুদিত হয়ে কি নির্জীব হয়েছে? না, আমি যা শুনেছি, সকলি মিথ্যা? না আনি স্বপ্নে শুনলেম? কি হয়েছে বল।” এই কথা বোলে যোগী সক্রোধে সেই ছুরাচারের হাত বোলেন, আর বোলেন, “তুই এই কথাটি বল যে, ‘সে বেঁচে আছে, তোমার অন্ধের ধন, সেই কমলময়ী লীলা মরে নি,’ তা হোলে এ বুদ্ধের আশীর্বাদের পাত্র হাবি।”

কুতুব নিশ্চুঞ্চ, স্তম্ভিতের ত্রায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ছোরাখানি কাঁচ শেষ কোরেছে, সেটা তিনি মনে জানতে পেরে-ছিলেন।

যোগী-কুতুবের ভাব-গতিক দেখে চীৎকার করে উঠলেন, বোলেন, “তবে সত্য সত্যই আমার অদৃষ্টে আগুন লেগেছে, যা শুনেছি, সকলিই সত্য। রে দুর্জন! তোর পুত্রকেও যমালয়ে পাঠিয়েছিস, তাকেও মেরে ফেলেছিস,

তাকে ভুই বাঁচাতে পাল্লিনি? মালেক, সেই পারদী মহাপুরুষ, সেও কি তোর কাল-কোপে পোড়ে প্রাণত্যাগ করেছে? উঃ! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!!”

কুতুব বোলেন, “পথ ছেড়ে দাও, আমি বাই, রাত্রি হয়ে এলো।” যোগী বোলেন, “কি! রাত্রি! কুতুব কি রাতকে ভয় করে? হায়! তবে কতই কালরূপা অনন্ত যোর রজনী তোর মুখ অপেক্ষা কোরে আছে। ওরে পাষণ্ড, দেখ, তোর রাজ্য গেছে, এখন তাই অরণ কোরে হায় হায় কর, তোর মনে সুখও নেই, ইহকালের মর্তন সে সুখধ্বংস হয়েছে, এখন বোসে বোসে সেই খেদ কর। জগদীশ্বর যাবৎ তোর জ্ঞান হরণ না করেন, এখনও কিন্তু তুই সজ্ঞানে আছিস, এখনও তোরে বোলছি, তুই সেই পরাংপর পরমশুভর কাছে কমা প্রার্থনা কর।”

“রে অভাজন পথিক! তুই চলে যা, তোর মহাশ্বে নমস্কার, শত্রু-হাত থেকে পালিয়ে বাঁচ, কিন্তু তুই তোর নিজের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবি না। রাজ্যের ভয় করিস না, রাত্রি যদি মহাধোর, মহা অন্ধকারও হয়, তথাচ সে তোর মত নিষ্ঠুর কাল-মৃত্যুর জন্ম দিতে কখনই পারবে না, তুই তবে প্রাতঃকালের ভয় করিস, তবে এখন এখান থেকে দূর হ।” পথটি এত অপ্রশস্ত যে, কুতুবরাজ পাশ কাটিয়ে চোলে যেতে, যোগীর গায় গাঠে কাঠেকি হল, যোগী অমনি মনে মনে ধৈর্যে উঠলেন।

কুতুবের প্রাহুর্ভাব অক্ষুর থাকলে, জেমলার অদৃষ্টে বা ঘটতো, তা তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাই আমীর আরজজেবকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র পেয়ে রাজপুত্র বাগনগরে আগমন করেন। সে পত্রে বা লেখা ছিল, সাদক! তুমি তা শুনিইছো। আরজজেবের কুতুবকে কায়দা কোত্তে পালেন না বটে, কিন্তু তিনি তাঁর নগর আর রাজপুরী দৃষ্ট কোলেন। এখান থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ কোরে, দৌলতাবাদ অবরোধ কোরবেন মনন কোরে, সেই অভিযুখে চোলেন। কুতুব এখন সেইখানেই আজর লয়েছেন। আমার বন্ধু বধন ঐ যোর

শোকাবহ বিষাদপূর্ণ উপাখ্যানটি এই পর্যন্ত বোলে শেষ কোলেন, সেই সময় আমার উপর রাজ-হুকুম হল যে, আমার লঙ্করের মধ্যে গিয়ে সমাবেশ হই। শাহজাহান বাদশাহ আরজজেবকে নিবেদন কোরে পাঠায়েছেন, তিনি যেন কুতুবের উপর আর উৎপাত না করেন, অবশ্য অবশ্য আপনায় রাজ্যে কিরে যান। আমার বন্ধুকে বিস্তর স্তুতি-মিনতি কোরে বোলেন, তিনি যেন এই মর্যাদাসিক কল্পপালনক চূর্ণটনার শেষ কথাগুলি আমাকে অবগত করান, সেই কথির-পিশাচ কুতুবের পরিণামে কিরূপ ফল হল, মালেকের অদৃষ্টেই বা কি পরিণাম লেখা ছিল, সেই সকল বৃত্তান্ত অবগত হবার জন্যে ভারি ব্যগ্র হয়েছিলেম, বন্ধু আমার কথার স্বীকৃত হয়ে বোলেন, “আচ্ছা, তোমার বাসনা নিষ্ফল হবে না।” ঐ কথা তাঁর মুখে শুনে বিদায় হয়ে প্রস্থান কোলেন।

অতি অল্প দিন পরেই বন্ধু নিজের কাহিনীটি লিখে পাঠালেন। “আরজজেব চোলে এলে, কুতুব নিকটক হলেন, তিনি এখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। দৌলতাবাদের কেল্লা পরিত্যাগ কোরে তাঁর বাগনগর সহরে উপস্থিত হোলেন। পূর্বে কমলার কুপাদৃষ্টি থাকায় ঐ সহর ভারি জমকাল, ভারি বোলবোলাও ছিল, বাগনগরপতি সম্ভ্রান্তি এসে দেখেন, সহর উদাস হয়ে গেছে, পূর্বের মত গুম্বাম কি জাঁক-জমক কিছুই নেই। সে শ্রী নেই, সে আকার নেই, সে গোলজার নেই তত্ত্বির সকলি গোলমাল, সকলি বিশৃঙ্খল, শ্রীজষ্টের তাবৎ লক্ষণ বিরাজমান দেখলেন। রাজ-অমাত্যেরা তাঁর সম্মান সমাদর কোলেন না, তাঁদের মধ্যে একে একে সকলেরি চেষ্টা যে, স্বয়ং রাজত্ব করেন, তাতেই প্রজারা কেউ কারও পক্ষ হওয়ার, বার্ষ বিরোধ হয়ে পরস্পর মহা বিবাদ চোলেছে। বারী অতি সামান্ত অন্ত্যাজ চাকর ছিল, তারাত্ত পর্যন্ত কুতুবকে ভুজতাজিয়া কোরে, অপমানের কথা কইতে লাগল। এই সকল কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে, মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হোয়ে, রাজ্যের প্রতি কুতুবের ভারি বিতৃষ্ণা—ভারি দৃষ্ণা জন্মিল, শেষে বিশিরাপুরের রাজাকে অনেক সাধ্যসাধনা

কাজে লাগলেন যে, গোলকন্দারাজ্য তাঁর প্রজার অন্তর্গত করেন। গোলকন্দারাজ্য অবশেষে দিল্লীর করাবীন হয়।

বিলাস-মন্দিরের সেই ভয়ঙ্কর বিকট অভিনয় ঘনেন হয়ে, কুতুব দিন দিন শুক হোতে লাগলেন, অস্থিচর্খ শীর্ণ হয়ে মৃতের স্থায় হয়ে পোড়লেন। পূর্বে যে যে দুর্কর্ম কোরেছেন, এক্ষণে সেইগুলি মনে উদয় হয়ে পরকালের ভয়ে কম্পিত হোতে লাগলেন, তাঁর সেই পাপাত্মা পামর স্বভাব শত্রুনি হয়ে তাঁর অন্তর খুঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগল, দুর্ভাবনার দুর্ভাবনার দ্বিগুণ ব্যতিক্রম হয়ে পোড়লো, ইদানীং বালকের স্থায় চরিত্র হল, কাজে, কথায় অতিশয় বালকতা প্রকাশ পেতে লাগল, শেষে সে বাল্যাব গিরে ক্রমে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, ঐ উন্মাদ অবস্থায় তাঁর প্রাপত্যাগ হলো। সরকারি বাজারের মধ্যে কুতুবের কাল হয়, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে হুঃখিত হয়ে কেউ একবার আহা উহ কোরেও খেদ প্রকাশ করে নি। তাঁর মৃত দেহ পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল, কেউ সে দিকে কিরেও দেখলে না শেষে বাজারের মেথরেরা ঐ শব ঘাড়ে কোরে সহরের বাহিরে একটা ভাগাড়ে এনে ফেলে দিলে। শ্যাল আর কুকুরে তার এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। এইরূপে কুতুবের নীচ নিকৃষ্ট অধম দেহটি সমুদয় খেয়ে শেষ কোরে দিলে, দেহটি কেবল নীচ অপকৃষ্ট গন্ধর উদর-ভৃগুর জন্তেই সমস্তে পালিত হয়েছিল। হায় ! কি ভয়ানক স্থগিত পরিণাম !!

কুতুবের দরবারে একটি লোক জেমলার পরম বন্ধু ছিল, তিনি আমখাসের দাবীর, অর্থাৎ আমখাসের দরবারে চিঠিপত্র পড়বার ভার তাঁর উপর ছিল। কুতুবের পতনের নিষিদ্ধ আমীর জেমলা যখন আরম্ভজবের সঙ্গে পত্র চালাচালি করেন, সেই সময় গোলকন্দার রাজদরবারে সেই একমাত্র নিজের সহায়তা আমীরকে অবলম্বন কোন্ডে হয়েছিল। দাবীরের উপর কুতুবের ভারি বিশ্বাস ছিল, তাই বাদশাহ এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ করেন যে, মালেক আমীর জেমলার সহোদর। দাবীর সেই কথা

শুনে প্রতিজ্ঞা কোলেন, কোন গতিকে মালেকের প্রাণ রক্ষা কোব্বেন। এ উপকার কোরে তাঁর অদৃষ্টে কি ঘোটবে, দাবীর সে ভয় কোলেন না, ভাবলেন, জাল-প্রতিনিধির পৌছন-সংবাদ যেমন চারিদিকে প্রচার হয়ে পোড়বে, সেই শুভ অবসরে তিনি বাগনগর পরিত্যাগ কোরে এক দিকে চোলে যাবেন। সেই মর্যাদাসিক শেষ দিবসের যে সময় কুতুব বিলাস-গৃহে প্রবেশ করেন, তার পূর্বে গোলকন্দাধ দাবীরকে লয়ে রাজকার্য্য কোচ্ছিলেন, বিস্তর কাগজ-পত্রে রাজার সহী মোহরের প্রয়োজন ছিল। দাবীর সেই সুযোগে জেলখানার দারোগার উপর একখানা পরোয়ানা লিখে অত্র অত্র কাগজের সঙ্গে গোলেমালে রাজার দস্তখত কোরিয়ে লন, তাতে এই লেখা ছিল, ‘এই পরোয়ানা পাবামাত্র কয়েদী মালেককে মুক্ত করিবা।’ কুতুব তখন ভারি ব্যস্ত, শীঘ্র শীঘ্র হাতের কাজ নিকাশ কোরে তাঁর প্রাপ্যপ্রতিমা লীলাকে দেখতে যাবেন, তাই দাবীর কাগজপত্র স্মৃকে যেমন ধোরে দিতে লাগলেন, তিনি অমনি দস্তখত কোন্ডে লাগলেন, তাতে কি লেখা ছিল, সাপ কি ব্যাড, কুতুব আর তা চোকে দিয়ে দেখেন নি। কাগজপত্র সহী কোরে রাজা যেমন চোলে গেলেন, দাবীর সেই অবকাশে মালেকের রেহায়ের পরোয়ানা দারোগার উপর জারী কোলেন। রাজার সহী মোহর দারোগার বেশ জানা ছিল, পরোয়ানা যেমন পৌছিল, অমনি জেলখানার দরজা খুলে মালেককে বার কোরে দেওয়া হলো। দাবীর তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মালেকের কানে কানে বোলেন, ‘পালাও, পালাও, আর এক তিলও এখানে থেকো না, পালাও।’ মালেক তাতেই বেশ বুঝতে পালেন যে, এ ব্যক্তির কোশলেই তিনি এ ব্যাডা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পালেন।

তার পরক্ষণেই দাবীর নিজে এক বোড়ার উপর সোয়ার হয়ে তাড়াতাড়ি আরম্ভজবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্ডে চোলে গেলেন, রাজপুত্র তখন বাগনগরের নিকটানিকটি এসেছেন,



সে খবর দাবীরকে কেউ চুপে চুপে বোলে যায় ।

সেই বিলাস-বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কুতুব যখন খোজাকে জিজ্ঞাসা কোলেন, 'কেমন রে, মালেক ত জেলখানায় বেশ হেঁপা-জাতে আছে ?' খোজা সায় দিয়ে বোলে, 'আঃ, এই দেখে আস্চি, সে বেশ হেঁপাজাতে আছে।' সহোদরের সহায়তার এই কল হল যে, মালেক প্রাণ লয়ে পালাতে পারলেন, নচেৎ রুধিরাসক্ত দুহৃদয় গোলকন্দ-রাজের কাল-কোপে পোড়ে তিনি যে এ যাত্রা বেঁচে যাবেন, সেটি অভাবনীয় । মালেককে অবশ্যই রাজার মূর্তিমান ক্রোধাগ্রে আত্মজীবনের বলিদান দিতে হতো ।

হৃর্ভাগ্য মালেক একটু পরেই শুন্লেন তাঁর প্রাণলম্বা প্রিয়তমা লীলার ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়েছে । ঐ নিদারুণ হৃদয়ঘাতী কথা শুনে লোকালয় থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা ঘোর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোলেন, সেখানে মল্লযোদ্ধার গত্যাত প্রায় ছিল না । সেই মল্লয্যাগম্য দুর্গম কাননমধ্যে প্রবেশ ক্রোরে করুণা-পূর্ণ কাতরস্বরে রোদন কোন্তে লাগলেন, শেষে অনাহারে অতি ক্লিষ্ট হয়ে সে স্থান থেকে উঠে বরাবর চোলে যাচ্ছেন, কোথায় কি কোন্ দিকে যাচ্ছেন, সে জ্ঞান নাই, যে দিকে তাঁর হৃদয়ভেদী শোকাহতপ্ত অন্তঃকরণ লয়ে যাচ্ছে, তিনি সেই দিকে চোলেছেন । যেতে যেতে হঠাৎ একটা মল্লযোদ্ধার মৃতদেহ তাঁর চক্ষে পোড়ে গেল, থম্কে দাঁড়িয়ে সেইটি নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন ;—দেখেন, তাঁর হৃদয়ের হার, প্রিয়তমা লীলার পিতামহ পূজ্য-বর গিরিবোগীর মৃত শরীর পোড়ে আছে ! শব-টির কবর দেবার নিমিত্ত একটি গোর খুঁড়লেন,

সেই সময় তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রুবারি স্রোতের তায় প্রবাহিত হোতে লাগল, আর উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কোন্তে কোন্তে বোলতে লাগলেন, 'হা আল্লা ! এই যোগিবরের জীবাত্মা যেন তোমার শাস্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামের স্থান পায়, এইবার বেন তাঁর যাতায়াতের অবসান হয়, এই জন্ম যেন তাঁর শেষ জন্ম হয়, আর বেন তাঁর কঠোর হার লীলার শোকে তাঁকে দক্ষ হোতে হয় না, যোগিরাজ যেন সংসারের তাবৎ দুঃখ থেকে চিরমুক্তি পান' ।

আমার বন্ধু আরো এই সকল কথা লিখে পাঠান, 'হৃর্ভাগ্য মালেক যখন লীলার শোকে অনাথার তায় পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ান, সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু কোথায় হয়, সেটি স্বরণ হোচ্ছে না, ঐ মালেকের মুখেই গিরিবাসি-যোগীর মৃত্যুর কথা শ্রবণ করি । উন্মাদপ্রায় হতবুদ্ধি পারস্য যুবার নিকট বিদায় হয়ে আমি আপনার কার্যে চোলে গেলেম, তার পর যে তিনি কোথায় গেলেন, কি, হোলেন, সে সকল বিষয় আমি কিছুই অবগত নই । বোধ হয়, এক্ষণে মাতৃ-ভূমিই তাঁর আশার লক্ষ্যস্থল, আল্লা তাঁর সহায় হয়ে স্বচ্ছন্দে যেন গৃহে পৌছে দেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা ।' আমি বন্ধুকে শত ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখ্লেম যে, তাঁর উদার কৃপায় মালেকের জীবন-রক্ষার আর গিরিবাসী যোগীর মৃত্যুর সংবাদ অবগত হোলেম, তাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হোলে মহা আনন্দিত হবো—ইত্যাদি লিখে পত্র সমাপ্ত কোলেম ।

গোলকন্দার লুট আমরা হিন্দামত ভাগ কোরে লয়ে আমোদবাদের অবস্থিতি কোন্তে লাগ্লেম ; সেই স্থানে আমীর জেমলা আরঙ্গ-জেবের সঙ্গে মিলিত হবেন ।



# উজীর পুত্র।

## তৃতীয় পর্ভ।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ক চিস্তিলে মন্দ হয়, মন্দের ভাল কখন নয়।”  
সিয়াপুরের অন্তর্গত অনেকগুলি ছাগল-  
শ আছে, তার মধ্যে বেদোরও একটি সেই-  
রূপ দৃঢ়াবদ্ধ হৃদেদ্য দেশ। আরঙ্গজেব বাগ-  
নগরের আশা অভিসন্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ঐ  
বেদোর চড়াও কোল্লেন। এখানে অপরিমিত  
অর্পণ হস্তসাং কোরে আমীর জেমলাকে সঙ্গে  
নয়ে দৌলতাবাদে ফিরে এলেন। উত্তর-  
কালে যাক্তে তাঁদের পরাক্রম বিস্তার হয়,  
দৌলতাবাদে বসে সেই সকল মতলব বার  
করেন, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্সা ফাঁদেন।  
রক্তনে বেশ প্রীতি-প্রণয়েতেও থাকেন। এখনো  
পর্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে কোন দিকে যুদ্ধবিগ্রহ বেধে  
উঠেনি, তাই আমীর জেমলা মনে মনে যুক্তি  
কোলেই যে, এই অবকাশে শাজাহানের সঙ্গে  
ব্যস্তরক্তি কোরে রাখা আবশ্যক। আমীরের  
কোশলে সম্রাট পত্রের উপর পত্র লিখে জেম-  
লাকে তাঁর দরবারে আহ্বান কোস্তে লাগ-  
লেন, আমীর শেষে বিবেচনা কোল্লেন যে, দিল্লীর  
দরবারে একবার তাঁর যাওয়াই শ্রেয়ঃ।  
সম্রাটকে উপহার দিবার নিমিত্ত অতি উজ্জল-  
দর্শন বহুমূল্যের রত্ন বিস্তর সঙ্গে নিলেন।  
আমীরের অভিসন্ধি এই যে, শাজাহানকে  
রক্তর ছারা বশীভূত কোরে, তাঁরে বোলে  
কোয়ে প্রত্নতি দিয়ে বিসিয়াপুরের রাজা,  
গলকন্দের রাজা, আর পর্তুগীস জাতি এই  
তিনের বিরুদ্ধে সমর-বোধনা করিয়ে দেন।

জেমলার সদৃশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির শরীর-রক্ষার  
নিমিত্ত বিস্তর লোক যে সঙ্গে যাবে, সেটা বড়  
বিচিত্র নয়, তবে আশ্চর্য্য এই যে, সেই সকল  
দলবলের উপর সরদারি পদ দেবার নিমিত্ত  
আমীর বেচে বেচে আমাকেই মনোনীত  
কোলেই, স্ত্রু তাও নয়, আরও দুটি সরদার  
বাহাল করবার ভার আমার উপরেই অর্পণ  
করা হলো, তত্ত্বিন্ন আমার বিবেচনায় ফা-  
ভাল, কি আবশ্যক বোধ হবে, সেইরূপ বন্দো-  
বস্ত করবার অশ্রমতি পেলেম। আমীর  
আমায় ডেকে বোলেই, “সাদক! বেদোর  
চড়াও করবার সময় তোমার সাহস উৎসাহ  
আর তৎপরতার প্রতি বেশ লক্ষ্য কোরেছি।  
আগ্রায় যাবার সময় যে লঙ্কর সঙ্গে যাবে,  
রাজকুমারের অশ্রমতি লয়ে তোমাকে তাদের  
সরদার কোরে দেবো, আর সম্রাটকে উপহার  
দেবার নিমিত্ত যে সকল রত্ন সঙ্গে নেবো, সে  
সমুদয় তোমারই জিম্মে থাকবে, তবে যাহাদের  
উপর তোমার বিশ্বাস আছে, সেই সকল  
ব্যক্তিকে বাহাল কোরে তোমার অধীন সর-  
দারি পদে নিযুক্ত করো। আমি কিন্তু ভূমি  
বই আর কাউকে জানিও না, চিনিও না,  
তোমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবো,  
রত্নগুলি যেন নিবিঁয়ে আগরার দল্লবারে  
পৌঁছে।” এই প্রদত্ত সম্মানে প্রফুল্লিত হোয়ে  
এত বিশ্বাস্তর হোলেম যে, আমার আর কুন্ত-  
জতা জানাবার ক্ষমতা রহিল না, কি বোলে  
যে উপকার স্বীকার কোরে স্তবস্তুতি কোস্তে  
হয়, আমি যেন সে সময় সে সকল কথা বিশ্বস্ত  
হোয়ে গেলেম, তাই আর স্ততিবাদ না কোরে  
এইমাত্র বোলেই, “বদি রাজপুত্র আরঙ্গজেব

অল্পমতি করেন, তবে আপনার দেয় সম্মান এই দণ্ডেই গ্রহণ কোন্ডে প্রস্তুত আছি।” জেমলা বোলেন, “তার জন্তে ভাবনা কি? আরজ্জিবের ক্ষমতা হন, আমি তার জবাব কোরবো, সে ভার আমার উপর, তুমি কিন্তু তবের তাকাদ। কোরে প্রস্তুত হয়ে থাকো। কেন না, আর তিন দিন মাত্র মধ্যে আছে, তার পরেই আমাকে যাত্রা কোন্ডে হবে।” আবজ্জিবের সম্মতি প্রদান করবার পর আমার মিত্রবর ইয়াসমিন আর ইয়াকুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোলেম, আমার সৌভাগ্যের কথা তাঁহাদিগকে অবগত কোরিযে পথরক্ষক সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ কোন্ডে অনুরোধ কোলেম। ঐ সংবাদ শুনে উভয় বন্ধু এত আশ্চর্য হোলেন যে, তার সীমা করা যায় না, বিশেষতঃ ইয়াসমিন আরও অতিরিক্ত পুলকিত হোলেন, যেহেতু স্নেহময়ী মাতাকে দেখে বর নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ লালায়িত হোচ্ছিল। আমরা কথায় বার্তায় আছি, এমন সময় রাজকুমার ডেকে পাঠালেন। বাক্তব-সংসর্গ ছেড়ে ত্রাস্ত হোয়ে চোলে গেলেম, তাঁদের যে আমি বিবৃত হয়নি, তাই তদন্ত বোসে যে দুটো স্তবস্ততির কথা শুনবো, তা পায়েম না, জোর তলব, আমাকে তখনি উঠতে হলো। সঙ্গতঃ কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। আরজ্জিব বোলেন, “সাদক! আমীর জেমলা আমার পিতার দরবারে চোলে-ছেন, তাঁর সমস্তি ব্যাহারে তোমাকেও যেতে অন্ত-মতি কোরেছি সত্য, তা যাই হোক, গুটিকয়েক কথা কিন্তু তোমায় বোলতে চাই, সে কথাগুলি যেন খোদিত অক্ষরের আয় তোমার অন্তঃকরণে অঙ্কিত হোয়ে থাকে। তুমি আমারি কারপ-দাজ, আর আমার বেণে বিশ্বাসও আছে যে, তুমি একজন বিশ্বস্ত পাত্র।” আমি উত্তর দান কোরবো মনে কোচ্ছি, রাজপুত্র নিষেধ কোরে বোলেন, “যা বলি, মনোযোগ কোরে শোনাও, আমীরের এ দেখাসাক্ষাৎ আমার মনোগত নয়, আমি তা আদৌ ভাল বিবেচনা কোচ্ছি না, হয় ত সে তলে তলে কোনো চক্র কোরে থাকবে, আমি কিন্তু তা ঠিক বলতে পারিনে,

আমার সহোদর দারা আত শঠ আর পদ, তার ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকতেও সাহস হয় না, এতলে তুমিই আমার চক্র, তুমিই আমার ভরসা, আমি তোমার মুখ চেয়েই থাকবো। কেউ যদি কোন কুচক্র কোরে আমার কি আমার স্বার্থের অনিষ্ট করবার চেষ্টা পায়, তুমি যদি তা জানতে পারো, কি তোমার মনে যদি সে সন্দেহও হয়, সকল কাজ-কর্ম ফেলে আগে আমায় সে বিষয় লিখে পাঠাবে। একথা যদি স্বীকার করো, তবে তোমার আমারের সঙ্গে পাঠাতে সম্মত আছি।” আমি প্রতিকৃত হোয়ে বোলেম, “আমি তাঁর প্রয়োজন বিশ্বস্ত হবো না, আর আবশ্যক-মত সংবাদ পাঠাতেও আলস্র কোরবো না। তখন রাজকুমার সন্তুষ্ট হোয়ে আমায় বিদায় হতে অন্তমতি কোলেন। আমার মাসিক বেতন ২৫০০ টাকা অবধারিত হোয়ে, আমার দুই বন্ধু ইয়াসমিন আর ইয়াকুবের ১২০০ কোরে ২৪০০ স্থির হলো, তবে অর্ধ সম্বন্ধে কারও আক্কেপ করবার কারণ ছিল না। সন্ধ্যার পর ৮০০ শত হাতিয়ারবদ্ধ সোয়ার আমাদের সঙ্গে থাকবে, তারা অষ্ট-গ্রহর দুটি মালের হাতী ঘেরে চোলবে, তার একটার উপর সোনা আর রূপো বোঝাই, আর একটি বাদশাহের নজরের নিমিত্ত রত্নাদিতে পরিপূর্ণ। আবশ্যকমত সকল আয়োজনই প্রস্তুত, আমিও রওনা হই হই হইয়েছি, এমন সময় হতভাগ্য লুনার পরামাণিক অত্যন্ত কাতর হয়ে আমায় সাধ্যসাধনা কোন্ডে লাগল, সলিমানও তার হোয়ে অনেক বোলে,—আমার অন্ত-মতি পেলে সে আমার সঙ্গে যাবে, এই তার প্রার্থনা—আমি তাতে সম্মত হোলেম। একটু পরেই দেখি, পরামাণিক টাটুর উপর সোয়ার হোয়ে হাত-পা ছুড়ে আছাদের নৃত্য কেড়ে দেখলেম, আমারই সেই দেওয়া টাটুটি, দেখে বড় সন্তুষ্ট হোলেম যে, তাকে সে যত্ন কোরে রেখেছে। আমীর জেমলার সদৃশ পরিপটীক ব্যক্তি হিন্দুস্থান জন্মেও কখন দর্শন করেনি, আমি এ পর্যন্ত যত মোগল পুরুষ দেখেছি, আমীরের তুল্য দীর্ঘাকার কেউই নয়, ফলিতার্থ তিনি একটি অদ্বিতীয় অদ্ভুত ব্যক্তি। যদিও দুঃখীর

ঘরে তাঁর জন্ম সত্য, কিন্তু চালচলনটা নবাব-  
জাদার মত ছিল, তাঁর দীর্ঘায়ত কৃষ্ণোজ্জ্বল  
চক্ষুদ্বিতে চতুরতা নৃত্য কোত্তো, আমীর যখন  
হুগুগ্রহ কোরে কাণ্ডে সঙ্গে কথাবার্তা কই-  
তেন, সেই সময় মুহূর্তমাত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত  
কোরে তাঁর চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য কোন্তেন।  
সেই দৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাঁর অহঙ্কার-মূর্তি  
বাক্ত হত, তখন চেহারা দেখে জ্ঞান হত, সে  
যেন তাঁর গ্রাহ্য যোগ্য নয়, আমীরের সেই  
অঙ্গী-মূর্তি দর্শন কোবে তার স্তম্ভকরণে  
কালভয় প্রহার কোত্তো। আমীর জেমলা  
পাতার একশেষ ছিলেন, অল্পগত 'আশ্রিত'  
লোকজনকে এত প্রশ্রয় দিতেন যে, যাবতীয়  
লক্ষ্যবেরা আর ছাউনির অনাহত অহুচরেরা  
স্বীকে প্রাণের সমান ভালবাসতো। অশ্রের  
এ কথাই নেই, আমীর যৎকালীন গলকন্দার  
একচ্ছত্রা আধিপত্য করেন, সেপাককার গুম-  
রাগুরা তাঁর প্রতি বিদ্রোহী ছিলেনও সত্য,  
আর তাঁর বিপক্ষে এককাত্তা হয়েছিলেনও  
সত্য, কিন্তু তথাচ কিছু রাজকীয় বিষয়-বুদ্ধিতে,  
কি ভব্যতার আদর অভ্যর্থনায়, কি অপ্রতি-  
হত বীরসাহসে আমীর জেমলা যে সর্বোপরি  
শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয় তাঁদের সম্মুখে স্বীকার  
কোন্তে হয়েছিল।

এ দিকে বাণিজ্য বিষয়ে মহাজনেরা এক  
মাকো তাঁর দক্ষতার, কারকারবারে তাদের  
সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পরিষ্কার সরল ব্যবহারের  
এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত স্বভাবের বিস্তর অহু-  
রাগ কোত্তো। আমার বাহাল হবার তিন  
দিবস পরে আমীর বাহাদুর অতি প্রত্যাষে তাঁর  
অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ রণাশ্বের উপর সোয়ার  
হলেন, অশ্বটি অনেক যুদ্ধেতে জেমলার অকু-  
ত্রিম বিশ্বস্ত মিত্র, কান্দাহান রাজ্যের অতি  
সুপ্রসিদ্ধ অশ্ববংশে তার জন্ম, তদপেক্ষা রূপবান্  
মহান্ অশ্ব পৃথিবীতে কখন পাদস্পর্শ করেনি।  
অশ্বটি যেন আপনার গুণ-গৌরব মনে মনে  
অবগত ছিল, তাই সে অগ্নিবৎ সরাগ-দৃষ্টিতে  
তার আনুপাশের ঘোড়াগুলির প্রতি একবার  
চেয়ে দেখলে, তার পরেই 'হঁ হঁ' শব্দচ্ছলে  
অর্ধক্ষণে তিত জ্ঞানন্দনাদ কোরে উঠল, বোধ

হলো যেন, তার মহাহুতব এডুকে নমস্কার  
পূর্বক স্বাগত আহ্বান কোলে। জেমলা  
পেয়ার কোরে অশ্বটিকে কখন "বা বা", কখন  
"বন্ধু সিকন্দর" বোলে ডাকতেন, তাই  
আমীর তার চিকণ গরদানার উপর সাদরে  
হুই চার খাবড়া মেয়ে "বাবা বাবা" বোলে  
রেকাবে-পা দিয়ে যখন চড়বার উদ্বেগ  
কোলেম, সেই সময় অশ্বটির এত আহ্বাদ  
হলো যে, সে তার অর্ধদণ্ডে স্বর পক্ষমে তুলে  
চীৎকারশব্দে নিনাদ কোন্তে লাগল। আমী-  
রের মস্তকে সবুজবর্ণ মসলিনের 'পাগড়ী',  
পাগড়ীর সম্মুখে অনেকগুলি বেশ কিম্বতি  
পাথর অর্ধচন্দ্রাকারে পোতা পাচ্ছিল, কটি-  
বন্ধনটিও সবুজ বর্ণের, ঐ কোমর-পটির উপর  
পেশ কবজের মুঠি বেরিয়ে আছে দেখা  
যাচ্ছিল, হীরা চুণী পান্না প্রভৃতি বিস্তর ভাল  
ভাল দামি পাথর তাতেও বসান ছিল, সেই-  
গুলি সূর্য্যের আভাস ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌  
কোচ্ছিল। তাঁর তেজঃপরিচিতি, শুণ-  
পরীক্ষিত তলোয়ারখানি পাশে ঝুলছিল।  
ধাসা মক্‌মলের খাপ, খাপের উপর হাতীর  
দাঁতের কারীগুরী, তা ছাড়া মিশ্‌কালজলের  
অঙ্করে কোরাণের কতকগুলি কবিতা আর  
পদ লেখা রয়েছে। কিংকোপের পাঞ্জামা  
ঝক্‌মক্‌ কোচ্ছিল, হীরা চুণী পান্নার চুনকিদার  
লপেটা জুতো, তার অগ্রভাগ বক্‌ হার প্রায়  
গোড়যুডেতে এসে ঠেকেছে। আমাদের কুচ  
কবরার পূর্বে আমীর একবার দৃষ্টিপাত  
কোরে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, দেখে  
শুনে সব বিষয়ে মহা সন্তুষ্ট হোলেন। চোনা  
চোনা ৮০০ বলবান সোয়ার আমীরকে  
ঘেরে রইল, আমি তাদের সরদার হোয়ে  
চোণেছি, আমাদের ঘোড়াগুলি নাচতে  
নাচতে, তড়াক তড়াক কোরে লাকোতে  
লাকোতে চলো। সূর্য্যের আভাস অশ্বগুলি  
চক্‌মক্‌ চক্‌মক্‌ কোন্তে লাগল। হুকুম  
দেবামাজেই সমুদয় দলবল সার বেঁধে কাতার  
দিয়ে রাস্তা ঘুড়ে চোলো। ক্রমাগত চোলে  
প্রথম উত্তীর্ণহানে নিরীয়ে পৌছিলে।  
ইয়াসমিন আর ইয়াকুব পালামত মালখানা

পাহারা দিতে লাগল, আমি নিরত জেমলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম, সেই সুযোগে আমীরের সঙ্গে কথাবার্তাও চোলে লাগল। একদিন অজুগীতি একটু দেখতে পেয়ে বোলেন, “বাঃ, বেশ আংটি, কেমন আংটি দেও দেখি দেখি।” আমি হাত থেকে আংটিটি খুলে, তীতিপদ্ধতি অনুসারে আমীর পাছে মনে করেন আমি তাঁরে নজর দেবার যত্ন পাচ্ছি, তাই যে গভিকে সেটি হস্তগত হয়, সে বুভুক্ষ বোলে তাঁকে এই কথা বোলেন, “দেখুন ধর্মাবতার! আমি কে, এই আংটিটি ভিন্ন সে বিষয় অবগত হবার অস্ত্র কোন উপায় নাই। এই আংটি উপলক্ষে যদি কখন সেই মর্শ্বকথাটি প্রকাশ হয়, ‘ঐ প্রত্যাশা কোরে একে চতু কোরে রেখেছি; নচেৎ সে কথা জানবার আর কোন পথ নেই।”

জেমলা বোলেন “এর পূর্বে হয় এই আংটিটি, নয় ঠিক এর জুড়ি একটি আংটি আমি কোথাও দেখিছি।”

আমি বোলেন, “হজুর! কোথায় দেখেছেন, স্মরণ হয় কি?”

জেমলা বোলেন, “হাঁ, হয় বৈকি, আমি যদি ভ্রান্ত না হয়ে থাক, তবে বোধ হয় নজফালীর হাতে হবল এই রকম একটা আংটি দেখেছি, তার চেহারা আর এর চেহারা ঠিক একই রকম।”

আমি অমনি শিউরে উঠে বোলেন, “নজফালী খাঁ!”

জেমলা বোলেন, “হাঁ, নজফালী খাঁ, তুমি চমকে উঠলে কেন? তার নাম তনে তোমার বিশ্বাস হবার কারণ কি?”

আমি বোলেন, “বাস্তবিক সে কথা আমি বোলতে পাচ্ছি নে হজুর! কেন যে আমি শিউরে উঠলেম, তা বুঝতে পাচ্ছি নি, তবে আংটিটি তিনি কোথায়, কি প্রকারে হস্তগত কোলেন, তাই মনে কোরে যদি শিউরে উঠে থাকি ত উঠেছি। এই আংটিটির পূরূপ রুস্তান অবগত হোতে পালে আমার বংশ আর জন্মের নির্ণয় হয়, সেই জন্তে এটি কার আংটি, প্রথম কার হাতে থাকে, সেই

সকল সন্ধান জানবার বড় অভিলাষ হয়, আংটিটি আমার জন্মবৃত্তান্তের স্মরণদাতা বোলেই আমার মনে ঐ অভিলাষ সন্ধান কোরে দিয়েছে, তা দিতেই পারে, বিচির নয়।”

জেমলা বোলেন, “তারই বা ভাবনা কি? আগরতে নজফালীর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হবেই হবে, তখন তাঁর মুখে আবশ্যক মত সকল কথাই শুনতে পাবে।”

আমি বল্লেন, “আমার সে অদৃষ্ট নয়, তিনি আমার প্রতি সদয় নন।” এই আক্ষেপ কোরে আমাদের ছাউনিতে যে যে কারখানা হয়ে গেছে, সে সমুদয় আন্তর্পূরিক আমীরের অবগত করালেন। পরামাণিকের দুঃসাহসের কথা শুনে জেমলা হেসেই খন, বোলেন, “সে কি সাহসে নজফালীর যুথের উপর নরমহলের নষ্টামি-চক্রের কথা অমানবদনে বোলেন? শেষে জিজ্ঞাসা কোলেন, নরমহল ছাউনি থেকে চোলে গেলে পর তাঁর কোনো সংবাদ পেয়েছি কি না? নজফালীর কি অভিপ্রায়, তা আমি জানি কি না?”

আমি “না” বোলে উত্তর প্রশ্নের উত্তর কোলেন।

এক্ষেণে আর কোন কথাবার্তা নেই, আমরা একটি পার্কতীর কন্দরের ভিতর দিয়ে চলছি, পতটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের ডাইনে বায়ে উত্তর পার্শ্বে পার্কতীর প্রাচীর, কন্দরের পথটি এক অপ্রশস্ত যে, তা উত্তীর্ণ হতে হস্তীগুলির অতিশয় কষ্ট হয়, তবু ত পিঠে কোন বোঝা বা কোনো প্রকার ভার ছিল না, সেগুলি পূর্বেই নাবিয়ে নেওয়া হয়। গোবা নামিয়ে দিয়ে, হেপাজাতের নিমিত্ত লোকজন যত ছিল, তাদেরও নাবিয়ে দিয়ে তবে হাতীগুলিকে সেই ক্ষুদ্র জুলি পথে লয়ে যাওয়া হয়। আর হুই দিবসমাত্র কুচ্ কোলেন আগরায় পৌছিতে পারি। চোলেতে চোলেতে তামাম দিন অবসান কোরে দিবসের শেষ ভাগে আমরা সেই পার্কতীর গলীপথে প্রবেশ কোলেন, তখন সূর্য্যদেব অস্তাশল অবলখন কোরেছেন। আমাদের চতুর্দিকে রজনীর

স্বর্গমুখি ঘনবেগে প্রগাঢ় হোচ্ছিল। সকলেই  
হাত, সকলেই বাগ্ন যে, কতকণে আপনাদের  
হাতড়ায় পৌঁছিব, এমন সময় একটা উচ্চ  
কণ্ঠস্বর শ্রবণের উপর থেকে বন্দুকের দেওড়  
বাড়ি বাড়তে শুরু কোলে, সেই শব্দ শুনে  
আমাদের অস্ত্র ভাবনা উপস্থিত হলো। বিস্তর  
তখন, বিস্তর সৈন্য পথ অবরুদ্ধ কোরে মৃত্যু-  
শায়ী শয়ন কোলে। একদল পদাতিক হাতে  
বন্দুক, রজতধারার উপর পোলুতে ধোরে  
সেই বাড়ি বাড়ি আর বিলম্ব নাই, এইরূপ  
কর্তৃত্ব আমাদের উপর চড়াও হবে বোলে  
সবটুকু লিপথ বেয়ে আসছিল, আর উচ্চস্বরে  
জ্যেদ বোলছিল যে, আমরা ধরা দিয়ে তাদের  
হাতে আত্মসমর্পণ করি। তাই দেখে আমীর  
জেমলা অশ্রুর পিঠে পাঁয়ের ধাক্কা মেরে  
“তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো,” এই কথা  
মাত্র বলবার অবকাশ পেয়েছিলেন, তার  
পরেই অশ্রুটি যেন উড়ে চলে, সে তার মূর্নিবের  
সংকেতিক কথাটি ভালরূপ অবগত ছিল।  
আমীর অমনি ভলোয়াব বার কোরে বীর-  
বিক্রমে বিপক্ষের উপর ঘোর আক্রমণ  
কোলেন, সম্মুখে যে পোড়তে লাগল, কেটে  
চটকরো কোত্তে লাগলেন, যে কেহ বাধা,  
ধির, ব্যাধা, বা বিপক্ষতা কোত্তে এলো,  
আমাদের মেরে কেটে একাকার কোলেন।  
কণ্ঠস্বরের নাকি সম্মুখে থেকে বাড়ি বাড়ি-  
ছিলো, তাই আমাদের বিস্তর হত আর বিস্তর  
সাংঘাতিক আহত হলো। কিন্তু দোশমনেরা  
পুনশ্চ যে বারুদ গেদে বাড়ি বাড়বেন, সে  
অবকাশ পেলে না, তার পূর্বেই আমীর চড়াও  
হোয়ে একটি একটি কোরে ভাবতের মাথা  
কেটে কোলেন, জনপ্রাণীও বেঁচে যেতে  
পারেনি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মাধার উপর  
থেকে প্রাণ সাংঘাতিক ঘোর অগ্নি-তরঙ্গের  
তুফান হোচ্ছিল। আমাদের অশ্রুগুলি পথশূন্য  
সেই চূর্ণ ভগ্ন পর্বত-শৃঙ্গের উপর কোন  
প্রকারেই আরোহণ কোত্তে পাগে না। আমীর  
জেমলা অস্ত্র কোন উপায় না দেখে আমাদের  
সকলকেই ঘোড়া থেকে নামতে হুকুম দিয়ে  
বোলেন, “এক এক ব্যক্তিকে দুই দুই ঘোড়া

ধোরে নীচে থাকতে হবে, তা হলে বাকী  
অর্ধেক লোক তগোরার হাতে পাহাড়ের  
উপর উঠে বিপক্ষের প্রতি চড়াও কোত্তে  
পারবে। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে অঁচড়িয়ে  
কাবুড়িয়ে পাহাড়ের উপর উঠলেম, জেমলাও  
অন্য সরদার হোয়ে আমাদের আগে আগে  
চোলেন। কিন্তু দোশমনেরা আমাদের সঙ্গে  
সাক্ষাতের অপেক্ষা কোলে না, তারা ইত-  
স্ততভাবে গুলি কয়েক লক্ষ্যশূন্য গুলি ছুড়ে,  
পার্কতীর ছাগপালের জায় পালিয়ে প্রহান  
কোলে যে যে দিকে অবিধা দেখলে, সে সেই-  
দিকে ছুটল, সব ছড়িত্ত্ব হোয়ে পোড়ল।  
জেমলা সেই বজ্রময় পর্বতশৃঙ্গের ধারে  
দাড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সেই দুই পর্ব-  
তের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র পথটি দেখতে লাগলেন,  
শেষে ডেকে বোলেন, “কেমন, রাজকোশ ত  
নির্ধিয়ে আছে, তার ত কোনো অনিষ্ট  
হয়নি?” “হজুর! তা রক্ষা হোয়েছে, কিন্তু  
ইম্রাকুব মারা পোড়েন।” আমাদের দলের  
একটি লোক এই উত্তর কোলে।

“কি! মারা পোড়েন?” আমি এই কথা  
জিজ্ঞাসা কোলেম।

সেই লোকটি বোলে, “তার নিয়তিই ঐ,  
অদৃষ্টে মৃত্যু আছে, কে কি কোত্তে পারে?”

জেমলা বোলেন, “সে বীর যুবা, তার মৃত  
শরীর এই দণ্ডেই এই খোলা ময়দানের  
মধ্যে নিরে এসো।” আমাদের পুঙ্কের কত  
লোক মারা পড়ে, অঙ্ককার বোলে তার  
নিরূপণ হলো না, বিশেষতঃ সে সময় নিরূপণ  
কবুবার পতি আমাদের মনোযোগও ছিল না।  
কে আমাদের পথাবরোধক হয়ে এই অনর্থ-  
পাত উপস্থিত কোলে, আমরা কেবল সেই  
বিষয়েরই চিন্তা কোচ্ছিলেম, তাতেই আমা-  
দের মন আচ্ছন্ন ছিল। কেন না, তারা সক-  
লেই রাজপুত আর পাঠান, তারা যে সামান্ত  
ডাকাতের মতন নয়, কি তারা যে সামান্ত  
ডাকাতের, অপেক্ষা উচ্চ পদের লোক, সেটা  
স্পষ্ট দেখা গেছিল। এদিকার গোলমাল মিটে  
গেলে আমরা রাজতহবিলের দিকে দৃষ্টি-  
পাত কোলেম, দেখলেম হস্তীগুলি গুলী দ্বারা

আহত হয়েছে বটে, কিন্তু মর্যাদাসিক নয়, তখাচ দাঁতজালায় অস্থির হোয়ে ক্রিপের প্রায় ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছিল, আর কি বোড়া, কি মানুষ, স্মৃণে যে পোড়ছিল, তাকেই দস্তাষাত কোচ্ছিল, যারা গুলী খেয়ে নীচে পোড়ে গেছিল, তাদের ত পায়ের নীচে ফেলে দোলে চোটকিয়ে নাড়ী বার কোরে দিলে, তবে কেউ কেউ যে যেমন কোরে সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তা বোলতে পারিনে, সিটি অতি অদ্ভুত দৈবশক্তি! আমাদের লোকজন ক্রান্তিবশতঃ অতিশয় অবসন্ন হোয়ে পড়েছে। মালের সিন্ধুকগুলি মাথায় কি ঘাড়ে করা দূরে থাকুক, তাদের এমন শক্তি ছিল না যে, পরাধারি কোরে হাতীর উপর উঠিয়ে দেয়। জেমলা কিন্তু ছকুম দিয়েছিলেন যে, লোকজনেরা সেগুলি ঘাড়ে কোরে বোয়ে নিয়ে যায়, কেন না, তৎকালীন হস্তীগুলি এত অবাধ্য হোয়ে পড়ে যে, কোন মতেই বশীভূত হোচ্ছিল না। তারা হোয়ের মত হোয়ে সেই গলী-পথের মধ্যে ঘুরে ঘুরে, ছুটে ছুটে, বেড়াচ্ছিল, কার সাধ্য নিকটে যায়? সিন্ধুকগুলি যদি কষ্টে জেঁটে উঠাতেও পারতো, তাতেও কোন ফল দেখতো না, যে হেতু পাগুলা হাতীগুলি পথ বন্ধ কোরে আগলে ছিল, তাদের নিকট দিয়ে চোলে যেতে কারও সাহস হতো না। হতভাগ্য ইয়াকুব বিবেচনার মত কাজ কোত্তে পারেন নি, তহবিলের সিন্ধুকগুলি সকলের পেছনে না রেখে, তাঁর উচিত ছিল, খুব যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা পেয়ে সেগুলি আগে আগে লয়ে যান। জেমলা এই বিক্রাটে পোড়ে ছকুম দিলেন, থাকী রাতটুকু সকলকে এইস্থানেই অবস্থিতি কোত্তে হবে, প্রভাত উদয় না হলে কোন কার্য্যই হবে না। হতভাগ্য ইয়াকুবের মৃতদেহ মালের সিন্ধুকের উপর বেখে সেগুলি একটি চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যস্থলে রক্ষা করা হলো, হেপাজাতের নিমিত্ত ঘন পাহারা নিযুক্ত হলো। মাহুতেরা মন্ত-হস্তীগুলিকে তুণো তেখে বশীভূত করবার ছেট্টা কোত্তে লাগল, আর যদি বোলে কোয়ে প্রবোধ দিয়ে সেই কুকাপস্থান থেকে সোরিয়ে

তফাতে লোয়ে যেতে পারে, তারও ফিকির দেখতে লাগল, তাদের সেই তাকব্বাক কোত্তই থাকী রাতটুকু কেটে গেলো। মাহুতেরা উন্নততরের কোরে জাগুন জেলে আপনাদের কাজে বোসে গেল, হাতীদের জেলে যা পাক কোলে, তাতে ঘি, ময়দা, আর মেঠাই মিশিয়ে আছা কোরে ঠেসে মাখলেন, তার পর সহিসদের ডেকে হস্তীগুলিকে নিকটে যেতে বোলে, সহিসেরা “কেয়দা বাবা! আবিত ঠাঙা হোয়া, বাবা! হো হোয়ো মো হোয়োয়া, কুচ্ খেয়াল মত করো, তোমারা ওয়াস্তে থানা পাকারো গেরা, খুব মিঠা থানা বাবা, আবি চলো মেরা বেটা, কুচ্ আন্দেসা মত করো, চলো, বাবা চলো,” এইরূপ স্তবস্তাতি কোত্তে কোত্তে অতি মতর্ক হয়ে দুই এক পা কোরে আস্তে আস্তে নিকটে গেল। সুরুক্তি চতুর জানোয়ারগুলিও সহিসদের মিষ্ট সম্ভাষণে বাদি হয়ে পোড়ল। গরম গরম রুটির আর গরম গরম ভাতের আশ্রয় লয়ে আপনাদের আগনার শুঁড়গুলি লথা কোয়ে বাড়িয়ে দিলে, বাড়িয়ে দিয়ে এইরূপ ভাবে দাঁড়ালে যে, সকলের আগে যে হাতীটি দাঁড়িয়ে, মাহুতেরা যেন একটি ময়দার লুটি তার মুখের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। সে সেই লুটিটি পেয়ে আড়ে আড়ে গিলে ফেলে। তার পরেই দেখা গেল, পেছন থেকে আর একটি হাতী শুঁড়টি সর্পফসার ভায় বিস্তার কোরে প্রথম হাতীর পিঠের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিলে। এইরূপে উভয় হস্তীই এক পা ছুপা কোরে সহিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলতে লাগল, শেষে ক্রমে ক্রমে গলীটি পার হয়ে ফাকা যারগায় এসে পোড়ল, এক্ষণে সাবেক দস্তুরমত পায়ের জিজির দিয়ে, বেশ পরিতোষ পূর্ব্বক তাদের জঠরানল শান্ত কোরে, ক্ষতের সজ্জা হতে লাগল। এদিকে আমাদের জেমলা তামাম রাজের মধ্যে একবার চক্ষু মুদিত করেন নি, যেমন প্রভাত-ছটা প্রকাশ হলো, অমনি তিনি গাজোখান কোরে ছুর্ভাগ্য ইয়াকুবের শব্দ যে স্থানে ছিলো, সেইখানে চোলে

গেলেন। গুলী দ্বারা শরীরটি স্থানে স্থানে ভেদ হয়ে এঁকোঁড় এঁকোঁড় হয়ে গেছিল। ধরের নিমিত্ত একটি গোর খোঁড়বার লক্ষ্য হলো, সরদার বাহাদুর ইয়াকুবের মৃত শরীরের উপর বুকে পোড়ে যখন এই কথাগুলি বাল্লেন, “বীর যুবা! তোমার অল্প আয়ু-গে সূর্য্য অন্তাচলাবলম্বিত হইয়াছে, আর তখনই পুনঃপ্রকাশ হইবে না,” সেই সময় ধর্মীরের চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রুপাত হইলো। ইয়াকুবের দেহটি যখন মৃত্যুকালে সমর্পণ করা হয়, তৎকালীন কারও মুখে শ্রদ্ধাশ্রুতি ছিল না, সকলেই স্থির, গভীর প্রশান্ত এবং নিঃশব্দ। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধেতে ধর অপর যে সকল বীর ভ্রাতারা ধ্বংসায়ী হইছিলেন, তাঁদের জন্তেও ঐ প্রকার বিবাদপূর্ণ ভাষায় অস্ত্রোষ্টি সংস্কার সম্পাদন কোত্তে হয়েছিল; আমাদের পক্ষের প্রায় ১৫০ ব্যক্তি হত এবং ২০০ ব্যক্তি আহত হয়, আহত ব্যক্তিদিগের আর অস্ত্রারোহণে ক্ষমতা ছিল না। দেখে লেম, শত্রুপক্ষের ২০০ ব্যক্তি আমাদের অগ্রে মৃত্যুশয্যা কোরে যাচ্ছে। হায়! রণমত্ততার উত্তাপ শীতল হইবার পর এই মৃত্যুদর্শন মনে চিন্তা করিলে যতই অশুখ জ্ঞান হয়! এ কথিরপাতের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ত—লুট্ আর প্রাণাতি !!! কে কোলে, বাণিকার কে? সে বিষয় এখনও সন্দেহের স্থল, সে কথা এখনও অপ্রকাশ আছে, জেমলা কিন্তু শপথ কোরে দিব্যি কোলেন যে, তিনি অচিরাত্ সে সন্দেহ ভঞ্জন কোরবেন, আর প্রতিজ্ঞা কোলেন, যে ব্যক্তির অসৎপরামর্শে এই নীচ ভষ্ম কাপুরুষব্যং আক্রমণের উৎসাহ পেয়েছে; তাকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে হিংসার উপযুক্ত প্রতিকূল প্রদান কোরবেন।

বহু লোকের বাসস্থান একটি সুপ্রশস্ত গওগ্রামে পৌছে জেমলা গ্রামবাসীদিগকে ভিজাসা কোত্তে লাগলেন ঐ গ্রাম দিয়ে একদল হাতিয়ার-বাধা লোক চোলে গেছিল কিনা? আর ঐ গ্রামের নিকটে কোন সরদার বাহাদুর অবস্থিতি কোরেছিলেন কি

না? গ্রামবাসীরা বোলে, সে দিন আমাদে-  
দের সঙ্গে সংগ্রাম সাফল্য হয়, তার পূর্ব দিন  
একদল অস্ত্রধারীকে গ্রামের নিকট দিয়ে  
চোলে যেতে দেখেছে, কিন্তু তারা  
কার লোক, আর কোথা থেকেই বা  
এসেছে, গ্রামবাসীরা তার কোনো খবরই  
রাখেনা, বোলে, “আমরা সে বিষয়ের কিছুই  
অবগত নই,” গত দিবসের যুদ্ধের প্রসঙ্গে  
নানা কথাবার্তায় আছি, বিশেষতঃ এমন কথ  
কে কোলে, এর বাণিকার কে, আন্দাজে  
আন্দাজে কত লোকের উপরই সন্দেহকাজি,  
সে সন্দেহ কিন্তু শুদ্ধ আত্মমানিক, এমন সময়  
পরামানিক লুচর আমার সঙ্গে কোন কথা  
কইবার প্রার্থনা কোলে, আমি তখন আমা-  
দের সঙ্গে একত্রে বোস আহতদিগের সেবা-  
স্ত্রজ্ঞদার বন্দেবেশ কোচ্ছিলেম, পুনঃ কুচ  
কোত্তে হবে, তার কি চাই না চাই, তারও  
তদারক কোচ্ছিলেম, সেইকাল শেষ কোরেই  
উঠে চোলে এলেন, ভাবলেন, সাই, ভিজাসা  
করিগে, পরামানিক কি শুভতর বিষয়ের কথা  
আমায় বোলতে চায়। পরামানিক বোলে,  
“ভজুর! নাদান গতিবাবচাচাকে মাং কো-  
বেন। কালকের গড়ায়ের বিষয়ে আমি বা  
আন্দাজে আন্দাজে সন্দেহ কোরেছি, সে  
সন্দেহ শেষে নিঃসন্দেহ হোয়ে দাঁড়াতে  
পারে।”

আমি বোলেম, “তুই তার কি জানিস?”

পরামানিক বোলে, “ভজুর! সে কথা নয়,  
মানুষ মাত্রেই মূর্খ, কেউ কোন বিষয় নিশ্চয়  
কোরে বলতে পারে না, তবে এক আছে  
আন্দাজ। সকল লোকেই আন্দাজে আন্দাজে  
বলে, আমার আন্দাজ এই, নরফলী খাঁই  
এ উপদ্রবের মূলীভূত, সেই ব্যক্তিই এই  
অনর্থপাতের জড়, গত রাত্রে তিনিই বিপক্ষ-  
দলের সরদার হয়ে এসেছিলেন।”

আমি বোলেম, “আহা! একথা যদি সত্য  
হয়, তবে খবরটুকর অনেক মূল্য হোয়ে  
দাঁড়ান, তুই সে কথা কি কোরে জানতে  
পালিস? কি সুবাস পেয়েছিস? যে, এরূপ অশ-  
মান কোচ্ছিস?”



পরামাণিক। হজুর! সে কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি তার অন্তরঙ্গ সকলকেই জানি, আমার কাছে কারও যথাক্রমে দাঁড়ি ছাপা নাই, যাম। মারা পোড়েছে, আজ প্রাতে তাদের মধ্যে একটি ব্যক্তিকে দেখেই চিনতে পেরেছি, আমি যদি তার দাঁড়ি কখন স্পর্শও না কোন্তে, তবু বোলতে পারতাম যে, এ সেই ব্যক্তি, তার বিশেষ কারণ আছে।”

আমি বোল্লাম, “তুই কার কথা বোল্চিস?”

লুচার বোলে, “তার নাম গজব উদ্দীন, সে ব্যক্তি নজফালীর চাকর ছিল, আর সদাসর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তো, একলহমাও ছাড়া-ছাড়ি হতো না। ঐ ব্যক্তিই আমার বুড় আকুল মোড়া দিয়ে মুচড়িয়ে ভেঙ্গে দিছিল।”

আমি বোল্লাম, “তাই হবে হোতেও পারে, কিন্তু সে যদি সম্প্রতি আর কাহারও চাকর হোয়ে থাকে, নজফালীর চাকরী সে যদি পরিত্যাগ কোরেই গিয়ে থাকে?”

পরামাণিক বোলে, “আমিও সে কথা বোলতে পারতাম, কিন্তু আর একটি কথা আছে, তাতেই আমার দ্বন্দ্ব বিশ্বাস হোয়েছে যে, ও ব্যক্তি যখন মৃত্যুশয্যা করে, তৎকালীন নজফালী তার নিকটে অবশ্যই ছিলেন, অথবা বোধ হয় তিনি তারে টেনে হিচড়িয়ে তফাতে লয়ে যেতে চেষ্টা কোরেছিলেন, তার কারণ এই যে, ঐ ব্যক্তির অতি পাখেরই এই চুনীর আংটিটি অযত্নে পোড়ে ছিল, এক্ষণে আমি তা কুড়িয়ে এনেছি। আমি যখন তখন নজফালীর হাতে এই আংটিটি দেখতে পেয়েছি, আংটিটি পেয়ে আমার আরও এই বিশ্বাস হলো যে, হজুরও ঠিক এইরূপ একটি আংটি পোরে থাকেন।” ঐ কথা বোলে পরামাণিক আংটিটি বার কোরে দিলে। আমি যত্নপূর্বক আংটিটি বার বার উণ্টে পাণ্টে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্লেম, দেখ্লেম; আমার আমাকে যে আংটির কথা বোলে-ছিলেন, এ সেই আংটি, আমারই মুড়ী আংটি ঠিক তারই প্রতিরূপ। আমি তৎক্ষণাৎ আমারই কাছে চোলে গেলেম, আংটিটি

তাঁর মুখে রেখে বোল্লাম, এটি পরামাণিক সন্ধান কোরে বার কোরে, আর সে ব্যক্তি এই এই কথা বলে। জেমলা বোল্লাম, “পরামাণিক ঠিক কথাই বোলেছে, আমার মনেও সে কথা বেশ ধোরেছে। আমার বেশ অরণ হোচ্ছে, করেক বৎসর পূর্বে নজফালীর হাতে যে আংটি দেখেছিলাম, এ সেই আংটি। একবার গলকন্দার রাজদ্বারে মগলরাজ উকিল পাঠান, নজফালী তাঁরই শরীররক্ষার নিমিত্ত সমভিব্যাহারী সৈন্তের সেনাপতি হোয়ে যান।”

নজফালী কার কারপরদাফ, এক্ষণে সেই বিষয়ই নির্ণয় করা, আর এ অতিপাত তিনি কেন কোলেন: তার কৈফিয়ত তলব করা—এই দুটি কথা আমাদের মূলত্ববী রইল। আমার বোল্লাম, “সাদক। আংটিটি এখন তোমার কাছে রেখে দাও, কিন্তু দেখো, আমি চাহিবামাত্র যেন পেতে পারি, পরামাণিককে কিছু বকসি দিয়ে দাও, আর তাকে বোলে দাও, আপাতত সোঁফেন একথা মুখে না আনো, বিষয় বিশেষে তাকার মত হাবা বোলা হওয়া ভাল, তাতে কাজ উদ্ধার হয়, সকল কথা জানি, সেরূপ ভাব সকল সময়ে দেখান উচিত নয়।” আমি এক্ষণে বিদায় হোয়ে লুচারকে ঐ কথা বোলে সতর্ক করে দিলাম, পরামাণিক বোলে “সে কি হজুর। যদি সেটি শুধু কথা হয়, তবে আমি ভিন্ন আর কে সে কথা গোপন রাখবে? গোপন রাখতে আমার মত আর কে পারে? হজুর। সে ভয় কোরবেন না।” আগরায় পৌছে জেমলা মুক্তকণ্ঠে কটুধরে অভিযোগ কোতে আগলেন যে, পথে তাঁর উপর অতি অতিপাত হোয়েছে, তাতে কোরে মিথ্যা মিথ্যা কেবল অতকগুলি বীর-পুরুষেরই প্রাণনাশ হলো। আমার বোল্লাম, যে এ কাজ কোরেছে, আর যার পরামর্শে হোয়েছে, তার নাম যে পর্যন্ত না শুনতে পাবেন, বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্তে যাবেন না। শাহজাহান বোল্লাম, তিনি সে ঘটনার কিছুই অংগত নহেন, পূর্বে কখন সে কথা কানেও শুনেনি। দারা ও ঐরূপ

বোলেন, কিন্তু রাজকুমার স্বমুখে ব্যক্ত  
বোলেন যে, নজফালী, তাঁর চাকর, আর অনেক  
সদিক লঙ্করও তাঁর তাঁবে আছে, দারা আরও  
এই কথা বোলেন, ঐ সকল লোকবল লয়ে  
একপক্ষ কোত্তে তার যদি সাহস হোয়ে  
হাকে সে রাজধানীতে ফিরে এলেই তার  
রাধী কেটে আমীরের কাছে পাঠাবেন । এ  
সকল কথা শ্রবণের বোণা বটে এবং কাজেও  
সত্য হোলে হোতে পারে, কিন্তু আমীর  
মনে সন্দেহ হোলেন না । আমীর কোন শ্রদ্ধেয়  
কর্ত্তে শুনতে পেয়েছিলেন যে, সমুদয় কাণ্ড  
দারার অহুমতি লয়েই করা হয়েছে । নজফালী  
পরামর্শ দেন, রাজকুমার তাতে আঁকর করেন,  
এই এ কথাও বোলে দেওয়া য় যে, নজফালী  
যদি অপদস্থ হয়, তবে আর যেন সে পদাচ  
করণায় ফিরে না আইসে, এ কথা সে যেন  
বিস্মৃত না হয় । বীর-শেঠাব নজফালীর মনে  
এক বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অবশ্যই জয়ী  
হবেন, পরাস্ত কখনই হবেন না, তাই সচিব  
সাহস কোরে আমাদের উপর আক্রমণ  
কোরেছিলেন, শেষকালে অপদস্থ হোয়ে  
পালিয়ে প্রস্থান কোলেন, কোথায় গেলেন,  
কিউ জানতে পারি না ।

যদিও রাজপুত্র দারা ধর্ম্মত বোলেন যে,  
তিনি সে বিষয়ের কিছুই জানতেন না, কিন্তু  
আমীর তাঁর সে কথায় পরিতুষ্ট না হোয়ে  
এই ক্ষেত্র কোত্তে লাগলেন যে, একদল সৈন্য  
পলাতকের অহুসন্ধানে পাঠান হয়, দারা  
তাতে সম্মত হোলেন । তিনি যে নজফালী  
বাক্যস্ত অত্যাচারে লিপ্ত আছেন, সে কথা  
তাঁর গোপন রাখবার ইচ্ছা ছিল, তাই আমী  
রের অধীনে ১২০০ লঙ্কর নিযুক্ত কোরে  
দেওয়া হলো । তাঁর মনে যেন কোন ছলনা  
চাতুরী নাই, সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ করবার  
জন্যে জেম্‌লার সঙ্গে এই কথা স্থির হলো যে,  
ঐ সকল সৈন্য আমীরের নিজ সরদারগণের  
অধীনে থেকে আবেশ পালন কোরবে । দারা  
হুফালীন আমীরের এ বন্দোবস্তেও স্বীকৃত  
হোলেন, তিনি তখন ইটি মনে ভাবেন নি যে,  
সে সাদক্কে তিনি একবার অতি-নিষ্ঠুরপ্রাণে

খন কোত্তে চেঁচা কোরেছিলেন, সেই সাদকের  
উপরেই ঐ সরদারি পদ প্রদান করা হবে ।

জেম্‌লা বোলেন, “সাদক ! তোমার নির্ভর  
অন্তঃকরণ,—উদ্যোগ, চেঁচা, উৎসাহ,— এ  
সকল গুণও তোমাতে ভালরূপ আছে,  
তাতে কোরে আমার মনে বেশ সাহস হোচ্ছে  
যে, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে । সে পাশর  
নরাদম এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি যে,  
ফাকি দিয়ে আমাদের হাত থেকে বেঁচে  
যাবে, আমি আগ্রায় থেকে শাজাহানের  
সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়-  
কার্যের কথা কোয়ে আপনার কাজ নির্বাহ  
করি, তুমি রাজকুমার দারার প্রদত্ত ১২০০  
ফৌজ লয়ে নজফালীর অহুসন্ধানে চোলে  
যাও । যে পর্যন্ত সে নরাদমের সন্ধান না  
পাও, তোমাকে দেশময় তন্নাতন্ন কোরে খুঁজে  
বেড়াতে হবে । আমি বাদশাহের কাছ থেকে  
কেল্লাদার এবং ঠাকুরদের নামে ফার্মান  
বার কোরে দেবো অথং দারার কাছ থেকেও  
প্রবেশাভুমতি পত্র এনে দেবো, তন্নিয় তাঁর  
চিঠিও দেবো, দারার তাঁবে যেখানে যত  
লোক আছে, তারা তোমার সহায় হোয়ে  
সেই পলাতককে গেরেস্তার করবার চেঁচা  
কোবুবে, তবে বাও, সব আয়োজন করোগে,  
যদি ইষ্টসিদ্ধ হয়, বিস্তার পুরস্কার পাবে ।”

যে নির্দিষ্ট ভার লয়ে আমার এখানে  
আসা হয়, তৎসম্বন্ধে এপক্ষে আমার একটি  
ওজর ছিল, অর্থাৎ আগ্রায় ঐ অহুপস্থিত  
থাকলে দারা আর আমীর জেম্‌লা,—ঐ দুই  
ব্যক্তির মন্ত্রণাচক্র অবগত হোয়ে আরজ-  
জেবকে সংবাদ কোত্তে পারব না । কিন্তু জেম্-  
লার প্রতি দারার যেরূপ মনের ভাব দেখ-  
লেম, তাতে কোরে যে তাঁদের পরস্পর প্রণয়  
হবে, সে আঁকার, সে সম্ভবনা নেই, তবে  
সে ভয় করবার কারণ দেখি না, তাই প্রয়ো-  
জনমত ফার্মান দারা প্রবেশাভুমতি পত্র  
হস্তগত কোরেই শত্রু অহুসরণে বহির্গত  
হোলেম । ইস্তক প্রায় লাগাত লক্ষ্য্য তামাম-  
দিন কুচ কোরে শেষে জিজাসায় জিজা-  
সায় জান্‌লেম, নজফালী পালিয়ে আঁর

সহরে প্রস্থান কোরেছে। অমীর জয়পুরের রাজধানী। আমি ত ভারি বিপদ দেখলেম, নজফালী যদি জয়পুরাধিপতির আশ্রয় লোয়ে থাকে, তবে তারে গেরেস্তার করা চঃসাধ্য। জয়পুরের রাজভগণের সঙ্গে দিল্লী-সম্রাটগণের কখন অপ্রণয় নাই, চিরকালই সন্তাব আছে সত্য, কিন্তু তাঁরা নাম মাত্র অধীন, বাস্তবিক তাঁরা প্রকৃত স্বাধীন পদে থেকে আপনাদের একাধিপত্য রক্ষা কোরে আসছেন। এক্ষণে যদি শাজাহান বাদশাহের প্রতি রাজার ভাল-রূপ অনুরাগই থাকে, কিন্তু ঠাকুরদের মন সে, রূপ নয়, রাজা আবার চিরকালই সেই ঠাকুরদের বশতাপন্ন। ঐ সকল ঠাকুরদের মধ্যে সকলেরি গড়বন্দি কেলা আছে, কেলাগুলি অতি দুর্গম, ঘন নিবিড় বেষ্টনে অবরুদ্ধ, তার মধ্যে প্রবেশ করাই দুঃকৃত, প্রায় সর্বদাই আপনাদের মধ্যে পরস্পর লড়াই ঝগড়া চোটে ছে, দস্তা, ডাকাত, লুটেরা,—এই সকল বদমা'সের দল লয়ে নিকটবর্তী রাজ্যের উপর অনর্থপাত করা হয়। ঐ সকল ধরাও উৎপাতের উপর যখন ভিন্ন দেশস্থ বিদেশীয় শত্রুগণেরা এসে আক্রমণ কোত্তে লাগল, তখন সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য একেবারে অরাজক হয়ে পোড়ল, তখন কে করে মারে কাটে, কে কার্ তা কেড়ে লয়, কে করে তাড়িয়ে দেয়, তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সকলি গোলমাল অব্যবস্থা হোয়ে সমুদয় দেশ লণ্ডভণ্ড হোয়ে পোড়ল। জয়পুরবাসী রাজপুতদিগের নির্ভয় অন্তঃকরণ। বল, বীৰ্য্য, সাহসে তাদের সঙ্গে কার্ও তুলনা হয় না, যতক্ষণ জয়ী না হবে, কদাচরণে ভঙ্গ দিয়ে, বিমুখ হোয়ে ফিরে আসবে না, তাই আমাকে আট ঘাট বেঁধে সাবধান হোয়ে চোলতে হয়েছিলো। যে সকল রাজা রাজ্যোড়াডের প্রসাদ দত্ত জায়গীর বা নাথেরাজচাকুরাণের মধ্যে তারা বসতি করে, তাঁদের সঙ্গে স্পষ্ট অকৌশল করা উচিত বিবেচনা কোল্লেম না, বিশেষতঃ যে সকল মোগল-সৈন্য আমার অধীন হোয়ে এসেছে, তাদের মনোগত ভাব কিছুই অবগত নই, ছরবস্থা

হোলে তারা যে আমাকে পরিত্যাগ কোরে চোলে যাবে না, সে সন্দেহ থেকে এক কালীন নিমুক্ত হতে পািলেম না, ভাবলেম, হয় ত দারা গোপনে গোপনে তাদের শিখিয়ে কি হুকুম দিয়ে দিয়েছে যে, তোরা অবসর বুঝে দিল্লীতে চোলে আসবি। সেই পার্শ্ব-তীয় সন্ধীর্ণপথে যারা আমাদের গতিরোধ কোরে বিপক্ষতা করে, তাদের মধ্যে অনেকেই রাজপুত, সেটি বাস্তবিক সত্য কথা—আবার জনরবে শোনা গেল নজফালী পাণ্ডিয়ে অমীর সহরে বাস কোচেন—এই সকল ঘটনা দেখে শুনে আমার মনে সন্দেহ হলো যে, হয় ত সে ব্যক্তি প্রধান প্রধান ঠাকুরদের সঙ্গে আনুরক্তি কোবেছে, আমাদের সঙ্গে বিস্তর অর্থ ছিল, হয় ত সেই প্রলোভ দেখিয়ে তাদের শুদ্ধ লয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোরবে। শেষে বিবেচনা কোল্লেম, অমীর সহরের দুর্গে উপস্থিত হোয়ে রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা অতি আবশ্যক। সেখানে কিন্তু রক্তহস্তে দেখা কোল্লে কোন ফল হয় না। দিল্লীর রাজধানী থেকে উপযুক্ত নজর না লয়ে রাজার কাছে মুখ দেখানই উচিত নয়। এখানে এসে এর তার মুখে শুনে যে সন্ধান পেয়েছি, সেই মর্মে এক চিঠি লিখে সোয়ারের ডাকে তখনি আমীর জেম্-লার কাছে রওনা কোরে দিলেম, আমীর শুনে সে বিষয়ের কি হুকুম দেন, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেম। নজফালীকে গেরেস্তার কর্তার জন্তে আমীর তার সঙ্গে কতকগুলি বিশকিন্মতি হিরে চুনী পায়া পাঠিয়েছেন, তন্নিয় রাজকুমার দারাও তাঁর পিতা শাজাহানের নাম কোরে খানকয়েক অতি সুন্দর সুন্দর জমকাল শাল আর একপ্রণ্ড শিরোপা পাঠিয়ে দিয়েছেন। জেম্-লা আমার নামে এক পত্র পাঠিয়েছেন, তাতে লিখেছেন, “আর কালবিলম্ব করো না, একেবারে সরাসর জয়পুরে চোলে যাও, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নজরগুলি তাঁর সুস্থখে ধোরে দেবে।” নজরের সম্পত্তিগুলি রাজার যে কদাচ অগ্রাহ হবে না, সে কথা আমীর অবধারিত কোরে

লিখেদেয়েছেন। পত্রপেয়েই তখন রওনা হোলেম ঠাকুরদের অনেকগুলি দৃঢ়বেষ্টন দুর্গম গড় পার হোয়ে চোলেতে হয়েছিল। প্রতি ফটকেই আমাদের যেতে নিষেধ কোরে আটক কোত্তে লাগল, আর প্রতিবারই আমরা 'কে, কোথ' থেকে এসেছি, কোথায় চোলেছি আমাদের অভিপ্রায় কি, এই সকল আত্ম-পরিচয় দিতে হয়েছিল, নচেৎ ছেড়ে দেবার তকুম ছিল না, কিন্তু সে সকল নিকেশ দিতে আমাদের কোনো কষ্ট হলো না—আমরা তা অনায়াসেই দিতে পার্লেম। আমরা একটি কৃষিহীন অনাদৃত—দীন 'বসতি'—উদাস রাজ্যের মধ্য দিয়ে চোলেছি, তারিদিকে বালুকাময় প্রান্তর সুঁধু কোটে, কেবল মধ্যে মধ্যে কাঁটাবন আর ঝোড় ঝোপের জঙ্গল দেখা গাচ্ছিল, সেইগুলি ভিন্ন সে স্থানে আর কিছুই ছিল না যে, সেই একা-ধব উদাস মূর্তির বাধা জন্মায়। মধ্যে মধ্যে অগ্নিশিখার ছায় উত্তপ্ত হাওয়া উঠে, দুর্ব ব্যতাস হোয়ে রাশি রাশি বালী উড়ে অন্ধ-কার কোত্তে লাগল, আমরা সেই সময় আরও অন্ধ হোয়ে পড়তে লাগ্লেম, আমা-দের স্মৃতে পশুশাশ্বিনী মনোহর দেশ আছে, কি নাই, একবার চক্ষু মেলে যে চেয়ে দেখবো, সে উপায় ছিল না।

জয়পুরের নিকটে পৌছে, একজন সোয়ার দ্বারা প্রার্থনা কোরে পাঠালেম যে, রাজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়। সোয়ার এসে বোলে, আজ মঙ্গলবার, অতিভজাদিন; আগত কল্য রাজা প্রাচীন দুর্গের অন্তর্বর্তী অতি নির্জন স্থানে গমন কোরে সেখানে জপ-তপ হোমাদি পাপনাশক যাগকর্ম করা হবে, অভাবপক্ষে দশদিন তাঁকে সেখানে বাস কোত্তে হবে, স্মৃতরাং এর মধ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোত্তে পার্বে না। রাজার সঙ্গে নজফালী যে আত্মীয়তা কোরেছেন, ঐ কথা শুনে সেটা বেশ মনে ধারণা হলো, তার প্রমাণের নিমিত্ত অপর কোনো সন্ধান জান-বার আবশ্যক হলো না। দশদিবস বাগকর্ম! সে কদিন আমাদের গড়ের ফটকে বোদে,

আপনার পায় আপনি তেল দিয়ে প্রাপ্তি দূর কোত্তে হবে! নজফালী যদি অমীর সহরে থাকে, আর তার যদি পালাবার মনন হোয়ে থাকে, তা হলে ঐ দশদিবসের অবসরে সে আমার উদ্দেশ্য বিফল কোত্তে সমর্থ হবে, তবে সে পালিয়ে রক্ষা পাবে, আমরা পশ্চাৎ তাড়া কোরে গিরেও তারে ধর্তে পারবো না। এই নিরুপায় দেখে, অনেক তর্ক-বিতর্ক, বিস্তর অর্থোপাত্তি এবং তার সঙ্গে অল্প অল্প মিষ্ট অলু-যোগ কোরে রাজাকে একখানি পত্র লিখে পাঠালেম। যে অভিজ্ঞায়ে আমার এখানে আসা হয়েছে, তার কোন প্রসঙ্গ কোলেম না, কিন্তু এই কথা লিখে দিলেম যে, 'যে কার্যের ভার লয়ে আমার এখানে আসা হোয়েছে, তাতে বিলম্ব করা চলে না, বিশেষতঃ শাহা-হান বাদশাহের দরবার থেকে যারা দৌত্য-কর্মের ভার লয়ে আসেন, তাঁরা কখন হাজির থেকে উমেদারি কোরে সাক্ষাৎ করেন না, সে রীতি কোন কালেই নাই, তবে তাঁদের আহ্বানের নিমিত্ত উদ্যোগ আদি কোত্তে যে কয়দিবস বিলম্ব হওয়া আবশ্যক, তা হয়ে থাকে'। এই সকল ত্রায়সঙ্গত তেজগর্ভ হেতু-বাদ দর্শনেতে কার্যসিদ্ধ হলো। হোমযোগের দশদিবস শেষ হতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু তত্রাপি রাজা হুকুম দিয়ে দিলেন যে, আগত কল্য তাঁর দরবারে আমার আহ্বান হবে। অমীর সহরের রাজপুরী ষথার্থই মহা গোরবের স্থান, ঐশ্বর্য ভূষিত মনোহর শোভার প্রফুল্লিত, তুলনা কোত্তে গেলে দিল্লীর শোভা সৌন্দর্য্য তার কাছে অতি যৎসামান্ত। রাজপুরীর প্রথমদ্বার একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখন পর্য্যন্তও ততদূর পঁজছিতে পারিনি, এর মধ্যেই এত খাল, বিল, গোরস্থান, ভগ্নবাটী, গিরিপর্কত, বালুকা রাস্তা আর উজ্জান দেখতে দেখতে চোলেম, যে, তার সংখ্যা হয় না। মনে কোলেম রাজবাটীতে পঁছিতে আজকার দিন অবসান হবে। ঝোপ, ঝোড়, জঙ্গল, নিবিড় কটক বন, বিপিন, কানন, অরণ্য, কুঞ্জ, প্রান্তর এবং মধ্যে মধ্যে গুপ্তশৈলের মধ্যে দিয়ে

চোল্লেম, চোল্লেতে চল্লেতে একটি পথে এসে পোড়লেম, তার ডাইনে বাঁয়ে দুই পাশে পাহাড়, সেই পথ ধরে সহরের মধ্যে প্রবেশ কোলেম। সহরটি মন্দিরে মন্দিরে খচিত দেখে বোধ হল, এ স্থানে কেবল গোঁগী আর গোসাক্ষরীরাই বাস করে, তাদের অতি বিভীষিকা মূর্তি, দিবা রাত্রি কেবল ছাই ভস্ম মেখে আর নেংট হোয়ে থাকে, কাপড় পরে না, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, জোড়িয়ে ধোপার মতন কোরে গেরো দিয়ে বেঁধে রেখেছে, মুখে ভস্মের লেপ দিয়ে তার উপর ত্রি কোরেছে, দেখলেম দেবালয়ের স্রুম্থে, অংশ যে সকল ভগ্নাবশেষ বাটা উদাসপ্রায় পোড়ে রয়েছে, সম্রাসীরা তার চতুষ্পার্শ্বে চক্র কোরে বোসে আছে। আমরা এখন পর্য্যন্তও পাহাড়ের স্রুম্থে দিয়ে ঘুরে ঘুরে, একে একে চোলেছি, ভাস্কর কার্যের খোদকারি করা তিনটি বৃহৎ নগরদ্বার ক্রমে ক্রমে পার হোয়ে চোল্লেম, শেষ দ্বারটি অতিক্রম হোরেই আমার যেন বোধ হলো, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে যে একটি বৃহৎ চক থাকে, সেই চকে এসে পোড়লেম, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, জিজ্ঞাসা কোরে জান্লেম, ইমারতগুলি কেবল আস্তাবল, আর বারবাটীরূপে দ্বার। এই চতুঃশালার মধ্য দিয়ে আমাদের লয়ে চলো, যেতে যেতে স্রুম্থে একটি বেশ রফরকে জম্কালা ফটক দেখতে পেলেম, এই ফটক রাজবাটীর মধ্যবর্তী উঠানে এনে আমাদের উপস্থিত কোলে, তার পরেই দেখি, একটি প্রকাণ্ড দরবার-দালানে এসে উপস্থিত হয়েছি, দালানের সম্মুখে একটি উত্তান, উত্তানের মধ্যস্থলে অতি রমণীয় একটি ফোয়ারা বিরাজ কোছে। আগ্রাতে শাজাহান বাদশাহের রাজপুরীর মধ্যে বাস কোরে কিছুকাল স্রুম্ভোগ কোরেছিলেম, এই ফোয়ারা দেখে সেই স্রুম্ভোগ আনন্দের দিন আমার মনে জাগ্রত হোয়ে উঠলো। একটা মিথ্যা বাহানা কোরে রাজা আজ সাধারণ দরবার ঘরে বোসলেন না। একটা ক্ষুদ্র গলিপথ দিয়ে ছোট ছোট ঘর, দালান, আর বাড়ীর ভিতর দিয়ে আমাদের

লয়ে চলো, তার স্থানে স্থানে বারাণ্ডা বারু করা, ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছাত, চাতাল, বাড়ী, বাগান, ফোয়ারা দেখা যেতে লাগল, তামান পথ সুগন্ধি পুষ্প সৌরভে প্রফুল্লিত হতে হতে চোল্লেম। এর পূর্বে এমন কোনো স্থান আমার দেখা ছিল না যে, অম্মীর সহরের স্তরে তার তুলনা হতে পারে। সহরটি দীর্ঘ প্রান্তে যেমন বিস্তার, তেমনি আবার উপযুক্ত স্থানে অবস্থাপিত। তার ভাস্কর-কার্যের কোমলতা প্রকাশতা আদি গুণ, তার শিল্পনৈপুণ্যের চাতুর্য্য, শ্রেষ্ঠ-প্রস্তরের প্রয়োগ, আর মনোহর উত্তান—এই সকল দর্শন কোরে জ্ঞান হলো যেন, স্বর্গে এসেছি। মহম্মদ তাঁর একান্ত ভক্ত শিষ্যদিগকে যে বৈকুণ্ঠবাসের আশ্বাস কোরে ছেন, আমার অনুমান হলো, আমি যেন সেই বৈকুণ্ঠধামেই উপস্থিত হোয়েছি।

রাজা বিস্তর শিষ্টাচার পূর্ব্বক আমাদের সমাদর কোলেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত নয়, তাঁর সে শিষ্টাচারে অমায়িক আকর্ষণতার অভাৱ ছিল না।

রাজা মকমলের গদীর উপর বোসে ছিলেন, আমি তাঁর ডাইনে বোসলেম, নজরের সম্পাত্ত গুলি তখান উপস্থিত করে দিলেন। সেগুলি খুলে দেখার পূর্বে রাজা ব্যস্ত হোয়ে বাঁদ বার জিজ্ঞাসা কোতে লাগলেন, আমি কি নিমিত্তে এসেছি? আমার অভিপ্রায় কি? নজফালী আমাদের উপর যেরূপ আক্রমণ কোরেছিলেন, সেই কথা বোলে মনোহুধের বিষয় অবগত করালেম, আরও এক কথা বোল্লেম, আমীর জেমলা প্রতিজ্ঞা কোরে ছেন, নজফালীকে ধৃত না কোরে ক্ষান্ত হবেন না। রাজা বোল্লেন, প্রথমত তাঁর জিজ্ঞাসা এই, নজফালী খাঁই যে চড়াও কোরেছে, তার প্রমাণ কি? গজবউদ্দীনের মৃত শরীরের পার্শ্বে যে আংটি পাওয়া যায়, সেই আংটি বার কোরে বোল্লেম, ঐ গজবউদ্দীন নজফালীর পরম মিত্র, তারা সদাসর্বদা এক-স্থানেই বাস কতো। রাজা বোল্লেন, তা হলোই বা, নজফালী দারার কারপরদাজ, সে যদি একাজ কোরে থাকে, দারার অনুমতি

এই কোরেছে। আমি বোল্লেম, “দারা সে  
অধীকার কোরেছেন, রাজকুমার বোল্লে-  
ন, তিনি তার কিছুই জানেন না, নজফা-  
ক সাজা দিতে প্রস্তুত আছেন, তাকে পুত-  
র জন্ত সঙ্গে লক্করও দিয়েছেন।” রাজা  
টি মুচুকে হেসে বোল্লেন, “দারার স্বভাবই  
তখন দেখ লেন যে, একতিয়ারের বার  
য়ে পেড়েছে, আর হাত বাড়িয়ে পাবার  
নাই, তখন তাকে পুত কোত্তে সৈক-  
ন করেন।” আমি বোল্লেম, “এখনও সে  
তার বার হয় নি, আমরা সন্ধান পেয়েছি,  
এই চতুঃদীর্ঘ প্রাচীরের মধ্যেই আছে।”  
রাজমন্ত্রী, রাজ-অমাত্য, রাজপরিবার এবং  
তার অপর অপর কারপদাজে খরটি পরি-  
হিত, রাজা তাঁদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা  
করেন, “কখন হে, এমন লোক কেউ  
কেনে আছে, তোমরা বোল্লেতে পার?” ই-  
তি শুনে তাঁরা প্রত্যেকে বুকের উপ-  
যোগ্যতা হাত বেধে বোল্লেন, “আজ্ঞা  
দারা সে বিষয়ের কোন খবরই জানেন।”  
নি বোল্লেম, “আমীর চেম্বলা একজন প্রধান  
প্রাণী ব্যক্তি, তিনি পরম মিত্র ও হোতে  
করেন, আবার নিষ্ঠুর শত্রুও হোতে পারেন,  
নি মনোগত অভিপায় এই যে, মহারাজের  
অজ্ঞীয়তা কোলে মহারাজ হতে তাঁর  
কার হবে, তাঁর প্রার্থনা যে, এইগুলি  
পনি গ্রহণ করেন। ঐ কথা বোলে নজর-  
ল সন্মুখে ধরে দিলেম।

গলকন্দার খনিজাত একখানি দুঃপ্রাণ্য  
র হাতে কোরে লয়ে যেমন তার প্রতি  
প্রীতি কোরেছেন, রাজা অমনি হঠাৎ “ও  
দাদেও!” এই শব্দ কোরে বোল্লেন, “কি  
বিকার রত্ন! কি চমৎকারই আভা বেরি-  
ছে!” আমি বোল্লেম, “এসকল ত অতি  
মোহ, আমীরের কাছে এর অপেক্ষা আরও  
বিকার চমৎকার রত্ন আছে, আপনাকে তা  
তেও পারেন, তাঁর সঙ্গে যদি আপনার প্রণয়  
হ, দেবেনই তার সন্দেহ নেই।” রাজা তাঁর  
দ্বী আমীর খাঁকে সঙ্গে কোরে পরামর্শ  
কোত্তে উঠে গেলেন, একটু পরেই তিতরের

একটি কামরায় আমায় ডেকে পাঠালেন।  
রাজা বোল্লেন, “বাস্তবিক কথা এই যে, নজ-  
ফালীকে আশ্রয় দিছিলাম সত্য, আমাদের  
নিয়মই এই, কেউ শরণাপন্ন হতে চাইলে  
আমরা তাকে বিমুখ করিনে, কিন্তু শরণাপন্ন  
ব্যক্তিকে এমন আশ্বাসও করিনে যে, যদি  
কখন কোনো গুরুতর মাহুমান ব্যক্তি তারে  
হাজির কোরে দিতে বলেন, আমরা তখন  
অধীকৃত হোয়ে বোল্লে যে, সে ব্যক্তি আমা-  
দের আশ্রয়ের মধ্যে নাই। সে ব্যক্তি এসে  
শরণাপন্ন হল, আমরা তারে আশ্রয় দিলেম।  
আবার আপনি এসেছেন শুনে সে স্থানান্তরে  
যোতে চাইলে, আমরা বোল্লেম “আচ্ছা যাও।”  
সে একপে এসে নাই, এখান থেকে চোলে  
গিয়েছে, আপনাকে আর তাতে কেবল এক-  
রাত্রের অগ্রপটাত, আপনি ভাড়াভাড়ি  
কোরে গেলে তাকে ধোতে পারবেন। আমী-  
রের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে এই  
কথা লিখ জানাব যে, তাঁর প্রদত্ত অমূল্য রত্ন  
পেয়ে চরিতার্থ হয়েছি। আমাকে যেন  
তিনি বন্ধু জ্ঞান করেন,—এ কথাও বোলে  
পাঠাব—একপে আপনি বিদায় হোতে  
পারেন।”

রাজা যেরূপ অকপটভাবে, উদারমনে  
এই কথাগুলি বোল্লেন, তাতে স্থির বোধ  
হলো, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলে-  
ছেন, কাল্পনিকতা করেন নি। আমি  
বোল্লেম, “মহারাজা আমায় চরিতার্থ  
কোলেন, আমি তারি বাধিত কোলেম।”  
শেষে আমার খাঁয়ের হস্তে এক ষোড়া সাল  
গ্রহণ কোরে, রাজার কাছে এবং রাজার  
মনোহর রমণীয় অট্টালিকার কাছে বিদায়  
হোয়ে প্রস্থান কোলেম।

কিরে যখন আস্তাবলের উঠান পর্য্যন্ত  
এসেছি, দেখলেম, একটি পুরুষকে হাতে পায়ে  
বেধে, মুখে চকে কাপড় বেঁপে দিয়ে লয়ে  
যাচ্ছে, যে লয়ে যাচ্ছিল, সে আমাকে বোলে,  
নিকটে কালীর মন্দির আছে, সেই করাল-  
বদনীর তৃপ্তির নিমিত্ত এই ব্যক্তিকে বলিদান  
দিতে হবে, দেবীর ক্রোধ-পানে বিভ্রাট নাই,

না তাঁর কথির-তুষা কখন ভুল হয়, তাও হয় না।” এই কথা বোলে বোলে, “আপনার যদি বলি দেখবার ইচ্ছা হয়ে থাকে ত সঙ্গে আসুন, এখন শিরচ্ছেদন হবে দেখতে পাবেন, ব্রাহ্মণেরা সব আয়োজন কোরে বোসে আছেন, আপনাকে অধিক বিলম্ব কোত্তে হবে না।” এরূপ ঘোর ভয়ঙ্কর নির্ভর অভিনয় মনুষ্যের কখন প্রিয়দর্শন হোতে পারে না, আমি তার মুখে ঐ নির্দয় বাক্য শুনে থর থর কোরে কাঁপতে লাগলুম, আল্লা না করুন আমার তা দেখতে হয়। তারে বোল্লাম, “তুমি শীঘ্র শীঘ্র চোলে যাও, আমার সময় নাই সে গিয়ে দেখি।”

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

“যত হাসি তত কান্না।”

আমি তখন আজমিরে রওনা হোলুম, মনে কোল্লাম, সেই পথেই নজফালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেইখানেই তাকে ধরবো। আবার ভাবলুম, হয় ত সে অস্ত্রীর সহরেই লুকিয়ে আছে, তা যদি হয়, তবে এত পথ দৌড়াদৌড়ি করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, কোনো ফলই হবে না। কিন্তু রাজার ভাব-ভক্তি অকপট দেখেছি, খোলাসা কথাই বোলে-ছেন বোধ হয়। পূর্বে আমার শোনা ছিল, যে এসে শরণ-লয়, রাজপুত্রেরা তারে আশ্রয় দেন। কিন্তু যদি জানতে পারে যে, শরণ-গতকে হাজির কোরে দেবার জন্ত অনেক পেড়াপেড়ি কোর্বে, তবে তারে গোপনে গোপনে সোরিয়ে তফাত কোরে দেয়, এই নিমিত্ত রাজা যা বোলেন, সে কথা বিশ্বাস-যোগ্য হলেও হোতে পারে। আমরা ধাওয়া-ধারি চোলে গিয়ে একেবারে মোজাবাদে উপস্থিত হোলুম। সहरটি বড়, অনেক লোকের বাস, সেইখানে পৌছে সে দিন ছাউনি কোরোরইলুম। এই স্থানে জৈন-দের অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। হিন্দু-

স্থানের এই প্রদেশে জিনোপাসকের সংখ্যা বিস্তর।\* লোকজনকে ডাকিয়ে বোল্লাম, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আসা হোয়েছে, তারা যে তার অতুসন্ধান করে, আমিও স্বয়ং জৈন মহাজনদের কাছে সন্ধান জানতে গেলাম। মহাজনেরা বড় সাবধানী, তাদের কাছে কোনে সন্ধানই পেলাম না। এক ব্যক্তি ছাগ-মেঘাদি পশু-বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সে দিয়া বোলে, “একটি লোককে, আকারে বোধ হয় বড় লোকই হবেন, পঞ্চাশ জন পেয়ারা সঙ্গে কোরে গতরাত্রে এই সহর হোয়ে আজ মীরের রাস্তা ধোরে চলে যেতে দেখিছি।” এই খবরে যথেষ্ট প্রমাণ হল যে, সে ব্যক্তি আজমীর অভিযুগে চোলেছে। এক্ষণে আমার লোকজন, ঘোড়া, উঠ, হাতী প্রভৃতি পেয়ে দেয়ে আরাম কোরে রাজা হোয়ে বোসেছে। আমি তাদের কুচ কব্বার লুকুম দিয়ে সজা হয় হয় এমন সময় হারসুলীতে পৌছিলাম যে সকল দেশ পরিক্রম কোরে এ স্থানে আসতে হয়েছিল, সে সকল দেশ জয়পুর অপেক্ষা বড় ইতর-বিশেষ নয়। হারসুলীতে পৌছিয়েও ঐ কথা শুনলুম,—ভদ্র আজমীর একজন লোক, সঙ্গে পঞ্চাশজন অতুচর,এখান থেকে চোলে গেছে। আমরা কিন্তু পথ চোরে চোলে নির্জীববৎ হোয়ে পোড়েছি। আজকার রাত্রে অবসাদ দূর কোরে কাল প্রাতে ভিন্ন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে যেতে পারব না! যে ব্যক্তি আমাদের আগে আগে চোলেছে, সে যদি নজফালীই হবে, তবে পথে কখন আলস্য করে মুহু-মন্দ-গতিতে চোলেতে না, কেন না, বন্দরসুন্দরী নামে একটি স্থানে পৌছে তাঁর কথা শুনতে পেলাম, তিনি

\* বুদ্ধদেবের উপাসককে জৈন কহে, তাহাদের প্রতি হিন্দুরা আত্মঘাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু পঙ্গাদেবীর পূজা এবং বারাগনী ধাম পূণ্যবাৎ বলিয়া স্বীকার, হিন্দুরাও করিয়া থাকেন, জৈনরা করেন। এই দুই বিষয়েতে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে। জিনমত্তাবলম্বীর দল তাদৃশ পুট নহে তত্ত্বিত তাহাদের আপনাদের মধ্যে আবার দুই সম্প্রদায় হইয়া পরস্পর বিধেযভাব প্রকাশ করে।



এতাবৎকাল আমাদের আগে আগেই চোলে-  
ছেন, কিন্তু অধিক দূর নয়, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র  
দূরে আছেন, তাই ভাবলেম, সে যদি নজ-  
ফালীই হবে, তবে তাড়াতাড়ি হনহন কোরে  
না চলে যাচ্ছি যাব, হোচ্ছে হবে. একপ গয়ং-  
গয়ং কোরে পথে বিলম্ব কোরবে কেন ?  
পথে তাড়াতাড়ি কোরে চোলবার জন্তে না  
সে আপনাই যত্ববান হয়েছিল, না তার  
লোকজনকেই যত্ববান হতে দিছিল। হার-  
ফলিতে এসে দেখলেম, দেশের মূর্তি নূতন  
আকার ধারণ করেছে, এ স্থানে বড় বড়  
রক্ত দৃষ্টিগোচর হল, সেগুলি কিন্তু তাদৃশ  
মহোৎসব বল নয়, আর সে সকল প্রায়ই কটক-  
বৃক্ষের জাতি। আমরা ক্রমিক একসারি  
ছোট ছোট বালুকাপাহাড়ের উপর দিয়ে  
চোলে কৃষ্ণগড়ে এসে উপস্থিত হলেম। কৃষ্ণ-  
সিংহ নামে এক রাজা সে দেশের অধিপতি,  
তার অতি শাস্ত্রপ্রকৃতি। তিনি নিকটাকাটে  
থাকতে ভালবাসেন এবং জয়পুরস্থ ঠাকুর-  
দের কোনো বিবাদের মধ্যে লিপ্ত থাকেন  
না। একটি পাহাড়ের উপর তাঁর দুর্গ অব-  
স্থিত করে। রাজপুরীর অট্টালিকাগুলি  
দেখতে অতি অসভ্য, একটি মনোহর পুষ্কার-  
ময় মধ্য থেকে গেঁথে তোলা হয়েছে, পুরীর  
পশ্চাতে কতকগুলি অসমতল ছোট ছোট  
পাহাড় আছে। আমরা যে তার পশ্চাৎ  
পশ্চাৎ ধোতে চোলেছি, বোধ হয় নজফালী  
সে বিষয় জানতে পেরেছিল, কারণ কৃষ্ণ-  
সিংহের রাজপুরীর মধ্যে সে আশ্রয় লভে  
গেটে পেরেছিল। সে রাজাটি অতি বিজ্ঞ,  
তাই তারে আশ্রয় দিতে স্বীকার করেন নি,  
ভাবলেন, কি জানি, আশ্রয় দিলে পাছে প্রতি-  
বেশী ঠাকুরদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পোড়তে  
হয়। নজফালী ফটক থেকে বেরিয়ে যাবার  
উদ্যোগ কোচ্ছে, এমন সময় আমরা সেখানে  
পৌঁছলেম, পৌঁছেই তখনি তারে ঘেরে  
ফেলেম। সে ব্যক্তি যদি ধরা না দিয়ে আমা-  
দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কতো, সেটি তার  
উদ্যাদক্ষেত্রের কার্য্য হত। কিন্তু তা না  
কোরে নজফালী সহজেই আমার বন্দী হল,

কেবল ধরা দেবার সময় অসভ্য গোঁয়ারের  
মত মগরামি কোরে এক রকম চটা চটা  
বিরক্তির প্রকাশ কলে, আমি না কি তার  
অভাব ভালরূপ অবগত ছিলাম, তাই তার  
বিরক্তি-মূর্তি দেখে আশ্চর্য্য বোধ হলো না।  
নজফালী মনে কোরেছিল, আমি আরজজে-  
বের সঙ্গে ডেকানেই আছি, তাই আমাকে  
দেখতে পেয়ে তার বিশ্বাস জ্ঞান হলো, সে  
কিন্তু কোন কথাবার্তা না কোরে মনে মনে  
রাগরাগভাব আর বাহ্যিক বিরক্তি-আভাসের  
মুখ চোক কোরে চুপ কোরে রইল। তারসঙ্গে  
আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন সে কি  
ছিল, আর এক্ষণে বা কি হয়েছে। এক্ষণ-  
কার ক্ষমতাহীন অসমর্থ অবস্থা চিন্তা কোত্তে  
কোত্তে এক একবার দুই চক্ষু রাক্তমবর্ণ  
কোরে, কখন বা ক্র জুগুটি কোরে কত  
প্রকারই মুখভঙ্গ কোত্তে লাগলো, মাঝে  
মাঝে দুই চক্ষু পাকিয়ে, কপাল আকুলিত  
কোরে তেঁটি মুখ নাড়তে লাগলো। এক্ষণে  
আমার অবস্থার অনেক প্রভেদ, তথাচ এ  
অবস্থায় নজফালী আমার নিকট যেরূপ  
খাতির-যত্নের আশা কোত্তে পারেন, আমি  
তার ক্রটি কোলেম না। তার ঘোড়া আর  
তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে বোলেম, “ঘোড়ার  
উপর সোয়ার হও, আর তলোয়ার কোমরে  
বাধো!!” তবে কি, আমার লঙ্করেরা লেঙ্গা  
তলোয়ার ঝালিয়ে তাঁকে ঘেরে লয়ে চোলো।  
নজফালীর লোকজনদেরও কড়াবড় পাহারা  
দিয়ে লয়ে চোলেম। অজমীর সহরে পৌঁছিলে  
পর আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হবার কথা শুনে  
রাজা বিস্তর আফ্লাদ প্রকাশ কোলেন। জয়-  
পুরনাথের তখন অবকাশ হোয়েছে, তাঁর সে  
যাগ-কর্ম্ম শেষ হোয়ে গেছে, তাই আজ নাচ-  
তামাসা দেখবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কোরে  
পাঠালেন। রাজা বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক  
আমার খাতির-যত্ন কোলেন। তিনি আমার  
সঙ্গে “তুমি আমার বেটা” বোলে কথা  
কহিতে লাগলেন, আর আমার হাত ধরে  
তাঁর ডাইনে বোসিয়ে বোলেম, “আজ আমার  
বড় সৌভাগ্য, তোমাকে লয়ে আমোদ

আজ্ঞাদ কোত্তে পার্বে, এখানে আজ নাচ-তামাসা হবে, এক তরকা নাচনেওয়ালী আগরাধেকে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন না কি আতি 'মষ্ট গাইতে পারে, আর তার নাচ-বার ভঙ্গীও না কি আতি মনোহর, অনেকে বোলুচ্ছে, তেমন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তুমি স্বচক্ষে দেখে বিচার কোত্তে পার্বে।" নাচনেওয়ালীদের ডাকিয়ে আনা হলো, তারা এগিয়ে গাল্চে পর্যন্ত এসে শির ঝুঁকিয়ে রাজাকে সেলাম কোলে। সেই সময় যে ব্যক্তি সকলের আগে দাঁড়িয়ে, সে যখন রাজাকে দণ্ডবৎ কোরে মস্তক উত্থান কোলে, মুখ দেখে আমি তখন চিনতে পাল্লেম। ইনি নূরমহল!—আমার বন্দী নজফালীর কন্যা! যোগ্য সংসারাত্মকের সেই একমাত্র ঘৃণিত এবং পরিবর্জিত মলের স্বরূপ, সেই ইতরের ইতর, তত্ত্ব ইতর দলে নূরমহল নিমগ্ন হয়েছিল দেখে আমার বিশ্বস্রস্তান হলো, মনে মনে তার ভাগ্য নিন্দা কোরে আক্ষেপও কোত্তে লাগলেম, নূরমহল কিন্তু মুখের ভঙ্গী দেখে আমার সেই বিশ্বাসমিশ্রিত মনস্তাপ লক্ষ্য কোত্তে পাল্লে। যুবতী আমায় দেখে লজ্জিতা হলো। পূর্বে কখন সে এরূপ লজ্জায় বাধ্য নাই হোক, এক্ষণে কিন্তু লজ্জা ঘোরাবরণ হয়ে তার চারুমূর্তি আচ্ছন্ন কোলে। তার আর মনোমোহিত যদুরস্বরে গান কোরে, কি অল্পময় মনোহর ভঙ্গীতে নৃত্য কোরে সভাসদের মনোরঞ্জন করা হলো না। মিষ্ট গাওয়া দূরে থাক, যুবতীর গলার আওয়াজ মোটা ষোড়া হয়ে পড়লো, আর এত অস্পষ্ট যে, কি গাচ্ছিল, কেউ তা বুঝতেই পাচ্ছিল না। পায়ে যেন শক্তি ছিল না, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়তে লাগল। যখন প্রণালী-শুদ্ধ সামান্য ভঙ্গীর নৃত্য কোত্তে পাল্লে না, তখন নূতন নূতন রসের হাবভাব দেখিয়ে রকম রকম মোহন-ভঙ্গীর না কি কোরে হোতে পারে? সেরূপ বিলাস-রসের ভাব সে সময়ে মনে উদয় হবে কেন? পেছনে একটা বুড়ো তবলা বাজাচ্ছিল, খাটমুণ্ডরের যত তার চেহারা, নূরমহল গাইতে গাইতে গান ভুলে, সুর ভুলে

যেতে লাগল, সে ভেড়ুরা অমনি চপেটাবাত কোত্তে লাগল। নাচতামাসা শেষ হোয়ে বিদায় হয়ে গেলে নূরমহল অদৃষ্টে যাহা আছে, এই দুঃস্বার্থ খাটমুণ্ড চেহারা দেখেই সেটি বুঝতে আর ব্যর্থ রইল না। রাজা স্পষ্ট মৈরাশ হোয়েন, তাই হস্তান্দোলন কোরে বাত রহিত করবার সঙ্কেত কোলেন। রাজপ্রাসাদের এক কোণে একটি কামরা চিহ্নিত ছিল, নাচনেওয়ালীরা উঠে সেইখানে চোলে গেল, তারা চোলে গেলে পর বালক সঙ্গে একদল পুত্র উপস্থিত হলো। তারা ভাঁড়ের মত রকম রকম ঢঙ্গে রো-বেতরো পোষাক পোষেছে। কেউ সিংহ, কেউ ভল্লুক সেজেছে। কেউ ছোট বালকেরা বানর সেজে সেই মতো ভল্লুকের পিঠের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে পোড়তে লাগল, আর মুখ খিচিয়ে কিছুর মিচির কোরে শব্দ কোত্তে লাগলো—এই হব্ব বানর, ঠিক সেইরূপ নকল কোরে লাগল। রাজা দেখে খিল খিল কোরে হাসতে লাগলেন। রাজাকে হাসতে দেখে আসল যে সকলেই তার দেখাদেখি হাসল, যেটা সম্ভাবনা বটে, পাঠক তা মনে কোরেও কোত্তে পারেন। কিন্তু নূরমহল আর নূরমহলের দুর্গতাবহা আমার মনকে একেবারে গ্রাস কোরে রেখেছিল, সেই চিন্তায় এত মগ্ন ছিলাম যে, রাজাকে হাসতে দেখে সকলে যখন আমোদে প্রফুল্লিত হোয়ে হো হো শব্দে হাস্তরব কোত্তে লাগল, সেই সঙ্গে আমিও হাসলেম বটে, কিন্তু আমার সে হাসি পুরুষ মতন মনোহান হাসি হল, ভাল ভেজ কোরে হাসতে পাল্লেম না, কেবল মুখ সিঁটকে দাঁত-গুলি বার কোলেম মাত্র। ভাঁড়েরা বিদায় হয়ে গেল, দুটি মল্লযোদ্ধা অগ্রসর হোয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে লড়াই কোরে লাগল। তারা ক্রমে অগ্নি-অবতার হোয়ে ঘোর প্রচণ্ডমূর্তি ধারণ কোলে, উভয়েই রাজপুত্র, উভয়েরি বজ্রদেহ, তলোয়ার-বিজয় উভয়েই সমান নিপুণ। তারা যেরূপ চক্ষের নিমিষে তলোয়ারের প্রহার নিবারণ কোরে

হাপনার আপনার দক্ষতা আর তৎপরতার পরিচয় দিতে লাগল, আমরা দেখে অবাক হোলো, বাস্তবিক অল্পকীড়ার ঐ অঙ্গটি অতি ক্ষুদ্র, সে সকল চোটে যে বেগে আর যে বেগে এনে পড়তে লাগল, তলোয়ারে তলোয়ারে নিবারণ না হোয়ে যদি গায়ে এসে লাগত, যে সঙ্গে লাগত, সে অঙ্গ তখন ওয়ার হোয়ে যেতো । যদি দুজনের একজন নৈব-বিধাকে এক আধবার সামলাতে না পারে, তবে তার মৃত্যু ধরাই রয়েছে, কার সাধ্য রক্ষা করে ? তাই মনে কোরে আমার মনে মনে ভয় হতে লাগল, এক একবার শ্রিউরে নিউরে উঠতে লাগলোম । সেটি কিন্তু কখন চোটে থাকে না । মালেরা কোতুকারণে আপন আপন তলোয়ার শূঙ্কর উপর এমনি জোরে, আর এমনি পেঁচপাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নে বেড়ায়, দেখে বোধ হয়, তারা যেন আপনারা সব কোরে আমোদ কোচে, কি যেন আপনাদের আমোদেই উন্মত্ত । খেলতে খেলতে একটু একটু কোরে শরীর ধরন হতে লাগল, তখনও কিন্তু তাহাদের মস্তি প্রশান্ত, স্নিগ্ধ এবং নম্র । ক্রমে সে সমস্তাব অদৃশ হোয়ে উগ্রভাব উপস্থিত, অধার ক্রমে ক্রমে সে উগ্রভাব গিয়ে উগ্র-ভাব হতে লাগল, অবশেষে জ্ঞান-চৈতন্য-বহিত হয়ে ঘোর উন্মত্ত হয়ে উঠল, তখন পরিশ্রমে কি হবে, সে বিবেচনা রটল না, তারা তখন অগ্নিমূর্তি হোয়ে বিরাট অব-

স্থা লাগল যখন তে লাগল এই সময় একটি মুহূর্ত্ত, তালোয়ারা হোলেই হয়, তার মস্তক ঐ অঙ্গটিকে গিরি ঠেসে প্রকাণ্ড গিরি টিপে আঁকড়ে রেখে ঐ ছা পীঠের মদাস্থলে এসে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে “নম, নম, জগদীশ মহাক্ষম করো”, এই কথা গো কানের ক্ষান্ত কল্লো । এই ব্যাক ঐ ঐ মল্লযোদ্ধার গুরু, তাহা সেই বিরাট বদন্তার পুরুষকে দেখে আঁটতে সবুজ পাহাড় স্বীয় প্রগাঢ় লোহা, আর ঐ ঐ তলোয়ারের দ্বারা হাতে

কোরে লয়ে, “সামীল সামীল” বোলে সামীল বামনকে ডাকলে, সামীল বামনের কাট-খোটার মত গের্টে শরীরটি, পিঠে একটি কুজ, মাথাটা বে-আড়া বড়, যেন একটি ছোট খাটো গুচ্ছে, দেহটি অষ্টবক্র, তামাম পা লোমে ভরে গেছে, সেই ধর্মাবতার এগিয়ে এসে তলোয়ার দুখানি হাতে কোরে নিলে, ঐ তলোয়ার লয়ে সে নানা প্রকার জাক্কা জাকামি কোন্তে কোন্তে চোলে গেল, তারে দেখে রাজার ভারি আমোদ হলো, তাঁড়ের তামাসা এই পর্যন্ত হোয়ে শেষ হলো । নর-কৌদের দ্বিতীয়বার আহ্বান হলো, এবার কিন্তু নুরমহল তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল না, রাজা তার কথা জিজ্ঞাসা কোলেন, “সে পীড়িত আছে, আমতে পারবে না, হজুর মাপ কোব-বেন,” এই ওজর কোরে কাটিয়ে দিলে । মাহুবর আমীর খাঁ বোলেন, “বেরূপ চক্কর ভাবভঙ্গী দেখিছি, পরম্পরের অধির ভাষা যদি পোড়তে পেরে থাকি, তবে বোধ হয়, আমাদের আমীর জেম্‌লার পূজনীয় প্রতি-নিধি ঐ প্রধান নাচনেওয়ালীর বিষয় কতক কতক পূর্বে অবগত আছেন, তবে যদি আমার ভ্রম হোয়ে থাকে ত বোলতে পারি নে ।”

আমি বোলোম, “সে কথা মিথ্যা নয়, আপনি সত্য কথাই বোলেছেন ।”

সত্যতা আর ভদ্রতার অনুরোধে আমীর খাঁ আর বেনী কথা জিজ্ঞাসা কোন্তে পালেন না, তাই তিনি ঐ পর্যন্ত বোলেই চুপ কোরে বসিলেন ।

মহাপ্রসন্ন যখন বরখাস্ত হলো, তখন রাজি অনেক হোয়েছে, রাজা হুকুম দিবে, রাজ-প্রাসাদের মধ্যেই আমার ভ্রমে একটা শোবার ঘর পশ্চিম কোণে বেছেছিলেন, আমি উঠে সে ঘরে চোলে গেলাম । কিন্তু শরন করবার পূর্বে খদীকে একলাক দেখে এলাম । চকের মধ্যে প্রবেশ কোন্তে, ফটকের ডাইনে একটা ক্ষুদ্র চতুর্কোণ কামরা, নজফালী সেই কামরার মধ্যে বন্দী ছিল । যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা পাল্ল, দেখা-বাকর ঘা, সব ঠিক আছে, তার অস্ত্র চিন্তা কোববেন না । ঐ কথা শুনে

আমি আমার কামরায় গিয়ে শয়ন কଲেম, নিজার আবেশ হোরে চোখ কেবল বুজে আস্ছে, এই সময় অকস্মাৎ মুখের উপর একটা আলো দেখতে পেলেম, অমনি চমকে খড়মোড়িয়ে উঠে বোস্লেম, দেখি না কটি দ্বীলোক, তার হাতে একটা প্রদীপ, ঘাটের পারায় কাছে বোসে আছে, আলম্বিত ঘোমটার পা পর্যন্ত ঢাকা, সে যখন ঘোমটা সোরিয়ে মুখ বার কলমে, ঐ প্রদীপের আলোতে দেখ্লেম, নূরমহল বোসে আছে। আমি তারে দেখে “সোবারান্না” বোে টেচিয়ে উঠে বোল্লেম, “কে? নূরমহল না কি?”

নূরমহল বে , “হাঁ, আমিই বটে, আমি কিন্তু তোমার কাছে বুখা কথা ঠাঁকাটি কোত্তে, কি শুধু শুধু সময় কাটাতে আসিনি, আমার আসা সে জন্তে নয়। সাদক! আমি শপথ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আমি তোমাকে প্রতিফল দেবে তুমি কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা অম্ভা করাতে পারো, তোমার হাতে সে ক্ষমতা আছে।”

আমি বোল্লেম, “কেমন কৈ কোরে?”

সে বোলে, “পিতাকে যদি অব্যাহতি দাও।”

আমি বোল্লেম, “কি পাপ! তার তুমি সে কথা শুনেছো!” নূরমহল বোলে, “আমি সকল জানি, কিন্তু প্রথমবার যখন আসরে নাম্লেম, তখন কিছুই জান্তেম না, তার পর কিরে গিয়ে সব কথা শুন্লেম। এক্ষণে পিতাকে নিকৃতি দিবার নিমিত্তে তোমার কাছে আসা হয়েছে। নজফালী আগরায় কিরে গিয়ে আমার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তা হোলে কি হয়, তখাচ তিনি আমার পিতা, আমি তাঁর সন্তান, তাঁর জন্তে তোমার কাছে আমি অহুরোধ কোব্বো, মশ কথা কোরে লড়াইককড়া কোব্বো, সেটি সন্তানের ধর্ম, করা উচিত। সাদক! তাঁকে তুমি ছেড়ে দাও, তা হলে আর কখন উপধাটিকা হোলে তোমাকে বিরক্ত কোত্তে আসব না।

তুমি যদি আমার এই উপকারটি করো, তা হোলে দেলজান তোমারি হবে।” আমি বোল্লেম, “তোমাকে আর প্রলোভ দেখিয়ে প্রবৃত্তি দিতে হবে না, আমার উপর যে ধর্মতঃ তার আছে, তার অন্যথা কখনই কোত্তে পারব না, তোমার জন্তে মনে দুঃখ হোচে সত্য, কিন্তু তাই বোলে যে তাঁরে খালাস দেবো, তা কদাচ হবে না।”

নূরমহল বোলে, “চুপ কর, নিরস্ত হও, ও সকল কথা মুখে এনো না। শুনে আমি পাগল হয়ে যাব। সাদক, শুধু কথার কিছু হয় না, কার্য্য দেখাও।”

আমি বোল্লেম, “তুমি বলছো, তোমার পিতাকে যদি খালাস দি, তবে আমার দেলজান হবে, আঃ হতভাগ্য আমি! তারে দেওয়া আর না দেওয়া তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি কেমন কোরে সে বিষয়ের কড়ী হোলে? তোমার কথা আমি মানিও না, তোমাকে আমি ভয়ও করি না। যে পর্যন্ত আগরায় না পৌছি, তোমার পিতাকে কড়াকড় কোরে নজরবন্দী কয়েদ রাখবো।”

“আমার কথা তোমার বিশ্বাস হোচে না? আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে এসো, তখন তুমি নিঃসন্দেহ হবে।”

“আচ্ছা, চলো যাই।” মুখে এই কথা বোলে মনে মনে বোলে উঠ্লেম, “হাঁ করুণায় আল্লা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দেলজান যে এ ব্যক্তির হস্তগত হবে, তাও কি কখন বিশ্বাস হয়? যদি যথার্থই সেইটি ঘোটে থাকে, তবে তারে উদ্ধার না কোরে নিশ্চিত হবো না।”

নূরমহল অনেকগুলি ছোট ছোট সিঁড়ি পার হোয়ে নীচে লয়ে এলো। এ গলি দিয়ে, সে গলি দিয়ে অনেক পথ ঘুরে একটা লোহার ফটকের কাছে উপহিত হোলেম। নূরমহল দরজার গায় তিনবার ঠক ঠক কোরে ঘা মাল্লে, একটি লোক এলে দরজাটি খুলে দিলে, তার মত চেহারার লোক পূর্বে কখন দেখিনি; নূরমহল তার হাতে একখান মোহর দিলে, তাতেই অহুমান কোল্লেম, সে ব্যক্তি রাধ-

সংক্রান্ত কোন লোক হবে। আমরা এক্ষণে ভিতরে প্রবেশ কোলেম, এই শুভ-দ্বারটি দিয়ে কালীদেবীর মন্দিরের সন্মুখে সেই চতুর্ভুজ উঠানে এনে উপস্থিত কোলে। উঠানটি আন্তাবালের দক্ষিণ পাখে অবস্থিত। স্থানটি দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলেম। মনে কোলেম, রুধির-পিশাচী সেই করাল-দেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত সম্প্রতি এই স্থানে নরবলি হোয়ে গেছে। আন্তাবালের উঠান পার হোয়ে দ্বিতীয় সদর ফটকে উপনীত হোলম। তার পর সেই ক্ষুদ্র পাছা-ডাট প্রদক্ষিণ কোরে জয়পুরের প্রাচীন সহরে দর্শন দিলেম। নূরমহল কতকগুলি গলি, গলির গলি, তন্ত্র গলি পার হোয়ে একটা জীর্ণ ভগ্ন পোড়ো বাড়ীর সন্মুখে এসে দাঁড়াল, ঐ বাড়ীর দরজাটি অতি বৃহৎ, প্রকাণ্ড, স্থল এবং সর্বাঙ্গে লোহার কীল বসান, দেখে বোধ হলো, ঐ দরজাই বাড়ীটির বলশক্তি-সামর্থ্য। নূরমহল একধান পাথর লয়ে সেই দরজায় আঘাত কোন্তেই তখনি ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হোয়ে জ্বাল কবাট কঁক হোয়ে পোড়ল, একজন বৃদ্ধ দরওয়ান বেরিয়ে এলো, যুবতী নজ্জত-কথায় তাকে কি বোলে, তার পর সাক্ষাৎ যমালয়ের স্থায় একটি ঘোর তিমিরা-কর চাকর মধ্যে প্রবেশ কোলেম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে বোধ হলো, সেটি অতি ভয়ানক কুস্থান। এই সময় সেই বিরাট দরজাটি পুনরায় গোঁ গোঁ শব্দ কোন্তে লাগলো, শুনতে পেলেম, দরজাটি অবরুদ্ধ হলো, ভিতরদিক থেকে চাবী পড়লো, তারও ক্যাচ কৌচ শব্দ শুনলেম, আমি এক্ষণে বন্দী হোয়ে নূরমহলের কুপার তলে পোড়লেম। দেলজানের জন্তে চিন্ত এত ব্যাকুল যে, নিজের বিপদ একবার স্বপ্নেও চিন্তা কলেম না। নূরমহল কতগুলি ছোট ছোট খাপ দিয়ে আমার লয়ে চলো, একটা লম্বা গলি, রাস্তার বাঁয়ে একটা কামরা, সেইখানে এসে একটু দাঁড়িয়ে দরজার কাছে কান পেতে একমনে কি শুনতে লাগল। একটু পরেই আর একটা কামরা খা-

মেরে তার দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ভিতরে প্রবেশ কোন্তে বোলে। এক্ষণে ঘোর অন্ধকার, চারিদিক কালো মিশমিশ কোচে, সেখানে আর কেহই নাই, আমি একা, দরজাটি কিন্তু খোলা আছে, নূরমহল সেখান থেকে চোলে গেছে। ঘরটি মাটির দেওয়াল ঘেরা, আমি ঐ অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে সোরে গিয়ে সেই দেওয়াল খেসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটি আলো এসে চোকের উপর পোড়ল, আলোটি ঐ দেওয়ালের কাটা মুখ দিয়ে নির্গত হোচ্ছিল। কি অদ্ভুত কাণ্ডই চক্রে দর্শন কোলেম! সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখি, পাশের কামরায় কি স্ত্রী, কি পুরুষ তরফা-ওয়ালীদের সংক্রান্ত ভাব লোক হাত-পা ছোড়িয়ে সটান পোড়ে আছে, তবলা পাকো-রাজ প্রভৃতি বাজাবার সমুদয় আসবাব ঘরের এক কোণে ছড়াছড়ি কোরে ফেলে রেখেছে, তা ছাড়া একটা পুরান পা-জামা, যুজুর, রস-ঘের আসবাব, গোটাকরেক মদের বোতল সেই কোণে ধরা রয়েছে। বোতলগুলি খালি বোধ হলো, বারা সেইগুলি খালি কোয়েছে, মাতোয়ালো হোয়ে সেইখানে পোড়ে আছে। এই সকল কারখানা দেখে শুনে মনে মনে দারুণ ভয় হতে লাগল। কিন্তু যে জনৈ এ সকল অপেক্ষাও মহাকালভরে অন্তঃকরণ কেঁপে উঠল, সে শুদ্ধ একটি মূর্তি দর্শন কোরে,— দেওয়ালের উল্ট পিঠে ছিজের মুখেই এক-খানি সামান্ত কোচ পোড়ে আছে, নূরমহল ঐ কোচের উপর উবু হোয়ে পোড়ে সেই মূর্তিটির উপর ঝুঁকে রয়েছে, অনেক টানাটানি করাতে মূর্তিটা মাথা উঁচু কোরে বিছানার উপর উঠে বোসল। পাঠক! সে আকৃতিটি আর কেউ নয়, আমার প্রাণময়ী দেলজান। তার অবয়ব চিন্তেপোয়ে আমার নোপিত পর্যন্ত শুদ্ধ হয়ে গেল, দেলজান তখন ফুলে ফুলে কৌস কৌস শব্দে রোদন কোচ্ছিলেন। নূরমহল জানতে পেরেছিল যে, আমি সেই ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখছি, সে তাই দেলজানের দিকে অঙ্গুলি হেলিয়ে বা পা দিয়ে শুতো যাচ্ছিল, আমি মনে কোলেম, কতকগুলি কাপ-

ছের উপরেই লাগি মাছে, শেষে দেখি, সে কাপড় নয়, একটা বুড়ী, সে যখন আধা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে, চোক মুছতে মুছতে উঠে বোস্‌লো, দেখি না। সে পরামণিকের মা। তার পর নূরমহল সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি যে কামরায় ছিলাম, সেইখানে এসে বোলে, “এখন তোমার বিশ্বাস হয়েচে ত ?” আমি বিকটস্বরে বোলেম, “হয়েছে ! কিন্তু তোমার ক্রোধের ভাজনকে এই দণ্ডেই মুক্ত কোরে দিতে হবে ।” নূরমহল বোলে, “এখন পথে এসো, আমিও তোমায় ঐ প্রস্তাব কোরেছিলাম, আমার পিতাকে কারামুক্ত করো, তোমায় দেলজান মুক্তি পাবে ।”

আমি বল্লম, “আমার যদি নিজের বিষয় হতো, তা হলে তোমার কথা রক্ষা কোন্ডে পাষ্টেম, বাস্তবিক তা নয়, তোমার পিতা আমার বন্দীও নন, আমার আসামীও নন, তিনি আমীর জেমলার কয়েদী আসামী, সেই জনোই আমি তাঁরে ছেড়ে দিতে পারি না, তত নরাধম নই যে”—নূরমহল কথায় বাধা দিয়ে বোলে, “আচ্ছা, ঐ কথাই ভাল, তবে দেলজান যে ভাবে আছে, ঐ ভাবেই থাক, তুমি তাতে রাজি আছ তো ? যার নামে তোমার মুখে লাগ পড়ে, যে নাম আহোরাত্র তোমার জপমালা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যারে তুমি স্বপ্নে দেখো, সে এখন আমাদের নাচনেওয়ালী, তা ছাড়া”—আমি অমনি বোলে উঠলম, “চুপ করো, মুখ সামলিয়ে কথা কইও, আল্লার দিবা, তা কখনই হোতে দেবো না, তুমি এই দণ্ডেই তারে আমার কাছে এনে দাও, নচেৎ যে কজন মাতাল তোমার লগ্নে আছে, তারা সকলেই আমার তলোয়ারের কোপে পোড়বে ।” নূরমহল ঐ কথা শুনে উপহাস ভাবে হা হা কোরে হেসে বোলে, “আচ্ছা, তবে বাও, তাই কর গে, ঘুমন্ত ব্যক্তিদের কচু কাটা কোরে ওয়ার করো । কিন্তু সাদক ! তাতে তোমার লাভ কি হবে ? এ প্রাণী-ঘেরা বাড়ী থেকে বেঁচে যাবে কি করে ? সাদক ! একটু প্রবীণ হও, দুবিজ্ঞের

মত কুথা কর, আমি যে প্রস্তাব কোরো, তাতে তুমি রাজি হও ।”

“তা কখনই হবে না—” এই কথা বোলে নূরমহলকে ঠেলে ফেলে দৌড়িয়েম, ভাবলম যে ঘরে দেলজান আছে, ভেঙ্গে কোরে প্রবেশ করবো, ঐ সময় নূরমহল মিহি টানা স্বরে একবার শিশ দিলে, তার পর দেখি না, যে ঘরটিতে সকলে ঘুমিয়েছিল, সবলে রুদ্ধ হলো, আমি সেই অন্ধকার গলিতে একলা দাঁড়িয়ে, নূরমহল খল খল কোরে হাসছে, তারি শব্দ শুন্তে পাচ্ছি । তখন আমার চৈতন্য হলো, এখনও বিবেচনা করার সময় আছে, আপাততঃ কিকি কৌশল অবলম্বন করা উচিত, তাই ঠা দ্রুত লগ্নেদে

আমি বোল্লম, “নূরমহল ! তোমার মত যা আছে করো, আমার কিছু রাজপুত্রের ফিরে যেতে অসম্মতি দাও ।” অনুমান হলে, নূরমহলের ইচ্ছা ছিল না যে, আমার ও কথা সম্মত হয়, পুনরায় বোল্লম, “আমায় ছেড়ে দাও, আমি চোলে যাই, আমার পারিতোষ যদি না দাও, তোমার পিতার অনুরোধেও আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত । আমি আপনায় উপস্থিত থাকুলে তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারবো, কিন্তু সেখানে উপস্থিত না থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই মারা পোড়বেন, উদ্ধার ছেড়ে দেবার ক্ষমতা নাই যে, ছেড়ে দেব, সুতরাং আমি তা পারবোও না, তবে বেগে কয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা কোরে দিতে পারবো ।” এই কথা বলাতে নূরমহলের মন নরম হযো, সে আমাকে সঙ্গে কোরে সেই প্রকাণ্ড কটকের কাছে লয়ে গেল, তখনও একবার নূরমহল বোলে, তার কথায় যদি সম্মত হই, তবে দেলজানকে খালাস কোরে দিতে প্রস্তুত আছে । আমি বোল্লম, “না, না, তা কখনই হবে না । পাপীদসী ! তোমারই জিৎ ! যে যখন তোমার হাতে পোড়ছে, তখন আর দয়ার প্রার্থনা নাই, তুমি যে তারে দগা কোরবে, সে আশা দে যেন না করে ।” নূরমহল পুনরুক্তি কোলে না, দেলজানকে তুলে কটক খুলে দিতে বোলে, তার পর অঙ্গুলী

দ্বারা দরজা দেখিয়ে দিশ বোলে, “মৃত্যু ত  
বলং ভাল, তার অপেক্ষাও দলজানের অদূর্ভে  
অধিক আছে, সেটি তুমি স্বরণ রেখো।  
নির্দিয় পুণ্য! তুমি বিদায় হও, তুমি দেলজান  
জাহের উপযুক্ত পাত্র নও, তুমি কেবল আশ্র-  
চন্দ্র চিত্রকেই স্থপতি, তোমার হৃদয়ে প্রণয়-  
বসন্ত সত্ত্ব হইল না।” নূরমহল যখন এই  
প্রকার নিন্দা-মন্দ কোরে ভৎসনা করে,  
তখন যে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে কি কষ্ট  
হোচ্ছিল, সে তার কিছুই অংগত ছিল না।  
তব্বি আমি যে দেলজানের উদ্ধারের নিমিত্ত  
মনে মনে কত প্রকার মতলব কোচ্ছিলেম,  
তার ত কথাই নাই, সে কিন্তু তা অপেক্ষা  
কখন মনে করেনি। নূরমহলের নিকট বিদায়  
হোয়ে সরাসর রাজবাটি এ গিয়ে, গড়িমসি  
কোরে এখানেই ঘুরে বেড়াতে লাগ্লেম।  
যে পর্যন্ত শ্রভাতরাগের কনকচ্ছটার পূর্ব-  
দিক প্রকৃতিত না হয়েছিল, সে পর্যন্ত সেই  
ভগ্ন-বাড়ার দিকেই চক্ষু ছুটি নিয়োজিত  
ছিল। পাছে নূরমহল কি তার সঙ্গীদে  
যতো কেউ আমার দেখতে পায়, সেই  
সেই পাশের একটি বাড়ীকে প্রবেশ কোরে  
তার উপরে গিয়ে সুকিয়ে থাক্লেম। বাড়ীটি  
নিগাদপুরী, কেউ তাতে বান কোত্তো না।  
আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজান যে কারাগারে  
একা আছেন, সেখান থেকে বড় দূর নয়,—  
এত কয়েক মাত্র তফাত। ভাব্লেম, মুজ্জা-  
ওয়ালীদের আর তাদের লোকজনের গতি-  
প্রতি এইখানে বোনেই দেখতে পাবো,  
পরদিন প্রাতে তারা জয়পুর থেকে চোলে  
যায় কি না, জানতে পারবো। যদি যায়,  
কোন পথ ধোরবে, তাও স্থির কোত্তে  
পারবো। আমার মানস এই যে, তারা  
যেমন বাড়ীর বাহির হবে, আমিও অমন  
পেছনে পেছনে ছুটবো। সূর্য্য উদয়ের  
পূর্বেই সেই পুরাতন ভগ্নবাড়ীর সদর-ফটক  
যেন খুলে গেল, এইরূপ অশুভব হলো। তার  
পরেই একখানি বকলীপাড়ী বেগিয়ে গেল  
দেখতে পেলেম, তাতে বেশ খাসা একঘুড়ী  
বয়েল ঘোড়া ছিল। গাড়ীর পরদাগুলি খুব

কোসে টেনে বৈধে দিচ্ছে, গাড়ীখানি  
নিঃশব্দে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চোলে গেল।  
তার পরেই সেই এক রকমেরই আর একখানি  
গাড়ী বেরিয়ে গেল দেখ্লেম, তার পরেই  
মুজ্জাওয়ালীদের লোকজনেরা বেতো টাট  
খোড়ার উপর সোয়ার হয়ে চোলে গেলো,  
সকলের শেষে পরামাণকের মা একটি  
টাটুর উপর সোয়ার হয়ে টংগস টংগস কোরে  
চোলেছে। তারা বানকোটির রাস্তা ধোরে  
চলো, তাতেই বোধ হলো, আজমীর তাদের  
লক্ষ্যস্থল। দেখ্লেম, যখন দৃষ্টির বার হলো,  
তখন তাড়াতাড়ি কোরে রাজবাটির আশ্র-  
বল-বাড়ীতে গেলেম। আমার লোকজনেরা  
সেইখানেই ছিল, তখন বার জন মাত্র সোয়ার  
ঘুম থেকে উঠছে, এই বার জন সোয়ার লয়ে  
ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম,—বানকোটির অভি-  
মুখে দৌড়িলেম, এক ক্রোশ চোলে গিয়ে  
তরফাওয়ালীদের দেখতে পেলেম, তারা  
আস্তে আস্তে চিকুতে চিকুতে সটান এক-  
সমান চোলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে  
তারা আগে থাকতেই জানতে পেরেছে যে,  
আমরা পশ্চাতে পশ্চাতে আসছি। নূরমহল  
গাড়ীর পরদা উঠিয়ে দেখ্ছিল, আমি তার  
চেহারা দেখতে পেলেম। সোয়ারদের গাড়ী  
ঘেরে ফেলতে শুরু দিলেম। সেই সময়  
গাড়ীর ভিতর থেকে একটি মর্খভেদী বিকট  
চীৎকারধ্বনি আমার কানে প্রবেশ কোলো।  
নূরমহল তখন গাড়ী থেকে লাফিয়ে পোড়ে  
তার একটি সঙ্গীর ঘোড়ার উপর জাঁচড়ে  
পাঁচড়ে উঠে বসল। সেই সঙ্গীটি আমাদের  
অভিপ্রায় বুঝতে পেরে পূর্বেই ঘোড়া থেকে  
নেমে পোড়েছিল। নূরমহল জিনের উপর  
আছা কোরে এটে বোসে, সে যে তার রাগ-  
দেবচরিতার্থ কোরে আমার জঙ্গ কোরেছে,  
সেইরূপ হুট অহঙ্কারের ভঙ্গীতে আমার দিকে  
একটি চরম দৃষ্টিপাত কোরে, মহিবাতি ঘোড়া  
ছুটিয়ে দিয়ে সন্ সন্ কোরে তাঁরের জায়  
ছুটলো। আমি গাড়ীর নিকট এসে পর-  
দাটি তুলেম।—আহা! পরদাটি তুলে কি  
দর্শনই কোলেম!! রক্তের চেউ খেল্ছে,



দেলজান সেই রক্তশ্রোতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন, মৃত্যু-অঙ্গুষ্ঠানি বৃকের ভিতর পর্গান্ত প্রবেশ কোরে কাজলার স্তায় এঁটে বোসেছে! আমি যখন সেই শোণিতাক্ত নির্ভর অঙ্গুষ্ঠানি টেনে তুলেছি, তার তামাম গায় দেলজানের প্রাণাধার রুধির-বাল্পের ভাপ উঠছিল। তাই দেখে শোকে উন্নত হয়ে, “হায়! কি সর্বনাশ হলো! হায় কি সর্বনাশ হলো!” এই বোলে হাহাকার কোন্তে লাগলেম। কখন বা মর্মান্তিক অঙ্গুষ্ঠানায় খাসাবরুদ্ধ হয়ে গৌ গৌ শব্দে গোপরাতে লাগলেম; হায় হায়! এ কি ঘোরনিষ্ঠুর কারখানা! দেখে প্রাণ ফেটে যেতে লাগল, নূরমহল যথার্থই প্রতিগোধ দিচ্ছে। “হা—দেলজান! এ অভাগার প্রতি একবার চেয়ে দেখো!—কোথায় তোমার উদ্ধার করবো,—না আমি তোমার কালের স্বরূপ হোলেম!! দেলজান! তোমার সাদকের প্রতি একবার চক্ষু মেলে চেয়ে দেখো!” এক্ষণে তাঁর আসন্ন-মৃত্যু উপস্থিত, পূর্ণ ঘোর আবিল চক্ষু ফিরিয়ে অতি আন্তে আন্তে বোধ হয় না হয়, এইরূপ মূহুভাবে দেলজান আমার একখানি হাত চেপে কথা কবার চেষ্টা কোলেন। এই সময় তাঁর জীবনের আরক্ত-ময় শ্রোত সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতমুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে সবেগে নির্গত হোতে লাগল, আমরা সাধ্যমত বন্ধ করবার চেষ্টা কোন্তে লাগলেম, কিন্তু কোনমতেই বাগ মান্লে না, সে রক্ত-শ্রোত রহিত হলো না, আমাদের তাবৎ চেষ্টা বিফল হলো! হায়! সে চক্ষু দুটি এক সময় মনোহর উজ্জ্বল রাগে প্রফুল্লিত ছিল, তাতে এক্ষণে মৃত্যু-লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষিত হোতে লাগল, মুখকান্তি ত্রিহীন হয়ে বিবর্ণ হলো। বাঁচবার আর কোন আশা নাই। মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছিলেম না, ঝুঁকে ঝুঁকে নীচের দিকে পোড়ছিল, আমি শিরেরে বোসে হাত দিয়ে ধোরে রাখলেম, শোকে অধীর হয়ে চক্ষের জলে দেলজানের মুখমণ্ডল অভিষিক্ত কোন্তে লাগলেম। দেলজান আর নড়েন চড়েন না, ডাকলেও উত্তর দেন না! জান হলো, তাহাতে অবশিষ্ট যা কিছু

বলশক্তি ছিল, চরমে একবার ঝেঁকে উঠবেন বোলে তাঁর প্রস্থানোন্মুখ মহাপ্রাণ সেইগুলি ঘেন একত্রে জমা কোচ্ছিল,—দেলজান অন্তিম সময়ে কেঁপে উঁচু হয়ে উঠে আমার কোলের উপর এসে পোড়লেন!—চেয়ে দেখি,—জীবাত্মা প্রস্থান কোরেছে!! মৃতদেহের বোঝা কোলে কোরে কতক্ষণ পর্যন্ত যে অজান অচেতন হয়ে থাকতে হতো, সে কথা এক্ষণে কে বোলতে পারে! আমার সোনারেরা কিন্তু এসে বোলে, “দেলজান অনেক হয়েছে, বন্দী সেই রাজপুরীতেই আছেন।” ঐ কথা শুনে আমার চৈতন্য হলো। আমি অঙ্গুলি দ্বারা দেলজানকে দেখিয়ে দিয়ে বোলেম, “বন্দীর মেয়ের এই কাজ! তোমরা দেখো!!”

তারা সকলে একত্রে বোলে উঠল “তার সে মেয়ে খুনে!!” আমি বলেম, “তাই-ই বটে, আ! হতভাগিনী দেলজান! আ! আমি অভাগা সাদক! আমিই তোমায় খুন কোরেছি! আমিই তোমার কালের স্বরূপ হয়েছি!—নূরমহল! দিক্ তোরে! দিক্ দিক্, শতবার দিক্ তোরে!! পাপীন্দ্রী! তোর সঙ্গে যদি কখন আমার আলাপ-পরিচয় না হতো, তবে কি এ কাজ হয়? এক্ষণে এ অমৃত্যুতাপ করায় কি ফল; হায়! সে কাজ অনেকক্ষণ নিকেশ হয়ে গেছে!!!”

ভয়ঙ্করালীদেব দুই জন লোক, তারা বাজিয়ে, এ পর্যন্ত ঐখানেই ছিল। তাদের আরে কোনো অভিপ্রায় ছিল কি না, বোলতে পারি নে, তবে গাড়ীখানার আর বয়েল দুটির অহুরোধে তারা সেখানে থাকে। শোকাক্রপাত কি দুঃখাক্রপাত করে বলে, তারা তা জানে না, এই স্বভাবের লোক তারা।—কিন্তু দেলজানের মৃত্যু দেখে তারা পর্যন্তও দুঃখ কোন্তে লাগল; আর বোলে, “আপনি যা বোলবেন, আমরা তা কোন্তে প্রস্তুত আছি।” আমি গাড়ীখানি চাইলেম, ঐ গাড়ীতে কোরে দেলজানের মৃতদেহ জর-পূরে পৌঁছে দেবে। বিবেচনা কোলেম।

সেই স্থানেই তাঁর বিধানাবহ চরম সংস্কার  
নিষ্পন্ন করা হবে।—তাতে তারা স্বীকৃত  
হলো। দেলজান জীবদশায় যে সকল পব-  
নার অন্তর্ভুক্তি নী হয়ে থাকতেন, এক্ষণে  
সেই সকল পরদা তাঁর শবদেহের আবরণ  
হলো।—যে বাহনমধ্যে হাশু-কোতুকের  
উদ্ভাস কোলাহল দিবারাজি ক্ষতিগোচর  
হতো, সেই বাহন আজ তাঁর মৃতদেহে বহন  
করবার দোলা হলো! হা আল্লা! এ সকল  
ধটনা কি সত্য? না কেবল ভয়াবহ স্বপ্ন  
মাত্র? পূর্বে পূর্বে যে স্বপ্নটি আমি প্রতি  
নিয়তই দর্শন কোন্তেম, সেইটি এক্ষণে স্মরণ  
হোয়ে বোলেম, আহা, নূরমহল সেই কাল-  
সর্প, সব প্রথম আমার প্রাণময়ীর পায়ে  
কাছে কুণ্ডলাকার হোয়ে শুয়েছিল, তার পর  
সে মস্তুরুরূপ ধরে তার নিরপরাধিনী  
ক্রোধপাজীর বুকে ছুরী প্রহার কোলে,  
আমার সেই স্বপ্নটি প্রত্যক্ষ সফল হলো।  
এক্ষণে আমি জানশূন্য হোয়ে মুহম্মদঃ মোহ  
যেতে লাগলেম, উদ্ভাদ-প্রলাপ দেখতে  
লাগলেম, বাক্যের জড়তা হোয়ে আসতে  
লাগল, বাতুলের ছায় অসঙ্গত, অসঙ্গত কথা  
বোলেতে লাগলেম, বড় বড় ধর্মবিন্দু কপাল  
বেয়ে গোড়িয়ে পড়তে লাগল, মনে  
কোলেম, অক্ষপাত কোরে শোকপ্রবাহের  
মোহানা মুক্ত কোরে দেই, চক্ষে কিন্তু জল  
এলো না, আমার তাপিত প্রাণ নীতল হলো  
না। শোক, হুঃখ, লজ্জা, সন্তাপের একটি ভয়া-  
নক অগ্রিশিখা হয়ে, আমার অন্তঃকরণ ধু ধু  
কোরে জলতে লাগল। গায়ের বস্ত্রগুলি  
ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোলেম, খাঁস প্রায় অবরুদ্ধ  
হোয়ে এলো, নিখাস ফেলতে পাচ্ছিলেম না,  
হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠতে লাগলেম, প্রাণ  
আইটাই কোন্তে লাগল, এত সামর্থ্যহীন  
হোলেম যে, ঘোড়ার উপর স্থির থাকা ভার  
হলো, পুনঃ পুনঃ পোড়ে বাবার উপক্রম হতে  
লাগল। লোকজনেরা আমার ঐ শোকতপ্ত  
উন্নত অবস্থা দেখে ধরাধরি কোরে, আশে  
আশে ঘোড়া থেকে নামিয়ে রাস্তার উপর  
বসালে, জন করেক জল আনতে দৌড়িল,

জল আবার নিকটে ছিল না, অনেক কষ্ট  
কোরে আনতে হয়েছিল, এক নিখাসেই  
এক লোটা পবিত্র জল উদরস্থ কোলেম।  
শরীরের ভিতর জলে যাচ্ছিল, মনে কোলেম,  
তৃষ্ণা দূর হলে অন্তর্দাহের কতক প্রতা-  
কার হবে, তা কিন্তু হলো না, অনন্ত বিষ্মতি-  
রূপ বারি ভিন্ন সে মর্মান্তিক জ্বালা আর  
কোন জলে নিবারণ হবার নয়। জ্বালায়  
চোটে ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে পরদাগুলি  
ফাঁত ফাঁত কোরে ছিঁড়ে ফেলে একেবারে  
দেলজানের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পোড়-  
লেন। এই সময় অশ্রুবারি আমার সহায়  
হোয়ে দর্শন দিলে, মুহম্মদঃ জ্ঞান হলো, যেন  
দেলজান মরেন নাই, বেঁচে আছেন, কিন্তু  
অজ্ঞাবাহের ভয়ানক বিকট মূর্তি দর্শন কোরে  
আমার সে ভ্রম তখন দূর হলো। দেখলেম,  
ঘায়ের মুখ ফাঁক হোয়ে পোড়েছে, যেন হাঁ  
কোরে চেয়ে আছে, তার উপর থানা থানা  
রক্তও জোমে জমাট হয়ে রয়েছে, তাই দেখে  
ঘোর ভয়াবহ প্রকৃতাভাবা স্মৃতিপথে উপস্থিত  
হলো। এক্ষণে সেই অসহ্য শোক-সন্তাপের  
পরিবর্তে ঘোর ক্রোধের বশবর্তী হোলেম,  
প্রতিফলদানের প্রতিজ্ঞা কোলেম এবং  
খুনে নূরমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভি-  
সম্পাত কোরে লাগলেম। বাস্তবিক প্রকৃত  
উদ্ভাদ হোয়ে উঠলেম, মাটিতে ঘন ঘন পদা-  
ঘাত কোরে মুখে সহস্র সহস্র কিরে-দিব্যা  
কোন্তে লাগলেম, মাথার পাগড়িটা ছিঁড়ে  
টুকুরো টুকুরো কোলেম, রাশি রাশি বালি  
আর ধূলা মাথিয়ে মস্তকটি ভূষিত কোলেম,  
তৎকালীন দুঃসাহস কোরে যে স্তম্ভে  
আসতে লাগল, তাকেই প্রহার কোন্তে লাগ-  
লেম, আর কেবল কাতরতাপূর্ণ বিলাপ-স্বরে  
“দেলজান! দেলজান!” বোলে চীৎকার  
কোন্তে লাগলেম। ছুটি কোরে বলদ-ঘোড়া  
ছোট ছোট গাড়ীতে কতকগুলি রাহাগির  
ঐ পথ দিয়ে চোলে যাচ্ছিল, আমার লোক-  
জনেরা বিস্তর অহ্নয়-বিনয় কোরে ঐ  
পথিকদের নিকটে একখানি গাড়ী ধার  
চাইলে, সেই গাড়ী কোরে তারা আমায়



তারা আমার জিজ্ঞাসা না কোরে, খোঁজ কিসি কোরে কয়েদী আসামীকে লয়ে চলে এসেছে। তারা এই মনে কোরেছিল, আমি হয় ত অগ্নেই চোলে গেছি, সেটি কিন্তু তাদের মন্ত ভ্রম। বিবেচনা কোলেম, একটি ব্যক্তির পাহারার জন্তে ৫০০টি জোয়ান যথেষ্ট, কিন্তু তখান মনের উদ্বিগ্ন গেল না; কয়েদী আসামীর হেঁপাজাতের বিষয়ে ভারি সন্দেহ হোতে লাগল, অতিশয় অসুখী হোলেম। হাজার কাছে বিস্তর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে অনেক স্তব-ব্রতি কোরে তাড়াতাড়ি বিদায় হোলেম, অবশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লোরে জয়পুর পরিভ্রমণ কোরে শীঘ্র শীঘ্রই বেরিয়ে পড়ি লেম।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

“যেমন কর্ম তেমন ফল।”

আমরা ষোড়া ছুটিয়ে বরাবর একটানা চোলে যাচ্ছি, যে ৫০ লক্ষের কয়েদী আসামীকে লয়ে পারি দ্রুতগতা হোয়েছে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোচ্ছে না। তাই মনে বড় ভ্রাস হোতে লাগল। আমার লোকজনরা কিন্তু বারবার মনে কোরে বোলতে লাগল যে, “কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তারা অগ্রমাদে চোলে বাচ্ছে।” আমি কিং নিরুদ্বিগ্ন হোতে পারিলাম না, আমার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হোতে লাগল, বন্দীকে একটিবার আপন চক্ষু দেখবার নিমিত্ত লালায়িত হোলেম। সময় হয় হয়, এমন সময় দূর থেকে নিরীক্ষণ হোরে দেখিলাম, কতকগুলি সোয়ার কেশ পথ ছাড়িয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি কোছে, জনকয়েক আমাদের দিকে আসছিল, আসতে আসতে কি ভেবে কঠোরে একটা চক্র দিয়ে আমার ফিরে চালা, আমরা যেন শূন্যপঙ্কের লোক, এইরূপ ভাবটি তারা প্রকাশ কোলে। একবার একটি সোয়ার এত নিকটে এলো যে, ডাকলে ডাক শোনা যায়, আমার একটি

পার্শ্বের তারে দেখে চিনলে, সে তার আপনার সহোদর ভাই, এ ব্যক্তি বন্দীর সঙ্গে আগে চোলে এসেছে। আমি বোলেম, “এরা আমাদেরই লোক দেখছি, ওকে বড় কোরে ডাকো দেখি।” সে তাই ক্রোলে, টেচিয়ে ডাকতে লাগল। এইরূপ ডাকতে সেই পথভ্রান্ত, স্তব্ধ-চিত্ত, ব্যাকুলাত্মা সোয়ারটি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। আমি জিজ্ঞাসা কোলেম, “কয়েদী কোথা?”

“হজুর! সে পালিয়েছে, আমাদের কতক লোক মারা পোড়েছে, কতক আহত হোয়েছে।”

“বেশ হয়েছে! যেমন কর্ম তেমন ফল!। যেমন অহঙ্কার কোরে আমার ফেলে চোলে এসেছিলি, তার মতন ফল পেয়েছিস। বন্দী কি কোরে পালাল?”

“যার হজুর! সে দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন, একদল মাহীর আচম্কা আমাদের উপর এসে পোড়ল, তারা পল-পালের স্থান বিস্তর লোক ঘুটে এসেছিল। কয়েদী মনে জানতো যে, তারা অবশ্যই তারে রক্ষা কোত্তে আসবে, তাই তাদের দেখতে পেয়ে আসামী ষোড়া শুক তাদের দিকে ফিরে দাড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে আপনার নাম বোলে। মাহীরেরা সে আওয়াজ পেয়ে হো হো শব্দে আনন্দের করতালি দিতে দিতে নজফালীকে তাদের মধ্যে টেনে নিলে। আমরা চড়াও হোলেম, কিন্তু তাদের ভীরের মুখে বিষ মাখান, সন্ধানও অব্যর্থ, আমাদের অনেককে জমীতে শুইয়ে দিলে, বাকী লোক-জন ভক্ত দিয়ে যে যে দিকে সুরিধা পেলে, ছুটে পালাল, সব ছড়িত্ত হয়ে ছত্রাকার হয়ে পোড়ল। হজুর! চলুন দেখতে পাবেন, অনেকগুলি সোয়ার নিরুপায় হয়ে কতক সদর-রাস্তার উপর, কতক এদিকে সেদিকে ছড়াছড়ি হয়ে পোড়ে যোয়েছে, তাদের আর নড়বার ক্ষমতা নাই, তাদের ষোড়াগুলি টিহিহি কোত্তে কোত্তে দাপাদাপি কোরে ছুটে বেড়াক্কে, আর আপনাপনি কামড়া-কামড়ি কোরে কতবিকৃত হোচ্ছে।”

আমি জিজ্ঞাসা কোলেম, “মাহীরেরা কোন জাতি, কি প্রকার লোক তারা?”

সোয়ার বোলে, “তারা পুরুষাত্মক মনুষ্য ব্যবসা করে, তাদের এক প্রকার মনুষ্য বংশ বোলেই হয়। রাকপুতনা রাজ্য বেড়ে যে একশ্রেণী ছোট ছোট পাহাড় বরাবর একটানা চোলে গেছে, সেই পাহাড়ের মধ্যে তাদের বাস। নামমাত্র মুসলমান, বাস্তবিক তাদের কাছে কোন ধর্মেরই সমাদর নেই। ভীল নামে যে বংশ ভারতবর্ষের অন্ততম পার্শ্বতীয় দেশে বাস করে, তাদের সঙ্গে মাহীরদের বিস্তর সৌম্যদৃষ্টি, উভয়েই প্রায় একই বংশ, একই গোত্র। মাহীরেরা এত বলবান, আর তাই দলে এত পুঙ্গব, জয়পুরের ঠাকুরেরা তাদের ভয়ে সর্বদা কম্পমান।”

ঐ সকল কথা শুনতে শুনতে মাহীরদের সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানে এসে উপস্থিত হোলেম। দুই পর্তের মধ্যস্থলে একটি কন্দর, সেখানে বিস্তর কাঁটা-বন, আর বিস্তর জঙ্গল। তত প্রাণীর মৃতদেহ চক্ষে দর্শন কোরে আমার হৃৎকম্প হলো, নিকেশ দিতে হবে ভেবে আরও ত্রাস হতে লাগল। যে লোকের অহুসঙ্কানে আমার আসা, তারে প্রকৃত প্রস্তাবে গেরেপ্তার কোরেছিলেম, গেরেপ্তার কোরেও শেষে যে আমার হাত থেকে গোলে বেরিয়ে গেল, সে দুঃখ রাখবার স্থান নাই সত্য, আর তা মনে হোলেও বুক কেটে যায় সত্য, সে সবই সত্য বটে, তবে কথা এই যে, এই দুর্ঘটনা কিছুদিন পূর্বে হোলে বোধ হয় অতিরিক্ত মন্বাস্তিকই হয়ে দাঁড়াত, এক্ষণে কিন্তু ততখানি জ্ঞান কোল্লেম না। তার কারণ আর কিছু নয়, তখন না কি আর একটি বিষয়ের চিন্তা লয়েই মহা ব্যতিব্যস্ত ছিলেম, তাই আর এ চিন্তা মনে স্থান পেল না। বোড়ার উপর সোয়ার হয়ে আছি, চিন্তায় নিমগ্ন, নিশ্চয় জেনেছি যে, আগরায় পৌঁছিলেই কর্তৃপক্ষেরা মহাকুলিত হবেন, শুধাচ ভীত হোলেম না। লঙ্করদের একস্থানে একত্রে জমা কোরে দেখলেম যে,

আগরা থেকে যে ১২০০ জোয়ান আমার সঙ্গে আসে, তার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৫০ লোক আপাতত পাওয়া যাচ্ছে। পীড়িত আর আহত ব্যক্তিদের নিমিত্ত ডুলী আনিতে দেওয়া হলো। প্রথম যে গ্রামে পৌঁছিলেম, সেইখানে তাদের ছেড়ে দিয়ে বন্দীর বিষয় একটি একটি কোরে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা কোতে লাগলেম। তাদের বোল্লেম, “তোরা কেউ বোলেতে পারিস, যখন জয়পুরে বয়েদী বন্দী ছিল, তার সে ঘরে কেউ সাক্ষাৎ কোরে গিয়েছিল কি না?” এক ব্যক্তি কিরে-দিব কোরে বোলে, “না, কাকেও তার কাছে যেতে দেওয়া হয় নি, তবে এক ছুঁড়ী নাচনেওয়ালী বিস্তর হাতে পায় ধোরে বলাতে পাহারা ওয়ালা একখানি চিঠি লয়ে বন্দীর হাতে দেয়।” আমি বোল্লেম, “তবে তাই সে মাহীরদের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিল। নাচনেওয়ালী আর কেউ নয়, বন্দীর কন্ডা নুরমইল, সে তাদের সঙ্গে পূর্বে গোড়ে পিটে ঠিক কোরে রেখেছিল।” লঙ্করেরা এক্ষণে তাদের ভ্রম বুঝতে পারিল, কিন্তু সে বোঝাতে আর ফল কি, বিপদ বা হবার, তা হোয়ে চুকেছে। পূজের অছিলায় নাচনেওয়ালীর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে দেওয়া, কি আমি তাদের সরদার, আমি যখন সঙ্গে নাই, তখন খোদ হাকিমি কোরে বন্দীকে লোয়ে আগে ভাগে চোলে আসা, তস্তির যত লোক সঙ্গে ছিল, তার অর্ধেক বই বন্দীর হেঁপা-জাতের নিমিত্ত সঙ্গে না দেওয়া,—এইগুলি অসদত কাজিল চালাক করা হোয়েছে। যাই হোক, এক্ষণে কাজটি বড় বিরুদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছে, তারি উদ্বিগ্ন হোলেম, মনের সাধনা কিছুতেই হোচ্ছিল না, তবে কৈটো কৈটো বিন্দুপাতের জায় লঙ্করদিগের যথ থেকে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি প্রাজ্ঞল বাক্য নিঃসৃত হতে লাগল, তাই শুনে কতক সুস্থ হোলেম। তারা এই কথা বোলতে লাগল।

প্রথম সোয়ার।—কি করা যায় বল? সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভাই! অদৃষ্টই গোড়া জানুবে, সকলই অদৃষ্ট।

দ্বিতীয় সোনার।—সে কথা সত্য, প্রাজ্ঞনে  
যে লেখা আছে, তা হবেই। তা থেকে  
বিচার পথ নেই।

একটি প্রাচীন সোনার বোলে, “লজ্জা  
আমাদের খেয়ে কেলবে, আড়ে আড়ে গ্রাস  
করবে, এক্ষণে লজ্জার অধোবদন হোয়ে  
নৈরাশ্যের কোণে মুখ ঢাকবে হবে।”

তুর্ধ সোনার বোলে, “সে পাহারাওয়াল  
পথে লয়ে বন্দীর হাতে কেন দিলে? এ  
কাজ সে কেন, কোলে? আমি তার পিতার  
কবরের উপর থু থু দেবো।”

আর একটি স্বর বোলে, “তার বাপের  
মুখে কেন, তার মুখেই দাও না, সে তো আর  
বেড়ে নাই।”

আর এক ব্যক্তি বোলে, “আহ, গরিব  
বোঁদরা! ঐটিই তার অদৃষ্টে লেখা ছিল।”  
এ কথা বলতে সব বিবাদ মিটে গেল, ও কথা  
লয়ে আর কেউ উচ্চবাচ্য কোলে না।

আমার অদৃষ্ট বড় বিরুদ্ধ বোধ হলো, কেন  
না যখন যে কর্মে হাত দি, কোথা থেকে  
একটা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা অকস্মাৎ  
উদ্ভূত হোয়ে আমার সঙ্গে বাদবাদী  
কোরে আমার গমন-পথে আড় হোয়ে পড়ে।

বিষম ভুলে যে কি কোরে পার পাবো,  
এ দায় থেকে কিরূপে যে উদ্ধার হবে, তা  
বোলতে পারিনে। এক্ষণে আগরার প্রাচীর-  
গুলি দেখা যেতে লাগল। আমরা লিটপিট  
কোরে চোলে সহরের মধ্যে প্রবেশ কোলেম।  
আমীর শুনে তখন ডেকে পাঠালেন, আমি  
মানবদমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোলেম।

আমীর বোলেন, “তোমার বন্দীর সহজে  
কত কথাই শুনতে পাচ্ছি, তার তাৎপর্য কি?  
সে না কি পালিয়েছে, মহম্মদের দিব্য, ঠিক  
কথা বলে।”

আমি বোলেম, “হুজুর! দুর্ভাগ্যক্রমে সে  
দায় খুবই সত্য, আর তার জন্য আপনায়  
অহুগত সাদক যেমন হুঃখিত, তেমন আর  
কেউই নয়। বা বা ঘোটেছে, সে সকল  
খাণ্ডোপান্ত্র নিবেদন কোত্তে প্রস্তুত আছি।”  
দেখলেন, আমীর শুনে অমিচ্ছুক নহেন,

তাই নজকাগীকে ধোতে গিয়ে যে সকল কষ্ট,  
বির-বাধা ব্যাধাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে  
হয়েছিল, সে সকল বস্তান্ত্র আহুপূর্বক  
বোলতে শুরু কোলেম। আমীরের কি তত  
বৈর্য হলো না, তিনি বিরক্ত হোয়ে বোলেন,  
“ছোঃ! তুমি কি এখন হাত পক্ষাশেক এক  
গল্প কৈদে দিয়ে আমার সঙ্গে কোতুক কোত্তে  
বোসলে? কি প্রকারে সে গেরেস্তার হোয়ে-  
ছিল, সে কথা আমি শুনতে চাই না, তাই  
ধোরে আবার ছেড়ে দিলে কেন, সেই কথাই  
আমায় বলে।”

দেলজানের মৃত্যু উপলক্ষে আমার ভয়,  
ভ্রাস, হুৎকম্প, কণ্ঠস্থানে উপস্থিত না থাকে,  
তত লোকের প্রাণ নাশ এবং তদ্বিত্ত নজ-  
ফালীর প্রস্থান,—এতগুলি ঘটনা এক এক  
কোরে পুনরায় আদোপান্ত্র বর্ণনা করা  
আমার গক্ষে কঠিন পাঠ হয়ে উঠল। কিন্তু  
করি কি, ভারাক্রান্ত মন অন্তঃকরণে আহু-  
পূর্বক সকল কথাই বোলতে হলো।

আমীর শুনে বোলেন, “রাজপুত্র সে কথা  
আমায় পূর্বেই বোলে রেখেছেন। তিনি  
যখন শুনলেন, তাঁর প্রদত্ত কোজগুলি তোমার  
হস্তে সমর্পণ করা হয়েছে, তখন বোলেন,  
“তা বেশ হয়েছে, সাদক হতেই কার্য উদ্ধার  
হতে পারবে, তবে যদি কোন মেয়েমানুষ  
মধ্যবর্তিনী হোয়ে বাধা না দেয়, তা হোলেই  
মঙ্গল, আর যদি তাৎসে সেইটিই ঘটে, তবে  
নিশ্চয় জানবেন, আমাদের আর আগরাতে  
বন্দী দেখতে হবে না, আর যদি অর্ধেক  
লোকও প্রাণ লয়ে ফিরে আসে, তাতেও  
সৌভাগ্য মানা উচিত। যুবা! তোমার ওজর-  
আপত্তিগুলি আমি প্রামাণ্য কোত্তে পারিনো,  
তোমাকে যে কাজ কোত্তে বোলেছিলেম,  
তা তুমি কর নি, তোমার বিশ্বাস কোরে  
বড়ই নৈরাশ হতে হোয়েছে, তুমি আমার  
বিড়ঘনা কোরেছো; অতএব তোমায় চাই  
না, তোমাতে আর প্রয়োজন নাই। রাজপুত্র  
দারা শুনেন্ছেন, তুমি এসে পৌছেছ। তুমি  
আপনিই বোলেছো, এই দারাই তোমায়  
মেয়ে খেলবার নিমিত্ত দুইবার চলনা-চক্রে

কাদ বিস্তার করেন, তাই এক্ষণে তোমার পক্ষে উত্তম পরামর্শ এই যে, আর বিলম্ব না কোরে একেবারে সরাসরি ডেকামে চোলে যাও।”

এক্ষণে করি কি? লজ্জায় আর হুঁতাবনায় ত্যক্ত-বিরক্ত হোয়ে ইয়াসমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। ইয়াসমিন তখন আমীরের শরীর-রক্ষক হোয়ে অবস্থান কোন্তেন। আমার ছুবস্তার কথা শুনে বিস্তর খেদ, বিস্তর দুঃখ কোন্তে লাগলেন, বিশেষতঃ আমি যখন দেলজানের মৃত্যুসংবাদ বোলে নিজের দুর্গতি আর কষ্টের কথা অবগত কালেম, তিনি আর থাকতে না পেরে বাস্তবিক কৈদে ফেল্লেন, তাঁর ছুই চক্ষু বেয়ে বর্ষ বর্ষ কোরে অশ্রুপাত হোতে লাগল। ইয়াসমিন নজফা-লীকে আর তার পাপীয়সী কন্যাকে যৎপরো-নাস্তি গালাগালি দিতে লাগলেন, আর আমাকে আগরা থেকে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান কোন্তে পরামর্শ দিলেন। কেন না, তত পরি-মাণে ভাল ভাল সাহসিক সৈন্য মারা পোড়েছে শুনে দারা কোধে অগ্নি-অবতার হয়েছেন। এইক্ষণে পরামর্শ কোরেছেন, আমীরকে বোলে পাঠাবেন, তিনি আমাকে গেরেস্তার কোরে তাঁর হাতে যেন সমর্পণ করেন। প্রাণের মাসা, বড় মাসা, তাই ইয়া-মিনের পরামর্শমতেই আমায় চোলে হেলো। আগরা থেকে চোলে গেলে নিজের প্রাণও রক্ষা হবে, আর আমীরের পক্ষেও এই একটা গুজর হবে যে, আমি এখানে নাই, তাই তিনি হাজির কোরে দিতে পারেন না। সলিমানকে আর লুচার পরামা-নিককে সঙ্গে লোয়ে পুনরায় আমি আগরা পরিত্যাগ কোরে চোলেম। এত তাড়াতাড়ি কোরে বেরিয়ে পোড়লেম যে, রাজদরবারে কি মরণাচক্র চোলেছে, ইয়াসমিনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করবার অবসর হেলো না। বাস্তবিক আমি আপনার চিন্তা লয়ো ব্যস্ত ছিলাম, আরজজেবের কথা একটিবারও স্মরণ হয় নি। একটি উপযুক্ত আড্ডায় পৌছে ইয়াসমিনের নামে একখানি চিঠি

লিখে সলিমানের হাতে দিয়ে আগরার রওনা কোরে দিলেম, বিস্তর স্তবধতি কোরে লিখে পাঠালেম যে, আমীর জেমলা, দারা আর স্বয়ং বাদশাহ এরা একত্রে বোসে যে যে পরামর্শ, যে যে বন্দোবস্ত স্থির কোরেছেন, সেগুলি আমার লিখে অবগত করান। কেন না, সে সকল বিষয় অবগত থেকে আরজজেবের কাছে উপস্থিত হোলে, রাজপুত্র অকুপা কোরে আমার প্রতি অনাদর প্রকাশ কোরবেন। ইয়াসমিনের লিখিত নিয়ের পত্রখানি পরে সলিমান যথাকালে প্রত্যাগত হলো।

“আমার হৃদয়ের বন্ধু ধর্মবর সাদক!

ঈশ্বর-প্রসাদে ইয়াসমিন এই কথাগুলি লিখিতেছেন। সাদকের পক্ষে সময়মত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমীর জেমলা বাদশাহকে ঐখ্য-ময় তোজোকান্তির উপহার প্রদান করি-বার শ্রীমান লস্কর সংগ্রহ করিতে অগ্রযাত্রা করিয়াছেন। আমীর ঐ লস্করের সেনাপতি হইয়া গলকন্দা-জম্মার্ব রণধাত্রা করিবেন। পূর্বে বাদশাহ মনে কোরেছিলেন যে, কতক-গুলি সৈন্য কান্দাহারে পাঠাবেন, কিন্তু আমীর অনেক জেদ কোরে বলাতে সে মত এক্ষণে ফিরে গিয়াছে। আমীর এই কথা বুঝিয়ে বলিলেন যে, গলকন্দার হীরকপানির প্রতি অগ্রে দৃষ্টিদান করা আবশ্যক, কান্দাহার পার্শ্বতীয় দেশ, পরীত লাভ করিয়া কি ইয়া-পতি হইবে? প্রস্তাব অপেক্ষা হীরকের প্রতি অধিক গোবব এবং অধিক মাসা প্রদর্শন করা অবশ্যই কর্তব্য। এরূপ যুক্তি-প্রমাণ কথা বলাতে বাদশাহের মন শ্রম হইয়া আমীরের অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহের আরও কোন উদ্দেশ্য ছিল, তাই সম্রাট এই অছিলায় লস্কর সমবেত করিবার অবসর পাইয়া সমুদ্র হইয়াছিলেন। দারা অহ-কারে ফুলিয়া দিন দিন ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিতেছেন, এক্ষণে তাঁরে ভয় দেখাইয়া শাসন করিতে পারিবেন। তা বাহাই হোক, কলে এক্ষণে আমীর জেমলাকে সরদার করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফৌজ পাঠাইবার প্রস



মুখ হর হইয়াছে। রাজপুত্র দ্বারা, এতদ-  
প্রসঙ্গ বিপক্ষে ছিলেন। বাণ্ডবিক দাক্ষি-  
ণাত্যে ফৌজ পাঠাইলে কেবল তত পরি-  
মাণে সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁর ভ্রাতা আরজ-  
জ্জবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া বই আর  
কিছুই নহে। এ মর্শ্বটি কিন্তু দারা স্পষ্ট বুঝিতে  
পারিয়াছিলেন। দারার বাধা দেওয়াতে  
কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। তিনি যে  
সকল আপত্তি করিলেন, বাদশাহের মনে  
সেগুলি ধারণা হইল না। তথাচ সম্রাটকে  
বলিয়া কহিয়া আমীরের উপর কতকগুলি  
করাই-নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।  
প্রথম করার এই যে, এ যুদ্ধে আরজজেব  
অক্ষপেপ করিতে পারিবেন না, তাহাকে ক্ষান্ত  
থাকিতে হইবে। আরজজেব দৌলতাবাদ  
প্রভৃতি অল্পে বাস করিতে পারিবেন না। ঐ  
দৌলতাবাদে অবস্থানপূর্বক শুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের  
রাজ্যশাসনের ভার লইয়াই তাহাকে নিশ্চিন্ত  
থাকিতে হইবে। লস্করের উপর কোন প্রকার  
আধিপত্য করিতে পারিবেন না, তারা শুদ্ধ  
একমাত্র আমীরের অধীন হইয়াই থাকিবে,  
আমীর ভিন্ন অপর কেহই তাহাদের উপর  
প্রভুত্ব করিতে পারিবেন না। আমীরের  
পরিবারেরা এক্ষণে কারনাট হইতে আগ-  
রায় পৌছিয়াছে, দারা বলিলেন, আমীরের  
প্রভুত্বের জামিনের নিমিত্ত তাঁহার পরিবার  
শাজাহান বাদশাহের অরুণুরে বন্দীস্বরূপ  
বাস করিবেন। শেষের নিয়মটিতে আমীর  
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, যেহেতু, সেটি  
তাঁহার পক্ষে অতিশয় অপমানের কথা। বাদ-  
শাহ কিন্তু অনেক বুঝাইয়া বলিতে (জমলা  
শেষে সে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। সম্রাট  
বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, শুদ্ধ পুত্রের  
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্তেই এই নিয়ম  
লিখিত হইল, নচেৎ তাঁহার অস্ত্র কোন  
অভিপ্রায় নাই, বরং আমার যেমন বিদায়  
প্রার্থনা হইবে, তাঁহার পরিবারও  
সমন্বিত পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিবে।

আপাততঃ এখানকার বিষয়-কার্যের  
এই ত অবস্থা। সৈন্য সমবেত হইলে আমীর

সরদার-পদে অভিযুক্ত হইবেন, আর তিনি  
যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবেন, আমাকেও  
তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। তাই আশা  
আছে যে, তৎকালীন আমার জয়বান্ধব  
সাদকের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া চরি-  
তার্থ হইব। আর কি লিখিবার আছে যে,  
লিখিয়া জানাইব, তবে এক্ষণে জগদীশ্বরের  
নিবট এই প্রার্থনা যে, সাদকের সৌভাগ্য-  
রবি অগ্নির জায় প্রদীপ্ত হইয়া, তাঁহার ছায়া  
চারাচর পরিব্যাপ্ত হউক।”

এই পত্র পেয়ে ইয়াসমিনকে প্রাণ খুলে  
আশীর্বাদ কোত্তে লাগ্লেম, তাঁর কল্যাণে  
পূর্বোক্ত গুরুতর সংবাদটি আরজজেবকে  
বিজ্ঞাত কোত্তে সক্ষম হোলেম। তিনি যে  
তা শুনে কিরূপ আশ্বাদন করবেন, সেটি  
এক্ষণে বিবেচনা। কোরে উঠতে পাচ্চিনে,  
কেন না, রাজপুত্রের যন্ত্রণা আর অভিসন্ধি  
অতি অতলস্পর্শ, আমি ততদূর নিম্ন হোতে  
পারবো না। দারার সতর্ক চতুর ধূর্তমি  
বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি ত তাঁরে সাধুবাদ  
না দিয়ে ক্ষান্ত থাকিতে পাঞ্জেম না। আমীর  
আর তাঁর রাজভ্রাতা আরজজেবের উপর  
ততগুলি নিষেধের নিয়ম কড়াকড় কোরে  
লিখে লয়েছেন। বিশ্বাস এবং রাজভক্তির  
প্রতিভূতরূপ আমীরের পুত্র পরিবারকে  
রাজদ্বারে বন্দী রেখেছেন—এগুলি কম চাতুরী  
নয়। কিন্তু আরজজেব আবার তেমনি  
রাজধূর্ত। তিনি এমনি একটি কৌশলবার  
কোরবেন যে, তাতে কোরে ঐ সকল নিষেধ-  
ার্থক প্রতিবন্ধকগুলি কেটে গিয়ে পথ পরিদায়  
হোয়ে পোড়বে, তখন সেই সমুদয় রাজসৈন্য-  
গুলি আপনার দিকে টেনে আনবেন। যদিও  
জয়পুর সদর-রাস্তার ধারে নয়, তথাচ  
সেখানে একবার বাওয়াই স্থির কোলেম।  
ইচ্ছা হলো, একবার রাজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ  
কোরে আসি, আর সেই উপলক্ষে অপবা-  
দ-প্রাপ্তা দেলজানের কবরও দেখে আসতে  
পারবো। রাজা পীড়িত ছিলেন, তাই তাঁর  
সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। বাণ্ডবিক মর্শ্ব-কথা  
এই যে, তিনি অহমানে বুঝতে পেরেছিলেন,

বন্দী আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে যাওয়াতে আমি অপদস্থ হোয়েছি। কি পূর্বের মতন সঙ্গে কিছু লোকজন ছিল না, তাই হয় ত শুনে মনে কোরেছেন, এবার আর তাঁর সঙ্গে হীরে মুক্ত আনতে পারিনি তবে আর সাক্ষাৎ কোরে লাভ কি? এ যাত্রা রাজ-পুরীর মধ্যে স্থান না পেয়ে একটি পাহালায়ে অবস্থিতি কোলেম। পাহনিবাসটি একটি উজানের মধ্যে অবস্থাপিত। উজানটি কোপের মতন ছোট ছোট গাছে আর বড় বড় বৃক্ষে পরিপূর্ণ। অনেকগুলি ঘোয়ারাও সেখানে বিরাজ করছিল। এই সকল ঘোয়ারার জলে বাগানটি সজীব থাকত। তার মধ্যে একটি ঘোয়ারা পাহালায়ার সম্মুখেই ক্রীড়া কোচ্ছিল। তৎকালীন সেখানে আমার জায় আরও বিস্তার পথিক সমবেত হোয়েছিল। আমার একটি কামরা দেখিয়ে দিলে, আমি সমাগত মহাত্মাদের মঙ্গল কামনা কোরে সেই কামরার গিরে বোস্লেম। আমি কে, অনেকে এই অল্পসন্ধান বোতুকী চক্ষু ফিরিয়ে আমার চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। সলি-মান রসুই কোলে, আমি গোটা কয়েক ভাত নাকে মুখে দিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়লেম—আমার প্রিয়তমার সমাধিস্থান দেখতে চোলেম। ঐ সমাধির অতি অদূরেই একটি মসজিদ ছিল, সেই মসজিদের পার্শ্বেই একটি বৃদ্ধ পীরের আন্তান। বৃদ্ধ ফকীর কব-রের চারিধারে ফুলের গাছ বোসিয়ে স্থানটি সুশোভিত কোরে রেখেছিলেন। তাঁর মেহ-ময় কৃপাপূর্ণ হস্তের প্রসাদে গাছগুলি সতেজ হোয়ে উঠেছিল। এই স্থানে আমি আর্ন্তনাদ কোরে শোকস্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিলেম, সেই সময় অন্ধকার কক্ষপক্ষ বিস্তার কোরে আমার চতুর্দিক আবরণ কোল্লে। আমি বাসবনের উপর বোসে ছিলেম, উঠে পুমকীর সেই বাগানে চোলে গেলেম। গিরে দেখি, বত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, আর বত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উপাসনামত আমাদের দেশটিকে আশ্রিত কোরে রেখেছে, সেই

সকল বিষয় লয়ে আমার সহপথিকেরা বাসবানুবাদ শুরু কোরে দিয়েছেন। ঐ পাহালায়ে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন, কি জানি, কারও মুখ দিয়ে পাছে কোন অসন্ত বা অপ্রিয় কথা বেরিয়ে পড়ে, তা হোলে কেউ না কেউ ক্ষুব্ধ হোতে পারেন, তাই সকলকেই সতর্ক হয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর কোত্তে হাখেছিল। আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোত্ত দেখে একটি বৃদ্ধ মুসলমান সেলাম কোরে বোলেন, “বিদেশী! আমরা হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র লয়ে বিচার কোত্তে বোসেছি। মহাত্মা পরমেশ্বর যে শাস্ত্র আমাদের প্রদান কোরেছেন, হিন্দুর শাস্ত্রের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছি। দলের মধ্যে যে কজন ইসলামের মতাবলম্বী আছি, আমরা সকলেই ঐক্য হোয়ে এই কথা বোলছি যে, অপবিত্রতা আর কথিরপাত এই দুটি অগুরুষ্ট ভিত্তির উপর হিন্দুধর্মের পত্তন হোয়েছে এবং সেই জন্তেই ঐ হিন্দুরা আমাদের অপেক্ষা অতিরিক্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকেন, আর সেই জন্তেই তাঁদের স্রীলোকেরা চির-অনাথিনী হোয়ে দিনপাত কোত্তে বাধ্য হয়। বিশেষতঃ তাদের সম্মুখে স্বামী যদি ইহসংসার পরি-ত্যাগ করে, তবে ভয়ঙ্কর করাল মৃত্যু মুখে তাদের প্রাণবিসর্জন কোত্তে হয়, তেমন বিকট কালমৃত্যু আর যে কুত্ৰাপিও দেখা যায় না, সে কথা হিন্দুরা অস্বীকার কোত্তে পারেন না। কিন্তু কি পরিতাপ, তখাচ তারা বোলে বেড়ায় যে, তারা যতই নিষ্ঠুর লোক, তবু আমরা না কি তাদের অপেক্ষা অতি-রিক্ত নিষ্ঠুর—একপে অপনার কি যত?”

আমি বোল্লেম, “আমি ধর্মাত্মক নই, বীর ধর্মের গৌরব কোরে অল্প ধর্মের ঘেব করি নাই। আমার যেটি দৃঢ় বিশ্বাস, যা স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি, আর যা স্বয়ং ভোগ কোরেছি, তাই বোলবো, — ইসলামের মতাবলম্বীরা যেরূপ বোর পাহালা, হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ পাহালায় কথা প্রবণ করি নাই।”

বৃদ্ধ মুসলমান বোল্লেম, “মুখে বোল্লে ত হয় না, একটা প্রমাণ দেখিয়ে দাও।”

দাউদা খাঁর প্রতি বেরূপ নির্দিষ্ট ব্যবহার  
হয়, আমি সেই প্রমাণ উদ্ধার কোরে দিয়ে  
বোলেম, “তঁার জিবটি টেনে ছিঁড়ে ফেলে  
দিয়েছে, চক্ষু দুটি খুঁড়ে-বার কোরে লয়েছে।”

তার একটি মুসলমান বোলে, “ঐ একটি-  
টা প্রমাণ দেখিয়ে সমুদয় মুসলমানকে অপ-  
রাধী করা সুক্তিসঙ্গত নয়।”

আমি বোলেম, “আহা! কবিরশিষ্য  
গুরুদেবের যে একটি গল্প শুনেছি, আমি  
সে গল্পটা বলি, শুনে আপনাদের হৃৎকম্প  
হবে, গায়ের রক্ত শুক হোয়ে যাবে।”

শবিকদের মধ্যে কেউ ঢোকে ঢোকে,  
কেউ চুপকে চুপকে কাকি পান কোচ্ছিলেন,  
কেউ তামাক সেজে নল মুখে দিয়ে ভড়-  
ভড় কোরে টানছিলেন, কিন্তু কারও মুখে  
কথা নেই, সকলেই নীরব গোয়ে ছিলেন। ঐ  
কথা শুনে তাঁরা বোলে উঠলেন, “গল্পটি  
আমাদের বলুন।”

গুরুদেব বোসে বন্ধুর মুখে যে উপা-  
খ্যানটি শ্রবণ করি, তাই অল্পপুঙ্খিক বর্ণনা  
কোরে বোলেম। শুনে সকলেই বোলেন,  
গল্পটিতে বেরূপ পাষণবৎ নির্দয়তার প্রমাণ  
রয়েছে, যে কোন মুসলমান হোক, তা শুনে  
তাকে লজ্জিত হওয়া উচিত। যে বৃদ্ধ মুসল-  
মানটি প্রথম সন্দেহন কোরে আলাপ করেন,  
তিনি বোলেন, “কৃতুব যে নির্দয় ছিল, সে কথা  
মান্য, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র ত আর তাকে  
নির্দয় হতে উপদেশ করে নি। শোণিতপ্রাবে  
প্রক্লিষ্ট হতে হিন্দুদের শাস্ত্রই যে উপদেশ  
করে। দেবদেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত নরবলি প্রদান  
কোরে তাদের বেদেই যে লেখা আছে।  
যথাক্রমে নিকোঁথ যাজ্ঞদীপকে রথচক্রের নীচে  
ফেলে দিয়ে চূর্ণ করা, বিধবা স্ত্রীলোককে জলস্ত  
অগ্নিতে দগ্ধ করা, সাগরে সন্তান নিক্ষেপ করা  
ইত্যাদি পাষণ্ড ব্যবহার তাদের শাস্ত্রেই যে বিধি  
আছে। এতদিন তাদের আর একটি ভ্রম অতি  
চমৎকার। সকলেই মনুষ্য, মনুষ্যের স্বভাব  
প্রকৃতি সকলেতেই একরূপ বিদ্যমান আছে,  
তথ্যচ হিন্দুরা ব্রাহ্মণকে স্বয়ং জগদীশ্বর জ্ঞান  
করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিও সেইরূপ

প্রদর্শন কোরে থাকে। তা যা হোক, সংপ্রতি  
বারাণসীতে একটি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে  
গেছে, তেমন অপূর্ণ ঘটনা পূর্বে কেউ কখন  
দেখেও নাই, শোনেও নাই। আমি সেই গল্পটি  
বোলেছি, শুনে বুঝতে পারবেন, সেটি কিরূপ  
ভয়ানক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন।”

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সতী।

হিন্দুশাস্ত্রি বোস।  
সং: শুভনি,  
পো: শুভনি,  
জেলা বর্ধমান।

নিশান-পতাকা উড়ছে, ডকা পিটছে, তুরী-  
ভেরীর হর্ষ প্রক্লিষ্ট আনন্দ নিনাদ হোচ্ছে,  
ঢাক ঢোল জগজাম্পর নিরবচ্ছিন্ন কড়কড় বড়-  
বড় রবে কর্ণ বধির কোচ্ছে। ঝাঁজ ঘটা  
মন্দিরে করতাল প্রভৃতির থন্ থন্ থন্ থন্  
শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বহুধরের  
কোলাহল এককালীন নিনাদিত হোয়ে বায়ু-  
মাগর উন্নত কোরে তুলেছে। চতুর্দিকে ধক  
ধক কোরে মশাল জ্বলছে, আলোর আলো  
হোয়ে পোড়েছে, আলোর চক্ষু বসুন্সে যেতে  
লাগল, সে দিকে চাওয়া যাচ্ছিল না। বারাণ-  
সীর গলি ঘুঁজগুলিও মশালের জ্যোতিতে চক্  
চক্ কোত্তে লাগল। কি ধনীর জয়কাল অষ্টা-  
লিকা, কি দীন-দুঃখীর মলিন-হুটীর, আলোর  
মূর্ত্তি সর্বত্রই সমান পরিভাররূপে দেখা  
যাচ্ছিল,—এই সকল আনন্দাভরণ পরিচয় দিয়ে  
জ্ঞাত করালে যে, বর বিবাহ কোত্তে চোলেছে,  
তাই এই সমারোহ। এত লোক কার কল্যাণ  
প্রার্থনা করে? তারা কার মঙ্গলের নিমিত্ত  
দেবতাদের কাছে স্তবস্তুতি কোচ্ছে? যুবা  
রঘুনাথ ব্রাহ্মণের জয় হোক, তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী  
জয়ার জয় হোক—এই শব্দ কোরে এক এক-  
বার বোর চীংকার কোরে উঠছিল। রঘুনাথ  
একটি হৃদয়বর্ধসদৃশ স্বৈত অখের উপর সোবার  
হোয়ে চোলেছেন, অখটির কপাল, গলা, গলার  
চতুর্দিক ভাল ভাল বিশকিম্বতি রঙ্গে সাজান,  
হীরে-মুক্ত-খচিত, উত্তম কাবুচোব বস্ত্রে মাথাটি  
ঢাকা, অখটি যেন সেই অহঙ্কারে মধ্যে মধ্যে

ষাড় নেড়ে গর্ষ প্রকাশ কোচ্ছিল। পায়ে নিরেট সোনার মল, সে সেই গোরবে যেন থমকে থমকে চোলেতেছিল। ঈর্ষাভাজন রঘুনাথ হিন্দুস্থান দেশ-প্রসিদ্ধ প্রভাপুত্র ঐশ্বর্য্যাদ্বয় বিস্তার কোরে মহা সমারোহে শিউরামের বাটীতে চোলেছেন—শিউরাম তাঁর বাগদত্তা মনোময়ী পত্নী জয়ার পিতা।

তরুণ বর আলোর উজ্জ্বল কান্তিম্রোতের মধ্য দিয়ে চোলেছেন। তিনি যখন কন্ডার বাটীতে এসে পৌঁছিলেন, সেই সময় রেয়ো, ভাট, কাকালী, নাগা, তদিদার প্রভৃতি দলল বেঁধে তাঁর চারিদিক ঘেঁরে দাঁড়াল। রঘুনাথের জয় হোক, যুবা দীর্ঘ-জীবী হোক এই আশীষ-বাক্যের কোলাহল কোরে, লম্বা লম্বা আশীর্বাদে ছড়া কাটাতে লাগল। সমারোহ যত বাড়ীর নিকট হোচ্ছিল, জয়ার মন ততই অস্থির হোয়ে উঠছিল।

বিবাহ-সমারোহ শিউরামের বাড়ীর সদর দরজা পর্য্যন্ত এসে সেইখানে দাঁড়াল। এই সময় ঘন ঘন হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দের তুফান উঠল। রঘুনাথ অধ থেকে নেমে যেমন দরজার উপর পা দিয়েছেন, অতি জিগ সুরে তুরী ভেরী প্রভৃতি নানা বাজ্য বাজতে সুরু হলো। কন্ডা সম্প্রদানের নিমিত্ত একটি ঘর সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। নিরীহস্বভাব জয়ার পিতা শিউরাম সেই ঘরে আপনার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বোসলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, আচার্য্য-পুরোহিতে ঘরটি ভোরে গেল, তারা চারিদিকে ঘেঁরে বোসল। ঘরের একদিকে বরের নিমিত্ত হীরা মুক্তা প্রভৃতি নানা উপাদানে বহু মূল্যের দান সাজান রয়েছে, অপর দিকে বরের সমাদরের যোগ্য লওয়াজিয়া জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখা হোয়েছে। যুবা অপূর্ব মনোহর ভদ্রীভে, ধীরে ধীরে, সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোলেন। তাঁর আগমনে প্রফুল্লচিত্ত শিউরাম উঠে দাঁড়িয়ে একটি সুদীর্ঘ আশীর্বাদ পাঠ কোরে বরকে, সাদরে আশীর্বাদ কোলেন। রঘুনাথ অতি প্রকার সহিত আশীর্বাদটি গ্রহণ কোলেন, তাঁর পর জয়া কোথায় বোসেছেন, তাই বাগ্ন হোয়ে চঞ্চল-মননে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোন্তে

লাগলেন। পাত্রীকে সে সময় দেখতে না পেয়ে রঘুনাথের মনে মনে ইচ্ছা যে গিজাস! করেন জয়া কোথায়, তাই এখানে দেখছিলেন কেন কিন্তু ততদূর পেরে উঠলেন না। যেমন ন মন্ত্র প্রভাবে আবদ্ধ হোয়ে পোড়তে হয়, সেই রূপ শাস্ত্র উক্ত যারপর যে ব্যবহার, তা তাঁকে কোন্তেই হবে। তাই রঘুনাথ কোনও কথা বার্তা না কোয়ে, একেবারে কুশাসনের উপর গিয়ে বোসলেন। হিন্দুর মতে কুশের আসন অতি পবিত্র। রঘুনাথ আচমন কোরে, একটি ক্ষুদ্র মন্ত্র আবৃত্তি কোলেন। আর একবার কুশাসন লয়ে, “যে আমার শত্রু, তাই দেব পায়ে নীচে ফেলে মর্দন করি, সেইরূপ এই কুশাসনখানি পায়ে নীচে ফেলে বিদগ্ধ কোচ্ছি” এই কথা বোলে রঘুনাথ যেমন সেই কুশাসনখানি পায়ে তলে রেখেছেন, এমন সময় আশ্রয়গরিমায় অন্ধ মোরোবা ব্রাহ্মণের মূর্তি সম্মুখে এসে দাঁড়াল। পূর্বে ঐ মোরোবা আপন পুত্রের সঙ্গে জয়ার বিবাহ দিবার প্রাণন করেন, কিন্তু শিউরাম তাঁর সে প্রার্থনার শোণন করেন নি। মোরোবা দুই চক্ষু আরক্ত কোরে কুটিল ব্রাহ্মণের সঙ্গে অধর দংশন কোন্তে লাগলেন। তাঁর হস্ত দুখানি কোণাকোণি হোয়ে, বৃকের উপর ভাঁজ করা ছিল। দেহ হিংসাজাত-মৃশংস ক্রোধে বিবময় প্রভাবে, তা সর্কশরীর গেন ছটফট কোচ্ছিল, যেন বেক তেড়া হোয়ে মুচড়ে পাক দিয়ে, বেঙচে পোড় ছিল। রঘুনাথ জানতেন, মোরোবা তাঁর পর শত্রু, যেমন তেমন নয়, তাঁর একটি মহা কাল শত্রু, অতএব তাই পায়ে নীচে ফেলে, দোলে মোলে জফ করা সহজ কথা নয়, সেটি অসাধ্য নীয়। বিশেষতঃ রঘুনাথ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সময় মোরোবার সেখানে উপস্থিত হওয়া ভালোর লক্ষণ নয়, বরং উলটে আরও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা দেখছিলেন। ভাবলেন, না জানি আজ অদৃষ্টে কি বিড়ঘনাট আছে। যাই হোক, রঘুনাথ কাঁপতে কাঁপতে শাস্ত্রকর্মগুলি শেষ কোন্তে লাগলেন, সেগুলি অল্প নয়, বোক্তে বোক্তে তাঁর মাথা ধোরে গেল। রঘুনাথ যখন আচমন করেন,

দুই হাত ধর ধর কোরে কাপতে লাগল, কেন না, তখনও মোরোবার আকৃতিটি পূর্ণের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে, অধিকন্তু চক্ষু দুটি রঘুনাথের উপর স্থির কোরে রেখেছিলেন। যে পর্য্যন্ত বংশাশ্রয় জয়ার সম্প্রদান না হোয়েছিলো, সে পর্য্যন্ত মোরোবা ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একদিকে পুরোহিতেরা মন্ত্র পাঠ কোচ্ছেন, সেই অপর সেরে যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি সম্মুখ প্রেমাতুরাগের দৃষ্টিপাত কোর্তে লাগলেন। হিন্দুর বিবাহে যাদের সম্বন্ধে ঐ উৎসব, অর্থাৎ যে বর কোনের বিবাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই নিঃস্নেহ উদাসীনতাই দেখা যায়, কিন্তু এ বিবাহে সেরূপ ঔদাসীন্যরূপ দেখা গেল না। এ বিবাহে বর কোনে উভয়েই উভয়ের মনের ভাব বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, আর উভয়ের মনেই বেশ অবগত ছিলেন। তার তাৎপর্য্য এই, শিউরাম নাকি রঘুনাথের অভিভাবক ছিলেন, তাই বরের বিষয় কন্ডার, আর কন্ডার বিষয় বরের এত জানা ছিল, আর সেই হেতু উভয় উভয়ের রীতি-চরিত্র ব্যবহার এত অবগত ছিলেন যে, এতৎ-পর্য্যন্ত বর কোনের সম্বন্ধে নীরব ব্রত বা বিরাগ উৎসবের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় নি। অল্প তাও নয়, এ বিবাহে রঘুনাথ পবিত্রমন হোয়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে, অকপটচিত্তে, এক একটি কোরে শপথক সমুদয় বাক্য উচ্চারণ দৃঢ়ক ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞার অঙ্গুগত হোলেন। শিউরাম জয়াকে প্রাণের অধিক স্নেহ কোন্তেন, তাঁর সে স্নেহ অতি অকৃত্রিম এবং ভাগীরথীর নারসদৃশ অতি নির্মল। কতক সেই পিতৃ-স্নেহের প্রসাদে, কতক সাদাত্মা শিউরামের প্রতি রঘুনাথের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত এ পরিণয়ে বর কোনের মধ্যে পরস্পরের নীরস িঃস্বার্থক উদাসভাব দেখা গেল না। জয়া স্নান কোরে পবিত্রা হোলেন, অপর একটি ঘরে হোম, যাগ, অগ্নি-সংস্কারাদি বহুতর শাস্ত্রক্রিয়া সমাপন হলো। তার পর জয়া যখন একখানি উৎকৃষ্ট স্তম্ভ পট্টবস্ত্র পরিধান কোরে দাঁড়ালেন, তাঁরে দেখে মানবী জ্ঞান হলো না, বোধ হলো, একটি দেবকন্ডা যেন স্বর্ণ থেকে নেবে দাঁড়া-

লেন। হাতের কবজা, অঙ্গুলী, বাহু, কর্ণ আর গলা সোনার এবং ভাল ভাল দামি হীর। যুক্ত চুম্বির সর্ব্ব অলঙ্কারে বিভূষিত। পায়ে রত্ন ভারি রূপোর মল। অঙ্গুলি কুসুমদামে বিনিমে চুলগুলির পাট করা হোয়েছে, দেখে বোধ হলো, কেশর সঙ্গে চুলগুলি যেন স্তবকে স্তবকে সাজিয়ে রেখেছে। পশ্চাতে ধোঁপা, স্বর্ণ-তারে জড়িত, তার মধ্যে মধ্যে হীরের চুম্বকি বসান। সেগুলি নক্ষত্রপুঞ্জের স্থায় প্রভাপুঞ্জ বিকসিত কোচ্ছিল। এক্ষণে শাস্ত্রমত বিবাহের শেষ অঙ্গটি পূর্ণ হোলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, সেইটি শেষ হোলেই বিবাহও শেষ হয়। আর কিন্তু তা রহিত হবারও নয়। সেই চরম অঙ্গটি শেষ করবার নিমিত্ত রঘুনাথ জয়ার হস্ত ধোরে যখন বিবাহের ঘরে লয়ে বান, সেই সময় বালা তাঁর কৃষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু দুটি কেবল রঘুনাথের উপরেই স্থির অচঞ্চল কোরে রেখে-ছিলেন। পুরোহিতেরা জয়াকে লয়ে, রঘুনাথকে বেড় দিয়ে, বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ কোন্তে কোন্তে চক্রাধারে ফিল্ডে লাগলেন। ছয় পাক ঘুরে এসে যখন তারা সপ্তম পাক ফিরবে, সেই পাক হোলেই সাত পাক হোয়ে বিবাহ সিদ্ধ হবে, সেই সময় জয়ার নবীন কোমলাঙ্গ ধর ধর কোরে কঁপে উঠল, বালা অমনি তাঁর শ্রিয়-তম রঘুনাথের কোলে মুচ্ছিতা হোয়ে পোড়-লেন। সভার মধ্যে মহা গোলমাল হোয়ে উঠল, সকলেরি ভয়ে হৃৎকম্প হোতে লাগল। রঘুনাথও ঠক্ ঠক্ কোরে কাপতে লাগলেন। কন্ডার পিতা কোনো অজ্ঞাত কারণের আশঙ্কা কোরে চম্কে চম্কে উঠতে লাগলেন। রঘুনাথ জয়ার মুখে মুচ্ছার হেতু শোণবীর জন্তে অনেক চেষ্টা কোলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা নিফল হলো, জয়ার তখন কথা কবার ক্ষমতা ছিল না, কেবল অঙ্গুলী দিয়ে একটি লোককে দেখিয়ে দিলেন, ঔদাস্ত বশতঃ রঘুনাথ এ পর্য্যন্ত তার আকৃতির প্রতি চেয়ে দেখেন নি। তিনি এক্ষণে ষাড় কিরিয়ে দেখেন যে, খর্ব্বাকার শব্দর বামনের কদাকান্ত মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে। শব্দরকে দেখে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে অপর পথ দিয়ে চোলে যেতো।

স্রীলোকদের ত কথাই নেই, পুরুষেরাও তাঁরে দেখে পাশ কাটিয়ে অস্থানিক দিয়ে গ্রহণ কস্তো। জিজ্ঞাসা কোলে কি পুরুষ কি যেনে, কেউ বোলতে পাঠো না যে, কেন তারা সে দৃষ্টতঃ নিরীহ বামনকে অবস্থণা করে। তা যাই হোক, বিবাহের আসরে শঙ্করের আগমনটি লোকে যে অকল্যাণ জ্ঞান কস্তো, সেটি কিন্তু সত্য কথা। তার সমাগমে হয় বর, নয় কন্যা, যে হয় একজনের আশু মৃত্যু হবেই হবে। তাও যদি না হয়, একটা যে মহা বিপত্তি ঘোটবে, তার আর সন্দেহ নাই,—সকলেরই এই সংস্কার ছিল। জয়ার অবয়বে আতঙ্ক লক্ষিত হবার কারণই সেই। রঘুনাথ সমাদরে মধুরবাক্যে শাস্ত্রনা কোত্তে লাগলেন, শিউরাম কত প্রকার কোরে বোঝাতে লাগলেন, পুরোহিতেরা কতই তিরস্কার ভৎসনা কোত্তে লাগলেন, কিন্তু জয়ার মন কিছুতেই নিরাস্তক হলো না। বালা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও কথাই গ্রাহণ কোলেন না। অবশেষে রঘুনাথ আগ্রহ হোয়ে সকাতির অনেক অনুনয় বিনয় করাতে জয়া কাঁপতে কাঁপতে কোমল কম্পিত-পদ সপ্তম বেঠেনের উপর রক্ষা কোলেন। রঘুনাথ বালার চির-স্বখসচ্ছন্দতার নিমিত্ত দেবতাদের কাছে দীর্ঘছন্দে স্তবস্ততি কোত্তে লাগলেন, তার একটি কথাও কিন্তু জয়ার কানে প্রবেশ করেনি।

“জয়া! তবে এক্ষণে আমি তোমার পতি হোলেম,” এই কথা বোলে রঘুনাথ বামনের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে দৃঢ়কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে বোলেন, “কেউ যেন এই পরিণয়-মিলনের ব্যাধাত জন্মাতে না পারে। যাঁরা আমাদের স্মৃথের প্রার্থনা করেন, তাঁরা এই উদ্বাহ-বন্ধন সপ্রমাণ পূর্বক সবল এবং সযুচ করুন।” তার পর সেইরূপ সতেজস্বরে দর্শকগণের প্রতি চেয়ে বোলেন, “আপনারা এক্ষণে আমার পত্নীকে দর্শন কোরে আপনার আপনার গৃহে গ্রহণ করুন।”

শঙ্কর বামন তাঁর আগমনের ফল স্বচক্ষে দর্শন কোরে গ্রহণ কোলেন, মোরোবা কিন্তু গ্রহণে দাঁড়িয়ে থেকে রঘুনাথের প্রতি আর

একটিবার ভয়ানক দীর্ঘপূর্ণকটাক্ষপাত কোরেন, ঐ বিকট বক্র-কটাক্ষপাতের সঙ্গে এমনি একটু নির্ভর, এমনি একটু অবস্থণার আড়হাসির ছটা বেরোলো যে, তাই দেখে ভয়ে বরের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, তাঁর অন্তঃকরণ চম্কে চম্কে উঠতে লাগল, কিন্তু কেন যে তাঁর আতঙ্ক হলো, তা তিনি অনুভব কোরে উঠতে পারেন না। বারানসীর মধ্যে মোরোবা একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ। শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা নিয়মের প্রতি তাঁর নিজের যেক্রপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং শাস্ত্রমর্যাদার কোন প্রকার ক্রটি হলে তিনি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তাদি কোরে যে সকল কষ্ট স্বীকার কোতেন, লোক সকলকেই বলপূর্বক সেই সকল নিয়মে আবদ্ধ কোতেন এবং সেইরূপ কষ্টসাধ্য ক্রিয়ার অন্তষ্ঠান করাতেন। এ বিবাহে তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কন্যা-সম্প্রদানে যে সকল নানা-বিধ কুট-কচালে শাস্ত্র-কর্ম্ম আছে, সেগুলি শাস্ত্রমত যথার্থ প্রণালীতে নির্বাহ হলো কি না, তাই তিনি অনুসন্ধান পূর্বক তন্ন তন্ন কোরে দেখবেন। নিরপরাধিনী জয়া বেদোক্ত সমুদয় শাস্ত্রাচার শাস্ত্রব্যবহারের মর্যাদা অক্ষুরূপে রক্ষা কোলেন কি না, সেগুলি তিনি দ্বিধাকাতর এবং স্ক্রোধান্বিত-চক্ষে একটি একটি কোরে নিরীক্ষণ কোরবেন। রঘুনাথের সামান্ত ক্রটি-গুলিও যে অবহেলা কোরবেন না, সে অভি-প্রায়ও তাঁর ছিল। ক্রিয়াস্তু সেই সকল ছল ছতো ধোরে বিবাহটি যে অসিদ্ধ কোরবেন, সেইটিই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। বর-কোনে কিন্তু এমনি সুশিক্ষিত হোয়েছিলেন, আর পুরোহিতেরাও এমনি বহু-পরিশ্রম কোত্তে লাগলেন যে, মোরোবা কোন প্রকারেই দোষ ধোন্তে পারেন না, তাঁরা অতি তৃচ্ছ তৃচ্ছ, অতি সামান্ত সামান্ত বিষয়গুলিরও বধাশাস্ত্র গোরব রক্ষা কোত্তে লাগলেন। স্তবরাং সভা সুদৃঢ় সঙ্কলেই বোলেন, এ বিবাহে কোনো ভদের ক্রটি হয় নাই, শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধি আছে, সব সেইরূপই হয়েছে। তাই কাজে কাজেই মোরোবাকে নৈরাশ হোয়ে ফিরে যেতে হলো। বিবাহ-কার্য্য সমাধা হয়ে গেলে দেশাচারের

রাজগৌরব রাজপরাঙ্কমাসুসারে রঘুনাথ আপ-  
নার দুঃস্বপ্নে স্বৈতবর্ণ অশ্বের উপর আরুঢ় হোয়ে  
প্রকল্প চিত্তে গৃহে চোলে গেলেন । তাঁর শ্রিয়তমা  
পিতৃগৃহেই রইলেন । রঘুনাথ প্রতিশ্রুত হোলেন  
যে, চারদিনের দিন ফিরে এসে জয়াকে সঙ্গে  
কোরে তাঁর স্বগুরালয়ে লয়ে যাবেন, ইটি  
কৌলিক প্রথা, আবহমান এই ব্যবহারই চোলে  
জান্দছে । রঘুনাথ যখন বিদায় হয়ে গৃহাভিমুখে  
যাত্রা কোলেন, তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে  
মানন্দের কোলাহল হোতে লাগল । “জয় হোক,  
জয় হোক,” চতুর্দিকে এই জয়শব্দের তরঙ্গ  
উঠল উঠল । নাগরা, ডকা, জয়চাক সশব্দে  
ধেজে উঠল, ঝাঁজ ঘটা মন্দিরের খন খন বন  
ম্ন শব্দে গগনতল পরিপূর্ণ হলো, তুরী ভেরী  
ধানায়ের ভৌঁ ভৌঁ, শৌঁ শৌঁ ধ্বনির লহরী  
ধেলে লাগল । রঘুনাথ এই প্রগল্ভ আনন্দ-  
উৎসবের মধ্য দিয়ে গৃহাভিমুখে চোলেছেন ।

জয়া আপনার কুটীরে একাকিনী বোসে  
আছেন । একবার রঘুনাথের চারু কাস্তি, এক-  
বার শঙ্কর বামনের বিকট কদাকার মূর্তি, তাঁর  
মননোপাস্তে পর্যায়ক্রমে চিত্রিত হোতে  
লাগল । বালা নিরবচ্ছিন্ন সেই দুটি পরস্পর  
বিসম্বাদী অবয়ব অন্ধান কোতে লাগলেন ।  
জয়া যখন অতি বালিকা, শঙ্কর বামনের নাম  
কোলে তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হতো । বালার  
জননী মৃত্যুকালীন বারংবার নিষেধ কোরে যান  
যে, শঙ্কর যে পথ দিয়ে চলে, চারুলোচনা জয়া  
সেন সে পথে কদাচ যাতায়াত না করে ।  
ধারণ এই কথা ব্যক্ত করেন যে, তিনি যখন  
ষোল মাস গর্ভবতী, দৈবাৎ একদিন শঙ্করের  
গায়ে গা-ঠেকাঠেকি হয়, সেই যে তিনি পীড়িত  
হোয়ে ঘরে এলেন, আর তাঁকে উঠতে হলো  
না, সেই পীড়াতেই তাঁর মৃত্যু হয় । তৎকালীন  
বালার মাতা যে সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন,  
সে সন্তানটি যে পৃথিবীর মুখাবলোকন কোতে  
পায় নাই, সে কথা মিথ্যা নয় । অন্তিম দুর্ভাগা  
মাতা সেই অবধি চিররোগী হোয়ে, বহুকাল  
শয্যাগত থেকে, তারপর যে তাঁর পঞ্চম হয়, সে  
কথাও সত্য । যারা অজ্ঞানাক হিন্দু-জীর্ণের দ্বার  
তে সন্নিবিষ্ট নহেন, তাঁরা কিন্তু শঙ্কর বাম-

নকে দেখে ভীত হতেন না । কলতঃ শঙ্করের  
অবয়বে এমন কোনো বিভীষিকার লক্ষণ নাই  
যে, দেখে আতঙ্ক হয় । শঙ্কর মহা শুদ্ধাচারী নিষ্ঠা  
ব্রাহ্মণ, পূজা আহুত্রে একান্ত শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মহুতানে  
অতিশয় রত, অতি কঠোর নিয়মে চলেন,  
সংসার-আশ্রমের প্রতি একপ্রকার অনমুরাগই  
ছিল এবং নিষ্কিন বাসেই কালষাপন কোতেন ।  
যদিও তিনি স্বয়ং অতি কঠোরব্রতী ছিলেন  
সত্য, কিন্তু কেউ বোলতে পারেন না যে, শঙ্কর  
কারও প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার কোরে-  
ছেন, কি তাঁর নামে কেউ কখন দুর্নাম কোন্তে  
শুনেছেন, কি এই দুঃস্বপ্নটি তাঁ হোতে হোয়েছে ।  
এই সকল অমুকুল পরিচয় সত্ত্বেও লোক  
কিন্তু মনে মনে সন্দেহ কোতো যে, শঙ্কর অস্তঃ-  
শীলে জাহ, ভেলগী, মায়া আদি তত্ত্ব মন্ত্রের  
অমুঠান কোরে থাকেন, অথচ কারও ক্ষমতা  
ছিল না যে, সদর হোয়ে দশজনের সাক্ষাতে  
তাঁর অপবাদ করে । প্রকাশ্যতঃ সকলেই তাঁর  
সমাদর গৌরব কতো, অসাক্ষাতে কিন্তু  
কেউ মুখেও তাঁর নাম উচ্চারণ কতো না ।  
শঙ্কর উদ্ভে তিন হাতের অধিক উচ্চ ছিলেন  
না, শরীরে কিন্তু বিস্তর সামর্থ্য ছিল । স্বন্ধের  
পরিসর আর তাঁর শিরাময় বলিষ্ঠ বাহু দেখি-  
লেই বেশ অতুভব হতো যে, শঙ্কর বলবান  
ব্যক্তি । মস্তকটি অতিশয় বৃহৎ, চক্ষু দুটি ঘোর  
কাল, গোল, আর দুর্দান্ত ভয়ানক, মালুসার  
মতন চাকলা গাল, চোকোণা ধূথি, ঐ ধূথির  
উপর কটাবর্ষের ছোট ছোট ঝাড়াল দাড়ি,  
ওষ্ঠ দুটি বেয়াড়া মোটা, মুখের হা রাবব বোয়া-  
লের মত অসদৃশ বড়, ঐ মুখ আর ঠোঁট  
দাড়ি ছাড়িয়ে বেরিয়ে পোড়েছে । মুখাবয়বের  
তাবদঙ্গগুলি একত্র কোলে তাঁর দিকে চেয়ে  
দেখতে এককালীন প্ররাস্তি হতো না ।

এই অদ্ভুত বিভীষিকা ব্যক্তি পারতপক্ষে  
গায় জামা দিতেন না, যদি কখন নমাসে ছমাসে  
দৈবাৎ এক আধবার ব্যবহার কোতেন, তাতেও  
আবার স্তম্ভচাঁ খুলে রেখে দিতেন, সেটি তাঁর  
অর্থাগত নিয়ম । স্তম্ভে খুলে দিয়ে গা দেখা  
যায় না, সর্দাদ লোমে ঢাকা, মস্ত পুরু চেটাল  
বুকের ছাতি বার কোরে রাখতেন । হাতে



সোনার বালা, বালা দুগাছা যেমন ভারি, তেমনি মোটা, কোমরে সোনার গোট। তাবৎ লোকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্বক শঙ্করের সমাদর কত্তো। আকৃতিটি না কি অসঙ্গত কদাকার ছিল, তাঁর সেই অষ্টবক্র কুঞ্জ-মূর্তি দেখে ব্রাহ্ম-গেরা একেবারে রাষ্ট্র কোরে দিচ্ছিলেন যে, শঙ্কর দেবতাদের চিহ্নিত ব্যক্তি, অন্য কোন লোকই তাঁর তুল্য দেবানুগৃহীত নহে।

ঐ অষ্টবক্র বিকটাকার পুরুষ একটি মন্দিরের বিনাশাবশিষ্ট নির্জ্বল কুটীরে বাস কোতেন। এক সময়ে মাহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্যে ঐ মন্দিরটি অতি পবিত্র স্থান বোলে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এক দিবস দেবীর তৃপ্তির নিমিত্ত নরবলির ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর আড়ম্বর হোচ্ছিল, এমন সময় মন্দিরের চুড়ার উপর ঘোর কড় কড় রবে ভীষণ বজ্রপাত হয়, মন্দিরটি মহা শব্দ কোরে চূর্ণ হোয়ে গেল। পুরোহিত, জন্মদা, কর্মকার, আর বধের পাত্রটি দেবালয়ের ভগ্নাবশেষের ভিতরে চাপা পোড়লেন। সেই অবধি মন্দিরটি পুনরায় নূতন কোরে কেউ নির্মাণ করে নাই। সুতরাং আজও পর্যন্ত সেই ভগ্ন অবস্থায়ই পোড়ে আছে এবং তৎকাল অবধি বারাণসীর লোকেরা সেখানে সাহস কোরে গমনাগমন কত্তো না। তাতেই শঙ্কর ঐ মন্দিরটি মনোনীত কোরে আপনার বাসস্থান কোরেছিলেন। একে তো শঙ্করের নামে লোকের জ্ঞান হতো, তাতে আবার সেই দেবালয়ে বাস করাতে লোকের মনে আরও ভয় হলো। শঙ্কর সেই সংসর্গ-বিরহিত গুপ্ত নিবাসেই অষ্ট-প্রহর কালযাপন কোতেন, কদাচিৎ কখন নির্গত হোয়ে বাইরে আসতেন। কিন্তু একটি উপলক্ষে তাঁকে লোকালয়ে আসতেই হতো, —কোনো পতিপ্রাণা নারী যদি সহযত্ন হোতেন, সেই ভয়ঙ্কর নৃশংস উৎসবের সময় শঙ্কর উপস্থিত হোতেনি হোতেন, সিটি তাঁর অধস্তিত নিয়ম ছিল, কদাচ অবহেলা কোতেন না। সে সময় শঙ্কর সতেজ আত্মাদে প্রফুল্লিত হোয়ে তাঁর চোক মুখ দিয়ে সজীব তেজস্কৃতি নির্গত হতো। বিশেষতঃ ভাগীরথী-তীরেই

না কি তাঁর বাস ছিল, আর সেই স্থানেই কি সাক্ষী রমণীরা চিতা অ'রোহণ কোতেন। তাই শঙ্করের উপরেই সকল ভার ছিল, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে অধ্যাক্ষতা কোতেন চিতা সাজান প্রভৃতি সহমরণের তাবৎ আয়োজন তিনি আপন চক্ষে দেখে তত্ত্বাবধান কোতেন।

সতীর সহমরণের সময় শঙ্করের মনে নিঃশিখর আনন্দের আবির্ভাব হতে, তখন তাঁকে স্পষ্ট আমোদ-প্রফুল্লিত দেখা যেতো, আর কেবল সেই সময়েই তাঁর মুখ দিয়ে হাসি বেরোতো, নচেৎ অন্য সময়ে কেউ কখন তাঁকে হাসতে দেখেনি। কি আশ্চর্য! ধর্মের কি অদ্ভুত পরাক্রম! সেই নিদারুণ মর্শভেদী, হৃদয়-কম্পকারী উৎসব দর্শন কোরে কৌতুক জ্ঞানে লোকের মনে আনন্দ উচ্ছলিত হয়!!! মহাপাতকীদের প্রাণদণ্ডের সময়েও শঙ্কর সেই বধ্যভূমিতে কখন কখন উপস্থিত থাকতেন। তাঁর আকার প্রকার দেখে বোধ হতো, অপরায়ীদের আশ্রয়দাতা মনে মনে সহ্য হোতেন। আর শিরশ্ছেদনের পর ধড়টা যখন মাটিতে পোড়ে ছট্ ফট্ কোতো, সেই সময় তাঁর বিকট চক্ষু দুটি ঘূর্ণিত কোরে তাকিয়ে তাকিয়ে চেয়ে দেখতেন, তৎকালীন কিন্তু তাঁর মুখে হাসি নাই, কেবল দেখে শুনে আপনার পাতালপুর নিবাসে ফিরে যেতেন। শঙ্করের একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কিসে যে তাঁর সে ক্ষমতা হলো, সে কথা কেউই বোলতে পারে না। প্রাচীন স্বীলোকেরা যারা সম্ভানের মাতা হোয়েছেন, তাঁরা ত শঙ্করকে দেখে ভয়ে পালাতেন, যুবতীরা, কি অল্প বয়স্ক বালিকারা শঙ্করের নাম কোলে পাড় ছেড়ে প্রস্থান কত্তো। আর বিবাহের উপলক্ষে সম্প্রদানের সময় দৈবগতিকে যদি কোনো সঙ্গে চোকোচোকি হয়—তবেই সর্বনাশ উপস্থিত! পাত্রীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো তবে সে গুণে পোড়ে মনে মনে ঠিক দিতো যে একটা না একটা বিপদ ঘোটবেই ঘোটবে, বিসে মনে কত্তো যে, যত্নবোধ যত প্রকার অকল্যাণ হয়ে থাকে, সে সমুদায় অকল্যাণ তাকে ভোগ কোতে হবে। এই তে

শব্দের বাজার-সম্মত। এদিকে মনে করুন-  
কোনো নারীর প্রতিবিয়োগ হয়েছে, তার  
জাতীয়-স্বজনেরা তারে সাধাসাধনা কোচ্ছে,  
ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকার ভয় দেখাচ্ছে, সে  
বিধবা কিন্তু কারুরি কথা শুনছে না, সেদিকে  
তদপাতও কোচ্ছে না, সে সত্য হবে না, সহ-  
মরণ যেতে তার প্ররুতি নাই, সে পতির জলন্ত  
চিতায় প্রাণত্যাগ কোরবে না, সে বিষয়ে সে  
খাতি হোয়ে বোসে আছে। শিব এসে বোল্লেও  
তার কথা শুনবে না, কেউই তারে বোঝাতে  
চ না, কারুরি কথা সে গ্রহণ কোচ্ছে না।  
এমন সময় শব্দর সেখানে উপস্থিত হোয়ে বোলে  
পতালেন, সতীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোর-  
বেন। শব্দরের গলার আওয়াজ শুনেই হোক,  
কি তিনি কাণে কাণে কোন গুরুমন্ত্রই শুনিয়ে  
নি, সেই জন্যে হোক, শব্দরের সমাগম  
খোলেই আর সে হতভাগা নারীর সংশয়  
অপত্তি কিছুই থাক্ত না। সে আর তখন  
অস্বাধ্য হোয়ে সহমরণ যেতে অস্বীকার কত্তো  
না, ইটি শব্দরের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যক্ষ ফল,  
অস্বাচ তা অত্যা হবার নয়। তাই ইদানীং  
শব্দরকে যেচে সাক্ষাৎ কস্তে হতো না, সে  
প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে এককালীন উঠে গেছিল।  
ইদানীং আবদ্ধক হলে, ব্রাহ্মণেরা তাঁর বাড়ীতে  
পোড়ে সাধাসাধি কত্তো, অকরণ নিষ্ঠুর আত্মী-  
ব্রোও কত প্রকার বিনয় কোরে শব্দরের স্তব-  
ধতি কত্তো। তত্ত্বিমে যে সকল ব্যক্তি আত্ম-  
সার্থের নিমিত্ত সেই হতভাগিনী বিধবা কামি-  
নার মৃত্যু কামনা কত্তেন, তাঁরাও তাঁর হাতে  
পায়ে ধোরে উপাসনা কোরে বোল্ন্তেন,  
একটিবার মাত্র পায়ের ধূল দিয়ে সেই অব্যব-  
স্থিতমনা গঙ্গনাপীড়িতা স্ত্রীলোকটিকে সুপ্ররুতি  
দিয়ে আসুন, আর তার সতীর্থ্য যাতে রক্ষা  
পায়, তার উপদেশ করুন। শব্দর যে তার কানে  
কি মোহিনীমন্ত্র পোড়্ন্তেন, কি গুরুমন্ত্র শোনা-  
তেন, তিনি যে তার সঙ্গে কি তর্ক কত্তেন,  
কি কথা বোলে তার প্ররুতি উদীপ্ত কত্তেন,  
আর কি কোরেই বা তিনি কার্য্য-সিদ্ধি কত্তেন,  
সে গুঢ় তত্ত্ব তিনিই জান্ন্তেন, তাঁর সেই অদ্ভুত  
কমতার অন্তর-মর্ষ অত কেউই বুঝে উঠতে

পাত্তো না। কি বোলে তিনি জপাতেন, সে  
স্ত্রীলোকটিও সে কথা মুখের বাবু কোত্তো না,  
বরং পাছে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সেই  
ভয়ে আরও সাবধান হোয়ে মর্ষকথাটি সে  
গোপন রাখতো। জয়ার সঙ্গে রঘুনাথের  
পরিণয় সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হোয়ে গেলে, তার চতুর্থ  
দিবসের সাংকালে আনন্দপ্রফুল্লিত রঘুনাথ  
তাঁর সহধর্ম্মিনী প্রমদাকে নিজালয়ে আনবার  
জন্তে বাড়ী থেকে যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন,  
সঙ্গে একখানি অপূর্ণ মনোহর সমুজ্জ্বল পাকী,  
পাকীখানি পশ্চাতে পশ্চাতে চোলেছে। পথে  
এক স্থানে সদর রাস্তার ধারে মোরোবা আর  
সেই বামন ব্রাহ্মণ মুখোমুখি হোয়ে কিস্ কিস্  
কোরে কি পরামর্শ কোচ্ছিল, রঘুনাথ দূর  
থেকে উঁকি মেরে তাদের দেখতে পেয়ে-  
ছিলেন, কিন্তু তিনি যে তাদের দেখেছেন, তারা  
তা জানতে পারে নি। পিতাপুত্রে উভয়েই যে  
বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন, সে কথা ইতি-  
পূর্বে রঘুনাথ বিস্মৃত হোয়ে গেছিলেন। এক্ষণে  
কিন্তু সেই কুৎসিত কদাকার মূর্তিটির  
সঙ্গে কুৎসিত কদাকার অন্তঃকরণের একত্র  
আবির্ভাব স্বচক্ষে দর্শন কোরে রঘুনাথের অন্তর  
আতঙ্কে কঁপে উঠ্লে, তাদের দেখে পূর্কের  
কথা তাঁর স্মরণ হতে লাগল, এক্ষণে মোরোবার  
তৎকালীনের নীরস নিষ্ঠুর হাসি তাঁর মনে  
জাগ্রত হোয়ে উঠ্লে, আর যখন তাঁরে বেঠন  
কোরে তাঁর আত্মীয় স্বজন সজীব উল্লাসে উন্নত  
হোয়ে জয়ধ্বনির উপর জয়ধ্বনি করে বায়ুগ্রাম  
বিদীর্ণ কোচ্ছিল, সেই সময় তাঁর প্রিয়তমা  
জয়া যে শব্দর বামনের কিস্তুত বিকট মূর্তি  
দর্শন কোরে ভয়ে মুছাঁপ্রাপ্ত হন, সে নিষ্ঠুর  
ছবিও অভিনব হোয়ে তার মনোপটে চিত্রিত  
হোতে লাগল। রঘুনাথ আনন্দে নিরানন্দ  
কত প্রকার অমঙ্গল চিন্তা কত্তো কত্তো অতি  
বিমর্ষ হোয়ে শিউরামের মন্দিরে দর্শন দিলেন।  
রঘুনাথের ইচ্ছা ছিল যে, মুখখানি হাস্যরসে  
প্রফুল্লিত কোরে চিন্তোদ্বেষ্ট গোপন করেন,  
সিটি কিন্তু অনেক চেষ্টা কোরেও পেরে  
উঠলেন না। রঘুনাথকে দেখে জয়া মনোহর  
ভঙ্গী কোরে আস্তে আস্তে নিকটে এলেন,

তার বদনকান্তি কোমলোচ্ছল রাগে দীপ্তি কোত্তে লাগল, তাঁর নয়নোপান্তে প্রফুল্ল জ্যোত নৃত্য কোত্তে লাগল । রঘুনাথ কোনও কথাবার্তা না কোয়ে প্রণয়িনীকে নিঃশব্দে গৃহের বাহির কোরে, বস্তার স্বর্গপথের দ্রব নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে গভীর-স্বরে বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ কোত্তে লাগলেন, রঘুনাথ বড় বড় কোরে বোলুতে লাগলেন, “হে পৃথ্বী! হে ত্রিদশালয়! হে জগদ্রক্ষাণ্ড! আপনারা অচলা হোয়ে ত্রিদিন একস্থানেই অবস্থান কোচ্চেন, এই মধুর রমণী যেন তাঁর স্বামীর পরিবারের মধ্যে আপনাদের স্থায় চির-বিচ্যমানা থাকেন তার পর শুভাশীষ-বাক্যে প্রণয়িনীর মঙ্গল কামনা কোরে গৃহের বাহির হলেন । শিষ্টাচার ও সমাদরপূর্বক পুরবাসিনীদেরকে নমস্কার কোরে, তাদের শিরে জল প্রদান কোলেন, তাই কোরেই শাস্ত্রীয় ক্রিয়া শেষ করা হলো ।

স্তাবক, আশীর্বাদক এবং বন্ধু-বাকবেরা জয়াকে ঘেরে ছিলেন, বাল্য অল্পময় শোভাময় পাকীর মধ্যে প্রবেশ কোলেন, একগে তিনি রঘুনাথের আলয়ে চোলেন । সেখানে আরও অনেক শাস্ত্রক্রিয়া নির্বাহ কোত্তে বাকী আছে । হোমায়ি প্রচ্ছলিত করা হলো, রঘুনাথ স্বর্গ, মর্ত, পাতাল—ত্রিলোকের পূজা কোলেন,—নৈবেদ্যাদি নিবেদন কোলেন,—জয়ার কোনো বিষয় না হয়, স্থখে সচ্ছন্দে থাকেন, এই উদ্দেশে স্তবস্ততি কোত্তে লাগলেন । কিন্তু কি পরিতাপ ! বোড়শোপচারে পূজাই করুন, আর আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত স্তবস্ততিই করুন, দৈববাধনার কোনো ফল হলো না । নব-বিবাহিত দম্পতী যুগলকে শক্রাদগের কুটিল মন্ত্রণাচক্র থেকে রক্ষা কোত্তে পালেন না । মোরোবা স্তবদ্বন্দ্বের, বিশ্বাসভঙ্গের, বিসম্বাদের এবং রাগদ্বন্দ্ব হিংসার একটি মূর্ত্তমান্ দানো । যে দিবস শিউরাম তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ কোরে জয়ার সঙ্গে শঙ্করের পরিণয় হবার কথা খণ্ডিয়ে দেন, সেই দিন থেকে জয়ার উপরেই মোরোবার লক্ষ্য, সেই দিন থেকেই নিরীহ বাল্য তাঁর ভীষণ কোপের পাত্রী হোলেন । একমাস অতীত হলো, প্রতি-

দিনই নব-বিবাহিত যুবকযুবতীর প্রফুল্লানন্দের সাক্ষ্য প্রদান কোচ্ছিল, তাঁদের মিলনস্থলে ব্যাঘাত জন্মায়, সেরূপ কোনো বিষয় উপস্থিত ছিল না । ভুল ভ্রান্তিও শঙ্করের নাম একবার মুখে আনতেন না ।

মোরোবা বারাণসীতে নাই, কয়েক দিবস হলো, তিনি স্থানান্তরে চোলে গেছেন,—সকলের মুখেই এই কথা শুনতে পাওয়া গেছে । রঘুনাথ শুনে মনে মনে মহা আনন্দিত হোলেন । কিন্তু মোরোবা কেন বারাণসীতে নাই? কোথায় গেলেন? কোনো গেলেন? রঘুনাথ স্বপ্নেও তা জানতেন না । একমাস কাল গত হোতে না হোতে চিরদেবী মোরোবা পুনরায় কাশীধামে দর্শন দিলেন । তাঁর আসবার কিছু দিন পরেই রঘুনাথের কাছে খবর এলো যে, দেওয়ালে তাঁর যে জমিজমা আছে, তা জোক কোরিয়ে বলবন্ত নামে এক ব্যক্তি সরকারে জানিয়েছে যে, সে সকল জায়গাজমি তারই—তাতে রঘুনাথের কোনও স্বত্ত্ব নাই । সে দাবি করাতে ইজারাদারের বিচারে সে সকল সম্পত্তি তারই হোয়েছে । এই সংবাদ পেয়ে একবার সেই দেওয়াল গ্রামে যাওয়া রঘুনাথের নিত্য আবশ্যক হলো । রঘুনাথ অতি বিমর্ষ হোয়ে সে কথা প্রণয়িনীকে ভেদে বোলেন । ঐ খবর শুনে বালার পূর্বকার ভয়, আতঙ্ক, সংশয় পুনরায় দর্শন দিলে,—পূর্বাপেক্ষা এবার দ্বিগুণ প্রস্তাব হোয়ে দর্শন দিলে । জয়া চীৎকার শব্দে কাঁদতে কাঁদতে মনের ভাব ব্যক্ত কোরে বোলেন যে, আমাদের এই যা দেখা সাক্ষ্য হলো, এই দেখাই শেষ দেখা, এ জন্মে আর আমাদের দেখা হবে না !

রঘুনাথ বোলেন, “ও কি ! এমন অলঙ্কারে কথা কেন বলো? দেখা হবে না কেন? দেওয়াল ত অধিক দূরের পথ নয় ।”

জয়া বোলেন, “দূর নয় সত্য, আর আমিও তা জানি ; কিন্তু তা হোলে কি হয়, তোমার শত্রু যারা, তারা অতি দুর্দান্ত, আর অতিশয় কুচক্রী । নচেৎ তোমার জায়দাদের উপর এ মিথ্যা দাবি কেন উপস্থিত হবে ।”

রঘুনাথ বোলেন, “তুমি সে জন্ত কোনও ভয়

করো না, যে ব্যক্তি এই দাবি করেছে, তাকে আমি জানি, আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে। সে ফিচেল লোক, আর তারি মামলাবাজ। পরগণার নায়েবকে স্বরূপ বুভাঙগুলি অবগত করালে সব মিটে যাবে। মিটে গেলেই আমি সেই দণ্ডে সেখান থেকে রওনা হয়ে পুনরায় এই স্নেহ-প্রফুল্লিত বাহুলতার পাশে ফিরে আসবো।”

জয়া কঁাদতে কঁাদতে বোলেন, “তবে যাও। যাও, কিন্তু যে পর্যন্ত ফিরে না আসবে, আমি অত্যন্ত অস্থির থাকবো, এই কথাটি স্মরণ থাকে যেন।”

রঘুনাথ মনে মনে বহুশী কোচ্ছিলেন যে, বিবাদ মিটিয়ে শীঘ্র ফিরে আসবেন। জয়া কিন্তু কেবল অমঙ্গলই দেখতে লাগলেন, তাঁর মনের অন্ধকার, তাঁর অন্তঃকরণের হুঁচকানো কিছুতেই পরিষ্কার হোচ্ছিল না। এইরূপ অস্থায়ী-পুরুষ পৃথক পৃথক হোয়ে পোড়লেন। যে বোড়ার সোয়ার হয়ে বিবাহ কোত্তে গেচ্ছিলেন, রঘুনাথ সেই বোড়ার উপর আক্রান্ত হোলেন। রেকাবের উপর পা রাখতেই ছুঁজন অকস্মত, তারা রঘুনাথের চিরবিশ্বাসী, পৃথিবী চুঁখন কোরে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রণয়িনী জয়া দাড়িয়ে দাড়িয়ে সব দেখেছিলেন। অকস্মত সঙ্গে রঘুনাথ বোড়া ছুটিয়ে চোলেছেন, প্রমদার দর্শনোৎসুক চক্ষু সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। রঘুনাথ একটি বাড়ীর মোড় ছাড়িয়ে বোরিয়ে পোড়লেন, জয়ার আর দৃষ্টি চোলো না, সেই কোণটি প্রতিকূল হোয়ে প্রিয়তমার সরাগ স্নেহদৃষ্টি অবরুদ্ধ কোলে। রঘুনাথ দৃষ্টির বাহির হোয়ে কতকদূর চোলে গেলেন, জয়া একটি সুদীর্ঘ বিবাদ-নিখাস ফেলে বোলেন,—“প্রাণবল্লভকে চক্ষুভরে দেখে নিলেম, জন্মের শোধ দেখে নিলেম, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম—আমার মন বোলছে, এ জন্মে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না, জয়াস্তরে যদি হয়, সে কথা কে বোলতে পারে? এ জন্মে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।” জয়াকে সান্ত্বনা করার জন্তে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা নানাপ্রকারে বল কোত্তে লাগলেন, তাঁরা এই বোলে বুঝাতে লাগ-

লেন, “মন্দ হবে গেলে ভাবতে নেই, তাতে স্বামীর অকলাণ হয়, তুই ভাবিসনে, ভাবলে অকলাণ ডেকে আনা হয়, তোর দেখি সকলভাতেই বাড়াবাড়ি কারও স্বামী কি বিদেশে যায় না?—তোর মত কে এত ভেবে থাকে, কবে কি হবে,—বালাই, তাই বা হবে কেন,—তাই বোলে এখন কাদাকাটা করা কি ভাল দেখায়, যদিই কপালে মন্দ ঘটনা থাকে, তা ভেবে কি কোববে বলো? তোমার ভাই সব অনাচ্ছিষ্ট, মনে মনে ভয়ই ছিল, তবে যেতে দিলে কেন? মানা কোলেই ত পাগ্লে। এখন উঠো, খাও দাও, হেসে খেলে বেড়াও, আমোদ আশ্বাস করো, আর জরুরদেবকে ডাক, তিনিই তোমার মঙ্গল কোববেন, তোমার স্বামী শীগির ফিরে আসবেন।” জয়া বোলেন, “ওগো না, আমার অন্তঃকরণ ডেকে বোলছে, তিনি আর ফিববেন না, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।” জয়াকে খাওয়ার নিমিত্ত মেয়েরা অনেক সাধাসাধি কোত্তে লাগলেন, বালা কাকুরি কথা শুনলেন না, সে দিন আহার নিদ্দা তাগ কোরে অঁচোল পেতে অমনই শুধু মাটিতে পোড়ে রইলেন।

রঘুনাথ বিদায় হোয়ে গেলে এক সপ্তাহ পরে জয়া একদিন ছাতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, সন্ধ্যার শীতল বায়ু স্পর্শ কোরে স্নিগ্ধ হোচ্ছিলেন, আর যে রাস্তাটি দেওয়াল গ্রামে চোলে গেছে, সেই রাস্তাটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। সাদা বোড়ার উপর সোয়ার একটি লোক আসছিল, জয়া তাকে দূর থেকে দেখতে পেলেন, বোড়াটি মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে আসছিল। ইনি কি তাঁর রঘুনাথ? রঘুনাথ কি এত শীঘ্র ফিলেন? না,—তা হোতে পারে না। লোকটি ক্রমিক এগিয়ে আসছে, সন্মুখে অনেকগুলি বাড়ী, ঐ বাড়ীর আড়ালে সোয়ারটি ঢাকা পোড়লেন, এখন আর তাঁরে দেখা যায় না। সে ব্যক্ত আবার বাড়ীগুলি ছাড়িয়ে এসে পোড়েছে, জয়া আবার তারে দেখতে পেলেন। লোকটি হন হন কোরে চোলেছে, বাড়ী-মুখই; আসছে। পতিপ্রাণা জয়ার তুই চক্ষু দিয়ে আনন্দ-ধারা গোড়িয়ে পোড়তে

লাগল। তবে বুঝি রঘুনাথই এলেন,—এই ভেবে স্নেহময়ী বালা প্রাণপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্সে দৌড়িলেন। নীচে এসে দেখেন, সে পুরুষটি তাঁর স্বামী নয়!! যে দুজন অল্পচর সঙ্গে যায়, সে ব্যক্তি তারই একজন। উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে, তার এক হাতে এক-খানি পত্র, আর এক ঘোড়া খড়ম। ঐ পত্র, খড়ম, আর আগন্তুক ব্যক্তির চেহারা, এরা একত্র হোয়ে মর্মযাতী স্বরূপ অবস্থা ব্যক্ত কোরে দিলে। জয়া নিস্তক, আড়ষ্ট, সংজ্ঞা-শূন্য, মুখে কথা নেই, বাকরোধ,—শোক-সংবাদবাহকের প্রতি ঐকদৃষ্টে চেয়ে আছেন, চক্ষে পলক নেই, যেন প্রস্তরমুর্তি দাঁড়িয়ে। এই সময় জয়ার আতঙ্ক-আকান্ত সচকিত বিহ্বল মূর্তি দর্শন কোরে মহারাট্টা কাসীদেরও মন নরম না হোয়ে যেতো না, বালার সেই হৃৎকম্পকারী আতঙ্ক-আহত মূর্তিটি চক্ষে নিরীক্ষণ কোলে নিষ্ঠুর কঠোর দর্শন কাসীদের মনে অবগুই করুণায় উদয় হতো। বালা এ পর্যন্ত সেইরূপ বাকরোধ হোয়েই আছেন। রঘুনাথের মৃত্যুর খবর শুনে অন্তঃপুরের মধ্যে ক্রন্দনের তরঙ্গ উঠেছে, মেয়েরা আর্জুনাদ কোরে মহা কোলাহল আরম্ভ কোরেছে। জয়া তাদের বিলাপস্বর শুনতে পেয়েছেন, তাই শুনে বালা শেষে বোলে উঠলেন, “ঐ শোনো, রঘুনাথ রঘুনাথ বোলে চীৎকার কোচ্ছে, তিনি কোথায়?” সোয়ার বোলে, “তিনি নাই! তাঁর পরোলোক হয়েছে!” জয়া “হা হা” কোরে উদ্গাদিনীর জায় উচ্চরবে হেসে পরিচারিকার কোলে মুচ্ছিতা হোয়ে পোড়লেন, সেই অজ্ঞানাবস্থায় ধরাধরি কোরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। কতক্ষণ পরে চৈতন্ত হোয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। বিলাপিনীদের হাহা-কারধ্বনি বাড়ী ভেদ কোচ্ছিল। জয়া তাদের শোকস্বর একতানমনে শুনতে লাগলেন। বালার শোক-বিলাপের সেরূপ বাহাডুস্বর ছিল না, তাঁর সে শোক, নির্মল সরল আনন্দ-হৃদয়ের অন্তঃস্পর্শে গাঢ় নিহিত হোয়েছে। বালা কথা কইতে জান, আর কেবল ফুলে ফুলে, গুন্সে গুন্সে কান্না এসে—কেউ ছুটে সাধনার কথা

বোলে-বালার শোক-প্রবাহের বেগ ঐনিরতি করবার চেষ্টাও কোলে না। শিউরাম ভিন্ন একটি প্রাণীও তাঁর নিকটে গেল না! বালা কেবল সম্প্রতি শিউরামের বাড়ী ছেড়ে এসেছেন, সবে তরুণ বয়স, যৌবনাকুর কেবল মাত্র প্রক্ষুটিত হোয়েছে, সেই নিরীহ সরল কন্যার মূর্তি আজ স্বচক্ষে দর্শন কোরে, যে তাঁরে কণ্ঠে স্নেহ, কত শ্রদ্ধা কতো, তার আজ এই দুর্কথা চক্ষে নিরীক্ষণ কোরে, শিউরামের সর্বাঙ্গ অবসর হোতে লাগল, জ্ঞান-বুদ্ধিরও ভ্রান্তি জন্মিল। সেই ক্লান্তমস্তি তরুণার ভয়ানকি, আর যারে পেয়ে প্রফুল্লিত হোয়ে, সংসার-আশ্রমের বন্ধ প্রকার সুখাশা কোরেছিলেন, সেই সকল সুখ-আশার আশ্রয়-মূর্তি আজ শূন্য মনে, শূন্য-হৃদয়ে, আর শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর দৃষ্ট হোয়ে আছে! শিউরাম যে তাঁর স্নাত্বে দাঁড়িয়ে, আজ সে জ্ঞান কার নাই!! খানিকক্ষণ পরে লোকের মনে সন্দেহ হতে লাগল যে, জয়া বাতুল হোয়েছে, বালা কিন্তু আত্মীয় স্বজন-চ চিন্তে লাগলেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও কইতে লাগলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কোলেন, তাঁর স্বামীর কিরূপে মৃত্যু হয়েছে? শিউরাম তাঁকে বুঝিয়ে বোলে, যে, দেওয়ান পৌছিতে না পৌছিতে রঘুনাথের সাংঘাতিক জ্বর হয়, চিকৎসকেরা অনেক চেষ্টা কোরে-ছিলেন, কিন্তু কোনমতেই বাঁচাতে পারেন না। ঈশ্বরের মনে যা থাকে, তাই ঘটে, মহা-যোর হাত কি? পূর্বে কত পাপ কোরেছ, তারি ভোগাভোগ ভুগতে হোয়েছে, অদুষ্ট ছাড়া পথ নাই, ভেবে আর কি কোরবে? দেওয়ানের ইজারাদার মৃত্যু সপ্রমাণ কোরে কাসীদের নামে এক পত্র লিখেছেন, আর তাড়াতাড়ি কোরে রঘুনাথের খড়ম পাঠিয়ে দিয়েছেন। জয়ার মনে এখন বিশ্বাস হলো যে, রঘুনাথ যথার্থই নাই। মোরোবাকে অরণ হোয়ে, ঐ ব্যক্তিই রঘুনাথের অকাল-মৃত্যুর মূলভূত, ঐ ব্যক্তিই কুচক্র কোরে রঘুনাথকে দেওয়ানে পাঠিয়ে দেয়, এক্ষণে বেয়ারাম সেয়ারামের কাল রঘুনাথ যদি বাড়ী ছেড়ে না যেতেন, তবে কখনই মারা পোড়তেন না।

মোরোবার অতিশয় খল স্বভাব, তার শরীরে  
দুঃখময়ী নাই,—জয়া এই প্রকার, এ' ছাড়া  
করুণ কত প্রকার চিন্তা কোচ্ছেন, এমন সময়  
দরের দরজাটা ধরাস কোরে খুল গেল, জয়া  
দুঃখ ভুলে চেয়ে দেখেন, পাষাণ মোরোবা! তাঁর  
মুখে দাড়িয়ে। মোরোবা মৌখিক বিস্তর  
দুঃখ জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোলেন, সুখময় আনন্দ-  
ধামে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে বালা কখন  
প্রস্তুত হবেন? মোরোবার পঁচাত্তে পঁচাত্তে  
এই পুরোহিতের দল এসে উপস্থিত। এক  
মাস মাত্র পূর্বে ঐ সকল ব্রাহ্মণেরাই প্রস্থনাথের  
দেখে জয়ার পাণিবন্ধ কোরিয়ে দেয়, এক্ষণে  
তাবাই আবার জয়াকে আত্মঘাতিনী হোতে  
পেড়াপিড়ি কোত্তে লাগল।

পতিহীনা জয়া প্রথমত আত্মীয়বর্গের কথা  
বিশেষল বুঝতে পারেন নি। শেষে যখন দুঃখ  
লেন, তারা তাঁকে অগ্নিতে পুড়ে মোত্তে পরা-  
মর্শ দিচ্ছে, বালা তখন আপনার হৃদয় দেখিয়ে  
দিয়ে বোলেন,—এই,—এইখানে আমার  
অগ্নিশিখা জগছে, আপনারা আমাকে জীবিত  
থাকুতে দিন, তা হলে চিরকালই সেই আগুনে  
দগ্ধ হোতে পারবো। সে অগ্নি এখন আমাকে  
দগ্ধ কোচে, তার হৃদয় তেজ, সে তেজ যদি  
দখন লাঘব হয়, তখন নয় আমার যা  
বোলুবেন, তা করবো, কিন্তু এক্ষণে আমি সহ-  
মরণ যেতে পারবো না, একেবারে ভ্রম্মাশ্রম  
হওয়া অপেক্ষা আজন্মকাল দগ্ধ হবো মনে  
কোরেছি, যত দিন বাঁচবো, হৃদয়ের কালাগ্নি  
আমায় দগ্ধে দগ্ধে পোড়াবে।" বাস্তবিক জয়া  
অতি অবাধ্য হোয়ে একবেগে হোয়ে বোস-  
লেন, ব্রাহ্মণদের কোন কথাতেই কর্ণপাত  
কোলেন না। জয়ার প্রতিজ্ঞা যে, কদাচ  
অমৃত্যুতা হবেন না। ব্রাহ্মণেরা দেখলেন,  
তাদের কথা রক্ষা হলো না, যুবতী তাঁদের  
বাসনাভূরূপ স্বামীর সমাদর কোত্তে সম্মতা  
নহেন, তাই বালা ইচ্ছা কোরে তাঁদের ক্রোধা-  
নল ডেকে নিয়ে এলেন। "তুই বাবি বোলে  
তোর পতি আশা কোরে রয়েছে, সে তোর মুখ  
য়ে পথ তাকিয়ে আছে। তুই বড় বোটা।  
পাপীয়সি! তুই যদি আপনার জেদই বজায়

রাখিস, তুই যদি আমাদের কথা অমান্য করিস,  
তুই যদি হতভ্রম্মা কোরে পতির সঙ্গে সহবাস  
কোত্তে আনন্দধামে না যািস, তবে জয়াস্তরে  
তোর অনুরোধে যে কি হৃদয়শাই আছে, তা তখন  
টের পাবি, লোকান্তরে তোকে যে কি শাস্তি  
কি দণ্ডই ভোগ কোত্তে হবে, তা তুই  
সেই সময়ই জানুতে পারবি।" এই ভয়  
প্রদর্শনের পর ব্রাহ্মণেরা জয়ার পরকালের  
মুক্তিটি কালভয়ে অদ্বিত কোরে মুখে চিত্রিত  
কোলেন। জয়া শুনে মনে কোলেন, হয় ত  
ব্রাহ্মণেরা যা বোলেন, সত্যই হবে। বাবার  
চিত্ত আন্দোলিত হলো, অকরুণ পরকালের  
ভয়ে অন্তঃকরণ শিউরে উঠল। আবার কিন্তু  
কি ভেবে তাঁর মনে সন্দেহ হোতে লাগল।  
বালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তমনে সাতপাঁচ চিন্তা  
কোচ্ছেন, এমন সময় রত্ননাথের ভগ্নী এসে উপ-  
স্থিত। তিনি আত্মবিভ্রম্মনার অন্ধকূলে বিচার-  
বিতর্কের একটি দীর্ঘ স্বত্র গঁথে এনেছিলেন।  
ভগ্নী বোলেন, "লোকটা একেবারে ঢলালি,  
আর যে মুখ দেখাবার পথ রাখলি নে, উচু  
মাথা যে হেঁট হলো। তোমার পিতামহী সতী  
ছিলেন, তোমার খুড়ীও সতী ছিলেন, তোমা-  
কেও তাঁদের প্রদর্শিত প্রথামত চলতে হবে।  
এই শিশি এনেছি, পরো, এর মধ্যে যে বস্ত্র  
আছে, খেলে কষ্টাচর্য থাকে না, শরীর  
অসাড় হয়। ভেবে দেখো, কত বড় নাম-খ্যাতি  
থেকে যাবে, আবহমান লোকে তোমার যশ  
কোরবে, তুমি তাদের চিরস্মরণীয় হবে। আর  
একান্ত কথার অবাধ্য হোলে পরিণামে অনুরোধে  
যে ভোগাভোগ আছে, সেটাও একবার স্বরণ  
কোরে রেখো। ব্রাহ্মণেরা পাষণের ছায় অচল  
এবং অহৃদয়, তাদের প্রার্থন্য তোমার জানাই  
আছে। কথা না শোনো, নাই শুনবে, তারা কিন্তু  
তোমায় অল্পে ছাড়বে না। দিবি কোরে, শাখা-  
পল্লব দিয়ে একটি পরিপাটীর কু-কথা রোচে,  
তোমার ছন্দাম কোরে বেড়াবে, কুলে একটা  
দাগ চোড়িয়ে দেবে, যা এ বংশে কখন হয়  
নি। এখনই তারা জাঁচাজাঁচি কোরে বোলুছে,  
জয়ার অবস্থা কেউ ভালবাসার আছে, নচেৎ  
এত বুলোবুলি কোচ্ছি, তখাচ সে ভেদ ছাড়ছে

না কেন?" জয়া শুনে শিউরে উঠলেন, "তবে আমি সহমরণ যাবো," অভিমানে তার যুগায় এই কথা তাঁর মুখে দিয়ে অর্দ্ধাঙ্গির অধিক বেয়িরে পোড়েছিল। বাল্যকিছু পুনর্জীবন গভীর নিমগ্ন হোয়ে চিন্তা কোত্তে লাগলেন। কি ভয়ঙ্কর কথা! যার যৌবনকালটির তরুণ্যকুর সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, যার দেহ-শোভার চারুমহিমায় মোহিত হোয়ে কত লোক ধাড়াবৎ মনোরুপী কোরেছে, যার শুভ-বিবাহ কেবল সম্প্রতি মাত্র নিষ্পন্ন হোয়েছে, সে বিবাহে আবার কতই ধুম, তুরী, ভেরী, অরচাক প্রভৃতি নানা প্রকার প্রফুল্লকর বাজের প্রমোদ-কোলাহলে বারানসীধাম পরিপূর্ণ হোয়েছে, আজ কি না তারে প্রজ্বলিত হতাশনের মুখে দগ্ধ হোতে বলে! যে জীবনের সঞ্চার হোয়েছে কি না সন্দেহ, আজ কি না সেই নবোদিত জীবন ধ্বংস কোত্তে চায়! ঐ সকল কথা স্মরণ হোয়ে জয়ার প্রকৃতি বিপক্ষ হোয়ে দাঁড়াল। বাল্য মনে মনে অল্পমানে পরাঙ্মুখ হলেন। মনদের বাক্যগুলি শ্রবণ কোরে নিস্তব্ধ রইলেন, তার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। স্বীলোকটি উঠে চোলে গেলো, জয়া আবার পূর্বের মত একাকিনী হোলেন। এই অবসরে সান্ধ্য প্রাপ্ত হোয়ে দেবতাদের উদ্দেশে স্তবস্ততি কোত্তে লাগলেন। তাঁর যেন মনের পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন কুলাচার্য আর ব্রাহ্মণদের কুটিল নিগ্রহ অমান চিন্তে সহ্য কোত্তে পারেন, বাল্য গুরুদেবের কাছে এই বর প্রার্থনা কোলেন। ঘরের দরজাটি আধা আধি খোল ছিল। নীচের একটি কামরায় অনেকগুলি লোক একত্রে গোল-মাল কোচ্ছিল, জয়া তাদের গলার স্বর শুন্তে পাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে মোরোবা রেবে রেবে বড় বড় কোরে কথা কোচ্ছিলেন, তাই যুবতী তাঁর কর্ণস্বর স্পষ্ট বুঝতে পালেন। তার পর একমনে কাণ পেতে থেকে তাঁর পিতার স্কন্ধে প্রতি-প্রয়োচক স্বর শুন্তে পেলেন। শিউরাম যেন সকাতির লাল্যগ্নিত-স্বরে কাকেও বুঝিয়ে বোলচ্ছিলেন। জয়া শুনলেন, তাঁর পিতা সময় তিফা কোচ্ছেন, "তারে বিবেচনা কোত্তে সময় দাও," এই কথা বোলছেন। ব্রাহ্মণেরা

কিছু শিউরামের ব্যাকুলান্বিত করুণ প্রার্থনার অনাদর কোরে "জয়াকে অবশ্যই এ দণ্ডে সহমরণ যেতে হবে," এই বোর ব্যাকুল হির কোচ্ছেন, বাল্যকে বলপূর্বক সহগামি করবার নিমিত্ত শিউরাম পাছে পিতৃপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তাই কুলাচার্যেরা তাঁকে পর্যন্ত অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোচ্ছিলেন। জয়া ব্রাহ্মণদিগের মুখ-উগারি সেই সকল নির্দারক ক্রোধ-বাক্য শুনে, দরজাটি সংলগ্ন কোরে, বিষমমানে পালঙ্কের উপর অবসর হোয়ে পোড়লেন। পিতার লাঞ্ছনা দেহে আত্মরক্ষার প্রতি তাঁর ঔদাস্য জন্মিল। পিতার আর ব্রহ্মকোপে পোড়তে দেবো না, তাঁর দুর্গতি চক্ষে দেখে সহ্য কোত্তে পারি না, তা চেয়ে বরং আমি অল্পগামিনী হবো, পাত সজে চিতা আরোহণ কোরবো, তাই আমি পক্ষে ভাল, - এইটি হির কোরে, সেই কাল বোলতে যেমন দৌড়ে বাহিরে যাবেন, এমন সময় ঘরের দরজাটি খুলে গিয়ে শঙ্কর বামের বিকট মূর্তি তাঁর সন্মুখে উপস্থিত!! তাই জয়া চীৎকার-শব্দ কোরে মুর্ছিত হোয়ে পোড়লেন। শঙ্কর স্তম্ভভয়স্বরে বোলে "জয়া! আমার দেখে তোমায় সয়ে থাকতে হবে, ভয়ে কাতর হোতে পারবে না, আমি কথ্য তোমায় বোলবো, মনোযোগ কোর শুন্তে হবে। যদি ভয়ঙ্কর যোগ হয়, হো তথাচ তোমায় তা শুন্তেই হবে।" এই পৌচক্রিকার পর ঘরের দরজাটি বন্ধ কোরে জয় কানে কানে ফিস্ ফিস্ কোরে শঙ্কর বোলেন, জয়ার মাথায় যেন ধূলা পোড়ে দিলে বাল্য অমন ঘাড়ুইটে কোরে স্বীকার কোরে সে গুরুমন্ত্রের এত পরাক্রম যে, কর্ণে প্রবেশ কোত্তে না কোত্তেই যুবতীর মন ফিরে গেছে। এক্ষণে সহগামিনী হোতে জয়ার আর ওহ আপত্তি নাই। বামনের সঙ্গে খানিকক্ষণ দেখে কি কথাবার্তা হলো, তার পর শঙ্কর বোলে "তবে এক্ষণে আমি চোলেম।"

ব্রাহ্মণেরা নীচের একটি ঘরে বোসে আ-  
বামন এসে শুভ-সংবাদ দিলেন। তারা শু  
একটি চীৎকার-শব্দ কোরে সকলেই যুগ



স্বানন্দ-কোলাহল কোরে উঠলো। তাতেই প্রাণ পেলে যে, মনকামনা সিদ্ধ হওয়ায় তারা তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। কর্তৃপক্ষেরা, বৃদ্ধী, এবং রঘুনাথের অল্প অল্প স্বাস্থ্যকরী স্বীলোকেরা এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উপরে চোলে গিয়ে জয়ার সম্মুখে জয়দে প্রণিপাত হতে লাগল। এবং দৃষ্টান্তনত কোরে তাঁর পরিহিত বস্ত্রাঞ্চল বার-বার চুম্বন কোত্তে লাগল। জয়া আর মানবী নাই এক্ষণে দেবদায়ী হয়েছেন। অল্প পরের ত কথাই নাই, গর্ভিত ব্রাহ্মণদেরও তাঁর সম্মুখে মস্তক অবনত কোত্তে হয়েছিল। দেবীজ্ঞানে চিত্তাহিতেরা স্তবস্ততি কোরে জয়ার মালায়্য কাটন কোলেন। তৎকালীন রঘুনাথের বাড়ীতে প্রাণ যারা উপস্থিত ছিলেন, জয়ার দেবীর পদ স্পর্শে বোলে সকলেই সেইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে লাগলেন। ফলে এক্ষণে তাতেই একবাক্য হোয়ে জয়কে দেবীপদগোষ্ঠে বরণ কোলেন। বৃত্ত ব্রাহ্মণেরা এই সকল কৌশল দ্বারা শ্রদ্ধাদান দিয়ে, অবলাদের অবোধ মন প্রতারিত করে, বঞ্চকেরা ধর্মপ্রবর্তা হয়ে, মনের মতরূপ পরলোক চিত্রিত কোরে চক্ষের উপর ধোরে দেয় সেই সাহসে প্রফুল্লিত হোয়ে সনাত্না স্বামিহীন রমণীরা মনের ভীকৃতাকে পরাজয় করে। প্রতারকেরা বৈকুণ্ঠবাসের প্রণোভ দেখিয়ে পতিপ্রাণা অভাগিনীদের অসংকরণে সজীব উৎসাহের স্ফূর্তি কোরে দেয়, কসংকারাপন্ন নির্বোধ হতভাগিনীরা সেই সতেজ উৎসাহে উন্নতা হোয়ে স্বচ্ছাপূর্বক অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ প্রদান করে। তবে কোনো কামিনীকে বোলতে কইতে বা জোরজবরদস্তি কোত্তে হয় না সত্য, তারা আপনারাই ইচ্ছা কোরে পুড়ে মরে, নিবারণ কোলেও শুনে না, এ কথা শুন্তে বড় অদ্ভুত বটে, কিন্তু তার তাৎপর্য আছে। একে তো তারা অবোধ অবলা জাতি, তায় বদ্ধ বিনা মনের পরাক্রম আদৌ নাই, তার উপর তও ব্রাহ্মণদের মহা উৎসাহ দেওয়া আছে, পাশও যাদাবীদের মোহিনী মস্ত্রে যুদ্ধ হোয়ে অচতুর অবলারা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। প্রতারকেরা এমনি কুহক মস্ত্র পড়ায়, শুনে বোধ হয়, পর-

কালের স্বধসম্পদগুলি এনে যেন হাতে তুলে দিলে, যেন মুখে বোলে দিচ্ছে, “এই নেও, ধরো, এ সকল সম্পদ তোমার নিমিত্তই ধরা রয়েছে।” একে অবোধ, তায় এই বিষম ভেদী, অবলারা একেবারে বিমোহিত হোয়ে পড়ে। লোকের উপাস্ত্র দেবতা হবে, স্বামীর সঙ্গে একত্রে অনন্ত নিবাসে অক্ষয় আনন্দ ভোগ কোরবে, পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি থাকবে, পুণ্যের শ্লোক হয়ে মর্ত্যলোকের চিরপ্রাতঃস্মরণীয় হবে, লোকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা কোরবে, বর প্রার্থনা কোরবে এবং দেবতাদেরও শ্রদ্ধাস্পদ হবে। প্রথমেই ত এইগুলি মস্ত্র অভিমানের সম্পদ, তার উপর ব্রাহ্মণেরা পুনঃপুনঃ ধর্মত বাক্যে আশ্বাস কোত্তে থাকে যে, নিত্যাধামে স্বামীর সঙ্গে অনন্তসুখের অধিকারিণী হবেনই হবেন। এই সকল প্রবৃত্তি-দান পেয়ে অবলারা আত্মাদে গলে পড়ে, তাদের হৃদয় অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য কোরে উঠে। অনেকে আবার লোকলজ্জা, লোকগঞ্জনার ভয়েও অহম্মতা হয়। অনেকে আবার গৃহযজ্ঞগার হাত থেকে নিস্তার পাবার জ্ঞেও আত্মঘাতিনী হয়। তা যাই হোক, ব্রাহ্মণেরা এইরূপ নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার কোরে আপনাদের আধিপত্য রক্ষা করে এবং তাদের কুধিঃপ্রাপিত ধর্মের প্রতি লোকের অহুরাগ উদ্দীপ্ত কোরিয়ে দেয়। তাতেও তাঁদের প্রয়োজন-তৃষ্ণার শাস্তি হয় না। স্বার্থকুশল বঞ্চকেরা যুদ্ধ শাস্ত্রগৌরব রক্ষা কোরেই যে নিবৃত্ত হয়, তা হয় না। তারা ধর্মের মাহাত্ম্য গাইতেও ক্রটি করে না, অথচ আবার আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখতেও বিস্মৃত হয় না। সহযরণের সময় সতীর স্বজনের নিকট ব্রাহ্মণেরা বিস্তার অর্থ আত্মসাৎ করে। মায়াবীদের উদয়গিরি শাস্তি হোলে যে সকল আত্মীয়বর্গ সতীকে পরিবেষ্টন কোরে থাকে, তাদের কস-ল্লের সময় এসে পড়ে, তারা তখন সেই অনাথা দুঃখিনীর বস্ত্র-অলঙ্কার লুণ্ঠিতে সুরু কোরে দেয়। সেগুলি গায়ে থেকে খুলে আপনারা হিন্তে কোরে লয়। একজন ই-রাজ গ্রন্থকার বোলে- ছিলেন, “এই নিষ্ঠুর ব্যবহার কি চিরকালই

প্রচলিত থাকবে? কোনো ভীষ্মপরাক্রান্ত রাজা দুর্দান্ত হস্ত প্রসারিত কোরে ভ্রমাক্ষ কুপে পতিত সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকটিকে প্রজ্ঞানদায়ির ভয়ানক শিখামুখ থেকে কি উদ্ধার বোঝবেন না? এমন সময় কি দেখন হবে না?”\*

জয়া অল্পমতা হবেন, এই কথা প্রচার হোতেই রঘুনাথের বাড়ীতে লোকের আমদানী হোতে লাগল। যোগী, সম্যাসী, গোশালী, আর ব্রাহ্মচারীতে বাড়ীটি গিস্ গিস্ কোতে লাগল। ধর্ম্মাভিমানী পবিত্র সাধুরা শীর্ণ, শুষ্ক, রুগ্ন হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, তাঁদের ভিক্ষা সুলীর মুখ চিরকালই উজ্জ্বল, অপরূপ হয়ে থাকতে কখনই দেখা যায়না। ঐ চিরযুক্ত সুলীর মধ্যে মুটো মুটো চাল, ছোলা, যব প্রভৃতি নানা প্রকার শুষ্ক শস্ত পোড়তে লাগল। তার পর একদল স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত হলো, তাদের হাহাকারের দাপটে গগন কম্পিত হোতে লাগল। অর্দ্ধ-উলঙ্গ হোয়ে বুকের উপর গুম্ গুম্ কোরে নিষ্ঠুর কিল আর ঘুসি মাতে লাগল, ক্রোধোজ্জল প্রলম্বান কুন্তলগুলি ছিঁড়ে যেন হুড় হুড় কোরে ফেলে, এইরূপ ভাণ আরম্ভ কোরে দিলে, থেকে থেকে এক একবার “রঘুনাথ! রঘুনাথ!” বোলে চীৎকার কোরে উঠতে লাগল। ঐ প্রকার বিলাপ করবার নিমিত্তেই তাদের ক্রোয়া কোরে আনা হয়। বামনের বড় উদ্‌যোগী স্বভাব, তাই সংকার উপলক্ষে যে সকল লোক সদা সর্বদাই কর্ম্ম-কাজ কোরে থাকে, ব্যস্ত-স্বভাব শব্দর পূর্ব্বাহ্নেই তাদের উপর চিতা প্রস্তুত করবার অল্পমতি দিয়ে রেখেছিলেন। মোরোবার মনে ভয় হোচ্ছিল, কি জানি, জয়ার অন্তঃকরণ কিরে গেলেও যেতে পারে, তাই ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা কোরে লেগে গেলেন, যাতে প্রেতভূমির ব্যাপারটি শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়, তারি তদবির কোতে লাগলেন। জয়া ছাত্তের উপস্থ থেকে সেই সকল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর উদ্‌যোগগুলি

হাঁ, সে শুভ সময় বহুকাল হইল আগত হইয়াছে। ইতিহাসবেত্তাদের এক্ষণে কেবল এই কথা লিখিতে হইবে যে, হিন্দুস্থানে সহস্রাব্দেও এককালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে কথা না কেহ কর্ণে শুনিতে পায়, না সে ঘটনা কেহ চক্ষে দেখিতে পায়।

দর্শন কোতে লাগলেন। তাঁর এখনকার অবস্থা যথার্থই ভয়াবহ, মনে হোলে হৃৎকম্প হোয়ে শরীর স্তম্ভিত হয়।

মমতামুগ্ধ পিতা শিউরাম যখন একমাত্র কন্তারঙ্গের সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ কোরেন, শোকের তাড়নায় আপনার হস্ত আপনি মোচ্ ডাতে লাগলেন। যদি মোরোবা আর তার পারিষদেরা বলাকরণ পূর্ব্বক তাঁকে ধোরে না রাখতো, তবে শিউরাম তখন ছুটে গিয়ে তাঁর কণ্ঠকে নিবৃত্ত কোন্তেন। ব্রাহ্মণেরা দল বেধে আড় হোয়ে পোড়ল, জয়ার কাছে তাঁকে যেতেই দিলে না। অধিকন্তু অগ্নিমূর্ত্তি হোয়ে বহু নাদে কেবল শাপান্ত কোতে লাগল, আর মগে মগে চোক-মুখ আরম্ভ কোরে শিউরামকে শাসাতেও লাগল। ব্রাহ্মণের অপরাধ এই যে, সাক্ষাৎ কালের স্বরূপ, ঘোড় ভয়ানক অভিভূত থেকে তাঁর একমাত্র স্নেহপাত্র দুহিতাকে নিবৃত্ত হোতে অচ্যুত কোরবেন। ব্রাহ্মণদের মুখে ঐ সকল অভিসম্পাত আর ভয় দর্শনের ভৈরব নিনাদ আশ্রয় হোয়ে ভীক্সভাব নিরীহ শিউরামের পায়ে কেঁটে শৃঙ্খল পোরিয়ে দিলে, কেউ যেন গায়ে বেড়ি দিয়ে সেই স্থানে থাকে বেঁধে রেখে দিলে, তাঁর আর উঠে যাবার ক্ষমতা হলো না। শিউরামের দুই চক্ষু বেয়ে ধারাসম্পাতের স্তম্ভ অশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগল, তাতেই বা কি চিন্তাসন্তাপের লাঘব হলো, নচেৎ তাঁর শোকসন্তপ্ত দগ্ন হৃদয়ের উপশান্তি হবার আ কোন পথ ছিল না। শিউরাম তাঁর সন্ধ্যা একমাত্র মধুরহাসিনী অমৃতভাবিনী কন্তারঙ্গের বিয়োগ চিন্তা কোরে মনঃপীড়ার বাতনায় ছট্ ফট্ কোচ্ছিলেন, তাঁর সে দুঃসহ দুর্গতি স্বচক্ষে দর্শন কোরে মোরোবার অন্তঃকরণ কোমল হলো না, বরং বৃদ্ধ গরিব ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়ে যতই অশ্রুপাত হতে লাগল, মনোবল পূর্ণ হলো বোলে মোরোবা তথা আত্মদেহ জ্বলতে লাগলেন এবং তাঁর প্রতি ফল দানের পিপাসা ততই লাঘব হোয়ে আসতে লাগল।

স্বভার বিষাদপূর্ণ বিলাপভেরী বেজে উঠল

জয়ার দরবার উপর গোসায়ের দল শ্রদ্ধাধিনি কোরে শোকনাদ কোন্তে লাগল। কিছু দিন-মাত্র পূর্বে যে অটালিকা কুসুমদামে সুসজ্জিত হোয়ে জয়া তার মধ্যে কোনে-বেশে প্রবেশ কোরেছেন, পুরোহিতেরা এক্ষেপে সেই সকল অটালিকার মধ্য উঠান দিয়ে বালাকে লোয়ে চোলেন, সেই সময় বিলাপকারীদের বাহাড়-হরের শোকনাদ জয়া স্বকর্ণে শুন্তে লাগলেন। দিবাহের রাত্রে শুদ্ধবৎ শুভ্র যে মসৃনি বস্ত্র-ধানি বালা পরিধান কোরেছিলেন, আর পরিণয়-দিবসে যে সকল অলঙ্কার তাঁর সূচাক মনোহর লাভণের গৌরবাস্তি রুদ্ধি কোরে-ছিল, জয়া আজ সেই বস্ত্র, আর সেই সকল অলঙ্কার পরিধান কোরে চোলছেন। ব্রাহ্ম-সারী ফুল মালা লয়ে তাঁর গলার ফেলে ফেলে ঝেঁতে লাগল। সুন্দরী গম, ছোলা, ধান, যব প্রভৃতি শুদ্ধ শস্যপূর্ণ একটি সাজী বামকক্ষে রেখে দিলেন। ঐ সাজী থেকে ক্ষুধাধী ভিক্ষু-দিগকে মুটো মুটো দান কোন্তে লাগলেন। দক্ষিণ হস্তে বৃত্ত স্বায়ীর পরম, ঐ খরম বারম্বার বুকের উপর রেখে চেপে চেপে ধোচ্ছিলেন। জয়ার পার্শ্বে রঘুনাতের পুরস্বীগণ, তারা তাঁর পিতৃবশাদের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে চোলেছে। এরাই কিন্তু যথার্থ কাতরস্বরে বিলাপ কোচ্ছিল, আবার এরাই কিন্তু দুর্গধনী জয়ার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করবার নিমিত্ত ভিড় ঠেলে অগ্রসরও হোচ্ছিল, জয়া তখন নিরলঙ্কার হোয়ে গহনাগুলি দান কোন্তে কোন্তে যাচ্ছিলেন। বালা দেখেই চিন্তে পালেন যে, তাঁর বিবাহের দিবসে যে সকল বাদক বাজুক এসেছিল, আজও তারাই এসেছে, সেই রূপ, সেই অবয়ব, সেই পরি-চ্ছদ, তাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। সে সকল লোক ঠিকে ভাড়াটে, তারা বিবাহের ধোস্ আমোদের প্রফুল্ল বাদ্যই বাজাক্, আর মৃত্যুর শোকাবহ স্বরভঙ্গ গভীর নিনাদই করুক, তাদের মনের বিকার কিছুতেই নাই, না তাতেই তাদের আমোদ জন্মে, না এতেই তাদের দুঃখ হয়! তাদের কাছে পরের শোকা-জ্ঞান দুইই সমান, অর্থাৎ তাদের পূজা, আর

অর্থাৎ তাদের উদ্বেগ। একান্ত অল্পগমনাত্মক সতীর অগ্রে অগ্রে কতকগুলি অর্দ্ধ-উলঙ্গ সন্ন্যাসী ধুলোর উপর পোড়ে, বুকে হেঁটে দেহের পরিমাণ দিয়ে চিতা পর্যন্ত পথ মাপতে মাপতে চলো। ধঞ্জেরা “মাই! ভিচ্ছা দে” বোলে ডাকতে লাগল। অন্ধেরাও হস্ত বিস্তার কোরে “ভিচ্ছা দে, ভিচ্ছা দে” বোলে চোঁচাতে লাগল। জয়া অমনি মুটো মুটো শুকনো শস্য দান কোঙে কোঙে চোলেন।

জয়া এক একখানি কোরে গায়ের গহনা-গুলি খুলতে লাগলেন, ডাইনে বাঁয়ের স্ত্রীলো-কেরা গাণসোমন্ত হোয়ে অমনি হাতে থেকে কেড়ে কেড়ে নিতে লাগল, ভ্রমবশতঃ এক ব্যক্তিকে দুবার দুখানা গহনা দেওয়া হোয়ে-ছিল, তার প্রতিপক্ষ, যে বাঁয়ে ছিল, তাই দেখে কোঁধে শোকতাপ ভুলে গিয়ে টেঁচিয়ে চীৎকার কোরে মহা গুণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে, সেই গোলযোগে লোকের চলাই প্রায় রহিত হলো। যেমন না বাঘিনী রাগে, ঐ স্ত্রীলোকটি সেইরূপ কোঁধ উন্নত হোয়ে তার প্রতি-অভি-লাষীর উপর ঝাঁপিয়ে পোড়ে তার নাক, মূণ, আঁচড়িয়ে কানড়িয়ে কালশিরে পাড়িয়ে দিলে, নিষ্ঠুর নখাঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হলো। এক দিকে একদল কোঁধে কালাগিবৎ হোয়েছে, অপর দিকে একদল চীৎকার কোরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, জয়া ঝগায় বিরক্ত হোয়ে মন্ত কেশিনীদের সোরিয়ে তফাত কোরে দিয়ে গোল থামাবার চেষ্টা কোচ্ছেন, কিন্তু পেরে উঠছেন না। পথের মধ্যে গুণ্ডগোল হওয়ায় সঙ্গে যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাঁরা সেই অভি-নয় স্থলে এসে উপস্থিত হোলেন। মোরোবার চেষ্টা যে, তায়মত বিচার হয়, তিনি মীমাংসা কোলেন, সতী যারে যা হাতে কোরে দেবেন, সে সম্পত্তি তারই হবে, তাতে আর কেউ দাবি কোন্তে পারবে না। যে না পেয়ে অসন্তুষ্ট-হয়েছে, মোরোবার ঐ মীমাংসা তাকে সন্তুষ্ট কোন্তে পাল্লে না। সে বোজ্জে, এমন অজায় কাজ হোতে দেবো কেন; সকলকেই সমান সমান ভাগ কোরে দিতে হবে। তার

প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত যে অলঙ্কারখানি পেয়েছিল, আর তার নিজের ভাগ্যে যা পোড়েছিল, ঐ দুইখানি গহনা বার কোরে মিলিয়ে দেখে বোলে, “এই দেখো, ও যে গহনা পেয়েছে, তারই বা কি মূল্য, আর আমি যা পেয়েছি, তারই বা কি মূল্য, এখন বিচার কোরে সমান সমান ভাগ কোরে দাও।” ব্রাহ্মণদের ইচ্ছা যে, আপোসে রক্ষা হোয়ে মিটমাট হোয়ে যায়, কিন্তু সেটি হোয়ে উঠল না, তাদের সে কথা কেউই শুনলে না। বিলাপীদের মুখে যা আসছিল, তাই বোলে তারা গালাগালি দিতে লাগল, তাদের মুখ দিয়ে যেন গালাগালির শ্রোত বোয়ে চোম্বো। এক্ষণে তারা রঘুনাথ আর জয়ার সম্পত্তি ভাগ কোন্তে বসেছে, সেই গুরুতর কার্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তারা তাদের নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হোয়ে গেছে। লোকজনেরা পথের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল, ভেরী তুরী, জয়ঢাক প্রভৃতি সকল বাদ্যই নীরব, কোন ধুমধামই নেই, পথের মধ্যে যেন নীরব নিশ্চব্দের তরঙ্গ অবস্থিতি কোন্তে লাগল। কেবল মাগিদের গলাবাজি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। গোসাক্ষীরী কিন্তু বুকে হেঁটে হেঁটে ধুলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে চোলে যাচ্ছিলেন, তাঁরা ঠিকানায় পৌঁছে পথের উপর উরুড় হোয়ে পোড়ে আছেন, সাক্ষেতিক ইঙ্গিত হলে তবে তাঁরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। জয়া কাতর হোয়ে যোড়হাত কোরে কত স্তবস্তুতি কোন্তে লাগলেন, যদি বিবাদিনীরা তাঁরে পথ ছেড়ে দেয়, তা হোলে তিনি চোলে যান, কিন্তু তাঁর সে অনুরণ-বিষয় কেউ কানেও ঠাই দিলে না। মাগীরা হাতমুখ নেড়ে, চোপাবাজি কোরে পথ-বাট মাথার কোরে নিলে, কৌদল ভূতের জয়জয়কার হলো। অস্ত্র আকারের আর একটি ভূত এসে ঐ কৌদল ভূতকে পরজয় করে, তবে সকলে নিরস্ত হয়। বামন ব্রাহ্মণ শব্দর এতক্ষণ পর্যন্ত অধীর হোয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিলেন যে, কতক্ষণে সতী দলবল সঙ্গে কোরে সমাগতা হবেন। এক্ষণে বিলম্ব দেখে তিনি স্বয়ং চোলে এসে রাগন্ত হোয়ে বোলতে লাগলেন, “কেন এত দেরি হোচ্ছে ?

এত বিলম্ব হবার কারণ কি ?” কালারিয়ার শব্দরের সেই ক্রোধমূর্তি দেখে যারা যারা বকড়া কোচ্ছিলো, অমনি চুপ কোলে, কারণ মুখে আর বাক্য নেই, তাদের রসনায় যেন কেউ হুনপড়া ছোড়িয়ে দিলে। শব্দরের উগ্র আকৃতি দর্শন কোরে জয়াও কাঁপতে লাগলেন। সেই বিকটাকার ব্রাহ্মণ যখন শুনলেন যে, এই এই কারণে বিলম্ব হয়েছে, তখন তিনি মস্তকটা একবার নাড়া দিয়ে, হাতে একগাছা মাথাচেরা লাঠি ছিল, সকলে তারে শব্দরের কৌতুকা বোলতো, ঐ কৌতুকা গাছটা মাথার উপর উচু কোরে, দুই চক্ষু লাল কোরে কটমট কোরে যুগতে লাগলেন, তাই দেখে সকলের পেটের পিলে চমকে গেল। শব্দর সেই বিকটভঙ্গিতে চোক যুগতে যুগতে গভীর নিনাদে বোললেন, “মা সকল! হোমাদের বড় দুর্ভাগ্য, কি চাও তোমরা ? হয় বো, কি দরকার তোমাদের, নচেৎ ঈশ্বর—” শব্দরকে আর অধিক কথা কইতে হলো না, ঐ কটি কথা বোলতেই স্রীলোক-গুলি তার পায়ের উপর এসে পোড়ে কঁদে বোলতে লাগল, “শব্দর! দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, সমান সমান ভাগ হোক।”

বামন ঐ কথা শুনে একখানি লাল সাল মাটিতে পেতে একটি অজুগী সেই দিকে হেলিয়ে রাখলেন,—এ সঙ্কেতের অর্থ সকলেই বুঝতে পারল। তাই দেখে যে যত গহনা লয়েছিল, সকলে রূপ, রূপ কোরে সেই সালের উপর ফেলে দিতে লাগল। তার পর শব্দর জয়াকে ইসারা কোরে তাঁর বাকী গহনাগুলি দিতে বোললেন। শোক-সন্তাপে বিহ্বলা সেই কোমল-স্বদয়া বালা গহনাগুলি তদগোঁই যুক্ত কোরে দিলেন। সালখানি রসালঙ্কারে পরিপূর্ণ হলো, সেগুলি জয়ার বিবাহের যোহুক। অলঙ্কারের হাদ্যমা শেষ হোলে সেই কিজুতমূর্তি বামন রক্ষাকার অন্নানবদনে সালখানার চারটে কোণ একত্র কোরে আচ্ছা কোরে কোসে বেঁধে, একটা গেরো দিয়ে আপনার গোসা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। রসালঙ্কারগুলি ঐরূপে হস্তগত কোরে গভীর

প্রাচীন-ভগ্নস্থরে লোকসমারোহকে অগ্রসর হতে  
সম্মতি কোলেন। শব্দের আদেশ পেয়ে  
সঙ্গে অগ্রসর হোতে লাগল। বিবাদিনী  
কালকেরা কতক লজ্জায়, কতক মনোহুংখে  
হুঁচোক ঢেকে, অভিযানে মন ভারি কোরে  
পশাৎ পশাৎ চলে, তাদের সে কৌদল যে  
শেষ হবে, বিবাদিনীরা তা স্বপ্নেও মনে  
করেন নি। কি শব্দর যে এরূপ ছলনা কোরে  
তাদের নৈরাশ কোরবেন, তাও তাদের মনে  
কখন উদয় হয় নি। বিবাদিনীরা অতি মনমরা  
হয়ে চোলেছে, মনে মনে বতিশয় ব্যস্ত হতে  
লাগল যে, গহনাগুলি কতক্ষণে ফিরে পাবে।  
জয়ার অঙ্গুগমনের প্রতি তাদের যে যত্ন আর  
আগ্রহ ছিল, এক্ষণে সে যত্ন, সে আগ্রহ উদাস  
হয়ে পোড়ল। বিবাদিনীদের মন নৈরাশে  
এই হোক, আর উৎসাহে প্রফুল্লিতই হোক,  
তাদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোলেতে হয়েছিল,  
বোধ হয়, তারা তখন এই মনে কোরেছিল,  
জয়া অন্তর্দীন হোলে ঐ সকল রত্নালঙ্কার শব্দর  
তাদের মধ্যে বিভাগ কোরে দেবেন। এই  
পরিবোধবুদ্ধি উদয় হোয়ে পুরস্কৃতদের মন অনেক  
দুঃস্থির হলো। তারা এক্ষণে শোক-সন্তাপের  
তান কোরে মুখে হাঁপকার কন্ডে লাগল,  
কলে যথার্থ কথা বোলতে গেলে, এই শোক-  
সমারোহের বাপারে তাদেরই কিন্তু যথার্থ  
দাখিত হতে হয়েছিল।

যেখানে স্ত্রীলোকেরা চিতারোহণ করে, সে  
স্থানের নাম 'কালক্ষেত'। শব্দর দেখলেন যে,  
অলঙ্কারগুলিও হস্তগত হল, আবার লোকজনও  
পূর্বের মত চোলেতে আরম্ভ কোলে। তাই  
দেখে তিনি তখন সেই কালক্ষেতের দিকে  
ছুটলেন, সেখানে উপস্থিত হোয়ে কখন কাঠের  
উপর বসে চোলেতে লাগলেন, কখন বা ধুন  
উড়িয়ে দিতে লাগলেন, সকলকে দেখাতে লাগ-  
লেন যে, এ কাজে তাঁর ভারি যত্ন। সব শুধিয়ে  
দিয়ে প্রস্তুত কোরে শব্দর পুনরায় অগ্রসর  
হয়ে অস্তোষ্টি-সমারোহের লোকজনকে অবগত  
কোন্তে চোলে। তখনও সেই বহুমূল্যের  
বস্ত্রের বুলিটি তাঁর কাঁধে ঝুলছিল, মাথা চেঁরা  
সেই কাঁৎকাটিও উর্দ্ধে উঁচিয়ে রেখেছিলেন।

জয়া আন্তে আন্তে সেই মধ্যাহ্নিক সাংখ্য-  
তিক স্থলে উপনীত হোলেন। বামনের কথায়  
বিশ্বাস কোরে তিনি যে আত্মবিস্মৃত হোয়েছেন,  
তাই এক একবার আক্ষেপ কোরে অমৃতাপ  
কোন্তে লাগলেন। আর আর লোক-জনের  
অপেক্ষা শব্দরকে অধিক ব্যস্ত দেখে বামনের  
প্রতি তাঁর ঘৃণা বোধ হোতে লাগল এবং আপ-  
নাকে ধিকার দিতে লাগলেন যে, তার কথায়  
মুগ্ধ হোয়ে তিনি আত্মজীবনে জলাঞ্জলি দিতে  
চোলেছেন। চিতা সাজাতে দেখে বালা ভয়ে  
জড়সড় হোতে লাগলেন, তখন সেই চিতা-তলে  
অনল-সংযোগ করা হোয়েছে, আর তখন সেই  
চিতা-মুখ হতে রাশি রাশি দমশিখা স্তম্ভাকারে  
সমুখিত হোচ্ছিল। জয়ার প্রবেশমাত্র অপেক্ষা  
ছিল, সেইটি হোলেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে চতু-  
র্দিকে অনলক্ষেত্র হোয়ে পোড়ত। চিতানলের  
করাল মুষ্টি দর্শন কোরে জয়ার মনের মূর্তি  
অপ্রক্লিত হলো। সমভিব্যাহারী একজন পুরো-  
হিত বালায় চিতচাঞ্চল্য লক্ষ্য কোন্তে পেরে  
অগ্রসর হবার জন্ত জয়াকে বিষম পেড়াপীড়ি  
কোন্তে লাগলেন, মতাকে বোঝা, "এ পর্য্যন্ত  
এসে আর ফিরে যেতে নাই, তাতে বড় অদর্শ  
হয়, নিরয়গামী হোতে হয়, মনে তোমার যাই  
থাক, তুমি আর জীবনের মায়া করো না।"  
আর ত এক্ষণে উপায় নাই, জয়া বেদোক্ত মন্ত্র-  
পাঠ কোন্তে কোন্তে কাম্পিত-কলেবর হয়ে  
চিতার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চিতার এক  
পাশে কতকগুলি ধাপ ছিল, জয়া ঐ ধাপ বেয়ে  
উঠবেন বোলে শব্দর সেগুলি পূর্বেরি গাঁথিয়ে  
রেখেছিলেন। শব্দর পূর্বাহ্নে ঐ চিতার উপর  
উঠে ভিতরের দিকে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে  
লাগলেন। যেখানে যেটির দরকার, সেগুলি  
বিলি ব্যবস্থা-মত সাজান হোয়েছে দেখে ভৈরব-  
নাথে চীৎকার কোন্তে লাগলেন। এদিকে  
লোকারণ্য শব্দরের দেখাদেখি তারাও  
চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে শাশানভূমি  
আকুল কোরে তুলে। বামন এই সময় স্বক-  
থেকে অলঙ্কারের বোকাটি নামিয়ে ধূম-উখিত  
চিতার মধ্যস্থলে ছুড়ে কেলে দিলেন, তাই দেখে  
অর্ধলোলুপ পুরবাদী স্ত্রীলোকেরা আশা-অভি-

সন্ধিতে নৈরাশ হলো। এপর্যন্ত তারা এই উদ্বেগান্বিতে দগ্ধ হোচ্ছিল যে, কতক্ষণে সেই সকল অবলুপ্তিত অলঙ্কারগুলি শঙ্কর তাদের মধ্যে বণ্টন কোরে দেবেন। অলঙ্কারগুলি চিতাগর্ভে নিষ্ক্ষেপ করবার সময় শঙ্কর দানোর মত দাঁত-মুখ খিচিয়ে বিকট মুখ কোরেছিলেন, তাঁর সেই নীরস মুখের বিকট ভঙ্গী দেখে সকলে অস্থত্ব কোলে, শঙ্কর গহনাগুলি অগ্নিতে সমর্পণ কোরে মনে মনে মহা আত্মদ্রবিত হোয়েছেন। অলঙ্কারগুলি এক প্রকার পুরবাসিনীদের হাত মুচড়ে কেড়ে লওয়াই হয়েছিল। তারা এক্ষণে দেখলে যে, সেগুলি একান্ত-আশ্চর্যের মত হাত-ছাড়া হোয়ে গেল, তাই দেখে তারা যুহুমন্দ অচুচ ভঙ্গিতে গুন্ডে গুন্ডে কাঁদতে লাগল, মনের ক্ষোভে গায়ের বস্ত্রগুলি কাঁৎ কাঁৎ করে ছিঁড়তে লাগল, আর এই সময় সন্তাপিনী জয়াকে আশীর্বাদ এবং হিংস্রক বামনকে শাপান্ত কোত্তে লাগল, তাদের মর্যাদাস্তিক মনোকষ্টগুলি শঙ্কর অস্বাভাবিক দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখলেন, অথচ দুঃখিত কি অস্বচ্ছন্দ-চিন্তা হোলেন না। শঙ্কর এক্ষণে চিতার উপর থেকে নেবে নীচে এলেন, অভাগিনী জয়া ঐ চিতার উপর আরোহণ করবার উদ্যোগ কোলেন, রত্ননাথের পুরোহিতেরা বিমল-কান্তি কোমল বালার দুপানি হাত ধরে তুলে দিতে চোলেন। সোনার প্রতিমায় অনল-তরঙ্গে ভাসিয়ে দিতে চোলেন! অমল তরুণ-প্রভার নবীন-যুবতীকে চিতাশয্যায় শয়ন করাতে চোলেন। অন্তঃকরণে দুঃখ নাই, খেদ নাই, ক্ষোভ নাই, অকাতর-হৃদয়ে বালাকে চিতার উপর তুলে দিতে চোলেন।। সহস্র সহস্র লোক কাঁক বেধে এসে দেব-মূর্তি বালার পরিহিত বসনাঞ্চল চুখন কোত্তে লাগল, তাদের নির-হঙ্কার উদার শ্রদ্ধার কোমল সমাদর থেকে দেবী-বির্ভাবা জয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়াই ভাব হলো, তাদের সেই ভক্তিময় সবিনয় সমা-রোধ হতে অব্যাহতি পেতে বালাকে অনেক কষ্ট কোত্তে হোয়েছিল, অচলা ভক্তির, বিমল শ্রদ্ধার এমনিই প্রাহুর্ভাব।

জয়া পাছে ভয়ে পেছিয়ে আসেন, তাই

করণাময় ব্রাহ্মণেরা একটা একটা ঠাণ্ডা, পেট বা একটা একটা লম্বা বাঁশ হাতে কোরে চিতার চারিদিকে ঘেঁরে দাড়িয়ে রইলেন, বালার মূর্তি ব্রাহ্মণেরও অসাহস বা চঞ্চলচিত্তের আভাস প্রকাশ কোত্তেন, তবে ঐ কুপানিধানেরা নিশ্চ-য়ই ঐ ঠাণ্ডাগুলিকে মূর্তিমান কলিদগু কোরে তুলতেন। চিতা বেড় দিয়ে চারিপাশের কাঠ-গুলি উপর্যুপরি কোরে সাজান ছিল, তাতে আগুন ধোরিয়ে দেওয়া হোয়েছে, দাউ দাউ কোরে জলছে, চারিপাশের জলন্ত কাঠগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে চিতাখর্ভে পড়বার সময় হোয়েছে। শঙ্কর একখানি জলন্ত কাঠ লয়ে চারিদিকে গুরুতে ফিকতে লাগলেন, দর্শকেরা কোঁক কোম্পত হোয়ে সিংহনাদ কোত্তে লাগল। এই সময় জয়া একটি লক্ষ প্রদান কোরে চিতা-কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কোলেন। তাই দেখে ধানিকঙ্কণ কি ভেবে শঙ্কর সকলের আগে জলন্ত কাঠ চিতাখর্ভে বুগ বুগ শব্দে নিষ্ক্ষেপ কোত্তে লাগলেন। যারা যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, শঙ্করের দেখাদেখি সকলেই ঐ প্রকার জলন্ত আগুন ফেলে ফেলে দিতে লাগল। বাঁশ কি লাঠি, যার হাতে যা ছিল, চিতার উপর দমা-দম মাত্তে লাগল, চিতার আগুনগুলি অমনি বিকটমূর্তি ধোরে হুর্দান্ত প্রজ্বলিত শিখা হোয়ে জলে জলে উঠতে লাগল।

পুরজীরা এ পর্যন্ত কেবল রত্ন-অলঙ্কারেরই চিন্তা কোচ্ছিল। অলঙ্কারগুলি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্ক্ষেপ হওয়া অবধি তারা কেবল ফুলে ফুলে, গেড়িয়ে গেড়িয়ে কাঁদতেছিল। জয়াকে লক্ষপ্রদান পূর্বক চিতাকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ হোতে দেখে না তাদের দুঃখই হলো, না তারা বিষয়ভাবই প্রকাশ কোলে, না তাতে তাদের আত্মদ্রবিত জগিল, কেবল অন্যমনস্ক হোয়ে উদাস্যভাবে একবার চিতার দিকে চেয়ে দেখলে মাত্র, আবার তারাই কিন্তু সকলের আগে বাড়ীমুখ প্রস্থান কোলে। হায়! অর্ধের কি অপূর্ণ লীলা! সে কতই মায়ী দেখায়, অর্ধে স্নেহ জগিয়ে দেয়, কল্পনা উদ্দীপ্ত করে, আত্মীয়তা বাড়ায় এবং আহরক্তি বৃদ্ধি করে; সত্য কথা বোলেতে কি, অর্ধের হাড়ে যেন ভেদী খেল।

দোষের কৃষ্ণায়া ক্রমে নিবিড় হোয়ে এলো, তাটি এখনও পর্যন্ত ধুঁ ধুঁ কোরে জ্বলছে, গিরি বিরাট ভেজোমূর্তি চতুর্দিক চক্রাকার গুহে কতকদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হোয়ে পোড়েছে। ই উৎসবোপলক্ষে যাদের ক্রেয়া কোরে আনা হচ্ছিল, তারা তাবতেই চিতার নিকটে এসে কত্রে জমা হলো, যার যে কাজ ছিল, শেষ দ্বারে মধুপানে ঢলাঢলি কোন্তে লাগল, এত মত্ত হলো যে, লজ্জা-সন্ত্রম, অহুরোধ উপরোধ ভিত্তি ভব্যতা, তদ্রূপ তথনি সেখান থেকে দাঁট পালাল, মুখে কাপড় দিয়ে লজ্জায় ছুটে গেল, তাদের যে কাজ, তা শেষ হল, আপাততঃ ৮ ময়দে ভাঙামি কোরে বুক চাপড়াতেও বে না, মিছামিছি হা-হতাশ কোরে আর লাপ কোন্তেও হবে না, তাই বিলাপিনীরা রাসিত হোয়ে এত মত্ত, এত ভণ্ড, আর এত লেহী চোমে উঠল যে, বাজাদার শানাইদার ভিত্তি ইতর লোকেরাও পর্যন্ত তাদের কাছে রাস্তা হোয়ে হার মেনে গেল, তার পর তারা ভীত হোয়ে, গোলমাল কোন্তে কোন্তে যে আর বাড়ী প্রস্থান কোলে।

যিটি সহমরণ বোলে বিবেচনা হোচ্ছিল, তার সমারোহ এইরূপে পর্যাণ্ত হলো। যারোবা গৃহে ফিরে গেলেন, তাঁর ছলনা চক্র নব্বক হলো না, তাই মনে মনে মহা উল্লাসিত। জয়ার হতভাগ্য পিতা নির্দারুণ শোক আঘাতে দিগন্ধ হোয়ে পথ হারালেন, এবং শাকাশ প্রবাহিত কোন্তে কোন্তে একবার এ পথ একবার সে পথ কোরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যিনি সন্তানের পিতা হোয়েছেন, তিনিই কেবল শিউরামের মধ্যান্তিক অন্তর-মাতন বুকতে পেরেছেন। গরিব ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে বাড়ীতে পৌঁছে, কারণ সঙ্গে সাক্ষাৎ না কোরে, একটি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে গুয়ে রইলেন। জয়ার সন্তাপিত পিতা নির্জনে বোসে রোদন করুন, মনোবাছা পূর্ণ হয়েছো বলে যোরোবা আপনার গৃহে বোসে ফুলের-মন্দ হোয়ে আমোদ আছাদ করুন, পুরবাসী-নীরা স্বর্ণালকারের মায়ার রাস্তায় রাস্তায় কঁদে কঁদে বেড়ান, আমরা কিন্তু এইকণে তাঁদের

পরিত্যাগ কোরে দেওয়াল গ্রামে ফিরে চোলেম।

একটি তরুণ যুবতী, যুধখানি অতিশয় অগ্র-গম, হাতে একটি ছোটো বোচ্কা, বারাগণীর বার-রাস্তা দিয়ে একাকিনী চোলেছেন। চল-বার ভদ্রীতে বোধ হলো, বেশ একটু চকিত হোয়ে চোলেছেন। ইনি কি অন্তঃপুরের কুল-কামিনী? তবে কি কুলাভিমান কালি দিয়ে গৃহের বার হোয়েছেন? না, তা নয়, তাঁর কুল-লজ্জা, কুলাহঙ্কার আছাদিত অসন্দিগ্ধ নির্মল যান মূর্তিতে সেরূপ বিষময় বিসদৃশ পরিচয় পাওয়া বাচ্ছিল না। 'অন্যত্রাত পদ্মের লায়, অস্পষ্ট কামিনী কুম্বের লায় যুবতীর জ্যোতি প্রবাহিনী চারু নির্মল নয়নে অভিলানের ছটা দেখা বাচ্ছিল, যেমন উপবনের বায়ুর সঙ্গে পুষ্প-পরিমলের আগ্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি সুল-রীর যুগভঙ্গীর ছটার সঙ্গে কুলাহঙ্কারের সৌরভ প্রবাহিত হোচ্ছিল। অনাদরে অযত্নে খিল্লমনা হোলে কুলবধুরা অভিমানিনী হোয়ে থাকেন, এ কিন্তু সে অভিমান নয়। কুল-কামিনীদের প্রতি হঠাৎ চেয়ে দেখলে, তাঁরা বোম্বটা টেনে দিয়ে লজ্জায় মুণ ঢাকেন, পরপুরুষ দেখেছে বোলে তাঁদের মনে অভিমান জন্মে, এ সেই অভিমান। পাছে কেউ দেখে, কি পাছে কারও সঙ্গে দেখা হোয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কি তাঁর অপমান কোন্তে উদ্ভত হয়, সেই ভয়ে চাকলোচনা এক একবার চকিত ভাবে চারি-দিকে চেয়ে দেখছিলেন। তবে বুঝি ইনি কুল-বধু হবেন। কোথায় চোলেছেন? বিস্তার আয়ত সংসার-ক্ষেত্র তাঁর সম্মুখে উদার বিস্তৃত রয়েছে, যুবতী কোথায় যাবার অভিপ্রায় কোরেছেন? আর কেনই বা প্রাস্ত-রাস্তা হোয়ে একাকিনী চোলেছেন? সুলরী অতি বিষম! অতি উৎ-কর্ষিত! অতি গ্লান! থেকে থেকে আতকে অব-সন্ন হোচ্ছিলেন, তারই বা কারণ কি? যুবতী 'কি কাদতে কাদতে চোলেছেন? চক্ষু ছুটি ছল ছল কোচ্ছিল বটে, কিন্তু অশ্রুপাত হোচ্ছিল না। কখন যদি এক আধ বিন্দু অশ্রু চক্ষুকোণে দেখা দিলে, তা কিন্তু তখনি আবার অদৃশ হইল, যেন অন্তরানলের প্রতাপে বিগত হয়ে যাচ্ছে।



কোথায় যাবেন, কোথায় গেলে আশ্রয় পাবেন, পথিক-ললনা সেই অকরণ নিষ্ঠুর সংশয়ে প্রসীড়িতা হোয়ে অতি বিনয় মনে ভাবতে ভাবতে চোলেছেন, যুবতী মুখ ফিরিয়ে এক একবার উদাস-নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলেন, কিন্তু যে দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কেবল স্বজনবর্জিত, করুণাশূন্য স্নেহের উদার প্রবাহ দেখতে পাচ্ছিলেন! ন পিতা! ন মাতা! ন স্বাক্ষব! আমার বোলে সোহাগ কোরে অমরগ-হৃদয়ে স্থান দেয়, এমন আশা-স্বরূপ স্থান কোথায় পাবেন? কে তাঁরে দয়া কোরে স্নেহের আতিথেয় আহ্বান কোরবে? তুমার জল, ক্ষুধার অন্ন দান কোরে কে তাঁর তাপিত হৃদয় শীতল কোরবে? এরূপ হৃদয়বান্ আতিথেয় সুন্দরী কোথায় পাবেন? যুবতী নিরুপায়িনী, যুবতী অসহায়িনী, যুবতী অতি দুঃখিনী!! স্নান হোয়ে, দুঃখিত হোয়ে, কাতর হোয়ে, ভীতা হোয়ে একাকিনী চোলেছেন, ভাবতে ভাবতে চোলেছেন, যেখানেই যান, সবই অপরিচিত নিরাক্ষর পুতী, সকল স্থানেই অসম্মান আর অপমানের কালভয় মুখ বাড়িয়ে আছে। রাস্তা-ঘাট কিছুই জানা নাই, তাই সুন্দরী সিধে একটানা চোলে যাচ্ছেন, যে দিকে তাঁর সভয়-দুঃখিত অতঃকরণ প্ররুতি দিচ্ছ, বালা সেইদিকেই চোলেছেন। চোলেতে চোলেতে একটি স্থানে পৌঁছে মনে কোলেন, রাজপথ ছাড়িয়ে এসে পোড়েছেন, একগে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর পথক্লান্তি তাঁরে অবসন্ন কোলে, বোচকাটি বইতে ভার জ্ঞান হোতে লাগল, তার উপর আবার অতঃকরণের দুর্ভার, তাই সুন্দরী একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর ধারে এসে বোসলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধলতা, কুঞ্জ বন, উপবনগুলি নদীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হোয়ে আর স্নান্নিক প্রভাত-বায়ু মুহুমন্দ হিচোলে প্রবাহিত হোয়ে স্থানটি অতি পবিত্র রমণীয় শোভার প্রফুল্লিত কোরে রেখেছিল। যুবতী সেখানে অধিকক্ষণ বিশ্রাম কোন্তে পারেন নি, এমন সময় ষষ্ঠার ঠন্ ঠন্ শব্দ শুন্তে পেলেন। বোধ হলো, কারা বয়েলি গাড়ী কোরে সেই দিকে আসছে। সুন্দরীর ইচ্ছা না যে, তারা তাঁকে দেখতে পায়, তাই

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে চোলেলেন। গাড়ীতে আসছিল, তারা কিন্তু সূর্যপো পোড়লো, তাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম কোরে বেরিয়ে পড়েন, তত দ্রুতবেগে সুন্দরী চোলে পালেন না। গাড়ীখানি পরদা দিয়ে ঢাক, মধ্য থেকে একটি স্ত্রীলোকের স্বর শুনে বোলেন, “ও ছুঁড়ী, তুই এত ভোরে এত কেন? হেঁটেই বা চোলেছিস কেন? গা যান! গাড়ী থামা, গাড়ী থামা, দু সপ্তে দুটো কথা কই।” আরও কত স্ত্রীলোকের স্বর ঐ গাড়ীর মধ্য থেকে শোনাচ্ছিল, তারা থিল থিল কোরে হেসে ঢোলে ঢোলে পোড়ছিল, এর দবের লোক, তাতেই বোধ হলো। মোটা মোটা, খাটমুতুরে চেহারার আপা-ব বুড়ী গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেবে মুখ কাছে হন হন কোরে চোলে গেল। যুবতী দেখে ভয়ে কাপতে লাগলেন। স্ত্রীলোক এসেই সুন্দরীর হাতে থেকে বোচকাটি কোরে কেড়ে নিয়ে হিজাস! কোলে, “এ মধ্যে কি আছে?”

সুন্দরী বোলেন, “গহনা।”

“গহনা? বা, তবে ত বড় স্বজাই! তুই ছুঁড়ী কোথায় থাকিস?”

যুবতী বোলেন, “বাছা! আমি বড় কপালী! পোড়া অদৃষ্ট যেখানে লয়ে সেইখানেই চোলেছি।”

“আটকপালী! ও সব ধ্যান রেখে দে ছুঁড়ী ন্যাকা, গহনাগুলি কোথা থেকে কোরে এনেছিস?”

যুবতী বোলেন, “চুরী করি নি, গহনা আমারই।”

ঐ কথা শুনে হা হা কোরে একগাল স্ত্রীলোকটা বোলেন, “ও সব ন্যাকামি এক রেখে দে, তুই আমাদের সঙ্গে চল, থাকবি, চোরামালের জন্যে আর ভাবনা না।”

যুবতী বোলেন, “তোমরা কে?”

স্ত্রীলোকটি বোলেন, “আমরা কে, গহনা চাস? এর পর যারা তোমার উপর ঠা

বে, আমিবা তারাই, এখন গাড়ীতে চল  
তোকে বেশ যত্ন করে রাখব।”  
বতী কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যেতে ইতস্তত  
করেন না।

তী বোলে, “কি ভাবছিস? যাবিনে  
মন সোচ্চে না, না?”

বতী বোলেন, “না, আমি যাব না।”

কথা শুনে স্বীলোকটি চল বোলে  
একটা ধাক্কা মেরে তার সেই অবরুদ্ধ  
আরও অবরুদ্ধ কোরে তুলে। যুবতী  
বল বোলেন, “না, আমি যাব না।”

তী বোলে, “হু! যাবি নে? রাস! এ  
ক ধোরে গাড়ীতে উঠিয়ে দেতো।”

যা গাড়োয়ান নেবে হলো, স্বীলোকটি  
র পরদা তুলে ধোলে, রাসা গাড়োয়ান  
র সূচক মণ্ডর কোমল দেহ ভ্রূহাত দিয়ে  
এ ধোরে গাড়ীর মধ্যে দুটি ছুঁড়ীর প্রায়  
বর কাছে নিয়ে ছেড়ে দিলে। তারা  
ক পেয়ে হো হো শব্দে হাসির হোরা  
দিতে আর যুখে নানা প্রকার নিজ নিজ  
বালুতে বোলুতে আমোদে গড়িয়ে গড়িয়ে  
তে লাগল। তাই দেখে যুবতীকে আর  
ত হল না যে, কিরূপ সংসর্গে এসে পোড়ে-  
যুবতী অতি কাতর হয়ে অল্পনয় বিনয়  
ক লাগলেন যে, গহনাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে  
ছেড়ে দেয়, তাতেও তাদের অন্তঃকরণে  
র উদ্বেক না হওয়ার শেষে পায় ধোরে  
ক কাঁদা-কাঁটা কোত্তে লাগলেন। তাই  
কখন বা সেই ছুঁড়ী দুটো খল খল কোরে  
টোলে পোড়তে লাগল, কখন বা সেই  
যসী বুদ্ধা ভাগা মোটা সরদারী গলার  
একটা ভাড়া দিয়ে, চূপ কোরে থাক  
গ ঠাকুরালী ফলাতে লাগল। যুবত যতই  
সাধি কোত্তে লাগলেন, ততই ছুঁড়ী দুটো  
হেসে আর বৃড়ীটা চাক মুখ রাঙিয়ে তাঁর  
র উত্তর দিতে লাগলো। তারা যুবতীর  
কথাই না শুনে সেই পথ ধোরে একটানা  
গ। এক্ষণে চারিদিকে বেশ পরিষ্কার  
এসেছে। যুবতীর বোচ্কাতে  
শাছে, তাই এখন ওদন্ত কোরে দেখবার

সময় হয়েছে। খুব কোসে বজ্জ গেরো দিয়ে  
বোচ্কাটি বাধা ছিল। বুদ্ধা অনেক রগড়া-  
রগড়ি কোরে গেরোটি খুলে, খুলে তার মধ্যে  
বহুগুলোর ভাগ ভাল গহনা বেরিয়ে পড়াতে  
তার অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো। তাই দেখে  
আমোদ, বিলাসিনীদের মনে এই স্থির বোধ  
হলো যুবতী হয় সেগুলি বর থেকে চুরি কোরে  
এনেছে, নয় সে কোনো ধনী লোকের পাশায়  
ছিল, তারি জিনিসগুলি সাত কোরে চুপে চুপে  
দোরে পোড়েছে। বিশেষতঃ যুবতী কিছু  
নিজের বিষয়, কি গহনাগুলির সম্বন্ধে কোনো  
কথা প্রকাশ কোরে বোলুতে সাহসী হোলেন  
না, তাই তাদের সন্দেহ আরও পরিপক্ব হোয়ে  
দাড়িল। যুবতীকে শেষে বলা হলো, ঐ বুদ্ধা  
একদল নাচনেওয়ালী, চাকর বেধে মুজরা কোরে  
থাকে, দেওয়ালে পৌঁছিয়ে তিনিও সেই দলের  
অন্যত একজন নাচনেওয়ালী হবেন। নাচের  
কৌশল, আর তার অব্যক্ত ভাবভঙ্গীগুলি সেই  
দেওয়ালে গিয়ে তাঁকে অভ্যাস কত্তে হবে,  
তন্নিয় আজ অবধি বুদ্ধার অমুচারী হোলেন  
জ্ঞান কোত্তে হবে। যুবতী তাদের হাত থেকে  
পরিত্রাণ পাবার জন্তে অনর্থক বাক্‌ছল,  
আর নির্থক স্তবস্তুতি কোত্তে লাগলেন,  
তারা সে কথায় আমলই দিলে না। বুদ্ধা  
বোলে, একবার মুটের মধ্যে এসে আবার  
যে তিনি হাত থেকে গোলে বেরিয়ে যাবেন,  
তা পারবেন না, তাই যুবতীকে নিরস্ত হয়ে  
থাকুতে পরামর্শ দিলে, আর এই আশ্বাস কোলে,  
সুন্দরী যদি নাচুতে গাইতে শিখতে পারেন,  
আর সকল বিষয়ে যদি তার কথার অমুগত  
হোয়ে চলেন অর্থাৎ যখন যে কাজ কোত্তে  
বোলবেন, তা কোত্তে যদি স্বীকার করেন, তবে  
তাঁকে খেতে পোত্তে ক্রেশ দেবেন না, বরং  
ভালরূপ যত্ন কোরেই রাখবেন। অনাথা যুবতী  
কেবল অক্ষপাত কোরেই বুদ্ধার কথার প্রত্যুত্তর  
কোত্তে সমর্থ হোলেন। যুবতী যতবার কপালে  
করাযাত কোরে আপনার অদৃষ্টের নিন্দা কোছি  
লেন, সেই ছুঁড়ী দুটো ততবার টিট্‌কারী দিয়ে  
আর সেই বুদ্ধা ততবার রাগত হোয়ে চূপ চূপ  
বোলে তার হাহাকাবের প্রত্যুত্তর দিতে লাগল।

গাড়ীখান একটি গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম কোন্সে, আরোহীরা নেবে একটি গাছের তলায় রত্নই কোন্সে গেল। যুবতী জাভাডিয়ানের নিমিত্ত তাদের সঙ্গে একত্রে আহাৰ কলেন না, তিনি পৃথক্ হোয়ে রত্নই কোন্সেন। সকলে আহাৰাদি কোরে ক্রমাগত দুই দিবস চোলে গাড়ী শুরু দেওয়ালে পৌঁছিলো। ঐ গ্রামে সেই বৃদ্ধা আর তার রক্ষীীদের বাসস্থান। একটি বৃহৎ অট্টালিকার দরজার সম্মুখে গাড়ীখানা থামলো। কতকগুলো মড়ারমতন পাতলা রোগা ছিপছিপে চেহারার মদলমান ভেড়ুয়া এবং ঐ বৃদ্ধার আরও দুটি তরফাওয়ালী ছুঁড়ী এগিয়ে এসে সকলের খাতির তোয়াজ কোরে বাড়ীর ভিতর লয়ে গেল। বৃদ্ধা যুবতীকে সেই দুটো ছুঁড়ীর কাছে জিম্মে কোরে দিয়ে যেখানে বাড়ীর পুরুষেরা বোসেছিল, সেই ঘরে চোলে গেল। সেখানে ঘেয়েই সেই গহনার পুটলীটি ধোরে দিলে। পুরুষেরা গহনাগুলি পেয়ে, এক একখান কোরে সমুদয় উটে পাটে দেখে, আর কার কত মূল্য, তা স্থির কোরে বৃদ্ধাকে সঙ্গে কোরে লয়ে যুবতী যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরে চোলে গেল। গহনাগুলির পূরস্কার সৌভাগ্যবতী অধিকারিণী সেই যুবতীর কিরূপ রূপ-গুণ, তারা তাই নিরীক্ষণ কোন্সে গেল। সেখানে উপস্থিত হোয়ে কোন কথা জিহ্বাসা না কোরে যুবতীকে ধোরে কিরূতে ধুকতে লাগল। মধ্যে মধ্যে মোড়া দিয়ে মুচড়িয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাউরে ঠাউরে দেখতে লাগল। একটা অথ বিক্রম কোন্সে আন্লে লোকে যেমন জানোয়ারটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোষ গুণ ভদারক কোরে দেখে, তারাও যুবতীকে লোয়ে ঠিক সেইরূপ পরীক্ষা কোন্সে লাগল। যুবতীর হস্ত-পদের সৌন্দর্য্য-মাধুরী অতি পরিপাটি বোলে সকলেই স্বীকার কোন্সে, তাঁর শরীরের দীর্ঘতা, বিশেষতঃ তাঁর তরুণ যৌবন, আর তাঁর দেহের উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ দেখে তারা অতিশয় প্রশংসা কোন্সে লাগল, বৃদ্ধাকে সকলে বাহবা দিতে লাগল, সে যে এরূপ উৎকৃষ্ট শীকার হস্তগত কোরেছে, তাই সে সহস্র সহস্র প্রশংসার অধিকারিণী হোয়েছে, বৃদ্ধাও অমনি আত্মাদে চুরচুরে হোতে লাগল।

যুবতীকে খুব আঁটা আঁটি কোরে নজরের উপর রেখে দিলে, আর বিলম্ব না কোরে তখন তখন তাঁর হাতে খড়ি দিয়ে নৃত্যশিক্ষা শুরু করিয়ে দিলে। যুবতী শেবে আন্তে পালে, যারা তাঁর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ কোরে দেখলে, তারা ঐ দলের বাগদর, সজ্জেরা সব ছাত্রীর মনোবেদার দিকে দৃষ্টিপাত না কোরে, স্বঃ মেলাবার নিমিত্ত কেউ বেহালা ধোরে কৌ কৌ শব্দ কোন্সে লাগল, কেউ বা তব্লাতে চাট মাতে আরস্ত কোরে দিলে। যে দুটো ছুঁড়ী সঙ্গে একত্রে এসেছিলেন, তাদেরই একজন উঠে দাড়িয়ে কিরূপে পা ফেলতে হয়, সেই ভঙ্গি দেখিয়ে দিতে লাগল। তাল, মান, লয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বিশেষ যত্ন পেতে লাগল। যুবতীকে বোলতে লাগল তাঁর সম্মুখে সেই ছুঁড়ী যেরূপ কৌশলে পা ফেলেন, তিনিও যেন সেই রূপ ভঙ্গী কোরে পা ফেলেন। যুবতী কিন্তু সে রূপ পালেন না, বায়ংবার ভুলতে লাগলেন। ভুলে যাওয়া একটি মহা অপরাধ, খানিকক্ষণ পরে যুবতীর সে অপরাধটি ষষ্ঠব্যোম মধ্যে গণ্য হলো না, যেহেতু তিনি নূতন এবং অব্যবস্টি পূর্বে কখন নৃত্য করা অভ্যাস ছিল না, তা তাঁর প্রথমবারের ত্রুটি মাপ হলো। যে না শেখাছিল, সে একটি সফেদ দাড়ী শোভি প্রাচীন গুণ্ডা, আঁকাড়া মুক জোয়ানের মত তার চেহারা, একটু পরেই কিন্তু সেই ওরা সাহেবের মেজাজ গরম হোয়ে উঠল, তার অসবুর সইল না। সেই পামর শেবে একগা ছোট চাবুক হাতে কোরে জবরজস্ত দ্বারা যুবতীকে তালিম দিতে শুরু কোন্সে, নির্ভুর পা সেই চাবুক লয়ে বাংলায় লোলিত কোমল চোখে নির্ধাত প্রহার কোন্সে লাগল। যতবার প্রহার করে, ততবারই একটি একটি স্থণিত কটু কোরে গালাগাল দিতে লাগল, সে নচ্ছার উদ্ভ্রলোকে শুনলে, শিউরে উঠে কণ্ঠে প্রদান করেন। সম্যক এক কণ্টা পর্যন্ত প্রকারে মানসিক এবা শরীরিক কষ্ট ভে কোরে যুবতী বিশ্রাম কোন্সে অহম পেলেন ; সে কিন্তু যুহুর্জকালের নিমিত্তে যা কেম না, প্রায় তখনই তখনই সেই নরাধম

কৃতান্তের সহোদরের জায় চাবুকগাছা বুকতে বুকতে, ধমকিয়ে চোটপাট কোরে বোলে “ওঠ ! ওঠ !” যুবতী তখন পরিশ্রমাস্তর অবকাশের ক্ষণময় ফল বিন্দুমাত্রও অস্বস্তি কোত্তে পারেন নি। টুমটুম কোরে যুদ্ধমল্ল স্বরে যন্ত্রগুলি অল্প অল্প বাকিতে আরম্ভ হলো, যুবতী চাবুকের দ্বায়ে ভীতা হোয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে তালে তালে পা ফেলতে লাগলেন। পা ফেলতে যখন একটু ভগ্নীর ক্রটি হয়, কি যখন একটু বেতালা পদ ফেলেন, তখন ফকবার তাঁকে চাবুক খেতে হয়, সুধু তাও নয়, যুবতীর পেছনে যে বেহালা বাজাচ্ছিল, সে পাপিল্পও তখন খিচড়ি গাল দিয়ে সঙ্গেহে তাঁর পাঠে বেহালার তাল মাত্তে লাগল। এই সকল নিষ্ঠুর অত্যাচারে হতভাগিনী যুবতী ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পোড়লেন এবং ভয়ে জড়সড় হোতে লাগলেন, বুদ্ধিস্বক্লিষ লোপাপত্তি হোয়ে আরও তাঁর ঘন ঘন ভ্রম হোতে লাগল। শরীরের বল শক্তি গেল, হাঁটু দুটি ঠক ঠক কোরে কাঁপতে লাগল, যুবতী অমনি মুচ্ছিতা হোয়ে নীচে পোড়ে গেলেন। নরাদম্য ওস্তাদ কিন্তু তখন আবার চাবুক উছিয়েছে, তচার যা বসিয়ে দেয় আর কি, এমন সময় সেই রক্ত এসে পোড়ে তার হাত ধোলে। “এ ভাণ নয়, যুবতী যথার্থই অসুস্থ হোয়েছেন।” বৃত্তী এই কথা বোলে একটা অন্দরের ঘরে যুবতীকে লয়ে যেতে আদেশ কোলে, আর বোলে, “একটু সুস্থ হোলেই আবার আসবে।”

নবাগতা বালা না পৌছতেই তখন তাঁরে লয়ে তালিম দিতে বসে গেল, তিনি যে একবার আস-পাশ চেয়ে দেখবেন, সে অবকাশ পাননি, এর মধ্যেই তাঁরে শিকা দিতে শুরু কোলে,— তার ভাংপর্ষ এই যে, কাশী থেকে হুতুম ছাদের হোয়ে দেওয়ালের সাবক ইজারাদারকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাঁরি জায়গায় যে ইজারাদার নতুন বাহাল হোয়ে এসেছেন, সেই ব্যক্তি সমারোহের নাচ-মজলিস কোরবেন, নাচের দিন কাল অবধারিত হোয়েছে। তাই যুবতীকে লয়ে তারা পেড়াপেড়ি কোচ্ছিল। যুবতী যে এক-রাত্রেই নৃত্যবিদ্যায় পণ্ডিতা হবেন, সেটি নিতান্ত

অসম্ভব, অসাধ্য বোলেও বলা যায়। অল্প নাচ-নেওয়ালীদের সঙ্গে সঙ্গে স্বর মিলিয়ে শ্রু দিয়ে তালে তালে নাচতে পারেন, যুবতীর সেই পর্ষান্ত কতক অভ্যাস হলো, তার উপর তাঁর কপের গরিমা এবং লাবণ্য-ছটার অস্বরোধ আছে, তাই রক্তা মনে কোলে, যুবতী যদি ভাল নাচতেই না পারেন, নাই পাল্লেন, তাতে কি ব্যয়ে গেল, অল্প রকমে তাঁর দ্বারা বেশ দশ টাকা রোজগার হবার সম্ভাবনা আছে।

সে দিন যুবতীকে আর উত্তেজনা কোলে না, পরদিন প্রাতে আবার তাঁরে ধোরে বেঁধে নাচ শেখাতে আরম্ভ কোলে। যেরূপ রক্তভঙ্গ কোরে হস্ত-পদ নাড়তে হয়, সেই সকল চাক্র মনোহর রসাল ভঙ্গী অভ্যাস করাতে লাগল। সন্ধ্যাও হলো, সংগতেরাও অমনি সেজে গুঞ্জে প্রস্তুত হোয়ে বসল, এক্ষণে তারা সেই ইজারাদারের বাড়ীতে চলো। যুবতীর অনেকগুলি গহনা লোয়ে অপর নাচনেওয়ালীদের পোত্তে দিয়ে, বাকীগুলি, আর যেগুলি বহুমল্যের, সিন্ধুক পুরে, চাবি দিয়ে, বেশ হেলাপাত কোরে রেখে দেওয়া হলো। ছুঁড়ীরা তাড়াতাড়ি চাবুটে খেয়ে নিয়ে রক্ষীলা বেশ-বিজ্ঞাসের ছটায় রদিলো হোয়ে হেসে ঢোলে আমোদিনী হোতে হোতে বেরিয়ে পড়ল, ইজারাদারের বাড়ীতে চোলেছে। যুবতী রক্তার সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে এক সঙ্গেই চোলেছেন, সঙ্গতেরা ঘেরে নিয়ে যাচ্ছে, সকলে হেঁটেই চোলেছে। ইজারাদারের বাড়ীতে পৌঁছিলে একটা রহৎ ঘরের মধ্যে তাদের বোসতে দিলে। দলের মোড়ল মাতব্বর সেই রক্তা সরদারনী এগিয়ে গিয়ে বাড়ীর কর্তাকে খাড়া হেঁট করে লম্বাচোড়া একটি সেলাম বাজিয়ে আপনার স্থানে গিয়ে বোসল। একটু পরেই মজলিস আরম্ভ হলো। আমোদিনীরা পায়ে নূপুর বাধলে, যারা নাচের গোঁড়া, তারা ঘুমুরের কল্লু কল্লু শব্দ শুনে মোহিত হোয়ে যায়। যুবতীর চাক্র মোহিনী-রূপের গৌরবাস্বরোধে, সকলে ধরাধরি কোরে নাচনেওয়ালী আর গওনেওয়ালীদের শত মধ্যস্থলে নিয়ে বসালে। যুবতী পূর্বে কখন এত লোক-সমাগম প্রকাশ সম্ভার মুখাবলোকন করেন নাই, তাঁর এ অবস্থা এবং এ অবস্থা সঙ্কে ভয়, আতঙ্ক, ত্রাস

একেবারে তাঁরে হতবুদ্ধি হতজ্ঞান কোরে ফেলেন। বালা এক্ষণে অপার লজ্জিতা, অপার কুণ্ঠিতা এবং অপার ভীতি হোলেন, ত্রাহি ত্রাহি কোন্তে লাগলেন। যুবতী বুকের সাথ মিয়-মাণা হয়ে অধোবদনে বোসে রইলেন, একবার মুখ তুলে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখবারিও ক্ষমতা হলো না। একটি স্বর পশ্চাৎ থেকে বেহাশার একটা ধাক্কা মের বোলে, “ছুড়ী হাস না, আমুদে হ না, পোড়ার মুখ কোর বোসে রইলি কেন? রঙ্গীলা কোরে ছট আমোদ-প্রমোদের কথা বল না, লোকে শুনে খুসী হোক, নইলে এর পর মাজাটা টের পাবি, রাড়ী গিয়ে চাবুক খাবি, চাবুকিয়ে চাবুকিয়ে লাল কোরে দেবো। এই বেলা দুটি মজাদারি কথা বোলে আসর গরম করে দে, তা তলে খর বগড় উঠবে। এখন চাবুকের নাথ শুনে নিরীহ বালা ভয়ে আঁচি হোলেন, প্রাণবদন হবার জগে অনেক মড় পেতে লাগলেন। তাঁর অন্তঃকরণ কিন্তু বোর তমাজ্জর, বিষাদ দুঃখের ভারে অবনত আর অগ্রসর, তাই চেষ্টা বোরো যুবতী স্কলমুখী হোয়ে প্রসন্ন-মূর্তি দেখাতে পালেন না, বালা পূরী অশ্রুকা আরও ক্লিষ্টতা, আরও লজ্জিতা হোয়ে বাখা হেঁট কোরে বসে রইলেন। বড় পীড়াপিড়ী করাতে যুবতী যখন একবার চোক মেলে চাইলেন, সেই সময় দেখতে পেলেন, সেই বুড়ী একটি ব্রাহ্মণের কাণে কাণে কি পরামর্শ কোচ্ছে, ব্রাহ্মণ একখানি লাল সাল ওভষোড় কোরে জড়িয়ে বসে আছেন। তার পবেই বুড়ী যুব-তীরে ডেকে উঠিয়ে এনে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বোলে। তার অভিপ্রায় কি? তাঁরে কোথায় লয়ে যাবে? বুড়ী যুবতীর হাত ধোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলীর ভিতর ঢুকলো, নিকটে একটা বাড়ী ছিলে, সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোলে।

যুবতী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বোলেন, “আমাকে কোথায় যেতে হবে?”

তখন ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে বুড়ী যুবতীকে বাড়ীর ভিতর জোর কোরে টেনে লয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে বোলে, “দেখিস,

ভাল কোরে আমোদ আচ্ছাদি কন্তে চাস। তার পর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ একটা দরজার নিকটে এসে বুড়ী পুনর্বার বোলে, “দেখিস, খবরদার! মগদ একশ টাকা আনবে চাস; এ ব্যক্তি মন্ত শোক, যদি খুনি কোন্ডে পারিস্ বেনী দিলেও দিতে পারে।”

এ বাড়ীতে আসবার ভয়ঙ্কর অসদভিপ্রায় বুঝতে পেরে যুবতী বুড়ীর ছুখানি পা জড়িয়ে ধোরে ভিতর ‘কাঁদা কাটা কোরে বলেন, “আমায় এ সাফাৎ অদখ থেকে, এ ঘোর মূর্তি-মান পাপকর্ম থেকে রক্ষা করুন, আমাকে এই অপবিত্রে ভূমিমা থেকে অব্যাহতি দিন, আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোলাচ্ছি, আমি আপনার দাসী হোয়ে, সেই শাদী-উপযুক্ত সামান্য মত-বৃত্তি কোরে দিনপাত কোরবো, তথাচ আমাকে একপ জ্বরজ্বর হোন্তে অরম্যত কোরবেন না। দোহাই আপনার, আপনি আমায় রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন, আমার ধর্ম নষ্ট কোরবেন না।” এই করণবদ মিনতিবাক্য বোলে যুবতী আরও মন্ত কোরে বুড়ীর হুখানি পা জড়িয়ে ধোয়ে। “চোর! না শুনে ধর্মের কাহিনী!” এই কথা শুনে বুড়ী চোটে লাল হোয়ে, পিঠে একটা লাথী মেরে “ওঠ, ছুঁড়ী ওঠ, ব্রাহ্মণ আশা কোরে বোসে আছে,” এই কথা বোলে যুবতীর বিনয়-গর্ভ সফাতর প্রার্থনার ইচ্ছার দান কোলে। কেউ ভিতর দিক থেকে দরজা খুলে দেওয়ার বুড়ী যুবতীকে টেনে হিঁচড়িয়ে ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরিয়ে দিলে। বালায় অন্তঃকরণের মধ্যে তখন যে অপূর্ণ মনস্তাপ-তরঙ্গের কোণা হল হোচ্ছিল, তাহা কেবল পতিপ্রাণা, নির্মল পবিত্র আত্মা সতী স্বীলোকেরাই অনুভব কোন্তে পারেন, তাঁরা ভিন্ন আর কারুরই সাধ্য নাই, সে কোলাহলের মূর্তি অন্তঃগটে চিত্রিত করে। যুবতী মনে জানতে পেরেছেন যে, এই ঘরেই সেই লোকটি আছে, কিন্তু মুখ তুলে চেয়ে দেখতে তাঁর ভরসা হলো না, অবলজ্জা, চিত্তবিলম্ব আর মনস্তাপ একেকালে আবিভূত হোয়ে যুবতীকে হতচিন্ত, হতশক্তি আর হত-চৈতন্য কোরে ফেলে। বালায় মনঃপ্রাণী

মুহুর্তে কঁপে কঁপে উঠছিল। যুবতী তাঁর কোমল হস্তে হৃদয় চেপে ধরে ফুলে ফুলে, ঝাপিয়ে ঝাপিয়ে উচ্চস্রবে কাঁদতে লাগলেন। সেই পুরুষটি তাঁর সঙ্গে কথা কবার মনস্তত্ত্বের উঠ এগিয়ে আসছিলেন, যুবতী তাঁর চরণের নজ পেয়ে কাছে যেতে না যেতে তাঁর পায়ে উপর গিয়ে উবুড় হোয়ে পোড়লেন, উভয় হস্ত দ্বারা চন্দ্রবদন, ঢেকে ঢেঁচিয়ে বাল্যে লাগলেন, “আমায় রক্ষা করুন, যা ভেবেছেন, আমি তা নই, শিষ্টর কটিল অদুর্ভাগ্য আমার এখানে উপস্থিত কোরেছে, তার উপর আমার মনুষ্যের জবরদস্তি দৌরাখ্যা। আমি কারও কেনা দাঁদী নই, যে কার্য্য কোলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়, এমন যে কর্ম্ম বোলবেন, আমি তা কোতে প্রস্তুত আছি, মহারাজ! আমার রক্ষা করুন, আমার পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করুন, আমার আদান, আমার রক্ষা করুন, আমার অপমান কোরবেন না, আমার জাত-কুল নষ্ট কোরবেন না, আমি পতিহীনা নারী পতিগত আমার প্রাণ, লোকান্তরে গিয়ে সেই পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো প্রতিজ্ঞা কোরেছি, সে মানস যে পর্য্যন্ত সফল না হয়, পাপকর্ম্ম কোরে শরীর অপবিত্র কোরবো না, আমার যে প্রতিজ্ঞা, তা শুনলেন, এখন আমার নিকটে আসতে চান, আসুন, যে মুহুর্তে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে শরীর অপবিত্র হবে, সেই মুহুর্তেই জলন্ত চিতানলে শয়ন কোরবো, আর উঠবো না।” এই কথা বোলে যুবতী কোমর থেকে একটি শিশি টেনে বার কোলেন, তাতে যে পের ছিল, তার অর্দ্ধেক ফলে মিশিয়ে তাঁর একটি শত্রুকে দেওয়া হয়, বাকী অর্দ্ধেক সেই শিশিতেই মজত ছিল। অর্দ্ধেকটুকু মাত্র জলের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল বোলে অপার নিদ্রার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়েছিল, বাকী অর্দ্ধেকটুকু নির্জলা পান কোলে সাংঘাতিক হালাহলের ক্রম কোরবে তার সন্দেহ নেই। শিশিটি বার কোরে যুবতী বোলেন, “ব্রাহ্মণ! আমি অবলা, দুর্ব্বল, নিঃসহায়, রাখলেও পারেন, মাল্লেও পারেন, আপনার কৃপার উপর ভরসা, আপনি যদি আমার মৃতদেহ দেখতে বাসনা করেন, আর তা

দর্শন কোরে আপনার যদি আনন্দ ভবে, আমার নিকটে এগোবেন, নাচে এগোবেন না, যদি কথা না শুনে আসেন, এই বিষয়ে প্রাণ ত্যাগ কোরবো।” ব্রাহ্মণ নিস্তক, এক পদও অগ্রসর হোতে পারেন না, যেখানে ছিলেন, সেইখানেই চিত্রপুতলীর ভায় স্থির রইলেন। তাই দেখে যুবতী মনে কোলেন, তবে তাঁর প্রার্থনা নিফল হয় নি, এক্ষণে তাঁর মনে সাহস হলো। বালা ছই হাঁটুর উপর দাঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উবুড় হোয়ে ছিলেন, সেই অবস্থায় থেকে পুরুষটির চেহারার দিকে একবার চক্ষু উন্নত কোরে চেয়ে দেখলেন। বালা দেখলেন, ব্রাহ্মণ চক্ষের জল মুচ চেন, অশ্রুপাত দূর কোরে হাত-খানি যখন সরিয়ে নিলেন, যুবতী তখন তাঁর মুখ দেখতে পেলেন, মুখখানি বেশ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, দেখে মস্তক নত কোরে চক্ষু দুটি পবনত কোলেন, অপার একবার মস্তক উচ্চ কোরে মুখখানি নিরীক্ষণ কোলেন। বালা এখন উঠে দাঁড়ালেন, সমুখস্থিত মূর্তিটির উপর তাঁর আয়োজল অর্ধি দুটি স্থির কোরে রাখলেন, তার পরেই যুবতী ব্রাহ্মণের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন,—ধীরে মৃত্যুর মধ্যে গণনা কোরেছিলেন, আজ সেই প্রাণপতি প্রিয়তমের কোলে গিয়ে বালা ঝাঁপিয়ে পোড়লেন।

যুবতী অত কেহ নয়, ইনি শিউরামের কন্যা জয়া, রঘুনাথের প্রাণপ্রতিমা, আর ঐ পুরুষটিও অপর কেহ নয়, তিনি স্বয়ং রঘুনাথ, জয়ার প্রাণবল্লভ। ইহাদেয় প্রাণদানের মর্ম্ম-কথাগুলি ক্রমে ব্যক্ত হবে।

জয়া সকল লোকেই অবিখ্যাপ কোলেন। যুবতী তাঁর নিজ চক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দানের প্রতি সন্দেহ কোরে রঘুনাথের কোল থেকে ছাড়িয়ে এসে পুনর্বার অন্তর হোয়ে দাঁড়ালেন, বালার মনে ভয় হলো যে, হয় ত তাঁর ভ্রম হয়েছে, ধীরে রঘুনাথ বোলে মনে কোরেছেন, হয় ত তিনি রঘুনাথই নন। ইনি কি যথার্থই তাঁর পতি? যিনি মরেছেন বোলে শোকাকুলা হোয়ে জয়া আর্তনাদ কোরেছেন, ইনি কি যথার্থ

সেই রঘুনাথ ? এই পুরুষটির মুখের দিকে আর তাঁর আকৃতির দিকে জয়া অনিমেঘ-চক্ষু চেয়ে রইলেন, বালার চাঁউনীর ভঙ্গীতে জ্ঞান হতে লাগল, তাঁর চক্ষুটি ঠিকিরিয়ে বেরিয়ে পড়ে বা ! দেখলেন, অতি আশ্চর্যা, অতি অলঙ্ঘনীয় সৌ-সাদৃশ্য, রঘুনাথের অবয়বের সঙ্গে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । তখাচ ইনি যে রঘুনাথ, সিটি কিছু নিতান্ত অসম্ভব, এই উৎকর্ষার সময় জয়ার মনে একটি অপূর্ণ ভাব আবির্ভূত হলো । বাধা মনে কোলেন, ইনি রঘুনাথের জীবাত্মা, আমি যে সহস্রতা হইনি, আমি যে লোকান্তরে পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে অস্বীকার কোরেছি, তাই রঘুনাথ রাগত হোয়ে আমার ভৎসনা কোত্তে আর আমার চরিত্রে কলঙ্ক কোরে দিতে এসেছেন । রঘুনাথ নাকি চিত্রপুতুলের ছায় নিস্তক হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই জয়ার মনে ঐ সন্দেহ আরও পরিপক্ব হলো । বালা কল্পিত-কলেবর হোয়ে রঘুনাথের স্মৃখে দাঁড়িয়ে রইলেন । রঘুনাথও জয়ার ছায় বিষয়-তক্ক হোলেন, স্বীয় পত্নীর পতিভক্তি আর প্রে-মায়রাগ স্বচক্ষে দর্শন কোরে আফ্লাদে অভিভূত হো'তে লাগলেন । ইতিপূর্বে রঘুনাথকে শোনান হোয়েছিল যে, জয়ার কালধর্ম্য প্রাপ্তি হোয়েছে, এক্ষণে সেই জয়াকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কোরে প্রপ্ত-মুষ্টির ছায় অচল স্তম্ভিত হোয়ে এক স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন । রঘুনাথ এক একবার কথা কবার চেষ্টা কোচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না, আফ্লাদে উল্লাসিত হোয়ে সর্ব্বদা অবশ হোয়ে গেছিল, রসনারও বাক্শক্তি ছিল না । বড় বড় অশ্রুবিম্ব রঘুনাথের পুরুষা-কার ও বেয়ে গোড়িয়ে পোড়'ছিল, আর তাঁর সর্ব্বদা ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছিল, জয়া সেগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন । শেষে আর থাকতে না পেরে বালা এই কথা টেটিয়ে বোলেন, “যাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি রোদন কোরেছি, তুমি যদি সেই রঘুনাথ হও তো কথা কও, একবার কথা কও, আমার নিদারুণ শোকদগ্ধ চিত্ত শীতল হোক, আমার বিচ্ছেদ-সন্তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ হোক ।” রঘুনাথ ঐ কথা শুনে জয়ার নাম উচ্চারণ

কোরে বোলেন, “কে তুমি, জয়া ?” জয়া আফ্লাদে উদ্ভ্রান্ত হোয়ে, “হাঁ, আমি জয়া,” এই উত্তর কোলেন, আর বোলেন, “এখন আমি নিঃসং-শয় হোলেম, এখন নিশ্চয় জান্লেম যে, আমার পতি রঘুনাথের স্মৃখে দাঁড়িয়ে আছি । তোমার স্মৃধুর কণ্ঠস্বরে আমার সকল সন্দেহ দূর হোয়েছে ।” জয়া এই কথা বোলেই উঠে:স্বরে রোদন কোরে আনন্দ-অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে রঘুনাথের উদার, প্রসারিত, বিস্তার উদ্ভুক্ত, স্তম্ভিত অন্তরাগ-কোড়ে পুনর্বার কাঁপিয়ে পোড়লেন । রঘুনাথ প্রেময়িনীকে কোলে পেয়ে বৃকের মর্ধ্যে চেপে রেখে, প্রেমরাগে মত্ত হোয়ে, অধরাভ্রাণের চিত্তে বালার বিভা-বিকসিত কপালমণ্ডল ঘন ঘন অঙ্কিত কোত্তে লাগলেন । তাঁর শ্রায়ল পদ্ম-অঁধি দুটি নিরশ্র কব্জার নিমিত্ত রঘুনাথ অনেক যত্ন কোত্তে লাগলেন, পূর্বে তিনি সেই দুটি নীলোজ্জ্বল নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে কতবার আনন্দে বিহ্বল হোয়েছেন । “জয়া কেঁদো না, স্থির হও, ক্ষান্ত হও ! বিধাতা আমাদের প্রতি প্রগল্ভ হোয়েছেন, আর তোমার চক্ষের জল ফেলতে হবে না ।” রঘুনাথ এইপ্রকার মধুর-বাক্যে জয়াকে সান্ত্বনা কোত্তে কোত্তে অন্তরাগে মত্ত হোয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপনার বুক দেখিয়ে দিয়ে বোলেন, “জয়া ! আর আমাদের বিচ্ছেদ হবে না, এই অন্তরাগাসক্ত স্নেহময় হৃদয়ে তুমি আশ্রয় পেয়েছো, প্রাণ থাকতে কখনই তোমায় সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হোতে দিবে না ।” জয়া মন্তক তুলে, মুখ উচু কোরে একটু হাসলেন । বহু দিনের পর জয়ার মুখে আক্স প্রথম হাসি বেরুলো, পতির মৃত্যুসংবাদ শুনে অবধি তাঁর বদনে কেউ হাসি দেখেনি । প্রাণপতির এক-খানি হাত ধোরে আস্তে আস্তে চাপতে চাপতে মধুর বৃদমন্ড-স্বরে ভগবান্কে ডাকতে লাগলেন, আর যেন তাঁদের বিপদ না ঘটে, আর যেন তিনি পতিশোকে ব্যাধ লা হোয়ে পথে পথে ভেসে না বেড়ান, এই অভাবনীয় অকস্মাৎ মিলন হোয়ে তাঁরা যেন আক্সের মতন স্মৃখী হোলেন, তাই সক্রতজ-চিঃস্ত গুরুদেবের নিকট স্তব্ধতি কোত্তে লাগলেন ।



রঘুনাথ দেওয়ালে চোলে গেলে যে যে কাণ্ড  
ঘটেছিল, জয়া অকণ্টচিত্তে সে সমুদয় আনু-  
শ্রিতিক পতির কাছে বিবৃত কোলেন। রঘু-  
নাথের মৃত্যুসংবাদ, ব্রাহ্মণের দৌরাণ্য বামনের  
চেষ্টা, নাচনেওয়ালীদের সরদারনী তাঁকে  
টকে চাকুরাণীর মত ব্যবহার করে, এই সকল  
ভাস্কর্য্য একটি একটি কোরে অত্যাশঙ্কিত সমুদয়  
দুনাথকে শোনালেন, এক্ষণে 'অন্তঃকরণের  
গর লাঘব হোয়ে জয়া প্রফুল্লরসে ভাসতে  
লাগলেন।

রঘুনাথ ঐ সকল কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা শুনে  
রগে লাল হোয়ে গেলেন। প্রতিজ্ঞা কোলেন,  
যদি ঐ কুচক্রের অন্তর্গত হোয়ে মন্দচেষ্টা  
কারেছে, তাদের সকলকেই ভালরূপ শিক্ষা  
দেন। জয়া পতির হস্ত ধোরে বোলেন, "প্রাণ-  
চরিত! তা কেন কোরবেন? তাদের যে মনকা-  
না সিক্ত হয়নি, তাদের অনিষ্ট চেষ্টা যে নিফল  
হোয়েছে, সেই কথা তারা শুনতে পেলেনই  
হাদের বর্থেই শাস্তি পাওয়া হবে, কিন্তু নাথ!  
আপনার মৃত্যু-বিস্ময় নিঃসন্দেহ হোয়েও আমি  
পৃথগুণে পরাধুষ্ট হোয়েছি, প্রাণভয়ে সঙ্কুচিত  
হোয়ে সে পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিনি,  
এক্ষণে সে কথা অরণ হোয়ে আপনার কাছে যুগ  
সেখানে কুণ্ঠিত হোচ্ছি, আপনার সঙ্গে  
কথা কহিতেও লজ্জা বোধ হোচ্ছে, পোড়া  
প্রাণের যে এত মায়ী, তা পূর্বে জান্তেম না।  
আমার সম্মুখে যদি আপনার লোকান্তর-প্রাপ্তি  
হতো, তবে কেউই আমাকে ধোরে রাখতে  
পাতো না, টানা ছেঁড়া কোরেও বেরিয়ে পোড়-  
ন্তেম, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই স্থাননে গমন  
কোরে একজেরই চিত্তা আরোহণ কোন্তেম,  
তখন ইচ্ছা কোরে ব্যাকুল হোয়ে সেই চিত্তা-  
নলে জীবন আহুতি দিতেম। তোমার মৃত্যু-  
সংবাদ শ্রবণ করবার পর আমার মন যেন  
আমার ডেকে বোলে, 'তুই আত্মঘাতিনী  
হোসনে, রঘুনাথ বেঁচে আছেন।' প্রাণেশ্বর!  
যদিও অল্পগমন কোরিনি সত্য, কিন্তু জীবিত  
থেকেও তুমি অভাবে যে সুখী হোন্তেম, সেটি  
যেন মনে কোরবেন না। নিঃশ্বাসে বোসে,  
লোকের অসাক্ষাতে কতই আর্তনাদ কোরেছি,

নীরবে কতই রোদন কোরেছি, তোমার মৃত্যু-  
সংবাদ শুনে আমার অন্তঃকরণ শোকাভিভূত  
হোয়ে যেরূপ আকুল হোয়েছিল, গুরুদেবই তা  
জানেন, দেবতারাই তার সাক্ষী আছেন। এখনও  
তো আমার গিন্নী-বান্ধীর মত অধিক বয়স  
হয়নি, এখনও আমার কাঁচা বুদ্ধি কি না, তাই  
বয়সের দোষে ভয়ে মহাপ্রাণী কেঁপে গেল যে,  
কেমন কোরে দম্কে দম্কে পুড়ে মোরুবো, প্রাণের  
প্রতি বড় মায়ী হলো, মন আর কোন মতেই  
সে পথে যেতে স্বীকার কোলে না, আমার  
অন্তঃকরণ বাধা দিয়ে বোলতে লাগল যে, কেন  
লোকের কথা শুনে সাথে সাথে পুড়ে মোরুবি।  
তাই সহমরণের প্রতি আমার কালঘৃণা হোয়ে  
দাঁড়াল, মনে মনে অনিচ্ছা হোয়ে পোড়ল, পুড়ে  
মরুবো বোলে অন্তঃকরণ যতই কাতর হোতে  
লাগল, ততই তাতে আমার অনিচ্ছা বাড়তে  
লাগলো, প্রাণপরীপসা ততই বৃদ্ধি হোতে  
লাগল। মোরোবা কিন্তু ততই উগ্রমূর্তি হোয়ে  
বাক্যজালা দিয়ে আমায় সাহস আর প্রবৃত্তি  
দেবার চেষ্টা কোন্তে লাগল, তার সে সময়ের  
কালমূর্তি মনে হোলে এখনও আমার অন্তঃ-  
করণ আতঙ্কে শিউরে উঠে। সহমরণ যাওয়া  
যদি পবিত্র ধর্ম্মই হয়, আমি যে প্রাণের মায়ায়  
সে ধর্ম্ম পালন করিনি, সে অপরাধ, মাধ! তুমি  
কি মার্জনা করুবে না? বোধ হয় এক্ষণে  
আমার প্রাণপতি রঘুনাথ তার জন্তে দুঃখিত  
হবেন না।" এই কথা বোলে কোমলহৃদয়া  
সরলা জয়া রঘুনাথের মুখের দিকে চেয়ে এমনি  
একটু অমিয় ভঙ্গীতে ঈষৎ হাস্ত কোলেন, দেখে  
জান হলো, তাঁর ওষ্ঠাধর যেন অমৃতলহরী  
হোয়ে সেই হাসির হিলোলে মৃত্যু কোন্তে  
লাগল। তৎকালীন বালা কেমন একটু মধুর  
ব্যাপ্রোয়ন্ত চক্রে রঘুনাথের মুখের দিকে এক-  
দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, বোধ হলো যেন, তাঁর  
নয়ন-পল্লবে অন্ন অন্ন হাস্তের হিলোল হোচ্ছে।  
রঘুনাথ তাঁর দুঃখের কথাগুলি শুনে কি উত্তর  
দেন, বালা তাই শোনার জন্তে কতই ব্যাকুলা  
হতে লাগলেন, চারু যুবতীর সেই অন্তর্ভানে  
অবয়বটি তাঁর ভীতবৃষ্টি কোমল নয়নে বিকসিত  
হোতে লাগল। জয়ার কথা অবসান হোলে

আনন্দ-প্রফুল্লিত রঘুনাথ উচ্চকণ্ঠে গোয়েন,  
 “জয়া! তুমি আমার হৃদয়ের নিধি, তুমি আমার  
 তমসাক্তরূপ-গগনের একমাত্র উজ্জ্বল  
 তারকা, তুমি আমার হৃদয়-প্রান্তরের একমাত্র  
 স্নিগ্ধ প্রবোধ, তুমি আমার হৃদয়রূপ মরু-উজ্জা-  
 নের একমাত্র হাস্তমুখী পরিমলবাহী কুসুম,  
 আমার নিদাশ-সন্তাপনাশিনী শূশীতল কোমল  
 ছায়া। আমি তোমার স্নেহের প্রমাণ চাই না,  
 আমার অদৃষ্টে যাই ঘটুক, আমার ভাগ্যে যাই  
 থাক, তাই বোলে যে তুমি তোমার নবানুপ্রিত  
 জীবন চিতা-শস্যায় ভ্রমাবশেষ কোরবে, এ  
 বাসনা আমার কখনই নাই। দেবতারা আমা-  
 দের রক্ষা কোরেছেন, তাঁদের চরণে যদি ভ্রষ্টা  
 থাকে, তবে যেন তাঁরা এইরূপ চিরকাল আমা-  
 দের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন।”

রঘুনাথ বারাগসী পরিত্যাগ কোরে তাঁর  
 অদৃষ্টে কি কি দুর্ঘটনা ঘটেছে, পাঠক মহাশয়ের  
 কোতুহল ভূপ্তির জন্তে সে বৃত্তান্তগুলি এক্ষণে  
 অবগত করান কর্তব্য। রঘুনাথ বাড়ী থেকে  
 রওনা হোয়ে দেওয়ালে নির্ঝিয়ে পৌঁছিলেন,  
 সেখানকার ইজারাদার নাম মাত্র ইজারাদার,  
 ফলে তৎকালীন প্রকৃত রাজপ্রতিনিধি নায়েব,  
 সেই ইজারাদার বলবন্ত রাও কর্তৃক অভিযোগের  
 ছল কোরে রঘুনাথকে কয়েদ করেন। বলবন্ত  
 রাও রঘুনাথের জমিদারীর দাবিদার। এই  
 অত্যাচার দেখে রঘুনাথের মনে অতিশয় বিষয়  
 জন্মিল। কিন্তু বিষয়ের জন্তে আর বাদানুবাদ  
 না কোরে, সকলি দেখরের ইচ্ছা, তাঁর মনে যা  
 আছে, তাই হবে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্থায় এই  
 রূপ ঐর্ষ্যাবলম্বন কোরে ভগদীপ্তরে আত্মসম-  
 র্পণ পূর্ব্বক কারাগৃহে বন্দী হোয়ে রইলেন।  
 বলবন্ত রাও যেন অত্যাচার দাবি করে নি, সেই  
 কথা রঘুনাথের মুখ দিয়ে কবুল কোরিয়ে লবার  
 জন্ত তাঁকে একখানা কাগজে দস্তখত কোন্তে  
 অহুরোধ করা হয়, রঘুনাথ ঐ কথা শুনে রেগে  
 আগুন হয়ে উঠলেন, তাতে দস্তখত কোন্তে  
 কোনো মতেই স্বীকার কোলেন না, সেই স্ত্রে  
 তাঁকে কয়েদ কোরে রাখা হয়। সোভাগ্য-  
 বশতঃ বারাগসী থেকে হঠাৎ একটা হুকুম  
 ছাড়ের হোয়ে সাবেক ইজারাদার বরখাস্ত

হোলো, তার স্থানে নূতন এক ব্যক্তি বাহাল  
 হলেন। রঘুনাথ অবসর বুঝ সেই নূতন ইজারা-  
 দারের কাছে আপনার অবস্থা অবগত করা-  
 লেন, আর জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার  
 জন্তেও প্রার্থনা কোলেন। নূতন ইজারাদার না  
 কি সম্প্রতি বারাগসী থেকে এসেছিলেন, তিনি  
 আসবার পূর্ব্বে শুনেছিলেন যে, জয়া তাঁর  
 স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সহমৃতা হোয়েছেন।  
 তাই রঘুনাথকে জীবিত দেখে সে ব্যক্তির  
 অত্যন্ত বিষয় জান হলো। শুধু তাও নয়,  
 দেওয়ালে কয়েদ হোয়ে রয়েছেন! ইজারাদার  
 তৎক্ষণাৎ রঘুনাথকে খালাসের হুকুম দিয়ে  
 দিলেন, আর তাঁরে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণও  
 কোলেন। ঐ নাচের মজলীসে ইজারাদার  
 রঘুনাথকে বলেন যে, তাঁর প্রিয়তমা জয়ার মৃত্যু  
 হোয়েছে! জয়া নাই শুনে রঘুনাথের মনে যে  
 কি কষ্ট হলো, সে কথা বলবার আবশ্যক নাই,  
 পাঠক তা এমনিই অনুভব কোন্তে পারবেন।  
 রঘুনাথ সেই দণ্ডেই অবসর লয়ে সেই আমোদ-  
 কোতুকের, সেই হাস্য-পরিহাসের আসর থেকে  
 উঠে চোলে যেতেন, কিন্তু পাছে তাঁর প্রাণ-  
 দাতা বন্ধু, সেই আতিথাকর্ত্তা ক্ষুর হন, সেই  
 ভয় কোরে তা কোলেন না। রঘুনাথ বোসে  
 আছেন, উদাসমনে, উদাস-দৃষ্টিতে চারিদিকে  
 চেয়ে দেখছেন, এমন সময় তৎক্ষণাতঃ আলীরা  
 পৌঁছিল। তাদের দেখে রঘুনাথ বিষয়ে জড়ী-  
 ভূত হোয়ে স্তম্ভিত হোয়ে পোড়লেন। কি অন্তত,  
 —কি আশ্চর্য্য কাণ্ড স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কোলেন!  
 রঘুনাথ দেখলেন, তাঁর সেই সহধর্ম্মিণী, যার  
 অবধারিত মৃত্যুর বিষয় ইতিপূর্ব্বকই তাঁকে  
 বলা হোয়েছে, তিনি অতি স্নান, অতি বিষম  
 হোয়ে নাচনেওয়ালীদের মধ্যে সকলের  
 আগে দাঁড়িয়ে! রঘুনাথ ইজারাদারকে কোন  
 কথা না কোয়ে সেই বুড়াকে হাতছানি  
 দিয়ে ডাকলেন। বুড়ী সেই ইজারাদারেরে তাঁর  
 কাছে গিয়ে বসলো। রঘুনাথ সেই নবীন  
 নর্তুকীর নিমিত্ত বেলমোক্তা একশত টাকা  
 স্নাতচুক্তি কোলেন, কুটনী বুড়ীও তখন তাতে  
 রাজি হয়ে জয়াকে,—ব্যাকুলান্না দুঃখিনী  
 জয়াকে মজলিস থেকে উঠিয়ে সঙ্গে কোরে

নিম্নে গেল, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রঘুনাথ যে একরূপ কৌশল অংশবিশেষ কোলেন, তার তাৎপর্য এই, তাঁর পত্নীর প্রকৃত অবস্থা কি, সেইটিই তাঁর অবগত হবার অভিপ্রায়। রঘুনাথ দেখলেন, অপবিত্র হবার পক্ষে জ্ঞার অসঙ্গত আন্তরিক স্বপ্না, এত স্বপ্না যে, সে কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। তত্ত্বি জ্ঞার বারের পরপুরুষ মনে করেছিলেন, সে ব্যক্তি যদি অপরিচিত অবস্থায় তাঁর সতীত্ব নষ্ট করবার জন্য বল প্রকাশ করতো, তা হলে তিনি আত্মবাহিনী হোতেন। স্বীয় পত্নীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সেই সকল নিঃসংশয় নির্দর্শন পেয়ে রঘুনাথ আত্মদে উন্নত হোয়ে পোড়লেন।

জ্ঞার কুটীরে প্রবেশ কোরে তাঁর কাণে কাণে শব্দর কি বল্লেন, এই পর্য্যন্ত পাঠক মহাশয়কে অবগত কোরে রাখা হয়েছে। বামন বোল্লেন, “জ্ঞার! আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে, আমি তোমায় বাঁচাতে এসেছি, তোমার প্রাণ নিতে আসি নি। কিন্তু সহমরণ যেতে তোমায় অবশ্যই স্বীকার কোত্তে হবে।”

জ্ঞার মুখ তুলে, চোক মেলে চেয়ে দেখলেন, যে কথা শুনলেন, তাতে যেন তাঁর বিশ্বাস হোচ্ছে না, এই ভাবটি বোধ হোলো। ছুঃখিনী জ্ঞার বল্লেন, “মহারাজ! তবে রক্ষা পাব কেমন কোরে?”

শব্দর বল্লেন, “আমার কথা অমান্য করো না, যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। চতুঃপার্শ্বের লোকেরা মনে কোরবে, তুমি মহাসতী, মন-প্রাণ পতির উপরেই সমর্পণ কোরেছো, তুমি কাঁপ দিয়ে সেই প্রজলিত অগ্নিরাশির মধ্যস্থলে পড়বে, তাও সকলে দেখতে পাবে। সেই সময় সেইখানে একখানি হস্ত প্রসারিত হয়ে থাকবে, সেই হস্তখানি তোমায় মৃত্যুর গ্রাস থেকে উদ্ধার কোরবে, অপরে কিন্তু তা লক্ষ্য কোত্তে পারবে না।” জ্ঞার বোল্লেন, “আঃ! আমার অদৃষ্ট! তাতে কি কোরে রক্ষা পাব? ও কথার প্রতি বিশ্বাস করি কি কোরে?”

দরজাটি বন্ধ আছে কি না, কি তার আড়ালে থেকে বারদিকে কেউ কাণ পেতে শুনেছে কি না; তাই একবার ঝড় ফিরিয়ে

চেয়ে দেখে শব্দর ফিস্ ফিস্ স্বরে বলতে লাগলেন, “তবে মর্শ্ব-কথা বলি শোন, চিত্তা সাজানোর ভার আমার উপরেই থাকে, লোকে যে আমাকে কৃতান্তের স্বরূপ জ্ঞান করে, তাও আমি জানি, কিন্তু বাস্তবিক আমি যে নির্ভর, কি কারও কালের স্বরূপ নই, বরং লোকে আমায় যা বিবেচনা করে, আমি যে ঠিক তারি উল্ট, সেই কথা সপ্রমাণ কোত্তে আমার এখানে আসা হয়েছে। যে গণ্ডির মধ্যে চিত্তা সাজান হবে, তারি মধ্যে একটি লোহার দরজা আছে, লোকে কিন্তু সেটি দেখতে পায় না। আমার বাসের নির্মিত মাটির নীচে যে ঘর আছে, ঐ অলক্ষ্য দরজা দিয়ে সেই ঘরে যাওয়া যায়। যখন লক্ষ দিয়ে চিত্তার মধ্যে পোড়বে, সকলে মনে কোরবে, তুমি তোমার মৃত্যুমুখে পোড়লে, কিন্তু তুমি মৃত্যুমুখে না পোড়ে বরং প্রাণদান পেয়ে পুনরায় যে সংসার আশ্রমে প্রবেশ কোরবে, সেটি প্রত্যক্ষ দেখাবার ভার আমার উপরেই থাকে। সেই সময় তোমায় রক্ষা করবার নির্মিত সেই অলক্ষিত লোহার দরজার বাহিরে যে অল্পকূল হস্ত বিস্তার আয়ত হোয়ে থাকবে, তুমি সন্দেহ কোরে সে হস্তকে অবিশ্বাস করো না। সেই মৃত্তিকাগর্ভস্থিত গুপ্তগৃহে যেমন প্রবেশ কোরবে, অমনি তুমি প্রাণদান পাবে, আর তোমায় জীবনের ভয় কোত্তে হবে না। তার পর তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে চোলে যেও। যে কঁধাগুলি বোল্লেন, ধবরদার, কেউ যেন তার বাপও না জাস্তে পারে, মৃত্যুর বার কোলেই ভুলি পোড়বে, সমস্ত পরামর্শই মিথ্যা হোয়ে যাবে। তত্ত্বি যদি এ সমস্ত কথা প্রকাশ করো, তোমায় আজন্মকাল ব্রহ্মকোপে জলে মত্তে হবে, আমি তোমায় চিরকাল অভিসম্পাত কোরবো। জ্ঞার! তোমার যদি ব্রহ্ম-শাপের ভয় থাকে, তবে কদাচ এ সকল কথা মৃত্যুর বার করো না, যদি করো, আজন্ম আমি তোমার কালের স্বরূপ হোয়ে থাকব, আমার হাত থেকে তুমি কখনই বেঁচে যেতে পারবে না।”

জ্ঞার নিশ্চর হোয়ে বামনের কথাগুলি শুনলেন। জীবনের দ্বার চিত্তার মুখেই মুক্ত

ধাক্বে, প্রস্থান কোত্তে পাগ্নেই প্রাণটি রক্ষা হবে,—ভয়ঙ্কর নিফল মৃত্যু হতে প্রাণটি রক্ষা হবে। একরূপ অকারণ মৃত্যুকে—একরূপ নিকারণ আত্মহত্যাাকে জয়া পাণ জ্ঞান কোত্তেন, বিশেষতঃ একরূপ নিফল মৃত্যুর শরণাগত হোলে তিনি যে রঘুনাথকে ফিরে পাবেন, তাও পাবেন না। ব্যাকুলপ্রাণা জয়া এক্ষণে কি উত্তর দেন, শঙ্কর তারই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেন।

জয়া বোলেন, “মহারাজ! আচ্ছা, তবে ঐ কথাই স্থির।”—“আচ্ছা, তবে আমি এক্ষণে চোল্লেম, ভিড়ের মধ্যে আমার দেখতে পেয়ে পাছে তুমি ডিরিয়ে যাও, তা যেন যেও না, সেখানে আমার থাকতেই হবে। আর আর সকলের অপেক্ষা আমাকেই তুমি অধিক ব্যস্ত দেখতে পাবে। যা কিছু করা কৰ্ম্মা, তা আমাকেই কোত্তে হবে। কাঠে আগুন ধোরিয়ে প্রথম আমিই তোমার মাথার উপর ফেলে দেবো, কিন্তু সে সময় তুমি নিরাপদ হোয়েছো, প্রাণভয়ের পথ ছাড়িয়ে তখন অনেক—অনেক অন্তরে গিয়ে পড়েছো। জয়া! আমার তুমি অবিশ্বাস করো না। চিতার উঠে তার মধ্যে কি আছে, চেয়ে দেখো, তুমি যদি তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত একখানি অহুস্কল হস্ত প্রসারিত না দেখতে পাও, তখন নয় তুমি ফিরে এসো, বোলো যে, আমি আত্মহাতিনী হবো।

কিন্তু এতাবৎকাল সতীদের যা যা ষোন্তে হয়, তোমাকেও তা কোত্তে হবে। তুমি যে নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে, তোমার ভদ্রী কি চেহারা দেখে সে মৰ্ম্ম-কথা যেন প্রকাশ না পায়। আচ্ছা, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম।” এই সকল আশাবাক্য প্রদান কোরে শঙ্কর ব্রাহ্মণদের শুভসংবাদ দিতে চোলে গেলেন।

শঙ্করের আশাবাক্যে বালা মুগ্ধ হোলেন বটে, কিন্তু ছাত্তের উপর থেকে চিতা আগ্নে-জনের ভয়ঙ্কর আড়ম্বর দর্শন কোরে অন্তরে অন্তরে অবসন্ন হোতে লাগলেন। বালার এখনকার অবস্থা বার্থ্যই ভয়ঙ্কর, তা শরণ কোলে হৃৎকম্প হোয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। জয়ার মনে তখন এই সংশয় হোতে লাগল, “বাবনের কথা কি সত্য? তার কথার উপর

কি অবলম্বন করা যেতে পারে? না আমার ভুলিয়ে ফুলিয়ে কান্দে ফেলবার নিমিত্ত সে এই কৌশল কোরেছে?” যে মৃত্যুরূপ নদীর উপকূলে দাঁড়িয়ে কালের ভীষণ মূর্ত্তি চিন্তা করে, স্বভাবতঃ তার মনে এই সকল সংশয়, এই সকল আশঙ্কা স্বতই উপস্থিত হয়, আত্মহান কোরে আন্তে হয় না। শঙ্করের বলবার ভদ্রী, তার আকার-প্রকার, বেক্রপে উদ্ধার করা হবে, তার কৌশল-প্রণালী, পূর্বে যে সকল স্ত্রীলোক প্রথমত তাঁর জায় সহস্ররূপে অসম্মতা হয়েছিলেন, কিন্তু শেষে শঙ্কর গিয়ে বলবা-মাত্রেই তাঁরা সম্মতা হন, এই সকল বিবেচনা একত্র হোয়ে বিন্দু বিন্দু নিব্বার-প্রপাতের জায় বালার সম্বন্ধ অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে শঙ্করের কথার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে। তাই জয়া এক্ষণে সুস্থিরচিত্ত হোয়ে সাহসকার দান্তিক ব্রাহ্মণদের নিলজ্জ প্রগল্ভ আত্মহানের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেন।

শঙ্কর প্রতারণা কোরবেন হোলে যে ভয় ছিল, এক্ষণে আর সে ভয় না, যেহেতু তাঁর কথায় বিশ্বাস জন্মেছে। তার পরিবর্তে কিন্তু আর একটি নূতন ভাবনা এসে উপস্থিত হলো। প্রাণ যেন রক্ষা হলো, কিন্তু পরে কি গতি হবে? জয় যাবেন কোথায়? তাঁর দশাটা হবে কি? আর তো বারানদীতে মুখ দেখাতে পারবেন না, সেখান থেকে একাল আধেরের মত প্রস্থান কোত্তে হবে, তার পর এদেশ সেদেশ কোরে পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াও আর কি। কত লোক কত প্রকার কু-কথা বোলে ছুর্নাম করবে, অনেক অপমানও সহ কোত্তে হবে, তাই ভেবে বালা এক্ষণে অকূল সাগরে ভাসতে লাগলেন, বিবেচনা কোলেন, তবে তার চেয়ে পুড়ে মরাই ত ভাল, সেই ত উত্তম। যে জীবনে গগন আর লাঞ্ছনা ভিন্ন কোন প্রকার প্রসাদ-গুণের প্রত্যাশা নাই, এমন জীবনে প্রয়োজন কি। তা শেষ কোরে কেলাই কর্তব্য। স্বভাবতঃ সকল জীবেরই প্রাণের প্রতি মায়ী হোয়ে থাকে, তবে কারও কিছু অন্ন, কারও কিছু অধিক হয়। প্রাণের প্রতি জয়ার অধিক মায়ী হলো, আত্মরক্ষার প্রতি তাঁর বহু প্রব

হয়ে উঠল, তাই বালা মনে মনে স্থির কোলেন যে, সাথে সাথে পুড়ে না যোবে আরও কিছুকাল জীবিত থাকবেন। বিশেষতঃ মোরোবা যেমন অাড়ী কোরে তাঁর প্রাণের উপর আক্রোশ প্রকাশ কোচ্ছে, তাই তিনি বিবেচনা কোলেন যে, পরমায়ু বৃদ্ধি কোরে সেই অপকারার্থী মৃশংস হিংস্রককে নৈরাশ কোরবেন। তিনি প্রাণদান পেয়েছেন শুনে সেই পাণিষ্ঠ নারকী দাপনার হিংসা-আঙুনেই আপনি দগ্ধ হবে। দাবার ভাবলেন, আমি যে জীবিত, আছি, এ কথা সে জানবে কি কোরে? আমি ত আর ধারণসীতে মুখ দেখাতে পারবো না। চাই ভেবে বালা আবার ম্লান হোলেন। মোরোবাকে ছলনা কোরে নৈরাশ কোরবেন, তাঁর প্রাণদানেই নরাধমের উপযুক্ত শাস্তি হবে, পায়র কোনো গতিকে না গতিকে অবশ্যই সে কথা শুনতে পাবে, শেষে এই বুদ্ধির ক্ষুতি হোয়ে জন্মের অন্তঃকরণে আত্মাদের উদয় হলো, ঐ আত্মাদপ্রবাহে অবগাহন কোরে গাঙ্গার সম্ভাপিত চিত্ত অনেক সুস্থও হলো। দয়া কিন্তু সে আত্মাদ মনে মনেই চেপে রেখেছিলেন, বাহিরে তা প্রকাশ হোতে দেন নি। যুবতী চিতার উপর আক্রমণ হোয়ে, সতৃষ্ণ-বৃত্তিতে মধ্যস্থলটি চেয়ে দেখলেন। ভয়কর বিকট শব্দের যে ভয় ছিল, সে ভয় এক্ষণে তিরোহিত হলো। একাকিনী বালা অন্তর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখলেন, লোহার দরজাটি উদার মুক্ত রোয়েছে, তাঁরে ধরে ভিতরে লয়ে যাবার জন্যে একজন কাক্রিও হাত বাড়িয়ে আছে। শব্দের ইশারা পেয়ে জন্ম সকলের সমক্ষে লক্ষ প্রদান কোরে চিতার মধ্যে প্রবেশ কোলেন, সেখানে যে কাক্রি বালার প্রতীক্ষায় ছিল, সে সেই রমণীর কোমল মাধুরীকে কোলে কোরে লয়ে নীচে নেবে নির্ঝিয়ে পাতাল-গৃহে চোলে গেল। শব্দর একটু অপেক্ষা কোরে থেকে মনে কোলেন, এতক্ষণে লোহার দরজাটি অবশ্যই রুদ্ধ হোয়েছে, তাই সকলের আপে চিতাহুণ্ডের মধ্যে অলস্ত কাঠ রূপ রূপ কোরে ফেলে দিতে লাগলেন। বার বার সেখানে

উপস্থিত ছিল, শব্দের পথাদেশি সকলেই সেই প্রকার অলস্ত কাঠ পরে চিতার মধ্যে নিক্ষেপ কত্তে লাগল। সে কথা পূর্বেই একবার উল্লেখ করা হোয়েছে। শব্দের কাক্রি দাস পতিহীন। তাপিতহৃদয়া যুবতীকে অগ্নির মিদাক্ষণ কালগ্রাস থেকে নির্ঝিয়ে রক্ষা কোরে একখানি কৌচের উপর এনে তাঁরে বসালে, কৌচখানি বালার নিমিত্তে পূর্বেই প্রস্তুত কোরে রাখা হয়। একটি শুদ্ধ জীর্ণ লোল বৃদ্ধা তাঁর সহচরী হলো। অলঙ্কারের পুটলিটি কৌচের নিকটেই অযত্নে পোড়ে ছিল, জন্মের বাসনা যে, সেগুলি তার দৃষ্টিপথে না থাকে। অলঙ্কারগুলি তাঁর প্রাণপতি রবুনাথের প্রদত্ত উপহার,—বিবাহ-রাত্রের প্রদত্ত উপহার, তাই সেগুলি তাঁর স্মৃতিমল বিনোদ-অঙ্গের রমণীয় ভূষণ ছিল,—সেই কথা এক্ষণে মরণহোয়ে বালা অশ্রুপ্রবাহে চক্ষু ছুটি আশ্রাবিত কোলেন। জন্ম স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, অদৃষ্টে সুখ যা হবার, তা জন্মের মতন হোয়ে চুকেছে ; এক্ষণে বৈচে থাকা কেবল বিভ্রম না মাত্র, এক্ষণে অবশ্যই তাঁকে চিরবঞ্চিতা চির-দুঃখিনী হোয়ে এ পাপ-সংসারে কেবল কষ্টভোগ কোত্তেই থাকতে হবে। সেই বৃদ্ধা কিন্তু বারংবার আশাবাক্য প্রদান কোরে যুবতীর অগ্র-সন্ন চিত্তকে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা কোত্তে লাগল। বৃদ্ধী বারবার এই কথা বোলে বোঝাতে লাগল যে, “তোমার ভাবনা কি, ধরে বোসে ঠাকুরালী কোরুছে, আমোদ-প্রমোদে থাকবে, তোমার কিসের দুঃখ? ছিঃ! অমন শশিমুখখানি আঁধার কোরে বোসে আছ কেন? দুটো কথা কও, হাসো, ফুলমুখী হোয়ে বেড়াও, তবে ত অমন চাঁদমুখের, শোভা পায়, ভূমি আদরিণী গৌরবিনী হোয়ে থাকবে, তোমার আবার ভাবনা?” বৃদ্ধা দেবীআবির্ভাবার দ্বার ভবিষ্যদ্বক্তা হোয়ে ঐক্লপ আরও কত কথাই বোলতে লাগল। জন্ম বোসে নিঃশব্দে শুনিছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গোপ-নীর পথ দিয়ে শব্দর এসে উপস্থিত। যে দরজা দিয়ে শব্দর ধরের মধ্যে প্রবেশ কোলেন, তার চাবি তাঁর আপনার কাছেই থাকত, কোমরের গোটে বেঁধে তুলিয়ে রাখা হতো। শব্দরকে

দেখে রুক্ষা সেখান থেকে উঠে চোলে গেল, জয়ার অমনি আত্মাপুরুষ কঁপে উঠল। তিনি দেখলেন, সে হবে সেই বিকট মূর্তি বামন ভিন্ন কেউই নাই। শঙ্কর শচিকী ব্যাকুলাত্মা জয়ার সঙ্গে এই আলাপ শুরু কোরে দিলেন, “জয়া! কোমলাঙ্গী! আমি কি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোলেন না? তুমি কি নিষাপদ গোলে না? দেখ দেখি, আমার কতখানি ক্ষমতা, কেমন কোণল কোরে তোমায় বাচিয়ে দিলাম, কেমন, দিইছি ত?”

সকল্মিতা জয়া বলেন, “হ্যাঁ, তা দিয়েছেন সত্য, আপনি আমার যেরূপ উপকার কোলেন, আমি যে আপনাকে কি দিয়ে সম্বলিত করব, তা ভেবে স্থির কোন্তে পাচ্চিনে।”

বামন বোলেন, “তুমি তা ভেবে স্থির কোন্তে পাচ্ছে না আচ্ছা, যা দিয়ে সম্বলিত করবে, আমি নয় তা খোলাসা কোরে বোলে দিচ্ছি।” বামন এই সময় যুগল শুভ প্রসারিত কোরে বোলেন, “এই যুগল বাহুর মধ্যে আইস, আবার কঁচে, নূতন হোয়ে সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করো, এবার কিন্তু অক্ষয় মুখের সংসার, এবার তোমার মুখের শেষ নাই, সকলে তোমার দাস হোয়ে থাকবে, যখন যে অভিলাষ হবে, একবার ইচ্ছা কোলেই হলো, মুখের বার হোতে না হোতেই তখন তা পূর্ণ করবে। এখানে কিছুই অপ্রতুল নাই। জয়া! তুমি আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা, তোমায় আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। এ পাতালপুরে আমার একাধিপত্য, তুমি এখানে সর্বস্বত্বা হোয়ে, আমার গৃহিণী, উপ-গৃহিণী, আমার সঙ্গিনী মতন হোয়ে, বাস কোরবে।”

বিষমকনয়া জয়া এই অকস্মাৎ প্রস্তাবের সমুদয় কথাগুলি শুনলেন, কোন কথারই উত্তর দিলেন না। শঙ্করের অসং অভিপ্রায় মনে কোরে আতকে অবসন্ন হোলেন, হস্তপদ আঁর্দি অবশ হোয়ে পোড়ল। শঙ্কর জয়াকে অত্যন্ত পেড়াপীড়ি কোতে লাগলেন, তিনি যে কথা বোলেন, সে কথার জবাব দাও বোলে জেদ কোরে ধোরে বসলেন।

নিরুপায়িনী জয়া ভয়ে কম্পিত হোতে হোতে শঙ্করের পদতলে পতিতা হোলেন, দু পা সবলে জড়িয়ে ধোরে তাঁর ইতিপূর্বে কান্তিপ্ৰফুল্লিত সরাগ চক্ষুটি বামনের নীচ কর্ণ মূর্তির দিকে একবার নিক্ষেপ কোলে বাসনা যে, মধুর কোমল বচনে পামরের ছা মহম কোরে করুণা উদ্দীপ্ত করেন। বাস মুখ দিয়ে কিন্তু কথা সরলো না, তাঁর বাক্য ফলো না। মুখের কথা মুখেই বিলীন হলে প্রার্থনিতার অবসরে ঘোর মর্মান্তিক গনঃপীড় চিত্র অবলোকন কোরে বার প্রাণ কাহ হলো না, সে পামরের অন্তঃকরণ অংশুই কষ্ট তার অন্তরাত্মা অবশুই হেম-হিংসায় পরিপূর্ণ বামন কিন্তু সেই হতশপূর্ণ অচঞ্চল চক্ষু অবলীলাক্রমে নিরীক্ষণ কোতে লাগলেন। ভগ্নাধর শুদ্ধ একমাত্র রঘুনাত্তরই পূজ্য পরিদন, সেই বিমল গুণদুটি যন বন কম্পিত হোলে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করবার জন্ম অনর্থক চো কোতে লাগল, বামন তাঁর মুখেরদিকে তাকি অকাতরে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। শব্দ বেশ বুঝতে পালেন, যুবতী বজ্রের ছায় শ কোরে পাছুটি জড়িয়ে ধোরে আছেন, কি তখাচ তাঁর শঙ্কর বিচলিত হলো না, শঙ্ক উচ্চস্বরে বোলতে লাগলেন, “ওঠো ওঠো তুমি আমারই হবে বোলে শপথ প্রতিজ্ঞ কোরেছি, আর সেই অস্ত্রেই প্রজ্জ্বলিত হতাশনের মুখ থেকে তোমার উদ্ধার করা হোয়েছে

এক্ষণে বাক্যশক্তি হোয়ে ব্যাকুলিনী জয়া এই উত্তর কোলেন, “তবে আরও একটি চিত্র প্রজ্জ্বলিত করুন। কৃষ্ণক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বত চিত্র প্রজ্জ্বলিত হোয়েছে, এ চিত্রটির অগ্নি যেন সকলের অপেক্ষা ঘোর উগ্রমূর্তি হয়, আমি চিত্রার মধ্যে নিমগ্ন হোয়ে, তার কাল-অগ্নি দেখ হব। হায়! আমার এ পোড়া অঙ্গ যা ঘোটবে, তা দেখতেই পাচ্ছি, তার অপেক্ষা মৃত্যু অনেক গুণে প্রার্থনীয়। আমি বরং প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখাকে আলিঙ্গন কোরবো, তা বরং ভাল, তখাচ তোমাকে এ পবিত্র অকথনই গ্রহণ করবো না। ভ্রাতৃ! আমি প্রতিজ্ঞা শুনলেন, তখন এখন আমার নিরুপায়িনী



দন, আমার নিরুত্তি দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা  
ক্ষয় করুন ।”

বামনের মুখকান্তি ক্রোধে রক্তিমাবর্ণ হল,  
দুইচক্ষু আরক্তিম কোরে সাহসাবে পীঠে একটা  
ধাক্কা মেবে জনাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে  
বোলেন, “জয়া ! আমি প্রতিজ্ঞা কোরেছি,  
আমি তোমার পতি হব, তোমার লগ্নে মনো-  
ভিলাস চারিতার্থ করুবো। যে কণে তুমি  
আমার কৌশলচক্রে ধরা পোড়েছো, সেই-  
কণেই তুমি আমারি হয়েছো, তুমি এখন আমার  
বন্ধ, আমার সম্পত্তি, আর কি তা নয় কোন্ডে  
পারো, এক্ষণে তুমি নিরুপায়। আজকার রাত্তির  
মতন তোমার অবকাশ দিলেম, বা ভাবতে হয়  
যদি, যা বিবেচনা কোন্ডে আছে, বিবেচনা  
করো। কাল কিন্তু যখন সন্ধ্যার ক্রয়মূর্তি চতু-  
র্দিক আবরণ করবে, তখন আমার আগমন  
প্রতীক্ষা কোরে বিলাস-সজ্জায় সুসজ্জিত হোয়ে  
থেকো ।”

এই সকল কথা বোলে সরণী লাকে  
শাসন আর বিবাদের প্রতিমূর্তি কোরে রেখে  
শঙ্কর প্রস্থান কোলেন। বামনের ইঙ্গিত মতন  
সেই বৃদ্ধা অভাগিনী বন্দিনীর কলযোগের  
সামগী এনে উপস্থিত কোলে। কাকুরি প্রতি  
জয়ার বিশ্বাস ছিল না, তাই তিনি কোনো দ্রব্যই  
মুখে দিলেন না, কেবল গোটাকয়েক শুকনো  
ছোলামাত্র চিবিয়ে এক ঢোক জল খেতে চাই-  
লেন। পিপাসার তাঁর তখন আকর্ষিত হুইয়ে  
গেছিল, ক্ষুধাতেও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে উঠেছিল,  
তথ্য আহারের প্রতি তাঁর প্রবৃত্তি হলো না।  
একটা মেটে কলগীতে পুষ্পবাসিত সুশীতল জল  
রাখা ছিল, বুড়ী তা থেকে এক গ্রাস জল লয়ে  
শঙ্কর-নয়না জয়ার মুখের কাছে ধোলে। সেই  
এক গ্রাস জল পান কোরে জয়ার মহাপ্রাণী  
কতক শীতল হলো। অশ্রুযুগী বালা জিজ্ঞাসা  
কোলেন, “বে কাল বিড়ম্বনা আমার মুখ  
অপেক্ষা কোরে আছে, তা থেকে নিস্তার পাবার  
কি কেনো উপায় নাই? উদ্ধার হবার কি  
কোনো পথই নাই?” বুড়ী বোলে, “না, তার  
কেনো আশাই নাই, ব্রাহ্মণের প্রতি এত  
বিষেই কেনো? তোমার কি প্রাণের ব্যাধি

নাই? আবার কি তোমার শরীরের কোন্ডে  
চিতার যুখে নিক্ষেপ করবার নিমিত্ত যের  
কিরে বেতে চাছো? তোমার কি পুড়ে মরবার  
বড় সাধ? আপনি অত উতলা হবেন না, স্থির  
শান্ত হোয়ে থাকুন, আমার প্রভু কৃত উপকার-  
গুলি শ্রবণ কোরে মন স্থির করুন, অমৃত-  
তুরী দিয়ে মনপ্রাণ তাঁর স্নেহের সঞ্চে একত্রে  
বৈধে রাখুন। শঙ্কর একটু পরেই নেবে এসে  
আহারাদি করবেন, এই দেখুন, আমি তার  
উদযোগ কোন্ডে গোলেম।”

ছল ছল-নয়না ভাবা পুনর্বার একাকিনী  
হোলেন, কি কোরে সেই কারাগৃহ থেকে  
প্রস্থান করবেন, তারই কৌশল চিন্তা কোন্ডে  
লাগলেন। বালা মনে মনে স্থির-সিদ্ধান্ত  
কোলেন যে, ব্রাহ্মণের শরীরে যদিও কখন  
দয়ার সঞ্চার হয়, এক্ষণে কিন্তু সে দয়া অন্তর্ধান  
কোরেছে। ব্রাহ্মণ কামান্দ্র হোয়ে যেরূপ উন্নত  
হোয়েছে, তাতেই সে পথ অবরুদ্ধ হোয়ে  
পোড়েছে। জয়া স্পষ্ট বুঝতে পালেন, তাঁর  
অনুন্নয়-বিনয়ে কোন ফল দর্শিবে না। নিরু-  
পায়িনী, নিগ্রহ-পীড়িতা, দুঃখিনী বিধবাদের  
মনের সংশয় পরাস্ত কোরে, শঙ্কর যে কেন  
তাদের পুড়ে মোতে প্রবৃত্তি দিতেন, বামনের  
কথা বেদবাক্য জ্ঞান কোরে দুহৃদয় ব্রাহ্মণ-  
দের, কি লালসোগস্ত স্বজনবর্গের বাসনামুরূপ  
কার্য্য কোন্ডে পতিহীন অবলারা কেন যে  
স্বীকৃত হোতেন, সে সকল মর্ম্ম-কথা জয়া  
এক্সণে পরিপাটীরূপে ব্যাখ্যা কোন্ডে সমর্থ্য  
হোলেন।

বামনের মনোবাহা পূর্ণ হল! পরিণামে  
সেই সকল হতভাগিনী অবলাদের কিরূপ গতি  
হতো, জয়ার কোন উপায় ছিল না যে, সে  
সকল গৃঢ় বৃত্তান্ত নিশ্চয়রূপে অবগত হন। হয়  
ত সেই সকল নিঃসহায়িনী দুঃখিনীদের অনাথা  
কোরে অকরণ নির্ভর লোকালয়ে তাড়িয়ে বার  
কোরে দেওয়া হত। তার পর তারা প্রাণে  
মারাই পড়ুক, কি তাদের সমুদয় শোক-সজ্জা-  
পের সহভাগিনী এই গ্রহের বীরাদমার তার  
নৃসংশ-অবতার নির্দয় দানবগণের করাল  
শীকার-মুখে পতিতই হোক, কাকুরি তা জান-



বার প্রয়োজন ছিল না। ধর্ম্মাশ্রমী ব্রাহ্মণ মহা-  
পুরুষদিগের কথা অমাত্র কোরে অহুতরূপ  
পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের  
ফল এক্ষণে প্রত্যক্ষরূপে অহুতরূপে কোন্ডে লাগ-  
লেন। অভাগা জয়া মনে মনে বোলতে লাগ-  
লেন, “হায়! আমি যদি অহুগমন কোন্ডেম,  
তবে আজ অক্ষয় আনন্দ-ভবনে রঘুনাথের  
সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্ডে পাওঁম। কিন্তু কি পরি-  
তাপ! অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা প্রদান কোন্ডে আমার  
সাক্ষ্য হলো না, কেমন কোরে যে পুড়ে  
মরুণো, তখন আমার সেই ত্রাস হলো,  
বিশেষতঃ জীবিত শরীরে অনল সংগ্রহ কোন্ডে  
প্রাণ আরও কৈপে উঠল, পুড়ে মোন্ডে  
হবে বোলে আমার মহাপ্রাণী আত্মকে  
চম্কে চম্কে উঠতে লাগল। তখন এই বুদ্ধি  
হলো যে, জীবনের অক্ষুর হোতে না হোতেই  
সে জীবন কি কোরে ধ্বংস করবো? আমার  
মনে তখন সেই মায়ী প্রবল হলো, আমি যেন  
মনোদর্পণে সেই জীবন-মায়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্য-  
ক্ষের দ্বারা স্পষ্ট দর্শন কোন্ডে লাগলেন, শুধু  
তাও নয়, কেমন কোরে পুড়ে মরুণো, তাই  
ভেবে আত্মপুরুষ শুক হোতে লাগল। যে জীবন  
এত যত্ন কোরে রক্ষা কোন্ডেম, এক্ষণে কিন্তু  
তার সৌরভমাধুরীর আভ্রাণে, তার অমৃত-রস  
আবাদনে বঞ্চিত হোয়ে কেবল তার কালকূট  
হলাহল পান কোন্ডেই থাক্লেম। আমার যে  
পাপম্পর্শ কোরেছে, এই শাস্তিই সেই পাপের  
দণ্ড। গুরুদেব আমার প্রতি বাম হোয়েছেন,  
আর কি তিনি রূপা কোরবেন? দেবতারা কি  
আমায় কটাক্ষ কোরে এই কথা বোলে উপ-  
হাস কোরবেন না? ‘তোর যেমন বাঁচবার  
সাধ, সে সাধ ত পূর্ণ হলো, এখন বেঁচে থেকে  
কত সুখ, তাই দেখ, তারই ভোগাভোগ এখন  
ভোগ কর’।”

জয়া এই সকল চিন্তার ভ্রমমাণা হোয়ে  
কোচের উপর অবসর হোয়ে পোড়লেন। দুই  
চক্ষু দিয়ে বানের দ্বারা অশ্রুশ্রোত বইতে লাগল,  
জয়া সেই অশ্রুজলে ভাসতে লাগলেন। বালা  
ক্ষীত চক্ষু দুটি মোচবার নিমিত্ত অঞ্চলের একটি  
কোণ যেমন হাতে কোরে তুলেছেন, সেই সময়

রসমের কোমরবন্ধনের নীচে শক্ত মতন কি  
একটা জিনিস হাতে ঠেকলো। সেটি একটি  
শিশি, তাতে ‘অজ্ঞান’ হবার দাবক ছিল, ঐ  
শিশিটি তাঁর খুড়ী তাঁকে প্রদান করেন। সেই  
শিশির কথা শ্রবণ হোয়ে একটি উজ্জট ভাব  
জয়ার মনে তীরের দ্বারা প্রবেশ কোলে। যে  
অপকুট স্থানের কুটীরে তিনি বন্ধিনী হোয়ে  
আছেন, এই শিশি সহায় কোরে সেখান থেকে  
কি প্রস্থান কোন্ডে পারেন না? বামনকে কি  
তা পান করাইবার উপায় হয় না? কি পরি-  
তাপ! দালার মনে ভয় হলো যে, এ কৌশল  
সুসিদ্ধ কোরে তোলা দুঃসাহ্য। জয়া নৈরাশ  
হোয়ে সে আশা পরিত্যাগ কোরবেন, এমন  
সময় সেই বর্ষীয়সী আহারোপকরণ লয়ে সেই  
ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোলে। মেজেতে একটি  
মাজুর পেতে তার উপর সেইগুলি রেখে দিলে।  
সেই দেবপ্রীতি ভবিষ্যৎজয়ী বুদ্ধা গৃহের মধ্যে  
কি কোচ্ছিলেন, জয়া আড়চক্ষে আড়চক্ষে তা  
নিরীক্ষণ কোন্ডে লাগলেন। বালা দেখলেন,  
বুড়ী রূপার গ্রাস লয়ে সেই জালা থেকে এক  
গ্রাস জল পুরে খাবার পাশে রেখে দিলে, রেখে  
দিয়েই সে চোলে গেল, বোধ হয় আহার কব-  
বার নিমিত্ত শঙ্করকে ডাকতে গেল। জয়া সেই  
অবকাশে শিশিটি বার কোরে তার মধ্যে যা  
ছিল, চেকে দেখলেন। তাতে স্বাদ-গন্ধ কিছুই  
ছিল না, বর্ণটিও সাদা, সেইটি তাঁর দুঃসাহসী  
কল্পনাসিদ্ধির পক্ষে আরও সুপ্রতুল হলো।  
যুবতী তখন উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিতহস্তে শিশি-  
টির অর্ধেক পানীয় সেই জলপূর্ণ গ্রাসে ঢেলে  
দিয়ে মিশিয়ে দিলেন।

তার পরেই শঙ্করের পায়ের শব্দ, আর তার  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বুড়ীর হাব-ভাবের চলন-  
ধ্বনি প্রচার কোরে দিলে—তারা আগতপ্রায়,  
বালা তখন ফিরে গিয়ে কেবল কোচের উপর  
বোসেছেন। সেই শব্দ শুনে বালার মহাপ্রাণী  
চম্কে চম্কে উঠছিল, আর সর্বাঙ্গ ধর ধর  
কোরে কাঁপছিল। জয়া ভাবলেন, ব্রাহ্মণ যদি  
সন্ধান পায় যে, এই কৌশল করা হোয়েছে,  
তবে যত্ন, কি তার অপেক্ষা আরও কিছু  
নির্ভর অমঙ্গল তাঁর সন্মুখে বরাই হোয়েছে।

শব্দর ধরের মধ্যে প্রবেশ কোরে কোনো কানাতা না হোয়ে তখনি খেতে বোসলেন ।  
হাতগুলি খেয়ে সেই রূপার গ্লাসে যে পের ছিল, এক নিশ্বাসে শেষ কোলেন । জয়া নিশ্বাস ফেলে মাছেন, ভয়ে দম নিতে পাচ্ছিলেন না, হৃৎকপি তাঁর নিগ্রহদাতার উপর স্থির কোরে রেখেছিলেন, বামন স্বপ্নেও জানতে পারেন নি, তিনি কি পদার্থ এক চুয়েকে উদয়ে নিয়ে গাছিলেন । শব্দর যা পান কোলেন, তার ক্রম তখন প্রকাশ পায় নি, আমোদে প্রক্লান্ত হয়েছেন, মনে মনে মহা আনন্দ, আঙ কি স্ত-প্রভাত আজকার দিনটে কি কুণ্ডেই জীবদান হলো ! শব্দরের বাসনা যে, তাঁর লক্ষিত পানী জয়া তাঁর দৃষ্টান্তগণের প্রশংসা করেন, আর তিনি বোসে বোসে সেইগুলি প্রাণ করেন—তাই বামন কোলেন,—  
“তোমার গহনাগুলি লয়ে তারি ঝকড়া কোচ্ছিল, কেমন জয়া ! কোচ্ছিল না ? কেমন হালকি কোরে সেগুলি হস্তগত কোরেছি, আমার বাহাদুরি দেখেছো ত ? কেমন চোকে দুল দিয়ে হালকি পেলেছি, কেমন কৌশল কোরে তাদের ঝকড়া মিটিয়ে দিলেম ! আমি যা করি, তুমি কি তা ভাল বলো না ? তোমার কি তা ভাল লাগেনি ?”

জয়া বোলেন, “মহারাজ ! আপনি যা করেন, তা ভালই করেন, আপনার কাছে সবায় অবিচার নাই ।”

শব্দর বোলেন, “সে কথা সত্য—তাই বটে, আচ্ছা জয়া ! তোমার কি বিবেচনা হয় ? প্রতিবাসীর চেয়ে আমি মাথায় খাঁটো, কি আমি দেখতে কদাকার, তাই বোলে কি আমি আমোদ-প্রমোদ কোরবো না ? তাই বোলে আজন্ম খুবড়ো হোয়ে থাকবো ? আমার প্রাণে কি সাধ নাই, না সঙ্ক নাই, আমার কি কল-বাবুর মতন ফুলফুলে হোয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করেনা ? না খোসপোসাকী হতে আমার সাধ যায় না ? বামন হয়েছি বোলে কি আমার রূপ নাই বোলে আমি যেন মাথা বিক্রি কোরেছি, কি কারও যেন ধার কোরে খেয়েছি । লোকের অবিচারটা দেখো—সুখের আশায় কেন জলা-

গুলি দেবো ? দেবো কেন, গরজ কি ? বেটে আছি আমিই আছি, রূপ নাই, —নাই, থাক, তাই বোলে কি আমার বিলাসভ্রম সন্তোষ কোন্তে ইচ্ছা হয় না ? তাও কি একটা কথা ? অবশ্যই হয়, আমার তা হোয়ে থাকে । তুমি কি মনে কোরেছো, আমি কাণা ছুঁচোর মতন বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে কেবল পোকা মাকড় ধোর বেড়াই, আমার তেমন নীচ প্রকৃতি, তেমন লগু চেঁটা নয়, তুমি কি মনে কোরেছো, আমি কেবল জপ-তপ আর উপবাস কোরেই সন্তুষ্ট, না কেবল বাগ-পূজা কোরেই দিনপাত করি, না এ পাতালপুরে কেউ দোসর নাই যে, আমার সেবা-শ্রদ্ধা করে ? হাবী ! তা নয়, আমার সে জপ-তপ সকলি মিথ্যা, সে কেবল বার-চটক মায় । আমার কুৎসিত দেখে, আমি কারও পোষামোদ বরামোদ করিনে বোলে আমার কেউ মেয়ে দিতে চায় না । কারও বিবাহ-সমারোহে পুরবাসিনীরা আমার দেখে আপনার আপনার ছেলে মেয়ে ঢেকে নিয়ে বেড়ায়, আমার দেখতে দেয় না, এ কি কম দুঃখের বিষয় ? হোক, আমি কিন্তু মনে মনে জানি, আমারও একদিন আছে, একদিন তাদের আমি হাতে পাব, আর তা পেয়েও থাকি । যাকে পেয়ে অত কারুরি দরকার হয় না, এ পর্যায়ে সেইরূপ দোসর পেয়েই আমি সন্তুষ্ট হোয়ে আস্কে, এবার কিন্তু আমি আশার অতিরিক্ত কুতর্ভ হয়েছি, এবার একটি যুবতীও পেয়েছি, আবার তার অলঙ্কারও পেয়েছি, কেমন জয়া ! পেয়েছি ত ? কাল রায়ে তবে আমরা বিবাহের ধুম আমোদ কোরবো—তখন—”

এই কথার পর কি বোলেন, বোঝা গেল না, তখন তাঁর গলার আওয়াজ বোসে গিয়েছে, কথারও জড়তা হোয়ে এসেছে, বাড়টা বুকের উপর ঝুঁকে পোড়েছে । শব্দর উচু হোয়ে সিঁদেভাবে বসবার চেঁটা কোচ্ছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না, পোড়ে পোড়ে যাচ্ছিলেন । তখন মাদক তার নিজ বিক্রম প্রকাশ কোরেছে, শেষে অধোর নিজার অভিভূত হোয়ে শব্দর সেই মাহুরে পোড়ে নাক ডাকতে লাগলেন ।

জয়া উঠে দাঁড়ালেন, একটি প্রদীপ মিট মিট কোরে জ্বলছিল, তার শিখাটি শব্দের চক্ষের উপর এক একবার নেবো নেবো হোয়ে, আবার একটু একটু তেজ কোরে উঠছিল। শব্দের প্রদীপটি একবার উকেও দেন নি। এক্ষণে সকলে গভীর নিস্তর, যে দরজা দিয়ে শব্দের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, সে দরজাটি ভেজান ছিল, জয়া আবও খুলে কঁক কোর রাখলেন, কবার দুবেলের কঁচ কঁচ শব্দ হওয়ায় জয়ার হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হল, পাছে শব্দ শুনে বুড়ী এসে উপস্থিত হয়, তা হলে বাবার প্রদান করা ঘোটবে না। জয়া একটু কাণ খাড়া কোয়ে থাকলেন, পাখরের যে সিঁড়ি নেবে এসেছে, তার দক্ষিণ দিক্কার কামরায় যেন কারও কণ্ঠস্বর শুনে পেলে, এইরূপ তাঁর অহুভব হলো। বাবা প্রদীপটি হাতে কোরে লয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, আবার যেখানকার প্রদীপ, সেইখানে রেখে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে কতকগুলি ধাপ বেয়ে উঠলেন, তখন ঐ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনে লাগলেন, আরও ধাপ কয়েক এগিয়ে গিয়ে নিম্নের কথোপকথনগুলি তাঁর কর্ণমুখে ঝঙ্কার কোন্তে লাগল।

একটি স্র বোলে, স্বর শুনে জয়া বেশ বুঝতে পারলেন, সে সেই বুড়ীর গলার স্বর, স্বরটি বোলে, “এইবার আমাদের প্রভু একটি পরমাত্মন্দরী হস্তগত কোরেছেন।”

তার সহচর বোলে, জয়া অহুভব কোলেন, সে ব্যক্তি সেই কাফরী দাসই হবে, “কেবল সন্দরী নয়, মনুষ্যবতীও বটে।”

“তবে ত তোমারি ভাল হলো, আমার মূনিবের যখন অক্লি হবে, তিনি যুগ কোরে আর চাইনে বোলে যখন তারে বিদায় কোরে দেবেন, তখন সে তোমার অনেক টাকা দিয়ে যাবে। বাবু! তোমার উপরি রোজগার দেখে আমার হিংসা হোচ্ছে।”

পুরুষটি বোলে, “হিংসা তোমার হয় সত্য। যদি দুটাকার মুখই না দেখে, তবে এত কষ্ট কোব্বো কেন? নির্ধিয়ে ভিতরে লয়ে আসা কম কষ্ট নয়, সে সময় যেন উড়ে গিয়ে

পোড়তে হয়। এই গন্তের মধ্যে আজন্ম বাস কোন্তে হোচ্ছে, এখানে ত চন্দ্রস্বরের দপ দেখতে পাওয়া যায় না, তার উপর আবার দেশ সে দেশ টো টো কোরে ফিতে হয়, সঙ্গী মালগুলি অনেক কায়ক্শে কোরে বেচতে হয়, কেন না, সকলের সঙ্গে দরে বনে উঠে না, তাই তাবে ঘাড়ে ঘাড়ে কোরে এ দেশ সে দেশ ফিতে হয়, তাতেও কি কম পরিশ্রম, আর কয় ক্শে? আমি যে নানো মাঝে ভাল ভাল যুক্তা ধোরে এনে দি, তার জগে বকসিস বোলে অতিরিক্ত কিছু পেয়ে থাকি? এই দেখো, শেষবার, আমার আরসাবাদে ছুটে যেতে হাচ্ছিল, তাতে একশ টাকা বটে পেলেম না, সে কি একটা পাওনার মধ্যে?”

“সত্যিই বাবু, তুমিও টাকার জগে খেটে মরো, আমিও টাকার জগে খেটে মরি। আর কথা বোল্ছিলে, শেষে সে স্ত্রীলোকটির ভাগ্য কি হল?”

“শ্রীমতী একবার হস্তান্তর হোলে তার পর যে কার ভাগ্য কি ঘটে, বাস্তবিক আমি তা বোল্তে পারিনে। তবে তুমি যার কথা জিজ্ঞাসা কোছো, তাকে একজন নবাব মোসলমানের কাছে বিক্রয় করা হয়, সহরে থাকতে থাকতেই শুনে পেলেম, তার মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলে দিয়েছে। নবাবের রমণীয় মহলে অনেকগুলি সেকলে পাকা ঘালি রাঁড় আছে, তারাই নাকি একটা মিথ্যা দুর্নাম তুলে দিয়ে ঢোল পিটে দিছিল।” বুড়ী হাহা কোরে প্রাণ ভরে একবার হেসে নিয়ে বোলে, “তবে এ ছুঁড়ীকেও তারই কাছে লয়ে যাও, তা হলে বড় রগড় উঠবে, সেবার চোকেছো, এবার কিন্তু জিতে যাবে, বস, শোধেবোধ হোয়ে গেল।”

পুরুষটি বোলে, “তা যা হয় হবে, তোমার এখনো ঝুঁটো নিতে ডাক্ছে না কেন? আমার যুগাপিত্তি নাই জানো, পাতের ঝুঁটো পেলে বিষম হওয়া নাই।” “তা সত্যি বাবু, কিন্তু না ডাক্লে যেতে ভরসা হয় না।” তারপর বুড়ী কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে কি বোলে, জয়া তা শুনে পেলেম না।

আর এখন কারও কথা শোনা যায় না,

ইহায়েই নীরব। এইরূপ প্রশান্তভাবে খানিকক্ষণ থেকে সেই কাফরি দাস একটি হাঁই তুলে ছিট্টিয়ে বোলে, “আচ্ছা, যদি খেতেই না পারি, তবে আর বোসে কি করি, যাই, ভাই নিয়ে।” কাফরি তখন উঠে দরজা বন্ধ কোলে, যেমনি পুনর্বার সাক্ষাৎ প্রেতভূমির জায় নীরব নিস্তব্ধ হলো।

জয়া তাঁর পূর্বগামী সম্মত রমণীদের মূর্তির কথা শ্রবণ কোরে ভয়ে আড়ষ্ট হোতে লাগলেন। বিশেষতঃ সেই বুড়ী আর তার সঙ্গী গই কাফরি পুরুষটি যেরূপ অমানবমনে পরস্পর হাঙ্গা কচা কোলে, তাই শ্রবণ কোরে জয়ার হোপ্রাণী শুক হোতে লাগল। বালা পূর্বাপেক্ষা ভীত ও উৎকণ্ঠিত, আরও উদ্ভিন্ন হোলেন, হৃৎকণ্ঠে তন্তুগত হোয়ে থাকলে তাঁর অদৃষ্টে বড়র জালা যন্ত্রণার ভয় আছে, তাই তার হাত থেকে বক্ষা পাবার িমিত্ত যুবতী অতিশয় প্রকলিত হোলেন। সিঁড়ি থেকে নেবে এসে পৌঁচি উদ্ভিষে দিয়ে বামনের কোমরে চাবি ক্রোড়ে লাগলেন, চাবিগুলি ঘুনসীতে বাঁধা ছিল, মাত্রতকে বিরক্ত না কোরে, চাবিগুলি আন্তে আন্তে খুলে লয়ে, সিঁড়ির দরজা বার-দিগ্ দিয়ে ক্র কোরে সেই অন্ধকূপ থেকে ছুটে বেরিয়ে পাড়লেন। বুড়ী যে ঘরে থাকে, সেইখানে একটু কাণ পেতে রইলেন, কাফরি বড়র বড়র দে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, বুড়ী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কঁস কঁস কোরে নিশ্বাস ফেলুচ্ছে, বালা কবল তাদের নাসিকা-গর্জ্জনই শুনলেন, তা ডা অথ কোনো শব্দ শুনতে পেলেন না। অর্থ িন্ন প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য, জয়া সেই া পূর্বশ্রবণ কোরে আপনার অলঙ্কারগুলি স্তগত কোলেন। বামন সেইগুলি পেয়ে কতই গাফালন কোরে আপনার বাহাছুরি দেখা- ছলেন যে, কি চালাকি কোরেই সকলকে ক্রিত কোরেছেন। বালা প্রদীপটি হাতে করে সিঁড়ির শেষ দাপ পর্যাস্ত এসে সেখানে, রজা বন্ধ দেখে তাঁর গতি রহিত হলো। সে কিন্তু চাবি ছিল, সেই চাবি দিয়ে রজা খুলে একটি ঘর দেখতে পেলেন, াকারে বোধ হলো, শব্দর দিবসে সেই ঘরে

বাস করেন, ঐ ঘর পার হোয়ে জয়া আরও একটি ঘর দেখতে পেলেন, ঘরটির ভিতরের দিকে হড়কো দিয়ে বন্ধ করা ছিল। হড়কোটি আন্তে আন্তে তুলে, নিঃশব্দে পাশের দিকে ফেলে রেখে দরজাটি খুলেন, খুলে দেখেন, একটা ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে এসে পোড়েছেন। কোন দিক দিয়ে বেরিয়ে সদর রাস্তায় পোড়তে হয়, সে পথ জাত না থাকতে ভয়াক্রান্ত ভীতবভাবা জয়া আন্দাঞ্জে আন্দাঞ্জে শোজা সিধে পথ ধোরে চোলেন, যেতে যেতে পা বেধে পোড়ে গেলেন, সেখানে অনেকগুলি ভাঙ্গা থাম পোড়ে ছিল, জয়া তারি উপর পোড়ে গেলেন। অন্ধকার রাত্রি, অন্ন অন্ন হাওয়া চোলেছে, জয়া নীতল- স্পর্শ কোরে অনেক সঙ্গী ব হোলেন। একপে শ্রির জানতে পালেন, সদর দরজা বড় দূর নয়, তার নিকটেই এসেছেন। যেমন একটি কোণ ঘুরে আসবেন, দেখেন যে, পথের মধ্যে আলোর ছটা পোড়েছে, তাই দেখে একটু থমকে দাঁড়ালেন, আবার পূর্বের মতন অন্ধ- কার হওয়াতে আন্তে আন্তে পা টিপে টিপে চোলতে লাগলেন। খানিক দূর এগিয়ে এসে দেখেন, কালীদেবীর ভগ্নমূর্তির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটি লোক দেবীর সম্মুখে বোসে পূজা কোচ্ছে, সে ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোন্তে কোন্তে বিড় বিড় কোরে কি মন্ত্র পোড়ছে, পাশে একটি পাত্রে দুপ-দুনো ধরা রয়েছে, সেইগুলি এক একবার অন্ন অন্ন জলে উঠছে, আবার নেবো নেবো হোচ্ছে। জয়া ত তাই দেখে ভয়ে সেইখানে বোসে পোড়লেন, এগোবেন, কি পেছবেন, তাই তেবে অস্থির হোলেন। তার সম্মুখে সেই পুরুষটির ভাবভক্তি বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগ- লেন, সে ব্যক্তি মাথা তুলে উঠে এসবার পূর্বে সেই ধূপ-ধনোর পাত্রে কতকগুলি কি শুড়ো ছড়িয়ে দিলেন, পাত্রটি তখনই সাতোজে জলে উঠল, সেই সময় সেই ব্যক্তি যেন মাথা উচু কোরে উঠে বোসবেন ঐ আলো চিহ্নক মোরোবার মুখের উপর এসে পোড়ল, জয়া ত তারে দেখে পূর্বেই ভীত হোয়েছিলেন, একপে কিন্তু মোরোবারও হৃৎকম্প আর আতঙ্কের

অবাধ ছিল না। সে ব্যক্তি তাঁর ধূপদীপের আলোতে, আর জয়ার হাতে যে প্রদীপটি মিট মিট করে জল্ছিল, তার ক্ষীণপ্রভার আলার আকৃতিটি স্পষ্ট চিনতে পালেন। মোরোবাইয়ের জেনেছিলেন, জয়া দক্ষ হোয়ে ভয়াবশেষ হয়েছেন, তাই তাঁর নিতান্ত প্রতীত হলো, আকৃতিটি তাঁর হিংসাতাজন জয়ার অপ-চ্ছায়া। মানস পূর্ণ হোয়েছে বোলে সেই আফ্লাদে মোরোবাই তখন সেই সংহারমূর্তি কালীদেবীর অর্চনা পূর্বক তাঁর স্তব-স্ততি কোচ্ছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর সময় জয়ার আকৃতি তাঁর নয়ন-পথে পতিত হলো। মোরোবাই জয়ার প্রতি দ্বিতীয়বার চেয়ে দেখবার অপেক্ষা না কোরে, পুনর্বার মস্তকটি মৃত্তিকার উপর রেখে, “দেবি! রূপা করো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা করো, আমার প্রাণদান দাও।” এই সকল উক্তি কোরে ভয়ঙ্কর বিকট চীৎকার কোরে উঠলেন।

জয়াকে অকস্মাৎ দর্শন কোরে কুসংস্কারাপন্ন মোরোবাইর অন্তঃকরণের মধ্যে যা হোতে লাগল, বাংলা সেটি বুঝতে পালেন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে চোলে এসে খিলাননির্মিত সিংদরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পোড়লেন। যে চিতা জয়াকে ভয়াবহ কোরেছে বোলে লোকের মনে বিশ্বাস হয়েছিল, সে চিতার মুখ দিয়ে তখনও পগান্ত ধূম নির্গত হোচ্ছিল। দক্ষাবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে, রাত্রের হাওয়া পেয়ে ছোট ছোট কাষ্ঠের গুঁড়িগুলি মধ্যে মধ্যে জলে উঠে অল্প অল্প আলোর ছটা প্রকাশ হোচ্ছিল, সেই আলোতে দূর থেকে পথিকেরা দেখতে পাচ্ছিল, ডোমেরা চিতার পাশে ঘুরে ঘুরে পোড় কাষ্ঠগুলি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঐ কাষ্ঠ লয়ে তারা রসুই করে। জয়া হাতের প্রদীপটি একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উল্টুমুখো হোয়ে ময়দানের উপর দিয়ে ব্যস্ত হোয়ে চোলেন, বাংলা মনে কোলেন, তবে আর ভয় নেই, তাঁরে কেউই দেখতে পাবে না। এক্ষণে বিস্তীর্ণ সংসারক্ষেত্র পথিক বিধবার অগ্রে উদার বিস্তার রয়েছে। এক্ষণে কোন দিকে আর কোন

মুখো পাদাবনত কোরবেন, যুবতী তারি চিতা কোত্তে লাগলেন। জয়া বেশ বুঝতে পেয়ে ছিলেন, তিনি যেখানেই যান, সকল স্থানই তাঁর অপরিচিত আর সর্বত্রই অসম্ময় অপ-মানের ভয় আছে। শেষে যেক্ষণে রঘুনাথের সঙ্গে সতীর সাক্ষাৎ-ঘটনা হলো, সে বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে পাঠকবৃন্দকে অবগত করান হোয়েছে।

রঘুনাথ আর জয়ার একান্ত প্রতীতি হলো যে, মোরোবাই যত নষ্টামির গোড়া, যে সকল কাণ্ড হোয়ে গেছে, মোরোবাই তাঁর মূলভূত, সেই হোতেই সমুদয় কুচক্রের সৃষ্টি হোয়েছে। যিনি সম্প্রতি দেওয়ালের ইজারাদার হোয়ে এসেছেন, হয় ত সে বাক্যকে তাড়াতাড়ি বারংবার চোলে আসতে হচ্ছিল, তাই মোরোবাইর স্তবিধা হয়ে উঠেন যে, তাঁরে ঘৃণ কবুল কোরে ক্রোধ-তাজন রঘুনাথকে আরও কিছুকাল কয়েদ অবস্থায় রেখে দেয়, তাই হোক, কি সে নিশ্চয় জেনেছিল, জয়া নাই, তাই হয় ত বিবেচনা কোলে, এখন আর রঘুনাথকে আটক কোরে রাখার দৃশ্য কি? মোরোবাইর কথা এই পগন্ত শেষ কোরেই রঘুনাথ বোলেন, “আর এখানে বিলম্ব করা নয়, চলো, যত শীঘ্র পারি, তাড়া-তাড়ি বারাগসী চোলে যাই, সেখানে পৌঁছে সুবাদারর কাছে এই বিচারের প্রার্থনা কোরবো যে, মোরোবাই আমাদের উপর এই সকল অত্যাচার কোরেছেন, এক্ষণে আপনার কাছে নালীসবন্দী হোলেম, আপনি তার বিচার করুন।” রঘুনাথ বোলেন, “জয়া! যে গতিকে তুমি নিকৃতি পেয়েছো, সে কথা আমি প্রকাশ কোত্তে চাই না। শররকে আর ভয় কোরে চোলে হবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো, সে যা জানে, প্রাণান্তেও সে কথা প্রকাশ কোত্তে পারবে না। আমি যদি তার অসহ্যাবহারগুলি প্রচার কোরে তার দুর্নাম কোরে বেড়াই, তা হোলে সেই হোক, কি তার বাপ মোরোবাই হোক, তারা যে তোমার নামে কত প্রকার কলঙ্ক রটিয়ে দেবে, তা এক্ষণে নিশ্চয় কোরে ঠাাভার, হয় ত তোমার চরিত্রে একটা দাগ চড়িয়ে দেবে, শেষে জাতি-কুল নিয়ে

চানটানি পোড়বে। তুমি যে আমায় বোলে, মোরোবা তোমায় ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে দেখতে পায় ভয়ে কাঁপতে লাগল, এখন যদি তার বিশ্বাস হয়, সে মূর্তি তোমারি, তোমার জীবাত্মার নয়, তা হোলে সে নিঃসন্দেহ এই মনে কোরবে, দেবতারা তোমায় রক্ষা কোবেছেন, আমি জীবিত আছি বোলে তাঁরা তোমায় আত্মবিসর্জন কোন্তে প্রবৃত্তি দেন নাই, কি তাঁরা তোমার আত্মবিসর্জন করবার পথ অবরুদ্ধ কোরেছিলেন। তাই তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি যে, যা সত্য সত্যই ঘোটেছে, সেই কথাটি প্রচার কোরে দিও, বোলো যে, একটি দেবহস্ত প্রদর্শিত হোয়ে অগ্রিমুখ থেকে তোমায় রক্ষা কোবেছে।

জয়া আজন্মকাল আমার অতুচ্ছ, তাঁর আশা কখনই মন। শব্দবোধ নাম দেন গোপন রাখা কর্তব্য, তার মর্ম্ম তিনি বুঝতে পালেন, তাই বোলেন, সে কথা অপ্রকাশ রাখবেন, কদাচ তা বুঝে বার কোরবেন না। তারপর সেই ব্রজা স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন, সে পরসার লোনে তখনি এসে তাজির হলো। রঘুনাথ ব্রজার ছুকরীকে আপনার বিবাহিতাস্ত্রী বোলে দাবি কোলেন, ঐ কথা শুনে বুড়ীর হৃৎজ্ঞান উপস্থিত। শেষে কিন্তু সে চীৎকার কোরে মহা গুণ্ডগোল বাধাধার উদ্যোগ কোলো। ব্রজা এই কথা বোলে গোল কোন্তে লাগল যে, এরা চক কোরে আমায় প্রভাষণ কোন্তে বসেছে, আমায় ফাকি দিয়ে ছুকরীকে যে হতুগত কোরবে, তারি চেষ্টা কোছে। রঘুনাথ বুড়ীকে অনেক ভয় দেখিয়ে বোলেন, সে যদি ওরূপ কোরে গোলমাল করে, তবে তাকে নতুন ইজারাদারের কাছে লয়ে যাবেন, সে যে জয়াকে পার জয়ার স্বর্ণালঙ্কারগুলি জোর কোরে আটক কোরে রেখেছে, তার জন্তে শাস্তি দিয়ে দিবেন, —আর এ কথাও বোলেন, সে যদি গোলমাল না কোরে সহমানে জয়াকে ছেড়ে দিয়ে চোলে যায়, তা হোলে তিনি গহনাগুলি ছেড়ে দেবেন, তার দাবি তিনি কোরবেন না, অলঙ্কারগুলি ও বুড়ীরই হবে। রঘুনাথ এই ভয় আর আশা দেখিয়ে বুড়ীকে নীরব নিঃস্তর কোলেন। বুড়ী

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে সেই প্রস্তাবে সম্মত হোয়ে আপনার স্থানে চোলে গেল। বলবন্ত-রাওর সঙ্গে রঘুনাথের যে বিবাদ ছিল, নবাগত ইজারাদারের সালিসিতে বন্ধ হোয়ে রঘুনাথের পক্ষে মঙ্গল হলো। রাজ প্রভাল হোয়ে কিঞ্চিৎ বেলা হোয়েছে, সেই সময় রঘুনাথ আর জয়া বারাবারীতে যাত্রা কোলেন। পথের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়নি, সন্ধ্যাও হলো, আর তাঁরাও বারাবারী সহরের ভিতর প্রবেশ কোলেন। রঘুনাথ জয়াকে অতি সংগোপন কোরে তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত কোলেন। জয়া যে আবার ফিরে আসবে, সিটি অতি অদূরত দৈবানুশায়া, সিটি একান্ত অভাবনীয়, নিতান্ত অচিন্তনীয়। শিউরায় কত্যাংকে পেয়ে আনন্দে উদার হোলেন। অগাদ গভীর শোকের সঙ্গে অপরিসের আত্মলোভের বিনিময় হলো। আনন্দ ময় প্রকল্প উল্লাস এত অকস্মাৎ সঞ্চিত হলো যে, শিউরামের পক্ষে সেটি সংবাদিকপ্রায় হোয়ে উঠল। শিউরামের সঙ্গে পরামর্শ কোরে পরদিবস রঘুনাথ সুবাদারের দরবারে চোলে গেলেন। তাঁরে রেখে সকলে বিস্মিত হোয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই অবাক হোয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঘুনাথকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াতে লাগল, তাদের মনে বিদগ্ধ সন্দেহ হলো যে, রঘুনাথ মোরে আবার কি কোরে বেঁচে উঠল। অনেক ভয়ে কাঁপতে লাগল, ভাবল, হয়ত রঘুনাথ দানোই হোয়ে এসেছেন! রঘুনাথ কিন্তু যোরোবার ছন্দময় কোরে বোলতে লাগলেন, সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর নিমিত্ত কৌশলচক্র কোরেছিল, ঐ কথা বোলে সকলের ভ্রম নিবারণ কোলেন। সুবাদার তাঁর পারিষদদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা কোলেন, তারা এই কতোয়া দিলে যে, মোরোবা ব্রাহ্মণাতি, তাই সে হিন্দুর মামলায় অবশ্য অবধ্য এবং তাই তাঁকে স্বয়ং ব্রহ্মবাদেবের নাগ, পুণ্য পবিত্র-আত্মা বোলে হিন্দুদের জ্ঞান কোন্তে হবে। হতভাগ্য কাসীদের উপরেই সুবাদারের ক্রোধানল পতিত হলো, সেই ব্যক্তিই যোরোবার প্রতিনিধি হোয়ে বারাবারীতে প্রচার কোরে দেয় যে, রঘুনাথের পরলোক

হোয়েছে। 'কাসীদ যেখানে থাকে, খুঁজে বার কোরে, হাতে পায়ে বেঁধে, হাতীর পায়ের নীচে ফেলে, দাঁলে মেয়ে ফেলবার হুকুম হলো।

জয়া জীবিতা হোয়ে পুনর্জন্ম ফিরে এনে-  
কেন দেখে মোরোবার মাগ্ৰাণী ক্রাস কেপে  
উঠল, সে ভয়ে থেকে নিকৃতি পেতে না পেতে  
তার উপর পরোয়ানা ছাদের হলো যে, তাকে  
৫০০০ টাকা জরিমানা দাখিল কোত্তে হবে,  
তড়িয় আরও এই হুকুম হলো যে, তার সেই  
প্রাণিনিধি কাসীদেব দণ্ডপ্রাপ্তির সময় তাকে  
সেই বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকতে হবে।  
অনেক পেড়াপিড়িতে মোরোবা জরিমানার  
টাকাটি দাখিল কোরে সেই বধ্যভূমিতে চোলে  
গেলেন। মুখটি নীরস, অতি স্নান আর বিষয়  
হোয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুবাদারের  
বাড়ীর সম্মুখে অসম্মত ভিত্ত, দণ্ডপ্রাপ্তি দেখে-  
বার নিমিত্ত বিস্তার লোক সেইখানে একত্রে  
জমা হোয়েছে। পাপিষ্ঠ পামর কাসীদকে চেপে  
মেবে ফেলবার নিমিত্ত যে বিরাটমূর্তি পশুটি  
নিযুক্ত করা হোয়েছে, তাকে ঐ অপাম জন-  
তার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সহরের  
তাগাম লোক একস্থানে জমা হোয়েছে, দেখে  
রঘুনাথ অবসর বুকে আপনার পত্নীকে সেই  
স্থানে আনাগেলেন, জয়া সেখানে উপস্থিত হোলে  
সকলে তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল,  
তড়িয় সহস্র লোক বালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে  
ভূমিষ্ট হোয়ে প্রণিপাত কোত্তে লাগল, তারা  
মনে কোলে, জয়া পূর্বের অপেক্ষাও অতিরিক্ত  
দেবীত্বপদ পেয়েছেন।

শঙ্করের যেমন পূরীপার রীতি-চরিত্র দেখে  
আসা যাচ্ছে, সেই প্রসিদ্ধ স্বভাব বহুসারে তিনি  
ঐ বধ্যভূমিতে দর্শন দিলেন। জয়াকে দেখে  
দানোর জায় দুই চক্ষু পাকিয়ে তাঁর দিকে  
কটমট কোরে চাইতে লাগলেন, জয়া ভয়ে  
সঙ্কুচিত হোয়ে একটু অন্তরে গিয়ে বামনের  
কুপিত নয়নের অন্তরালে লুকিয়ে রইলেন।  
শঙ্কর সেই বিরাট হস্তীটির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়া-  
লেন, তাঁর পিতা মোরোবা তাঁর পাশে অব-  
স্থান কোচ্ছিলেন। কম্পিতকলেরব পাপিষ্ঠ  
দুরাশয় কাসীদকে ধরাধরি কোরে মাতঙ্গের

পায়ে বেঁধে দেবার উদ্যোগ হোচ্ছে। শঙ্করের  
চিরকালই দানোর মতন প্রকৃতি, পাপহত্য  
হুকুমগা কাসীদের বাঁচবার পথ না থাকে,  
তাই পাশও শঙ্কর ছুঁচের মতন অগা সফ্র একটা  
কাণী লয়ে হস্তীটির শুড়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে দিতে  
লাগলেন। তার তাৎপর্য এই, সেই মহাভব  
পশুকে রাগিয়ে দিয়ে আরও তারে উগ্র অব-  
তার কোরে তোলে। হস্তীর ক্রোধ কিন্তু  
অন্যাভিগুণে প্রধাবিত হলো, সে ক্রোধ শঙ্ক-  
রের উপরেই পর্যাপ্ত হলো। বিরাটমূর্তি  
হস্তীটি শঙ্করের খোঁচাখুঁচিতে বিরক্ত হোয়ে,  
বিশেষতঃ এক ব্যক্তি অপরিচিত লোকের অপ-  
মানে মহা অভিমানী হোয়ে তার সেই বহু-  
তলা কটিন শুঁড়টি উল্টে উখিত কোরে আর  
একপদ মাত্র অগ্রসর হোয়ে শঙ্করের কষ্টব্রত  
শরীকটি শুড়িয়ে বোলে শোরেই পাথরের উপর  
একটি নির্বাক আছাড়, সেই এক আছাড়েই  
শঙ্করের মথার বি কোরয়ে পোড়ল। শঙ্করের  
গোঁয়ারতামির নিমিত্ত কেবল ঐ একটি মাত্র  
অনিষ্টপাত হোয়ে ক্ষাণ্ড হলো না, কেন না,  
মোরোবা শঙ্করের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন,  
সকলি পশুটি তাঁর পীঠেও একটি দণ্ডায়ত  
কোলে, মোরোবা তখন অজ্ঞান হোয়ে পোড়-  
লেন, সকলে ধরাধরি কোরে ব্রাহ্মণকে সোরিয়ে  
তফাতে নিয়ে রাখল। রঘুনাথ দেখলেন, যে  
দুই ব্যক্তি যথার্থ পাপী, যদিও তাঁরা মনুষ্যের  
হাত থেকে বেঁচে গেছিলেন সত্য, কিন্তু  
সেই সূচক বুদ্ধিমান পশুটির কোপ থেকে রক্ষা  
পেলেন না—এটি জগদীশ্বরের সাক্ষ্য কোশল।  
মহাভব পশুটি একটি মর্ধ্যাতিক নির্ঘাত  
প্রহারে দুরাশয়দের সমুদয় বুদ্ধিবল রসাল  
কোলে, আর তাদের কুবুদ্ধিভাত দুষ্ট কৌশলের  
কঁদ পাস্তে হবে না, সে পথ জবোর মতন  
খুঁচয়ে দিলে। রঘুনাথ দৈবরীয় কোপের প্রত্যক্ষ  
সাক্ষিস্বরূপ ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ  
কোরে সুবাদারকে বিস্তার অন্তনয় কোরে  
বোলেন, তিনি গেন কাসীদের জীবন-দান  
করেন, সুবাদার তাঁর সে প্রার্থনা অগ্রাহ  
কোলেন না। মোরোবার কার্যোদ্ধারের প্রকৃত  
মুলাধার সেই দীন দুঃখী হস্তভাগ্য কাসীদ তাই



রি জাণকর্তা রঘুনাদের পায়ের উপর এসে পোড়ে দীনের লাগ্ন অতি কাতর হোয়ে নতুনধারে কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি চালাতে লাগলেন :

রঘুনাথ আর জয়া বেশ প্রীতিক্ষণেয়ে স্মৃতি-সমন্বিত হাস কোত্তে লাগলেন। অনেকগুলি সন্তানও হলো, তাদের লয়ে মহা সংসারী হোয়ে পোড়লেন। জয়া অল্পমৃত্যু-সংক্রান্ত কোন কথা হোয়ে তার কোত্তেন না, পেটে পেটেই চেপে রেখেছিলেন। যৌরোবা গজদন্তের আলাপ্ত কোত্তে আর উজীর লোতে পাল্লেন না। অনেক নাট্যে যাট্যে কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন সত্য, কিন্তু মনের কষ্টে দিন দিন ম্লান আর অবসন্ন হোয়েছিলেন। তারপর বিস্তর যাতনা পেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে কেউই ভংগিত হোয়ে জাকপ করেনি। তাঁর বিশ্বাস অপহরণের বিষয়, আর তাঁর ঈর্ষাপূর্ণ প্রকৃতির কথা মারা দিবা আশ্রিত হোয়েছিলেন, তাঁরা কেউই তার ভাঙে ক্ষুণ্ণিত হোলেন না।

আমার ভাগ্যে সম্প্রতি বা যা ঘটছে, আর এই গল্পের পরিশেষে যা যা শুনলেম, দুটো এক আকারে জ্ঞান হলো। ঐ দুই ঘটনার মধ্যে পরস্পর বেশ দৌমদমা আছে। আমি কিন্তু তাই চিন্তা কোরে মনে মনে মহা ভংগিত হোলেম। সেই ব্রাহ্মণের নাম আমারও প্রিয়তমা নাচ ওয়ালীদের হস্তে গেলো হন। কিন্তু কি পরিতাপ! আমার সংসারযাত্রার পরিণাম কতই বিভিন্ন। না তাঁরে আমি উজীর কোত্তে পাল্লেম,—না পত্নী বেলে বৃকের উপর রেখে প্রণয়ানুগ দেখাতে পাল্লেম! তার পরিবর্তে কোলেম কি? না, বৃষতীর মৃতদেহ নির্ভুর নিগ্রহদাতা, নির্দয় প্রাণহত্যাদের হাত থেকে ছিনিয়ে লয়ে তার কবর দিলেম—আমার প্রণয়ের এই মাত্র চরম ফল! হা করুণা নিধান জা! তোমার মনে কি এই ছিল? যতকাল বেঁচে থাকব, এ কথাটি আমার স্মরণ থাকবে, এ ঘটনাটি আমার চক্ষের উপর স্মৃতিমান হোয়ে বিরাজ কোববে, সে সময়টুকু অমর হোয়ে চিরকাল আমার স্মৃতিপথে বিচরণ কোববে। সঙ্গীদের

মনো এক ব্যক্তি বোলে, “সম্প্রতি জয়পুরে কি তার নিকটবর্তী কোন স্থানে একটি ঘটনা হোয়ে গেছে, জয়পুরবাসীরা অজ্ঞাপি সেই কথা পরস্পর বলা কথা কোরে থাকে। ঘটনাটা এই যে, নাচনেওয়ালীদের একটি ছুকী খুন হোয়েছে।”

আমি বোলেম “সে মিথ্যা কথা, যে খুন হোয়েছে, সে ব্যক্তি ভগ্নাত্মা খুন নাচ ওয়ালীদের লোক নয়।” সে লোকটি বোলে, “তা আমি জানি না, এই কথা শুনেছি যে, নাচনে-ওয়ালীদের সঙ্গে এক গাড়ীতে চোলে যাচ্ছিল।” আমি বোলেম, “তাঁরে ধোরে কয়েক কোরে লয়ে যাচ্ছিল।” সে লোকটি বোলে, “তা হোলেও হোতে পারে, শুনলেম, একটি যুবা তাঁরে ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা কোরেছিল, সে ব্যক্তি মহা আক্ষলন কোরে তলোয়ার লয়ে ঘুরোচ্ছিল, ঘুরতে ঘুরতে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে যেমন তারে চোড় মারবে, সেই চাটু তার গায় না লেগে সেই বৃষতীর গায় লাগল, তাতেই সে মারা পোড়ল।”

আমি বোলেম—“এ কথাও মিথ্যা।”

সে বোলে “বটে! তবে বোধ হয়, আপনি সে বিষয় ভালরূপেই অবগত নাছেন, বিষয়টা কি, অল্পপ্রহ কোরে বলুন।”

আমি বোলেম, “আমায় ক্ষমা করুন, আপ-নারা যার কথা উল্লেখ কোচ্চেন, আমিই সেই হতভাগা ব্যক্তি, আর সেই যুগ্মতীটি আমারই বাগদত্তা পত্নী। নাচনেওয়ালীরা তাঁরে আমার হস্তে সমর্পণ না কোরে বৃকে ছোঁরা ঘেরে ঘেরে ফেলেছে।” এই প্রাণঘাতক হত্যার কথা সংক্ষেপে বলেম সত্য, কিন্তু সে কথা উত্থাপন হওয়ায় অতিশয় কাতর, অতিশয় ব্যাকুল হোয়ে পোড়-লেম। সঙ্গীরা আমার সেই বিষয় অবস্থা নিরী-ক্ষণ কোরে ভঙ্গ্যপূর্ণক অল্প গল্প এনে ফেলে।

একজন চিন্দু বোলেম—“আর সময় নাট, ‘নচেৎ’ অ’মি একটি একরূপ পল্ল কোত্তেম যে, তার কাছে নির্ভুরতা আর কঠিনতা কি কুব, কি বারাগমীর ব্রাহ্মগণ সকলেই পরাস্ত হোতেন। তখাচ আমার কিন্তু একটি কথা বোলতে হোয়েছে, আমাদের মুসলমান বন্ধ বারাগমীস্

রাজগণদের 'দুব'বহার দেখে তাঁদের পাণ-  
মুর্তির যে অবয়ব চিত্রিত কোরেছেন, তাতে  
তিনি অতিরিক্ত তুলী টেনে অধিক উজ্জ্বল  
কোরেছেন। সত্য বটে, শায়ে-রূপ আজ  
নাই যে, সচ্ছন্দতা হোতাই হবে, কিন্তু তা হলে  
কি হয়, এ ব্যাঘাটটি দড়কাল অবধি প্রচলিত  
হোয়ে আসিতেছে। ইতি যে শাস্ত্রসম্মত আর  
অতি পবিত্র ধর্ম, সে বিষয় সকলকেই স্বীকার  
করা উচিত, বাস্তবিক সে কথাটি মিথ্যাও নয়।  
ইতি সে অতি পবিত্র ধর্ম, সে কথাও কেউই  
বোলতে পারবেন না। তাই কারও  
উচিত নয় যে, এক্ষণে 'সে প্রথাটি অবহেলা  
করেন।' কিন্তু ন্যায়মান-দ্বিগের মধ্যে আমরা  
সকলেই সেই প্রথাটির নিন্দামূল্য কোরে হিন্দু-  
দের উপর দোষাবোপ কোরে লাগলেম।  
মলের মধ্যে পান্না যি ছিলেন, তাঁরা তাঁর  
পোষকতা কোরে লাগলেন। আমরা যদি  
অত্যাধিক সে কথা করে তর্ক কোদেয়, তখাচ  
তাঁরা তাঁর আপকতা কোন্ডে কান্ত হোতেন  
না। তাই আর বিবাদ না কোরে, উঠে গিয়ে  
যাব যে স্থানে শয়ন কোল্লেখ, যর যে মত,  
তিনি তাই লয়েই অবস্থান কোলেন। প্রাতে  
উঠেই সেই হিন্দুটির তল্লাস কোল্লেখ, তিনি  
ডেকানে যাবেন, সে কথা পূর্বে আশায় বোলে  
রেখেছিলেন। আমিও না কি ডেকানে যাব,  
তাই হুজনে একত্র যাওয়াই স্থির হলো।  
রাস্তায় চোলেতে চোলেতে আমি তাঁবে বিস্তর  
সাধাসাদনা কোন্ডে লাগলেন যে, সময় থাকলে  
যে গল্পটি আমাদের শোনাতেন বোলেছিলেন,  
সেই কাহিনীটি এক্ষণে আশায় অল্পগ্রহ কোরে  
শ্রবণ করান। তিনি বোলেন, "তা শোনাতে  
বাধা কিছু আছে, তা নয় এবং আমার ইচ্ছাও  
আছে, সে কথাটি আপনাদের জ্ঞাত করাই,  
কিন্তু কথা এই যে, আমাদের বন্ধুর সেই প্রাজ্ঞ  
মুসলমানটি যেরূপ ঝাড় বুটো কেটে, বেশ-  
বিত্তাস কোরে, দশ রত্ন অলঙ্কার দিয়ে তাঁর  
গল্পটি সাজিয়েছেন, আমি কিন্তু সরূপ পারবো  
না। আমার কথায় ঝাড় বুটও নাই,  
বেশ-বিত্তাসও নাই, অলঙ্কারও নাই,  
অসজ্জিত, অশোভিত স্পষ্ট সরল কথায়

গল্পটি চিত্র কোরবো, তাতে যদি আপনাদের  
সন্তুষ্ট 'হন ত বলুন।' আমি বোল্লেখ,  
"আমি তাতেই সন্তুষ্ট হবো।" তখন তিনি  
এই বোলে শুরু কোরে দিলেন, "আদি গরুটি  
বলবার পূর্বে, ঐ গল্প উপলক্ষে যে সকল  
লোকের প্রসঙ্গ কোন্ডে হবে, তাদের জ্ঞাত  
সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছুই উল্লেখ কোরে রাখা  
আপনার পক্ষে সুবিধা হবে। পারসী নামে  
এক জাতি আছে, আপনি তা শুনে থাকবেন,  
তারা পশ্চিম-ভারতবর্ষে বাস করে।" আমি  
বোল্লেখ, "হ্যাঁ, আমি তা জ্ঞাত আছি, সম্প্রতি  
আমি সেই দেশে গেছিলাম। ঐ পারসীদিগের  
আজ বিবরণ, আর তাদের অলঙ্কৃত ইতিহাস  
জ্ঞাত হবার নিমিত্ত অনেক কষ্টও কোরেছি,  
সে বিষয় আমি যি অবগত হোয়েছি, তা  
বোল্ছি, শ্রবণ করুন।"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"হাসিলে না হাসে যেই কাদিলে না কাদে,  
কার সাধ সেধে পড়ে তার প্রেম-কাদে।"

গল্পে বর্ণিত আছে, হাজার বৎসর পূর্বে ইয়াজ্-  
দেজেরদ্ নামে এক ব্যক্তি পারস্যানের  
অধিপতি ছিলেন। ইয়াজ্দ্ সহর তাঁর রাজ-  
পাট ছিল। সহরটি প্রকাণ্ড, বিস্তর লোকের  
আস এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় পবিপূর্ণ,  
তাই তৎকালীন অধিতীয় সহর বোলে সর্বত্র  
পরিচিত হয়। ইয়াজ্দ্দেজেরদের বিশ বৎসর  
রাজত্বের সময় একদল আরব ঐ দেশ আক্র-  
মণ করে। পারস্যান-পতি যুদ্ধে পরাস্ত হোয়ে  
পালিয়ে খোয়াসানে প্রস্থান করেন, শেষ  
সেই দেশেই তাঁর পরলোক-প্রাপ্তি হয়। ইয়াজ্-  
দেজেরদ্ শুইমার বংশের শেষ সন্তান, তাঁর  
সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন পারস্যান-সাম্রাজ্যের চিত্র  
অবসান হয়। ইয়াজ্দ্দেজেরদের মৃত্যুর পর  
মুসলমানেরা সমুদয় দেশ একাধীন কর  
কোরে পারস্যানবাসীদিগকে বলপূর্বক আপ-  
নাদের রাজ-ব্যবস্থা, আপনাদের রাজনিয়মের

অনুগত করে। তাতেও তারা কান্ত হয় নাই, পরমার্থ বিষয়েও তাদের শরণাগত হোয়ে চোলেতে হোয়েছিল। পরাভূতেরা আপনাদের প্রাচীন মত, প্রাচীন শাস্ত্রের অমর্যাদা কোরে মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ ধর্ম, মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ মত এবং মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার গ্রহণ কোত্তে বাধ্য হয়। দখাতিমানে অভিমানী হোয়ে 'বিস্তার পারসী হিন্দুস্থানে আসিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁরা বিবেচনা কোলেন, হয় ত হিন্দু রাজগণের আশ্রয়ে সুদুর্খে থেকে নিকরুপাত হোয়ে স্বখে বাস কোত্তে পারবেন। শেষে তাঁরা তাই কোলেন, সকলের অজ্ঞাতে নৌসরায়ীর নিকট গুজরাটের উপকূলে উপস্থিত হলেন। তথাকার রাজনবর অধিকারে স্থান প্রদান কোত্তে সম্মত হোলেন এবং স্বদেশের রীতি-পদ্ধতি মত স্বদুর্খে থেকে ব্যবহার-ব্যঞ্জিয়া কোত্তেও অক্লমতি কোলেন, কিন্তু হয় অস্ত্র প্রজ্ঞার ব্যয় করদান কোরে রাজ-শাসনের শরণাগত হোয়ে থাকতে হবে। আরও কতকগুলি পারসী কায়েতে উপস্থিত হোয়ে পূর্বরূপ নিয়মের উপর বাস কোত্তে লাগলেন। এই সমস্ত দেশে এতকাল বাস কোলেন যে, ক্রমে তাঁরা আদি-স্বত্ব-বৃত্তান্ত প্রাপ্ত বিস্তৃত হোয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে খায়া দেশান্তরে না বাস কোরে মাতৃভূমি পারস্থানেই অবস্থিতি কোরেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে শেষে বিদেশবাসীদের আলাপ পরিচয় হয়, তাঁরা বিদেশী দলের পরিচয় পেয়ে চিন্তে পাগলেন। সেই আদি পারস্থান-বাসীদের নিকট হিন্দুস্থানাগত পারসীরা আপনাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হোলেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষাত্মক যে আচার-ব্যবহার চোলে আসছে, সে সকল বিদেশস্থ পারসী পরিবারকে অবগত কোরিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁরা যেন পূর্বপুরুষের চির-আচরিত ধর্মগুলি বিস্তৃত না হন।

পারসীরা অদ্বৈতবাদী, তাঁরা বলেন, একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি স্বর্গমর্ত্যের সৃষ্টি কোরেছেন। জলপ্রাবন হোয়ে পৃথিবী

রসাতলস্থ হয়, সে কথাও তাঁরা স্বীকার করেন। গোস্ভাফ বাদসাহের আমলে বর্তমান ধর্মমত এবং বর্তমান উপাসনাকাণ্ড পারসীদের মধ্যে প্রচলিত হয়। প্রাচীন পারস্থানের রাজাবলীর পর্যায়ক্রমে গোস্ভাফ যোল পুরুষের রাজা। রাজনবর গোস্ভাফ অনেক আরাধনা কোরে, বিস্তার প্রয়াস পেয়ে প্রাচীন পারসীদের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা মতের সমর্থন করেন; পরকালের সদৃশতার নিমিত্ত অগ্নি-উপাসনা যে মহা আবশ্যক, সে কথার প্রতি কারোও সন্দেহ বা আপত্তি কোত্তে দিতেন না। অগ্নি-উপাসনার প্রতি গোস্ভাফ রাজার কেন যে এত অগাধ ভক্তি জাগিল, সে বৃত্তান্ত এস্থলে অনারত কোরে দেওয়া উচিত। প্রবাদ আছে, চীন দেশে দীন-দুঃখী এক ঘর গৃহস্থ,—একটি পুরুষ, আর তাঁর স্ত্রী বাস কোত্তেন, তাঁরা অতিশয় ধর্মাত্মা, পুণ্যশীল ছিলেন। বৃদ্ধ হোয়েছিলেন, তথ্যচ সন্তান জন্মেনি, স্ত্রীজন পুত্র-কামনার বিস্তার দৈব-ক্রিয়াও কোরে-ছিলেন, ঐ সকল দৈবাত্মানের পর এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সন্তানের লক্ষণ হয়, পুরুষটি শুনে মহা আনন্দিত হোলেন। গর্ভসম্প্রদায় সময় পত্নী একটি ভ্রূৎস দেখে ক্রমে কাপতে লাগলেন। তাঁর যেন জ্ঞান হলো, কি তিনি যেন দেখলেন, স্বপ্নে আশ্রয় লেগেছে, চারজন ভয়ঙ্কর বিরাট অবয়ব রাক্ষস নিকটে এসে তাঁর পেটের ভিতর থেকে সন্তান বার কোরে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোত্তে উত্তত হলো, এই সময় হঠাৎ একটি চাকমুখি দীর্ঘজায় যোদ্ধা পুরুষ এসে দর্শন দিলেন, রাক্ষসেরা তাঁকে দেখে ভয়ে কাপতে কাপতে পালিয়ে প্রস্থান কোলে। স্ত্রী এই অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্বামীকে অবগত করালেন, স্বামী পুরুষ উভয়েই স্থির কোলেন, এই স্বপ্ন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের হয় কল্যাণ, নয় অকল্যাণ হবে, মদলামঙ্গল দুয়েরি সন্তাবনা আছে। একজন দৈবজ্ঞকে ডেকে স্বপ্নের কথা বলা হলো, সে শুনে এই ব্যাখ্যা কোলে।—

দৈবজ্ঞ বোলে, সেই দীপ্তিময় অগ্নিশিখা

একটি অদ্ভুত দৈববাণী, ঐ দেববাণী গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি প্রকাশ হোয়ে শেষে সমুদয় পৃথিবীতে সেই কথা প্রচার হবে। যে চার-জন ব্রাহ্মস দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তারা ঐ সন্তানের পরম শত্রু, তারা তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা কোচ্ছিল, আর সেই চার-আক্রান্ত, দীর্ঘকায় বোদ্ধা পুরুষটি স্বয়ং পরমেশ্বর, তিনি মধ্যবর্তী হোয়ে ব্রাহ্মসদের দৃষ্ট অভিশ্রয় নিবারণ কোলেন। দৈবজ্ঞের মুখে ঐরূপ অপ্রাচ্যব্যাখ্যা শ্রবণ কোরে মহামন্ত্রে শোয়ে তাঁরা অস্তঃপুরে চলে গেলেন। স্বাী অলকালের মধ্যেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব কোলেন। প্রবাদ আছে, ঐ শিশুটি উচ্চ হস্তবব কোঠে কোঠে ভূমিষ্ঠ হোয়েছিলেন। পুত্রটির নাম জাব্দন্ত অথবা জেজুভুন্ত রাখ হল,—নামের "অর্থ—হতাশন-সংখা, এ নাম রাখবার তাৎপর্য্য এই যে, সন্তানের জননী স্বপ্নে যে অনল দর্শন করেন, দৈবজ্ঞের ভাবী বাক্য অনুসারে ঐ অনল হোতেই তাঁর সন্তানের সন্তাননা হোয়েছে।

চানসমার্ট এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে আপাদ-মস্তক কেপে গেলেন পাছে তাঁর সিংহাসনের নির্ভরতা রক্ষা তাঁর মনে সে ভ্রাস হলো জাব্দন্ত কি উত্তরাধিকারীরা তাঁরে অপদস্থ কোরে সিংহাসন অপহরণ কোলেও কোতে পারেন, সম্রাট সেই ভয় কোরে গুপ্তচর দ্বারা সন্তানটিঃ প্রাণ নষ্ট করবার চেষ্টা কোতে লাগলেন, কিন্তু সেই সকল প্রতিনিব্রিগণের পক্ষাঘাত হোয়ে পঞ্চতপ্রাপ্তি হয়, তারপর সন্তানটির ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম যে পর্য্যন্ত না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত কেউ তাঁর প্রাণের উপর হস্তারক হোতে চেষ্টা করে নাই। ঐ ১৩ বৎসরের সময় তিনি এতবার পীড়িত হন। সম্রাট সন্তানটির অসুস্থতার কথা শ্রবণ কোরে চিকিৎসককে পারিভোষিকের প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রবৃত্তি দিলেন যে, ঔষধের সঙ্গে কালকট বিষ অজ্ঞাতে প্রদান করেন। জাব্দন্ত কিন্তু তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণ কোলেন না, তাকে তাঁর সমুখে যেতেও দিলেন না,

সুতরাং সম্রাটকে পুনর্বার নৈরাশ হোতে হোয়েছিল। বালকটি আরোগ্য হোয়ে পিতা-মাতাকে অনেক অহুন্নয় বিনয় কোরে বোলেন যে, তাঁরা তাকে পারস্থানে লয়ে যান। বালক বোলেন, সম্রাটের কুচকের নিমিত্ত চীনদেশে তাঁর জীবনের নিরাপদ নাই। বালকও যেমন ভীত হয়েছিলেন, পিতামাতাদেরও তরুণ ভ্রাস হয়েছিল। তাই সকলের পরামর্শমতে পিতা-মাতা পুত্র সঙ্গে কোরে পারস্থানে প্রস্থান কোলেন। সে দেশে যথাসময়ে পৌঁছে, গোস্বামীর গৃহগত হোয়ে, তাঁর আশ্রয়-ছায়ায় অবস্থিতি কোতে লাগলেন। গোস্বামী এখন তদ্দেশের পুত্র-দণ্ডধর রাজা। লারদন্তের পিতাধাতা বাহুর বলে পরিশ্রম কোরে দিন-পাত কোতে লাগলেন। পুত্রটি জগদীশ্বরের দ্বানে নিমগ্ন থাকতেন, আর অত্যন্ত নিষ্ঠমনে শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অন্ধা-ভক্তি দেখাতে লাগলেন, শৈশবাবস্থা হতেই তাঁর প্রবৃত্তি সেই দিকেই প্রধারিত হয়। পারস্থানের লোকেরা নিশ্চয় কোরে বলে, ঐ বালকটি বহোবুদ্ধি হোয়ে বৎকালীন অহুন্নয় পৌঁছিলেন, তখন তিনি একবার সশরীরে স্বপ্নে গমন করেন, সেখানে না দিবস বাস কোরে, জেন্দাবেস্তা নামে ধর্ম পুস্তক সৃষ্টিকর্তার নিকট গ্রহণ করেন পারসীদিগের ধর্মসংক্রান্ত একককার প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা নিয়ম ঐ ধর্মপুস্তকের মতে লিখিত আছে। স্বর্গীয় অনল, যাহা কবিন্ কালেও নির্বাণ হবার নয়, সেই সময় সেই অনল তাঁকে প্রদত্ত হয়। তদ্বিধি ঈশ্বর-অন্তঃপ্রহ-রূপ অল্প অল্প নানা প্রকার উপহারও তৎকালীন তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, সে সকল দৈব প্রসাদ পূর্ব্বে কখন কোন মনুষ্যই প্রাপ্ত হন নাই। পারসীরা এই অভিমান করেন না যে, জেন্দাবেস্তা আজও পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে প্রচলিত আছে, তাঁরা এই মাত্র বলেন, জেমাই নানুক পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কুসংস্কারের পরিবর্তে যিনি অভিন্নব বিশ্বল জ্ঞানের উপদেশ করেন, সেই জ্ঞানগুরু জেরা-ষ্টর ঐ জেন্দাবেস্তা হতে আধুনিক প্রচলিত

আচার ব্যবহার ও ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন কোরে নতুন আকারে পুস্তক প্রস্তুত করেন।

পারসী ধর্মসংস্থাপক সেই অপ্রসিদ্ধ আদি-পুরুষের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। আমি নানা গ্রন্থ এবং নানা লিপি হোতে সেগুলি সংগ্রহ কোরেছি। অনেক পারসী আজও পর্য্যন্ত সে সকল বিষয় কিছু-মাত্র অবগত নয়। পারসীদিগের কুলাচার কলধর্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার পরীক্ষা নিয়মের নিয়মিত বৃত্তান্তগুলি একটি প্রাজ্ঞ পারস্য কলাচার্যের নিকট গ্রহণ কোরেছি। এক সময়ে ঐ পণ্ডিতবরের সঙ্গে আমার অতিশয় আত্মীয়তা আছে। তদ্বিষয় আমার পারসীদের দ্বারা সে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরেছি, তাহা সাধ্যমত সেই সকল অনুসন্ধানের মধ্যে আমার অন্তর্ভুক্তি করায়।

পারসীদের চারটি মাত্র বাৎসরিক উৎসব, যথা কৃষ্ণের স্মরণ করাই সে সকল সমারোহের একমাত্র উদ্দেশ্য। নৌরোজ,—বৎসরের প্রথম দিন, এই পরীক্ষা ভিন্ন আর কোন উৎসব যে আপাদমর সাধারণে এতদ্ব্যতীত হোয়ে সমারোহ করে, সে কথা আমি কারও মুখে শুনি নাই। প্রতি মাসের প্রথম দিনও একটি পরীক্ষা, সিটি কিন্তু সকলে মান্যও করে না, আর সম্রাটের তার প্রচলনও নাই। প্রত্যেক পরীক্ষার পর পারস্যের পাঁচ দিবস উপবাসে অধ্যবসান থাকে, অথবা শাস্ত্রমতে তাঁদের দাস্য উচিত। পারসীদের সংস্কার আছে যে, কষ্টকর্ত্তা এক একবার একটি নূতন সৃষ্টি কোরে পাঁচদিবস কোরে ক্রিয়াম কোরে-ছিলেন, সেই কথা স্মরণ রাখবার নিমিত্ত ঐরূপ উপবাসের প্রথা চোলে এসেছে। উপবাসের সময় দিবারাত্রির মধ্যে কেবল একটিবার মাত্র ভোজনের বিধি আছে।

বৈশ্বানরই পারসীদের প্রধান বাহ্যিক উপাস্ত দেবতা। তার তাৎপর্য্য এই, পারস্যবাসীরা বলেন,—তাঁদের শাস্ত্র-বিধানকর্ত্তা জরদস্ত স্বর্গ হতে ঐ অনল আনয়ন করেন। তাঁদের আতশ্য কাহবতে,—অর্থাৎ অনল-

প্রতিষ্ঠিত গৃহে দুটি আগুন প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত থাকে। তার মধ্যে একটি আগুনের নিকট যে সে সকলেই সমাগম কোন্ডে পারে। আতশ বাহারাম নামে যে আগুন অনল-মন্দিরের অতি নির্জন পবিত্র কোণে সংগোপনে রক্ষিত আছে, সে স্থলে ডিস্টুরী অর্থাৎ প্রধান কুলাচার্য ভিন্ন আপাদমর সাধারণের গমন করবার আদেশ নাই। ঐ অগ্নিকে সূর্য্যের স্মৃতিবলোকন কোন্ডে নাই, তাই অতি সাবধান সতর্ক হোয়ে মন্দিরের ছিদ্রাদি অবরুদ্ধ কোরে রাখা হয়, যেন রবিকিরণ সে ঘরে কোনমতেই প্রবেশ কোন্ডে না পায়। পারসীরা কথায় কথায় এই প্রথা করে যে, গুজরাট দেশের অন্তর্গত নৌসরাই নামক একটি স্থানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া একটি অগ্নি একভাবে প্রজ্জ্বলিত হোয়ে রয়েছে, এতকালের মধ্যে একটি দিনের নিমিত্তও সে আগুন নির্জ্বল হয় নাই। কিন্তু বোধহেতে সর্ব্বশেষে যে অনল-মন্দির নির্ম্মিত হয়, ঐরা জদু নামক স্থানের পবিত্র বেদীয় ভিক্ষু অনল জুবর্ণময় পদদানের মধ্যে বোধহে বোধহে নিজে ঐ মন্দিরে প্রজ্জ্বলিত করা হোয়েছে। সমুদ্র-পথের বিপদ আশঙ্কায় না পোড়তে হয়, সেইজন্তে স্তম্ভপথ দিচ্ছে ঐ অনল নীত হোয়েছিল। অনল-জরদস্তের প্রণালী এইরূপ, যদি দৈবগতিতে পবিত্র আমল-শিখা কখন নির্জ্বল হয়, তবে হয় তারবুদ—পুত্রো-হিত,—নয় ডিস্টুরী,—প্রধান কুলগুরু, ইহাদের মধ্যে যে কেহ তৎকালীন উপস্থিত থাকেন, তিনি অপর অপর লোকের সঙ্গে একত্রে ১০ হস্ত অন্তরে বৈশ্বানরকে ঘেরে ঠাঁড়িয়ে উঠেঃস্বরে অপরাধ মার্জ্জনায় প্রার্থনা করেন। অন্যের প্রতি পারসীদের অগাধ গৌরব, অগাধ ভক্তি এবং অগাধ ভ্রাতা, এমন কি, আপনাদের গৃহদাহকালে অগ্নিনির্কাণের কোন প্রয়াসই পায় না, অথচ তাঁদের হোয়ে অপর কেউ যদি সেই উপকারটি করে, তার কাছে তারা চিরবাহিত হোয়ে থাকে। গই-বিরোহাও সূর্য্যের আর সমুদ্রের অবাধনা

করে। বোধহেতু তারা সাংসারিক পড়ের-মাঠে একত্রে জমা হোয়ে, এ তার কাছে, সে এর কাছে, এইরূপ পরস্পর মাথা হেঁট কোরে আত্মিক কব্জার জায় ঈশ্বর-উপাসনা কোণ্ডে দেখা যায়। সেই সময় তারা হড়-বড় কোরে এত তাড়াতাড়ি উপাসনা-মন্ত্র-গুলি আবৃত্তি করে, দেখে বোধ হয় যেন, তাদের মুখ দিয়ে খই ফুটছে। এই উপাসনার নাম জেন্‌জেন্‌মে।—চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে মন্ত্রগুলির আবৃত্তি কোণ্ডে হয়, সূর্য্য বা সমুদ্রের সম্মুখেও আবৃত্তি কব্জার নিষেধ নাই। পারসীদের বিবাহ-প্রথা পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার নাম শান্সান।—এই প্রথানুসারে শৈশবাবস্থায় সন্তানদের বিবাহের সপক্ষপত্র হোয়ে আদান প্রদানের কথা স্থির হোয়ে থাকে, আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় ককেরসোরা।—স্ত্রী বা স্বামী বিয়োগ হলে পুনর্বার বিবাহের প্রথা। তৃতীয় খোভে-সারাসান।—অর্থাৎ স্বামী আপনায় অভিমত অনুসারী স্বামী মনোনীত করেন, আমাদের মধ্যে এ প্রথাকে ইচ্ছা স্বয়ংধরা বলে। চতুর্থ একসান্ অর্থাৎ বালক বালিকার মধ্যে পরস্পর বিবাহের কথা স্থির হোয়ে বিবাহ হবার পূর্বে এক পক্ষের মৃত্যু হয়, সেই সময় এই প্রথা আছে যে, অপরের কন্যা বা পুত্র হোক, সেটি ঘটনাক্রমে যখন যেমন আবশ্যক হয়, তার সঙ্গে সেই মৃত ব্যক্তির পরিবর্তে বিবাহ দিতে হয়। পঞ্চম সিটারসন,—পিতার পুত্র-সন্তান অভাব হোয়ে পুরোহিতকে দত্তকপুত্র কোরে আপনায় ঔরসজাত পুত্র জানে বিবাহ দেওয়া। হিন্দুদিগের জায় তাদের বিবাহ-প্রণালী তত দীর্ঘ বা তত বিরজ্জজনক নয়। কন্যাকর্তা আর বরকর্তা, এই উভয় পক্ষের মধ্যে যারাই হোক, এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক আসনে বর আর পাত্রী একত্রে হোয়ে বসেন, উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন এবং উভয় পক্ষের পুরোহিতস্বরূপ সেখানে উপস্থিত থাকেন। যুবক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা বিবাহ কোণ্ডে সম্মত আছেন কি না?

বর-কন্যাকে বসুতে হয়, “হাঁ, আছি।” এই উত্তর দিয়ে তারা বিবাহ স্বীকার কোলে, পুরোহিত উভয়ের হস্ত একত্রে সংলগ্ন করেন। তারপর পুরুষটি কন্যাকে কিকিং স্বর্ণ দান কোরে পরিণয়-প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ করেন। যদি অর্থের সৌষ্ঠব থাকে, কন্যার পিতা-মাতাও যথাসাধ্য যৌতুক প্রদান কোরে থাকেন। স্বজনবর্গেরা কিছুই দেন না। আট দিবস পর্যন্ত বিবাহের সমারোহ থাকে। একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হোলে ডাক নামে পুরোহিত কালাকাল আর গ্রহাদির গণনা কোরে তার জন্ম পত্রিকা লিখে দেন। তারপর প্রসূত সন্তানের নামকরণ করেন, তৎপরে সেই সন্তানটিকে পবিত্র অনল-মন্দিরে লগ্নে বাওয়া হয়, সেখানে তার যুথের মধ্যে এক-বিন্দু জল প্রদান কোরে পুরোহিত এই বর দেন যে, ঐ জলবিন্দু যেন সন্তানের সমস্ত পাপ বা অনাচারের পরিষ্কার কোরে দেয়। তার পর একটি ডালিমের পাতা তার মাঠের উপর রেখে দিয়ে আবার পূর্বের মতন বর-প্রদান করেন। তৎপরে শিশুটিকে জ্ঞান করিয়ে স্নেহ নামে একটি চিলে আঙ্গুরাখ পরিষে দেন, ঐ আঙ্গুরাখটি কোমর পর্যন্ত নেবে পড়ে। আঙ্গুরাখের উপর কুসী নামে একটি কোমর বসে দেওয়া বন্ধনীটি উট-লোমজাত; পুরোহিতকে বসুতে বসুতে হয়, আর আঙ্গুরাখ কোমরে রেখে দিতে হয়। এই সন্তানটি পারসী ধর্মের একান্ত ভক্ত, আর একান্ত অমরকৃত্ত হবেন, জাদুকর-আনীত বর্ষ আর মত ভিন্ন তিনি অস্ত কোন ধর্মের বা অস্ত কোন মতের প্রতি পৌরস বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোরবেন না, চিরকাল অগ্নি-উপাসক হবেন, নরমাংস ভক্ষণ কোরবেন না, অস্ত্রের দ্বায়ে বা পাত্রে পান কোরবেন না এবং পারসী কুলধর্ম, পারসী কুলধর্মের রীতি-পদ্ধতি অনুসারে তাবৎ বিষয়কার্য সম্পাদন কোরবেন। সন্তানটি যে প্রকৃত পারসী হয়ে পারসীমত-অবলম্বী হবেন, এই সদের তার নিদর্শন, আর কুসী তার প্রতিভূ হোয়ে রইল,—এইরূপ দীর্ঘ

বক্তৃতা কোরে সন্তানটির জাত-সংস্কার সমা-  
রোহে নিশ্চয় হয়। এই দিনাবধি ঐ সন্তানটি  
একজন প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ গইবির হলেন।

অন্য অন্ত ভারতবাসীদের মধ্যে যেরূপ কবর  
দেওয়ার প্রথা আছে, পারসীদিগের কবরের  
প্রথা তার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। স্বসম্প-  
র্কীয়, কি জাতি-কুটুম্বের মধ্যে কেহই মৃতদেহ  
স্পর্শ করে না। নারসেসলাবুস নামে এক-  
জাতি ইতর লোক লোহার চৌপায়ার উপর  
শবটি বহন কোরে যথানির্দিষ্ট স্থানে লয়ে  
যায়। দারখাটের পরিবর্তে লোহার খাট ব্যব-  
হার করবার তাৎপর্য্য এই যে, যে অগ্নি তাঁদের  
কাছে তত পবিত্র, কাঠের দ্বারা সেই অগ্নি  
প্রজ্জ্বলিত হোয়ে সজীব থাকে। যে স্থলে মৃত-  
দেহের সংস্কার হয়, সে স্থানটি অতি অদ্বিত।  
বহুদূরব্যাপী গুয়েলের দ্বায় একটি প্রকাণ্ড  
গোলাকার বেঠন আছে, তার মাথা খোলা,  
অর্থাৎ ছাত নাই, ঝড়, বৃষ্টি, বৌদ্র মধ্যে  
প্রবেশ কোত্তে পায়, ঐ গোলাকার বেঠনটি  
অগ্নি নিরেট হুল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ  
প্রাচীরই কবর দেবার স্থান। বেঠনের ভিতরে  
একটি সুপ্রশস্ত বিস্তারমুখ গভীরখাত, ঐ খাতের  
উজ্জপথে লোহার কাঁকরি বসান, ঐ কাঁকরি  
চারিদিকের দেওয়ালের গা দিয়ে ঢালু হোয়ে  
ঝুকে পোড়েছে, মৃতদেহ সকল তারি উপর  
রক্ষা করা হয়। লোহার জালগুলি দেওয়া-  
লের মাঝামাঝি থেকে সুরু হোয়ে খাতের  
মুখ পর্য্যন্ত চোলে গিয়েছে, এমন কি, যে সে  
ইচ্ছা কোলে দেওয়ালের মাথার উপর থেকে  
ঝুকে পড়ে শব স্পর্শ প্রায় কোত্তে পারে।  
মৃতদেহগুলি জলবায়ু আর রৌদ্রের মুখে দিবা-  
রাত্রি অনাবৃত থাকায় শরীরের রস, রক্ত, মাংস,  
হয় নীচ শুকিয়ে ভুবাড়িয়ে যায়। নয় গুণিনীর  
দল পোড়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোরে গোত্রাসে  
খেয়ে ফেলে। শকুনীরা সর্বদাই সেই স্থানে  
গতিবিধি করে। সেখানে এদিকে সেদিকে  
ছড়ান বিস্তার শুকনো রোগা কাঁকড়া গাঁছ  
আছে, সেই সকল পাছের উপর শকুনীরা  
পালে পালে বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত মাংস  
অবশেষিত হোয়ে অবশিষ্ট যে অস্থিখণ্ড থাকে,

সেগুলো লোহার কাঁকরিতে ঠেকে বন্ বন্  
থন্ থন্ কোত্তে কোত্তে নীচের সেই খাতে  
গিয়ে পড়ে, তখন সেই মাংসপিণ্ড পোটুক  
পক্ষীপালের উদর-ভৃষ্টির নিমিত্ত পুনরীকর  
নূতন শব গ্রহণের স্থান প্রস্তুত হোয়ে থাকে।  
কখন কখন ধর্ম্মাক্ত কুসংস্কারাপন্ন এক আধটি  
পারসীকে ঐ গোরস্থানে শব চোকা দিতে  
দেখা যায়। সে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত  
থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখে, পক্ষীরা সর্বাপ্রাণে  
মৃতদেহের কোন্ চক্ষু প্রথম খুঁড়ে খায়। যদি  
সব প্রথমই বামচক্ষুর উপর আক্রমণ করে,  
তবে পরলোকে মৃতব্যক্তির সদৃশি না হোয়ে  
তার জীবাত্মা অনন্ত দুঃখে পতিত হবে।  
বামচক্ষু না হোয়ে যদি দক্ষিণ নেত্রের উপর  
প্রথম আক্রমণ করে, তবে তার জীবাত্মার  
সমাদরের নিমিত্ত স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত থাকে।  
এক্ষণে কিন্তু চোকা দিয়ে দেখবার প্রথা প্রায়ই  
উঠে গেছে। তবে কদাচিত্ কেউ কখন সে কষ্ট  
সহ্য কোত্তে স্বীকার কোরে থাকে। বিশেষতঃ  
মৃত ব্যক্তি যদি দেশপ্রসিদ্ধ মহাপাতকী হয়,  
কি সে যদি তার কলকণ্ঠ সূলাচারের প্রতি  
ঐদৃষ্টি কোরে থাকে, তবে ত তারে কখনই  
কেউ চোকা দিয়ে দেখবে না। সংস্কারক্রিয়া  
শেষ হোয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজনেরা তিন  
দিবস পর্য্যন্ত একস্থানে সমবেত হোয়ে অবস্থান  
করে। ঐ তিন দিবসের পর তারা এই  
সিদ্ধান্ত করে যে, তাদের লোকান্তরগত ভ্রাতার  
উপর পরলোকে চূড়ান্ত বিচার হোয়ে  
গেছে। পারসীরা যখন স্বদেশ পরিত্যাগ  
কোরে গুজরাটে এসে বাস করে, আর আর  
নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গে এই একটি নিয়মও  
অবধারিত হয় যে, তারা গোবধ এবং গোভ-  
ক্ষণ কোত্তে পারবে না। তারাও কিন্তু ঐ  
প্রতিজ্ঞাটি আজন্মকাল সত্যে এবং সগৌরবে  
রক্ষা কোরে এসেছে। পারসীরা এক্ষণে গো-  
জাতিকে পবিত্র কুল জ্ঞান করে, হিন্দুদিগের  
দ্বায় তারাও গরুর প্রতি সেইরূপ ভ্রূদ্ধাভক্তি  
এবং সেইরূপ সমাদর প্রদর্শন কোরে থাকে।  
তন্নিম্ন গুজরাটীভাষা তাদের জাতীয় ভাষার  
দ্বায় ব্যবহার করবারও কথা থাকে এবং অজ-



শস্য লয়ে গতিবিধি করবারও অল্পমতি ছিল না। পারসীরা ধর্মপ্রতিজ্ঞার প্রতি সমাদর দেখাবার নিমিত্ত ঐ সকল নিয়মের প্রতি আজও পর্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোরে থাকে।

হিন্দুরা যেমন গরুর গোরব করেন, গই-বিরেরা তেমন কুকুরের গোরব কোরে থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁদের বাসগৃহ কখন কুকুর-শয়ল হয় না, আর সেই নিমিত্তেই তারা সমাদরে কুকুরকে আহার দিয়ে থাকে। কুকুর ভোজন করান পারসীদের কুলধর্ম বোঝেই হয়। কোন পারসী মুমূর্ষু হোলে একটি কুকুর তার শয্যার পাশে নীত হয়, ঐ কুকুরের উপর মৃতকল্প ব্যক্তি তার মুদিতপ্রায় চক্ষু দুটি স্থির কোরে রাখে, কি রাখবার চেষ্টা করে। তাদের সকলেরি এই সংস্কার আছে যে, জীবাত্মা যখন অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় কুকুর রক্ষক হোয়ে তাঁরে অপদেবতার হস্ত থেকে পরিত্রাণ করে। এই ব্যবহার দেখে অনেকে মনে কোভে পারেন, পারসীরা যে কুকুরের গোরব করে, তার কারণই সেই। আবার অনেকে কিন্তু এ কথাও বলেন যে, তারা যখন স্বদেশ পরিত্যাগ কোরে দেশান্তর অবেষণ করে, সেই সময় পথে কুকুরের রব শুনে গুজরাটের উপকূলে সমাগত হয়। সুতরাং ঐ কুকুরই তবে পথ-প্রদর্শক হোয়ে তাদের গুজরাট রাজ্যে আনয়ন করে বোধ হয়। এই ঘটনাই পারসীদের কুকুরের প্রতি গোরব-প্রদর্শন করবার প্রকৃত কারণ হোতে পারে।

পারসীদের মধ্যে এই একটি অপূর্ণ রীতি প্রচলিত আছে। একমতাবলম্বী একাজমী স্বজাতীয়দের মধ্যে কেউ যদি আত্মকুল্যের প্রার্থনা করে, তবে প্রত্যেক পারসী সংস্থান-হুসারে তার উপকার কোরবেন, সেটি তাদের প্রতিজ্ঞা, কোভেই হবে, তাই পারসীদের মধ্যে ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায় না। স্বীলোকদের সম্বন্ধে পারসীরা অতিশয় অমুখাপেক্ষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অল্প ধনাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা, কইবার অল্পমতি নাই। কোন প্রকার অবহিত, অসঙ্গত, কিম্বা

অল্পপযুক্ত গতিবিধি কি কথোপকথন কোলে প্রাপদগেয়, ব্যবস্থা আছে। এই নিদারুণ কঠিন প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও পারসীর স্বীলোকেরা মুসলমানীদের স্বায় অস্তঃপুরের মধ্যে অবরুদ্ধ হোয়ে থাকে না, তারা ইচ্ছামত যখন তখন আর যেখানে সেখানে যাতায়াত করে, পথে ঘাটে সর্বদাই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। পাতকোতলায় জল আনতে যায়, একলাই যায়, একলাই আসে, কেউ রক্ষক হোয়ে তাদের সঙ্গে যায় না। একটি সংসারের যত জলের দরকার হয়, স্বীলোকেরাই তার সরবরাহ করে। অল্প অল্প গৃহকার্যের মধ্যে সেটিও একটি প্রধান কার্য। সকল ঘরেরই স্বীলোককে জল আনতে হয়। বোম্বেতে পাতকোতলায় স্বীলোকের ভিড় লেগে যায়, এ তার সঙ্গে বক্ বক্ কোচ্ছে, সে তার সঙ্গে কিচির মিচির কোচ্ছে, কেউ কারও সঙ্গে বক্ড়া কৌদলও বাধিয়ে দিচ্ছে, দেখে বোধ হয় বেন, স্বীলোকের বাজার বোসে গেছে। একটি স্বীলোক পাঁচ ছয়টি জলপূর্ণ পিতলের কলস উপরোপরি কোরে মন্দিরের মতন সাজিয়ে মাথায় কোরে বোয়ে নিয়ে যায়। একটার উপর একটা, তার উপর একটা, এইরূপ কোরে সাজিয়ে এমনি চমৎকার পরস্পর ভার রেখে দেয় যে, কদাচ তারা পা টোলে পোড়ে যায় না।

আমার সহ-পাঠক বোলেন, “অন্তঃপর আমি গইবির-কন্তার আখ্যায়িকা বর্ণন করিব।”

### গইবির-কন্তা ।

অগ্নি-উপাসককে গইবির বলে, পারস্থানে সকলেই তাদের হতপ্রজ্ঞা করে, সেখানে তারা গবরস্ নামে খ্যাত, ঐটিই কিন্তু যথার্থ উচ্চারণ।

রম্ভম জাতিতে গইবির, বোম্বেতে তাঁর বাস, তিনি একটি মস্ত ধনী পারসী। কুলাচার কুলধর্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোন্তেন এবং আপনাদের মত অহুসারে পূজা আহিকের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠ ছিলেন, সেই জন্য অগ্নি-উপাসকের মধ্যে সকলেই তাঁর

স্বপ্নান সমাদর কোত্তো। তাঁর পত্নীও একান্ত অগ্নিভক্ত আর স্বধর্ম-অমরতা ছিলেন, স্বভাব-নয় আচার ব্যবহারের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ কোত্তেন, ক্ষুদ্র কোণ পর্যন্ত শাস্ত্রের তাৎপর্ষ্য বিধি-ব্যবস্থাগুলি একটি একটি কোরে দৃষ্টি খুঁটে প্রতিপালন কোত্তেন। জীবা প্রাণের একমাত্র সন্তান, বালা পিতা-মাতার অশ্রু-অশ্রু-বাৎসল্য অমরগুণের একমাত্র ভাগিনী হয়েছিলেন। তাঁর স্নেহ আদরের পরিমাণ ছিল না।

অর্থেতে বতদূর সুখ-সম্পদ হোয়ে থাকে, আর কিছুই অসমস্থান ছিল না, জীবা সেগুলি সমুদয়ই ভোগ কোত্তেন। এত সুখে বাস কোরেও গৃহকাঁচের, কি কুলকর্মে একটি কণিকামাত্রও অবহেলা করবার অহুমতি ছিল না। জীবাকে আবশ্যিকমত সংসারের সকল কাজই দেখতে হত এবং কলক্রিয়ার সকল নিয়মই রক্ষা কোতে হত, তাই কোত্তেই বাবার অনেক সময় কেটে যেতো। সুন্দরীর মুখকান্তি অতিশয় সুন্দরী ছিল, দেখলে বোধ হতো যেন, চারু প্রভা-বিকসিত বিমল চন্দ্র-কলা। দেহের আকারটি যেন লাবণ্য-মাধুরীর মূর্তিমান কোমল প্রতিমা। পারস্থানের কবিরেরা যেরূপ নেত্রছবির প্রশংসা কোরে থাকেন, জীবার চক্ষু দুটি ঠিক সেইরূপ দীঘা-যত,—সেইরূপ শ্যামল উজ্জ্বল এবং ঠিক সেইরূপ কোমল জ্যোতিতে প্রফুল্লিত। ক্রমশে টানা,—নাকটি বাঁশীর মতন মনোহর সরল। মুখের ইঁা বরং একটু বড়, সরুপ দীর্ঘাঁদের ওঠ এ দেশের সুন্দরীদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।

“তরুণ যৌবনচাঁক আঙণের আঁচে,

তরুল কনক চালি মনোহর ছাঁচে।

বিধাতা গঠিল মুখ ভুবন মোহিতে,

নবজ্যোতি ক্ষুরে তার সকল ভঙ্গিতে।”

জীবা যখন অতি শিশু, তখন তিনি বাগ-দত্তা হন। গইবির যুবতীরূপের মধ্যে সেই রমণীর কোমল কুসুমটি যে যুবকের প্রণয়িনী হবার কথা স্থির হয়, তার নাম ফ্রেমজী। তিনি গুজরাটদেশীর একজন পারসী মহা-

জনের পুত্র। ফ্রেমজীর পিতা অতি নীরস কঠোর চেহারার লোক, ক্ষুদ্রাশয়, নীচপ্রসূতি এবং লাভের প্রতি অসঙ্গত দৃষ্টি। রত্নমের বিস্তার অর্থ ছিল, তাই ঐ গইবির-কন্ডার সঙ্গে তাঁর পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হওয়া গুজরাট পারসীর পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় হয় নাই। যুবা ফ্রেমজী অতি দান্তিক,—অতি অহঙ্কারী ছিলেন। পিতার কুপ্রকৃতিগুলি সমুদয়ই তাঁতে বর্তেছিল। তাঁর এমন কোন সদগুণ ছিল না যে, সেইটি নিজের অপর পাল্লায় রেখে তোল করা যায়। জীবার বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় যুবা ফ্রেমজী একবার তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন, তখন গুরুপক্ষের শরচ্ছত্রের তায় বাবার বিমল কান্তি-মাধুরী পূর্ণগৌরবে বিকসিত হোয়েছে। যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো মত্যা, সিটি কিন্তু নীরস পান্দে সাক্ষাৎ, বাবার স্বর্ণোপম চারু মনোহর মুখকান্তির গৌরব না কোরে তাঁর অমৌল্যমধুর স্বভাব, তাঁর সরলচিত্ত, তাঁর চারু-প্রফুল্লিত সদয় প্রকৃতি,—এ সকলের প্রতি অমরগুণ প্রকাশ না কোরে, তাঁরে বিবাহ কোরে যে বিস্তার স্বাধীন পাবেন, যুবা কেবল সেই কথা লোয়েই মহা আনন্দ কোরেছিলেন, আর কতদিনে বিবাহ হোয়ে যৌতুকধনে বর-পরিপূর্ণ কোরবেন, ফ্রেমজী কেবল সেই চিন্তাতেই উৎকণ্ঠিত ছিলেন, আর কেবল সেই প্রসঙ্গই বারবার উত্থাপন কোত্তেন। নৌরোজ নামক পরীহ আগত-প্রায়, ঐ দিনে তাঁদের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হবে, কথা স্থির হোয়ে আছে, কিন্তু যুবার উৎকট পীড়া হওয়ার তিনি তাঁর বাস-গ্রাম সুরাট থেকে স্থানান্তরে যেতে অক্ষম হলেন, তাই কাজে কাজেই সে লগ্ন-পত্র ফিরে গেল। এক্ষণে এই কথা স্থির হল যে, মেহসিরম্ পরীহ-দিবসে বিবাহ-ক্রিয়া নীরহ হবে, তারও বড় বিলম্ব ছিল না।

জীবা তাঁর অপিতা স্বামীর অনাদরতার লক্ষ্য কোরেছিলেন। তিনি নাকি জন্মিয়ে অবধি আদর গৌরব পেয়ে আসছেন, তাই যুবার উদাস্ততার দেখে মনে মনে মহা

দুঃখিত হয়েছিলেন, তাও বাই হোক, ক্রেমজী যে গুল্লারাটে যাবার অভিপ্রায় কোরে সে কথা প্রণয়িনীকে না বোলে অমনি হঠাৎ চোলে গেছেন, সেইটাই তাঁর অতিশয় দুঃখের কারণ হলো, তাই যুবতী পিতামাতার কাছে বাগদত্ত স্বামীর নির্দয় আচরণের কথা মুক্তকণ্ঠে বোঝাতে লাগলেন, আর আপনার অদৃষ্ট ভেবে মনোদুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ইদানীং তাঁর মনের ভাব গুরুতর হোয়ে উঠল, দিব্যরাত্রি স্রিয়মাণ হোয়ে কেবল কি ভাবতেন, আর পূর্বের মতন পুলকিত হোয়ে হেসে খেলে আশোদ কোরে বেড়াতে না, পিতামাতা তাঁকে আর সৈরুপ সরসপ্রকৃতিত দেখতে পেতেন না। জীবীর মনস্তাপের আরও একটী হেতু ছিল, সে কথা মনে কোরে আপনা আপনিও একবার নিশ্বাস ফেলতে তাঁর সাহস হতো না, বাপ মায়ের কাছে প্রকাশ কোরে বলা ত আরও অনেক দূরের কথা। জীবী তাঁর চিত্ত চার যুবা সুরজরঙ্গের মধুর মূর্তি নয়নগোচর কোরেছিলেন। নুরজরঙ্গ মোগলপুত্র, কাছে সহরে তাঁর বাস, তার মোগল পিতা মহাধনী ওমরাহ, সেই দেশের নিউরাল দরবারে মহা উচ্চপদে অভিযুক্ত ছিলেন। সুরজরঙ্গ যখন সোয়ার হোয়ে বোধের গড়ের ময়দানে তাঁর সতেজ আরব-খোড়াকে মনোহর ভঙ্গী কোরে নিয়ে বেড়াতে, সেই সময় যুবা মোগলের মূর্তির উপর জীবীর চক্ষুহুটী স্থির আশ্রয় পেতো। যুবতী দেখতেন, অথচ কখনো বিদ্যুৎগতিতে ছুটেছে, দেখে ভয়ে তাঁর প্রাণ কাঁপতো, আবার দেখতেন, তার স্তম্ভায়ুক্ত মনোহর প্রভু সুশিক্ষিত হস্ত-চাতুগ্রীষারা বেগ খাটো কোরে নিয়ে এসেছে, অথচ তখন মাটিতে পদাঘাত কোত্তে কোত্তে, আর মুখ দিয়ে কেণা উগরুতে উগরুতে তীরের স্থায় দৌড়েছে। অথচ একণে ছুটে বেরিয়ে পোড়েছে, আর দৃষ্টি চলে না, আরোহীকেও আর দেখতে পাওয়া যায় না। জীবীর এখন ঘর-সংসার মনে পোড়ে, দুটি রফরকে উজ্জল কলসী লয়ে পাতকো-তলার জল আনতে চোলে গেলেন। জল পূরু কলসী

দুটি মাথায় কোরে নারিকেল-বনের ভিতর দিয়ে সদর-রাস্তা বেয়ে বাড়ী-মুখো চোলে-ছেন। পথে যেতে যেতে তাঁর মনোদর্পণে প্রতিফলিত সেই মূলমান যুবীর চারু মূর্তিটি নিরীক্ষণ কোচ্ছিলেন, বালা মোগলের আরুতির সঙ্গে তাঁর বাগদত্ত স্বামীর রূপ মিলিয়ে দেখছিলেন, তুলনায় স্বামী কিন্তু বিস্তর অপদার্থ হোয়ে পোড়লেন। বালা দেখলেন, বাগদত্ত স্বামীর প্রতি কথঞ্চিৎও অনুরাগিণী হওয়া তাঁর সাধ্যের মধ্যে নয়, অনেক চেষ্টা কোরেও তারে তাঁর অনুরাগ আসনে বসাতে পারেন না।

জীবা পায় পায়, ধীরে ধীরে চোলেছেন, পথাপথ বিচার নাই, যেখানে সেখানে পা ফেলছেন, পথ দেখে, চোলেছেন না, পথে বিপদ আপদ আছে কি না, তারও খবর নাই, এই সময় একখান ছকট গাড়ীতে দুটি বলদ মুড়ে তিন জন পশুপিস ইঁাকিয়ে যাচ্ছিল। বালা গায় গাড়ীখানার অল্প খেস লেগে মাথা খেকে জলের কলসী দুটি পোড়ে গেল। গাড়োয়ান তাতে ক্রোধান্বিত না কোরে তাড়াতাড়ি গাড়ী ইঁাকিয়ে বেরিয়ে পোড়লো। তৎকালীন নিকটে কেহই ছিল না যে, কলসী দুটি তাঁর মাথায় পুনরায় তুলে বসিয়ে দেয়, কেউ না ধোলে তিনি যে अपना আপনি তুলে বসাবেন, তা তাঁর সাধ্য ছিল না, অনেক টানা-টানিও কোরে দেখলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না, তাই বালা চারি দিকে চেয়ে দেখছিলেন, যদি কারও দেখা পান, তারে বোলে কলসী দুটি তুলিয়ে নেবেন। এমন সময় অশ্বের পদশব্দ শুনে পেলে, তার পরক্ষণেই সেই সুপুরুষ মোগলবর এই গান গাইতে গাইতে তাঁর আরব খোটকের উপর সোয়ার হোয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হোলেন।

পান।—“কোমল প্রবাল অধর-যুগল

যখন হাসিতে বিতত হয়,  
যে দেখে তাহাঁরে আপন মানসে  
আর কি আপনে আপনি রয়॥  
হাসির আভাস মিশিয়ে নয়নে  
আমরি কি শোভা ধরে রে ধরে,

হৃদয় কাহার খল যদি হয়  
তবু তার মন হরে রে হরে ।  
ধরণীর নাথ যদিও সে হয়  
অথবা ভুবনবিজয়ী বীর,  
আহত, বিজিত, বিগতগৌরব  
বালা-পদে করে প্রণত শির ।”

বালার কষ্ট দেখে মোগল তখনি ঘোড়া  
খেঁচে নেবে জিজ্ঞাসা কোলেন, কেন এরূপ  
কটনা হল, জিজ্ঞাসা কোরেই কলসী দুটি  
তার মাথায় তুলে দিলেন। বালা কাঁপতে  
লাগলেন, কেন কাঁপতে লাগলেন? সেইমাত্র  
দ্বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাই স্বরণ  
কোরেই কি কাঁপছিলেন? না—তা নয়।  
বাপ হয় যে যুবা পুরুষটির তত অকুরাগ  
দেখলেন, তাঁকে তত নিকটবর্তী হোতে  
দেখই বালা কাঁপছিলেন। মুখ উঁচু কোরে  
চোয় দেখতে জীবীর সাহস হলো না, তখাচ  
যুবা যেকথা কোরে তাঁর উপকার কোরে-  
ছেন, তাই জন্তে বালা তাঁর কৃতজ্ঞতা কোতে  
লাগলেন। তাঁর শরীরে কোন চোট লাগেনি,  
সে কথাও জীবা তাঁরে বিশেষ কোরে বোলেন,  
এ কথা বোলে জল আন্বার অছিলায়  
পাক্কোতলায় ক্ষিরে চোলেন, জীবীর অকু-  
রোধক্রমে নৃজরঙ্গ আরবের উপর সোয়ার  
গোয়ে বালার পাশাপাশি হোয়ে চোলেন,  
আর কেবল পর্ভু গিস গাডোয়ানকে যদুচ্চা-  
প্রবৃত্তি পালাগালি দিতে লাগলেন। যুবা  
বোলেন, সে কেন একটা স্থানলোককে—বিশে-  
ষতঃ এরূপ পরমাস্ত্রদ্রব্যকে পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যব-  
হার কোলে। এই কথা আশ্রিত হোয়ে মনো-  
বেগ ঢাকবার নিমিত্তও যুবতী গাজবস্ত্র টেনে  
বদন আচ্ছাদন কোলেন, অথচ আবার “সে  
ইচ্ছা কোবে আমার অনিষ্ট করে নি, তবে  
দৈবাৎ হোরে পোড়েছে, তাতে আর অপরাধ  
কি?” এই প্রকার বাদান্তবাদ কোরে পর্ভু-  
গিস গাডোয়ানকে নিরপরাধী করবার চেষ্টা  
পেতে লাগলেন। তার পর তাঁরা নানা বিষ-  
য়ের আলাপ কোতে কোতে বৃক্ষরাজির  
মনোহর ছায়া-পথ ছাড়িয়ে এসে পোড়লেন।

সেই সময় অনেকগুলি লোক দূর থেকে দৃষ্টি-  
গোচর হল, লোক দেখে যুবতীর অপ্রতিভ-  
ভাব বুঝতে পেয়ে নৃজরঙ্গ “আবার দেখা  
সাক্ষাৎ হবে,” এই আশ্বাস কোরে তুরঙ্গমের  
বাগ ফিরিয়ে চক্ষের নিমিত্তে অন্তর্দান  
হোলেন। পর্ভু গিসেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি,  
ভারতবর্ষে তাদের বাস, তাদের মধ্যে অনে-  
কেই অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক খ্রীষ্টিয়ান, তারা  
সকালে যৌত্তর ক্রুশপতাকা বহন কোরবে,  
আবার সেই দিনেই সায়াংকালে শিবমন্দিরে  
উপস্থিত হোয়ে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণামও  
কোরবে। এরা অতি নীচ, অত্যন্ত দুঃখী এবং  
বিলাস-বাসনে অতিশয় অকুরত। গ্রেহাম  
সাহেব তাদের এইরূপ বর্ণন করেন,—“তারা  
এক জাতি কৃষ্ণবর্ণের লোক হোয়ে শূকরের  
মাংসও খায়, পেনটলুনও পরে।”

আজ অবধি নৃজরঙ্গ জীবীর মনোমুহ-  
চিন্তাচোর হোলেন। আজ জীবা নিদ্রা অব-  
স্থায় তাঁরে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন। কার্ভো  
পের পোষাক পরা, মাথায় সবুজ রঙের  
পাগড়ী, কোমরে পেশকবজ কলানো, তার  
মুঠ হীরে দিয়ে বাধানো, পায়ে বিশকিঅতি  
লপেটা জুতো, এইরূপ ঐশ্বর্যাভূষণের বেশ  
কোরে, আরব ঘোড়ার সোয়ার হোয়ে যুবা  
পবনবেগে চোলেছেন, ঘোড়া থেকে পোড়ে  
গিয়ে পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে, সেই ভয়ে  
সুন্দরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল,—জীবা উদাস-মননে,  
শূন্য অন্তরে চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোতে লাগ-  
লেন। স্বপ্নচ্ছলে পুনর্বার নৃজরঙ্গকে দেখবার  
নিমিত্ত আবার নিদ্রা যাবার যত্ন কোতে  
লাগলেন, কিন্তু আর তাঁর নিদ্রার আবেশ  
হলো না। তাই তখন আত্মভংসনা কোরে  
বোলতে লাগলেন, “রে স্বপ্ন! তুই দূর হ, তুই  
আর আমার অন্তরে আসিসনে, তুই আর  
আমার সঙ্গে ছলনা কোরিসনে, তুই বুঝা বড়,  
আমি আর তাঁরে ভাববো না। তিনি মুসল-  
মান, তিনি কখনই আমার হোতে পারবেন  
না, গইরির কহার, অকুরুল মিত্র হোলে  
হোতে পারেন—সেই পর্য্যন্ত—সেই পর্য্যন্ত,—  
নচেৎ আমার কোনো আশা নেই, আমি কিছু

আর তাঁরে মনে করবো না, আর তাঁর চিন্তাও করবো না।”

যোগলের রমণীয় ছাঁদ বিস্মৃত হওয়া যথের কথা নয়, মনে কোলেই তাঁরে ভুলতে পারেন না, যেহেতু জীবীর মনোপটে যুবার চারু আকৃতি গভীরাক্রান্ত হয়েছে, তাঁর সরস অমিয় বাঁকাগুলি যুবতীর হৃদয় মোহিত করেছে, তাঁর মোহন প্রভাব কস্মিনকালেও বিরস হবার নয়। জীবা পরদিন প্রাতেই কলসীগুলি মেজে ঘোষে পরিষ্কার কোরে পাতকোতলায় জল আনতে চোলেন। কলসী-গুলি হাতে কোরে তুলে এই কথা বোলেন, “আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে!” এই সময় কিন্তু তাঁর মনে পোড়ল, তিনি গইবির-কস্তা, বিশেষত বাগদস্তা হয়েছেন, ঐ কথা স্মরণ হোয়ে যুবতীর সহাস্ত-প্রফুল্ল বদন মলিন আচ্ছাদনে আবৃত কোলে, - তাঁর মুখশ্রী বিবর্ণ হোয়ে কৃষ্ণমেঘে ঢেকে ফেলে, এর পূর্বেই কিন্তু যোগলের নাম উচ্চারণ কোরে তাঁর বদনকান্তি আচ্ছাদে স্বকৃমক স্বকৃমক কোচ্ছিল। এখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বোলেন, “হার! তবে আর তাঁকে এ পাপ চক্ষে দর্শন কোরবো না, তা আর কি কোরে হয়, তবে নয় অস্ত্র পথ ধোরে পাতকোতলায় দাবো, তা হোলে যুবার সঙ্গে সাক্ষাতের হাত এড়াতে পারবো।” যুবতী সত্য সত্যই তাই কোলেন, আর এক রাস্তা দিয়ে জল আনতে চোলেন, মনে মনে এই কথা বোলে আপনার স্নান আপনি কোত্তে লাগলেন, “আমি খুব সয়ে থাকতে পারি, আমি যেমন বরদাস্ত কোত্তে পারি, বোধ হয় তেমন আর কেহই পারে না, বিশেষতঃ এ ভরা বয়েসে।—আমি অনেক কষ্ট, অনেক নিগ্রহ সয়ে আছি, মনের অহরূপ বাসনা পূর্ণ না হোলে তাতে ছুঃখিত হইনে, সে বিষয়ে আমার বল সাহস সহিষ্ণুতা বেশ আছে।” এবার কলসী হুটি পূর্বের অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। হেমাদিনী বালা শরীরের ভর দিয়ে যেমন কলসী দুটি উচু কোরে তুলবেন, পার্শ্বে বেদনা অহুভব কোলেন, সিটি কিন্তু গত দিবসের আঘাত পাবার কল, তবে

তিনি এই প্রথম অহুভব কোত্তে পালেন। জীবা-ভাবলেন, এখনও কিছু বেলা অধিক হয় নি, ফিরে যাবার সময় মেরী সাউসির বাড়ী হোয়ে যাবেন। মেরী সাউসি বিধবা স্ত্রী, তাঁর পর্তুগিস স্বামীর বেনেবকাল, আর গাচ-গাছডার দোকান ছিল, মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা-পত্রও করা হতো। বৃদ্ধা একটি নির্জন নিভৃত স্থানে একাকিনী বাস কোতেন, তাঁর চাল চলন কেমন একরকম খাপছাড়া খাপছাড়া অদ্ভুত প্রকার ছিল, তাই অর্ধাচীন আর দুই প্রকৃতি কুচক্রী লোকেরা মনে কোত্তো, বৃদ্ধা ডাইনী কি ডাকিনী, অপদেবতাদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চোলে থাকে, সে সকল স্থানে তাঁর বাতায়াতও আছে। প্রাজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা কিন্তু বৃদ্ধার অনেক প্রশংসা কোতেন, তাঁরা তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা আর প্রাজ্ঞতার বিস্তর অমুরাগও কোতেন। বিজ্ঞতা আর বিবেচনার প্রভাবেই বৃদ্ধা অনেক অদ্ভুত আরোগ্যসাধন কোরেছেন। আজন্মকাল চিকিৎসার চর্চা-তেই তাঁর দিন অতিপাত হয়েছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞার আলোচনা এত পরিমাণে কোরে ছিলেন যে, তাতে তাঁর অল্প ব্যাপত্তি জন্মে নি, এবং তাতে তিনি অল্প প্রতিপত্তিও লাভ করেন নি। অনেকগুলি উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য কোরে সকলের কাছে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হোয়েছিলেন, ইদানীং হিন্দুরাও পর্যন্ত তাঁর কাছে ব্যবস্থা গ্রহণ কোত্তে দ্বিধা মনে কোতেন না। এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকটি জ্যোতিষ বিজ্ঞারও বেশ পারদর্শিনী ছিলেন, ব্রাহ্মণদের জ্ঞান অজ্ঞান হোয়ে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ গণনা কোত্তে পারতেন। হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রে তাঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, আর সংস্কৃত এত জানুতেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে একটা অদ্ভুত দৈবান্বিত্য জ্ঞান কোতেন, গই-বিরহেরও ধর্মমত তাঁর বেশ জানা ছিল। রোমান ক্যাথলিক অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মের প্রাচীন মত তাঁর স্বীয় কুলধর্ম ছিল, বৃদ্ধা আপনার মতে একান্ত অন্ধ ছিলেন। যতপ্রকার অস্ত্রায় অহুচিত কুৎসিত ধর্মের মধ্যে তিনি বাস কোতেন, তাঁর মধ্যে প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম তত

সত্য—তত অসম্ভব নয়, বোধ হয় এইরূপই  
বোধ ছিল। মেরী দরিদ্র ছিলেন নত্যা,  
তার চরিত্র আর আচরণ অতি ভাল ছিল,  
কথায় কুটিল কণ্ঠতা ব্যবহার কোতেন  
আর বেশ স্বার্থবাদীও ছিলেন, কেউ  
কামক দিয়ে ভয়ই দেখাক, কি অর্থের  
দেখিয়ে প্রবৃত্তিই দিক, মেরী সাউসী  
কথায় ভুলতেন না, যে সকল ঔষধের  
কব্জার শক্তিই অধিক, অথবা যে সকল  
দুঃখের দ্বারা প্রাণের উপর সাংঘাতিক  
নিহোতে পারে, তা তিনি কদাচ হাত-  
ড়া কোতেন না, কোন প্রকার অস্বার্থে দ্বিষ্ট  
কতেন না, কেউ তাঁরে প্রবৃত্তি দিয়ে কোন  
ম অর্থে বা নিষিদ্ধ কার্যের সংগ্রহে  
কোতেন না। যদি কখন কোন রোগী  
যে মারা পোড়ত, জানবান্ চিকিৎসকের  
তও সময়ে সময়ে সেরূপ ঘটনা দেখা  
দিতেন, তেমন আর কাহাকেও হতে দেখা  
না। শুধু দুঃখিত হওয়াও নয়, আবার  
রাজীবীদের নিমিত্ত তারি উৎকণ্ঠিত  
কতেন, তারা কষ্ট পাবে, তাদের সংসার  
ধ্বংস হবে না, তার জন্তে তিনি কি না  
কৈপ কোতেন।

এই অপূর্বচরিত্রা স্ত্রীলোকটির জ্যোতিষ-  
শাস্ত্র অধিকার ছিল বোলে যুবক যুবতীরা  
তার ফলাফল জানবার নিমিত্ত যখন তখন  
কে গিয়ে বিরক্ত কোতো। মেরী নাকি  
যে প্রকৃতির অকীচীনতা ভালরূপ পরিজ্ঞাত  
লেন, তাই এ ক্ষেত্রে অস্তুত গণনা করাই  
র নিয়মিত প্রথা ছিল, প্রতিবারই একটা  
একটা কুপিত গ্রন্থের দোষ দেখিয়ে অক-  
ণ্ঠের ভয় দেখাতেন—প্রাণান্তেও তিনি এ  
রমের বহিষ্কৃত কাজ কোতেন না, কিন্তু  
রূপে যে অমঙ্গলপাত নিবারণ হয়, ফল-  
শাস্ত্র-প্রার্থীদের তার উপদেশ বোলে  
কতেন। এই কৌশল দ্বারা কুর্খের রত  
শাস্ত্র দুর্ভাগ্যবাদের প্রায়ই শুধরে যেতে  
কোতেন, তন্ত্রের পরের অনিষ্ট কোতো প্রবৃত্ত  
দেবতার লোকদেরও সংগত আশ্রয়

কোতো শুনেছেন। চিকিৎসা সম্বন্ধেই হোক,  
আর গণনা সম্বন্ধেই হোক, তাঁর ব্যবস্থা গ্রহ-  
ণের নিমিত্ত কারও অর্থ ব্যয় কোতো হতো  
না, কারও গীড়িত দেখলে, তারে এই কথা  
বলা হতো, “তুমি আমার বাড়ীতে যেও,  
তোমায় কেবল ঔষধের মূল্য সংকীর্ণ দিতে  
হবে, আমার ব্যবস্থা কি আমার পরামর্শ গ্রহ-  
ণের নিমিত্ত তোমায় কিছু বার কোতো হবে  
না, আমি যে উপদেশ দিব, তা শুনে তোমার  
যদি জ্ঞান জন্মে, তবে যথেষ্ট লাভ বোধ  
কোবো। মেরী সাউসী নারিকেল বৃক্ষের  
উপবনে একখানি কুটার বেধে বাস কোতেন,  
তাঁর ক্ষুদ্র দোকানখানি দিবারাত্র পরিষ্কার  
পরিচ্ছন্নরূপে সাজান থাকতো। যে শিশিতে  
যে ঔষধ রাখতেন, তাঁর নাম সেই  
শিশির গায়ে লিখে রেখে দিতেন,  
এইরূপ প্রত্যেক শিশির গায়ে নাম লিখে  
রেখে দিচ্ছিলেন। লাতিন, পর্তুগিস, আর  
সংস্কৃত—এই তিন ভাষায় অতি পরিষ্কার  
পরিচ্ছন্ন অক্ষরে নামগুলি লেখা থাকত।  
কদাচ কখন দরের বার হোতেন, অথচ কোন  
পরিবারের মধ্যে কি কাণ্ড হোচ্ছে, তা নথ-  
দর্পণের দ্বারা জানতে পাচ্চেন, কিন্তু কারও  
কথা, কি কারও পরিবারের কথা প্রাণান্তেও  
যুথের বার কোতেন না। স্বভাবতঃ তিনি  
কথাও অতি কম কইতেন, তাইতে আরও  
কারও কথা প্রকাশ কোতো তাঁর অভিরুচিই  
হতো না। তাঁর সকল বিষয়েতেই অতি  
সাবধান—অতি সতর্ক হোয়ে চোলেতেন।  
কনক-পদ্মিনী ভীষা মেরী সাইসীর বাড়ীতে  
সদাসর্বদাই যাতায়াত কোতেন, সুতরাং  
মেরীর কাছে যুবতী অপরিচিত ছিলেন না,  
যুবতীও তাঁর অঙ্কুলে পক্ষপাতিনী ছিলেন।  
তাই বালা যেখানে তাঁর বাসস্থান, সেই বৃক্ষ-  
বনে নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ কোলেন। জীবা  
তাঁর কুটার অভিমুখে চোলেছেন, এমন সময়  
হৃৎকরককে দেখতে পেয়ে অতিশয় অপ্রতিভ,  
অতিশয় বিস্মিত হোলেন। যুবা তখন মেরীর  
বাড়ী থেকে বেরিয়ে সবে মাত্র বাইরে  
এসেছেন। একপে আর রাস্তা ভাঁড়ানোও

যায় না, পরস্পর দেখাদেখি হত্যাও নিবারণ হয় না, অস্ত্র পথ না থাকাতে সিটি হবারই যো ছিল না, বিশেষতঃ অস্ত্র পথ থাকলেও বালা যুবার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতেন, পালাতেন না, কারণ পূর্কদিন রূপা কোরে যুবা যে উপকার কোরেছেন, বালা মনে কোলেন, আজ যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন, তবে অকৃতজ্ঞা হয়ে উপকার বিশ্বস্তা হবেন। তর-তরঙ্গ নিকটে গিয়ে বোলেন, “জীবা! কাল যে আঘাত পেয়েছো, তার জন্তে ত স্মৃতি মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে যাচ্ছো না? বোধ করি, এ দেখা সে ভুলে নয়।” জীবা তাঁরে বিশেষ কোরে বোলেন, “তেমন শত্রু চোট কিছুই লাগেনি, তবে পাজরে কিঞ্চৎ বেদনা বোধ হোয়েছে, এর পর পাছে বৃদ্ধি হয়, তাই এই বেলা ঔষধ দেবার মনন কোরেছি।” মোগলবর বালার মাথা থেকে জলের কলসী দুটি ধরাধরি কোরে নামিয়ে দিলেন, সেই অবসরে অনেকগুলি সম্মেহ গোহিনীবাঁকা স্তনদ্বীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ কোরে বোলেন। বালা তৎকালীন হৃদয়ত লজ্জায় হতবুদ্ধি, হতচিহ্ন ছিলেন সত্য, কিন্তু তথাচ তরঙ্গরঙ্গের চিত্তহারী বাঁকাগুলি তাঁকে গ্রহণ কোতে হয়েছিল। যুবা পূর্কেই তাঁর হৃদয়ের সন্ধান বেশ জেনেছিলেন, তাই মনে মনে সাহস ছিল যে, তাঁর বাঁকাগুলি বালার কর্ণে অপ্রিয় বোধ হবে না। যুবা যেন তৎকালীন বাঁকপতি হোবেন, অনেক পাকচক্র কোরে, নানা কৌশলের কথা বলে আপনাতর মূর্তিটি এমনি অভ্রান্তরূপে চিত্রিত কোলেন, আর মিশকাল নয়ন নিঃসৃত হৃদয়ানুসঙ্গী দৃষ্টির সঙ্গে এমন একটু স্তম্ভুর কোমল ভঙ্গী প্রকাশ কোলেন, তা শুনে গই-বিরকন্নার ক্ষমতা হলো না যে, সেই সরস স্তম্ভাব্য মনোমুগ্ধকারী কণ্ঠস্বরে আপনাকে বঞ্চিত করেন, কি তার শ্রবণ-পথ থেকে অন্তর হোয়ে দাঁড়ান। এত আপ্যায়িত হোয়েও যুবার কথার উত্তর দিতে তাঁর সাহস হলো না, কিন্তু মোগল বৎন বোলেন, বালা তাঁকে হতপ্রজ্ঞা করেন, তাই ঘুণায় তাঁর কথার

উত্তর দিচ্ছেন না, ঐ কথা শুনে হরিণমে জীবীর বিনোদ চক্ষু দিয়ে শতধারার অশ্রু প্রবাহিত হোতে লাগল, তাঁর হৃদয় ফুলে ফুলে কাল্লা আসতে লাগল, বালা তে অর্ধক্ষণীত রোদন চেপে রাখবার নিঃব্রথা চেষ্টা কোতে লাগলেন, লাভের না অশ্রুবাস্পে কণ্ঠরোধ হোয়ে তাঁর বাক্য রহিত হলো। হৃবৃজরঙ্গ মস্তক অবনত কোর তাঁর পায়ের নীচে পোড়তে বালা কিন্তু হস্ত হেলিয়ে তাকে নিষেধ কো ইশারা কোলেন, তুমি এখন এখান থেকে চোলে যাও, নৃবৃজরঙ্গ নৈরাশপূর্ণ বিষয় বোলেন, “আরকি আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে পাবো না? আঃ! প্রফুল্লনেত্রী জী তুমি আমার জন্মের মত বিদায় দিও চিরকালের নিমিত্ত তুমি আমার বনব পাঠিও না। বল দেখি জীবা! আর সত্য সত্যই দেখা সাক্ষাৎ হবে না? আর চন্দ্রমা বিকসিত হয়ে গৃহের বাহিরে যাবে না?”

জীবা বোলেন, “চূপ করো, তাকে কখন হোতে—”

নৃবৃজরঙ্গ। দোহাই আল্লার, অবশ্যই কেন হবে না, জীবা! একবার মুখে বসে ‘হবে’।

জীবা। তুমি যে কি কথা বলি তা তুমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছো না। বিরের কথা হয়ে আমি তা পারিনে, তা উচিত নয়, আমার সাহস হয় না, এখন এসো গিয়ে, আমিও বিদায় হো তোমার মঙ্গল হোক।

নর। তুমি ত আমার মনে মনে প্রজ্ঞা করো না?

জীবা। না না, সে কি কথা! হত কেন কোরবো? কেন আর আমার বাড়িও, দেখতেই ত পাচ্ছো, তোমার আমার কতখানি প্রজ্ঞা।

নর।—জীবা! তবে আমি কি হোলোম, তবে চোলোম।

অহুরাগোন্নত যুবা এই বোলে স



জীবর হস্ত চুষন কোরে, হস্তখানি আপনার  
দলিত বকের উপর একবার চেপে  
দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্থান কোলেন।

যুবা চোলে গেলে পর জীবা যেমন বুখ  
দূরে চেয়ে দেখবেন, দেখেন যে, মেরী  
দটনী হির অচঞ্চল ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে  
দেখি আছেন। মেরী তখন কাঁরাণ্ডার দাঁড়িয়ে  
ছিলেন, যুবক যুবতীদের মধ্যে যে কথাবার্তা  
যে কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, বোধ হয়  
সব শুনেওছেন, আর দেখেওছেন।

মেরীর সঙ্গে চার চক্ষে দেখা হয়ে জীবা অতি-  
অপ্রতিভ হোলেন, গতমতো ধৈর্য  
কেনে একটু থমকে দাঁড়ালেন, আবার  
কিন্তু সেখান থেকে চোলে যেতেন,  
কিন্তু দটনী হির মায়াতেই আটক হয়ে  
ছিলেন, সে ছুটি কেসে তিনি যেতে পারেন  
তা আবার মাথায় তুলে না দিলেও  
যেতে পারেন না। মেরী সাউসীর  
দলিত অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি এখনো  
ঐ অবাকমূর্তি অপ্রকৃতিস্থ যুবতীর  
দিকে রয়েছে, বালা তাই দেখে লজ্জা-  
বলনে মুগ্ধমগ্ন গতিতে বারান্ডার দিকে  
দেখি গেলেন। মেরী শেষে ভিজাস  
কন, “জীবা! কেন এসেছো বাছা?  
কি? ঔষধ চাও? বা ব্যবস্থা চাও?”  
জীবা বোলেন, “হুয়েরি দরকার।”

মেরী।—তবে বরের ভিতর চলো, যখন  
দরকার হবে, এখানে তাই পাবে।  
বালা একপাশে আর তত অপ্রতিভের মতন  
তাঁর চিন্তাভেগ অনেক সূস্থ হয়েছে।

পা আশ্বাস পেয়ে পঞ্জরে বেদনা হয়েছে,  
দস্তাভটী বোলে ঔষধের প্রতীক্ষা কোতে  
গেলেন। ঔষধটি অতি সামান্য, তখন  
সেগ করাও হলো সত্য, কিন্তু বিনা পরি-  
দেপ হলো না। মেরী বোলেন, “আমার  
এত ভ্রান্ত আর এত অনামনস্ক যে, পথ  
হুড়ে অপথে এসে পড়েছিলেন।” ঐ  
বিবাস কোরে জীবর মনের ভাবান্তর  
দখে তাঁর অতিশয় বিস্ময় জন্মেছে, সেই  
থাক্তাকে বারবার বোলতে লাগলেন।

মেরী বোলেন, “হয় ত সে সময় তুমি  
কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তা কোচ্ছিলে, তাই  
তোমার মনের ঠিক ছিল না, এইমাত্র যে  
যুবাকে দেখতে পেলেম, হয় ত তিনি তোমার  
তৎকালীন গ্রাস কোরেছিলেন, তাই পথাপথ  
বিচার কোরে চোলে পায়োনি, জীবা!  
কথা কও না যে? কেমন? তাই ত?” যুবতী  
নিস্তব্ধ আছেন, এক বিন্দু অশ্রু তাঁর নেত্র-  
কোণে এসে দাঁড়াল যুবতী থর থর কোরে  
কাপতে লাগলেন। মেরীর মুখের দিকে মুখ  
তুলে চেয়ে দেখতে তাঁর লজ্জা হলো, দুই  
হস্ত যুগচন্দ্র আচ্ছাদন কোরে কুলে কুলে  
কাঁদতে লাগলেন। দুঃখিনী জীবা যখন  
কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলেন, তাঁর স্নেহময়ী প্রতি-  
বাসিনী বন্ধু বোলেন, “জীবা! যা হয়ে গেছে,  
তা হোয়ে গেছে, তুমি আর কখনই সেই  
যোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে পাবে না।  
চব্বাকির দোষে, আর বিবেচনার ত্রুটিতে  
তোমাকে জীবন গুণগারী দিতে হবে, তুমি  
হেন শেষ গইবিরকুলের কলঙ্কিনী হয়ো না,  
সুপের সংসারমাত্রা তোমার ভাগ্যে যেন গরল-  
ময় হোয়ে উঠে না। তোমার স্বজাতির  
নারীর সমক্ষে অতিশয় নিম্নাক্রম, তাঁদের  
দুঃখ নিঃসঙ্গলি তুমি ভালরূপই অবগত আছ,  
বিশেষতঃ তোমার পিতা একজন গোঁড়া গই-  
বির, কুলদর্পের প্রতি তাঁর অচলা শ্রদ্ধা,  
অচলা ভক্তি, সে কথা আমার বোল হবে  
কেন? তুমিই কোন্ তা না জানো? মন্ডের  
অসাক্ষাতে ভিন্নজাতীর লোকের সঙ্গে কথোপ-  
কথন কোরেছো, এ বিষয়ে শুদ্ধ মনোভাব  
হোলো তোমার প্রাণদণ্ড কোরবে। তবু  
তখন তুমি ফ্রেমজীর বাগদস্তা দ্বী, সেটিও  
একবার স্মরণ করো।”

ফ্রেমজীর নাম শুনে বালাকে যেন কাল-  
সূর্পে দংশন কোলে। সেইরূপ দভয়ে চমকে  
উঠে উচ্চৈঃস্বরে বোলেন, “ভদ্রে! তাঁর নাম  
কোঁরবেন না, আমি কখনই তাঁর হবো না,  
নৃরাজের অসুরাগিনী হোয়ে যদি যুত্বা হয়,  
তাও প্রার্থনীয়, তথাচ আমি তাঁর হব  
না।”

“আঃ হাবী ! আঃ পাগলী ! একেবারে কেপেছিলাম ! চুপ্ করু কেপী, ও কথা কি এখন মুখে আনতে আছে, কথা স্থির হয়ে গেছে, লগ্নপত্র পর্যন্তও হয়ে গেছে, আর কি তা খণ্ডান যায় ? পাশা পোড়ে চুকেছে, আর কি তা কেবে ? তোমায় ফ্রেমজীর সহধর্মিণী হোতেই হবে, অথবা—”

“অথবা কি ?”

“অথবা প্রাণটি হারাবে।”

“তা চারটি হারাবো, তাতেও বরং সুখ আছে, ফ্রেমজীর অঙ্গাঙ্গ হোলে কোনো সুখই নেই। তাঁর পত্নী হোলে কোন্ বিষয়ে সুখী হবো ? কোন্ সুখ আমার জন্তে ভাঙারে মজুত হোয়ে আছে ? তিনি কখনই আমার হবেন না। যোগলকেও আশ্বাস দিয়ে উন্নত কোব্বো না, তবে আর একটিবার মাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে জন্মের মতন বিদায় হবো।”

মেরী সগজীরস্বরে বোল্লেন, “জীবা ! সাবধান ! সেই যে একটিবার মাত্র শেষ সাক্ষাৎ, সেই সাক্ষাৎ সাবধান ! তোমার মনে যে কোন ক-অভিপ্রায় নাই, সে কথা সত্য, আর সে কথা আমিও মানি, তোমার স্বয়ং নিবলঙ্ক নির্মূল : কিন্তু তোমার স্বজাতীয় বিচারপতির। সে কথা শুনবে কেন, তারা তোমায় ছববে, তুমি অপরাধী হবে। তোমার সদাভিপ্রায় তখন কোনো কাঙ্ক্ষাই লাগবে না, তখন শিল-মোহর পোড়ে তোমার অদৃষ্ট চির অবরুদ্ধ হবে।”

“কহে ! আপনি ত আমার দুর্নাম কোব্বেন না ?” জীবা এই কথা বোলে সকাতির দৃষ্টিতে মেরীর মুখপানে চেয়ে রইলে।

“জীবা ! কেন বাছা এমন কথাটা জিজ্ঞাসা কোলে ? আমার প্রাণের জীবা তুমি, আমি কি তোমার দুর্নাম কোত্তে পারি ? তা কখনও সম্ভব নয়।”

“তবে আর ভয় কারে ? দেখাসাক্ষাৎ হলো না হলো, কে তা চোকি দিয়ে দেখতে বাবে ?”

“বৎসে ! তোমার মনে কি এতই ধারণা

হোয়েছে যে, কেউই তা দেখতে পাবে না বাছা ! সিটি তোমার মস্ত ভ্রম। তুমি সাহসে ভরসা বাঁধছো যে, কেউই তা দেখতে পাবে না ? বৎসে ! আমি পুনর্বার বোলছি, তুমি সাবধান হও, সাবধান হও, যা হোয়ে গেছে, তার চারা কি, আর তার সঙ্গে কন্য সাক্ষাৎ করো না। তার চিন্তাহারী সাবধান বাক্যের মধ্যে ভুজঙ্গম-গরল অলক্ষিত হোয়ে আছে, তুমি সেই বিবের আত্মাণ পেয়ে বিবর হোয়েছো, তার চারুকান্তি তোমায় হতভয় হতবুদ্ধি কোরেছে, তাই “তুমি তার ক উন্মাদিনী হোয়েছো, আর সেই জন্মেই ভে কোন সম্ভাবনা নাই মনে কছো। ও জীবা ! বৎসে ! তুমি মৃত্যুরূপ নরীর দ্বারে বেসে দাঁড়িয়ে আছো, সিটি তুমি মনে মনে জানতে পেরেও স্বীকার কছো না। সা আমার মন বুঝবে না, তুমি আমার মাথা হাত দিয়ে দিকি কোরে বল যে, আরও যোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোব্বো না।”

“আপনার মাথার হাত দিয়ে সে আমি বোলতে পারবো না, বোলবোও আর একটিবার মাত্র সেই যোগলের সাক্ষাৎ কোত্তে অল্পমতি করুন, আমার কেবল সেই ভিক্ষাটি দিন।” জীবা কলে কলে কাঁদতে কাঁদতে এই কথাগুলি বোল্লেন।

“না, জীবা ! সে কথা আমি কখনও বোলতে পারবো না, তুমি আর কখনও যোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাবে না, আমার গা ছুয়ে বল যে আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না, আমার কাছে তুমি ক্রোধ দিকি করো, নচেৎ তোমার কাণ্ডকারখানা তোমার পিতামাতা অবশ্যই শুনতে পাবেন।” অপ্রকল্পিত জীবা অগত্যা এই কথা স্বীকার কোল্লেন, “আপনার কাছে দিকি কোছি, আর সে যোগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোব্বো না।” এই কটি কথা মুখদিয়ে বার হবার সময় বালায় হৃদয় কেউ যেন টেনে ছিড়ে ফেলে, কেউ যেন ঝোড়া দিয়ে ঘুচিয়ে ভেঙে দিলে, তখন এইরূপ তাঁর বোধ হোতে লাগল, বালার মাথা ঘুস্তে লাগল, জীবা

নির্মলা হোয়ে পোড়লেন, শেষে আর দাঁড়াতে না পেরে কঁদতে কঁদতে তাঁর হৃৎখে হৃৎখিতা মেয়ের কোলে মূর্ছা গেলেন। মেয়ী অনেক কষ্টে জীবন মূর্ছাভঙ্গ কোরে তাঁর উৎকলিতাকুল চিত্তকে প্রশান্ত কোলেন, দুঃখিনী জীবা একটু সুস্থ হয়েছেন, একটু বলও পেয়েছেন, এক্ষণে অনায়াসেই ঘরে ফিরে যেতে পারেন, তাঁর পরামর্শদাত্রী মিত্রের নিকট বিদায় হয়ে বাড়ীর বাইরে যেমন সেই সময়সীমায় এসেছেন, এসে দেখেন যে, কতকগুলি পুত্র, গিস থানাদার একটি যুবতী তানীকে সঙ্গে কোরে পূজ্যপাদ মেয়ীর বাড়ীর দিকে হন হন কোরে চোলে এসেছে। মুসলমানীর চুলগুলো আনু খালু চারি দিকে খুলে পোড়েছে, চৌক মুখ সজ্জাকার হয়ে ঘন ঘন শ্বাস বোছে। দেখে ব্যস্ত হল, হয় সে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে নয় নাথি অগ্নিমুক্তি হয়েছে।

ক্রোধমত্তা সেই খালোকটি মেয়ীর দিকে আসে বোলে, “ঐ খুনী দজ্জান বুড়ীকে গেরে-তে করো, ঐ আমার ঔষধ বোলে যে বিষ তাই খেয়ে আমার স্বামীর প্রাণ হরণ করেছে।” একটা শিশি, তার আধা লাড়ি পর্যন্ত কালরঙ্গের দ্বাবে পরিপূর্ণ, ঐ দলমানী সেই শিশিটি উচু করে দানের উচ্চৈশ্বরে বোলতে লাগল, “দেখো ভাই সকল, এই দেখো! এই তার কষ্ট একে সে ঔষধ বলে, তোমরা তার কথায় ভুলো না, এ ঔষধ নয়, বিষ। হুলাহল বিষ, খেয়ে আমার প্রাণের সমান প্রিয় স্বামী প্রাণত্যাগ কোরেছেন। হায় হায়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট! আমি কি হতভাগিনী! হাতে তুলে বিষ খাওয়াবে, এই কালকূট আমি আপনি হাতে কোরে তার মুখে তুলে দিইছি। হায়! আমার ভাগ্যে এই দুঃখ লেখা ছিল, আমি বুঝতে পেরে এত গুণের স্বামীটিকে হারালেম, ও মাগিরিই বা কি ছাতি! মেয়েমানুষের এত-খানি বুকের পাটা হয়, কেউ কখন দেখেওনি, স্নেহওনি। শুকে ধরো, সুবাদারের কাছে

লয়ে চলো। “তবে ধরে লয়ে চলো, তবে ধরে লয়ে চলো,” এই কথা বোলে থানাদারেরা, চৈচিয়ে উঠল। মেয়ী নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন, শেষে বোলেন, “একটু বিলম্ব করো, পবিত্র ক্রুশের দোহাই দিয়ে, নির্ভয়ে শপথ কোরে বোলছি, আমি কিছুই জানিনে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি নিদোষী, আমার অনপকারী ঔষধ খেয়ে সে মরবে যদি মৃত্যু হোয়ে থাকে, তবে সেটি বিধাতার নির্বন্ধ, তার নিয়তিই ঐ পরাজয়।” একজন থানাদার বোলে, “ভাল, তবে বাকীটুকু তুমি আপনি খাও, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস রাখো।”

মেয়ী বোলেন, “না—আমি তা খেতে পারিনে, এ ঔষধটি সকলের পক্ষেই অপকারী সত্য, তবে কি না আমি না কি এ-এক রোগ ভোগ করছি, তাই আমার পক্ষে অপকারী, কি সাংঘাতিক হোলেও হতে পারে সেই বিবেচনার বাকীটুকু আমি খাবো না।” ঐ কথা শুনে থানাদারেরা ধোঁ হো হো করে হেসে উঠে, বোলে, “সাংঘাতিক হবে যে, তা আমরা বুঝতে পেরেছি, সেটা আর বোলে হৃৎখে পেতে হবে না। তবে আর বিলম্ব কেন? চলো, শুকে ধরে লয়ে যাও।”

জীবা বোলেন, “একটু দেরি করো, মেয়ী না খান, আমি খাবো।” মেয়ী যে নিদোষী, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, আর তাঁর কথার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা আছে যে, তাঁর হোয়ে আমি তা অনায়াসেই পান কোরে পারি। খেলে যদি কোনো মন্দ না হয়, তবে তোমরা সমস্তই হরণ যেখান থেকে এসেছো, সেইখানে ফিরে যাবে ত?”

থানাদারেরা বোলে, “আচ্ছা, তা খেলে আমরা ফিরে যাব।”

জীবন মনে কোন সংশয় নাই, তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোলেন, “তবে শিশিটি আমার দাও।” এখন মুসলমানীর ক্রোধ অনেক সাম্য হোয়েছে, সে একটু এগিয়ে, জীবন স্মৃখে শিশিটি ধোলে, জীবা শিশিটি লয়ে মুখে ঢেলে দিতে যান,

এমন সময় পশ্চাদিক থেকে কেউ তাঁর হাতখানি চেপে ধোলে,—বজ্রের মতন শক্ত কোরে চেপে ধোলে, বালা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, সেই যোগল পুরুষ ছুর-ছুরঙ্গ !”

যোগল টেচিয়র বালেন “আঃ ! ছুর্কোথ ! তুমি,—ও কি কোচো ? মেরী যে ঔষধ দিয়ে-ছেন, এ সে ঔষধ কি না, সেটা আগে তদারক কোরে জানো, যদি মেরী বলেন, তা ! সেই ঔষধই বটে, তবে তুমি খেতে চাও খাও ।”

মুসলমানীর মুখ শুথিয়ে একটুখানি হোয়ে গেল, ঠকঠক কোরে কাঁপতে লাগল, বোলে, “শিশিটি তবে ফিরিয়ে দাও, মেরীর প্রতি যখন তোমার এত শ্রদ্ধা আর এত বিশ্বাস, তাতে কোরে আমিও নিঃসন্দেহ হোলেম যে, তাঁর কোনো অপরাধ নাই ।”

নরজরঙ্গ বোলেন, “তুমি ত নিঃসন্দেহ হয়েছো সত্য, এখন কিন্তু আমাদের নিঃসন্দেহ হবার পালা !” কোঁড়ে ঘূবার চোক দিয়ে তখন অগ্নির হাওয়া নির্গত হোচ্ছিল। যোগল বোলেন, “মেরী ! একটি চেকে দেখ দেখি, এই ঔষধই কি তাঁর স্বামীকে পাড়িয়ে-ছিল ?” মেরী বোলেন, “না, এ ঔষধ পাঠাব কেন ? এ তো যথার্থই কালকূট বিষ, বা হোক জীবার আর আমার জীবন তোমা হোতেই রক্ষা হলো, তুমি আমাদের উভয়েরই জীবন-নাশ। তুমি আমার আশীর্বাদে পাত্র হয়েছো, তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক, আমি তোমায় মন খুলে আশীর্বাদ কোচ্ছি, জীবার প্রাণ দিয়েছো বোলে সেও তোমায় সুরুতুজ-হৃদয়ে সাধুবাদ কোবুবে, এ উপকার সে কখনই বিস্মৃত হবে না ।” মেরী শিশিটি তদন্ত কোরে দেখে মুক্তকণ্ঠে বোলেন, আজ প্রাতে যে শিশি কোরে ঔষধ দিছিলেন, এ সেই শিশি বটে, কিন্তু সে ঔষধ নয় । তিনি শপথ পূর্বক প্রতিজ্ঞা কোরে বোলতে পারেন, তাঁর ঔষধ ফেলে দিয়ে, কেউ তাতে বিষ ভোজে রেখে দিয়েছে ।

যোগল বোলেন, “যারা তা কোরেছে,

তাদের আমি জানি। থানাদার ! ঐ কাল-নাগিনী নিলজ্জ মুসলমানীকে আগে গেরে-প্তার করো, সে আপনায় স্বামীকে নিজহস্তে খুন কোরে,—অতি ঘণিত, অতি নৃশংসরূপে খুন কোরে, এখন কেমন অমানবদনে মেরীর উপর সেই খুনের তহমত দিচ্ছে । এখন শোক দুঃখের কেমন জাল মূর্তি দেখাতে দেখো, স্বযোগ পেলে আরও কত নিরপ-রাধীর পবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত কোরে পারে, তাতে সে সদ্ধৃতিত হয় না ।”

ঐ কথা শুনে থানাদারেরা সেই মুসল-মানীকে গেরেপ্তার কোলে । চতুর্দিকে লোকারণ্য, সেই জনতার মধ্যে একেবারে চারিদিক থেকে একটি আতঙ্কের শব্দ উঠল ।

নরজরঙ্গ উঠেঃখরে বোলেন, “বাসুজ্যাস নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বৈত আছে, তাকে গেরেপ্তার কোবে স্বাদারের কাছে লয়ে যাও, সেই ব্যক্তিই ঐ কালবিষ প্রদান করে তার বোগেই এই মহা কাণ্ডটি ঘটেছে । কতক অর্থের লোভে, কতক ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোকটির প্রতি অনুরাগানন্ত হোয়ে তার ঐ ছুই প্রবৃত্তি হয়ে । তবে তোমরা এখন চোলে যাও, আর একতিলও বিলম্ব করো না, আমি যে যে কথা বোলেম, তার প্রমাণ আছে, আমি তা প্রতিপন্ন কোরে দিতে পারুবো, প্রয়োজন হোলে দর্শাতেও পারুবো ।”

থানাদারেরাও চলে গেলা, ভিড়ও কোঁদে পড়ল, মেরী আর জীবা পুনরায় একাকিনী হোলেন । সুরুতুজ মেরী উঠেঃখরে বোলেন, “বাছা জীবা ! তোমার অতি সদয় প্রকৃতি, তোমার মনে কোন ঘোর পেষ নাই, তুমি অতি মহাত্মা মেয়ে, তোমার এ ক্রপাক্ষণ আমি কিরূপে পরিশোধ কোবুবো, তাই ভাবছি । এখনো আমার প্রাণ কাঁপছে, না জানি, কি সর্বনাশই ঘটতো, ভাগ্যে তিনি ছিলেন, তাই রক্ষা । যোগল যথার্থই মহাশয় ব্যক্তি, তিনি এসে পোড়েছিলেন বোলে তাই এ বাছা বৈতে গেলেম তাঁর প্রসাদে আমরা উদ্ধারই প্রাপ্ত হই পেরেছি । সংসারে যে

এত প্রভাবনা আছে, পূর্বে কখন যোগেও মনে করিনি, এরূপ দক্ষাল জীলোক বাপের জন্মেও কখন দেখিনি, কাণেও কখন শুনিনি, কি দুই-বুড়ি! তাঁর কেতরাজি দেখে অবাক হোয়ে গেছি। দেখ দেখি, কি বোরচক্রই খেলেছে। কি করেবি সাজিয়েছে, যোগল কি কোয়ে সন্ধান জানলেন, তা শুন্তে হবে। আপাতত ভূমি বাড়ী গিয়ে যে অস্ত্রে বিলম্ব হোয়েছে, বুঝিয়ে বলোগে, আর যে কথা খীতার কোয়েছো, তা যেন মরণ থাকে।”

জীবা বোলেন, “কি বালাই, যে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিলে, তারে ছুটো অতুলনর বিনয় কোরে কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারবো না। তিনি যে আমার প্রাণদান দিচ্ছেন।”

মেরী বোলেন, “কৃতজ্ঞতা না জানালে ধর্ম থাকে না সভ্য, কিন্তু লোকের অসাক্ষাতে লুকিয়ে ছাপিয়ে দেখা করবার প্রয়োজন করে না, তাই বলে সেই প্রতিশ্রুত কথাটি ভুলে যেও না যেন, সেটি আর এবার মরণ কোরো, তবে এখন বাড়ী যাও।”

এদিকে জীবির মমতাজ পিতামাতা এক-মাত্র সন্তানকে অনেকক্ষণ মা দেখতে পেয়ে বৎসহারা পাণ্ডুর ভাব ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছিলেন, এত বিলম্ব কখনই হয় না, তাঁদের মনে কত প্রকারই ভয় এসে উপস্থিত হোচ্ছিল, তাঁরা কত আশকাই করনা কোচ্ছিলেন। একপে হুহিতাকে জলক্ষে গৃহে আগত দেখে আক্সাদে পুলকিত হোলেন। জীবা পূর্বদিবসের দৈববিড়ম্বনা অবগত কোরিয়ে তিনি মেরীর বাড়ীতে গেছিলেন বোলেন, সেখানে যে অস্ত্রে আবদ্ধ হোয়ে থাকতে হোয়েছিল, সে বৃত্তান্তও সমুদয় অবগত করালেন। শঠ হুহিকনী বজ্জাত মুসলমানীকে যৎপরোনাস্তি মিস্লামল কোরে মুক্তকণ্ঠে মেরীর গুণ গাইতে লাগলেন। জীবা সেই শিশির পের পান কোন্ডে চেয়েছিলেন বোলে রসতম তাঁকে, বিস্তর ভিরকায় কোলেন, কিন্তু তাঁর সরল অন্তঃকরণ যে উত্তরসাধক হোয়ে তাঁকে তা পান কোন্ডে উপদেশ দিছিল, বালার সেই সন্ততাওনের বিস্তর অনুরাগও কোন্ডে লাগ-

লেন। সেই ব্যাপারের চরম কল কি হয়, তাই জানবার আবশ্যক বিবেচনা কোরে, রসতম তখনই কেল্লাভিমুখে চোলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হোয়ে দেখেন, বাদারের বাড়ীর স্রুমুখে সেই ঘুবা যোগল, সেই মুসলমানী, সেই ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞ, আর সেই মধ্যান্তক দুঃখিতা অথচ ঐ ব্যাপারে আটে পিটে আবদ্ধ মেরী সাউসী এক স্থানে একত্রে জমা হোয়েছেন। বিচারের মুখে প্রকাশ হোয়ে পোড়ল যে, হুহিকনী (সত্য-ধর্মের আলোক) নামে এক ব্যক্তি সওদাগর হঠাৎ পীড়িত হয়, তারই জী অনেক দিনাবধি ষড়চক্রের ফাঁদ পেতে পেতে বেড়াচ্ছিল, সে এই স্রুমুখ পেয়ে স্বামীকে বিমপান করাইবার কৌশল করে। তার ঐ দুঃখিসম্মি সকল করবার নিমিত্ত বাসু জাসু নামে ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞের কাছে মনের অভি-প্রের্ত ব্যক্ত করে। বাসুজাসু জীলোকটির বাসনার সম্মত হোয়ে বোলেন, “মেরী সাউসী ঔষধের পরিবর্তে বিষ দিচ্ছে, এই কথা প্রচার কোরে দিবে, তার নামে যদি অপবাদ করা হয়, তবে তিনি একাধো যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন।” ডাকিনী মুসলমানী বৈজ্ঞের কৌশলায়রূপ চোলেতে ওদেওই সম্মতা হয়ে মেজপুটে অশ্রুতার লয়ে, মেরীর বাড়ীতে উপস্থিত হলো। অতি কাতর হোয়ে হাতযোড় কোরে জানালে, তার প্রিয় স্বামী উৎকট পীড়িত, তিনি যদি একবার অস্ত্রগ্রহ কোরে দেখে তার প্রাণদান দেন। মেরী রোগীকে দেখে একটি পেয় ব্যবস্থা করেন, তত্ত্বির পথ্যাপথ্যের আর সেবা-শুশ্রূষারও অনেক উপদেশ দেন। হুচারণী মুসলমানী ঔষধের শিশিটি হস্তগত কোরে ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞকে ডেকে পাঠালে, সে এসে শিশির ঔষধটি একবার নিরীক্ষণ কোরেই চোলে গেল। বাসুজাসু যখন পুনর্বার রোগীকে দেখতে আসে, সেই সময় একটি প্রাণ-সাংঘাতিক বিষ, সঙ্গে কোরে লোয়ে আসে। তার সেই বিষ আর মেরীর প্রেরিত ঔষধ ঠিক এক আকার, এক প্রকার, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ছিল না। ঔষধের রঙ আর আকারের

সঙ্গে এক কোরেই বিয়টি আনা হয়। ঐ বিষ রোগীকে নির্ভয়ে সেবন করান হলো, সে তা পান কোরেই তখন প্রাণত্যাগ কোলো, অনেক যত্নে পেয়েই প্রাণটি বার হয়। হলোহলটির ক্রম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার পর এই উপস্থিত উপলক্ষের নিমিত্ত তা থেকে কিছু বিষ আলাহিদা কোরে রেখে দেওয়া হলো। সেইটুকু শেষে মেরী সাউদীর প্রদত্ত শিশির মধ্যে ঢেলে রেখে, তাতে যে ভ্রম ছিল, যা সেদিন কোলো রোগী হয় ত আরোগ্যই হতে পারতো, সে সমুদয় বাসুজাসু অল্প শিশিতে ঢেলে আপনার কাছে রেখে দিলে। এদিকে কাজ নিকেশ হোয়ে গেলে মৃতের বিধবাস্ত্রী আপনার নাট্যক্রিয়ার অভিনয় দেখাতে মেরীর বাড়ীতে চোলে গেল। তখন মনে কোরেছিল, তাদের সে কোশলের লক্ষ্যন কেউই জানতে পারবে না। নুরুদ্দীন সওদাগর একটি কাফরী বাসক প্রতিপালন কোতো, তারি কথা প্রমাণ, সেই অর্থের দুকিয়াগুলি শেষে প্রকাশ হোয়ে পড়ে। এই বালকটি প্রভুর উৎকট পীড়া দেখে যথার্থই আন্তরিক দুঃখিত হোয়েছিল, সে কর্তীর কথা না শুনেও চূপ চূপে মনিবের বিছানার একপাশে বোসে, একখানি পাখা লয়ে তারে বাতাস কোতো। রোগীর মুখের উপর মাছি বোসেছিল, তাই সে বাতাস কোরে তাড়াছিল, এমন সময়ে কর্তীর পায়ের সাড়া পেয়ে আর তার সঙ্গে অপর এক ব্যক্তিকে আস্তে দেখে সে সেখান থেকে উঠে যেতে বাধ্য হলো, তারে দেখে কর্তী ক্রুদ্ধ হবেন ভেবে সে বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে একটা সিঁদুকের পাশে গিয়ে লুকোলো, সিঁদুকটি নিকটেই ছিল। ঘরের দরজাটি খুলে গেল, বালকটি তার শব্দ শুন্তে পেল, তার তখন দেখবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটি পা টিপে টিপে রোগীর বিছানার পাশে এসে তার সঙ্গে যে এসেছিল, তার কাণে কাণে কি যত্নে কোভে লাগল, এত ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কইতে লাগল যে, অনেক চেষ্টা কোরেও বালক দাস তাদের একটি শব্দও শ্রুতে পালে

না। একটু পরেই পুরুষটি চোলে গেল, কিছু গৃহিণী সেই ঘরেতেই রইলেন, তাই বালকটি বাইরে বেরিয়ে আস্তে পালো না, তার তখন বেরিয়ে আসবার কোনো উপায় ছিল না। এক ঘণ্টার পর সেই পুরুষটি আবার ফিরে এলো, তারে দেখে স্ত্রীলোকটি এই কথা বোলে সম্ভাষণ কোলে, “কি হলো বাসু আসু? সঙ্গে কোরে এনেছো কি?”

বাসু। চূপ চূপ! গোল করো না, মাদরকার, তা সঙ্গেই আছে।

সেই চিরদাস এখন দুটো শিশির ঠান ঠানি শব্দ শুন্তে পেল, শিশি দুটো গায় গায় ঠেকাঠেকি হোয়ে যেমন ঠন ঠন শব্দ হোতে লাগল, সেই সময় তারাত ফিস্ ফিস্ কোরে কি গুঢ় পরামর্শ কোভে লাগল। তার পর রোগীর নিকটে গিয়ে তার মুখ চিরে কি গিলিয়ে দিলে। বালকটি মনে কোলে, হয়ত রোগীকে উদ্ধেই খাইয়ে দিলে। একটু পরে তারা দুজনেই চোলে গেল। তার পরেই নুরুদ্দীনের অন্তর্দাহ আর শয্যাকটক উপস্থিত। রোগী অস্থির হোয়ে এপাশ ওপাশ কোভে লাগল। কোনো পাশেই তৃপ্তি বোধ হোচ্ছিল না, মহাশ্বাসের জ্বালায় ঘন ঘন নিশ্বাস পোড়তে লাগল, গৌ গৌ শব্দে গোঙরাতে লাগল, যমযাতনার জ্বালা ছটফট কোভে কোভে এক একবার বুকে বুকে উঠবার চেষ্টা কোভে লাগল। বিছানাশুক ভোলপাড় হোয়ে পাশকথানি নড়ে নড়ে উঠতে লাগল। বালকটি এই সকল কাণ্ড চক্ষে দেখে আর সে চূপ কোরে থাকতে পালে না সে তখন সিঁদুকের নির্জন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে তার তত প্রকল্পিত মনিবের বিকৃত মুখশ্রী ঠাউরে ঠাউরে দেখতে লাগল। নুরুদ্দীনের মুখকান্তি বিবর্ণ দেখে, আসন্ন-মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ অল্পভব কোরে তার মনে হঠাৎ এই কথা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল,—কর্তী তার স্বামীকে কালকূট প্রদান কোরেছে!! বালক দেখলে, তার সেই একমাত্র আশ্রয় তার হৃদয়ে অনাথ হয়ে পোড়ে আছে, অন্তর্দাহ আর সর্বশরীর নেচে নেচে উঠু হয়ে উঠছে,

যেন যেন আক্কেপ হয়ে হস্তপদগুলি যেন মুচ-  
ড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলছে। মূনিবের দুর্গতি দেখে  
বালকের অন্তঃকরণে যেন একটি কালশিরে  
পৌড়ল, তার হৃদয় যেন কেউ মোড়া দিয়ে  
ভেঙ্গে ফেলে। কি কোরবে, আর কি কোরেই  
বা কি কোত্তে হয়, সে তা কিছুই জানে না,  
বালক বই ত নয়, জান্বেই বা কি কোরে ?  
তার আসন্নমৃত্যু মূনিবের গেলানি কাতরানি  
শ্রান, আর স্বচক্ষে তার দুর্গতি দেখে সে  
যেন অন্ধকার দেখতে লাগল। বালক অজস্র  
অশ্রুপাত কোচ্ছে, এমন সময় পুনর্বার পারের  
শব্দ শুনতে পেলো, কারা যেন আসছে,  
বালকও পুনর্বার সেই সিন্দুকের কোণে সেয়ে  
অবগুপ্ত হইলো। দয়াকৃতি আস্তে আস্তে  
খলে গেল, বালক তার শব্দ শুনতে পেলো,  
তার পরেই অক্লট, ফিস্ ফিস্ শব্দের ব্যাকার  
তার কর্ণস্পর্শ কোলে। তারা চোলে গেল,  
রেকাটি পুনরায় অবরুদ্ধ হলো, এক্ষণে  
কোনো দিকে কোন শব্দ নাই, সব নিরুন্ম  
নিশুন্ম, কেবল মস্তদীর্ঘেীড়িত সেই নুক-  
কানের গেলানি শব্দ, আর তার অনলদগ্ধবৎ  
গর্জনার এবং নিম্নীলিত স্রান চক্ষুদ্বয় বেড়ে  
যে সকল মক্ষিকা বন বন হবে বিষাদ-ব্যাকার  
কোচ্ছিল,--সেই শব্দ—তদ্বির আর কোনো  
শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটু পরেই একটি  
গভীর প্রাণবাতী নিশ্বাস নিঃসারিত হয়ে তার  
পরকণ্ঠেই ঘোর ভয়ঙ্কর নিশুন্ম ঐ প্রাণবাতী  
নিশ্বাসের অহুগামী হলো। তাই দেখে  
সেই চিরদাস মনে কোলে, মিশ্র তার  
প্রভুর অশেষ দুর্গতির চির-অবসান হলো।

বালকটি বিবেচনা কোলে, তার দুর্দশ  
নিষ্ঠুর কর্ত্তী আবার এখনই ফিরে আসবে,  
সেই ভয়ে সে পুনরায় সেই সিন্দুকের পাশে  
গিয়ে লুকিয়ে রইল, কি জানি, পাছে প্রকাশ  
হয়ে পড়ে, তাই তখন সজোরে নিশ্বাস  
ফেলতেও তার সাহস হোচ্ছিল না। ফলে  
সে যা সন্দেহ কোরেছিল, তাই শেষে সপ্র-  
মাণ হলো। প্রালোকটি তখনি ফিরে এসে  
নিঃশব্দে খামীর বিছানার পাশে গিয়ে  
দাঁড়াল, দেখলে, পতির প্রাণবিরোগ হয়েছে,

তাই দেখে বিপর্যয় শোকের ছলনা কোরে  
উগাদিনী সেজে তীরের স্রায় ঘরে থেকে  
ছুটে বেরিয়ে গেল। বালক দাস তখন সিন্দু-  
কের নীচে থেকে বেরিয়ে, দৌড়ে রাস্তায়  
এসে দাঁড়াল, কি কোত্তে হবে, তা তখনও  
সে স্থির কোত্তে পাচ্ছিল না। রোগীর ঘরে  
গোপন থেকে যে ব্যাপারগুলি স্বচক্ষে  
দেখেছে,অকর্ণে শুনেছে, সেগুলি কারে যে  
অবগত করাবে, তাও তখন ঠিক কোত্তে  
পাচ্ছিল না। তার একটি আত্মীয় যুবা  
মোগল নুরজরদের অহুসেবায় নিযুক্ত ছিল,  
বালকটি দৌড়ে তারি কাছে গেল। মোগল  
যুবা সে সময় সোথার হবার উদ্যোগ কোচ্ছি-  
লেন। সপ্তদাগরের চিরদাসের উৎকণ্ঠিত  
মূর্ত্তি দর্শন কোরে ভরে চমকে উঠে, কি জন্ত  
সে সেখানে এসেছে, সেই কথা তাকে  
বোলতে বোলেন। বালক বোলে, এখানে  
রাস্তায় না বোলে বাড়ীর ভিতর চলুন, সেই-  
খানে সব বৃত্তান্ত শুন্তে পাবেন। যুবা  
তাই কোলেন, ঘরের মধ্যে গিয়ে সকল  
সরেওয়ারগুলি শুলেন। শুনে তারে এই  
পরামর্শ দিলেন, সেখানে গিয়ে গোলমাল  
না কোত্তে চূপচাপ হয়ে থাকে, তারপর  
তিনি তারে ডেকে পাঠাবেন। মোগল যুবর  
মনে এই সন্দেহ হলো, মেরী সাউসীকে নষ্ট  
কদ্দবার নিমিত্ত ভিতরে ভিতরে কোনো  
দুরভিসন্ধির চক্র চোলেছে। মেরী সাউসী  
যে সেই সপ্তদাগরের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়ে-  
ছিলেন, সে কথা যুবা পূর্বে জানতেন, তাই  
তিনি তখনিই মেরীর বাড়ীমুখো দৌড়িলেন।  
তীয় প্রিয়তমা জীবর প্রাণ যে সময় রক্ষা  
হবে, ঠিক সেই সময় সাউসীর বাড়ীতে গিয়ে  
উপস্থিত হোলেন। তার পৌহিতে যুহুর্ভ-  
কাল মাত্র বিলম্ব হোলে সরলা জীবা সপ্তদা-  
গরের বিধবা স্রীর নিষ্ঠুর চক্রে পোড়ে মারা  
গেছিলেন আর কি !! সে বৃত্তান্ত পূর্বেই  
বলা হোয়েছে।

চিরদাস বালক একটি একটি কোরে সব  
কথা স্পষ্ট প্রমাণ কোরে দেওয়াতে, আর  
মেরী সাউসীর দেয় ঔষধ ব্রাহ্মণ বৈতের



কাছে শিশি শুদ্ধ ধরা পড়াতে, অপরাধী ছজনকে শাস্তির হুকুম দেওয়া ভিন্ন বিচারের বাকী আর কিছুই ছিল না। শ্রীলোকটির উপর মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হয়ে ব্রাহ্মণ বৈভবের প্রতি আজীবন কারাবাসের আদেশ হলো। সেই গইবিরকড়া জীবা আর তাঁর প্রতি ভদ্গত-চিত্ত সেই মোগল ধূবা নরজরজ যদি নাট্য-ক্রিয়ার মূর্তি ধারণ কোরে ঐ মিষ্টর মৃত্যু-অভিনয়ে দর্শন না দিতেন, তবে সে সকল বস্তুর তত্ত্ব বাতলারূপে অবগত হওয়া দুর্ঘট হতো। ঐ রিযাদপূর্ণ নিরানন্দ অভিনয় থেকে শুরু কোরে, আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা প্রফুল্ল-অভিনয় দেখিয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করবো। একদা নোকোজ সমারোহ উপলক্ষে,—পারস্যদেশে নূতন বৎসরের পর্বাছে বোধে সহর সজীব আনন্দে প্রফুল্লিত হয়। গইবিরেরা মহা আড়ম্বর কোরে দলে দলে চোলেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত তাদের সেই পবিত্র অনল দর্শন কোন্তে চোলেছে। পাড়ী বোড়া পালুকী প্রভৃতি যাতারাতের নানা প্রকার বাহনে বাস্তা জুড়ে নিয়েছে, পথঘাট লোকারণ্য। তুরী ভেরী জয়চাক প্রভৃতি নানা মনোহর বাস্তের তুমুল আনন্দ-কোলাহল হোচ্ছে, সকলের মন প্রগল্ভ উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে একে-বারে সহস্র সহস্র স্বর ভৈরবনাদ কোরে ধরনী কম্পিত কোরে তুলছে, তারা প্রফুল্ল উল্লাসে উন্নত হয়ে নববৎসর আগমনের আনন্দ ঘোষণা কোচ্ছে। পবিত্র ভক্তি সঙ্গ্রাম করবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে মহা আড়ম্বরের, ভীম কলরবের স্রোত চোলেছে, কলরবে কলরবে কর্ণ বধির কোরে তুলছে, সহর ভোলপাড় কোরে ফেলছে, 'সহরের তাবৎ পারস্য আনন্দে মেতে উঠেছে, কেউ কারও মুখ অপেক্ষা কোচ্ছে না, চোট বড় ভাবতেই আনন্দের ডুকানে পোড়ে ভাসতে ভাসতে চোলেছে। অশীতিপর ভীমরথী বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও লাগী ভর কোরে কুজ গোতে গোতে চোলেছে, অর্ধ পন্থা কৌকড় হয়ে হামা-গুড়ি দিতে দিতে বিছানা ছেড়ে রাস্তার

পোড়েছে। যুবক যুবতীরা কেউ হেঁটে, কেউ বাহনে চোলেছে, বালক বালিকারা আনন্দে নাচতে নাচতে দৌড়েছে, শিশু সন্তানেরা বয়লাহসারে কেউ কাঁধে, কেউ কোলে উঠে হাসতে হাসতে মধুর আঁধ আঁধ বোল্‌বোল্‌তে বোল্‌তে অগ্রসর হোচ্ছে। কারো বা হাতে ধোরে হাঁটি হাঁটি পা পা কোরে গোয়ে যাচ্ছে। কেউ ছড়া কাটছে, কেউ গান পাচ্ছে, কেউ নৃত্য কোচ্ছে, সহস্রে বক্ত পারসী ছিল, উল্লাসের তরঙ্গে ভেসে চোলেছে।

রবিবন্ধেবের প্রদীপ্ত লোহিতবাগে পূর্বা-ধর চিত্রিত হবার কিছু পূর্বে কত-ক্ষণে পারস্য-সমারোহ রাস্তা দিয়ে চোলে যাবে, তাই দেখবার নিমিত্ত লোক লম-বাস্ত হলো। গৃহস্থের মেয়ে ছেলেরা কেউ চিক্‌ফেলা বারাণ্ডায়, কেউ ফিলিমিলি-ওয়াল খড়্‌খড়ির পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কোন্তে লাগল। পুরুষেরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লড়ে কোরে, সার বেঁধে সরে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে গেছে। বুড়োবুড়ীরাও লাগী হাতে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারও বারাণ্ডার উপর, কারও ছাত্তের উপর, কারও রকের উপর লোক গিস্‌গিস কোচ্ছে। সকলেরই তামাসা দেখবার লাগল।

এদিকে গইবিরেরা আর গইবির-পুরো-চিত্তেরা রাজি শেষে ব্রাহ্মমূর্তি দর্শনের প্রত্যাশা কোরে পূর্বদিকে একদূটে নিরীক্ষণ কোরে আছে, রবিবন্ধেবের প্রথম কিরণছটা পৃথিবীতে পতিত হোতে দেখে তারা তাঁকে নমস্কার কোরে কতক্ষণে জেম্‌জেমে অর্বাং প্রাতঃসন্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপন কর্ণবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছে। গইবিরদের দারু নামক পুরোহিত আর ডিস্তুরী নামক ফুলাচারী বরকের ভ্রাতৃভ্রাত্রে আবৃত হোরে আর দক্ষিণ হস্ত অতি সাবধানে সুরীর্ষ আঙিনে সমাচ্ছাদিত কোরে একদূটে প্রতীক্ষা কোন্তে থাকে। প্রভাকরের প্রভাত-দীপ্তির প্রথম ঐষৎ ছটা অন্নমাত্র দর্শন কোরেই লাগর-কন্ডোলের ভ্রাতৃ ভীমনাদে

চাঁকর কোরে উঠে, আর সেই সময় পবিত্র ভাস্কর ঘণ্টার অগ্রে প্রণত হোয়ে, অনন্ত-ভাবনায় ক্রতবেগে তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-আহ্নিকের মন্ত্র আবৃত্তি কোত্তে থাকে। তৎকালীন তাদের জপতপের প্রতি তদুগত-চিন্তের ব্যাঘাত জন্মায়, এমন কোনো বিষয় বা বাধা সম্মুখে উপস্থিত হোতে দেয় না। সুবারা তাদের প্রজ্ঞাল্পন আচার্য্যদ্বয়ের অঙ্ক-করণ কোরে আপনাদের কেম্‌জেমের প্রাতঃসন্ধ্যার) মন্ত্রগুলি আঙড়াতে থাকে, তারপর চিরপ্রচলিত পবিত্র অনল-অর্চনার নিমিত্ত সেই প্রথম দেবমন্দিরে স্থাবর জন্তে যখন তাদের আহ্বান করে, তখন তারা আপনাদের প্রাতঃ উপাসনার ক্ষান্ত হোয়ে সমারোহের মধ্যে সমবেত হয়।

পারসীরা এই দিনকে সিক্রিযোগ জ্ঞান করে। অনেক শিশুসন্তানেরা এই শুভদিনে শুভলগ্নে বাগদত্তা হোয়ে তাদের বিবাহের লগ্নপত্র স্থির হোয়ে থাকে। যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোয়েছে, তারা এই মহেন্দ্রযোগে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। যারা সংসারপ্রমে প্রবেশ কোরবে, তারাও প্রতিপত্তি লাভ কোরবে, বোলে এই দিনে কর্তৃকাজ সুর কোরে দেয়, অনেক আবার চিরসুখের প্রত্যাশা কোরে এই শুভযোগে জপতপ কোত্তে বসে যায়। নারিকেলবৃক্ষের উপবন থেকে সেই প্রকাণ্ড সমারোহ নির্গত হবার প্রথা আছে। একদল পুরুষ বিচিত্র রেসমী বস্ত্র আর উজ্জ্বল বৃতীদার কিংখাপের পোশাক কোরে অতি মনোহর সুসজ্জিত অখের উপর সোয়ার হোয়ে আগে আগে যায়, তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গুলো-কেরা স্বর্ণালঙ্কারের ভারে অবনত হোতে হোতে পালকীর মধ্যে বোসে গমন করে, তাদের সঙ্গে দাসদাসীও যায়, তারা রূপার পাঞ্জে ফল সাজিয়ে লয়, অস্ত্রের তারা বাজনায় সঙ্গে সুর মিলিয়ে মনপ্রফুল্লকর সরস গান গাইতে গাইতে আমোদিনী হোতে হোতে চলে। সমারোহ গড়ের মাঠ হোয়ে কেজার মধ্যে প্রবেশ করে, সেখান থেকে ইংরেজী নামক স্থানে সেই পবিত্র অনল-মন্দিরে উপ-

স্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান পণ্ডুগিস প্রভৃতি সকলেই ঐ সমারোহে যোগ দেয়, সকলেই একরূপ আমোদে উল্লাসিত হয়, আর সকলেই স্বাগতবাদ কোরে নববৎসরের প্রাতঃ-উদয়ের অভ্যর্থনা করে।

এই ফুলবান জনতার মধ্যে যার দিকে চেরে দেখবে, তার মুখেই হাসি, তার মুখেই আনন্দ দেখতে পাবে, সকলেই আমোদে প্রফুল্লিত, কেবল একমাত্র অভাগিনী জীবা য়ান আর বিষয়। সুন্দরী পাল্কির মধ্যে বোসে নিরানন্দমনে ভিড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছেন, কেবল মধ্যে মধ্যে দুর্ভার হৃদয় কোল হস্তদ্বারা চেপে ধরে একটি একটি কালঘাতিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিলেন। কি দ্রী, কি পুরুষ এমন দুঃখের দুঃখী কেউই ছিল না যে, বালা তার কাছে মনের আক্ষেপ ব্যক্ত করেন, তাঁর মনের কথা যার তার কাছে প্রকাশ কোত্তে সাহস কোত্তে না। সুন্দরী ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে আশ্বাস হোয়ে গেছেন। যে জীবনউজানে বালা প্রবেশ কোত্তে পেরেছেন কি না সন্দেহ, এর মধ্যেই সে উজানের ধ্বংস হবার উপক্রম হোয়েছে, তাঁর অদূরে যে, সে উজানের ফল আবাদন করা ঘটে, তা বোধ হয় না, সে সম্ভাবনা প্রায়ই নাই। বালা যথার্থই ধর্ম ভেবে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরেছেন, যে দিন সেই মোগল তাঁর আশ্রিত্য হস্ত প্রসারিত কোরে ঝালাকে যত্নাযুথ থেকে উদ্ধার কোরেছেন, সেই দিন থেকে জীবা আর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি।

নববৎসরের সমারোহ শেষ হলো, জীবা তাঁর প্রিয়তম নৃজরদের অহুরাগমূর্ত্তি অঙ্ক-ধ্যান কোত্তে শরন-গৃহে চোলে গেলেন। নৃজরদের সঙ্গে আর কখন চারিচক্ষু এক কোত্তে পারবেন না, একপে সেই কথা, সেই ভাবনা তাঁর জপমালা হোয়েছে। আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, অপরাহ্নিক বায়ু-হিল্লোলের মধুরিমা আবাদন করবার নিমিত্ত বিবাদিনী জীবা ঘরের জামালাগুলি যুক্ত কোরে দিলেন। চরমা উজল থে .

বিকশিত করেছেন। উনার প্রসারিত অঞ্চল বৃক্ষের নীলোজ্জ্বল পত্রগুলি বায়ুযোগে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হোচ্ছিল, পত্রবৃক্ষের জলদর্পণ ছায়াগুলি কৃষ্ণলহরী ধোয়ে অবনীতলে ক্রীড়া কোচ্ছিল, দূরস্থিত সাগর-তরঙ্গের গভীর অটুনিবাদ ভিন্ন কোনো দিকে কোন শব্দ ছিল না যে, রজনীর প্রশান্ত নীরব ব্রতের ব্যাঘাত জন্মায়। জীবা হুঃখিত হোয়ে মনে মনে চিন্তা কোচ্ছেন, “আজ পূর্ণিমা, কিরে পূর্ণিমার আমার অদৃষ্টের দ্বার অবরুদ্ধ হবে। হায়! মেঘসিরম পর্বাধের আর বড় বিলম্ব নাই, এসে পড়ল বোলে, যার সঙ্গে আমার বিবাহের বধা স্থির হোয়েছে, আমার সেই বাগদত্ত স্বামীও সেই সঙ্গে উপস্থিত হবেন। আমার মন কিন্তু তাঁর প্রতি বিচ্ছিন্ন, সন্তুষ্ট নয়, হায়! হায়! জীবা কি হতভাগিনী!” এই আক্ষেপ কোরে বালা একটি দীর্ঘপ্রবাহিত সুগভীর বিষাদ-নিশ্বাস ফেলেন, জানালার বার থেকে আর একটি ঐক্লব নিশ্বাসপাত হোয়ে তাঁর নিশ্বাসপাতের প্রভুত্তর দিলে। একটু একমুহূর্তে একচিন্তে কাণ পেতে থেকে জীবা স্পষ্ট শুনে, অতি অল্পক্ষণ সাবধান হয়ে কেউ যেন তাঁর নাম ধোরে ডাকছে। বালা একটু স্তম্ভের দিকে ঝুঁকে উকি মেরে দেখলেন যে, সে সেই যুবা মোগল একটি গাছের গায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পাছের কতকগুলি ডাল লম্বা হোয়ে সুন্দরীর জানালার উপর এসে পোড়েছে। জীবা তখন পূর্ব-প্রতিজ্ঞা স্বরণ কোরে জামালাটি বন্ধ কোত্তে উঠলেন, কিন্তু সেই সময় যুবার নৈবংশ-বিশিষ্ট স্নানমুর্তি, আর তাঁর সকাতির ব্যাগ্রোন্নত ভাব প্রতিরোধ হোয়ে বালায় হস্ত নিবারণ কোলেন।

“দোহাই ঈশ্বরের, চোলে যাও, এখানে আর থেকো না, তুমি আমার মেরে ফেলবার জন্তেই কি বাচিয়েছো?” যুবতী এই কথা চৈচিরে বোলে।

যুবা। ভয় কি? এত রাজে পাড়ার কেউ জেগে নাই, এখন সকলেই নিদ্রিমে ঘুমাচ্ছে,

সুখ পাড়া বোলে কেন, আধি আর আমার প্রাণ-প্রতিমা জীবা ভিন্ন পৃথিবী সূর্য মিশ্রম, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, তোমার আমার চক্ষু ভিন্ন এত রাজে আর কারুর নেত্র চক্রমার রক্ত-কান্তির স্বৈতমুর্তি নিরীক্ষণ কোচ্ছে না, অথবা কেবল তুমি আর আমি ভিন্ন আর কেউই এ নিশীথ রজনীর গভীর প্রশান্ত মূর্তি অলক্ষ্যাম কোচ্ছে না। জীবা। তুমি আমার প্রাণের তুল্য, তুমি আমার হৃদয়ের প্রিয়গদার্থ, তবে তোমার বলি শোনো, আমার পিতা, যিনি কাছের একজন মহাকুল-প্রসূত ধনবান আমীর, সম্প্রতি তিনি কালধর্মের ঋণ পরিশোধ কোরেছেন, তাঁর আরক্তিক কুটিল জরুটি, আর তাঁর কাল-ক্রোধ তাঁর সঙ্গে এক ত্রেই সমাদি প্রাপ্ত হোয়েছে, এক্ষণে আমি তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি ঋণ তোমার স্বেহ করি, আমি যে তোমার একান্ত অহুরাগী, তা তুমি মনে মনে জানতেই পেরেছো। তাই বলি, তুমি পালিয়ে আমার সঙ্গে কাদে চলো, যে শাস্ত্রের, যে ধর্মের শাসনে থেকে তুমি কখন সূত্থের মুখ দেখতে পাবে না, এমন ধর্মের, এমন শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? তুমি তা পরিত্যাগ করো।” এই কথা বোলে যুবা সেই গাছ বেয়ে একেবারে জীবির স্তম্ভে এসে উপস্থিত। কৌতূহীপতি আপনার রক্ত-প্রভা যুবার ঢল ঢল, বিমল মুখকান্তির উপর পূর্ণবর্ণণ কোচ্ছিলেন, সেই স্বৈতছটা যুবার ব্যাগ্রোন্নত মূর্তির বিস্তার ব্যক্ত কোত্তে লাগল, জীবা তাঁর প্রস্তাবের কি উত্তর দেন, বালায় মুখে সেই কথা শোমবার নিমিত্ত মোগলের চিত্ত যে জুধীর হোয়েছে, সে ভাবও ঐ আলোকে অনাবৃত হোয়ে পড়ল।

জীবা বোলে, “আপনার কথা শুনে আমার হৃদয় পাচ্ছে, লজ্জাও হোচ্ছে, আমার রাগও হোচ্ছে, মনে করুন, আপনার পিতার যেন রাগ-স্বৈ কবরে গ্রাস করেছে সত্য, আমার ত পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, তাঁরা আমার জাতিতে গইবির, আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, আমার বাগদত্তা হোয়েছে—”

মোগল তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বোলেন, “তার সঙ্গে কখনই তোমার প্রণয় হোতে পারবে না। হায় জীবা! ঐ দুটি মৌলপ্রভা-বিকশিত জাঁখি আমার হৃদয়ের মধ্যে যে প্রণয়-অগ্নি প্রজ্বলিত কোরে দিয়েছে, তা যদি তুমি কেবল মাত্র মনে জানতে পাও, আর তোমার হৃদয়-সৌন্দর্য্যের বিমল মধুরিম আমার মন-প্রাণ যেরূপ মুগ্ধ কোরেছে, তাও যদি তুমি ঘৃণাকরে বুঝতে পাও, তা হোলে তুমি আমার শোকসন্তাপের মুখে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পাও না, তুমি স্বর্গের প্রণয়িনী হবে, এ কথা মনে হোলে আমার কাল-শোকে দগ্ধদগ্ধ পুড়িয়ে মাচ্ছে।” জীবা বোলেন, “নূরজরঙ্গ! ছিঃ! ও সকল কথা মুখে এনো না, শুনে প্রাণে বড় ব্যথা পাই, তুমি কি আমার উম্মাদিনী কোরবে? তুমি ত জান, মিঠুর অদৃষ্টের দোষেই আমি অনেক ভাগ্যে জড়িয়ে পড়েছি। যদি জেতের আর ধর্ম্মের অহুরোধ না থাকত, তবে তোমায় এত কথা বোলতে হতো না, আমি বহু তখন সেধে, সাধ কোরে তোমার প্রণয়িনী হতেম, কিন্তু এ অবস্থায় আমার তা হবার যো নাই, আর তা হবোও না, কখনই হবো না, এক্ষণে ভালয় ভালয় বিলায় হও, আমিও হই। কেউ যদি দৈবাৎ দেখতে পায়, তা হলে প্রমাদ ঘোটবে, তুমিও কোন্ তা না জানো! তোমার সঙ্গে আমার যে কখন সাক্ষাৎ হোয়েছে, সিটি আমি বিস্মৃত হবো, আর ” নূরজরঙ্গ অমনি চমকে উঠে এই শব্দ কোরে উঠলেন, “কি বোলো? বিস্মৃতি!! কখনই না, তা হবারি নয়, সিটি অসাধ্য। প্রিয়ে জীবা! তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো, তোমার ধর্ম্মিক পিতা-মাতার অত্যাচার হতে পলাও, পালিয়ে আপনাকে বাঁচাও, দাসীবৃত্তির কঠোর বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করো, তোমার স্বজা-ত্বের স্বভাব-বিরুদ্ধ অসঙ্গত ধর্ম্মের এমনি শাসন যে, তোমায় দাসী কোরে রেখেছে, তুমি অতুচিত ধর্মে আবদ্ধ হয়ে আপনাকে স্থায়ী জ্ঞান করো না। তোমায় যেমন উচ্চ-

মন, তোমার যেমন অমায়িক প্রকৃতি, আর যেমন স্নেহপ্রাণিত হৃদয়, একটা অহুদার ছরাআ ক্ষুদ্রমনা ধর্ম্মে প্রতি গৌরবান্বিত হবার জন্ত কিছু সে মনের সে হৃদয়ের সৃষ্টি হয়নি, সে মন, দে হৃদয়, সে প্রকৃতি সেই অপ্রশস্ত ধর্ম্মের দৃষ্টারে অবনত হবার জন্ত হয়েছে? তাও হয়নি। তত্ত্ব যে ব্যক্তি পুটেতেলির আয় কঙ্গুস, আর অর্থ্যাশিচ, যে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতির লোভে তোমায় মহান্ মনের, মহান্ হৃদয়ের বথার্থ গৌরব অবধারণ কোতে সক্ষম নয়, সেই ক্ষুদ্রাশয় অর্থচণ্ডালের উপর সমর্পণ করবার নিমিত্ত তোমায় সে মনের সে হৃদয়ের জন্ম হয়নি, তাকে সমর্পণ কোরে অনর্থক নষ্ট করবার নিমিত্ত, তেমন মনের, তেমন হৃদয়ের জন্ম কখন হয়ে থাকে না, তা কখনই নয়, আজ অবধি তোমার দাসীবৃত্তি ঘুচে যাবে, তারি পূর্ব-আয়োজন কোছি, এক্ষণে ঠাকুরালী আর প্রণয়ানুগত তোমার মূখ অপেক্ষা কোছে, তুমি হস্তপ্রক্ষা কোরে আত্মকৃশলের অনাগর করো না। ধোঁগেঘাগে একবার কাঁধে পৌছতে পারলে হয়, তখন আর আমাদের কে পায়, পৃথিবীর সমুদয় গইবির একজু হোলেও আমরা তাদের জ্রক্ষেপও চোরবো না। মুখে একবার বলো যে, আমি যাতে, তা হলে স্থান সময় নৌকা প্রভৃতির কিছুই আটক হবে না, সব ঠিক-ঠাক হয়ে থাকবে।”

মোগলের প্রাণতোষিনী মধুর-স্বর প্রবৃন্তি-মন্ত্রণা দিয়ে বালাকে ব্যাকুল কোরে তুলে, তার উপর আবার জীবির হ্রস্ব মনোরাগ উত্তর-সাধক হয়ে তাঁরে বারবার ফুসলাতে লাগল, তাতে কোরে জীবির প্রতিজ্ঞা যে শিথিল হবে, সেটা বড় বিচিত্র কথা নয়। প্রস্থানের উপায়ও অতি সহজ জ্ঞান হোতে লাগল, আবার তার বিয়ও অতি অল্প দেখতে লাগলেন। একটি সুপুরুষ যুবা তাঁরে দুঃখ-বজ্রণা থেকে উদ্ধার কোয়ে, একটি সুধময় কুঞ্জে লয়ে যাবার জন্তে বন্ধকর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বাল্য হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, যুবার প্রণয়-চুম্বন গ্রহণ করবার নিমিত্ত যুবতী

হস্ত প্রসারিত কোরে দিলেন, যুবা বালায় চির বিষম পঙ্কজ হস্তের উপর অবররাগে চিহ্নিত কোলেন, সুন্দরী অমনি যুদ্ধ হয়ে আপনার হৃদয় এই প্রতিজ্ঞা-চিহ্নে অঙ্কিত কোলেন যে, বালা তাঁর অহুরোধেই প্রাণ রাখবেন, আর তাঁর অহুরোধেই প্রাণ দেবেন! বাস্তবিক জীবা পবিত্র হয়ে আপ-  
নার মন-প্রাণ যুবাকেই উৎসর্গ কোরে দিলেন।

তার দয়শনরূপ বয়স: পাইয়া,  
হৃদয়ে প্রণয়-স্রোত উঠিল নাচিয়া।  
পূর্ব্বস্তের শূন্য শত আশা-উর্ধ্বি তার,  
বৌবন পবন সঙ্গে গড়াইয়া যায়।  
মর্ম্মপথে অন্তরাগ বহে বেন বাণ,  
ভাজে বৃদ্ধি দেহ বাঁধ নাই সহ টান।  
সেই বেগে মন-ভুগ ভাসিয়া চলিল,  
ধৈর্য্য ধরিতে গিয়ে ডুবিয়া মরিল।

যে সময় কোমলীপতি তাঁদের দেখিয়ে দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারবেন না, যে সময় সকলের অজ্ঞাতে সাগরতীরে নির্ঝরে পৌছিতে পারবেন, আর যে সময়ে অল্পকূল বাহুর প্রফুল্ল হিল্লোলে পাল ভুলে দিয়ে গুজরাটের তটে উপ-  
স্থিত হোতে পারবেন, সেইরূপ নিশীথ রাত্রে তাঁদের প্রহানের সময় অবধারিত হলো। ঐ কথা স্থির হয়ে মোগল পুরুষ চোলে গেলেন, জীবা পুনরীকর একাকিনী হয়ে অরণ্য-উদাস-  
তরঙ্গিত গৃহমধ্যে প্রবেশ কোলেন। এ সময়ে কারু সাধ্য বালায় ব্যাকুল, বালায় উদ্ভিগ, বালায় চিন্তাকুল কাতর হৃদয়ের পরি-  
চয় প্রদান করে? সুন্দরী উৎকণ্ঠিতা হয়ে এই ভাবতে লাগলেন, মোগলকে কথা-দেওয়া ভাল হয়নি, তাঁর পিতা মাতার মূখে সকলে চুনকালি দেবে, বংশেও একটা ঘোঁটা থেকে যাবে, আজন্মকাল লোকে এই কথা বোলবে যে, অম্বকের মেয়ে বেরিয়ে গেছিল। শুধু বংশ বোলে নয়, গইবিরকুলেরও লজ্জা বটে, বিশেষত আমার পিতার মান সম্মান আছে, নামভাকও আছে, সর্ব্বজ্ঞে তাঁকে চেনে জানে, কারণ কাছে নতুন হয়ে পরিচয় দিতে হয় না, আমার লজ্জাভনি আর লোকায়ের

মুখ দেখাতে পারবেন না, আমি সন্তান হয়ে তাঁর অপমান কোম্বো, ধর্ম্মে সহিবে না, সেই পাপে হয় ত আমার শেষে মনস্তাপ পেতে হবে, পিতা মাতার আমি বই আর সন্তান নাই, আমি তাদের চক্ষু বোলেই হয়, অন্ধের লাড়ি, রূপণের ধন, শিবরাজের সন্তে,—যা বলো তাই সাজে, সকলি আমি, আমার না দেখে এক তিল থাকতে পারেন না, আমি কি কোরে তাঁদের মায়া বিষ্মত হবো, কি কোরে কাঁদিয়ে চোলে যাবো, আমার প্রাণ কৈদে কৈদে উঠছে, মন হ হ কোচ্ছে, আমি কোন্ প্রাণে তাঁদের স্নেহ-  
মায়া ফেলে চোলে যাব, আবার যে আমার নেদাবে, সে এক প্রকার বিদেশী, অপরিচিত লোক বোলেই হয়, তাঁর কুলশীল প্রায় অজ্ঞাত, তাঁর বখায়ই বা বিশ্বাস কি, এখন যেমন তাঁর অহুরাগ দেখছি, এর পর যদি সে ভাব না-ই থাকে, শেষে কি অকূলে পোড়ে কেবল কেবল কান্নাসার হবে! সহস্র অপরাধ কোলেও পিতামাতা চেয়ে দেখেন না, তাঁদের কখন অস্নেহ ভয়ে না—একবার চোকের জল ফেলেই সব দোষ ঢেকে যায়। পতির স্নেহ স্বেচ্ছাপ নয়, লোকের দশা ত দেখ-  
তেই পাচ্ছি, প্রথম বয়সে স্বামীর বেক্রপ স্নেহ-মায়া থাকে, অনেকের শেষে আর তেমন থাকে না, আমার অদৃষ্টেও যদি সেই দশাই ঘটে, বিশেষত চুর্কর্য্য কোন্ডে বসেছি, পিতামাতা যে অভিশম্পাত কোম্বেন, তা বিচিত্র কি, তবে সন্তানের মায়ায় পোড়ে যদি না কোরেন, সেই এক ভরসা আছে, আবার মায়ের প্রাণে বতখানি থাকে, বাপের কিছু তত বাজে না, পিতা যে আমার দশা কোরে আশীর্বাদ কোম্বেন, তা কদাচ কোরবেন না—পুরুষের প্রকৃতি সেক্স নয়, পিতা মহাশয়, তাঁর শাপ আমায়, কলবেই কলবে, এখন করি কি, কেন কথা দিলেম, প্রতিজ্ঞা করবার আগে বিবেচনা করাই উচিত ছিল,  
—বালা এইরূপ প্রতিজ্ঞার পাখারে পোড়ে কতই আশঙ্কর দেখতে লাগলেন, মোগলের সঙ্গে যে কথা হয়েছে, তা রক্ষা কোম্বেন কি

না, ইতস্তত ভাবতে লাগলেন, সেই সময় কিন্তু একবার ফ্রেমলীর অস্বাভাবিক আচরণ, একবার নৃজরঙ্গের অস্বাভাবিক-মাধুরী স্মরণ হয়ে তাঁর মন ভুলিয়ে দিতে লাগল, আর ক্রমে ক্রমে তাঁরে মোগলের পক্ষপাতিনী করেছে তুলে। তাই যুবতী মনে মনে বোলতে লাগলেন, তিনি যে অবস্থায় পোড়েছেন, আর যেসকল ভাবগতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিবেচনায় তাঁর কথা দেওয়া উচিত কাজই হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তিনি তা না কোরেই বা করেন কি, তিনি ত আর সাধ কোরে কি পারতপক্ষে ইচ্ছা কোরে কথা দেন নি, তবে কাজের গতিকে হোয়ে পোড়েছে, তাতে তাঁর দোষ কি? বলত এক প্রকার ধোঁবে বেঁধে জোর কোরেই তাঁর মুখ দিয়ে দে কথা স্বীকার কোরিয়ে লওয়া হোয়েছে, তাতে তাঁর অপরাধ কি? এক্ষণে যে পথে দাঁড়াবেন বোলে পরামর্শ এঁটেছেন, তাই বা না পাড়ালে চলে কই, আর তাতে তাঁর হাতই বা কি আছে, নাচার হয়েই না সে পথ ধোঁতে যাচ্ছেন, তবে তাঁর অপরাধ কি? এই প্রকার নানা হেতুবাদ দেখিয়ে আপনার মনটা জ্বালাবার নিমিত্ত যুবতী লালায়িত হোতে লাগলেন। তাঁর পিতার কাল-ক্রোধ, আর তাঁর মাতার চির-মনস্তাপ বালার মনোদর্পণে তড়িতের প্রভার প্রতিবিম্বিত হোতে লাগল, উদ্ভিন্ন লজ্জা আর ধরা পড়বার ভয়ও তাঁর অন্তরাধাত কোন্তে লাগল। ধরা পোড়লে তাঁর ভাগ্যে যে করাল শাস্তি লেখা রয়েছে, বাল! তাই স্মরণ কোরে চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। জীবা পরদিবস প্রাতে গাত্রোথান কোরে সজ্জর সজ্জর মতন হোলেন, আর অতিশয় শ্রান, অতিশয় বিষন্ন হয়ে পোড়লেন। মম-তামসী মাতা ছুঁহিতার আকার প্রকার দেখে শশব্যস্ত হয়ে যুবতী মেরী সাউসীকে ডাকিয়ে আনতে বোললেন, জীবীর কিন্তু মেরীর অন্তঃকরণে তীক্ষ্ণদৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখতে ভয় হলো, তাই বাল! কাতর হয়ে বোললেন, “আমার আর বারবার বিরক্ত কোরো না, আমি যেমন আছি, এমনই থাকি, আমার এ

অস্থখ আপনিই সেরে যাবে।” কোমল বাল! দুই দিবস যাবৎ নিজ্জলা উপবাসী রইলেন, কোন প্রকার আহারেই তাঁর রুচি ছিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণাও বোধ ছিল না, তাই শেষে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন হলো। জীবা নিষেধ করাতে মেরী সাউসীকে না ডেকে এক ব্যক্তি গইবির চিকিৎসককে আহ্বান করা হলো; সে ব্যক্তি নিতান্ত মূর্থ নয়, চিকিৎসায় তাঁর হাতখশ বেশ ছিল। তাঁর ঔষধের শুণেই হোক, কি ভীবার অন্তঃকরণ ক্রমে সুস্থির হোয়েই হোক, সে কথা কেউ বোলতে পারে না, তা যাতেই যা হোক, ফলে জীবা অল্প-দিনের মধ্যেই এত সুস্থ হোলেন যে, পিতা-মাতার মনে যে ভয় হয়েছিল, সেভর দূর হলো, তাহার! এক্ষণে নিকরদেগ হয়ে সাবেক রীতি-পদ্ধতি মতন সংসার-ধর্ম দেখতে লাগলেন।

নৃজরঙ্গ যখন তাঁর প্রিয়তমার নিকটে বিনার হয়ে চোলে যান, তাঁর অমৃতব হলো, তিনি যেন নারিকেল বৃক্ষের উপবনের মধ্যে একটি মনুষ্যের প্রলম্বমান ছায়া দেখতে পেলেন। পথে কিন্তু অপর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মনে কোলেন, তাঁর ভ্রম হয়েছে, তাই আর সে বিষয় মনে স্থান দিলেন না, বরং তখন আমন্দে এই কবিতা পোড়তে পোড়তে চোলেন।

১

“কৌমুদী! তোমার আর নাহি প্রয়োজন,  
তব রূপে আর কেন ভুলিবে নয়ন?  
প্রণয়িনীর মুখচাঁদ নীতল কিরণ,  
স্নিগ্ধ করে দিবানিশি আঁখি আর মন।”

২

“গোলাব! তোমার আর বৃথা অহঙ্কার,  
তব গর্ভে ধর্ম করে বদন প্রিয়র,  
যে মাছি তোমার দলে পদাঘাত করে,  
ঐ দেখ তিলছলে কত শোভা ধরে ॥”

মোগল যুবা মনোরাগে মত্ত হয়ে, আপনায় রত্নটি হস্তগত কোরে পালিয়ে গ্রহান কোর-বেন বোলে আবশ্যক-মতন সকল উদ্বেগই কোলেন। একখানি ক্ষুদ্র ভিজি ভাড়া কোরে রেখে দেওয়া হলো, ঐ ভিজি কোরে নায়ক-

নারিক। একখানি ছোট অথচ প্রশস্ত জাহাজের উপর চোড়বেন, জাহাজখানি একটি নির্দিষ্ট স্থানে নৌদর কোরে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাঁরে থেকে বড় নজর হয় না, একটু একটু ছারামাত্র দেখা যায়। অতি প্রফুল্লচিত্ত যোগল ধরুণ কৌশল কোরে এই সকল চৌকোষ আয়োজন কোরেছেন, তাতে যে তাঁর অভিসন্ধি সকল হবে, তার কোন সন্দেহ ছিল না। যুবা-তাই মনে কোরে বহাশা কোত্তে লাগলেন যে, তাঁর অভ্যুত সম্যক্রূপে সিদ্ধ হবে। তাঁর নির্দিষ্ট সেই ধোরূপা তমোময়ী রাজি আগত হলো। জীবা ভয়ে আর জাসে চম্কে উঠতে লাগলেন, এত আতঙ্ক হলো যে, ভ্রমবশতঃ নিশ্বাস ফেলতেও বিস্মৃত হোতে লাগলেন। জীবীর জ্ঞান হতে লাগল, তাঁর স্নেহময়ী জননী যেন তাঁর তাব-দহুষ্ঠান চোঁকী দিয়ে দেখছেন। যে দিন সেই ঘটনা উপস্থিত হবে, সেই দিন প্রাতে কোন কার্য উপলক্ষে বাবার পিতা সালসেটিতে গমন করেন, তাই সে দিন সে ব্যক্তি গৃহে অগ্নিপস্থিত থাকার উৎকণ্ঠিতপ্রাণা জীবীর মনে অনেক সাহস হলো, তাঁর চিত্তোদ্বিগ্নের অনেক সমতাও হতো। প্রণয়রাগ, গুরুভক্তি আর ধরা পড়বার ভয়, এই মনোভাবগুলি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বাবার অন্তঃকরণ তোলাপাড় কোত্তে লাগল। জীবা কতক কতক প্রশান্তমনের ভেক ধোরে চোঁকী দিয়ে দেখতে লাগলেন, তাঁর বাতা কতকণে শয়ন কোত্তে চোলে যান, বড় বড় অশ্রুবিদ্যু নেত্রপ্রভা। মলিন কোরে নিঃশব্দে তাঁর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পোড়তে লাগল। বালা পুনর্জীব অস্থতাপ কোত্তে লাগলেন যে, কেন তাঁর মাথা ধোরে সে পথে যেতে তাঁকে প্রবৃত্তি ছিলে? এদিকে আবার সেই মন তাঁকে ব্যস্ত কোত্তে লাগল যে, উদ্বিগ্ন-চিত্ত যোগল অধীর হয়ে সেই নিরুপিত স্থানে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কোচ্চেন। যার প্রতি তাঁর অহরাগ জন্মেছে, সেই ব্যক্তির সহবাসে উত্তর কালে চি-স্বধী হবেন, এই সজীব আশ্বাসে প্রফুল্লিত হয়ে জীবীর দর জীবাকে আবৃত

সাহস দিতে লাগল, আর বধাকালে সেই নিরুপিত স্থানে উপস্থিত হবার জন্য পেড়া-পীড়িত কোত্তে লাগল। বালা সাগরতরনের অহুচ্চ গভীর নিনাদ শুনে পেলে, হয় ত একটু পরেই সেই সাগরের বুকের উপর বসে তিনি আগনিই ভেসে চোলেবেন। বালা গবাক্ষ-দ্বার দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখলেন, পৃথিবী তিমিরাবরণে আবৃত হয়েছে, আর তমোময়ী ঘোরাঙ্কুর গগনে দুই চারটি নক্ষত্র মাত্র ধক্ ধক্ কোরে জ্বলছে, এক একবার বায়ুর হিলোলে সপত্র বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়ে চোলে এসে, একটা একটা দোম্কা বাতাস হয়ে অনৈক্য ধোরে ছ ছ শব্দ কোচ্ছে, কাল-বৈশাখী পেঁচাগুলি দূরস্থ নিম্নবৃক্ষের ডালে বোসে অকল্যাণ ডাক ডেকে অন্তঃকরণ চমকিয়ে দিচ্ছে। এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত, জীবা একখানি সালে আপনাকে ওড়ঘোড় কোরে জড়িয়ে অতি সতর্ক হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন, নাব্বার সময় তাঁর জননীর ঘরের দরজায় কাণ পেতে রইলেন, সব নিঃশব্দ, কেবল উদাস নিস্তরের তরঙ্গ চতুর্দিকে বৃত্য কোরে বেড়াচ্ছে। সদর-দরজায় এসে ক্রমে আস্তে আস্তে কবাট দুবাইল খুলেন, তার পরেই তামসীর কালিমা মূর্তি বাবার অবয়ব ঢেকে ফেলে। পর্তুগিসের ধর্মমন্দির তাঁদের নির্দিষ্ট স্থান, সেই স্থানে তিন দিক দিয়ে তিনটি রাস্তা গিরে মিলেছে, এই স্থানে নূরজরজ বধাকালে উপস্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুবা সঙ্কম্পিতা বালাকে বুকের মধ্যে চেপে ধোরে একটা সন্ন পলিপথ দিয়ে সযত্নতরীয়ে নিঃশব্দে লয়ে চোলে, সে সময় ভয়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সোচ্ছিল না।

জীবা কাঁপতে কাঁপতে কিস কিস কোরে জিজ্ঞাসা কোলেন, “কই, ডিঙ্গি কই? কোথায় সে নৌকা?”

যুবা বোলেন, “ঐ যে সে জাহাজ, দেখতে পাচ্ছে না? ঐ যে চড়ার কাছে ভাসছে, তার পাশেই ঐ দেখো, জালীবোটখানি লাগান আছে, জাহাজে একবার উঠতে পারে হয়, তখন আমাদের কে ধোরে রাখে, দেখা যাবে।



জীবা! কাঁপছো কেন? এখন আর ভয় কারে? এখন একটু বকে বল বাঁধো, ‘আপাততঃ কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই।’

জীবা বোলেন, “একটু চুপ করো, আমার যেন জ্ঞান হোচ্ছে, কেন হোচ্ছে তা বোঝতে পারিমে, কলে আমার যেন জ্ঞান হোচ্ছে, কেউ আমাদের দেখছে। বল দেখি, আজ বাবু-রাস্তায় কোন গইবিরের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না? প্রাণে বড় ভয় হোচ্ছে, সে ভয় কোনো মতেই দূর কোতে পাচ্ছিনে, আমার মনের মধ্যে ভয়ের উপর ভয় হয়ে ভয়ের যেন জনতা হয়ে পোড়েছে।”

“না, না, আমার জীব! আজ জনপ্রাণী-কেও রাস্তা দিয়ে চোলতে দেখিনি, একটু হির হও, শেষে দেখতে পাবে, চিন্তার কোন কারণই নাই। আমাদের পক্ষে সকলেই অহুকুল, বাবু অহুকুল, শ্রোত অহুকুল, নিশি অহুকুল, প্রাতিকুল কেউই নয়, দেখতে দেখতে কত পথই চলে যাব, কত দেশই ছাড়িয়ে পড়বো, তখন আর অপ্রোণ্ড বিপদ মনে হবে না।”

পলাতকেরা শ্রাণানধার দিয়ে চোলেছেন, অর্ধ-নিরীক্ষণ পোড়া কাঠগুলি বাতাসের জোরে একবারে বিকট আকার হয়ে জলে উঠছে, আবাব পূর্বের মতন নেবো নেবো হোচ্ছে, সে আলো দেখতে কারও অভি রুচি হয় না সত্য, জীবির অন্তঃকরণে কিন্তু সাহস প্রদান কোতে লাগল, কেন না, ঐ আলোর ছটার যুবতী বড় জাহাজখানি দেখতে পাচ্ছিলেন, যে ডিজিতে বোসে জাহাজে চোড়বেন, সে ডিজিখানিও বগলে বাঁধা আছে দেখতে পেলেন। এখন ভাঁটা, জল সোরে গিয়ে অনেক নীচে পোড়েছে। দুজয় লাগরের অবিশ্রান্ত অহুক হাঁহঁ, গোঁ গোঁ শব্দ আর তার মুহুমন্ড কলকল কল্লোলধ্বনি পলা-তকেরের কর্ণে বজ্রার কোতে লাগল, সেই কোলাহল শ্রবণ কোরে জীবির মনে যে ভয় ছিল, তা বিগুণ প্রবল হলো, সে ভয় বেড়ে ফেলবার নিষিদ্ধ বালা পূর্বে অনেক চেষ্টা

কোরেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। যুবতী কাতর হোয়েছেন দেখে, যাতে সাহস জন্মে, নৃজয়রঙ্গ তার চেষ্টা কোতে লাগলেন, কিন্তু বালার মন কিছুতেই প্রবোধ মানছিল না।

“কই, সে নৌকা কোথায়? আর তো দেখতে পাচ্চিনে।” বালা এই কথা পুনঃ-পুন বোলতে লাগলেন। এই সময় চিতার আগুন ধক্ ধক্ কোরে একবার জলে উঠল, পূর্বে যা দেখেছিলেন, তার অপেক্ষা এ আলোর প্রভাও অধিক, আর অধিকক্ষণ স্থায়ীও ছিল, তাই ঐ আলোর ছটার যুবতী অনেক দূরে একখানি ক্ষুদ্র ডিজি দেখতে পেলেন, তার মধ্যে লোক বসে আছে, তারা তাদের নিয়োগকর্তার আগমন প্রতীক্ষা কোচ্ছিল।

বালা সেই ডিজি দেখে “ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ঐ যে দেখা যাচ্ছে” বোলে চোঁচয়ে উঠে বোলেন, “তবে এখনও পালালে পালাতে পারবো।”

“আল্লা আমাদের রক্ষা করবেন, তিনিই আশ্রয় দেবেন।” নৃজয়রঙ্গের মুখ দিয়ে এই কটি কথা বেরিয়ে পোড়ল। “জীবা! আর বিলম্ব নাই, আর একটুখানি সরে থাকো, একটু সাহস বাঁধ, প্রায় বড় জাহাজের কাছাকাছি এসেছি, জালিবোটখানা আমাদের দিকেই বাঁধা আছে, আমরা যে পালাচ্ছি, সে কথা কেউ জানে না, কেবল জন কয়েক মাঝী মাঝী ভিন্ন অর্থাৎ বাদের নৌকা ফেরা কোরে আনা হয়েছে, তারা ভিন্ন আর কেউই আমাদের দেখতে পার নি, তাই মনে হোচ্ছে, অভীষ্ট সিদ্ধ হবেই যে, তার সন্দেহ নেই।” যুবতীর সবিস্ময় স্নান চিত্তকে এইরূপে উৎ-সাহিত কোরে নৃজয়রঙ্গ তাঁকে একপ্রকার ঠেনে হাঁহাঁড়িয়েই সমুদ্রের ধারে সেই জাহাজের নিকট লয়ে গেলেন। জলের ধারে দাঁড়িয়ে মিহি জিল্ সুরে একটি শিশ দিলেন, ঐ সঙ্কেত শুনে ক্ষুদ্র ডিজিখানি তখনি নক্ষ-বেগে কিমারার এসে লাগল। জলের কাছে সমুদ্রের ধারটি জলকাষার চটচটে পেছল হয়েছিল, তাই বুঝা তাঁর জয়বাসিনী

জীবাকে কোলে কোরে জাহাজের উপর তুলেন, সেই সময় মোগলবর বালার আর-রক্তিম কপোল প্রফুল্ল চুপনে অঙ্কিত কোরে বোলেন, “এক্ষণে নির্ভাবনা হোলেন, আর আমাদের চিন্তা নাই।” ঐ কথা বোলে জীবাকে যেমন উৎসাহে পুলকিত কোচ্ছিলেন, এমন সময় একদল গইবির কতকগুলো লাঠী ঠেকা আর ভাঙা বোট লয়ে মার মার শব্দে ঘুরার উপর সে পোড়লে, পড়েই তাকে বেদম ঠেঙ্গিয়ে আগমরা কোরে, কাদার উপর শুইয়ে দিলে। জীবা করুণাপূর্ণ কাতর-স্বরে চীৎকার কোন্তে কোন্তে মোগলকে জাঁড়িয়ে ধোরে রইলেন, মোগলের সঙ্গে জীবাও কাদার পোড়ে লিট-পিট হোতে লাগলেন। গইবিরেরা ঘূষাকে হাতে পায়ে বেঁধে, সেইখানে ফেলে রেখে জীবাকে টানা-ছেড়া কোরে জাঁড়িয়ে লয়ে তফাৎ কোলো। যুবতী গলার স্বর শুনতে পেয়ে ব্যস্তে পাল্লেন, তাঁর পিতা কথা কোচ্ছেন, বালা অমনি মুর্ছিতা হয়ে সেই কাদাবলীর উপর চলে পোড়লেন। তার পর চৈতন্ত পেয়ে দেখেন, একটি ক্ষুদ্র গারদগানায় শুধু মেজের উপর শুয়ে আছেন। পঠিনাস্ত্র-করণ নির্দিষ্ট কর একদল গইবীর তাঁরে ঘেঁরে আছে, তাঁর অবরূপ সমাশূত্ নিষ্ঠুর পিতা-মাতা কি আদেশ করেন, তাই শোনবার জন্ত তারা দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা কোচ্ছিল।

বালা যেমন কাতর-নেত্রে তাঁর পিতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোলেন, রসতম অমনি বোলে উঠলেন, “পাপীরসি! আমার মুখের দিকে তুই চেয়ে দেখিস্। তোর এত বড় আশ্পর্ক! রে দুষ্চারিনি! রে নিলজ্জ ধর্মহাভিনি। এই ভয়েই কি লালন-পালন কোরে তারে মানুষ্য কল্লম? রে পাপমতি! এই ভয়েই কি তোর জননী তোর উদরে স্থান দিছিল? আর এই ভয়েই কি আপনার শরীর-পাত কোরে সে তোর আবদার উপ-দ্রব সহ্য কে রেছে? কলঙ্কার কুলহাভিনি হাবি বোগেই কি তুই সংসারে জন্মগ্রহণ কোরেছিস্? দেখো, ও আমার চক্ষের শূল,

আমার স্নমুখ থেকে ওকে তফাৎ করে। শোন, পাপীরসি! তোর এ পাপের মার্জনা নাই, তোরে যখন নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে আসবো, সেই সময় আর একবার তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এ কথা তোর যেন স্মরণ থাকে। একে এখান থেকে উঠিয়ে লয়ে যাও।”

জীবা যতপ্রায় হয়েছেন, তাঁরে উঠিয়ে একটা বৃহৎ চকের মধ্যে লয়ে গেল। সেখানে লয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা বিছানার উপর শুইয়ে রাখলে, সে রাত্রি তাঁর উপর আর কোনো উপদ্রব হোলো না। কিঞ্চিৎ আহারীয় এনে তাঁর স্নমুখে ধোরে দেওয়া হলো, বালা কিছুই মুখে দিলেন না, ভাল মন্দ কোনো কথাই বোলেন না।

পূর্বে বলা হয়েছে, নরুজরঙ্গ যখন জীবার সঙ্গে কথাবার্তা কোয়ে চোলে যান, সেই সময় তাঁর যেন অহুমান হলো, বৃক্ষরাজীর মধ্যে একটি লোকের আবছায়া দেখতে পেলেন, তখন তিনি ভ্রম জ্ঞান কোরেই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, ফলে সিটি তাঁর ভ্রম, যথার্থই কারও ছায়া দেখেছিলেন। মানীকজী নামে একটি পারসী মধুপানের আধড়া থেকে তত রাত্রে ঘরে ঘিরে যাচ্ছিলেন। রসতমের বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে লীষ যাওয়া যায়, তাই ঐ পথ ধোরে যাচ্ছিলেন। মানীকজী চাক্ষুষ দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি গাছ বেয়ে নেবে জীবার জানলার কাছে দাঁড়ালে। সে কখন চোলে যায়, তাই চৌকী দিয়ে দেখবার নিমিত্ত পারসী ঐ বৃক্ষ শারির মধ্যে লুকিয়ে রইলো। জীবা যখন জানলাটি বন্ধ করেন, ঐ ব্যক্তি কবাটো কাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেতেছিল। যে ব্যক্তি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সেখানে চোলে গেল, সে ব্যক্তি হিন্দু, মুসলমান, বি পারসী, মানীকজী তা চিনে উঠতে পারেনো না। কিন্তু ঐ প্রার্থনীয় সন্ধানটি জানবার নিমিত্ত তার পরদিনও রাত্রে চৌকী দিয়ে দেখবার মনস্থ কোলেন। মানীকজী অনেক দিন অবধি জীবার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়া দেবার প্রস্তাব করেন, কুলগরিষার নিমিত্ত

পাত্রটি মনোনীত না হওয়ার রস্তায় সে সম্বন্ধ খতিয়ে দেন, মানীকজীও সেই দিন অবধি রস্তুমের বংশ-পরিবারের জাতশত্রু হোলেন। রস্তুম যে তাঁর প্রস্তাবের অনাদর কোরেছেন, তাঁর প্রতিকূল দেবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সুযোগ সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সম্প্রতি অসান্ধকখনা মোগল-যুবর গতি-প্রবর্তি আর তাঁর পাদচিহ্ন অনুসরণ করিতে বিখাত। সেই কলাভিমানী গরুত রস্তুমকে মানীকজীর করতলে এনে ফেলে দিলেন। মানীকজী মনে মনে ভাবলেন, জীবা বাগদত্তা হয়েও এফ ব্যক্তি দুঃখদাক্ষ নিরাজ্ঞ পুরুষের যোগে চলনাচক্রে কোচ্ছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিটেকে, সে সন্ধান যতদিনে না জানতে পারবেন, তত দিন তিনি কখন নিশ্চিন্ত থাকবেন না। এই অভিপ্রায় কোরে জীবর জানলাটি দেখা যায়, এমন স্থানে লুকিয়ে থেকে চৌকী দিয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু সেই প্রথম একবার যা দেখেছিলেন, আর একটিবারও কারেও সেখানে উপস্থিত হোতে দেখতে পেলেন না, জানলাটিও সেই একবার যা খুলে যেতে দেখেছিলেন, নচেৎ আর কখন সেটি মুক্ত হোতে দেখেননি। তা যাই হোক, মানীকজীর কিন্তু খুঁতখুঁতিনি গেল না, তাঁর মন পরিস্কার হলো না, তিনি যে সন্দেহ কোরেছেন, সে সন্দেহের অবশ্যই কোন কারণ থাকবে, এইটিই তাঁর মনে ধারণা হলো। তাই বিবেচনা কোলেন যে, আরও ডুবে, আরও তলিয়ে দেখি, কতদূরে পাতাল পাওয়া যায়, আর যে পর্য্যন্ত এর একটা প্রমাণ পাওয়া না যাবে, সে পর্য্যন্ত সাবধান হয়ে চোলেবেন, এ সম্বন্ধে কোন কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না,—তুই চোঁট কদাচ একজ হোতে দেখেন না।

প্রণয়ী প্রণয়িনীর দুর্ভাগ্য বশতঃ মানীকজীর পুত্র পেস্টনজী সকল প্রকার নোকার, আর জাহাজের ঠিকার ইজারা লয়েছিলেন। রাজসরকারে বৎসর বৎসর বিস্তর টাকা তাঁকে মাপুল দিতে হতো, আর তিনিও আরতন

কোরে লয়েছিলেন, তাই তাঁর অজ্ঞাতে কেউ ডিজি কি জাহাজ ক্রেয়া লইতে কি ক্রেয়া দিতে পারেনা না, বিশেষতঃ প্রায় সকল জেলে ডিজিঙাই তাঁর নিজের সম্পত্তি ছিল, তাঁর উপস্থিতি তিন আপনিই ভোগ কোলেন। মোগল যখন বোলে পাঠালেন, তাঁর একখানি ছোট ডিজির বড় দরকার হয়েছে, রাত দুইপ্রহরের সময় ডিজিখান যেন কাক নামক কোলে লয়ে অল্প অবস্থা রাখা হয়। একে ভো তত্ত্বারাও ডিজির প্রয়োজন, তাঁর উপর আবার অনেকের মুখে শুন্তে পেলেন যে, মোগল একখানি জাহাজও ক্রেয়া কোরেছেন, তাতেই পেস্টনজীর মনে অত্যন্ত ভৌতুল জন্মিল যে, ব্যাপারখানা কি, অনুসন্ধান কোরে জানতে হবে। পেস্টনজী এই সকল কথা তাঁর পিতাকে অবগত করালেন। বুদ্ধ পারসী অতিশয় চতুর, আর শঠ ছিলেন, মোগল যুব যে প্রকার মাল বোঝাই কোরে জাহাজখান জলে ডালাবার মনস্থ কোরেছেন, সেটি তিনি অনুমান বলে বুঝতে পেরে, পুরুষের পুত্রের কাছে ব্যক্তি কোলেন। বুদ্ধ এ পর্য্যন্ত সে কথাগুলি কারও কাছে প্রকাশ করেননি, মনে মনেই চেপে রেখেছিলেন। মানীকজী পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, মোগল যা যা কোন্তে বলে, করো, কোন বিষয়ে যেন ক্রটি হয় না। মোগল কত রাজে আর কোন্ ঘাটে জাহাজে চোড়বেন, সে সকল ঠিক ঠিকানা এই যুজ্ঞে অবগত হয়ে মানীকজী রস্তুমের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে শুন্তলেন, রস্তুম বাড়ীতে নাই, কোনো প্রয়োজন বশতঃ সালুসেটেতে চোলে গেছেন। মানীকজী ঐ কথা শুনে তখাপি সোয়ার হয়ে রস্তুমকে গণের মধ্যেই ধোলেন, রস্তুম তখন অধিক দূর যেতে পারেননি। পরস্পর সাক্ষাৎ হয়ে দুজনে কথাবার্তার চোলেছেন, অনেক ব্যক্তাবের স্নেহ পরিহাস হোতে লাগল, পেঁচাও পেঁচাও ছেদোগোচের ঠাট্টা গাফিলত চোলে লাগল। এইরূপ অনেককাল ধোরে হালি ভাষাণর পর মানীকজী জীবর আতঙ্ক

তৃত পিতাকে সবিস্ময়ে অবগত কোরিয়ে বোলেন যে, তাঁর কন্যা এক ব্যক্তি মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে প্রস্থান করবার অকিঞ্চিৎকর করেছে। রস্তুম শুনে তখনি বোঁধে কিয়ে এলেন, কিন্তু সরাসর বাড়ীতে না গিয়ে কতকগুলি আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে লয়েই রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত সমুদ্রতীরে সেই বড় জাহাজের পাশে অপেক্ষাশতাবে আড্ডা কোরে রইলেন। সেখান থেকে ক্রোধোন্মত্ত সিংহের ভায় একটি লক্ষ দিয়ে হতভাগ্য পলাতকদের স্বর্গের উপর এসে পোড়লেন, সে কথা পূর্বে অবগত করান হয়েছে। মুমতাময়ী জননী যখন শুনলেন, তাঁর কন্যা কুলগৌরবঘাতিনী হয়েছে, বৃদ্ধা অশ্রুশলে ভাসতে লাগলেন, একমাত্র দুহিতা কুলটা হয়েছে, সেই ঘণায় তাঁর হৃদয়ে যেন শেগভেদ কোত্তে লাগল, বৃদ্ধা বকে করাঘাত কোরে হাহাকার কোত্তে লাগলেন। অশ্রুবারি পাত কোরে শোকাগ্নি-জাত মনোদাহের কালমূর্ত্তি কতক শামা হোলে একমাত্র বজ্রাধনের নিমিত্ত স্নেহময়ী মাতার হৃদয়ে অপত্যমায়া বলবতী হোয়ে উঠল, তাই বৃদ্ধা মনে মনে স্থির কোল্লেন যে, রস্তুমের হাতে পারে ধোরে তাঁকে বোলে কোরে বুঝিয়ে পাপমোচন। জীবর প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অহরোধ কোরবেন। রাগ, অহঙ্কার, ধর্ম্মাভিমান, আর কুসংস্কার, এই কটি অপ্রসাদকর চিত্তোত্তাপ রস্তুমের পিতৃ উচিত হৃদয়ের স্মৃতি ক্রমল স্নেহ আচ্ছন্ন রেখেছিল, অন্তঃকরণের তাবৎ ছিদ্র অবরুদ্ধ হও-রায় তার মধ্যে করুণা প্রবেশের পথ ছিল না। মায়াময়ী মাতা স্বামীর দুখানি পা জোড়িয়ে ধোরে একমাত্র কন্যার প্রাণদানের নিমিত্ত কাঁদাকাটা কোত্তে লাগলেন। যে হৃদয় কাল-ক্রোধে অনলমূর্ত্তি হোয়ে প্রতিকূল প্রদানের বিচারক তৃষ্ণার ব্যাকুলিত হোচ্ছিল, তাতে এক আধ ধিনু স্নেহকণা থাকলেও থাকতে পারে, এই মনে কোরে বৃদ্ধা অনেক বয়স—অনেক চেঁচা কোত্তে লাগলেন, যদি কোনো মতে স্বামীর সেই কণিকামায়া স্নেহ-

অগ্নি বাতাস দিয়ে প্রকাণ্ড কোরে ফুলতে পারেন। বৃদ্ধার সকল যত্ন কিন্তু বানের জলে ভেসে যাবার ভায় নিরর্থক হলো। ডিস্তুরী, প্রধান কুলাচার্য্য, তাঁর সঙ্গে আরও চার ব্যক্তি, স্বজাতীয় এই পাঁচ ব্যক্তির পক্ষাঘাত বসলো। জীবাকে টেনে লয়ে তাঁদের দরবারে হাজির কোরে দেওয়া হলো, অভাগিনী জীবর তখন সাহস হলো না যে, চক্ষু মেলে চেয়ে দেখেন, তিনি কোথায় এসেছেন, কার স্মৃতি উপস্থিত হয়েছে। যাদের কাছে দয়ার আশা কোরে মার্জনার প্রার্থনা জানাবেন, জীবা তাদের ভালরূপই চিন্তেন, তারা যেরূপ প্রকৃতির লোক' বালা তাঁর স্মৃতিরূপই অবগত ছিলেন। জীবা যখন তাঁর পিতাকে সেখানে উপস্থিত হোতে দেখলেন, বালা তাঁর দিকে চেয়ে একটিবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন,—কাতরতাপূর্ণ ব্যাকুল-চক্ষে একটিবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন, দৃষ্টিপাত কোয়েই যে তাঁরে ধোরে ছিল, তার কোলে মুচ্ছিতার ভায় অবসন্ন হোয়ে পোড়লেন। রস্তুম যখন কন্যার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তাঁর সেই সময়ের করাল রক্তমা চক্ষু দুটি বোলে দিলে যে, বালায় প্রাণের আশা ভয়ের মতন দূরে প্রস্থান কোরেছে। জীবা দেখতে পেলেন, পিতার সেই সাক্ষাৎ কালমূর্ত্তি: তাঁর অদৃষ্টের অনিবার্য্য ফলাফল স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত রয়েছে। বালায় এক্ষণে কতক চেতনা হোয়েছে, পাপময়ী অপরাধিনী কল্পিত হোতে হোতে তাঁর নিজরূপ নিষ্ঠুর বিচারপতিদের সম্মুখে মীত হোলেন। তখন প্রধান কুলাচার্য্য ডিস্তুরী উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে বোলেন, “এই স্ত্রীলোকটির করিয়াদী কে? কোন্ ব্যক্তি তার মুদই?” রস্তুম বোলেন, “আমিই তার মুদই, আমিই তার অপবাদক” এই কথা বোলে তিনি তাঁর কন্যার অপবাদের বৃত্তান্তগুলি আত্মপূরিক বর্ণন কোল্লেন। সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ কোরে পক্ষাঘাতের মধ্যে একটি অহুচ্চ কাতরধ্বনি নিঃসারিত হলো। কি করা কর্তব্য, তারা অনেককণ ধোরে তারি পরামর্শ কোত্তে লাগল। মানীকজী আর তার

পুত্র পেস্টনজী ও অন্য অন্য অনেক সাক্ষীর দল হোলেন, তাদের জোবানবন্দী আত্ম-পূর্বিক লিখে শোনান হলো, তারপর জীবাকে ডেকে বলা হলো, অপরাধ অপ্রমাণ করবার পক্ষে তোমার কি কথা আছে বলো, হস্ত-ভাগিনী বলতে গেলেন, কিন্তু পালেন না, বাক্য-শ্রীকে সে সমস্ত পরিত্যাগ কোরেছিল, ভিহা-বিদায় হোয়ে তালু পর্যন্ত স্পর্শ কোরেছিল, ওঠ হুটী এত শুকু হলো যে, অগ্নিতে যেন দগ্ধ হোয়েছে, নিঃসহায়িনী বালা বোনার মায় পাড়িয়ে রইলেন । তাঁর নিষ্করণ নিষ্ঠুর পিতা রস্তুম এক্ষণে অবসর পেয়ে বিচার নিষ্পত্তির প্রার্থনা কোলেন । বিচারপতিরা অনেকক্ষণ ধোরে পরামর্শ কোলেন, তারপর আপনার আপনার স্থানে গিয়ে বোসলেন । খানিকক্ষণ পরান্ত কারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব হোয়ে আছেন, ইতিমধ্যে প্রধান কুলাচার্য্য একটি সঙ্কেত কোলেন, সেই সঙ্কেতের অঙ্-সারে তিনি আপনার আসনে বোসে রইলেন, বাকী চারজন বিচারপতি উঠে দাঁড়িয়ে আপ-নার আপনার হস্ত দীর্ঘ আঙুলে আবরণ কোরে শান্তোক্ত মন্ত্র পাঠ কোঙে লাগলেন । প্রধান কুলাচার্য্য ভিস্তুরী তখন সগভীর স্বরে কমলময়ী জীবীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান কোলেন !!! ঐ দণ্ড-আজ্ঞা শ্রবণ কোরে বালার পিতা সেই নির্দয় পাষণ্ড রসতমের মুখমণ্ডলে আহ্লাদের ঈষৎ হাস্যছটা বিকাশ হোতে দেখা গেল !! ঐ অক্লপ নিষ্ঠুর পিতা তার একান্ত পিতৃভক্ত কন্যাকে পঞ্চা-য়েত-দরবার থেকে টেনে হিঁহড়িয়ে আপনার বাড়ীতে লয়ে গেলেন । পাষণ্ড রস্তুম তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, বিচার-আঙ্গনের আজ্ঞা অঙ্গসারে দণ্ড প্রদান কোরবেন । জীবীর স্নেহময়ী দুঃখিনী মাতা এক্ষণে নিশ্চয় জানুলেন, আর তাঁর সাধ্যসাধনা, আর তাঁর অহুন্নর বিনয় করা কথা, বিচার নিষ্পত্তি হোয়ে চুকেছে, এখন হাকিম-কেরে ত হকুম কিয়বে না । রস্তুম এক্ষণে অপত্য স্নেহে কাতরই হোন, অথবা পূর্বের মতন তাঁর প্রকৃতি তত নিষ্ঠুরই না

হোক, আর তাঁর ক্রমতা নাই যে, কন্যাকে রক্ষা করেন ।

নুরজরককে আমরা চরবহার রেখে এসেছিলেম, জেলে যাত্রার হাতের পায়ের বান্দন খুলে দিয়ে তাঁর মুক্তিদান দেয় । তিনি মুক্ত হোয়েই তাঁর হৃদয়রাগ্য জীবীর নাম ধোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্তে লাগলেন, সে চীৎ-কারটি বুঝা হলো, জীবা তখন কোথায় যে, উত্তর দেবেন ? যে সকল গইবির তাঁর জোড় শূত্র কোরে জীবাকে ছেঁড়াছিঁড়ি কোরে ছাড়িয়ে লয়ে যায়, সেই পশুবৎ নিষ্ঠুর আচ-রণের নিমিত্ত তাদের কটুকাটবা বোলে গালাগালি দিতে দিতে উদ্গারের দ্বার উর্দ্ধ-খাসে দৌড়িতে দৌড়িতে আপনার গৃহে চোলে গেলেন । উদ্গারক রস্তুম তাঁরে যে প্রহার করেন, তারি যাতনার স্বরে গিয়ে নির্জীব-প্রায় হোয়ে পোড়লেন । শেষে সে যাতনা থেকে স্বচ্ছন্দ হয়ে আর একটি মন্ত্রা-ঘাতে অভিভূত হলেন,— তিনি শুন্লেন, তাঁর হৃদয়াম্পদ জীবীর ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত হয়েছে । ঐ নিষ্ঠুর সংবাদ শুনেই তখনি সুবাদারের কাছে চোলে গেলেন । সেখানে উপস্থিত হয়ে অনেক অহুন্নর-বিনয় কোরে এই প্রার্থনা কোলেন যে, তিনি জীবাহত্যাদের কাল-হস্ত নিবারণ কোরে কোমলময়ী জীবীর প্রাণদান দেন । কি পরিভাপ ! সুবাদার বলেন, তিনি গইবির পঞ্চায়েতের বিচার-নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করে থাকেন না, তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত যে নিয়ম,—যে প্রথা চলে আসছে, তা এখনও চলবে । সুবাদার ইঙ্গিত করে আরও এই কথা বলেন, ত্রীলোক সম্বন্ধে কোন প্রকার লজ্জাকর ঘটনা উপস্থিত হলে গইবিরেরা উগ্রমূর্তি হয়ে বেরগে নিষ্ঠুর আচরণ করে, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই বোধ হয়, যোগলেরও উচিত যে, তিনিও চুপে চুপে সোরে পড়েন, নচেৎ তাঁরও কল্যাণ নাই । নুরজরক কিন্তু সে কথার ভীত হোলেন না, তাঁর আত্মকল্যাণের প্রতি ভাবশূন্য অভি-কৃতি ছিল না, জীবীর অস্ত্রই তাঁর ভাবনা হলো । তিনি এক্ষণে উদ্গারের দ্বার সহস্রম

ছুটে বেড়াতে লাগলেন। যখন রসভয়ের বাড়ীর নিকট দিয়ে চোলে যান, সেই সময় শ্রীলোকেশ্বর জন্মনন্দ্রামি শুনে পেলেন, দেখলেন, কারও মুখে কথা নাট, কারও মুখে হাসি নাই, সকলেই বিষন্ন, সকলেই নিরানন্দ, বাড়ীর ঘন অঁধার হয়ে আছে। তাই দেখে নৃজরজ এই কথা চোঁচিয়ে বোলে উঠলেন, “হা আল্লা! হা করুণানিধান! তবে নিকেশ কোরে কেলেছে ॥ সে কাজ রফা হয়ে গেছে ॥” যোগল মরিয়ে হয়ে রসভয়ের বাড়ীর ভিতর ঢুকতে যাচ্ছিলেন, দৌড়েছেন, ঢুকে পড়েন আর কি, এই সময় সেই চিরদাসটি ইশারা কোরে বোলে, “দোহাই আল্লার! অমন কাজ কোরবেন না, বাড়ীর ভিতর যাবেন না।” তারে দেখে যুবা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কোলেন, “জীবা কি নাই? সেট খুদামহী সরলাকে কি তারা খুন কোরে কেলেচে?”

বালক বোলে, “না, তিনি এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু আর বড় বিলম্ব নাই, অতি অল্প অবকাশই তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তার পরেই—” নৃজরজ অমনি বোলে উঠলেন, “তার পরেই আমার প্রাণের জীবার আপাদ-মস্তক ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে! কোমলমহী অচেতন হয়ে নির্জীব হয়ে পড়বেন!”

বালকটি সে কথার উত্তর না দিয়ে যোগলকে সঙ্গে কোরে তাঁর বাড়ীতে লয়ে গেল। যোগল এক্ষণে তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করুন, এদিকে গইবিরের বাড়ীতে কি হচ্ছে, আমরা এখন তাই দেখতে চলেম।

জীবা তাঁর পালকের উপর শুয়ে রোদন কোলেন, তাঁর হুই চক্ষু দিয়ে দরদর অশ্রুধারা বয়ে চোলেছে, এমন সময় ঘরের দরজাটি খুলে গিরে তাঁর পিতা ভিতরে প্রবেশ কোলেন, এখনও তাঁর মুর্জিতা সেই পূর্বের মতন নির্দয় নির্ভর আর অরুণ, কেবল একটা পিরায় মাত্র পার, তার উপর চাপকানও ছিল না, মাথার পাকড়ীও নেননি, উটলোয়জাত বস্ত্রের দ্বারা সদের বাধা রয়েছে, সেখানি আত্মাণু হয়ে চারিদিকে বুলে পোড়েছে, হস্ত

দুখানি আত্মল পর্যন্ত নয়। এক হাতে ছোরা, আর এক হাতে বিষের বাটী ধরা রয়েছে, অন্যথা কল্যাটির নিকট এসে সেই বিষের পাত্র আর সেই মৃত্যু অস্ত্রখানি তাঁর সমুখে রেখে দিলেন। তার পর হাত দুখানি বুকের উপর রেখে, হুই চক্ষু লাগ কোরে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বোলে, “তোরা যা ইচ্ছা হয়, তাই গ্রহণ কর।”

জীবা তাঁর পায়ের তলে পোড়ে “আমায় কৃপা করুন, আমার কৃপা করুন” বোলে চীৎকার শব্দে রোদন কোন্তে লাগলেন, মরাধম পাশও পিতা কেবল একটি মর্ম্বাভাৱী স্নেহের হাসি হেসে চোলে গেলেন, ঐ উপহাসই জীবার করুণার্জ প্রার্থনার প্রত্যুত্তর হলো। জীবা দেখলেন, তাঁর পিতা তাঁর সে প্রার্থনা উপহাস কোরে উড়িয়ে দিলেন, তাই বাল্য নিদারুণ অদৃষ্ট ভেবে চূপ কোরে রইলেন, গুরুদেবের মনে যা আছে, তাই হবে,—এই ভেবে তাঁর পাদপদ ধান কোন্তে লাগলেন। রসভম বোলে, “আর একটি ঘটা মাত্র অপেক্ষা, তার পরেই তোকে মস্তে হবে, আবার তখন আমি আসব, এই বেলা বিবেচনা কর, কিসে মোর্বি,—বিষ খেয়ে, না গলায় ছুরী দিয়ে?” ঐ কথা বোলে গইবির ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জীবা একাকিনী হয়ে আপনা আপনি বোলতে লাগলেন, “হা গুরুদেব! হা বিধাতা! আমার ভাগ্যে ইনিই কি আমার পিতা? এই পিতাই কি আমার তত স্নেহ কোলেন? যিনি আমার জীবনের ভূষণ, গৃহের কুসুম, জ্বলের অলঙ্কার বোলে আদর-আহ্লাদ কোলেন, তাঁর আজ এই মন, এই প্রবৃত্তি? আমারি ভ্রম হয়েছে সন্দেহ নাই, আমি কেঁদে কেঁদে চক্ষের দীপ্তি হারিয়েছি, তাই বুঝি চিনতে পাচ্ছি নে, এ ব্যক্তি আমার পিতা নয়, কোন নিষ্ঠুর দুঃখা হবে। তাই এক হাতে ছোরা, আর এক হাতে প্রাণঘাতী হলাহল উপস্থিত কোরেছে, আমার পিতা যে আমার প্রাণহত্যা হবেন, তা কখনই সন্দেহ নয়, পিতা হয়ে সন্তানের, বিশেষত একমাত্র

সন্তানের প্রাণ নাশ কখনই কোত্তে পারে না, আবার এই ব্যক্তিই যুদ্ধই হয়ে আমার নামে অভিযোগ করে, পিতা হলে কি কখন পাতন ? তুঃসময় দেখে মাও কি পরিতাপ কোলেন ? মা, তিনি নাই, মারা পোড়েছেন ? কি তুঃসময় ! তাই হবে, তিনি মারানি পোড়ে ছেন।” এই সকল আক্ষেপ কোত্তে কোত্তে জীবির মোহ প্রাপ্ত হলো, পালঙ্কর উপর গুরে পোড়ে “মা মা” বোলে ফুলে ফুলে, চৈচিয়ে চৈচিয়ে কাঁহুতে লাগলেন, সেক্ষণ ভরসা পূর্ণ সকাত্তর রোমন শ্রবণ কোত্তে প্রতিজ্ঞা পাশাশাস্ত্রঃকরণ রসতম পিতা ভিন্ন কার অস্তঃকরণ দয়া-রসে প্রাবিত না কর ? বাশা মাখা ফুলে চেয়ে দেখেন যে, তাঁর দেহ-নয়ী মাতা দরজা খুলে গিঃসাড়ে বন্ধের মধ্যে প্রবেশ কোলেন। মাতাকে দেখে ইশারা কোরে বোলেন, তিনি যেন বড় কোত্তে কথা না কন। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অখচ প্রফুল্লচিত্ত জীবা জননীর গলাটি জড়িয়ে ধোরে শোক-সন্তাপ-স্নেহ-উদ্ভূত অশ্রুধারার উপর ঘন ঘন চুঘন কোরে তাঁর গণ্ডদেশ বিস্তৃত কোলেন।

জননী বোলেন, “জীবা ! আর কি কোনো আশাই নেই ?” জীবা বোলেন, “না মা, আর কোনো আশাই নাই, সে কথা পিতা নিশ্চয় কোরেই বোলেছেন, আর এক ঘণ্টা মাত্র বাচ্চার অবকাশ দিবে গেছেন। ঐ দেপো, সাংঘাতিক বিষের পাত্র, আর ঐ দেখো বন্ধকে ছোরা একখানি ধরা রয়েছে, হয় আমি ঐ বিষ পান কোরুবো, নয় ঐ ছোরা আমার রক্ত পান কোরবে। দেখ মা ! আমার ঘেরে কেলবার জন্তে কি নিষ্ঠুর কি পায়ণ্ড উপায়ই করা হয়েছে। পিতা হয়ে একরূপ ব্যবস্থা করা আরও নিষ্ঠুরের কাজ। আমি নিজের জন্তে কিছুমাত্র ভাবছিনে, কিন্তু শেষে যে বড় ভয়-ফর হয়ে দাঁড়াবে, আমি তাই ভাবছি। পিতা এখন কিছু মনে কোলেন না সন্তা, এর পর কিন্তু তাঁকে মর্যাদাস্তিক শোকে বহু হতে হবে, আজন্মকাল হাহাকার কোরে বেড়াতে হবে, শেষে তাঁকে অনেক অহুতাপও কোত্তে হবে যে, এমন দুঃখ কেন কোলেন। এই বেলা

যদি বিবেচনা না করেন, শেষে তাঁকে বড় পত্নাতে হবে, আমার শোক অন্তর্ভেদ হয়ে তাঁর মর্মে মর্মে কালশিরে পোড়বে। তাই বলছি, যদি সাধ্য হয়, তবে এই বেলা আমাকে বাচ্চার চেষ্টা করুন।” ভয়ভয়না জননী বোলেন, “আমরা আর বাক্য ষায় কোরে অমূল্য সময়টুকু অনর্থক নষ্ট কোরুবো না। একপে তুমি যাতে প্রাণদান পাও, আর বামী যাতে উত্তরকালে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আঘাত থেকে রক্ষা পান, তারি চেষ্টা দেখাবাক। অকল্যাণী মেয়ী সাউসীর সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ-পরিচয় আছে ত ?”

জীবা বোলেন, “তাঁর সঙ্গে ভালরূপই জানা শুনা আছে, তিনি আমার বাচ্চাতে পাব্বরেন, তাঁর ক্ষমতা আমার জানা আছে। মা ! তবে আর দেরি করো না, তাঁর কাছে এই দণ্ডেই ছুটে বাও, এই বিষের পাত্র সঙ্গে লয়ে তাঁরে গিয়ে বল, তিনি একটু চেকে দেখে, ঠিক এইরূপ একটি ক্রাজ্ঞম বিষ ভয়ের কোরে যেন, আমার সঙ্গে - কলের যেন দৃশ্যে কোন প্রভেদ না থাকে, আমি এই বিষের পরিবর্তে সেই নকল খিস খাবো, তা হলে সকল দিক রক্ষা হবে।”

জননী বোলেন, “বৎসে ! তোমার মত-লব আমি বুঝতে পাচ্ছিনে, কবরের হাত থেকে কি কোরে বেচে যাবে ? কবর তোমায় দেবেই দেখে।”

জীবা বোলেন, “মা ! তাঁর জন্তে ভাবনা কি ? আমি কবর থেকে পালিয়ে প্রস্থান করুবো। সেই লোহার জালের উররে ত আমার শুইয়ে রাখবে ? তা হলেই হলো। কবরের দেওয়াল কিছু অধিক উচ্চ নয়, তখন এ দেশের পায় নমস্কার কোরে বিদায় হবো।”

একপে উৎসাহপ্রাপ্তা জীবির মাতা বিষের পাত্র থেকে একটা শিশিতে খানিক বিষ ঢেলে নিয়ে মেয়ী সাউসীর বাড়ীতে চোলে গেলেন। মধ্যমী সাউসী ঐ ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ কোরে আতঙ্কে কাঁপতে লাগলেন। এদিকে জীবির মাতা, “ওগো



আমার জীবাকে বাঁচাও, তারে রক্ষা কর, আমার মা বোলে ডাকতে আর কেউ নাই, ওগো তোমার পায় পড়ি, তারে বাঁচাও, তারে রক্ষা কর,” এই বলতে বলতে ধড়াস কোরে পড়ে গিয়ে মূর্ছা গেলেন। ব্যাকুলিনী পুনরায় চেতনা পেয়ে চৈতন্যে বোলতে লাগলেন, “জীবা আমার সবে-ধন, তারে তুমি বাঁচাও, দোহাই তোমার। তারে তুমি বাঁচাও। আমি তোমার হাতে ধোচ্ছি, পায়ে ধোচ্ছি, ঘোড়-হাত কোচ্ছি, তুমি তারে প্রাণদান দাও, এ ঘোর বিপদে তুমি না কাঁড়ারি হলে আমার আর উপায় নাই। আমার মা বোলে ডাকতে আর কেউ নাই। জীবা আমার শিবরাত্রের শল্যে, সে আমার আঁধার ঘরের মাণিক, তারে তুমি বাঁচাও।” এইরূপ করুণ আক্ষেপ কোরে শোকোন্মাদিনী মাতা বিস্তর অহুন্নয়-বিনয় কোন্তে লাগলেন।

মহামতি সাউলী বোলেন, “যদি ক্ষমতা হোয়ে উঠে, তবে তোমার জীবাকে অবশ্যই বাঁচাবো, সে যে আমার বাঁচাবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ হারাতে বসেছিল, আমার কি তা স্বরণ নাই? জীবা! তুমি আমার প্রাণের জীবা, তুমি মহামনা, তুমি অমায়িক উদার-সভাবা, তোমায় অবশ্যই বাঁচাবো।” মেরী এই কথা বোলে, সেই বিষের শিশিটি হাতে কোরে লয়ে, যে ঘরে ঔষধ প্রস্তুত হয়, সেই ঘরে প্রবেশ কোলেন। আফিম-ঘটিত একটি নূতন পের প্রস্তুত কোরে, সেটি একটি বড় বোতলে ঢেলে, সেই বোতলটি একপে হর্ষ-প্রকুল্লিত জননীর হস্তে প্রদান কোলেন। এ আরকের ক্রম এই যে, পান কোলে গভীর অচেতনে নিমগ্ন করে, সেটি তার অব্যর্থ শক্তি। তার আকার আর বর্ষ আসলের সঙ্গে ঠিক সমান। জননী সাউলীকে বিস্তর সাধু-বাদ দিয়ে ব্যাকুলপ্রাণা সন্তানটির কাছে ছুটে চোলে গেলেন। এ দিকে সময়ও প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে। বালার মাতা কস্তার পের বিষ আর একটি বড় পাত্রে কেবল ঢেলেছেন, সে পাত্রটি ঘরের এক কোণে পোড়েছিল, আর তার পরিবর্তে মেরীর দেয় আফিম-ঘটিত

পের সেই বিষের পাত্রে রেখে কেবল বোয়েছেন, সন্তানটির কাছে জন্মের শোধ বিদায় হবেন বোলে স্নেহ দেখিয়ে মায়া বাড়াচ্ছেন, এমন সময় রসতম আসছেন, তাঁর পায়ের শব্দ শুনে গেলেন। পাছে কোন সন্দেহ জন্মে, তাই জীবার মাতা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সোরে পোড়লেন। নির্দয় আমাকে আহ্বান করার শিমিত সন্তানবৎসল জননী বিষমচিন্ত কস্তাটিকে একাকিনী রেখে চোলে গেলেন। গইবির ঘরের মধ্যে ঢুকেই চীৎকারশব্দে বোলেন, “সময় ত অনেককণ হোয়ে গেছে, জীবা! তুই কি স্থির করেছিস? ছোরা, না বিষ?”

জীবা শুনে কাঁপতে লাগলেন, এবারও বোলেন “বাবা! তুমি আমাকে প্রাণে মেরো না, দোহাই তোমার, এ যাত্রা আমার মাগ করো।” গইবিরের হৃদয় কিন্তু লোহার পাত দিয়ে মোড়া ছিল, তাই তার মধ্যে করুণার কোমল মাধুর্য-রস প্রবেশ কোন্তে পাত্তো না। রসতম সেই বিষের পাত্র আর সেই উজ্জ্বল কাস্তির ছোরাখানি হাতে কোরে লয়ে বোলেন, “তোরা ইচ্ছা কি, বল।” জীবা বিষের পাত্র দেখিয়ে দিয়ে মোন হোয়ে রইলেন।

রসতম ছোরাখানি এক পাশে রেখে দিয়ে বোলেন, “আচ্ছা, তাই ভাল, তবে এখন খেয়ে ফেল।” জীবা বোলেন, “আচ্ছা, দাও খাই।” রসতম জীবার মুখের কাছে বিষের বাটীটি ধোঁ-চৈতন্যে বোলেন, “এক নিশ্বাসে বেবাকটুকু খেতে হবে।” “আচ্ছা, হোয়েছে, এতকণের পর অন্তঃকরণ জুড়োলো, এখন শুয়ে মোরে থাক। রে কুলখাতিনী পাপীয়সি! এখন তুই দুর্কর্মের প্রতিকূল ভোগ কর।” এই বোলে রসতম আর সেখানে দাঁড়ালেন না, তাড়াতাড়ি ঘরে থেকে বেরিয়ে বারদিক দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলেন।

আফিম তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ফল দেখালে। রসতম এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে দেখেন, তাঁর কস্তা শব হোয়ে রয়েছে, এখন তিনি নিশ্চিন্ত হোলেন, সংক্রিমার আয়োজন বোন্তে তখনি অহুমতি দিলেন।

এ দুটিকে নরজরজ অন্তর্দাহে ছুটুকট কোচ্ছেন, তাঁর যেন যমগন্ধা হোয়েছে, সর্ক-শরীর দিয়ে কাঁদা। বোয়ে চোলেচে। তার দেহ মন যেন কাল-অগ্নিতে দগ্ধ কোচ্ছিল। মর্মেভেদক মনোদাহে অধীর হোয়ে যুবা যোগল পর্ভু গিস চিকিৎসিকার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার অভিপ্রায় কোলেন, যদি কোন কৌশলে জীবার প্রাণ রক্ষা হয়, তাঁর একটা পরামর্শ করা। এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, নচেৎ তাঁর নিজের ওত গরজ ছিল না। সে, মেরীর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। একখান সালে সর্বাঙ্গ ঢেকে ঘরে থেকে কেবল বেরিয়ে-ছেন, এমন সময় মেরী স্বয়ং তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত, তাঁর মুখ-অবয়বে, বিময়মূর্তি চিত্রিত বোয়েছে। স্ত্রী কবিরাজী জিজ্ঞাসা কোলেন, “কোথায় যাবার মনন কোরেছেন? এখন স্থির হোয়ে একটু বসুন, আমি যা বলি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন।” এ কথা শুনে যুবা ফিলেন, মেরীও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এলেন। বাড়ীতে এসে স্থির হোয়ে বোসলে পর, সাউসী জীবার সম্বন্ধে তাৎকথ্য তাঁর থলে বোলেন। মেরী যেক্রমে জীবার প্রাণরক্ষা কোরেছেন, যুবা সেই কথা তাঁর মুখে শুনে আক্লাদে আঁটখান হোতে লাগলেন, তাঁর নিবারণ না কোলে নীচে গড়িয়ে পোড়ে জীবার প্রাণদায়িনীর পাদচুখন কোন্তেন, মেরী কিন্তু তাঁর এই কথা বোলে নিষেধ কোলেন, “যুবা! সেটি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হোয়েছে, আমি কেবল যৎসামান্য অকিঞ্চিৎ-কর উপলক্ষ্য মাত্র, আমার যা করা উচিত, তাই আমি কোরেছি, তার অতিরিক্ত কিছুই কোরিনি, সাধুবাদ আমায় না দিয়ে, যার জীবনরক্ষক বাহু দুঃখিনী জীবার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এখনও পর্যন্ত বিস্তার প্রসারিত হোয়ে আছে, তাঁকেই দাও। এক্ষণে তোমার যা কর্তব্য, তাই কোন্তে কেবল বাকী আছে, নচেৎ সেই কবরস্থানে তাঁর প্রাণত্যাগ হবে। এখনও পর্যন্ত সংকারের আয়োজন হোচ্ছে, গইবিরেরা যে প্রণালীতে মৃত দেহের সংকার করে, তোমার তা বেশ জানাই আছে। একটি

প্রকাণ্ড খাতের মুখে লোহার জাল বিছিয়ে তার উপর মৃতদেহ রক্ষা করে। স্বর্ঘ্যের উত্তাপে রস-রক্ত-মাংস প্রভৃতি শুক হোয়ে শরীর অস্থিসার হোলে, কি শকুনির পাশ পোড়ে খুড়ে খুড়ে থেয়ে দেহটি অস্থিযুক্ত অব-শিষ্ট কোলে তখন সেই অস্থিখণ্ডগুলি সোরে সোরে গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যে পর্কতের উপর তাদের সমাধিস্থান অবস্থিত, তাও তুমি জ্ঞাত আছো, তবে আর বিলম্ব করো না, এখনই সেইখানে ছুটে যাও। যে সকল গইবির শবের সঙ্গে যাবে, দেখো সাবধান। তারা যেন তোমার দেখতে না পায়, তাদের নিকটেও তুমি যেও না। জীবার নিমিত্ত আহাৰ আর পুষ্করের পোষাক সঙ্গে লইও। একটি উচ্চ বৃক্ষের উপর থেকে অলঙ্কিত হোয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখবে, কবরের কোন্ দিকে জীবার কবর দেয়। রজনী যখন তার কক্ষাবরণ চতুর্দিকে বিস্তার কোরবে, সেই সময় প্রাচীরের উপর উঠে বোসে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আফিমের ঘোর ছুটে না যায়, সে পর্যন্ত সেট-খানেক থেকে চোকা দিয়ে দেখো। জীবা যখন নিরীয়ে চৈতন্য লাভ কোরবেন, সেই সময় এই পের তাঁকে পান কোন্তে দিও, এরি শুণে তার শরীর সবল আর সজীব হবে। বাকী যা কোন্তে হবে, সে ভার আপনার উপর, তবে আমি এই কথা মাত্র বোলতে চাই, তোমাদের যখন উভয়ের প্রাণের প্রতি যাবা আছে, তখন আর তোমাদের এ দেশে থাকা নয়, পালিয়ে একেবারে সালসেটে চোলে যেও, সেখান থেকে একখানা নৌকা ক্রেয়া কোরে স্বদেশে যাত্রা কোরো। তবে আর দেরি করো না, চটপট কোরে বেরিয়ে পড়ো, সাবধান হোয়ে চোলে, সব দিকে দৃষ্টি রেখো, ধীর প্রাজ্ঞের জ্ঞান কাজ করো, জীবা তোমারি হোয়েছে, আমি এক্ষণে চোলেম।” যুবা দয়ালু মেরীকে পুনর্বার সাধুবাদ দেখার উপক্রম কোচ্ছিলেন, মেরী কিন্তু তাঁর ইশারা কোরে নিষেধ কোলেন। সাউসী চোলে গেলে, নর-জরজ প্রিয়তমার উজীরের উপায় ভাবতে লাগলেন। গভীর শোকের অভলম্পর্শে এক-

বার নিমন্ত্রণ হোয়ে আবার তখন তখন উল্লাস-তরঙ্গের উপর সীতার দিয়ে ভেসে বেড়ান এত অসঙ্গত আর এত অস্বাভাবিক যে, মেরীর কথাগুলি শ্রবণ কোরে সে কথার প্রতি যুবার বিশ্বাস হোচ্ছিল না, তাই অনেক-কণ ধোবে-কিন্তাস্তের ইন্ডায় হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অকস্মিকের আর কুলতা নিবারণ হোয়ে আবার যখন তিনি প্রশান্তচিত্ত হোলেন, তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমতা হোয়ে মন যখন পুনরায় স্থির হলো, তখন মেরীর উপদেশ-মত সেই ভগ্নবেশের আর আহারের আয়োজন কোত্তে চোলেন। যুবা সিধে রাত্ৰি ধোবে তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে সেই পাহাড়ের ঘাটে চোলে গেলেন। ঐ পাহাড়ের উপর কতদূর পর্যন্ত ব্যাপিয়া অনেকগুলি ইমারত, ইমারতগুলি কবচেন্দ্রি। নুরজঙ্গম যত মনে নোরেছিলেন, চতুর্দিকের প্রাচীরগুলি তত উচ্চ বোলে হলো না। একপাশে সন্ধ্যার রুম ছায়া অবগুণ্ঠন হোয়ে দর্শনিক আচ্ছাদন কোত্তে লাগল। সমাধি-মন্দিরের নিকটেই একটি বৃহৎ ভাগবৎ ছিল, যুবা একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোরে দেখলেন, কেউ কোথাও নাই, এই অবসরে আস্তে আস্তে সেই বৃক্ষের উপর উঠে বোসলেন, মনে কোলেন, তারি নিকটেই তাঁর প্রিয়তমায় যতদেহ রক্ষা করবে। এখানে সব দিক্ অবা-কুল, অহুষ্টি আর স্থির; কেবল উদর-তপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃধ্রী-মলের কঁয়া কঁয়া রব, আর তাদের পক্ষাফালনের চটাং চটাং শব্দ মধ্যে মধ্যে যুবাকে বিরক্ত কোত্তে লাগল, গৃধ্রীরা তখন কঠার কঠার নরমাংস বেয়ে উদর মোটা কোরে আপন আপন কুলায়ে ফিরে আসছিল। শব্দেহের সংসার সমা-রোহ কতক্ষণে আগমন কোরবে, মোগল বোসে বোসে তাই জাবতে লাগলেন, কিন্তু প্রণালীতে প্রস্থান কোরবেন, সে কৌশল পূর্কেই স্থির কোরে রেখেছিলেন। যুবাকে অবিকল্প অপেক্ষা কোরে থাকতে হলো না। একটু পরেই কতকগুলি লোক একটা লোহার চৌপারার উপর একটি দেহ মাথায় কোরে

লোয়ে পাহাড়ের তল বেয়ে সরাসর একটানা চোলে আস্তে দেখলেন, অনেকগুলি গইবি-রও চৌপারার সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। তারা দেখতে দেখতে যে পাহাড় মাথায় উপর তিনি বোসে ছিলেন, তারি নীচে এসে দাঁড়াল, তাই দেখে তাঁর এত ভয় হলো যে, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেলতে সাহস হোচ্ছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, যারা শবের সঙ্গে গেছিল, তারা কেউ একবার আহা উহ কোরেও আক্ষেপ প্রকাশ কোলে না, কি একবার শোক ছুঁধের ভাণ কোরেও মনস্তাপ জানালে না। একটিমাত্র মশাল ভানের আগে আগে লয়ে অস্ফুলি, তারি আলোতে যুবা তাঁর প্রাণপ্রতিমার দেহটি দেখতে পেলেন। 'পূর্ব্বরাত্রে তাঁর কোল উল্লাস কোরে যখন তাঁরে জোর কোরে ধোরে লয়ে যায়, সেই সময় যুবতীর বে বস্ত্র আর যে অলঙ্কার পরা ছিল, এখনও সেই পরিচ্ছন্ন পরা আছে দেখলেন। সঙ্গে অদিক লোক আসেনি, পাশ্চাত্তম তার মধ্যে ছিলেন কি না, যুবা তা ঠাউরে উঠতে পারেন না। গুণতিতে সর্কস্ক ১২ জনের অধিক নয়। ছুঁড়ন কোরে একখানি শেতবস্ত্রের কোণ ধোরে আছে, সকলেই মৌন হয়ে আশানৈর দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ কোলে। একটি পরেই সমুদ্র লোক বেরিয়ে এসে দরজাটি রুদ্ধ কোরে, পাহাড় থেকে নেবে চোলে গেল। যুবা সেটি সহ্যচক্ষে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন। তিনি পূর্কে জানতেন, কখন কখন কুসংসার-আসক্ত দেশাচারের অহুসারে এক ব্যক্তি পশ্চাতে থেকে চৌকী দিয়া দেখে, গৃধ্রীরা যতদেহের কোন্ চক্ষু প্রথমে খুঁড়ে থাক, পরলোকে যত ব্যক্তির ভাগ্যে সহগতি কি অযোগতি লেখা আছে, ঐ লক্ষণ দেখেই তারা তা স্থির কোত্তো। জীবায় উপলক্ষে কিন্তু কেউ লেখানে উপস্থিত ছিল না, তাই দেখে নুরজঙ্গম আনন্দে পুলকিত হোলেন। জীবা যোর পানী, তাঁর ভাগ্যে বা লেখা আছে তা তারা পূর্কেই স্থির কোরে রেখেছিল, বোধ হয়, সেই বিবেচনা কোরেই কেউ আর

৬৪ কোরে চৌকী দিয়ে দেখলে না যে, শকু-  
নীরা তার কোন্ চোক প্রথম খুঁড়ে বার-কোরে  
নিলে। সকলেই আপনার আপনার বাড়ী  
চোলে গেছে, এক্ষণে স্থানভূমি উদাস, তাই  
দেখে নরকরক গাছে থেকে নেমে প্রেতভূমি-  
বেষ্টিত প্রাচীরের উপর উঠবার উদ্যোগ  
কোত্তে লাগলেন। তাঁর প্রাণময়ী জীবন  
দেহ যে স্থানে রক্ষা করা হোয়েছে, 'অমুমান-  
বলে সেই স্থানটি লক্ষ্য কোলেন'। প্রাচীরটি  
খিশয় দূর আর তার গাথনীও অতি পরি-  
পাটী, তাই যুবা তার গায় পা রাখতে পারেন  
না। ঐ স্থানে বড় বড় পাথরের ধাম আর  
ছোট ছোট পাথর চারিদিকে বিস্তর ছড়াছড়ি  
যে পড়েছিল, সেইগুলি উপরোক্ত সাক্ষিয়ে  
তার উপর পা দিয়ে ছেওয়ালের মাথায় গিয়ে  
উঠলেন। নর-অস্থিগুলি সোরে সোরে যন্-  
কন শব্দে খাতের নীচে গিয়ে পোড়ছে, মোগল  
প্রাচীরের শিখর উপর বোসে তারি শব্দ  
শব্দে লাগলেন। সেখানে এমন একটা  
শব্দ ভাপসা ভগ্নক নির্গত হোচ্ছিল, তার  
অজ্ঞানে যুবার সঙ্গশরীর ঘিন্ ঘিন্ কোরে  
ঝম ঝম হোতে লাগল, ঘন ঘন উকি হয়ে  
চুখ দিয়ে থুথু উঠতে লাগল। মোগলের কিন্তু  
মনে মনে প্রতিজ্ঞাই ছিল যে, স্থান যতই কুৎ-  
সিত আর বতই ভয়াবহ হোক, তিনি কিছু-  
তেই অপদহ হবেন না, ভয়ঙ্কর আসে অভিভূত  
হোলেও তিনি পরাজুখ হবেন না। যুবা  
মাথারের অল্পষ্ট ঝাপসা ঝাপসা আলোতে  
দেখলেন, তাঁর প্রাণময়ী দেহটি লোহার  
ঝাঁঝর উপর পোড়ে আছে, সেই বিকটা-  
কার কাল খাতের করাল আস্যের উপর চালু-  
ভাবে ঝুঁকে রয়েছে। কাল-ভামসী এক্ষণে  
ককপক্ষ বিস্তার কোরে চতুর্দিক চেকে  
কেলেছে, তিমিরাবৃত রজনী বত গভীর হয়ে  
আসতে লাগল, জীবন সিকৎকর্ষ কল্যাণকর  
উদ্ধারের নিমিত্ত যুবার মনে ততই ভয় আর  
সঙ্কেত উপস্থিত হোতে লাগল, তিনি আক্ষেপ  
কোত্তে লাগলেন যে, আসবার সময় একটা  
মশাল কি আলো জালবার কোন প্রকার উপ-  
করণ সঙ্গে কোরে কেন আনলেন না। গৃধি-

নীরা তাঁর মাথার উপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,  
পক্ষীগুলির মাথায় যেন টনক ছিল, কি তারা  
যেন হাত গুণে জানতে পেরেছিল যে, আজ  
একটা নতুন টাটকা আহার তাদের ভাগ্যে  
ঘুটে যাবে। মোগল পক্ষীগুলির প্রতি কোন  
প্রকার উৎপাত কোলেন না, ভয় দেখিয়ে  
তাড়িয়ে দেওয়া, কি হাঁকাহাকি কোরে বার  
কোরে দেওয়া তাঁর বিবেচনার ভাল বোধ  
হলো না। তিনি মনে কোলেন, তারা যদি  
জীবন দেহের উপর এসে বসে, তা হোলে  
আফিমের বোর কেটে গিয়ে বালার চৈতন্য  
জন্মিলেও জন্মিতে পারে। পক্ষীগুলি যৎ-  
কালীন সেই লোহার জাল বেড়ে মন্দাদরে  
খিটখিট কোরে শূন্যের উপর উড়ে উড়ে  
বেড়াচ্ছিল, যুবা সেই সময় খুব সতর্ক চক্ষে  
তাদের গতি-প্রবর্তি নিরীক্ষণ কোরে দেখ-  
ছিলেন। তাঁর ভয় হলো, কি জানি, তাঁর  
প্রিয়তমা ত এ পদাঙ্ক কালনিজার ছায় গভীর  
অচেতনে অভিভূত আছেন, সঙ্গশরীর নিষ্পন্দ  
ও সংজ্ঞাহীন, কি জানি, পক্ষীগুলি যদি প্রকৃত  
শব্দই মনে কোরে চক্ষুহুটি খুঁড়ে যায়। কত-  
ক্ষণে দেহটি একটু নোড়ে উঠবে, তাই দেখ-  
বার নিমিত্ত যুবা অতিশয় অধীর, অতিশয়  
উৎকর্ষিত হোলেন। পক্ষান্তরে, জীবা যদি  
চেতনা পেয়ে চৌপায়ার উপর হঠাৎ উঠে  
বসেন, তাতেও যে কল দাঁড়াবে, যুবা সে ভয়ও  
কোত্তে লাগলেন। মোগল উভয়-সঙ্কেটে  
পোড়লেন, তিনি এক্ষণে দুই দিকেই অন্ধকার  
দেখতে লাগলেন। একে রজনী বোর অন্ধ-  
কার, আবার আফিমের প্রভাবে মনের ভ্রান্তি  
সহসা যাবার নয়, চক্ষেরও বোর হঠাৎ দূর  
হবার নয়, বিশেষতঃ জীবা যে ভাবে ওয়ে  
আছেন, সে অতি সঙ্কট অবস্থা, তাও আবার  
যুবতী জ্ঞাত নহেন, যুবার মনে এই ভয় হলে  
যখন প্রাণের প্রতি এতগুলি সংশয়, এতগুলি  
বিষ রয়েছে, তখন আর তাঁর নিস্তার নাই,  
হয় ত বালা সেই করাল খাতের অগাধ  
গর্ভে পতিত হবেন, তার ধোরস্বপ্ন গভীর  
অন্তলম্পর্শ থেকে তাকে আর পুনরায় ফিরে  
আসতে হবে না।

অনেকক্ষণের পর একটি শকুনি জীবার দেহে এসে বোসলো, বোসেই কিছু আতঙ্কের ছায় বিকটরবে চীৎকার কোরে পাখা ঝটপট কোন্তে কোন্তে তীরের মতন সেখান থেকে তখনই উড়ে বেরিয়ে গেল, তাই দেখে নূর-জরঙ্গ অজ্ঞান কোলেন, জীবা তবে নড়ে উঠেছেন। যুবা আস্তে আস্তে অতি কোমল স্বরে “জীবা” বোলে ডাকলেন, কখন উত্তর না পেয়ে একাগ্রমনে কান পেতে রইলেন, তাঁর যেন অল্পভব হলো, দীর্ঘনিশ্বাসের মুহূর্ত্ত কোমল স্বাকার শুনতে পেলেন। মোগল পুনরায় জীবার নাম ধোরে ডাকলেন, এই-বার অকি শীর্ণ মুহূর্ত্তস্বরে উত্তর পেলেন।

যুবতী বোলেন, “কে কথ্য কয়? জীবা বোলে কে ডাকছে? আমি কোথায় এসেছি?”

যুবা এইকথা বোলে সতর্ক কোরে দিলেন, “স্থির হয়ে চুপ কোরে থাকো, নোড়ো চোড়ো না, তোমার কাতর হয়ে ষোড় হাত কোরে বলছি, নোড়ো চোড়ো না, যেখানে যে ভাবে আছো, সেইখানে সেই ভাবে স্থির হয়ে থাকো। তুমি গইবিরদের প্রেতভূমিতে এসেছো, আর এক পা মাত্র সোরেছো কি, অমনি অভল গভীর কূপে নিমগ্ন হয়েছ, একটু অপেক্ষা করো, তোমার নূরজরঙ্গ তোমার কাছেই হাজির আছে।”

জীবা বোলেন, “কি বোলছো তুমি? কার নাম কোছো? হুরজরঙ্গ কে? কখন কবরে এগেল, সত্যি সত্যিই তি কবরে এসেছি?”

যুবা বোলেন, “হাঁ, তুমি কবরেই এসেছো বটে; এক তিলও নোড়ো চোড়ো না। প্রিয়তমে! অন্ধকার রাত দেখে আমার মনে বড় ভয় হোচ্ছে, ভয় হবার কারণও অনেক আছে, এই সময় কেউ যদি একটা আলো ধরে তোমার পথ দেখিয়া আনে, তবে আমি তারে ব্রহ্মাণ্ড পুরস্কার করি। আমি ঠিক তোমার মাথার উপরেই আছি।”

সৌভাগ্যক্রমে যুবা একগাছা রসী সঙ্গে কোরে এনেছিলেন, সেই রসী গাছটি নীচে

নামিয়ে দিলেন, জীবারও একপে বিলম্ব চৈতন্ত হোয়েছে, যুবতী রসীগাছটি হাত দিয়ে শক্ত কোরে ধোলেন, তাই দেখে মোগলের প্রাণে বড় আনন্দ হলো। যুবতী যে অবস্থায় আছেন, সে অতি ভয়ানক, তাঁর অবস্থিতির আকার প্রকার পূর্বে অবগত করান হোয়েছে। মোগলও সে স্থানের ভাব-গতিক অবগত ছিলেন না, যিনি যে অবস্থায় আছেন, প্রভাত পর্যন্ত তিনি সেই অবস্থায়ই স্থির হোয়ে থাকবেন, এই পরামর্শ অবধারিত হলো। স্বর্ঘ্য উদয় হোলে পথাপথ দেখে বিপক্ষে হাত এড়াতে পারবেন। জীবা প্রভাত-ছটা বিকশিত হবার অনেক পূর্বে ধোর অভিব্যক্ত অবস্থা থেকে চেতনা লাভ কোরে যা যা ঘটেছিল, সেইগুলি স্বরণ কোন্তে লাগলেন। স্মন্দরী যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবে থেকে মোগলের সঙ্গে কথায় কথায় রাজি প্রভাত কোলেন। প্রণয়ী প্রণয়িনীরা কাছে সে রাজি কত বড়ই বোধ হতে লাগল, শেষ যেন হোয়েও হোচ্ছিল না। প্রভাত হোতে যতই দেরি হতে লাগল, ততই তাঁরা অস্থখী হোতে লাগলেন, অনেক বিলম্বের পর তাঁদের অভিলষিত স্বর্ঘ্য-উদয়ে বিমল মূর্ত্তি দর্শন কোলেন। অরুণোদয়ের যেতচ্ছটার অম্পষ্ট শীর্ণ রেখা তাঁদের নয়ন প্রকুলিত কোলে পর, অরুণ-প্রভা যত সরায়ে বিকশিত হোতে লাগল, ততই তাঁরা বতী অদ্ভুত অদ্ভুত বিভীষিকা দৃশ্য দর্শন কোরে লাগলেন। গোরস্থানের চতুর্দিকে বেষ্টিত লৌহজালের উপর যতদেহগুলি পোয়ে আছে, অর্ধেক দেহ রৌদ্রতাপে শুকিয়ে তুষড়িয়ে গেছে, বাকী অর্ধেক শকুনিরা থুঁতে থুঁড়ে খেয়ে কেলুছে। তাজা তাজা মড়া উপর বোসে গৃধিনীগুলি তখনও পর্যন্ত আপনাদের উদর মোটা কোচ্ছিল, নীচে সোঁ ভয়ঙ্কর কালহর, তার আধাআধি কড়া আর নরকপালে পরিপূর্ণ। এক প্রকা অসহ্য চামুসে পক্ষ গোরস্থানটি ব্যাে পোড়েছে। মোগল বোলেন, “প্রিয়তমে ওঠো, আর বিলম্ব করবার সময় নাই, লৌহ

শালের পাড়গুলির প্রতি একবার চেয়ে দেখে,  
তারি উপর পা স্থির কোরে রাখতে হবে,  
সৌগাছটা বেশ শক্ত কোরে ধরো, আল্লার  
আশীর্বাদে খেন ভূমি নিরাপদ হোয়েছো ।”  
প্রত্যেকের বাতপাশ থেকে যুবতী এখনও  
অনেক অন্তরে আছেন, অনান তাঁকে চারি  
পাশে প্রাচীরের গা বেয়ে উঠতে হবে, তবে ত  
লালা কবররূপ কাল কারাবাস থেকে মুক্তি  
পাবেন, তার এখনও অনেক বিলম্ব আছে  
বিবেচনা হোতে লাগল । বালা কিঙ্ক সেই  
কনী আর যুবার বলিষ্ঠ বাহু,—এই দুই  
সহায় অবলম্বন কোরে অবলীলাক্রমে সে  
শক্ত থেকে উত্তীর্ণ হোলেন । জীবা দেও  
শালের উপর যুবার পাশে এসেই উপস্থিত  
হোলেন । একপাশে অপরিমিত আনন্দ-অশ্রু  
প্রণয়ী প্রণয়িনীর গন্ত বেয়ে গড়িয়ে পোড়তে  
লাগল । যুবলধারায় বরণের পর, কাদা  
কেটে গিয়ে রাস্তা ঘাটী ক্রমে পরিষ্কার হয়,  
সেইরূপ নারক-নায়িকার অজস্র অশ্রুপাতের  
পর শোক-সম্ভাপ যুরে গিয়ে তাঁদের হৃদয়  
বিমল আনন্দে বক্ বক্ কোতে লাগল ।  
সেই কাল-সমাপ্তিক্রমে থেকে উত্তীর্ণ  
হোয়ে জীবা যখন মাতা বসুমতীর অংশ  
কোড়ে স্থান পেলেন, তাঁদের সে সময়ের  
আনন্দময় সুখ, মঙ্গলময় আশ্বাস, আর  
কল্যাণময় পরিতোষ বর্ণন কোরে শেষ করে,  
কার সাধ্য ?

মোগল উচ্চকণ্ঠে বোলেন, “জীবা ! সত্যি  
সত্যিই যে তোমায় আমি ফিরে পেলুম ।  
সত্যি সত্যিই যে মৃত্যুর মুখ থেকে তোমায়  
ফিরিয়ে আনলুম ! এবার একটি সুখের  
সংসার-আশ্রমে নূতন হোয়ে প্রবেশ কোরবে  
বোলেই কি ঐ ছুটি নীলোজ্জ্বল অঁধি পুন-  
প্রফুল্লিত হলো ? তোমার নির্ভর স্বজাতীয়ের  
মধ্যে আর কল্যাণ দেখা দিও না, তারা সত্যি  
সত্যি পাবন্ত, সত্যি সত্যি চঞ্চাল । তাদের  
করাল কাল-মূর্তি মনে হোলে বাস্তবিক  
আমার মন-প্রাণ জ্বালা কেঁপে উঠে । এখন  
আর তোমায় অনলের পূজা-অর্চনা কোন্তে  
হবে না, এখন অবধি পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাস

হোয়ে কেবল এক মাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা  
করো ।”

জীবা বোলেন, “জাই করুণা, অবশ্যই  
কোরবে, আর আমি গইবির হাশে না, গই-  
বির হওয়া যত সুখ, তত আর জানতে বাকী  
নাই, আজ অবধি আমি তোমারই কোলেম ।  
নূরজরঙ্গ ! আল অবধি আমার মন, আমার  
প্রাণ আমার নয়, সে সকল তোমারই  
হলো, শুদ্ধ তোমারই জন্তে আমি এ প্রাণ  
রেখেছি, আমার এখন দরদেখ লয়ে চলে ।”

আনন্দবিহীন যুবা সাধের আরাধ্য ধন  
জীবাকে পেয়ে বৃকের-মধ্যে চেপে রাখলেন ।  
মেরি-দত্ত পোষ্টাই যুবা বিম্বিত হননি, জীবা  
তা পান কোরে অনেক প্রকৃতিস্থ হোলেন ।  
তখাচ আফিমের নেশা এখনও ভালরূপ ছুটে  
নি । জীবা যোর ঘঘোর দেখতে লাগলেন,  
আর যেন দিকভুল হোয়ে দুটো একটা বিহ্ব-  
লের কথাও বলতে লাগলেন । মোগল একটু  
তফাতে গিয়ে তাতে ভাত চোড়িয়ে দিলেন,  
জীবা এই অবসরে পুরুষের পরিচ্ছদ পোরে  
একটি নবীন মোগল সেজে নূরজরঙ্গের পাশে  
উপস্থিত হোলেন । বাবার এই কৃত্রিম বেশ  
যেন প্রতিজ্ঞা কোরে বোলে, সে সকলকেই  
পরাজ্ঞ কোরবে, কেউ তাঁরে চিনতে পারবে  
না । কলেও সে কথা মিথ্যা নয়, কারও সাধ্য  
ছিল না যে, গইবির-কথা বোলে তাঁর পরি-  
চয় পরিজ্ঞাত হয় । জীবার নিজের পরিচ্ছদ-  
গুলি পৌরস্থানের শত মধ্যস্থলে ছুড়ে ফেলে  
দেওয়া হলো, তার পর উভয়েই পিন্দি-  
রক্ষার মতন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার কোরে  
সুস্থ হোলেন, বা আহার কোলেন, তপ্তির  
সহিতই কোলেন । ক্রমে বেলা হোয়ে পোড়ল,  
রৌদ্রের তেজ ক্রমে বেড়ে গেল, তাঁরা তাড়া-  
তাড়ি পাহাড় থেকে বেবে সিধে পথ ধোরে  
সালুসেট অভিমুখে চোলেন । একটি থেয়া-  
ঘাট পার হোয়ে চটপট কোরে বোম্ব  
ছাড়িয়ে পড়লেন, তার সেই সঙ্গে রুধির-  
দর্শনপ্রিয় গইবিরদেরও জন্মের মতন পরি-  
ত্যাগ কোরে চোলেন, এইটিই বিবেচনা  
হলো । নূরজরঙ্গের সঙ্গে পাখের ছিল, তাই

একখানা নৌকা ক্রেয়া কোরে খানে সহর থেকে বাসীন সহর পর্যন্ত পৌছিতে কোন কষ্ট বোধ হগো না। সেখান থেকে কোন মহাজনের জাহাজে উঠে একেবারে গুজরাটে চোলে গেলেন, তত্ৰাট থেকে আবার যথাসময়ে কাষের অভিলষিত তটে নির্ধায়ে উপস্থিত হোয়েন। সেখানে পৌছে জীবা ষৈতুক ধর্ম বিসর্জন কোরে ইসলামের ধর্মগ্রহণ পূর্বক বীর-পুরুষ নৃসিংয়ের প্রেমময়ী সহ-ধার্মিনী হোলেন।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

“বাক প্রাণ, থাকুক মান ।”

এত দিনের পর অনাথা জীবির পথিক রক্তে নিদারুণ ঘেব-হিংসা আর অহঙ্কারের পরিভূষ্টি সাধন করা হলো। রসূতম বড় লোক, তাঁর মতন বড় লোক আর একটি খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বজাতীয় ধর্মের প্রতি তাঁর একান্ত প্রীতি। গইবির কণের কুশলিক, গইবিরবংশের মান-সম্মত প্রাণ দিয়েও রক্ষা করেন, তাঁর তুল্য সঙ্গীয় আর নিষ্ঠ-প্রকৃতির লোক প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। পূর্বে পূর্বে স্বজাতীয়েরা ইত্যাকার গৌরব কোরে কতই তাঁর শুভবক্তা কোরেছেন। বিশেষতঃ একমাত্র সন্তানকে বলির মুখে প্রদান কোরে রসূতম যে স্বজাতীয়ের মুখ উজ্জ্বল কোরেছেন, কিছুদিন সেই গুণাহুবাদ যার তার মুখে দিবারাত্র লেগেই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন সে কাল নাই, আজকাল আর সে প্রশংসা, সে গৌরব, সে মহিমা কারো মুখেই শোনা যায় না। পূর্বে পূর্বে যারা একবাক্য হোয়ে রসূতমকে গইবির-বংশের চূড়ামণি বলতেন, তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের, মহৎ সাহসের যশোগান কোডেন, আজকাল আর তাঁদের মুখে সে সকল মহিমার কোনো কথাই শোনা যায় না। কেউ একবার বিদ্রুত হোয়েও রসূতমের নাম মুখে আনেন না।

কালের প্রভাবে সে সকল গুণাহুবাদের বণ লোকের মনে থেকে অকাল কুসুমের জার কোরে পোড়ে গেছে। আজকাল রসূতমের বাহাদুরি দেবার দিন ফুরিতে গেছে, তাই আর ইদানীং পুণ্যের লোক, ঘর্মের লোক বোলে কেউ আর তাঁর পৌষ করে না, কেউ একবার তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে না। রসূতমও ভাবতাক্ত আর পূর্বের মতন নাই, তাঁর মেজাজ আজকাল আর এক প্রকার হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও বাতারাভ করেন না, লোকালয়ে মুখ দেখান না, লোকেদের সঙ্গে বাক্য-আলাপ প্রায়ই উঠিয়ে দিয়েছেন, কাজের কথা বোলে ভাঙে মনো-বোপ করেন না, দেখা শোনা, কি করা করা কিছুই নাই, সংসারে কি চাই, না চাই, কি হলো না হলো, সে দিকে একবার ফিরেও চান না, সে পাঠ একেবারেই উঠিয়ে দিলেন, কেবল দিবারাত্র অন্তঃকণ্ড হোয়ে উদাসমানে বসে বসে কি ভাবেন আর কাঁদেন। চেহারা অতি মলিন, অতি পিষ্ট, বর্ণ কালী হোয়ে গেছে, শরীর ক্রমে ক্রমে পাক পেয়ে বাজে, আহারে প্রবৃত্তি নাই, নিদ্রায় প্রায় বঞ্চিত, অভিভের প্রায় এক হোয়ে একস্থানেই বোসে থাকেন। উচ্চ বৃন্দ-গভীরে শোক বিষাদ মূল বিস্তার বোয়ে চিরবাসের স্থায় এঁটে বসেছে। স্বামীর এই হৃদ্রশা অবলোকন কোরে তাঁর স্ত্রী অতিশয় ব্যাকুলিনী হলেন। পত্নী দেখলেন, রসূতম সংসার-সুখের ভগ্ন বিবর, মূর্তি হোয়ে, নৈরাস্য নির্ভরসার অহুগত ভাজনঘর হোয়ে, শরীর ক্ষয়, আত্মক্ষয় কোতে বসেছেন। তাই সতী মনে মনে হির কোয়েন, প্রকৃত কথা ব্যক্ত কোরে স্বামীর সংশয় দূর কোরে দেবেন, পতির সঙ্গে বেক্রপ চাতুরী কোরে জীবির প্রাণরক্ষা করা হোয়েছে, সেই মর্দকথা আহুপূর্বিক অবগত কোরিয়ে তাঁর চক্ষু এসময় কোরবেন। জীবির কোন্ চক্কর উপর পক্ষীরা সব প্রথম আনন্দ-আমোদ কোরেছে, তাই জানবার হলনা কোরে রসূতমের স্ত্রী গোরস্থানের চাবি চেয়ে নিলেন। সেখানে



## উজ্জী পুত্র ।

দিয়ে যা দেখলেন, তাতে জীবান্ন মাতা নিঃসন্দেহ হোয়ে, সন্তুষ্টিতে গৃহে ফিরে এলেন, জননীর মনে বেশ প্রতীত হলো যে, জীবা নিশ্চয়ই প্রাণ লয়ে প্রস্থান করেছেন, বালা যে সেই মোগলের ।

কোথাও চোলে গেছেন, সে বিষয়েও তাঁর মনে কোনো সংশয় হলো না । রস্তুমের গৃহিণী এক্ষণে চিন্তা কোত্তে লাগলেন যে, কি কৌশল কোরে তাঁর বিষয়-চিত্ত স্বামীর নিকটে সে মর্ম-কথা প্রকাশ কোরবেন ।

রস্তুম নির্জ্ঞানরূপে অভেদ উদাস-অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন হোয়ে আছেন । পত্নীকে নিকটে যেতে দিতেন না, তাই কাজে কাজেই সে কথা অবগত করান কিছুদিন স্থগিত রাখতে হোয়েছিল । গইবির ইদানীং আবার নরমাই শারীরিক অসুস্থ হোতে লাগলেন, একদিনের নিমিত্তেও সজ্জদ থাকতেন না, তাতে আরও সে মর্মকথাটির ভেদ বোলে দবার সুবিধা হোয়ে উঠছিল না । আজ বলি, কাল বলি কোরে ক্রমে দিন কেটে যেতে লাগল, কারবার-অবসর অভাবে কাল-বিলম্ব হওয়াতে সে কথাটি আর আদৌ প্রকাশ হোতে পেলো না, পেটের কথা পেটেই থেকে গেল, যে হেতু কিছুদিন পরে গইবির-পত্নীর সাংঘাতিক জর-বিকার হোয়ে ষট্টা কক্ষেকের মধ্যেই তাঁর প্রাণত্যাগ হলো । ব্রহ্মাণ্ডের লোক মনে কোলে, গৃহিণী রস্তুমকে আটকুড়ো কোরে রেখে গেলেন । পত্নীর মৃত্যু রস্তুমকে যেন নিজাভঙ্গ কোরে চৈতন্য করালে, তাঁর ঘোরাবল্য স্তম্ভিত ভাব কেটে গিয়ে তিনি এখন পূর্বের মতন সতেজ সজীব হোলেন । তাঁর কারবারগুলি অধিক আর উন্নাত্তে বিশৃঙ্খল হোয়ে পোড়িল, এক্ষণে সেগুলির প্রতি যত্ন আর পরিচর্য্য কেন্দ্রে লাগলেন ।

আজকাল মানিকনার আর তাঁর পুত্রের ভারি জাঁকপাট চোলেছে, তারা ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, যাবদীয় পারদী তাঁদের কাছে বোড়হাতি কোরে ভটস হোয়ে থাকতেন, সকলেই তাঁদের উপাসনা কোন্তেন, বিশেষতঃ বাঁদের কিছু

কম সঙ্গতি ছিল, তারা ত তাদের কেনা-বেচার মধ্যেই হোয়ে পোড়েছিলেন । অথচ রস্তুম তত ধার্মিক, তত পবিত্র আর তত কুলধর্ম্মপ্রতিপালক হোয়েও কেউ তাঁরে জিজ্ঞাসা কোন্তো না, ইদানীং সকলে তাঁরে এক পাশে ঠেলে ফেলে রেখেছিল ।

বোম্বের বাস রস্তুমের পক্ষে বনবাস হলো, আর কাণ মায়ায় তিনি সেখানে বসতি কোরবেন ? আর কি শোভা আছে যে, তাঁরে মুগ্ধ কোরে রাখবে ? রস্তুম আপ-নার ঘরবাড়ী বিক্রয় কোরে সুরাট সহরে যাত্রা কোল্লেন, মনৈ কোল্লেন, সে সহরে বিস্তর ধর্ম্মপ্রাণ গইবির বাস করে, তারা তাঁর সহায় হবে, আবশ্যক মত উপকার আহু-কুলাও কোরবে । জীবান্ন বাগদত্ত স্বামী ফ্রেম জীর কাছে কি কোরে মুখ দেখাবেন, সেইটি তাঁর ভারি লজ্জার বিষয় হলো । সেই যুবা আর তাঁর কড়িপিশাচ বখিল পিতা বোম্বে আসবার নিমিত্ত পূর্ব্বেরি যাত্রা কোরে প্রস্তুত হোয়েছিলেন, তাঁরা মনে করেছিলেন, চাকু-মোহিনী জীবা তাঁদের জন্তে অর্থ-ঐশ্বর্য্য লয়ে পথ তাকিয়ে আছে, এমন সময় কন্ডার মৃত্যু-সংবাদ আর যে জন্তে মৃত্যু হয়, সে খবরও তাঁদের কাছে পৌঁছিল, শুনে তাঁদের মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পোড়ল । সংপ্রতি ফ্রেমজীর পিতার কারবারে অনেক লোকদান হোয়ে গেছে, পুত্রটি আবার অত্যন্ত অসাবধান আর অতিশয় অপব্যয়ী, তাই পিতা-পুত্র উভয়েই আশা কোরে ছিলেন, জীবা যে রত্ন আদি বহু মূল্যের যৌতুক পাবেন, ঐ যৌতুক দ্বারাই তাঁরা ঋণদায় থেকে উদ্ধার হোতে পারবেন, এক্ষণে সেই কাল-সংবাদ বমদণ্ড হোয়ে তাঁদের সে আশা ভরসা রসাতলশায়ী কোলে । পিতা-পুত্র উভয়েই সেই মোগলকে, জীবাকে, আর সেই গোঁড়া গইবির রস্তুমকে মনের খেদ মিটিয়ে গালাগালি দিতে লাগলেন, তাঁরা বোল্লেন, রস্তুম যদি জীবাকে প্রাণে না মেরে ফেলে তাঁদের হস্তে সমর্পণ কোন্তেন, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হোন্তেন না, বরং তারা অর্থ-গুণের সুবর্ণময় বস সফল কোন্তে পান্তেন ।

রস্তুম, হিন্দু মুসলমান পর্জগিস প্রভৃতি নানা জাতির লোকের সঙ্গে একত্রে একখানি জাহাজ ক্রেয়া কোরে সমুদ্র-পথে বাত্মা কোলেন। যখন কাছের মহাখালের মুখে এসেছেন, দেখলেন, একখানি জাহাজ জলময় হবার উপক্রম হোয়েছে, তার আরোহীরা অতি কাতর হোয়ে ডেকে বোলতে লাগল যে, তাঁরা এসে এই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করেন। রস্তুমের জাহাজের মালিম মাজি আর খালাসীরা অপর অপর চড়ন্দারে-দের সঙ্গে একত্রে অনেকক্ষণ ধোরে পরামর্শ কোন্তে লাগল, পরামর্শ কোরে তারা যা স্থির কোলেন, সে কথা রস্তুমকে তখন অব-গত করালে। রস্তুম শুনে চমকে উঠলেন। তারা তাঁকে এই কথা বোলল যে, উদ্ধার কোন্তে এসেছি, এই হল কোরে আমরা তাদের জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করবো, বাস্ত-বিক উদ্ধার করা আমাদের অভিপ্রায় নয়, চড়ন্দারেদের প্রাণে নিকেশ কোরে যথাসর্ব্ব লুঠে আনাই আমাদের অভিপ্রায়। রস্তুমের হৃৎকম্প হোয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগল। একবার ত তিনি একটি প্রাণী নিকেশ কোরে-ছেন, এবার তাঁর প্রতিজ্ঞা আর অতিরিক্ত অধ্যম কোরে পাণের বোঝা ঘাড়ে চাপা-বেন না, আর অতিরিক্ত দুঃখ কোরে চিত্ত অপ্রসন্নতার সমাদর কোরবেন না, রস্তুম স্পষ্ট বোললেন, এ নিষ্ঠুর অভিসন্ধিতে তিনি তাদের সহায় হবেন না। তারা কিন্তু বল-পূর্ব্বক রস্তুমকে সঙ্গে লয়ে একখানি ছোট ডিজিতে উঠে, সেই ডগ বানচাল জাহাজের পাশে উপস্থিত হলো, জাহাজের উপরে উঠেই ভয়ঙ্কর কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে, রস্তু-ম নীরব নিস্পন্দ দর্শক হয়ে সাক্ষী গোপা-লের জায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সাল যুক্ত প্রবাল আর বিস্তর সোনা রূপোর ধান লুঠ কোরে আনলে, ঐ সকল বহুমূল্যে জাহাজখানি বোঝাই কোরে একদল বণিক গোয়া ঘোপে বাত্মা কোরেছিল। কিছু দিন পূর্বে তারা কাষে থেকে রওনা হয়েছিল। প্রতিফুল বায়ুর মুখে বাস্তলের রসী অতিরিক্ত কষাকষি

কোরে টেনে ধরাতে জাহাজের তলা কেটে গিয়ে খোলের মধ্যে জল প্রবেশ কোরে লাগল। সেইসময় রস্তুম যে জাহাজে ছিলেন, সেটখানা দেখতে পেয়ে উপযুক্তকালে হাতের মাথায় সহায় পেলেম মনে কোরে বিপদ-পন্নেরা আনন্দ কোলাহল কোরে জয়ধ্বনি কোন্তে লাগল। আর জগদীশ্বরকে মঙ্গলময় জ্ঞান কোরে তাঁর স্তুবজ্ঞতিও কোন্তে লাগল। বদমায়েসেরা লুঠের মালগুলি আপনাদের জাহাজে আগে রওনা কোরে, অর্দ্ধময় জাহাজ খানিক তলা কেড়ে দিয়ে চলে এলো, জাহাজ খানা তখন তলিয়ে গিয়ে সাগর গভীরে নিমজ্জ হলো। লুঠের মাল বিভাগ করবার সময় অনেক তকবার উপস্থিত হয়। এক্ষণে কোন বন্দরে জাহাজ চালাবে, সে কথা লোয়েও অনেক বচসা হোতে লাগল। এ সময় কাছের অভিযুখে জাহাজ চালান নিতান্ত উন্মাদক কর্ম, কিন্তু এক্ষণে আপনাদের মতামতের উপর নির্ভর কোরে চলবার সময় নয়, যেহেতু "বায়ু তঠাৎ বিরুদ্ধ হয়ে বড় বহিতে শুরু কোলেন," তাই কাজে কান্দেই কাষে যাওয়া ভিন্ন আর তাদের উপায়ান্তর ছিল না, জাহাজখানি কাষে অভিযুখে না চালালে অসুবিধার কবাল কালগ্রাস থেকে প্রাণ বাঁচাবার পথ ছিল না, শেষে অপার্যায়ান হয়ে সেই কাষের দিকেই গতি অবনত কোন্তে হলো। পথে পরামর্শ কোরে স্থির হলো, লুঠে কোনো জিনিষ তীরে অবতরণ করা কি সহরে বিক্রয় করা হবে না। বড়ের উৎপাত নিবারণ হোলে, আর একখানি জাহাজ ভাড়া কোরে নুরাট সহরে যাত্রা কোরবে। আরোহীরা সকলে ঐকা হয়ে সমুদ্রের ধারে একটি বাড়ী ক্রেয়া লয়ে সেইখানে বাসা কোরে থাকলো। রস্তুমও তাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে সকলে ধোরে বেঁধে ডগ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখে ছিল। তাঁকে তারা নজরের উপর রেখে দিলে তিনি কি করেন, কোথায় যান, সেগুলি চৌকী দিয়ে নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগল, রস্তুম নাকি তাদের কাটাকাটির মধ্যেও ছিলেন না, লুঠের ভাগও গ্রহণ করেননি, তাই

বদমাসেদের প্রাণে ভয় হলো, পাছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো কথা প্রকাশ কোরে দেন, এ উদ্ভয় ভাববিসিক্ত, হবারি কথা । একজন মাল্লা, সে জাতিতে মুসলমান, লুঠের ভাগ তার হিসো বা পোড়েছিল, সে তা পেয়ে সন্তুষ্ট হয় নি । এক রাত্রে সকলে যখন আহারাদি কোরে দরজার দরজার চাবি দিয়ে চারিদিক এটে সেটে বন্দ কোরে শুয়েছে, সেই মাল্লা অনেক কৌশল কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল, সে থানার গিয়ে মালিম আর তার কী-মের নামে ছদ্মনাম কোরে হত্যাকাণ্ডের কথা প্রচার কোরে দিলে । থানাদারেরা সেই অচ্ছ-লয় বদমাসেদের দলশুদ্ধ গেরেপার কোরে উপযুক্ত বিচারকর্তার কাছে হাজির কোরে দেয় । মাল্লা আগে আপনার বাঁচবার পথ পরি-দার কোরে লয়ে শেষে সে গুপ্তকথা প্রকাশ কোরে দেয়, সে ব্যক্তি হত্যার কথা প্রকাশ কব্বার পূর্বে থানাদারের মুখ দিয়ে কবুল কোরিয়ে লয় যে, তাকে তিনি ক্ষমা কোর-বেন, কি তাকে তিনি অপরাধীদের মধ্যে গণ্য কোত্তে পারবেন না ।

নূরজরদের পিতা নবাব-সরকারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ছিলেন, নবাবও তাঁর বেশ খাতির-বর কোত্তেন । ঘটনাক্রমে নূরজর কৌজদার হারছেন, সহর সংক্রান্ত কৌজদারী আর আদালত তাঁরী জিম্মায় ছিল । ঐ নৃশংস নিষ্ঠুর অপহত্যা আর সামুদ্রিক ডাকাতি এই দুই বিষয়ের তদারক সুতরাং তাঁকেই কোত্তে হয়েছিল । অস্ত্র অস্ত্র চালানি আসামীদের মধ্যে রসূতমকেও উপস্থিত দেখে নূরজরদের অতিশয় বিস্ময় জ্ঞান হলো, তিনি দেখলেন, রসূতম তাঁকে চিনতে পেরে লজ্জায় মাথা হেঁট কোরে আপনাকে গোপন কব্বার চেষ্টা কোচ্ছেন । সাজা দিবার পূর্বে কয়েদীদের একবার পারদে পাঠাবার হুকুম হলো । আসামীদের দেখবার নিমিত্ত তাবৎ লোকই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানা পর্য্যন্ত চোলে গেল, কাছারি একেবারে খালি হয়ে পোড়ল, জম্বাশ্রীও সেখানে উপস্থিত ছিল না । আসা-মীদের মধ্যে বার বটুক অপরাধ ছিল, নূর-

জরর এই অবসরে গয়েন্দার মুখে সে সন্ধান অবগত হয়ে নিলেন । তিনি শুন্লেন, গই-বির এই দুর্ভাগ্য নিষ্ঠুর পাপে আন্দো লিপ্ত ছিলেন না, রসূতম সমাক্রমে নিরপরাধী ; তন্নিম্ন লুঠের হিসাবও তিনি গ্রহণ করেন নি । ঐ কথা শুনে যোগল মনে মনে স্তব্ধ হোলেন । যে দিবস থানাতল্লাসি হয়ে তদন্ত করা হয়, সেইদিন রসূতম একখানি তলবচিঠি পেয়ে চমকে গেলেন । চিঠির মর্ম্ম এই যে, অস্ত্র সন্ধান পর নূরজরদের নিজ বাচীতে গিয়ে তোমায় হাজির হোতে হবে । রসূতম মনে কোলেন, যোগল হতে তাঁর কোন প্রকার কল্যাণের প্রত্যাশা নাই, সে না কোনো অস্ত্র-রোধই শুন্বে, না অস্ত্রগ্রহ কোরে ক্ষমাই কোব্ববে । পারসীর মনে আরও এই ভয় হলো যে, হয় ত বেছে বেছে তাঁকেই সকলের আগে সাজা দেখার মনন কোরেছে । রসূতম যোগলের রাজ-কট্টালিকায় সন্ধান সময় উপ-স্থিত হলেন, তাঁর হাতের হাতকড়ি মুক্ত কোরে একটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি দিয়ে একটি প্রশস্ত ঘরে তাঁকে লয়ে গেল । ঐ ঘরের বাঁ দিকে একটি গোলাবি রঙের পরদা ঝুলানো রয়েছে, তার দুই পাশে দুটি চির-গোলাম সাদা পোশাক পোরে দাঁড়িয়ে আছে । রসূতম দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে দেখেন যে, রেসম-নির্ম্মিত কারপেটের গদীর উপর নূরজরর আর তাঁর বায়ে তাঁর দেওয়ান বোসে আছেন । দেওয়ান বোলেন, “রসূতম ! তুমি আর তোমার সহচরেরা দুম্পার জলধির বুকের উপর অশ্রুচিহ্নিত কোরে যে অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর হত্যা আর ডাকাতি কোরেছ, তৎসম্বন্ধে যথার্থ কথাগুলি আত্ম-পূর্ব্বিক তোমাকে বোলতে হবে ।” রসূতম যা যা জানতেন আর যা যা দেখেছেন, সে সমুদয়ই বোলেন, তিনি নিজে যে সে নির্দয় রক্তপাতে লিপ্ত ছিলেন না, আর তিনি তাহা নিবারণ কোত্তেও যে চেষ্টা কোরেছিলেন, সেই কথা উল্লেখ কোরে বারবার বলতে লাগলেন, তিনি এ অপরাধে দোষী নন । রসূতমের জবান-বন্দী লিখে লয়ে দেওয়ান সেখান থেকে উঠে

চোলে গেলেন, তখন নৃভরদ পানিকে বোলতে লাগলেন, “সুস্থ! তোমার নিজের দোষ না থাকলেও থাকতে পারে, তখাচ আমি তোমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেবো। লোকের অন্তঃকরণ এমনি বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যতগুলি প্রাণী তোমার জাহাজে ছিল, তাদের সকলেরি প্রাণদণ্ড করা উচিত বোধ হোচ্ছে, তবে তুমি প্রস্তুত হও, আমি বেছে বেছে তোমাকেই স্থির কোরেছি। তোমায় সকলের অগ্রে দণ্ডভোগ কোত্তে হবে; কেন না, আমি জানি, অনেকে মৃত্যু আর মৃত্যুর আতঙ্কসমী ভ্রাস আতঙ্ক হুকুম্প আদির প্রতি প্রফুল্লনেতে দৃষ্টিপাত কোরে থাকে, আর অনেকে তখন কুলবদন হয়ে অগ্নে অগ্নে হাতুও কোরে থাকে, তুমি একজন সেই প্রকৃতির লোক, তা আমি পূর্বাবধি জ্ঞাত আছি, তোমার চিত্তে ভয় নাই, তোমার অন্তঃকরণ দয়ালু, তুমি অবলীলাক্রমে অগ্নির তেজাগ্রের প্রতি উপহাস কোত্তে পারো। অথবা নিকৃষ্টেগে এক পাত্র হলাহলও উদরে ঢেলে দিতে পারো।” গইবির শব্দে চক্ষু অবনত কোরে অধর দংশন কোলেন, তাঁর জাম্বু দুটি শরীরের ভায়ে ঠক্-ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগল। নৃভরদ পুনর্বার বোলতে লাগলেন, “যে সকল আরোহীর সঙ্গে তুমি সমুদ্রযাত্রা কোরেছো, তারা অতি ইতর জাতি, আমি তাদের মহাপাষণ্ড পাতকীর ভায় ব্যবহার কোরবো, তুমি কিন্তু তা নও, তুমি উচ্চ পদের ভদ্রসন্তান, তাই তোমার অভিমত লয়ে তোমার দণ্ড দেবো, তুমি কি প্রাণালীতে মোত্তে ইচ্ছা করো ঐ দেখো, জল্লাদ উপস্থিত, দক্ষিণ হস্তে অসি, বামহস্তে বিষ, যা হয় একটা মত করো।” ঐ সকল কথা শেষ হলে গোলাম দুজন সেই রক্তবর্ণের পরদা সোরিয়ে এক পাশে রাখলে। জীবা পারসী স্বীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান কোরে, একহাতে একখানি চক্চকে ছোরা আর এক হাতে একটি পাত্র, তার কানায় কানায় পূর্ণ রক্তবর্ণের পের, মনঃপতিতে বরের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন। গইবির বালাকে দেখে গো

গো শব্দে গোদ্বারাতে গোদ্বারাতে মেজের উপর শুয়ে পড়ে চোঁচিয়ে বোলতে লাগলেন, “আমার অপবাতম্যত সন্তানের অপছায়া ঐ! সন্তান! এখান থেকে চোলে যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও! আর কেন এ পার্শ্ব সংসারে তোমার অপার্শ্ব মৃতি দেখিয়ে আমার যন্ত্রণা বাড়াত? তোমায় যেন আর দেখতে না হয়, আমার তুমি অব্যাহতি দাও। হে জগদীশ্বর! আমার কুপা করো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এ মূর্তির হাত থেকে আমার রক্ষা করো, আমার বাঁচাও, আমার জীবন জীবাত্মার হস্তে আমার প্রাণদণ্ড কোরো না।”

নৃভরদ বোলেন, “তোমায় কেন সে অব্যাহতি দেবে? তুমি তারে অব্যাহতি দিছিলে? কে হাতে কোরে তাঁর মুখের কান প্রাণদাতী বিষের বাটী ধোরেছিল? এ নিশ্চেষে থেয়ে ফেল, পেট পূরে থেয়ে ফেল এখন শুয়ে মোরে থাক্, এ সকল কথা তাকে কোলেছিল? কে তাঁর নামে অভিযো করে? কে তারে হত্যা করে? তুমিই না এখন তুমি দয়ার প্রত্যাশা কোত্তে চাও? ধিক্ তোমায়!! তুমিই না ততবড় সন্তানে অসহ যন্ত্রণা চক্ষে দেখেও তোমার অন্তঃকরণ স্নেহের উদ্বেক হয়নি? এখন আর কোন্ মরু রূপার প্রত্যাশা কোত্তে চাও? রে নিষ্ঠুর হৃদয় নির্দয় পিতা! এই চাক্রমোহিনীকে এই স্বর্ণলতাকে তুমি কোন্ প্রাণে কবলে কালক্রাসে সমর্পণ কোলে? যে তোম সন্তানোচিত মায়ামমতা দেখিয়েছে, তোমায় কত শ্রদ্ধা, কত ভক্তি, কত কোরেছে, তুমি কোন্ অন্তঃকরণে তার রক্ত হস্ত কলঙ্কিত কোলে? সেই নিষ্ঠুর আচরণে প্রতিফল এখন তোমায় পেতে হবে, অ তার সময় হয়েছে। জীবা এই মাত্র থেকে উঠে আসছেন। তোমার পাপ ভ্রান্ত বুদ্ধি মনে ক্লক, তোমায় সাজা দি জীবা কবর থেকে উঠে এসেছেন, আমার কথা অবহেলা কোরে অগ্রাহ্য কোরো না,—জীবা জীবিত আছেন!” গইবির হঠাৎ

মুখে উঠে চেঁচিয়ে বোলেন, “আঃ! বেঁচে আছে? না না, তা কেমন কোরে ‘হোভে’ কোরে?” নুব্বজর পুনর্বার বোলেন, “হাঁ হাঁ, এই বটে, জীবা বেঁচে আছেন, মরেননি।”

রস্তুমেক এখন অনেক ভরসা হোলো, নীবার মুখের দিকে চক্ষু তুলে চেয়ে দেখলেন, দেখে বোলেন, “আঃ! চক্ষু দুটি সেইরূপ সজীব ফুল্ল দেখছি, নয়ন দুটির উজ্জ্বল প্রভা বেঁচে থাকতে আবার দেখতে পেলুম। জীবা! ঐ বিষের পাজিটি আমার হাতে দাও, তোমার হাতে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত, তুমি যে বেঁচে আছো, এখনও আমার বিশ্বাস হোচ্ছে না আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তুমি মোরেছো, তোমায় যেন কবর দিতে লগ্নে বাচ্ছি। না, তা হতে পারে না, জীবা কখনই বেঁচে নেই।”

মোগল বোলেন, “গইবির! জীবা সত্যই বেঁচে আছেন, তিনি যথার্থই মরেননি। যদিও তার পিতা তাঁর প্রতি বক্র হয়েছিলেন সত্যি, বালার কিন্তু একজন আত্মীয় ছিল, সেই তাঁরে বিষের পরিবর্তে আফিম দেয়, (আপনার হস্ত প্রসারিত কোরে) আর এই হস্ত সেই নরকতুল্যকবর থেকে তাঁরে উদ্ধার করে। তোমার জীবা এক্ষণে আমার সহ-ধর্ম্মী হয়েছেন, সে গইবিরের ধর্ম্ম শপথ পূর্বক পরিত্যাগ করেছে। জীবা! কথা কওনা যে? তোমার অমৃত্যুপিত পিতার সঙ্গে দুটো কথা কও।”

জীবা বোলেন “বাবা! আমি তোমার অকুপা বিস্মৃত হোলেম!” রস্তুমের বাপ্পা-দারাই তাঁর কথার প্রত্যুত্তর হলো। গইবির পরাশরী ছিলেন, উঠে বোসে চীৎকার কোরে বোলেন, “না জীবা! তুমি আমার কখনই ক্ষমা কোতে পারো না, আমার মৃত্যু হোক, এই দণ্ডেই আমি আয়ুশেষ করুণা, যে অবধি আমাদের শেষ দেখাসাক্ষাৎ, এক এক দিন এক এক বৎসরের জায় জ্ঞান হয়েছে, আমি যে মনস্তাপ আর যে মনঃকষ্ট ভোগ কোরেছি, তুমি তার কিছুই জান না। এ পাপসংসারে আমি একটি পাবণ্ড চণ্ডাল হোয়ে আছি। যে কাজ নিশ্চয় জানুছি, আমা হতে

হয়েছে, তা কখন মনে থেকে দূর হবার নয়। যে আমার পরামর্শ দিয়ে হৃদয় কোত্তে প্রবৃত্তি দিয়েছে, তার যেন সর্বনাশ হয়, তার যেন তিন কুলে কেউ বাতী দিতে না থাকে। জীবা! তুমি আর আমার ওরূপ স্নেহ চক্ষে চেয়ে দেখো না, তোমার স্নেহ-কটাক্ষ শেল হয়ে আমার হৃদয় গভীর ভেব কোচ্ছে, মধ্যে মধ্যে আমার অন্তঃকরণ ছেদ হয়ে যাচ্ছে, তুমি আমার ভিতরকার ভৎসনা করো, অভিসম্পাত করো, সে সকল আমার সহ হবে, তোমার পিতৃবধনল অহুরাগ দৃষ্টি আমি আর সহ কোত্তে পারি না, আমার মন তাতে প্রকুল হয় না।” জীবা মায়ায় মুগ্ধ হলেন, মনের ভাব আর সংবরণ কোত্তে পারেন না, ছোরা-খানি আর বিষের বাটীটি গোলামের হস্তে দিয়ে, অমৃত্যুপী পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন। রস্তুম ধারা শ্রাবণের স্থায় অশ্রু বর্ষণ কোচ্ছিলেন, জীবা যেন ঘন গাণ্ড চুষন কোরে সে অশ্রু গুদ কোত্তে লাগলেন। বাল্য পিতৃস্নেহে মোহিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বোলতে লাগলেন, “বাবা! তুমি মরো না, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি মরো না, তুমি আজ্ঞাঘাতী হইও না, তুমি মোলে আমি তবে কারে বাবা বোলে ডাকবো? বাবা! তুমি আমার বাবা ত্যাগ কোরে যেও না, দোহাই ঈশরের, দোহাই ধর্ম্মের, তোমার উপর আমার রাগ নাই। বাবা! তোমার অপরাধ কি? আমিই হৃদয় কোরে তোমার অকুপার ভঞ্জন হয়েছিলুম, আমিই তোমার কুলাকার সম্ভান। তুমি যদি আমার কাছে অপরাধ কোরে থাকো, সে অপরাধ আমি বিস্মৃত হয়েছি।” নুব্বজর এই অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্যের অভিনয় দর্শন কোরে অতিশয় মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে পিতার সম্নেহ ক্রোড় থেকে অন্তর কোলেন, তার পর নবাবের নামোল্লেখ করে রস্তুমকে এককালীন পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেন। তিনি বোলেন, “নবাব শুনেছেন, দুরাচারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন।” জীবা তাঁর জননী কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা কোরে

যখন শুন্লেন, তাঁর মা নাই, বাবা অমনি ‘মা মা’ বোলে মুর্ছিত হয়ে ভূতলশারিনী হলেন। যুবতীকে অতিশয় কাতর দেখে নূরজহেদ তাঁকে অনেক বন্ধিয়ে সান্তনা কোরে লাগলেন। গহবির মুক্তি পেয়ে ঐ কাষেতেই বাস কোলেন।—অপরাধী আরোহীরা ভ্রাতাদের হস্তে প্রাণত্যাগ কোলে। রম্ভমের প্রতি মোগলের মনের বিরূপভাব একেবারে তিরোহিত হলো না, তিনি কদাচ কখন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোতেন, কিন্তু জীবাকে লয়ে মনের আনন্দে নিরবচ্ছিন্ন স্থখে বাস কোন্তে লাগলেন।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

“নাতোয়ানের ছনো মালগুজারি।”

বন্ধুকে বোল্লেম, তাঁর মনোহর উপাখ্যানটি শ্রবণ কোরে বড় আপ্যায়িত হোল্লেম, আমি যে তাঁকে ঐরূপ একটি রমণীয় আপ্যায়ন বোলে তাঁর চিত্তোবিনোদন কোন্তে পাল্লেম না, তার জন্তে অনেক আক্ষেপ কোন্তে লাগল্লেম, কিন্তু তাঁর ঐ কথকতা শুন্তে গিয়ে এদিকে যে, মহাকেরে পোড়ে গেছি, সিটি আমরা স্বপ্নেও জানুতে পারিনি। সহপাঠিক এত উন্নত হোয়ে তাঁর গল্পটি কেঁদে বোসে ছিলেন, আর আমরাও হতচৈতন্য হোয়ে তা শুন্তেছিলেম যে, রাস্তা ভুলে অন্ধ পথে গিয়ে পড়েছি ॥ সলিমান আর লুচারের উপর ভারি রাগত হোল্লেম, তারা প্রকৃত পথে দেখিয়ে না দিয়ে কেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চোলেছে। সলিমান বোল্লে পরমাণিকও একটি মনোহর গল্প যুড়ে দিছিল, তাই সে এত মত্ত হয় যে, পথাপথের বিদগ্ধ তার কিছুই মনে ছিলো না, সলিমান আমাদের ভরসাতেই নিশ্চিন্ত ছিল। আমি আর কথার উত্তর কোল্লেম না, দেখল্লেম, আমিও যে অপরাধে অপরাধী, সেও সেই দোষে দোষী। আমার হিন্দু সহপাঠিককে আমাদের ছাত্র ব্যাকুল হোতে দেখ-

লাম না, তিনি এই মাত্র বোল্লেম, “তবে এখন করা যায় কি?”

আমি বোল্লেম, “চলুন ফিরে যাওয়া যাক।”

তিনি বোল্লেম, “না, তা নয়, যদি আমার পরামর্শ চাও। যখন এতদূর এগিয়ে এসে পড়েছি, তখন চলুন, আজমীরে যাওয়া যাক, সেখানে গিয়ে তোমাদের জগতবিখ্যাত পীর সেক কাজী মাউদুনীর কবর দেখতে পাবেন, এমন সুন্দর সুবিধা ছাড়বেন না।”

আমি বোল্লেম, “বা, বেশ বোল্লেম, কবর দেখতে আমার ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই।” হিন্দু বোল্লেম, “তাই বটে, এমন সকল বিষয়ে তোমার বড় অজ্ঞানত্ব দেখছি। আমি একবার কুড়ি কোশ তফাত একটি গ্রাম থেকে রওনা হোয়ে উবুড় হোয়ে পেটে হেটে রাস্তা মাপতে মাপতে জগন্নাথক্ষেত্রে চোলে গেছি।” আমি বোল্লেম, “তাতে আর অতিরিক্ত ভক্তি কি দেখান হলো? জগন্নাথে পৌছে যদি হামাগুড়ি দিয়ে রথচক্রের নীচে যেতে পার্তে, তবে তোমার কতক ভক্তি—”

“হায় হায়! তা হলে বোলুতে, হা! তোমার কিছু ভক্তি আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে যে একটি কথা আছে, আমি যদি সেটি কোন্তেম, তবে আর আমাকে ফিরে এসে তোমার গুণাঙ্গবাদ শুন্তে হতো না।”

“হা! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু রথচক্রের নীচে পোড়লে, তোমায় গড়াতে গড়াতে সেই আনন্দময় অনন্ত সুখধামে লয়ে ফেলতো।” “আপনি ঠিক কথাই বোলেছেন, আমি, সেখানে যেতে পিঁচপাও ছিলেম না, কিন্তু ভট্টাচার্য্য যিনি আমার পাপনাশের নিমিত্ত এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তিনি আমার তত শীঘ্র শীঘ্র সেই আনন্দধামে প্রবেশ হবার ব্যবস্থা দেন নি।”

“তুমি কি পাপ কোরেছিলে?”

“উঃ! সে বড় গুরুতর গোচর পাপ, অজানত একটি সত্ত্বজাত কোইলে বাছুরের প্রাণ বধ করি।” ঐ কথা শুনে আমি আর মুখে হাসি রাখতে পাল্লেম না। বোল্লেম,

“এত বড় গুরুতর পাপটা দৈবাৎ কি  
কোরে হলো?”

“কেন মশায়! যে গোয়ালেতে বাছুরটি  
ছিল, তার নিকটেই একটি সিদ্ধুক থাকে,  
সিদ্ধুকটি খুব ভারি। আমি সেই সিদ্ধুক  
সোঁরিয়ে রাখতে গেছিলাম, সিদ্ধুকটি যে তত  
বড় ভারি, আমি তা আগে জানতে পারিনি,  
টাল না সামলাতে পেরে পোড়ে গেলাম।  
সিদ্ধুকটি কিন্তু সেই পবিত্র বস্তুটির উপর চেপে  
পোড়ল, তার হুদে মাথাটা আমনি গলে গিয়ে  
বি বেরিয়ে পড়ল, কচি কচি হাড়গুলো অমনি  
পিসে ফেল্লো। সেই সময় জগন্নাথের রথযাত্রা  
উপস্থিত, আমি তখনি ছুটে ভট্টাচার্য্যের  
বাড়ীতে চলে গেলাম, ভট্টাচার্য্য টি মহা পণ্ডিত,  
টাকে গিয়ে সব কথা বোলেম। ভট্টাচার্য্য  
একটা কষ্টসাধ্য গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা  
কোলেন, সে দণ্ড ভোগ করেও সুখী হোতে  
পাল্লেন না, গোঁঘাতক নরধর্ম কোলে সকলে  
দুশী কোত্তে লাগল। সে অপবাদ আর সখ  
কোত্তে না পেরে দেশত্যাগী হোলেন, ভারত-  
বর্ষেব সকল স্থানেই গেলি, সব দেশ প্রদক্ষিণ  
কোরেছি, তাতেই কোরে গইবিরদের কতক  
কতক খবর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। হিন্দুস্থানের  
মধ্য কোথায় কোন সহর, কোথায় কোন  
কেল্লা আছে, তা প্রায় সকলই জানা  
হোয়েছে। আপনি আমার সঙ্গে আজমীর  
সহরে চলুন, সেখানে এমন স্থান দিয়ে দেবো  
যে, আপনি জুখে থাকবেন, কোন কষ্ট হবে  
না।”

আমার সহচরটি অতিশয় ইয়ার গোচের  
লোক, পথে যেতে যেতে কখন গানই গাচ্ছে,  
কখন ভাড়া মিই কোচ্ছে, কখন কখন এমনি  
রজবেরদের গল্প জুড়ে দিত যে, হাসতে হাসতে  
নাড়ী বাধা হতো। তার আমোদে পড়ে পথ-  
শ্রমের কষ্ট প্রায় ভুলেই গেছিলাম, এমন কি,  
যখন শুনুলেম, আজমীরে পৌঁছেছি, শুনে বরং  
দুঃখিতই হোলেম, ভাবলেম, রাস্তা ফুরিয়ে  
গেল, আর তার মজাদারি মজাদারি কথা  
শুনতে পাবো না। পূর্বে মনে করেছিলাম,  
আজমীর প্রকাণ্ড সহর, কিন্তু এসে দেখলুম,

তা নয়, মধ্যবিশ আকারের অতি পরিপাটীর  
সহর, পর্বতের ঢালুর উপর অবস্থিত। ইমারত-  
গুলি সাদা ধপ ধপ কোচ্ছে, তাইতে বেশ পরি-  
ষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। নানা প্রকার  
কোড় জল আর কাটা-বনে পর্বতটি ঢেকে  
রেখেছে, সেইগুলি সহরের যাবদীয় অট্টালি-  
কার পশ্চাদিকে শোভা কোরে আছে। পর্ব-  
তের উপর যে একটি বিচিত্র কেল্লা আছে,  
সেই কেল্লাই কিন্তু আজমীরের বল-শক্তি—  
দর্প। কেল্লাটির ঘের প্রায় এক ক্রোশ, তার  
আকৃতি অতি অদ্ভুত অপূর্ণ, আর সর্বত্র  
একরূপ একাকার নয়, ইহার আশ্রয় শৈল-  
গুলি অনেক স্থলেই অভেদ এবং দেশের  
অতিশয় দৃঢ় আলদনস্থান। শত্রু স্বাধা নগর  
অবরোধ হলে ঐ দুর্গ অবলীলাক্রমে তা সহ্য  
কোরে থাকতে পারে। স্থল পাথর কেটে  
চৌবাচ্চা আর পুষ্করিণী খনন কোরে রাখা  
হোয়েছে, কোন কালেই জলকষ্ট হবার সম্ভা-  
বনা নাই। চান্ ডাল তেল প্রভৃতি নানা  
দ্রব্য গোলা-ভাণ্ডার আর গুদাম পরিপূর্ণ  
থাকে, সেই অইচ্ছারে আজমীরবাসীর  
প্রতিবাসী রাজারাজড়াদের অতি অতি  
দারিদ্র আর অতি প্রগল্ভ ব্যবহার দেখিয়ে  
থাকে। আজমীরে পৌঁছেই পীর সেক বাজা  
মাউল্লীনের পবিত্র কবর দর্শন কোল্লেন, তাঁর  
অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া সকল তাবৎ  
হিন্দুস্থানে জাজ্জল্যমান রয়েছে। দেখলুম,  
নানা দিক্ দেশ হোতে সমাগত সহস্র সহস্র  
লোক সেই গোর-মন্দির বেষ্টন কোরে আছে,  
সেই পবিত্র পুণ্য মন্দিরের একটু ইটের গুঁড়ো  
কি এক টুকরো পাথর পাবার জন্তে লোক  
লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছে, তারা সেই দুটি  
ইটের গুঁড়ো অথবা এক টুকরো পাথর পেলে  
যত্ন কোরে ঘরে লয়ে নাবে। সেই একটু  
অমূল্য প্রসাদকলিকা পাবার নিমিত্ত তত  
লোক এতদূর পর্যটন কোরে এসেছে। কি  
হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই ঐ গোর-  
স্থানের অঁকা গোরব কোরে থাকে, গোরের  
একটু গুঁড়ো পাবার নিমিত্ত সকলকেই  
সন্ধান-সালায়িত হোতে দেখা যায়। আমরা



এক রাত্রি আজমীরে বাস কোলেম। পরদিন প্রাতে বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে, তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে শুনলেম, তিনি নিশীথ রাত্রে একাকী উঠে চোলে গেছেন। তাঁর না বোলে হঠাৎ প্রস্থান কব্বার কারণ স্থির কোরে উঠতে পারেন না। ভারি উৎকণ্ঠিত হোলেম, ভাবছি এখন যাই কোথায়? মনের মধ্যে কত প্রকারই ভাবের উদয় হোচে, এমন সময় একটি নতুন ঘোড়ার সোয়ার হয়ে সেই হিন্দু এসে সম্মুখে উপস্থিত।

আমি বোলেম “এখন কোথা থেকে এলে? কোথায় গেছিলে? (ঘোড়ার দিকে দোখয়ে) এ আবার কি ভাব?” হিন্দু বোলেম, “বা! কেন বলা দেখি? একটি মিরের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে এলেম, তিনি আমার ঘোড়াটি দেখে ভারি পসন্দ কোলেন, তাই তাঁর হাত এড়াতে পারেন না “দেবো না,” একথা মুখ দিয়ে বোলতে পারেন না, তিনি তার পরিবর্তে এই ঘোড়াটি দিয়েছেন। আর ত বিলম্ব নাই? তবে চলো, সময় অমূল্য, মিছে মিছে নষ্ট কোত্তে নাই।”

শেষ কথাটা শুনে মনে একটু খটকা হলো, ভাবলেম এ ব্যক্তি ত সময়ের গৌরব কখনই করে না, সে বিষয়ে সে বরাবর অনবধান, তাই কথাটা বড় ঘোর ঘোর, পেঁচাও পেঁচাও বোধ হোতে লাগল, বিশেষত তারে দেখে অহুমান হলো, সে অনেক দূর থেকে চোলে আসছে, ক্লান্ত হয়ে পৌড়েছে, অস্বটিকেও দেখে জ্ঞান হলো, আস্তাবল থেকে তাজা টাটকা বোরিয়ে আসছে না, জানোয়ারটি যে অনেক পথ চোলে এসেছে, সে ভাবটি তার চেহারা দেখে এত স্পষ্ট লক্ষিত হোতে লাগল যে, আমি সে কথার উল্লেখ না কোরে থাকতে পারেন না, তাই চোক কোণ বুজে মরি মরি কোরে বোলেম “ঘোড়াটি দেখে স্পষ্ট বোধ হোচ্ছে, সে অনেক দূর থেকে চোলে আসছে।”

হিন্দু বোলেম, “আপনি যথার্থ কথাই বোলেছেন, আমার বন্ধুর ভাই কিন্তু কেবল এক ঘণ্টা পূর্বে ঘোড়াটিকে বাড়ীতে এনে-

ছিলেন, তিনি আমায় বরাবর কোরে বোলেন, বড় দূর নয়, নিকটেই ছিলেন, এখন সেইখান থেকে আসছেন। তিনি যখন তত কিরে দিবি কোরে বলেছেন, তখন এত আমি নোসেরাবাদ পর্যন্ত সচ্ছন্দে লয়ে যেতে পারি, তাতে আমার মনে কোন সংশয় হই না।”

আমরা পুনর্বার রাস্তায় উঠতে না উঠে, আমার সহচর হাত পরিহাসের সরস পদ আরম্ভ কোরে আমাদের মনোরঞ্জন কোরে লাগলেন। তখন তখনি কিন্তু এক দল ব্রাহ্ম-জারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমাদের সে কৌতুক পরিহাসের ভারি ব্যাধাৎ জন্মালে। ইন্দ্রাবাদে চারিদিকে বিস্তর মাহীর বাস করে, আরই ঐ ব্রাহ্মজারীদের উপর ঘোড়া হয়ে বরাবর সর্ব্ব লুটে লয়ে গেছে, ঐ ব্রাহ্মজারীরা এখন আজমীরে চোলেছে, সেখানে পৌছে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কোরে আপনাদের নির্দয় দুঃখ বৃত্তান্ত অবগত করাবে, আর যদি পেরে উঠে প্রতিকারের চেষ্টা দেখবে। আমার সহচর তাদের দেখে বোলেম, “তোমরা যোদ্ধা চোলে যাও, নসীরাবাদের রাজা তখান দুর্গে বাস কোছেন, তাঁর দ্বারাই তোমাদের উপকার হবার সম্ভাবনা। তাঁর পরামর্শ মতন চোলতে তাদের অভ্যর্থনা ছিল কিনা সে কথা তাদের মুখে শুনে পেলেন না তাদের বা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কোরবে এই ভেবে আমরা তাদের ফেলে রেখে বেরিয়ে পোড়লেম। চোলতে চোলতে একটি স্থানে এসে পৌছিলেম, স্থানটির নাম দেবল সেখানে একটি জরাজীর্ণ ভগ্ন দুর্গ আছে, আমার সহচর বন্ধু বোলেম, সে দুর্গে কৈউ বাস করে না, অমনি শূন্য পোড়ে আছে। একটু পরেই কিন্তু জানতে পারেন, সে কথা মিথ্যা, সেখানে যে কেউ বাস করে না, সেটি তাঁর ভ্রম বোলেই বোলেম, বাস্তবিক তাঁর ভ্রম নয়। মাহীরেবা পোড়ে তখন আমরা দের ঘেরে ফেলে, শেষে বন্দী কোরে বেঁধে লয়ে গেল। আমার সহপাঠিক বন্ধু সেই হিন্দু তখন আমাদের দিকে চেয়ে কটমট কোরে

১৩ ২৪ খিচিয়ে উঠল, তার সেই মুখ-শিটকন  
কিছু কল্প লোককে বিশ্বাস কোরে পথের  
দিক কোরেছিলেম, সে যে আমাদের ভুলিয়ে  
চোর-জালে আবদ্ধ করবার নিমিত্ত ফাঁদ  
হয়ে এসেছিল, এক্ষণে তা বুঝতে পার্লাম।  
এই সুম্মিষ্ট কোমল রসনার মাদুরীরসে আর  
এই প্রাজ্ঞল পরিহাস-আশ্রয়ে আমরা মুগ্ধ  
হয়ে গেছিলাম। লুণার আর সলিম্যান নিষ্কৃতি  
দেবার নিমিত্ত উদ্দেশ্যে অল্পনয়-বিনয় কতে  
ছিল, আমি কিন্তু নীরব হয়ে ছিলাম।  
অশেষে ঐ দেবল কেল্লার মধ্যে অন্ধকূপের  
একটা অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে বসে ছিলাম।  
অস্বাভাবিক অতিশয় উপকারী, ভারতবর্ষের  
এদের বাস। তাহারা না থাকিলে মুক্ত-  
কাজে সৈন্যেরা আহার অর্থাৎ মাংস পড়িত।  
কোরা চাল, ছোলা, গম ইত্যাদি শাকের  
সহকারে করে, সন্ধাবাদিলম্বিত আছে যে,  
কানে সেখানে তাহারা স্বাভাবিক করিতে  
হয়, কেউ তাহাদের উপর উৎপাত উপ-  
হাস করিতে পারিবেন না।

একটি খিলান-করা ঘর, তার মধ্যে আগুন  
হচ্ছে, ঐ আগুনের উপর একটি প্রকাণ্ড  
আমার ডেক চড়ান আছে, ঐ ডেকে কি সিদ্ধ  
হইছিল, আর ঐ আগুন থেকে এক একবার  
কীটা শিখা হয়ে জলে উঠাছিল, শিখাটি মেটে  
কীট নীলবর্ণ, ঐ শিখার আলোয় কামরটির  
প্রস্থ বুঝে নিতে পার্লাম। ডেকের চারি-  
দিক ঘেরে ২০১২ জন মাহীর বোসে আছে,  
তারা যে সেখানে বোসে কি কোচ্ছিল, আমি  
বুঝে উঠতে পারিনি, ভাবছি যে, তারা  
সেখানে বোসে কি কোচ্ছে, এর মধ্যে এক-  
জন মাহীর এক তাড়া তীর বগলে কোরে  
সব ডেকের মধ্যে ডুবিয়ে ধোস্তে লাগল, তখন  
পার্লাম, তারা কানরূপ সাংঘাতিক অভি-  
যানের নিমিত্ত বিষ প্রস্তুত কোচ্ছে। সেই  
এরগুলি যখন বিষের মধ্যে ডুবিয়ে চারিদিকে  
এতে ফিকতে লাগল, সেই সময় দলভুক্ত  
আমাদের হৃদয় ভেদ কোরে আনন্দের চীৎকার  
করে উঠিল। এদিকে আবার সেই নীল-  
বর্ণের অগ্নিশিখা কালযবনের তার ভীষণ

চণ্ডাল-মুক্তিগুলি আমার চোক্ষের উপর ধোরে  
দিতে লাগল, তেমন ভয়ানক হৃদয়-মুক্তি  
আমি জন্মেও কখনও চক্ষে দর্শন করিনি।

আমার সম্মুখস্থিত ঐ সকল মুক্তিগুলিকে  
আমার অধিকক্ষণ দেখতে দিলে না, কতক-  
গুলো নিষ্ঠুর চোয়াড় আমার টেনে ইছড়িয়ে  
পাশের একটা গর্তের মতন কামরাতে নিয়ে  
ফেলে, সলিম্যান আর লুণার কারণসেও  
আমার সঙ্গ-ছাড়া হতে পারেন। সেই হিন্দু  
সহচর যদি আমাদের কলে কোশলে ভুলিয়ে  
আনবার নিমিত্ত নিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে সে  
ব্যক্তি যে ভালরূপই চাতুরী দেখিয়েছে, তার  
সন্দেহ নাই, কেন না, সে যে বিশ্বাস অপহরণ  
কোরবে, সে সংশয় আমার আদৌ হয়নি, তবে  
ঘোড়া বদল করাতে আমার মনে কিছু সন্দেহ  
হয়েছিল বটে, সে কথা মিথ্যা নয়। রাতে  
রাতে উঠে কেল্লাতে গিয়ে আমার আগমনের  
সংবাদ করে, সেই সময় সাবেক ঘোড়া ছেড়ে  
দিয়ে একটা নূতন ঘোড়ায় সোমার হয়ে  
আসে, তার বন্ধু আর তার বন্ধুর ভাই ঐ  
ঘোড়া তাকে দিয়েছে, এই মিথ্যা কথা বোলে  
আমার বুঝিয়ে দেয়। লুণার বোলে, “হিন্দুদের  
কখন বিশ্বাস কোত্তে নাই। এদের অভিপ্রায়  
কি? আমাদের কয়েদ রেখে তাদের লাভ  
কি? যদি লুটে কুটে লওয়াই তাদের মানস  
হয়, তবে তাই কোরে আমাদের ছেড়ে  
দিক না।”

সলিম্যান বোলে, “তুমি নি য ছেনো,  
এরা কোন বড় লোকের অনুচর।

আমি বোলেম, “আমার তা বিবেচনা হয়  
না, সময়ে সব প্রকাশ হোয়ে পোড়বে।”  
শেষে সেই সময়ই প্রকাশ কোরে দিলে সত্য।  
কেন না, তার পরেই আমাদের ধোরে লয়ে  
নজকালী খাঁর সন্মুখে হাজির কোরে দিলে,  
সে আমার বন্দী দেখে আজ্ঞাদে মুচকে মুচকে  
হাস্তে লাগল।

নজকালী বোলেম, “পাশা উল্টে গেছে,  
এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। তোরে ঐ বন্দীর  
অবস্থায় কেমন কোরে রাখি, দেখতে পারি।  
ভূই বড় দুর্কোশ গোয়ার, তোরা এত বড়

সাহস যে, আমার দোষে আমি, এ ঠগ খোঁজ করা তোমার উচিত ছিল না, তোমার উচিত ছিল, যাতে খোঁজ কোন্ডে না হয়,

আমি বোলেন, “আমায় আটক কোরে রাখা হয়েছে কেন? তুমি কি আমায় প্রাণে মেরে ফেলতে চাও?”

নজফালী বোলেন, “না, আমি যাকে মনে করেছি, তুমি যদি সেই ব্যক্তিই হও, তবে না। আমার দে আংটি কোথায়? সেই কথা আগে বলো।”

ঐ কথা শুনে আমি ত স্তব্ধ হয়ে গেলেম, মনে কোলেম, “কি আশ্চর্য্য, সেটি যে আমি পেয়েছি, এ খবর তিনি কি কোরে জানতে পারেন।”

নজফালী বোলেন, “তুমি অবাক হয়ে গেছো, আমি সে সন্ধান কি কোরে জানলেম, তাই মনে কোরে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, তুমি যে অঙ্গীরের রাজাকে সে আংটি দেখিয়েছিলে, সে কথা ভুলে গেছো বোধ হয়, আমি যে তাঁর বাড়ীতে বন্দী হয়ে ছিলাম, তা কি মনে নাই? সেইখানে আমি আংটির কথা শুনেতে পাই। আংটি এখন বার কোরে দাও।” আমি তাই কোলেম, আংটিটি তাঁকে হাত থেকে খুলে দিলাম। সেই সময় আমার নিজের আংটির উপর তাঁর নজর পোড়লো, সে আংটিটি অনেক দিনাবধি আমার হাতে আছে।

নজফালী আমার সেই আংটিটি দেখে “ওঃ! এর যুড়ী আংটি যে, এ আংটি তুমি কোথায় পেলে? আর কি কোরেই বা তোমার কাছে গেল?”

আমি সব কথা তাঁকে ভেঙে বোলেন, নজফালী শুনে থানিকক্ষণ কি বিড়বিড় কোন্ডে লাগলেন, শেষে বোলেন, “তা হোতে পারে, তাই বটে, যুবা! তোমার জীবনে কোন ভয় নাই সত্য, কিন্তু জীবনাবধি কয়েক অবস্থায় থাকতে হবে।”

আমি বোলেন, “আমায় আমার পাহাণ অন্তরে অধীন হোয়ে চোলেতেই হবে, তার

আর উপায় কি? একাট কথা জিজ্ঞাসা দে, বাসনা করি, আমার কুলগোত্র আপনি অবগত আছেন কি না, বলতে পারেন?”

তিনি বোলেন, “তোমার কুল-গোত্র কেন, সাদুখারী কি তোমার পিতা নয়? না কি জান না? আমাকেও তুমি সেই পত্র দে দিয়েছো।” আমি বোলেন, “হাঁ, তা সত্য বটে, সে কথা এই যে, তিনি যখন কয়েক থাকেন, সেই সময় আমার বোলেছেন, তিনি আমার পিতা নন, ঐ কথা ভিন্ন তাঁহার মুখে আর কোন কথা শুনেতে পেলাম না, এক্ষণে আমার নার মুখে বাকী কথাগুলি শুনেতে বাসনা করি।”

“এ মুখ থেকে বাকী কথা কখনই আমার পাবে না, আর তা শুনেই বা তোমার কী? এই কেল্লার অন্ধরূপই তোমার ভয় হলো, এইখানেই তোমায় থসে গলে থাকতে হবে।” নজফালী এই উত্তর দিলেন।

আমি বোলেন, “কেন, আমি কি কোরেছি?”

“সারক! তুমি ঐ কথা বোলুছো? একমত তুমিই না দুঃসাহস কোরে দেলদান দে নিয়তি দাও? দ্বিতীয় তুমিই না আমার কষ্টকে ভুলিয়ে সুখগামিনী করো? আর তুমি না অহসন্ধান কোরে দেশময় আমার ভাড়াভাড়ি কোরে নিয়ে বেড়িয়েছো? তুমি না আমার মন্তব্য-শূন্স দড় দেখিয়ে তোমার মুনিব আমীর জেমলাকে সস্ত্র কোন্ডে রেখে ছিলে? আমার গেরেস্তার কবুবার নিয়তি দেই না তোমায় বকসিস দিতে চেয়েছিল। তাই বুঝি জিজ্ঞাসা কছো, আমি তোমার কি কোরেছি? আর কেন আমি তোমার কয়েক কোরে রাখতে চাই? দোহাই আল্লাহ তোমার এই দুর্বল দুর্জ্ঞানতার নিমিত্ত আমি তোমার মাথা জরিপানা কোন্ডেম, তবে কি করি, তুমি যখন অবগণ্ড শিশু, সেই সময় শপথ কোরে একটা প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তা তুমি বেঁচে গেলে।”

ঐ সকল আরোপিত অপরাধ খণ্ডন করার নিমিত্ত আমি যেমন বোলছি, “খন্দা তার।”

নজফালী অমনি চুপ চুপ বোলে চীৎকার করে উঠে বোলেন, “আমি তোমার চাকর টি চি করা চিবিনে চিবিনে প্রত্যাশার চাই না, তুমি দুর্ভাগ্য কোরেছ; তার ফল তোমাকে অবশ্যই ভোগ কোন্তে, আর ঐ কুস্তাকা বাছা, যে তোমার আঁছে, কালসপেরে তায় থল কী পরা-ধিক-পুত্র আজ রাতেই নিকের হবে, তা না হয় তবে আমার এখানে বসাই যাই।”

আমি বোলেন, “ওটা দারুণ নিকৌশ, ত গোবেচেরা, একে অত্যাচার কোরে তে দিন, প্রাণে মারবেন না।”

নজফালী ঠাট্টার স্বরে বোলে, “তাকে তে দাও। সে আরজকেবের আর তাঁর এক ন সভাসদবর্গের সম্মুখে আমার কস্তার দিক কোন্তে পেরেছে, তাকে ছেড়ে দাও। আমার মুখখানা আগুন দিগে পুড়িয়ে গছে, তাকে আগার ছেড়ে দেবো। সে এখন এখন পর্যন্ত আমার মুখময় তিড়িভিতরে জলে উঠছে। দোলাই আঁলার! তা এই হবে না, তাকে এই রাতেই বন্দীলয় ত করে।”

আর কোন কথা বোলতে আমার স-না, কিন্তু আমার পিতা মাতা কে? নু বংশে আমার জন্ম, সে কথা অবগত হইলে আর একবার বেয়ে চেয়ে দেখ-ন, নজফালী বোলেন, “একবার তোমার দিক, আমার মুখ দিগে সে কথা কখনই তে পাবে না, তবে তুমি আমার শত্রু না হই যদি মিত্র হোতে, তখন কোনো লোকের দিক বোলে দিতেম, সে ব্যক্তি তোমার দিক নিরীক্ষণ কোরে তোমার আর্থনা সম্পন্ন কোন্তে পাভো। এক্ষণে তুমি সে পথ হারি-না, জানবার উপায় তুমি আপনিই নষ্ট হোছো, আমি কিন্তু তোমার স্বাধীনতা অপ-কোলেম। যা! আমার সুমুখ থেকে দূর তুই সেই অন্ধরূপে যা।” কালযবন এই বোলে চৈচিয়ে উঠল, “তোমরা দেখো, কারাগারে কোন প্রকার আদর সমাদর

না পায়, কড়াকড় চৌকী দিগে রেখো, যে খেটার নাম লুচর, তার বিষয় তোমাদের হুকুম দিগে চুকেছি।” এই বোলে হাত-ছানি দিগে ইশারা কোলে, অত্যাচার মাফী-বেরা নজফালী যাদের উপর সরদার হোয়ে-ছেন, তারা এসে আমার টেনে হিছড়িয়ে লয়ে বাবার উদ্ভোগ কোলে, তখন আমি চৈচিয়ে বোলেন, “যদি হতভাগ্য লুচরের উপর দয়া নাই হয়, আমার চাকর সজি-মানের প্রতি রূপা করুন, তার ত কোনো দোষ নাই, সে নিরপরাধী।”

নজফালী বোলেন, “কোনো প্রয়োজন আছে, তাই তারে এইখানেই চাই, তার প্রাণের কোনো শঙ্কা নাই, সে ভয় কোরো না, এখন চোলে যাও।”

একটা সর গলি-পথ দিগে চোলে গিয়ে কস্তকজলি ধাপ গেলেন, সেই ধাপ বেয়ে আমার নাবতে বোলে, নেবেই একটা ভয়-কর নিজজন ভলাপথ দিগে চোলেছি, যেখানে অত্যন্ত শীত হয়ে কম্প হোতে লাগল, আমার বখন “এই তোমার গারদ” বোলে একটি অন্ধকার কারাগারে প্রবেশ হোতে বোলে, আমি শুনে একটি গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস তাগ কোলেম, আর বখন সেই ক্ষুদ্র অন্ধরূপের মধ্যে আমার একলা ফেলে রেখে গেল, আমি তখন নৈরাশ্যে নিরুৎসাহ হয়ে সেই সোঁতা মেজের উপর হাত-পা এলিয়ে দিগে শুয়ে পোড়িলেন, আর বোলতে লাগ-লেন, “হা, আমি দীন দুঃখী হতভাগ্য সাদক।” সেই জীবন সব প্রথমে কমলার তত রূপা-প্রসাদ লাভ কোরেছিল, তার পরিণামে কি এই হলো, আমার সংসার স্বখের, আমার পার্থিব বাসনার কি এই চরম ফল! কে আমার মাতা, কে আমার পিতা, কোন বংশে আমার জন্ম, সে সকল কুল-পরিচয় অজ্ঞাত হইলে শেষে কি এই অন্ধরূপে চিরবাস কোন্তে হলো! বিধাতা কি অদৃষ্টে ইহাই লিখে-ছিলেন? আমি মনঃকোভে মনস্তাপে অভিভূত ছিলেন, দরজা এখন খুলেছে, তার শব্দ শুন্তে পাইবি, সন্মুখে একটা মর্জি হঠাৎ

দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেম, শুয়েছিলেম, উঠে বোস্লেম, দেখি না একজন মাহীর যৎ-সামান্য গোচের আহার লয়ে এসেছে, একটা মেটে পাত্রে কোরে এক পাত্র জলও এনেছে। কোন কথা বাস্তা না কোরে সে সেইগুলি রেখে চোলে গেল। শোক-দুঃখের মধ্যেও ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে শাস্ত কোত্তে হয়। আমি রুটিখানি তিন কামড়ে খেয়ে ফেলে নিখিল পাবনীকে এক নিশ্বাসে বেবাকটুক পান কোল্লেম। আমার যে বিষ দেবে, সে সন্দেহ হলো না, কেন না, প্রাণদণ্ড করাই যদি নজ-ফালীর অভিপ্রায় হতো, তবে তখন এক-চোট নিকেশ কোরে দিয়ে এ যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্ত কোত্তো। আমি লুচাখের বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগলেম, তার আর কোনো আশাই নাই, মনে কোলেম, অনেক-ক্ষণ তার দফা নিকেশ হয়েছে, সে আর এতক্ষণ বেঁচে নাই। রে পাষণদয় নজ-ফালী খাঁ! তার মৃত্যুর জন্তে তোরে এক দিন জবাব কোত্তে হবে, শুধু তার ক্ষেও নয়, তুমি আরও অনেক রুধির-প্লাবিত ঘোর দুর্দশ কোরেছো, সে সকল মহাপাপের নিমিত্তেও তোমাকে জবাব-দিহিতে পোড়তে হবে। আশা ত কিছু ছিলই না, তথাচ যদি কোন পথ দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে পারি, সেই আশ্বাসে অন্ধকূপটি তন্ন তন্ন কোরে নিরীক্ষণ কোত্তে লাগলেম, কি দুর্ভাগ্য! দেখলেম, সকলি প্রস্তর, স্থূল দৃঢ় গাথনির প্রস্তর, দরজাটি বার দিক দিয়ে চাবি-আঁটা। নিতাই মহাকষ্টে মহা দুঃখে জীবন-মৃত্যু টেনে লয়ে চলেছি, আর যে কখন বাইরে গিয়ে বিমল বায়ুর আভ্রাণে শরীর প্রফুল্লিত করবো, সে আশা অন্তরের মধ্যে দিন দিন নির্বাণ হোচ্ছিল। ইতিমধ্যে সাত দিনের দিন সন্ধ্যার সময় জেলের দারোগা যখন আমায় আহার এনে দেয়, দেখি না, সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে, স যখন দরজা খুলে ভিতরে এলো, সেই সময় ছতের উপর অত্যন্ত গোলমাল হোচ্ছিল, কারা যেন দোড়াদোড়ি কোরে চারি

দিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল, আর উপরোপরি বন্ধ-কের' আওয়াজও শুনতে পেলেম। দারোগা সেই বন্ধকের শব্দ শুনে আমায় হেপাজাতের বিষয় ভুলে গিয়ে উর্জ্বাসে দৌড়ল, দরজায় চাবি দিতেও বিস্থত হাল, সে এত মাতোয়াশ হয়ে এসেছিল যে, এর অচমক্য একটা দৈবঘটনা হয়ে যদি তাকে ভাড়াভাড়ি কোরেও না যেতে হতো, তাহলে সে যে দরজায় চাবি দিতে পাত্তো, তা বোধ হয় না, সে বিষয় আমার বড় সন্দেহ, সত্য হাত তখন তত বেশে ছিল না। আমিও সাতর্স কোরে গলি পথে বেরিয়ে পোড়লেম, বেরিয়ে এসেছি, এর মধ্যে সজিমানের গম্বার আওয়াজ শুনতে পেলেম।

“সাদক! সাদক! আমার মুনিব সাদক! কোথায় তুমি?” সেই চির বিশ্বাসী ভূতটি এই বোলে ডাক্তে ছিল, আমি চাফাফ কোরে বোলেম, “এই যে আমি এখানে, কি খবর, সজিমান! কেন এত সোরসার হয়ে ভরস্কর গুণ্ডগোল হোচ্ছে?” সজিমান বোলে, “চুপ চুপ, আস্তে কথা কও, আমাদের এই পালাবার সময়। মাহীরেরা কতকগুলি শূঁড়ির মদ লুঠে এনেছে, সকলেই ঘোর মাতাল হয়ে পোড়েছে, ভীল আর রাজপুতেদের দল মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে, তাহাও তাদের একটি দল। নজফালী খাঁ তাদের ঐ গোলমাল ধামাবার চেষ্টা কোচ্ছেন, তিনি যদি সমুদ্রের তরঙ্গ নিবারণ কোত্তে পারেন, তবে তাদেরও শাস্ত কোত্তে পারবেন। ঝগড়ার বুনিয়াদ এই যে, অর্দ্ধেক লোকের ইচ্ছা যে, সওদাগরদের উপর চড়াও হয়ে তাদের খুন কোরে আসে, তা তারা আর যোধপুরে গিয়ে তাদের নামে অভিযোগ কোত্তে পারবেন না, বাকী অর্দ্ধেকের ইচ্ছা না যে, তারা অনর্থক রুধিরপাত করে। ঐ শুন, কালযবনেরা সদর-দরজা পর্যন্ত বুঁকেছে সেই দিকে উর্জ্বাসে নৌ ড়ে। অর্দ্ধ-উল্লস হও, চাপকান ফেলে দাও; ঐ বদমাসদের মতন চেহারা কোরে বেরিয়ে পড়, অন্ধকার রাতি, কেউ টের পাবে না, সচ্ছন্দে সোরে

পোড়তে পারবো।” সলিমানের পরামর্শ-মত উলঙ্গ হোলেম। যে ঘরে মদ খেয়ে ঘোরসার কোচ্ছিল, সেখানে আর কোন পাড়াশর পাওয়া যাচ্ছিল না, সলিমান বোলে, আমাদের ঐ উৎসব ঘরের মধ্যে দিয়েই চোলে যেতে হবে, আমি স্থির কোলেম যে, শারা সেখান থেকে চোলে গেছে, ঘর খালি হয়ে পোড়েছে, শেষে দেখলেম, সেটি আগার ভ্রম, সেই ঘরের ভিতর মাথা দিয়েই কি অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন কোলেম! কালঘবনেরা মন্ডের উপর গড়া গড়া মোরে পোড়ে রয়েছে, অনেকে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে একবার এদিকে একবার সেদিকে ছটফট কোরে বেড়াচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কতবিস্কৃত হয়েছে, কেউ মদের নৈসায় বিহ্বল হয়ে পোড়েছে। কিন্তু যে মূর্তি দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে রইল, সিটি নজফালী খার! নজফালী দেওয়াল ঠেস দিয়ে আছে, একটি বিখ্যাত ভীর তার ক্রিষ্টদেশ ভেদ কোরে বসেছে। কীচের মতন তার চক্ষু দুটির চিহ্ন আভা আমার বোলে দিলে, তার অদৃষ্টে কি দুর্দশা ঘটেছে,—সে শব্দ হয়ে রয়েছে! সময়ও ছিল না, আর ইচ্ছাও ছিল না যে, এখানে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়ে দেখি, তাই সলিমানকে সঙ্গে কোরে সিংদরজায় উপস্থিত হোলেম, দরজাটি উদার মুক্ত ছিল, আমরা ধেরিয়ে পোড়লেম, একটি প্রাণীও ছিল না যে, আমাদের নিবারণ করে। হায়! স্বাধীনতায়-কার না আনন্দ আছে! আমি যেমন পাহাড় গর্বত গুহা গহ্বর লাকিয়ে লাকিয়ে পার হয়ে যেতে লাগলেম, আমার সঙ্গে আমার হৃদয়েও লক্ষ দিয়ে নৃত্য কোরে কোরে উঠতে লাগল। সলিমান বরসের অগ্রসাদে আমার সঙ্গে চোলে উঠতে পাচ্ছিল না, তাই কেবল একবার একবার ধমকিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। একপাশে উদাসীনের মতন পরিব্রাজক হয়ে পোড়েছি, সঙ্গে না আছে ঘোড়া, না আছে অর্থ, মাহীরবা সে সবে আমাদের বঞ্চিত কোরেছে, দেশেবৈ পরিচর্যও অবগত নই, এখন বাই

কোথায়, আর কিরূপেই বা বাই। মাহীরবাদের মতন দেখাবে বোলে সলিমানও আমার ছায় কোমর পর্যন্ত বিবস্ত্র হয়েছে, তাতে কোরে পালাবার বেশ সুবিধাই হলো। পরামর্শটি উত্তম হয়ে ছিল বটে, আর পূর্ণাঙ্গ সাবধান হওয়াও যে ভাল হয়েছিল, তার সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষে দেখলেম, গায়ের বস্ত্রগুলি ফেলে না দিয়ে যদি সঙ্গেই রেখে দিতেম, তাতে পালাবার ব্যাঘাত হতো না, তা হোলে বরং বস্ত্রগুলিও বেঁচে যেতো, অথচ আবার প্রস্থানও কতে পারিতাম। সলিমান বোলে, একটা গ্রামে গিয়ে না পোড়লে পথ চলা ক্লান্ত দেওয়া হবে না, আমরা উভয়েই কিন্তু এত ক্লান্ত হয়ে পোড়েছিলাম যে, পায়ের উপর ভর দিয়ে বে দাঁড়াই, সে ক্ষমতা ছিল না, আর রাত্রিও এমনি ঘোর অন্ধকার যে, কোলের মাত্র দেখা যাচ্ছিল না, তাই একটা অমুকুল বৃক্ষমণ্ডলীর তলায় রজনী প্রভাত পর্যন্ত বিশ্রাম করবার অভিপ্রায় কোলেম। নিজা যাবার তথ্যই ছিল না, কেন না, একবার এদিকে ছালাগুলি ফেউ ডাকতে লাগল, একবার সে দিকে বাঘের ডাক শোনা মেতে লাগল, আমরা ভয়ে জড়মড় হয়ে কাঁপতে লাগলেম। তদ্বিন একে ত গায়ে বস্ত্র নাই, তার উপর রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া নাকে মুখে এসে লাগতে লাগল, আমাদের দুর্গতি দুর্ব-স্থার একশেষ হলো। অবশেষে অনেক-ক্ষণের পর উষাদেবীর খেত বিভূতি-ছটা সেই দীর্ঘ কালনিশির অন্তক হলো। শীতে কাঁপতে কাঁপতে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কৌকর হোতে হোতে আমরা ত তখনি বেড়িয়ে পোড়লেম, অনেক কষ্টে একটি সহরে এসে উপস্থিত হোলেম, জিজ্ঞাসা কোরে জান্লেম, সহরটির নাম দৌগলী, তার মধ্যস্থলে একটি ভগ্ন দুর্গ, সমুদ্র লয়ে সহরটি অতি ক্ষুদ্র, আর অতিশয় কুণ্ডিত, কতকগুলি যৎসামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেটে ইমারত আছে, এই মাত্র শোভা। তখনও ভাল কোরে সূর্যোদয় হয় নি, সহরের সদর-রাস্তায় দুটি লোক বকড়া কোচ্ছিল, বা ইচ্ছা তাই বোলে পরস্পর গাল দিচ্ছিল, সেই বক্কার

আমাদের কর্ণে প্রবেশ কোলে । তাদের  
ঘেরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে তামামা  
দেখছিল ।

কারা বকুড়া কোরে, কেন বকুড়া কোরে,  
তাই জন্মার ভুলে আমরা একটু এগিয়ে  
গেলেম, বিশেষতঃ সেখানে নাকি অনেক  
লোক দাঁড়িয়েছিল, তাদের জিজ্ঞাসা কোরে  
যদি একটা খানার সন্ধান পাই, সে অভিপ্রায়  
কোরেই বাতয়া হলো । সেখানে গিয়ে আমরা  
অবাক হয়ে গেলেম, আবার কিন্তু আহ্লাদও  
হতমনি হলো, দেখি না, সেই ভক্তন কলহ-  
কারীর মধ্যে একজন আমার চির-বিগানী  
লুচার পরামাণিক ! তারে ত আমরা মৃতের  
সামিল্য কোরেছিলাম, সে আমাকে দূর  
থেকে দেখতে পেয়ে তার জবজ্ব কুৎস প্রাণি  
গাওয়া বন্ধ কোরে, নিকটে এসে অল্প মাথা  
তইয়ে সেলাম কোলে ।

লুচার বোলে, “হজুর ! আপনাকে বৃত্ত  
দেখে আপনার দাস কি সুখী হয়েছি ।”

আমি বোলেম, “লুচার ! তোমার  
জীবিত দেখে বড় সন্তুষ্টই হোলেম, এ বকুড়া  
কেন, কার সঙ্গে তোমার মনান্তর হয়েছে ?”  
“ও ! হজুর !” এই কথা শুনে যারা সেখানে  
দাঁড়িয়ে ছিল, হো হো শব্দে হাত্ত কোন্তে  
লাগল, আমার কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য বোধ  
হলো না, কেন না, ‘হজুর’ হোয়ে যে গায়ের  
বস্ত্র নাই, সেটা তাদের কখন দেখা ছিল না,  
তদ্বিন্ন ক্ষুধা তৃষ্ণা আর শীতে আমায় তখন  
যথার্থই হাড়হাবাতে লম্বীছাড়ার মতন দেখা-  
ছিল, সেই ভিড় থেকে আমরা চোলে আস-  
বার উদ্দেশ্যে কোলেম, লুচারের প্রতিবাদীও  
অতি কুৎসিত অশ্রীল গালাগালি কোন্তে  
কোন্তে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল ।

“তুই ত মুসলমান নইস, তুই কুতাকা বাছা,  
আমার পরস্যাগুলি ফেলে দে, তোরও পরসায়  
কি অধিকার আছে ? আমি এখানকার কদিম  
নাগিত হোয়ে আমি পাব না ? তুই  
পাবি ? তোর তা পাবার কোন অধিকার  
নাই ।” বকুড়ার কারণ এখন আমি বুঝতে  
পায়েম । শেষে প্রকাশ যে, লুচারের আহা

চলবার উপায় ছিল না, তাই সে ক্ষুরভাঁড়  
লয়ে কতগুলি রাহাঙ্গীর লোককে ফেউরী  
করে । সহর-নাগিত একজন বিদেশীকে তার  
পূজাপাদ বৃত্তি অপহরণ কোরে দেখে তার  
হিংসা জ্বলিল, তাই সে হন হন কোরে দৌড়  
এসে লুচারকে গলাধাক্কি দিয়ে দরজার বার  
কোরে তার ক্ষুরভাঁড় টেনে ছুঁড়ে ফেলে  
দেয়, একপে তার উপরি রোজগারগুলি ফিরিয়ে  
দিতে বোল্ছে । লুচার আপনার ক্ষুর-  
ভাঁড়ের গোরব রক্ষার নিমিত্ত ব্যাঘ্র-অবতার  
হোয়েছিল, তার অপমান হলো বোলে সহর-  
নাগিতের মাথায় একটা দয়ের হাড়ী ফেলে  
মারে, দৈহাৎ সে ঠাঁড়িতে আঁধুঁইঁড়ি দই ছিল,  
সেই দই শুক কেলে মারাতে দীপলী সুরের  
দলিনী নাগিতের তামাম গায় দইয়ে দই হলো,  
সে যেন সং মেজে দাঁড়িয়ে রইল, তাই তখন  
লোক তাকে ঘেরে তামামা দেখছিল । শেষে  
উভয়েই স্রুখোশ্রুখী হোয়ে গালাগালির  
ছড়া কাটাছিল, এমন সময় আমরা গিয়ে  
পোড়লেম । আমি লুচারকে অনেক বুঝিয়ে  
পরস্যাগুলি তাকে দিয়ে দিলেম, লুচার  
যে “গরিবনেওয়ার, হজুর, ধর্ম্মাবতার,” এই  
সবল সম্মানের কথা বোলে আমার সমাদর  
কোরেছিল, তাই শুনে সকলে আমায় বেবে  
দাঁড়িয়ে “গরিবনেওয়ার, হজুর ধর্ম্মাবতার,”  
ইত্যাদি আমীর ওয়রাওদের জায় সম্বোধন  
কোরে আমায় বিক্রপ কোন্তে লাগল, আবার  
শির ঝুঁকিয়ে সেলাম কোরে উপহাসও  
কোন্তে লাগল, আমি তাতে ভারি বিরক্ত হয়ে  
গেলেম । একজন বৃদ্ধ মুসলমান তার দরজার  
স্রুখকে দাঁড়িয়েছিল, তারে দেখে অনেক অল্প-  
নয় বিনয় কোরে বোলেম, “আপনি যদি ভুট-  
চার বক্টার নিমিত্তে একটু স্থান দেন, তা  
হোলে বড় উপকারই করেন, আমরা চরিতার্থ  
হবো ।”

বৃদ্ধা বোলে, “বাবা, স্বচ্ছন্দে এসো, এ  
তোমার স্থান, এখানে কোন ভাবনা নাই,  
কেউ কিছু বোল্বে না ।” আমি সেই বাড়ীতে  
প্রবেশ কোলেম, লুচার আর সলিমান আমার  
পশ্চাতে পশ্চাতে চোলে এলো, দরজাটি বন্ধ



কোরে দেওয়া হলো, ভিড়ও ছড়িয়ে পোড়ল। যখন যেখানে যেক্রপ অবস্থায় পোড়েছিলেন, আতিথেয়ের নিকট সে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা কোলেন, কালযবন মাধীরদের হাত থেকে যেক্রপে বেঁচে এসেছি, সে কথাও তাকে অবগত করালেন, সে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত কোরিয়ে শেষে বোলেন, “আমাদের সঙ্গে না আছে আহাঁর না আছে অর্থ। এক্ষণে অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গালী হয়ে পথে পথে ভেসে বেড়াচ্ছি।” তাঁরে যখন বোলেন, আমি আরজজেবের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলাম, বোধ হলো যেন, দেখা তিনি বিশ্বাস কোলেন না, আমার কিছু আত্মকল্যাণ কোতে কোন রকমেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হলো না। মোটা চেলের ভাত আর কতকগুলো মোটা মোটা চী আমাদের স্মৃথে ধোর দিয়ে বুঝা মুখে মল লাগিয়ে নিঃশব্দে তামাক টানতে বোসে গেল। লুচার কিরূপ কোরে বেঁচে গেল, সেই কথা শোন্বার নিমিত্ত সন্নিমানও যেমন ব্যগ্র হলো, আমিও তেমনি আগ্রহ হোলেন। লুচার বোলতে আরম্ভ কোলে, “প্রথম দুর্গাতি জন-প্রাণীও আমার গারদে যায় নাই, তৃতীয় যিহসে আমার এসে বোসে গেল, আজ আমার মৃত্যু হবে, প্রকৃত হোয়ে থাকে।” চোরাড়ের দ্বন্দ্বন একটি কাল-পান্ড একখানা ছোরা দিয়ে আমার মাথার উপর পেচ খেলাতে লাগল, আমি তখন মনে কোলেন, তবে এই-বার মোলেন, আর রক্ষা নাই, নিকেশ কোরে দেয় আর কি! কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, মেরে ত ফেল, তবু একবার চেষ্টা পেয়ে দেখি, যদি বেঁচে যেতে পারি, এই ভেবে তার পায়ের উপর পোড়ে হাটু দুটো জড়িয়ে ধোলেন, বিস্তর শব্দ-স্বাতি কোরে বোলেন, “তুমি আমার বাবা, আমার মেরে ফেলো না, আমি যেতে নাপিত, অতি দুঃখী, অতি গো-বেচারা, আমার মেরে ফেলে কোন লাভ হবে না।” আমার কথা সে কানেও ঠাই দিলে না, ছোরার খোঁচা মাতে পাল্লো তাদের মনে যে একটি আনন্দ জন্মে, তার বাসনা ছিল না যে, সে আনন্দে সে বঞ্চিত হয়, তা নাপিত হলেন

ত কি হয়ে গেল। আমি সেই ভাব-গতিক দেখে তার পায়ের নীচে হাটুয়ে পোড়ে চীৎকার কোতে লাগলেন, “দোহাই তোমার! আমার মেরো না, আমার মেরো না! তাতেও সে কালযবনের পায়ান-দ্বন্দ্বন নরম হলো না দেখিলাম, শেষে ভাবলেন, দুই তিনখানা মোহর দিয়ে পূজা কোলে, হয় ত সে নিরন্ত হোতে পারে, ছোরাখানি কিন্তু তখন বৃকের উপর উঁচিয়ে রেখেছে, বসিয়ে দেয় আর কি! আমার সঙ্গে মোহর ছিল একিয়ে রেখেছিলাম, সেই মোহর কথান তাকে দিতে চাইলেন, সে তাইতে রাজি হোয়ে আমার ত প্রাণে মারেইনা, বরং আরও কারাগারে থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিলে। সেটি আমার আশার অতিরিক্ত। আমি ত অফ্রাদে বিহ্বল হোতে হোতে মাধীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেন, ২০টির কম নয়, লম্বা লম্বা গলিপথ পার হোয়ে একটি দরজার স্মৃথে এসে উপস্থিত হোলেন। আমার পঞ্চদশ-শকি যখন আমার সেই দরজার বাবু কোরে দিলে, তখন তাজা হাওয়া গায় লেগে মন-প্রাণ প্রকলিত হলো, আর যখন নিমুক্তির নিশ্বাস প্রাণস পরামানবিককে দুই হাত ভুলে আশীর্বাদ কোতে লাগল।

সে ব্যক্তি আমার কাছে মোহর কথান পেয়ে বোলতে লাগল, “পালাও, পালাও! আমাদের দলের লোক যে দিকে আছে, সে দিক ভাঁড়িয়ে যেও, যে গ্রাম প্রথম দেখতে পাবে, সেইখানে যেও।” ধন্য-অবতার! আপনার আর সন্নিমানের জন্তে তাঁরে অনেক বোলেন যে, এক লম্বা অপেক্ষা করো একটা, কথা বোলবো, সে বর্ষের ঐ কথা শুনে আমার একটা ধাক্কা মেরে বার কোরে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিলে। ধন্য-অবতার! গলাধাক্কা খেয়ে এত আনন্দ, এত উল্লাস আমি আগেও কখন অনুভব করিনি। তখন আর না দৌড়ে একেবারে উড়ে গোলেন, আর মুখে শুদ্ধ এই কথা বোলতে লাগলেন, “পরমেশ্বর এক ব্যক্তি আছেন, মহান্নদ তাঁর অবতার।” আমি একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হোলেন, সেখানে

একথানা কুটির জন্মে দরুজার দরজায় লাল-  
সিত হোয়ে বেড়ালেম, কিন্তু কেউই এক  
টুকরো কুটির মায়া ছাড়তে পারেন না। আর  
একটি গ্রামে গেলেম, সেখানে একটি হিন্দু  
কতকগুলি উচ্ছিষ্ট আমায় ফেলে দিলে,  
আমরা যেমন কুকুরকে দি না, ঠিক সেই  
প্রকার আর কি। যা হোক, সেই প্রসাদের  
বলেই আমি এই পুণ্য পবিত্র সহরে আসতে  
পেরেছি, মনে কোরেছিলেম, এখানে এসে  
শ্রায্য পরিশ্রম কোরে যা যৎকিঞ্চিৎ পাব,  
তাতেই জল আহার কোরে প্রাণ ধারণ  
কোরবো, দিন তাতেই কেটে যাবে, তাই  
ভেবে কতকগুলি রাহাগিরের দাড়ি কামাতে  
বোস্লেম, তারও ঐ ফল, আপনি তা স্বচক্ষে  
দেখ্লেম।”

আমি বোল্লেম, “লুচার! তুমি যথার্থই  
কপালে পুঙ্খ, কিন্তু উত্তরকালে আর কখন  
চির-নিষ্কুল নাপিতের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করো  
না।”

আমরা যেক্ষেপে প্রাণ লয়ে প্রস্থান করে-  
ছিলেম, সলিমান সে কাহিনী লুচারকে অব-  
গত করালে। পাষণ্ড নজফালী খাঁর হৃদিশার  
কথা শুনে পরমাণিক অতিশয় প্রফুল্লিত হলো।  
এক্ষণে খাঁ বাহাদুরের নামে নানা কুৎস কথা  
কইতে শুরু কোরে দিলে, পরমাণিকের  
প্রতিজ্ঞা ছিল, নজফালীর জীবদ্দশায় সে সকল  
গ্রানির রহস্য প্রকাশ কোরবে না। আমার  
কিন্তু সে সকল কথা শুনে প্রবৃতি হলো না,  
তখন আমি এত ক্রান্ত হয়ে পোড়েছি যে,  
ঘুমের আবেশে চোক ঢুলে ঢুলে পোড়্ছিল,  
সলিমানেরও দুই চক্ষু ঝিমিয়ে আস্ছিল, তাই  
আমরা তিনজনেই একটা শুধু মাহুরের  
উপর হাত-পা ছোড়িয়ে সটান হয়ে পোড়-  
লেম, বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত গভীর মিদ্রার  
সুধাময় বিরাম সম্ভোগ কোরে সবল সজীব  
হয়ে গাত্রোথান কোলেম। জাগ্রত হয়ে  
আবার সেই সকল হুর্ভাবনা, আবার সেই  
অগ্ন-বস্ত্রের চিন্তা মুখের কাছে কটমট কোরে  
একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কিন্তু সে সকল হুর্ভা-  
বনা অপেক্ষা আমার গুরুতর চিন্তা এই হলো

যে, আমি কাল আরম্ভজ্জের সঙ্গ ছাড়-  
হয়েছি, তাঁর প্রসাদনায় আর যে বাহান  
ধাকতে পারবো, সে আশা নাই। এক্ষণে  
আমার সঙ্গে ধোড়া নাই, অর্থও নাই যে,  
একটা খরিদ কোরে নেবো, তত ক্রোশ পয়সা  
বিনা সম্বলে, বিনা আহারে পদব্রজে চোপে  
যাওয়াও দুঃসাধ্য। আতিথ্যের নিকট কিছু  
কর্জ চাইলেম, তিনি বোল্লেম, তাঁর ত দেবায়  
সমস্থান নাই, তবে জৈন মহাজনের কাছে  
লয়ে যেতে পারেন, সে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ  
আজুকলা কোলেও কোত্তে পারে। মহাজন  
আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে দেখলে,  
দেখে বিবেচনা কোলে, এ ব্যক্তির গায়ের বর্ণ  
পর্যন্ত নাই, তবে কি ভরসায় টাকা কর্জ  
দেই, তাই সে গণ্য একটি পরসারও মুদার  
কোত্তে স্বীকার কোলে না, সে বোল্লে, “যদি  
কোন ভাটিকে জামিন দিতে পারো, তবে  
দিতে পারি। মহাজন মনে মনে বুঝেছিল,  
আমি মুসলমান হয়ে ভাটের জামিনও দিতে  
পারবো না, তাকেও টাকা দিতে হবে না।  
ভাটদের এই নিয়ম আছে, যার জামিন হবে,  
সেই কর্জদার যদি ঋণের টাকা পরিশোধ না  
করে, তবে সেই ভাট জামিনদার নিজ হাতে  
দেনা পরিশোধ কোরে তদগুণে সে আত্মহত্যা  
করে, অথবা পরিবারের মধ্যে কাউকে প্রাণে  
মেরে ফেলে, তারা মনে করে ঐ কৃধিরপাত-  
রূপ মহাপাপ সেই আনাড়ায় কর্জদারের  
মস্তকে পতিত হয়। কর্জদার যদি হিন্দু হয়,  
তবে সে মনে করে, তার ইহকাল পরকাল  
গেল, সে আজ্ঞাকাল সম্ভাপিত হয়ে অহুতাপ  
করে। আমি মুসলমান, পৃথিবীর সমুদয়  
ভাট বা চারণ যদি আত্মহত্যা হয়ে মরে,  
তথাচ আমাদের দুঃখ হবার সম্ভাবনা নাই,  
পরলোকেরও ভয় হয় না, তাই ভাটেরা যে  
আমার জামিন হোয়ে জৈন মহাজনের নিকট  
টাকা কর্জ দিয়ে দেবে, সে আশা আদৌ  
ছিল না।”

\*ভাট এক প্রকার পবিত্র জাতি, রাজ-  
পুতনার সর্কজে তাদের বাস, মহাদেব তাঁর

সলিমান আর লুচার অভিশপ্ত ত্রিগম্য  
হলো, তারা জন্মিয়ে অবধি একরূপ দুঃখ কষ্টে  
কখন পতিত হয়নি। আমিও আর কখন  
একরূপ বিপদাপন্ন হইনি, আমার অপেক্ষা  
তাদের অতিরিক্ত দুঃখিত হবার কোন কারণ  
নাই। আমরা দীউলী সহর থেকে বেরিয়ে  
পোড়ুলেম, কোথায় যাবো, তার স্থিরতা  
নাই। একজন পথিক বোলে, আমাদের  
সমচে যাওয়াই উত্তম কল, সেখান থেকে

পবিত্র ঘরের প্রহরী করবার নিমিত্ত, তাদের  
কখন করেন। কিন্তু কাপুরুষতার দোষে  
আমরা সে পদটি হারায়। মহাদেবের বড়  
জাদবের একটি সিংহও ছিল, ঐ দুইটিই  
প্রিয় পশু, এক ঘরেতেই রক্ষা করা হতো।  
রাটের চীৎকার আর ভয় প্রদর্শন না শুনেও  
ঐ সিংহ প্রায় নিতাই একটি কোরে ঘুম  
আহার কোতো, আর শিবকে নিতাই একটি  
কোরে নুতন ঘুম স্বপ্নন কোতে হতো, এইরূপ  
প্রভাবর একটি কোরে ঘুম সিংহের প্রচণ্ডকাল-  
দুইতে পতিত হতো, ততবার মহাদেবকে  
একটি কোরে নুতন ঘুম স্বপ্নন কোরে পূরণ  
কোরে বেখে দিতে হতো। এইরূপ কোরে  
নিতাই মহাদেব মনোহুঃখ পেতে লাগলেন,  
তখন নিতাই তাঁর কৰ্ম বেড়ে যেতে লাগল,  
যেমে বিরক্ত হয়ে এক নুতন জাতির সৃষ্টি  
কোলেম, সে জাতির নাম "চারণ"। তারা  
ভাট্টদের ছায় সুধার্মিক আর মিষ্ট গায়ক,  
কিন্তু ভাট বা কবি জাতি অপেক্ষা অতিরিক্ত  
মহসী, শিব তাদেরি অখাগারের অধ্যক্ষ  
কোলেম। ভাট অর্থাৎ বন্দীগণেরা অতাপি  
দেবতাগণের আর মহা প্রভাবশালী রাজ-  
পুরুষদিগের স্তবস্ততি কোরে তাদের যশো-  
বন্দনা করে। রাজপুতনার দুর্দান্ত গর্ভিত  
মহামতিগণ আপনাদের বাশাবলীর গুণাঙ্ক-  
কীর্তনের অভিশয় গৌরব কোরে থাকেন।  
সেই সকল বন্দনা পাঠ করা ভাটদের  
পৈতৃক রুতি। রাজপুতনার মধ্যে ব্রাহ্মণ  
অপেক্ষাও ভাটেরা অধিক সমাদরগীর এবং  
অধিক শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত।

গুজরাট, গুজরাট থেকে ডেকানে চোলে  
যাবো, স্বল্প সিধে পথে না গিয়ে সদর রাজ-  
পথ ধোরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। দুদিন ক্রমিক পথ  
চোলে বোনো নামক স্থানে পৌছে একটি  
বটবৃক্ষ তলায় আশ্রয় নিলেম, সেটি আশ্রয়  
লওয়া নয়, অবসন্ন হোয়ে একেবারে বোসে  
পড়', সেইখানে বোসে পথিকদের কাছে  
ভিক্ষা মাগতে লাগলেম। হা করুণাময়  
জগদীশ্বর! এ কি অদুত মনস্তাপ!! সাদক  
কি দীনই হোয়ে পোড়েছে!! কিছু দিন পূর্বে  
তার স্মৃধে কে না মন্তক অবনত কোরেছে?  
কে না শরণাগত হোয়েছে? অদৃষ্টের একরূপ  
উল্ট বিচার হোলে তা সহ করা ভার।  
আমরা সেই বনেরা সহরে প্রবেশ কোলেম।  
সহরটি প্রকাণ্ড, প্রাচীরে বেষ্টিত, কতকগুলি  
অচ্ছট ছোট ছোট পর্বতশ্রেণীর তলদেশে  
অবস্থিত, তার চতুর্পার্শ্বে উত্তান আর প্রান্তর।  
পর্বতগুলি বামার ছায় কর্করে শব্দ, অভিশয়  
উঁচু-নীচু, এবং কোপ-কোড়ের মতন ঝড়াল  
ঝড়াল গাছ আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শৈল-  
শ্রেণীর একটি শৃঙ্গের উপর একটি প্রকাণ্ড গ  
শোভা কোচ্ছিল, ঐ দুর্গের মধ্যে রাজা অব-  
স্থান করেন। মনে কোলেম, ঐ রাজনবরের  
কাছে একবার আত্মকুল্যের প্রার্থনা কোরে  
দেখি, তার পর তিনি সে কথা শুনুন বা নাই  
শুনুন, বিশেষতঃ তাঁর অধিকারে অপহৃত  
হোয়ে আমি সর্ববাস্ত হোয়েছি, তাই তিনি  
সাধ্যমত উপকার কোতে একপ্রকার বাধ্যও  
আছেন। তখন ভাবলেম, যদি ভিক্ষা  
কোতেই হলো, তবে রাজা-রাজ্ঞাদের  
কাছেই যাওয়া ভাল। এইটি স্থির কোরে সেই  
কেলার দিকে ছুটলেম। সিংহ দরজায় এসে  
অনেক অপমান সয়ে থাকতে হলো, অনেক  
ধমক-ধামক, অনেক তাড়া-হড়গ খেতে  
হলো, তথাচ ভিতরে প্রবেশ কোতে পেলেম  
না। দুর্গের কখন বাইরে আসবেন, সেই  
প্রতীক্ষা কোরে সেইখানে বোসে রইলেম,  
যুথাকালে দুর্গধিপতিকে দর্শন কোরে সে  
কোভ নিরুত্তি কোলেম।

দুর্গপতি সোয়ার হোয়ে আসছিলেন,

“ধর্ম্মাবতার! আমার একটি প্রার্থনা আছে; আপনাকে তা শুনতে হবে,” এই মিনতি কোরে, আমি তাঁর অখের অগ্রে গুয়ে পোড়লেম। ভূপালের তখন শৌনবার সময় নয়, তাই অহুমতি কোলেন, দেবমন্দির দর্শন কোরে ফিরে এসে আমার প্রার্থনা শুনবেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের সেইখানেই বোসতে বোলেন। ভাল, কণক আশা পাওয়া গেল বোলতে হবে, প্রহরীরা এক্ষণে অনেক ভদ্র হলো, আমার ডেকে নিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে বসালে, আমি বোসে আছি, রাজার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছি, অহুরের খেদ অন্তরেই বিলুপ্ত কোচ্ছি। মহারাজ ফিরে এলেন, আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হোলেম। দরবার-ঘরে আমার ডেকে পাঠালেন, আমার নাম আর ছরবস্থা অবগত কোরিয়ে বিশ্বর শুবন্ততি কোরে বোলেম, তাঁর রূপা ভিন্ন আমি আরদ-জিবের নিকট পৌঁছিতে পারিনে। রাজার মুখ দেখে বোধ হলো, তিনি আমার কথা অপ্রত্যয় কোলেন, আমি কিন্তু হাত মোড়

কোরে বোলেম, “আমার দুজন অহুর আছে, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি যে আতান্তারের কথাগুলি নিবেদন কোলেম, তারাও এসে যদি তাই না বলে, তবে আমার মাথা কেটে ফেলবেন, আমি যদি দুঃসাহস কোরে, মহারাজকে প্রবঞ্চনা কোরে থাকি, তার প্রতিফল তবে হাতে হাতেই পেলেম।” এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হোয়ে নৃপবর আমার টাণ দিতে আজ্ঞা কোরে দিলেন, আমি এই টাণ ফিরিয়ে দেবার নিমিত্ত শপথপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হোলেম। রাজনবর একটা ঘোড়া আর এক-জোড়া বসন আমার প্রদান কোলেন, আমি দুই হাত তুলে সেলাম কোত্তে কোত্তে সেখান থেকে রিদায় হোয়ে সলিমান আর লুচারকে আমার সৌভাগ্যের কথা অবগত করালেম। তারা শুনে মহা আহ্লাদিত হলো, তা ত হবারি কথা। ছুটি টাটু খরিদ কোরে দুজন বিশ্বন্ত অহুরকে দিলেম, আমি মহারাজ-প্রদত্ত অখের উপর আকৃষ্ট হোয়ে ডেকানের সৈন্যদলের মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হবার জন্ত উদ্যোগী হোলেম।

তৃতীয় পর্ক সমাপ্ত।

# উজীর-পুল

## চতুর্থ পর্বে

### উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

“ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে ?”

উত্তরকালে কোন ছবিপাকে না পড়তে হয়, তাই এক জন মজবুত দেখে সেখা সজে নিলেম, তার সঙ্গে এই চুক্তি হলো, সে আমায় নিমাত্ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে, নিমাত্ থেকে দোসরা একজন সেখা নিযুক্ত করবে। সে আমাদের গুজরাটের বরদা সহর পর্যন্ত পথ দেখিয়ে লয়ে যাবে।\* যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের রাস্তা, সে গ্রামগুলি উদাম জঙ্গলে সমাকুল, ঐ জঙ্গল কলেবর বিস্তীর্ণ কোরে আমিরগড় পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বুনাশ নামে একটি নদী পার হয়ে আমরা সেই আমিরগড়ে উপস্থিত হোলেম। নদীটি বর্ষাকালে দ্রুত ভীষণমূর্তি ধারণ করে, এক্ষণে কিন্তু কলেবর খর্ব কোরে, একটি মিড়মিড়ে ক্ষুদ্র সোঁতা হয়ে মড়ার স্থায় পড়ে আছে। অস্ত্র সহর যেরূপ, আমিরগড়ও সেই-রূপ। রাজ-অট্টালিকা আর দেবালয়গুলি

\* ইতর জাতির লোকেরাই সেখা হয়, হিন্দু-হানের মধ্যে এতি গ্রামেই তাহাদিগের বসবাস আছে। পথিকদিগকে পথপ্রদর্শন করান তাহাদিগের জাতীয় রীতি। সোয়ার-পথিকদিগের সঙ্গে সঙ্গেই পদব্রজে চলিয়া যায়, গ্রামান্তরে পৌছাইয়া দিয়া সে কিরিয়া আইসে, আবার দোসরা এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। গুজরাটে সেখাদিগকে ‘বুয়িরা’ বলে।

একটি উচ্চ শৈলের উপর সুশোভিত। আমরা একদিন দিনরাত এই স্থানে অবস্থিতি কলেম, তাতে কোরে পথপ্রমণ্ড অনেক লাঘব হলো, আমরাও অনেক সুস্থ হোলেম। আমাদের পথপ্রদর্শককে কিন্তু আমাদের স্থায় তত পথ চলতে হয় নাই, তাই সে ব্যক্তি ভারি বিরক্ত হোতে লাগলো, সে বোলে, এ অকারণ বিলম্বের প্রয়োজন কি? সন্ধ্যার সময় সলিমান আমাদের ফেলে রেখে একলা সহর দেখতে বেরিয়েছিল। সে যখন ফিরে এলো, তার দুর্গতি দেখে আমার কান্না পেতে লাগল। পিঠের দিকের চাপকান্টা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাথায় পাগড়ী নাই, কোথায় পড়ে গিয়েছে, তা বলতে পারে না, মুখময় চোট লেগেছে, শরীরময় রক্তে রক্ত হয়েছে, এক পায়ে একপাটি জুতো রয়েছে, আর এক পাটি কোথায় পড়ে গিয়েছে, তার ঠিকানা নাই। রাগে ফুলছে, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। আমি আগে জান্তেম না, তার শরীরে তত রাগ ছিল। মুখে কথা নাই, কেবল এক একবার আপনা আপনি এই কথা বোলুছিল, ‘লক্ষ্মী-ছাড়ার দাঁতে বিষ, আজ সেই দাঁত ভেঙ্গে দিইছি।’ তখন কোন কথাই জিজ্ঞাসা কোন্তে সাহস হলো না, অনেক কণের পর যখন একটু সাম্যমূর্তি হলো, তখন তার মুখে তার দুর্দশার কারণ শুন্তে পেলেম।

সলিমান বোলে, “মশায়! যারে খায় কালসাপে, কি করে তার ওখার বাপে। আমি তুম্বাক থেকে দেখলেম, সেই নেমক-

## উজীর পুত্র।

হারাম বেটা দাঁড়িয়ে, আজ তার নেমকহারামির শিক্ষা দিয়েছি, আজ বেটা কাল-গু হেগে মোরবে, যে কাঠার মাপ সেই কাঠার শোধ দিয়েছি।”

আমি বোল্লেম, “কে? কার কথা বোল্-  
ছিস?” “ধর্মাবতার! সেই বিটলে ঠগ্বেটা,  
সেই বজ্জাত নেমকহারামি হিন্দু, যে আমা-  
দের ফুলসিয়ে মাহীরদের চক্রের মধ্যে লোয়ে  
নায়, যে মাহীরদের হাত থেকে আল্লা আমা-  
দের রক্ষা কোরেছেন।” আমি বোল্লেম, “কে?  
যে আমাদের পথে উপাখ্যান শোনায়? সেই  
প্রফুল্লচিত্ত সুরসিক হিন্দু? সেই রহস্যপ্রিয়  
সুকোতুকী সহপাঠিক?”

সলিমান্ বোল্লে, “হাঁ, সেই নেমক-  
হারাম ধূর্ত বেটা! আমি তাকে দেখতে  
পেরেই চিন্তে পাল্লেম, সেও আমার চিন্তে  
পেরেছিল। সে একটা ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে লুকিয়ে  
লুকিয়ে ঘাঁতি মেরে ঘাঁতি মেরে বেড়াচ্ছিল।  
আমি বোল্লেম, ‘তুই আজ আমার হাত থেকে  
বৈচে যেতে পারবি না, ঐ কথা বোলে আমি  
তার পেছনে পেছনে চোল্লেম, তলোয়ারখানা  
বার কোরে, তাতে তখন খাপ লাগান আছে,  
কোসে তার ঘাড়ে এক চোট বোসিয়ে দিলেম,  
সে তখন কিরে দাঁড়ালো; আর এক চোট  
তার মুখ তেকে মাল্লেম, সেই চোটে কতকগুলি  
দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে  
গেল। বিটলে বেটা সেই চোট খেয়ে  
‘গেলেম’ রে, মাল্লেম রে, সাল্লে রে, মেরে  
কেলে রে, বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার  
কোরে লোক ডাক্তে লাগল, ‘হাটের  
নেড়ে হজুক চায়,’ তার ঐ চীৎকার  
শনে অনেকে এসে পোড়লো, তারি ফল এই  
যাহা চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। সকলে মিলে  
আমায় দূর দূর কোরে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে,  
দিয়েছে দিয়েছেই, আমি তা ভূণ জানও করি  
না, সে পাণিষ্ঠ বেটার দাঁতগুলি বখন পেটের  
মধ্যে ঢুকিয়ে দিইছি, তাতেই বস্ আছে,  
বস্! আর কিছু কোতে চাইনে। ধর্মাবতার!  
সকলে ভুটে হল্লা কোরে আমার কোলে, কি!  
আমি তো বেটাকে আছা কোরে ঠকে

দিইছি, কই, কেউ রক্ষা কোতে পাল্লে!  
এ কি হাত দিয়ে হাতি ঠেলা!”

আমি সলিমানের পাঠ খাবড়িয়ে বোল্লেম,  
“সাবাস্ সলিমান্! বাহবা, বাহবা! আছা  
জাঁহাজী কোরেছো, খুব বাহাজুরী দেখি-  
য়েছো! তুমি একটা মস্ত তুমতড়াকে লোক।  
এই দেগেশা দিয়ে শেষে বোল্লেম, তোমার  
এ বীরত্বের প্রশংসা না কোরে থাকতে পাল্লেম  
না সভ্য, কিন্তু তুমি যে এখানে নিষ্কিয়ে উৎ-  
পাত অত্যাচার কোরবে, তা পারবে না, এ  
সে দেশ নয়। দেখো, ভবিষ্যতে যেন এমন  
পাগলদমি আর না করো, এখানকার বাসি-  
ন্দাদের সঙ্গে কদাচ বিবান-বিসম্বাদ কোরে  
না! সলিমান্! সময়ে অনেকে বজু হয়, তারা  
কিন্তু অসময়ের কেউ নয়, আমাদের এখন  
সময় ভাল নয়, সেইটি যেন স্মরণ থাকে।”

স। ধর্মাবতার, এ দেশ আমার বেশ  
জানা আছে, এখানকার লোকেরা ঠেঁটা,  
বজ্জাত কি বাটপাড় জুরাচোর নহে, তাদের  
বেশ শাস্ত প্রকৃতি, কিন্তু পাশও গোয়েন্দা বেটা  
মাহীরদের চাহত চর, তার এখানে ঘরবাড়ী  
নাই, সে বাসিন্দাই নহে, ও বেটা কেবল এ  
দেশ সে দেশ নষ্টামি আর ঠকামি কোরে  
ফেরে; বেটা যেমন কাপুরুষ, তেমনি পাঞ্জী,  
ছোট লোক, তা যদি না হবে, তবে নিজের  
তলোয়ার বার কোরে আমার সঙ্গে মোহাড়া  
দিলে না কেন? তবে সে আমার সঙ্গে লড়াই  
কোতে মোস্তাদ হলো না কেন? বেটা ত  
না কোরে লোক ডেকে জড় কোলে, শত্রু  
লোকের হাতে পোড়ে কেঁদে কোকিয়ে মাটি  
ভিজিয়ে দিলে, বেটা হেলে ধস্তে জানে না  
কেউটে ধোস্তে যায়; হজুর! যেচে মান আর  
কেঁদে সোহাগ, তাও কি কখন শোভা পায়!  
সে বেটা ভারি পাঞ্জী, ভারি বজ্জাত, আম  
আগে চিন্তে পারে নি, আমি যে শির  
পাগল, বেটা তা জানে না।” এই কথা বে  
সলিমান্ ক্রমিক ভাবে একটানা গালাগাণি  
দিয়ে চলেছে, এমন সময় কতকগুলি অস-  
হাযী রাজ-অহচর উপস্থিত হয়ে সলিমান্কে  
হাজির কোরে দিতে বোল্লে, তারা

ধরে নিয়ে বিচারাসনে লয়ে যাবে। সলিমান আপনাই ধরা দিলে, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। এই উপলক্ষে ঐ স্থানের এক জন ঠাকুর প্রতিনিধি বিচারপতি হয়ে বোসে-ছেন। সেই হিন্দু তার সম্মুখে এসে ঘোড় হাত কোরে দাঁড়ালে, তার মুখ এত ফুলে গিয়েছে যে, তার প্রায় কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। যদি এই বিচারস্থানকে কাছারী বোলেই গণ্য করা হয়, আমি তবে সেই কাছারীতে করিম্বাদীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝিয়ে বোলে আমার অন্তরের দোষ কাটাবার পথ কতক খোলসা কোরে রাখলেম। শ্রোতের মুখ তখন উন্টে গেল, পড়তা ফিরে দাঁড়াল, ঐ স্থানের মহাজনেরা মাহীরদের কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অপহৃত হয়, এখন তাদের স্বরণ হলো ঐ হিন্দু যখন তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কোরে ফিরে যায়, তার পরেই মাহীরেরা পোড়ে লুণ্ঠ-তরাস কোরে চোলে যায়, প্রতিবারেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছে।

একণে বিস্তর লোক উচ্চৈঃস্বরে ঐ হিন্দুর ভূমি কোরে নালিশবন্দি হোতে লাগলো। সে বেটা যেমন বজ্জাত, আমার চাকর সলি-মান তার সঙ্গে তেমন উপযুক্ত ব্যবহার কোরেছে। সলিমান তাকে বেলাজনা কোরে এবং যে শাস্তি দিয়ে তারে ছেড়ে দেয়, বিচারপতির বিচারে সেটি যথেষ্ট হয় নাই, তাই হুকুম হলো যে, “আমার পরিহাসপ্রিয় উপাখ্যানবক্তার নাক আর কান কেটে লোয়ে, আচ্ছা রকম প্রহার কোরে, এই কথা বোলে সহর থেকে দূর কোরে দেওয়া হয়, সে যদি আর কখন আমিরগড়ে মুখ দেখায়, তবে তার অদৃষ্টে যত্ন নিশ্চয়ই অবধারিত আছে।”

সলিমান একণে গা হাত পা পরিষ্কার কোরে, ঘায়ে পটা দিতে বসে গেল, সে এবার যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছে, তাই স্বরণ কোরে আপনা আপনি আফ্লাদে চলে পোড়তে লাগলো। লুচর পরমাণিক তার দাড়িটি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার কোরে দিলে, এ কাজটি

যে তার ভাল এসে, সে অভিমান তার চিরকালই আছে। এবার কিন্তু লুচরকে জব্ব হোতে হয়েছিল, সে আপন মুখেই কবুল কোলে, দাঙ্গাতে মেতে গিয়ে সলি-মানের দাড়িটি একেবারে ছুড়ো ছুড়ো হয়ে পোড়েছে। যেন খিচড়ি পাকিয়ে গিয়েছে, একটু টুন্ টাম্ কোরে ফাঁকি দিয়ে যাবার যো নাই, এবার লুচরকে অনেক পাটখাট কোত্তে হয়েছিল, তত পরিশ্রম না কোলে দাড়িটির পঙ্কোদ্ধার হতো না।

হুঃখের বিষয় এই, যে সকল দেশ দিয়ে চোলেছি, আমার সময়ও নাই, আর স্থানও নাই যে, এই উপাখ্যানের মধ্যে সেই সকল দেশের আকৃতি ও অবস্থা নিবিষ্ট করি। গুজ-রাটের বরদা সহরে পৌছে দেখলেম, মুরাদ-বাকীর বাহিনী ডেকানে কুচ্ করবার উদ্যোগ কোচ্ছে। মুরাদবাকী আরজজেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাঁর আত্মকলো সহায়তা কোর্বেন, এই পরামর্শ স্থির হয়েছে। ঐ কথা শুনে আমার তো বিশ্বয় জ্ঞান হলো, এ ঘোর হুজুয় ব্যাপারের মর্ম অবগত হবার জন্ত আমার কিছুকাল বিলম্ব কোত্তে হয়েছিল, যে পর্যন্ত ডেকানে পৌছিতে না পেরেছিলেম, সে পর্যন্ত ঐ নিগূঢ় সন্ধানটি জানবার উপায় ছিল না।

মুরাদবাকী শুনলেন, আমি তাঁর রাজভাতা আরজজেবের একজন কর্মচারী, ঐ কথা শুনে আমার খাতির-বৃত্ত কোত্তে লাগলেন, কতক গুলি সৈন্তের অধ্যক্ষ কোরেও দিলেন, আর কিছু অর্থও আগামী প্রদান কোলেন। অর্থগুলি হস্তগত কোরে আমিরগড়ের রাজার পাওনা-গুলি অগ্রে পাঠিয়ে দিলেম, “রক্তনের চাউল চর্কণেই গেল,” তার পর কুচ্ কোরে সৈন্তে দাপ্তিগাত্যে পৌছিলেম, তার পূর্বে ইরাস-মিন্ আমির জেমলার সমভিব্যাহারে আরজ-জেবের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন। সম্রাট শাহজাহান ৭০ বৎসর গত কোরেছেন, একণে সঙ্কটাপন্ন পৌড়িত, এখন তখন হয়ে আছেন। তাঁর পীড়ার কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে দেশভূদ লোক উৎকণ্ঠিত সশস্ত্র হয়ে পোড়েছে,



ভাবছে, না জানি, কখন কি প্রমাদ উপস্থিত হয়। রাজপুত্র দ্বারা দিল্লী ও আগরায় বলবান্ বলবান্ বাহিনী সংগ্রহ কোরেছেন, আবার সেই সময় সুলতান সুলতা বন্ধে বোসে যুদ্ধের ঘোর আড়ম্বর কোচ্ছিলেন। এদিকে যখন এই সকল অনর্থপাতের মহাপ্রবাহ চোলেছে, তখন দক্ষিণে আরঙ্গজেব ও গুজরাটে মুরাদবাকী আলম কোরে যে নিশ্চিন্ত বোসে থাকবেন, সেই বিবেচনার বহির্ভূত। যার যত আশ্রয়, যার যত স্তম্ভ, যার যত মিত্র ছিল, রাজ-ভ্রাতারা আপনার আপনার পার্শ্বে এনে একত্রে সমবেত কোলেন এবং নানা প্রকার কুচক্র, নানা প্রকার কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হোলেন। এতদ্বিধ যে সকল লোকের বল-পরাক্রম দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা জেনে ছিলেন, তাদের সঙ্গে রাজকুমারদিগের চিঠিপত্র লেখালেখি চোলতে লাগলো। অদৃষ্টের অগ্রসাদ বশতঃ দ্বারা কতকগুলি সেই সকল পত্র পথে আটক কোরে তাঁর রাজপিতা শাজাহানের নিকট ধোরে দেন, সেই সময় আবার অপরাপর ভ্রাতাদের নামেও ষণ্পরোনাশি গ্রানি কোরে মনের আক্রোশ প্রকাশ করেন। রাজকুমারী বেগম সাহেবও এই শুভ লগ্নে অবস্থা তিন ভ্রাতার নামে নিন্দা-মন্দ কোরে যোগলপ্রধানের মনান্তর জন্মাইবার চেষ্টা কোন্তে লাগলেন। কিন্তু দ্বারার প্রতি সম্রাটের শ্রদ্ধাও ছিল না, আস্থাও ছিল না, “যার গলা ধোরে কাঁদি, তার নেই চক্ষে জল,” এই নিন্দামন্দ অবিকল সেইরূপ হয়ে দাঁড়াল। লোকের মনে সন্দেহ হোতে লাগলো, শাজাহান আরঙ্গজেবকে গোপনে গোপনে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। রাজকুমার দ্বারা ঐ সন্দেহের কথা শুনে ক্রোধে কালাগ্নির জ্বালা হোলেন, একদিন কথার কথার রাগে উন্মত্ত হয়ে বৃদ্ধ নরপতিক প্রায় মেয়ে বোসেছিলেন, আর কি। সম্রাটের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হতে লাগলো, তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে, এই কথা পূর্বের মতন আরও একবার রাষ্ট্র কোরে দেওয়া হলো। সেই জনরব শুনে সমুদয় রাজপুত্রীয় মধ্যে মহা গোল হোতে লাগলো, এমন কি,

গোলের যেন তরঙ্গ থেলতে লাগলো, আগরা-বাসী লোকেরা ভয়ে চকিত হলো, দোকান-পাঠ বন্ধ হলো, সরকারী কার্য স্থগিত হয়ে গেল, কারুকারবারও রহিত হলো, দেশ অরাজকের জ্বালা হয়ে পোড়ল, কে কাকে মারে, কে কাকে কাটে, তার বিচার ছিল না, রাস্তা-ঘাট ভয়ানক হয়ে পড়লো, লোকের চলাচল রহিতপ্রায় হলো।

এই সময় চার রাজকুমার স্পষ্ট হয়ে আপনার আপনার মনোগত অভিপ্রায় বাজ কোরে বোলেন, একমাত্র তলোয়ার মধ্য-বর্ত্তিনী হয়ে সগর্ভিত ছরন্ত স্বার্থবিবাদের মীমাংসা কোরবে। যিনিই হউন, যুদ্ধে বিমুখ বা অপদস্থ হোলে কেবল রাজমুকুটের উপর দিয়া বিপদ কেটে যাবে না, রাজত্বের পরিবর্ত্তে কেউ যে প্রাণ লোয়ে নির্ঝিড়ে থাকবেন, তা পারবেন না, রাজ্য আর মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে কারও ইচ্ছামত মনোনীত করবার ক্ষমতা থাকবে না, যিনি রাজত্ব হারাবেন, তাঁকে জীবনও হারাতে হবে, আমি যখন ডেকানে পৌছিলাম, রাজপদ এইরূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে দেখলাম। এখনও কিন্তু একটি বিষয় আমার জানতে বাকী আছে—যে সময় চার রাজকুমার সিংহাসনের নিমিত্ত ছটোছটি কোচ্ছেন, সেই সময় মুরাদবাকী আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিলেন; কি স্ত্রে এ ঘটনাটি হয়ে দাঁড়ালো, তাই জানবার নিমিত্ত মনে মনে ব্যগ্র হোতে লাগলাম, ভাবলাম এ ঘটনার অবশ্যই কিছু নিগূঢ় মর্ম্ম থাকবে। কুচের সময় শাহা আবিয়াসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। শাহা আবিয়াস একজন খোজা সিপাই, সাতিশয় বীর্যবন্ত, মুরাদবাকী সর্বদাই তাঁর ছালা পরামর্শ লোয়ে বিষয়কার্য্য কোভেন। দুই ভ্রাতার বাহিনী কেন একত্রে মিলিত হল, এ দুজের মর্ম্ম ভেদ কোন্তে না পেরে আমি বিষয় প্রকাশ করাতে, শাহা আবিয়াস মাথা নেড়ে বোলেন, “এটি আমার অভিমতে হয় নাই, মুরাদবাকী আরঙ্গজেবের চাতুরীতে বুদ্ধ হয়েছেন, সে কালকাঁদ থেকে রাজকুমার কহাচ বেঁচে

জাপতে পারবেন না”। মুরাদবাকী আরঙ্গজেবের প্রেরিত যে পত্র পেয়েছিলেন, “শাহা আবিয়াস ঐ পত্রের মর্ম ব্যাখ্যা কোলেন। মুরাদবাকীকে আরঙ্গজেব এই কথা লিখে পাঠান: “তীর (আরঙ্গজেবের) যেরূপ প্রকৃতি, আর তাঁর মনের যেরূপ প্রবৃত্তি, তাতে কোরে রাজত্বের কনুকাট তাঁর কদাচ সঙ্গ হবার নয় বরং তাতে তাঁর বিরক্তিই বোধ হয়, সেই জন্যে রাজত্বের প্রতি তিনি ঘৃণাই কোরে থাকেন। দারা আর সুলতানসুজা সান্নিপাতের তরফার জায় রাজ্যপিপাসায় ব্যাকুল হয়েছেন সত্য, কিন্তু আমি আরঙ্গজেব, ককিরের ফকির গ্রন্থন কোত্তে পাচ্ছিনে বোলেই দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কচ্ছি।” আরঙ্গজেব তাঁর পত্রে আরও এই কথাগুলি ব্যক্ত করেন, দারার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি রাজপদের যোগ্য নহে, তাঁর দ্বারা রাজ্য শাসন চোলবে না, তিনি তার যোগ্য নন, তাই কাজে কাজেই দারা রাজসিংহাসনের অস্থপযুক্ত পাত্র। ‘সাঁতার যাজ্ঞানলে বাপের পুকুরে ডুবে মোত্তে হয়,’ দারা রাজ্য পেলে অবিকল সেই দশাই ঘটবে, তদ্বিত্ত দারা ধর্মবিমূঢ়, ওরাওরা তাঁকে অতিশয় ঘৃণা কোরে থাকেন। সুলতান সুজাও অস্থপযুক্ত, রাজচ্ছত্র পাবার অতি অপাত্র। সুলতান সুজারেকাজি (অধর্মপ্রভু), সুতরাং তিনি সেই দোষে হিন্দুস্থানের মিত্র না হয়ে বরং ক্রি হয়ে পোড়েছেন।” এই প্রকার মুখবন্ধ কোরে, ধৃত আরঙ্গজেব শেষে এই মীমাংসা কোরে লিখলেন, “অতএব আমার যখন দর-বশের টুপি গ্রহণের অভিলাষ হয়েছ, তাতেই আমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ কোত্তে পারবো, আর যখন দারা আর সুলতান সুজা রাজকার্যের অস্থপযুক্ত পাত্র, তখন হে প্রিয় দাতা মুরাদ! দুর্জয় রাজ্য স্থাপন করবার ক্ষমতা যোগ্যতা শুদ্ধ তোমাতেই বিত্তমান রয়েছে। একথা শুধু আমি বলি না, বড় বড় ওমরাওরাও ঐ কথা বোলে তোমার অমুরাগ কোরে থাকেন। তোমার দুরন্ত পরাক্রমের ফলনা নাই, তাই তুমি তাঁদের প্রদাম্পদ হয়েছ, এক্ষণে তাঁরা তোমার রাজধানী আগ-

মণের প্রতীক্ষা কোরে আছেন। তোমার নিকট আমি এইমাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি যখন রাজ্যেশ্বর হবে, তোমার রাজ্যের মধ্যে কোন নির্জন স্থানে আমার বাস কোত্তে দিও, আমি যেন সেই স্থানে নির্ঝিয়ে জগদীশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থেকে জীবন অবশেষ কোত্তে পারি। আমি সহায় হয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছি, আমি আমার যুক্তি আর ভাতুক স্নেহ প্রদান কোরে তোমার আনুকূল্য কোত্তে সম্মত আছি। আমার সঙ্গে যে লঙ্কর আছে, সে সমুদয় তোমার হুকুমের অধীন কোরিয়ে দেবো। “এই সকল সরল প্রলোভনবাক্য দ্বারা আরঙ্গজেব মৎস্তটি আপন চারে এনে কুচক্র-রূপ বঁড়ীতে গেঁথে কেলে। শাহা আবিয়াস বোলেন, এই হোচ্ছে আরঙ্গজেবের আশয়, অভি-প্রায় এবং তাৎপর্য। মুরাদবাকীকে সুরাতের কেল্লা অবরোধ কোত্তে পরামর্শ দিয়ে চিঠি-খানি সমাপ্ত করেন, সুতরাং অবরোধ করবার তার আমার উপর এসে পোড়েছে। যুবা! সকল কথাই ত শুনলে, আরঙ্গজেবের পত্র সম্বন্ধে তোমার কিরূপ অভিপ্রায়, তা বল।” আরঙ্গজেব আমার যুনিব এবং রাজা, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আমার বলতে না হয়, সেইটিই আমার ইচ্ছা, কেন না, ধর্ম ভেবে বলতে গেলে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অবশ্যই দোষারোপ কোত্তে হতো, আমি তাই সাত পাঁচ চিন্তা কোরে ষোর-কের কোরে এমনি বিভাবের উত্তর কোলেম, খোজার সাধ্য হলো না আমার কি অভিপ্রায়, তা বুঝে উঠেন তাহার পরেই আবিয়াস যুদ্ধের আয়োজন কোত্তে সুরাতে চোলে গেলেন, আমিও বেঁচে গেলেম, আমার আর বার বার সেই অকৃতিকর কাল-তর্ক লয়ে নিরর্থক বাক্‌চাতুরী কোত্তে হলো না।

মুরাদ আরঙ্গজেবের পত্রখানি অকপটে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখাতে লাগলেন, মনের আশা এই যে, পত্রের মর্মাবগত হোলে লোক তাঁর অহুগত হয়ে চোলুবে, তাঁর অধীনে থেকে কাজকর্ম কোত্তেও। তাদের প্রবৃত্তি হবে, বনবান্ মহাজনেরাও তাঁকে ঢাকা কজ্জ

দিতে কুণ্ঠিত হবে না, এক্ষণে নিরবচ্ছিন্ন জোর-  
জবরদস্তি কোরে ঐ টাকা তাদের কাছ  
থেকে এক প্রকার কেড়ে নেওয়াই হচ্ছিল।

মুরাদ আকাশকুসুম-দর্শনের জ্বায় মনে  
মনে রাজপদ, রাজপরাক্রম গ্রহণ কল্লেন,  
লোকজনকে লম্বা লম্বা আশা-ভরসা দিতে  
লাগলেন, উমেদারে উমেদারে তাঁর বাড়ী  
ঘেন হরি বোষের গোয়াল হয়ে পোড়ল,  
বিস্তার বাহিনীও সমবেত কোল্লেন, সুরাত অব-  
রোধের নিমিত্ত সৈন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।  
এক্সণে আমি তাঁর অহুমতি লয়ে আরজজেবের  
নিকট চোলে গেলেম। এসে দেখ্লেম, দারুণ  
লোভ-ব্রতে ব্রতী, রাজ্যলোলুপ, ধূর্ত রাজ-  
পুত্র আরজজেব নানা ছুরভিসন্ধি-চক্র লোয়ে  
ব্যতিব্যস্ত আছেন, জেমলার বাহিনী সমূহকে  
হস্তগত করা এক্সণে তাঁর প্রধান অভিসন্ধি।  
আমীর জেমলা সৈন্য অগরা থেকে আগমন  
করেছেন, আপাততঃ কালিয়ানি অবরোধের  
নিমিত্ত মহাব্যস্ত ছিলেন, সেটি সম্রাট শাক্কা-  
হানের হুকুম। জেমলার সঙ্গে কিরূপে স্বয়ং  
সাক্ষাৎ কোরে পরামর্শ আঁটবেন, রাজপুত্র  
তারি মন্ত্রণা, তারি কৌশল কচ্ছিলেন, এমন  
সময় আমি উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ করিবার  
প্রার্থনা জানালেম।

আরজজেব আমার দেখে বল্লেন, “কও  
কথা! তুমি কোথা থেকে? আমি মনে করে-  
ছিলেম, কাল যমই বুঝি তোমার পরিসেবার  
আমাদের বঞ্চিত কোল্লেন। দোহাই আল্লার!  
তুমি এত দিন কি কাজে ব্যস্ত ছিলে বল, এই  
বুঝি তোমার প্রভুভক্তি দেখানো? এই বুঝি  
তোমার বিশ্বাস বজায় রাখা? যাবার সময়  
তোমায় বারংবার কোরে বোলে দিয়েছিলেম,  
আগরায় কি বন্দোবস্ত হয়, দারা কি মন্ত্রণা  
কি চক্র কোচ্ছেন, সে সকল বিষয় অবশ্য অবশ্য  
আমায় লিখে পাঠাবে, কদাচ যেন অন্তথা না  
হয়, সে সব কথা কি তুমি বিশ্বস্ত হয়ে গেছো?”  
আমি কি তোমায় তৎকালীন বিশেষ কোরে  
বোলে দিইনি, এ কার্যো যেন কদাচ গাফিলি  
না হয়?”

আমি আপনার দুর্ঘটনার বৃত্তান্তগুলি যত

পাল্লেম বোল্লেম, কিন্তু সে কথা শুনে রাজপুত্র  
সন্তুষ্ট হোলেন না, তথাচ তিনি অনুগ্রহ কোরে  
মুরাদের লঙ্ঘন সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা  
কোল্লেন, তাদের মনের কিরূপ গতিক, কার কি  
বেতন, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোন্ডে  
লাগলেন। আবশ্যকমত সকল কথারই উত্তর  
কোরে শেষে বোল্লেম, “শাহা আবিয়াস্ মুরাদ  
বাকীকে দিবরোত্র এই বোলে জপাচ্ছেন যে,  
আরজজেবের পত্র অনুসারে তাঁর কথায়  
বিশ্বাস যাবেন না, তাঁর আশ্বাস-বাক্যের  
উপর ভরাত্তর দিয়ে চলবেন না।”

আরজজেব একটু মুচকে হেসে বোল্লেন,  
“সাদক! তুমি যখন আমার দুর্দাম কোন্ডে  
শুনলে, তখন অবশ্যই তুমি কিরে দিবা কোরে  
বোলেছিলে, আরজজেব সেরূপ স্বভাবের  
লোক নন, তাঁর কথার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে  
নির্ভর কোন্ডে পার।” আমি যে দ্বি-অর্থক  
কথা বোলে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরে-  
ছিলেম, সে কথা রাজকুমারকে বলতে সাহস  
হলো না, তাই এই কথা বোলে তাঁর কথার  
উত্তর কল্লেম, “যে স্থলে শাহা আবিয়াস্ উপ-  
স্থিত আছেন, সে স্থলে আমি কে যে, আমার  
কথা গ্রাহ্য হবে, তথাচ হজুরের মনে  
খলতা কপটতা নাই, সেই কথাটি কি  
কৌশল কোরে জানিয়ে দিয়েছি, কতক  
ভঙ্গীতে, কতক ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছি  
যে, হজুর অতি নিরীহ, অতি নিস্পৃহ, অতি  
সরল, মনে কিছু গোল নাই।”

রাজপুত্র শুনে বোল্লেন, “আচ্ছা, তা বে  
করেছ, আমাদের আর একটি অভিপ্রা  
আছে, আমীর জেমলাকে আর তার সৈ  
সামন্তকে আমাদের অনুগত পক্ষ কো  
হবে।” আমি বোল্লেম, “হজুর! একটি ক  
বিশ্বস্ত হচ্ছেন, প্রভুভক্তির জামিনের স্ব  
আমীরের পরিবার আপনার রাজপ্রা  
দারার হস্তে আবদ্ধ আছে।”

আরজজেব বোল্লেন, “সে কথা আ  
বিশ্বস্ত হইনি, আমীরের সঙ্গে একবার সা  
হোলে সে পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাদ  
তোমায় স্পষ্ট বলছি, আমি তোমার উ

অসহ্য হয়েছি, তুমি যদি পূর্বের মতন আমার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ কোত্তে চাও, তবে তাঁর সময় এই। আমিও এক্ষণে কালিয়ানিতে বাস কোচ্চেন, তুমি গিয়ে তাঁকে এই কথা বল, তিনি যেন দৌলতাবাদে এসে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বিশেষ পরামর্শ আছে, সেই জন্তে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষা-ত্তের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে তুমি এই দণ্ডেই চোলে যাও, আমীরকে সঙ্গে কোরে আনতে চাও, দেখো যেন এ কথার অস্তথা না হয়।”

“অস্তথা না হয়,” এরূপ হুকুম কোত্তে রাজপুত্রের পক্ষে অতি সহজ, আমি কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় কোল্লম, এ কার্য আমা হোতে নিকাহ হবার নয়, আমি অপ্রতিভ হব, বিশেষতঃ সকল দিকে বিবেচনা কোরে দেখলে আমিই এ দৌত্যকার্যের অল্পপযুক্ত পাত্র, তথাচ কি করি, অগত্যা বিশ জন সোয়ার সঙ্গে কোরে কালিয়ানি যাত্রা কোল্লম, মন কিন্তু স্থবী হলো না, অস্ত-করণের মধ্যে যেন কতই দুর্ভার জ্ঞান হোতে লাগলো। আমীর আমায় দেখে, হঠাৎ চোমকে উঠে, রাগে চোক মুখ লাল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “তুমি আবার এখানে কেন এসেছ? আমার এখানে তোমার কি প্রয়োজন?” আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলেম, “আমার নিজের কোন গরজ নাই, আপনাকে সঙ্গে কোরে দৌলতাবাদে লয়ে যাবার জন্তে আরজজেব আমায় পঠি-য়েছেন, রাজপুত্র আপনাকে কোন বিশেষ কথা বোলবেন বোলে আপনার প্রতীক্ষা কোচ্চেন।” আরজজেব সাক্ষাৎ কোরে যে কথা বোলবেন, আমীর যেন তাঁর মর্শ বুঝতে পাঞ্জন, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে এইরূপ অনুমান হলো। জেমা লস্কর ছেড়ে যেতে অস্বীকৃত হলেন, মুখে কিন্তু এই কথা বোল্লেন, আগরা থেকে তাঁর কাছে পত্র এসেছে, তিনি নিশ্চয় খবর পেয়েছেন, শাজাহানের কালপ্রাপ্তি হয় নাই, মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, সম্রাট বরং দিন দিন আরোগ্য লাভ কোচ্চেন, এ সংবাদ

যদিও সত্য না হতো, তথাচ যে আরজজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পান্তেম, তা বোধ হয় পান্তেম না, যেহেতু, আমার স্বী পরিবার দারার আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিতি কছে। এই উত্তর লয়ে আমায় আরজজেবের কাছে ফিরে যেতে হলো। রাজপুত্র দুই চক্ষু পাকিয়ে কালমুখি হোলেন, আমি ছল-কৌশল জানি না বোলে আমায় তিরস্কার কোত্তে লাগ-লেন, মুখে বোল্লেন, এরূপ কোন দৌত্যকার্য আমায় কখন পাঠাবেন না। ঐ কথা শুনে আমার হাসি পেলে, ভাবলেম, এ শুকনো কাঠে ব্রহ্মশাপ কেন? কি করি, নিশ্চয় হয়ে রইলেম, তাঁর এ অজ্ঞায় অপবাদ আমায় সরে থাকতে হলো, কালগুণে, অবস্থাগুণে, সব সহ্য কোত্তে হয়, আমি আর কথা কাটা-কাটি না কোরে চুপ কোরে রইলেম, তাঁর পর অনেক অহুন্নয় জানিয়ে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সোরে পড়লেম। আরজজেব যে সহজে তাঁর অভিসন্ধি পরিত্যাগ কোরবেন, তিনি সে প্রকৃতিপ্র লোক ছিলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদকে আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, ইনিও কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন হতে পাঞ্জন না। মহম্মদ বিমুখ হয়ে ফিরে এলে, কুমারের মধ্যম পুত্র সুলতান মাজমকে পাঠান হলো, তিনি গিয়ে এত আত্মীয়তার ভাণ কোল্লেন, বাক্যের কঁাদ পেতে এত চতুরালি দেখালেন, আমীর সেই বাক্চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অহুরোধ রক্ষা কোত্তে বাধ্য হোলেন। আমীর কালিয়ানির দুর্গ দুর্গপতির হস্তে সমর্পণ কোরে, তাঁকে নিয়ম পালনের পক্ষে বিশেষ আবদ্ধ কোরে, বেছে বেছে ভাল ভাল সৈন্য লোরে দৌলতাবাদে চলে গেলেন। আরজজেব যৎকালীন আমীরকে আহ্বান করেন, তখন আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না, আমার উপস্থিত থাকবার অনুমতিই ছিল না, ইয়াসমিন কিন্তু তৎকালে সে স্থানে উপ-স্থিত থাকেন, ঐ ইয়াসমিনের নিকট শুন্লেম, রাজপুত্র আমীরের গলা জড়িয়ে ধোরে তাঁকে পিতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগলেন।

যখন তাঁদের গোপনীয় কথাবার্তা হয়, সুলতান মাজুম ও সুলতান মহম্মদ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা কিন্তু সে নিগূঢ় সাক্ষাতের মর্ম অবগত হোতে পারি নাই, শেষে শুনেম, আমীর দৌলতাবাদে বন্দী হয়েছেন, শুনে আমরা হতবুদ্ধি হোলেম, এই অসুখমান কোয়েম, আরজজেব আমীরকে বন্দী হোতে বলেন. আমীর তাঁর প্রজাবমত বন্দী হোতে স্বীকৃত হন, তা হোলে দায়া আর বৃদ্ধিতে পারবেন না যে, তাঁরা পরম্পরের মিত্র, কারণ, দায়া যদি জানতে পারেন, আমীর আরজজের মিত্র হয়েছেন, তবে যে তাঁকে পরিবারগুলিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, তার আর সন্দেহ নাই। আমীর বন্দী হোতে সম্মত হোলেন কেন? তাঁকে কি ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল? আমীর কি সেই ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞার কুহকে বিমোহিত হয়ে বন্দী হোতে স্বীকৃত হোলেন, না সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হোতে তাঁর সাহস হলো না? তাই স্তবরাং ভয়ে জড় সড় হয়ে অনিচ্ছাতেও বন্দী হোতে হয়েছিল? আমরা কিন্তু সে অস্বুট্টকথার কিছুই অবগত হোতে পারি নাই, তবে কথা এই যে, শুধু মেঘে কখন মাটি ভেজে না, কোন রকম না কোন রকম ভয় অবশ্যই দেখানো হয়েছিল। একজন খোজা কোন গতিকে সে পরামর্শ ঘরের ভিতর একবার উঁকি মেরে দেখেছিল, তারি মুখে সুলতান মহম্মদের আকার প্রকার, তাঁর ভাবভঙ্গির কথা শুনেতে গেলেম। সুলতান মহম্মদ তখন অস্ত্র-শস্ত্র লোয়ে বীরসজ্জায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর সে সময়ের ভাষা মুক্তি বিস্তৃত হবার নয়, বেহেতু, তিনি নিজে অপারগ হয়ে ফিরে আসিলে, তাঁর সহোদর গিয়ে আমীরকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আসেন, সুলতান মহম্মদের পক্ষে সেটি অপমানের কথা, তাই তিনি বীরমুর্তি হোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমীরের লঙ্করেরা যখন শুনে, তাদের, নায়কপ্রধান বন্দী হয়েছেন, তারা উচ্চৈঃ-

স্বরে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা কোন্তে লাগল। তারা তদুণ্ণেই আমীরকে উদ্ধার কোরে লইল, কিন্তু আরজজেব মধ্যবর্তী হয়ে তাদের নিবারণ কোলেন। রাজকুমার সেনাপতির প্রধান প্রধান সরদারদের ডেকে বোলেন, আমীর আপনার সমাক্ষ ইচ্ছাতেই কয়েদ হয়েছেন, এ কোশলের মর্ম কেবল তাঁদের মধ্যেই প্রকাশ ছিল, অস্ত্রের জানুবার বিষয় নয়। এতদ্বিধি রাজকুমার বিস্তর বহুমূল্যের খেলাত দিয়ে লঙ্কর ও সরদারদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দিলেন, তিন মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান কোলেন, রাজকুমার এই সকল উপায় ও কোশল দ্বারা লঙ্করদের মন মুগ্ধ কোরে আপনার অসুগত পক্ষ কোলেন। তিনি যে সময়-তরঙ্গের অস্থগত কোচ্ছিলেন, তাতে তারা ব্রতী হোতে স্বীকার কোলে। আরজজেব দেখলেন, তাঁর এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কোন বাধা নাই, সকল আয়োজনই হয়েছে, মুরাদবাকী সুরাত অধিকার কোরে তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে এসে-মিলিত হোলেন, এক্ষণে উভয় বাহিনী একত্রিত হয়ে উল্লাসের, উৎসবের মহা ধুম হোতে লাগলো। আমরা আপাততঃ আগরা রাজধানী যাওয়া করবার আয়োজন কোন্তে লাগলেম, আরজজেব সকল কথাতেই মুরাদবাকীকে সম্রাট বোলে সহোদন কোন্তে লাগলেন, তিনি বেন অসুগত দাস, এই রূপ ভাণ কোরে, মুরাদবাকীর আদেশ অসুখমতি গুলি অতি নম্র হোয়ে সগৌরবে পালন কোন্তে লাগলেন।

উভয় বাহিনী একত্র হওয়ারান্তে আগরাতো ভারি একটা গোলযোগ পোড়ে গেল। আরজজেব বীর, প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান; মুরাদবাকী দুর্দান্ত তেজস্বী, দারার মনে কাজে কাজেই ভয় হলো। এদিকে সুলতান সুলজা বিস্তর সৈন্য লয়ে দ্রুতবেগে বঙ্গদেশ থেকে রাজধানী অভিমুখে চলেছেন, তাতে কোরেও দারার পক্ষে আর একটা নূতন গুরুতর বিভ্রাট বৃদ্ধি হলো। সম্রাটের এক্ষণে প্রকৃত দুরবস্থা, এক দিকে রোগগ্রস্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ কোচ্ছেন, আর এক দিকে দারার হাতে প্রায় বন্দী হয়ে আছেন, দারা

## উজীর পুত্র ।

তঁার সঙ্গে দারুণ ছর্বাঘার কোচ্ছিলেন। আগরায় কি কি কাণ্ড হোচ্ছিল, সে খবর আমরা সকলের আগে পেতে লাগলেম।

সুলতান সুলজার প্রতিরোধ জন্ত যে লঙ্কর নিযুক্ত হয়, দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমান্ সিকু তাদের সেনাপতি হোলেন। সিকুকে দারা অভিশয় স্নেহ কোস্তেন, অপ্রাজ্ঞের স্থায় অধীর হয়ে কোন দুঃসাহসের কার্য না কোস্তে পারেন, বিশেষতঃ রাগাক্ত হয়ে হঠাৎ একটা ক্রুরপ্রাবিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হোতে পারেন, তাই দারার নিয়োগ অল্পসারে রাজা জয়সিংহ সুবরাজপুত্রের পরামর্শ-দাতা হয়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী হোলেন। জয়সিংহ একজন প্রবীণ বুদ্ধ রাজা, বিস্তর অর্থের অধিকারী, তাঁর উপর এই আদেশ হলো, চলে হোক, বলে হোক, সুলজা যাতে বঙ্গদেশে ফিরে যান, তারি চেষ্টা কোরবেন। তথাচ একটা যুদ্ধ কোস্তে হয়েছিল, যুদ্ধের ফল এই হলো, সুলজা পরাভূত হয়ে একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। সুলজা শত্রুহস্তে বন্দীও হোতেন, তবে জয়সিংহ যে একজন প্রকৃত রাজপুত্রের অঙ্গে সহসা হস্ত-পর্ণ কোরবেন, সে বিষয়ে তিনি ভারি বিবেচক, ভারি সাবধান ছিলেন, লোকে বলে তিনি ইচ্ছা কোরেই রাজপুত্রের পালাবার উপায় বোলে দিয়েছিলেন। আমরা যখন বরহামপুরের নদী উত্তীর্ণ হয়ে, পার্বত্যীয় দুর্গম পথ ভেদ কোরে, সরাসর একটানা চোলে আস্ছিলাম, সেই সময় ঐ যুদ্ধের আত্মোপান্ত বৃত্তান্তগুলি শ্রবণ কোল্লেম। আমাদের গমনে মর্দাব-ধারণ কোস্তে দারার কালবিলম্ব হলো না, তাই আমাদের প্রতিকূলে বিপক্ষতা কোস্তে কুমার একদল সৈন্ত পাঠিয়ে দিলেন, অজীন নদীর পথে আমাদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত করবার নিমিত্ত সে দিকেও একদল বাহিনী রওনা কোরে দেওয়া হয়। কালীম খাঁ ও রাজা যশোবন্তসিংহ এই দুই ব্যক্তিকে সেনাপতি কোরে আমাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করা হয়। কালীম খাঁ সম্রাট শাহজাহানের অতিশয় অমুগত বন্ধু, যশোবন্তসিংহ রাজবৃন্দের চড়াঙ্গি।

দারা দুতের মুখে অতুনয় কোরে আরঙ্গজেবকে এই কথা বোলে পাঠালেন, তিনি আর অগ্রসর না হয়ে পথে থেকে ফিরে যান। তখন কিন্তু রাজপুত্র অনেক পথ এগিয়ে এসে পোড়েছেন, সুতরাং ফিরে যাবার আর সময় ছিল না, বিশেষতঃ তাঁর মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ছিল, তিনি প্রাণ ঠাক্তে কদাচ বিমুখ হবেন না, আর কি এখন দুতের কথা শুনে নিবৃত্ত হোতে পারেন? কি করি, আমরা ক্রমিক অগ্রবর্তী হোতে লাগলেম, কতক পথ অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেম, নর্দদা নদীর কিঞ্চিৎ দূরে শত্রুপাক্ষরা একটা উচ্চ স্থানে যুদ্ধের ভঙ্গিতে সার-বন্দি হয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালীম খাঁ বিপক্ষের সেনাপতি, আমাদের গতি অবরোধ করেন, এই তাঁর স্পষ্ট অভিপ্রায়। আরঙ্গজেব তাই দেখে, কারপদ্যাজ লয়ে পরামর্শ কোস্তে বসলেন, আমি যে পরামর্শ দিলেম, সেই পরামর্শমতেই কার্য করা হলো। আমি বোল্লেম, আমরা নদী পার হবার ছলনা কোরে মিথ্যা মিথ্যা উদ্যোগ আড়ম্বর করি, নচেৎ রক্ষা নাই, আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে দেখলে, শত্রু-পক্ষেরা পার হয়ে এসে কেটে খান্ খান্ কোরে কেল্বে। নদীর ধারে এক্ষণে যে সকল লঙ্কর উপস্থিত, তারা পথক্রান্ত হয়ে নিজীবপ্রায় হয়ে পোড়েছে, পশ্চাতে যে সকল সৈন্ত আগমন কোচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার পূর্বেই বিপক্ষেরা আমাদের উপর চড়াও হোতে পারে, তাই নদী পার হবার জন্ত লোক-দেখানো মহা উদ্যোগ কোস্তে লাগলেম, কিন্তু সে সকলি মিথ্যা, তখন গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রেরও অতিশয় প্রভাব, হেঁটে পার হবার উপযুক্ত সময়। আমাদের এই উদ্যোগ দেখে বিপক্ষেরা আর অগ্রসর না হয়ে পথাবরোধ করবার জন্ত আয়োজন কোস্তে লাগলো। ইত্যবসরে বাকী লঙ্কর এসে পৌছিল, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে ভরসা হলো, তিনি এক্ষণে জবরদস্তি কোরে নদী পার হবার জন্ত যত্নবান্ হোলেন। তোপগুলি

দাপ্‌বার মুখে সাজিয়ে রাখা হলো, সেই সকল তোপমুখনিঃসৃত ধূমরাশির আবরণে আবৃত হ'য়ে লক্ষ্যবিন্দুর অগ্রসর হোতে হুকুম দিলেন । শত্রুপক্ষের তোপও ঘোর ভৈরব রব কোরে পাণ্টাপাণ্টি উত্তর দিতে লাগল, দুই দিকে সমান দুর্দান্ত-তোড়ে যুদ্ধ চোলতে লাগল । মুরাদবাকি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে লোয়ে সকলের অগ্রে পরপারে উত্তীর্ণ হোলেন, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাতেই বাকী লক্ষ্যবিন্দুর দল অতঃপর কোলে । কাশীম খাঁ রাজা যশোবন্ত সিংহকে সাংঘাতিক বিপদে পতিত কোরে পালিয়ে প্রস্থান কোলেন, রাজার একান্ত ভক্ত রাজপুত্রেরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ কোলে না, সেই সকল বীর্যমত্ত অতঃপর বীরগণেরা তাঁর পায়ের নীচে পোড়ে ছটফট কোতে কোতে প্রাণত্যাগ কোতে লাগল । রাজা এই মর্যাদাত্মক হৃদয়ঘাতী বিপদশ্রোত স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন । আমরা জয়ী হোলেম, রাজা যশোবন্তসিংহ পাঁচ শত রাজপুত্র লোয়ে আপনার রাজ্যে অথবা অন্তত পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন, রাজা আর যেখানেই যান, তিনি কিন্তু আগরায় আর ফিরে যাননি । অজীনে আরজ জেবের জয়ের বার্তা শ্রবণ কোরে দারা কালাগ্নিবৎ ক্রোধে প্রলয়াবতার হোলেন । কাশীম খাঁকে আর আমীর জেম্মার পরিবারকে প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা কোরে রাজপুত্র বোলেন, আমীর জেম্মা আরজজেবকে সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আহুকূল্য কোরেছে বলেই এই মহা অনর্থপাত উপস্থিত হয়েছে । দারার নিভাস্ত ইচ্ছা ছিল, আমীর জেম্মার পুত্রের প্রাণদণ্ড কোরে, তাঁর স্ত্রী পরিবারকে বাদী কোরে বাজারে বিক্রয় করেন, সম্রাট কিন্তু গুটিকতক কথা বলাতে দারা ততদূর নিষ্ঠুর হোতে পারেন না । সম্রাট বলেন, “আমীর জেম্মার পুত্র পরিবার যখন দারার হস্তগত হয়ে রয়েছে, তখন যে আমীর আরজজেবের সঙ্গে যোগাযোগ কোরবেন, এ কথা অতি অসম্ভব ।” বাদশাহ আর একথাও বলেন, “বরং আমীর বুদ্ধিদোষে আরজজেবের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন ।”

সংগ্রামের পর নরনারী দুই বোনে ঐ সকল কথা শুনে পেলেন, আমরা নদীতীরে কিছুকাল বিশ্রাম করবার অভিপ্রায় কোলেম, মুরাদ কিন্তু অধীর হয়ে আরজজেবকে বারবার বিরক্ত কোরে বোলতে লাগলেন, “আর বিলম্ব না কোরে অগ্রসর হবার পরামর্শ স্থির করুন ।” তাঁর কথা কিন্তু রক্ষা হোলোনা, আরজজেবের পরামর্শমত আস্তে আস্তে যাওয়াই স্থির হলো । আমরা একগুণে রয়ে-বোসে ধীরে ধীরে, অতি সতর্ক হয়ে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হোতে লাগলেম, পথের মধ্যে যখন যেরূপ সম্ভাব্য পেতে লাগলেম, আমাদের অগ্রগমনের ব্যবস্থা তদনুরূপ হোতে লাগিল ।

## বিংশ পরিচ্ছেদ ।

“সাঁতার না জানলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে ।”

শেষ কালে যে একটি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হবে, নরনারী-দুইয়ের যুদ্ধটি তারি পূর্বসূত্র হয়ে রইল । দারা দুর্দান্ত ক্রোধে অধীর হয়ে, সম্রাটের পরামর্শ না শুনে, আপনি সেনাপতি হয়ে চম্বল নদীর তীরে কুচ কোরে চোলে গেলেন । চম্বল নদী আগরার থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে, সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমাদের নদী অবতরণের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার উচিত আয়োজন কোতে লাগলেন । এরূপ সতর্ক হয়ে আটঘাট অবরুদ্ধ কোলে সে নদী পার হওয়া যে দুষ্কর হবে, আরজজেব সে বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলেন না, তাই আরম্ভপূর্বোবর্তী না হয়ে, দারার বাহিনী দেখতে পায়, ঠিক এত অন্তরে অবস্থিতি কোতে লাগলেন, এই অবসরে নানা কৌশল কোরে একটি রাজার সঙ্গে মহা আত্মীয়তা কোলেন । রাজবর নানা অতঃপর বাধ্য হয়ে তাঁর অধিকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কুচ করবার অনুমতি



প্রদান কোলেন। নদীর যে স্থান তরুণীয় অথচ অরক্ষিত, আমরা তাঁর রাজ্য দিবে সেই স্থানে পৌছিব স্থির কোলেন। দারাকে বন্ধনা করবার নিমিত্ত তাঁবুগুলি খাড়া কোরে রেখে আমরা চলে গেলেম। তিনি আমাদের প্রস্থান করবার সংবাদ অবগত হবার পূর্বেই আমরা তাঁর নিকটে এসে পড়লেম। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি দেখে দারা আপনার গড় পরিত্যাগ কোরে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। আমরা যমুনার ধারে পৌছে, গড়বন্দির মধ্যে অবস্থিতি কোরে শত্রু-আগমনের প্রতীক্ষা কোন্তে লাগলেম। একদিকে আমরা, অপর দিকে আগরা, ইহার মধ্যস্থলে দারা ছাউনি কোলেন, এই অবস্থায় চারি দিবস পর্যন্ত অবস্থিতি করি, এ অবকাশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। ইষ্ঠাৎ একটা কথা উঠলো যে, নজফালী খাঁ দারার একজন সেনাপতি হয়েছেন, আমি কিন্তু সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেম, আমার মুখে নজফালীর অপমৃত্যুর কথা শুনে আরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হলেন। রাজকুমার কর্মচারীদের ডেকে বলেন, আগামী যুদ্ধে দারা প্রসিদ্ধ খাতাপন্ন হবেন, তাদের পুরস্কার কোরবেন, তদ্বিধি কুমার চিরাহুগ্রহের আশী-ভরসা তাদের চক্ষের উপর ধোরে দিতে লাগলেন। সকলে প্রতিজ্ঞা কোরে নোল্লেম, “তাঁর জন্ত আমাদের প্রাণ পর্যন্ত পণ, জীবন দেব, তথাচ বিমুখ হব না।” রাজপুত্র আমাদের বিদায় কোরে দিয়ে যুদ্ধের আরোজনে প্রবৃত্ত হোলেন। তোপগুলি লোহার শৃঙ্খলে পরস্পর যুক্ত কোরে শ্রেণীমত সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হলো, শত্রুপক্ষের অঝারোহীরা আমাদের দলের মধ্যে প্রবেশ কোন্তে পারবে না বোলেই এই কৌশল করা হলো, বড় বড় তোপের পশ্চাতে উটের পীঠে ছোট ছোট তোপ স্থাপিত করা হলো, তার পশ্চাতে বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে, অঝারোহীরা সজীন, তলোয়ার ও তাঁর-ধনুক লয়ে ডাইনে বায়ে ইতস্ততঃ হয়ে অথচ ব্যবস্থামত ছোড়িয়ে রইল। আমাদের বৃহৎ-রচনার মতন দারারও বাহিনীবিন্যাস হলো। অবিশ্রান্ত ঘন-গর্জনের

স্তার তোপের নিরন্তর ষোরগভীর নির্ঘোষে, অবিশ্রান্ত বন্দুকার স্তার তীরের অনবরত সন্সন্স শব্দে ধরা কম্পিতা কোরে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ঘন ঘন তোপধ্বনির গভীর শব্দে কর্ণবধির হোতে লাগল, অনবরত ধমুটকারের কড়কড় রবে দিক স্তব্ধ হোতে লাগল, তোপ-মুখনিঃসৃত রাশ রাশ ধূমপুঞ্জ গগন অন্ধকারময় হলো, ঐ সকল ধূমরাশি অপসৃত হয়ে যখন চারিদিক পরিষ্কার হয়ে পোড়ল, সেই সময় দূর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখলেম, দারা একটা বিরাটাকার বৃহৎ হস্তীর উপর সোয়ার হয়ে হুকুম সাদের কোচ্ছেন, একদল অঝারোহী সঙ্গে লয়ে তাদের আগে আগে অকুতোভয়ে আমাদের তোপের মুখে অগ্রসর হোচ্ছেন, আমরাও অসঙ্কচিত-মনে তাঁর সম্মুখবর্তী হোতে লাগলেম, তিনিও সেইরূপ নির্ভয়ে আমাদের তোপাগ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্তে লাগলেন, শত শত প্রাণী তাঁর পায়ের তলে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল, তাঁর অত্মগামী যে সকল সোয়ার ছিন্নভিন্ন হয়ে পোড়েছিল, তারা পুনরায় আপনার আপনার পদ ও স্থান গ্রহণ কোলো। তোপের ভীষণ আক্রমণ পুনশ্চ আরম্ভ হলো, এই দ্বিতীয় বারেও আমাদের তোপাগ্নির মুখে মৃত্যুশ্রোত, সংহারশ্রোত ঘোর বেগে প্রবাহিত হোতে লাগলো, আমাদের তুরক-সোয়ারেরা মোরিয়া হয়ে, নিবিড় সমর-তরঙ্গের মধ্যে সরোষে প্রবেশ কোরে, ঘোর মহামারি আরম্ভ কোরে দিলে। বিপক্ষের গোলন্দাজ-নিগের মস্তক ছিন্ন কোরে ভূমিসাৎ কোন্তে লাগল, তারা যেন অকালে যুগপ্রলয় উপস্থিত কোরে দিলে। উভয় পক্ষের তুরক-সোয়ারে তুরক-সোয়ারে কাটাকাটি আরম্ভ কোলো, তখন আর আমার অস্ত্র কাজ ছিল না, কেবল কাটতে কাটতে, হুটুংরো কোন্তে কোন্তে চোলেছি, আমার হস্ত দুখানি পরিশ্রম কোরে কোরে যেন ছিঁড়ে পোড়তে লাগলো, আমরা কে কেমন বীর্য প্রকাশ কোছি, আরঙ্গজেব তা নিরীক্ষণ কোরে দেখছিলেন, তাঁর সঙ্গে একবার চোকোচোকি হওয়ার রাজকুমার

একটু মুচকে হাসলেন, হাসবার কিন্তু বিশেষ কারণ কিছুই ছিল না। দারাও বেছে বেছে, চোনা চোনা কতকগুলি তুরুক-সোয়ার লয়ে আমাদের উপর চড়াও হোলেন, আমাদের পক্ষে বিস্তর লঙ্কর কেটে টুকরো টুকরো কোন্ডে লাগলেন, আমাদের দল বল সংহার কোরে নিঃশেষপ্রায় কোরে ক্ষেলেন, এমন কি, আরজজেবের পক্ষে আমরা, হাজার লোকের অধিক অবশিষ্ট ছিলেম না। দুইবার আমি ঢাল দিয়ে ঢেকে রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করি। আমি আমাদের লঙ্করগণকে ডেকে বোল্লেম, আমরা কদাচ পশ্চাৎ হটব না, তার অপেক্ষা বরং এই স্থানেই প্রাণ বিসর্জ্জন দেব, তখাচ বিমুখ হব না।

ঐ কথা শুনে আরজজেব অমনি বোলে উঠলেন, “কি! হটে যাব! আলার দিবা, তা কখনই হবে না! তোমরা যদি ছেড়ে যাও, যাবে, আমার হাতির পায় জিজির বেঁধে দাও, আমি এই স্থানেই থাকব, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করব।” ঐ সাহস বাক্য শুনে আফ্রান্দে হোররা দিয়ে চীৎকার কোন্ডে লাগলেন, বোল্লেম, “আমরা শেষ পর্যন্ত তোমার পাশে থাকব, কদাচ পরিত্যাগ কোরে যাব না।” রণভূমির অসমতা হেতু দারার পক্ষের তুরুক-সোয়ার বিস্তর থেকেও আমাদের অল্পমাত্র অথচ তেজোমান্ত লঙ্কর-দলের উপর চড়াও কোন্ডে পালেনা, ইত্যবসরে দারা বীরমদে মত্ত হয়ে, ব্যাঘ্রের জায় আফ্রালন কোরে, আমাদের বাম পার্শ্বের বাহিনী-দল ছিন্ন-ভিন্ন কোরে ফেলতে লাগলেন, তারা কে কোথায় ছড়িভঙ্গ হয়ে পোড়তে লাগল, তার ঠিকানা ছিল না। দারা দুজন প্রধান রণকুশল সেনানায়ককে অহস্তে নিপাত করেন, তখাচ আজ দারার অন্তিম দিন, অন্তিমার যুদ্ধে জয়লাভ নিঃসন্দেহ তাঁর হতো সত্য, কিন্তু নির্বিবাদে সময় তাঁর সাহসার দান্তিক আচরণের বিষময় ফল আজ তাঁকে অনুভব কোন্ডে হলো, সেই মহা পাপের ভোগ আজ তাঁকে ভোগ কোন্ডে হলো, বিনাপরাধে গুণবান লোকের অনাদর

অগৌরব করা যে মহা পাপ, সেটি আজ তাঁকে শিক্ষা কোন্ডে হলো। দারার এক জন প্রধান সেনানায়ক ত্রিশ হাজার মোগল-বাহিনী লোয়ে তাঁর লঙ্কর-বাহের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা কোচ্ছিলেন, সেই ত্রিশ হাজার রণাসক্ত, সমরকুশল, মোগল সেনারা আমাদের সমুদায় দলবলকে উচ্ছিন্ন দিয়ে সমূলে নিপাত কোন্ডে পাত্তো, কিন্তু ঐ সেনাপতি সমরক্ষেত্রের দূরে অবস্থান কোচ্ছিলেন, তিনি যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত হন নাই, তার কারণ আর কিছুই নয়, কয়েক বৎসর গত হলো, দারা তাঁকে সাহসার পূর্বক অপমান করেন, সেই অপমান অত্যাধি বিশ্বত হন নাই, তাঁর অন্তরে এ পর্যন্ত জাগরক ছিল। দারা দেখলেন, সেই সমরনিপুণ সেনানায়ক এক্ষণে সহায়তা না কোলেও তাঁর জয়ী হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হয়েছে, তখাচ তিনি ঘোড়ার উপর সোয়ার হয়ে সেনাপতির কাছে গিয়ে অনেক অনুর কোন্ডে লাগলেন, সেনাপতি তখনও হাতীর উপর নিরুধেগে বোসে আছেন। এক্ষণে হাতী থেকে নেমে ঘোড়ার উপর সোওয়ার হবার জন্ত দারা তাঁকে অনেক যত্ন কোন্ডে লাগলেন; বল্লেন, আমরা যুদ্ধে হেরে ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে দৌড়িয়ে পলাচ্ছি, এক্ষণে কেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া কোরে লয়ে যাও। ভিন্ন বাকি কিছুই নাই। ইত্যবসরে দারার লঙ্করেরা দেখলে, রাজপুত্র হাতীর উপর নাই, তাঁকে না দেখতে পেয়ে তখনি স্থির কোলে, দারা মারা পোড়েছেন, তাই তারা হঠাৎ উল্লাসে অভিভূত হয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত ছুটে পলাতে লাগল, অলক্ষণের মধ্যেই দারার সমুদয় বাহিনী যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রাকার হয়ে পোড়ল, অবশেষে জয়ী পুরুষ পরাভূত হোলেন। দারা প্রাণভয়ে ও মনঃকোভে অবসর হয়ে পালিয়ে দিল্লীতে প্রস্থান কোলেন। সময়াসক্ত ভ্রাতাদের গতিপ্রবর্তি-গুলি যথাক্রমে বিবৃত করা আমার অভিপ্রায়। সুজার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন, অধঃপাতে গেছেন বোল্লেই হয়,

দারাও তথৈবচ, তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে সম্যক-  
রূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে পোড়লেন, তথাচ  
তার মনে মনে আশা ছিল, সম্রাট শাজাহান  
তার সহায়তা কোরবেন, তাই এখনও জয়ী  
হবার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন। ভ্রাতাধ্বংস  
আরজ্ঞেব ও মুরাদবাকী আগরায় প্রবেশ  
কোরে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী কোলেন, তার  
পরেই সমুদয় ওমরাওরা একত্র হয়ে ঐ ভ্রাতা-  
ধ্বংসের অন্তকূলপক্ষ হোলেন, 'হত-গর্ভ, হত-  
সম্পদ' বৃদ্ধ নৃপবরের পক্ষ হয়ে একটি প্রাণীও  
একবার বিশ্বাস পরিত্যাগ কোলে না, মুখের  
একটা কথাও 'বোলেন না। একপরামর্শী  
উভয় ভ্রাতা দারার অন্তসরণে বাহির হোলেন,  
দারা তখন পালিয়ে, দিল্লীতে অবস্থিতি  
কচ্ছিলেন। আমাদের 'প্রথম দিবসের কুচের  
পর মীর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আরজ-  
্ঞেবের যে কথোপকথন হয়, আমি তা উপ-  
কর্ণন করি : মীর খাঁ সম্ভ্রতি রাজকুমারের  
অতি বিশ্বস্তপাত্র হয়েছেন। এই কথোপ-  
কথনের ভাবার্থ অবগত হয়ে জাসে আমার  
সর্বোচ্চ কীপতে লাগলো, তাঁরা মুরাদবাকীর  
প্রতিকূলে সাংঘাতিক কালচক্রের কৌশল  
কোচ্ছিলেন, আমি মনে মনে বোলেম, হায় !  
চলনারূপ ছদ্মবেশের মুখস দূরে টেনে ফেলে  
'দেওয়া হবে, রাজপুত্র আরজ্ঞেব তারি অব-  
সর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক্ষণে আমরা মথু-  
রায় আছি, আগরা থেকে ছোট ছোট চাবু-  
মঞ্জিল দূরে মাত্র। যদি সাধ্য হয়, দুর্ভাগ্য মুরা-  
দের প্রাণরক্ষা করবো, এইটি মনে মনে স্থির  
কোলেম, সেই অভিপ্রায়ে নিশীথরাত্রে মুরাদের  
পরম মিত্র, তাঁর সংপরামর্শদাতা, খোজা শাহা  
আবিয়াসের অহুসন্ধান কোরে সাক্ষাৎ  
কোলেম। আরজ্ঞেব ও মীর খাঁর মধ্যে যে  
দ্রুত দ্রুত কৌশলের কথোপকথন হয়,  
সেই দ্রুত বৃত্তান্তটি তাঁকে অবগত করালেম,  
খোজা ধন্তবাদের উপর ধন্তবাদ কোরে  
আমার উপর ধন্তবাদের একটি বোকা  
চাপিয়ে দিলেন, তিনি আমার তাঁর প্রভুর  
প্রাণদাতা বোলে সন্ধান কোন্তে লাগ-  
লেন, তার পর রাজকুমার মুরাদের সম্মুখে

আমায় লোয়ে গেলেন। মুরাদবাকীর ভাব-  
ভঞ্জিতে বোধ হলো, তিনি যে মনে কোলেন,  
আমি তাঁর ভ্রাতার কথোপকথনের মধ্যে  
প্রবেশ কোন্তে পারি নাই, তার মর্থ বুঝতে  
পারি নাই, রাজপুত্র আমাদের কথা মনো  
যোগ দিয়ে শুনলেন না, তাঁর মনে বিশ্বাস  
হলো না, খোজা মুরাদের পায়ের তলে পোড়ে  
বিস্তার অহুসন-বিনয় কোরে বোলতে লাগলেন,  
আগরায় ফিরে চলুন, সেখানে আরজ্ঞেব  
পর্যন্ত আপনাকে সম্রাট বোলে স্বীকার  
কোরেছেন, সে স্থানে গেলে আপনি নির্ভয়ে  
থাকবেন। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ  
কখনই হয় না, রাজপুত্র আমাদের কথা  
গ্রাহ্যই কোলেন না, আমরা যত কাতর হয়ে,  
যত কেঁদে কোকিয়ে নিবেদ কোন্তে লাগলেম,  
রাজকুমার ততই জেদ কোরে অবাধ্য হোতে  
লাগলেন, শেষে স্পষ্টই বোলেন, তাঁর রাজভ্রাতা  
আরজ্ঞেবের সঙ্গে একত্র হয়ে দারার অহু-  
সরণে নিতান্তই গমন কোরবেন, কারুর কথাই  
শুনবেন না। দুঃখিতরূপে খোজা নিরুপায়  
দেখে, শেষে কুমারকে এই কথা বুঝিয়ে  
বোলেন, তিনি যেন আগামী কলা তাঁর ভ্রাতার  
সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্তে না যান। আরজ্ঞেব যে  
মুরাদবাকীকে মোহিনীমন্ত্র পড়িয়ে বশীকরণ  
কোরেছিলেন, সে কুহকমন্ত্রের এত প্রভাব, কি  
সুযুক্তি, কি হিতবাক্য, কি কাতর অহুসন,  
কিছুই তার কাছে খাই পেলো না, আরজ্ঞে-  
বের কুহকভালে পড়ে বুদ্ধিভ্রমের লোপা-  
পত্তি হয়ে কুমার যেন ভেড়া বোনে গেছি-  
লেন, আরজ্ঞেব মোখিক সুবস্তুতি কোরে,  
তাঁকে এত বাধ্য, এত বশ কোরেছিলেন যে,  
অগত্যা আবিয়াসকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে  
হয়েছিল। রাজকুমার মুরাদ এই উক্তি  
কোলেন, "যেমন নিত্যপ্রথা আছে, আজও  
সেইরূপ ভ্রাতার সঙ্গে সাংকালে একত্রে  
আহারাদি কোরবেন", ঐ কথা শুনে আমি  
সেখান থেকে উঠে চোলে এলেম, কুমার যাতে  
সেখানে আহার কোন্তে না যান, তার জগে  
আবিয়াস তারি ষড় পেতে লাগলেন। যে  
সকল কর্মচারীরা এই শেষ যুদ্ধে প্রাণ নিয়ে

বৈচে এসেছিলেন, অস্ত্রকার সাহায্যিক আহা-  
রের সময় তাঁদের সকলকেই আহ্বান করা  
হলো। আরঙ্গজেব আমার বিস্তর আদর-  
গৌরব কোন্ডে লাগলেন, আমার বীরত্বের  
গুণে তাঁর হবার প্রাণরক্ষা হয়, অতঃকেউ নয়,  
তিনি স্বয়ং তার সাক্ষীর স্থল। ধৃত আরঙ্গ-  
জেব অতঃ অতঃ দিন অপেক্ষা আজ অতিরিক্ত  
সম্মান, অতিরিক্ত বিনয় ও নম্রতা দেখিয়ে  
মুরাদবাকীর সমাদর কোলেন। তিনি যখন  
উঠে দাঁড়িয়ে মুরাদবাকীকে কোল দিয়ে  
তখন বোধ হলো, তাঁর নেত্রকোণ দিয়ে  
অশ্রু গোড়িয়ে পড়তে লাগলো। আহ্বারের  
সময় নানাপ্রকার হাঙ্গ-কোতুক চলতে  
লাগলো, প্রফুল্লচিত্ত যতদূর হোতে হয়, তা  
হোলেন। আহ্বারান্তে কাবুল ও সিরাজগাঁও  
উত্তম উত্তম উপাদেয় সরাব এসে উপস্থিত  
হলো, আরঙ্গজেব তখন গাত্রোথান কোরে  
বোলেন, “শ্রীমান্ সন্ন্যাসী আমার গুরুতর মনো-  
বন্দ্য অবগতই আছেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের  
জায় আমি নানাবিষয়ে সংশয় জ্ঞান কোরে  
থাকি, সেই সংশয়ের নিমিত্ত আমি মন্তপানে  
আমোদী হই না, এক্ষণে আমার এখানে না  
থাকাই সম্প্রদায়, তথাচ শ্রীমান্ সন্ন্যাসীকে  
একলা না থাকতে হয়, তাই ভাল ভাল লোক  
তাঁর কাছে রেখে দিয়ে আমি অন্তঃপুরে  
চোল্লেম, উপস্থিত মীর খাঁ প্রভৃতি অতঃ অতঃ  
বাক্সবেরা পার্শ্ববর্তী হয়ে আপনার চিত্ত-  
বিনোদন করবেন।”

মুরাদের বেআড়া পানদোষ ছিল, তাই  
এক্ষণে পরম উপাদেয় সিবাক-সরাব পেয়ে,  
যত পাল্লেন পেটে পুল্লেন, আকণ্ঠোদর পান  
কোরে জ্ঞানের মাধা খেয়ে বসলেন, তখন  
নেশায় ঢুলু ঢুলু হয়ে ভাই-ব্রাদারদের গাল্ মন্দ  
দিয়ে মুখবাণী কোন্ডে শুরু কোরে দিলেন,  
তাঁর তখন হাতও ছুটতে লাগল, বাকে  
সম্মুখে পান, তাকেই ঘেরে বোসতে লাগ-  
লেন, তার বাচ-বিচার ছিল না। খানিকক্ষণ  
দাপাদাপি মাতামাতি কোরে, শেষে তাঁর  
হাত পা অবশ হয়ে সর্বশরীর এলিয়ে দিলে,  
রাজকুমার অজ্ঞান অচেতন হয়ে পোড়লেন,

তাই দেখে আমি সেখান থেকে উঠে চোলে  
এলেম, তার পূর্বে কুমারকে ক্রান্ত কারবার  
নিমিত্ত বিস্তর যত্ন, বিস্তর কৌশল কোরে-  
ছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই বাগ্মনান্তে  
পাল্লেন না, তাই দেখে মনে মনে স্থির  
কোল্লেম, আজ মুরাদের চরম দিন উপস্থিত,  
শুদ্ধ তাঁকে ছারোথারে দেবার নিমিত্ত, শুদ্ধ  
তাঁকে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত, আজ এই  
কালকান্দ পেতে বসা হয়েছিল। হা দুর্ভাগ্য  
ব! কেন তুমি তোমার মিত্রবর খোজার  
তত্ত্বগত জ্ঞানশ্রদ বাধ্যগুলির প্রতি বধির  
হলে? আমি অধিকক্ষণ সেখান থেকে চোলে  
আসি নাই, এর মধ্যেই ভোজনোৎসব তাঁবুর  
মধ্যে মহাগোলমাল বেধে উঠেছে। শুদ্ধ  
পেলেম, শুনে তখন সেই দিকে ছুটলেম,  
এসে দেখি না, আরঙ্গজেব মহা উগ্রমূর্তি  
হয়ে গভীর গর্জন কোরে বোলছেন, “কি  
লজ্জা! কি কলঙ্ক? তুমি না রাজ্যেশ্বর?  
তোমার এই কীর্তি? এত অনবধান? এত  
অসাবধান? এত অপরিণামদর্শী? ব্রহ্মা-  
ণ্ডের লোক তোমাকেই বা কি বোলবে,  
আমাকেই বা কি বোলবে? ঐ হতভাগ্য নরা-  
ধম মাতোয়ালকে হাতে পায়ে বেধে একটা  
নির্জ্জন অন্ধকূপে টেনে নিয়ে ফেলে রেখে  
দাও, সেইখানে সে ঘুমিয়েই লজ্জার অবসান  
করুক।”

আরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে এই হুকুম বের-  
তেই তৎক্ষণাৎ সেটি তামিহ করা হলো।  
দেখলেম, দুর্ভাগ্য মুরাদের হাতে হাতকাড়ি,  
পায়ে বেড়ি দিয়ে আগে তাঁকে বন্দী কোলে,  
তিনি হাত-পা ছুটিয়ে হটোপাটি কোন্ডে  
লাগলেন, বারংবার চীৎকার কোরে বাড়ী  
কাঁপাতে লাগলেন। কুমার কিন্তু যতই চীৎ-  
কার করুন, হাত পা ছুটিয়ে যতই হটোপাটি  
করুন, তাঁর সে চীৎকার শোনেই বা কে?  
যদিও ছাড়াবার নিমিত্ত মুরাদ বিস্তর হটো-  
হটি, বিস্তর দাপাদাপি কোল্লেন, তথাচ তাঁকে  
বেঁধে কেলে, চেপে ঠেসে বেঁধে কেলে, তাঁর  
তত বল ও সামর্থ্য থাক্তেও, তত হাতবাগড়া-  
বাগড়ি সত্ত্বেও মুরাদকে বাঁধা পোড়তে

হলো! বেধে ফেলে, তার জন্তে যে অক্ষুপ  
নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেই অক্ষুপারাগারের  
মধ্যে ফেলে রেখে দিলে। মুরাদের অমুগত  
পক্ষেরা ঐ সকল গ্রানির কথা শ্রবণ কোরে  
কুমার যে ঘরে কয়েদাবস্থার ছিলেন, সেই ঘরে  
তারা জোর কোরে প্রবেশ কোন্ডে যাচ্ছিলো,  
মুরাদের এক জন প্রধান কারপরদাজ তাদের  
নিষেধ কোরে ক্ষান্ত কোলেন, 'আরজজেব  
মুলা দ্বারা ক্রয় কোরে তাঁকে আপনার পক্ষে  
এনেছিলেন। এ দিকে গুপ্তচরের প্রতি  
ইঙ্গিত হলো, তারা ছাউনিতে ছাউনিতে  
গিয়ে, উঠতে কোসুতে মুরাদের দুর্নাম কোরে  
কিতে লাগল, মুখে কিরে দিবি কোরে  
বোলতে লাগলো, তারা তৎকালীন সেখানে  
উপস্থিত ছিল, মুরাদ যে মাতোয়ালা হয়ে  
আরজজেবকে অকথা কথা বোলে গালাগালি  
দিরেছেন, তারা তা স্বকর্ণে শুনেছে, স্বচক্ষে  
দেখেছে, এক্ষণে আটক কোরে রাখা নিতান্ত  
আবশ্যক বোলেই তাঁকে বন্দী করা হয়েছে,  
একটু পরেই আবার খালাস কোরে দেওয়া  
হবে। পক্ষান্তরে, মুরাদের প্রধান প্রধান কার-  
পরদাজদিগকে বিস্তর অর্থ ঘুসু দিয়ে তদন্তেই  
তাদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দেওয়া হলো।  
এই সকল ফেরেব-ফেতরাজির ফাঁদ পেতে  
সকলের মুখ বন্ধ কোরে দিলেন। পরদিন  
প্রাতে একটিও অসন্তোষের মুর্ত্তি লক্ষিত  
হলো না, তাই দেখে আরজজেবের মনে বলও  
হলো, শাহসও হলো, তাঁর দুর্ভাগ্য ভ্রাতাকে  
কড়াকড় বন্দী কোরে দিল্লীতে পাঠিয়ে  
দিলেন। সেখানে 'সিদ্ধার' নামক কেল্লার  
কয়েদ কোরে রেখে দেওয়া হলো, কেল্লাটি  
একটি নদীগর্ভের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

আরজজেব এক্ষণে তাঁর অভিলাষের চরম  
চূড়ায় আরোহণ কোরেছেন, ছল, চাতুরী,  
প্রবঞ্চনার প্রভাবে সকল ভ্রাতাকেই নির্জিত  
কোরে ফেলেছেন, দারার অমুসরণের জন্ত  
তাঁর পশ্চাদগমন করা আবশ্যক বিবেচনা  
কোলেন না। আরজজেব শুনেছিলেন, বতি-  
ভ্রাতা দারা সিধনীর অন্তর্গত টালা-নামক  
দুর্গে আশ্রয় লয়েছেন, দুর্গটি সিধু নদের

উপর অবস্থিত। আরজজেব কিন্তু তথ্য  
এককালীন কি নিরুৎকণ্ত হোতে  
পালেন না, কিছু দিন পরে শুভে পেলেন,  
দারা গুজরাটের 'মুজাফা' অধিকার  
কোরেছেন, দে বড় তাচ্ছিল্য করবার বিষয়  
নয়, আরজজেবও সে অন্ত্রখটি মনে মনে  
অমুভব গোয়ে পেরেছিলেন। কুমার  
দারার প্রতিকূলে যাত্রা কোন্ডে প্রস্তুত  
ছিলেন, কিন্তু আগরা পরিত্যাগ কোরে তত  
দূরে গমন কোলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা, সেই  
বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হোলেন। তদ্বিষয় শুল-  
তান সুজা একদল বলবৎ বাহিনী লোয়ে  
নক্ষত্রবেগে চোলে আসছিলেন, ঐ সংবাদ শ্রবণ  
কোরে কুমার অতিশয় উদ্ভয় হোলেন।  
আরজজেবের পদগৌরব এখন পর্য্যন্তও  
সংশয়ের স্থল। সময়োচিত বিচার-বিবেচনার  
পর সুজার প্রতিকূলে রণযাত্রা কোরবেন স্থির  
কোলেন, সুজা তখন গঙ্গাপার হয়ে আলা-  
হাবাদে এসে পৌঁছিলেন।

এদিককার বিষয়-ব্যাপার এতদূর পর্য্যন্ত  
হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক্ষণে জেম্‌লার ছলপরামর্শের  
নিতান্ত প্রয়োজন, তিনি দৌলতাবাদের কারা-  
বাস থেকে মুক্তি পেয়ে আসা সঙ্গে এক-  
ত্রিত হোলেন, দারা পলাতক হোলে তাঁর দ্বী  
পরিবার অব্যাহতি পেলেন, সুতরাং আরজ-  
জেবের মানস পূর্ণ হবার জন্ত তাঁকে আর বন্দী  
অবস্থায় থাকবার প্রয়োজন হোচ্ছে না। শুলতান  
সুজার সঙ্গে দ্বিতীয়বার ধোরতর যুদ্ধ শুরু  
হলো, আমাদের পক্ষের আগ্রোহীরা সুন্দর-  
রূপ বীরত্ব দেখিয়েছিল। অনেক বীরপুরুষ  
ধূলায় পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো,  
অনেকে আবার কয়েদও হলো, তাদের সঙ্গে  
আমিও বন্দী হোলেম, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে  
সঙ্গীদ অবশ্য না হোলে আর আমি সহজে  
ধরা দিইনি। যে ভ্রম-প্রমাদের দোষে দারা  
রাজকিরীট হারালেন, আরজজেবকে অবি-  
কল সেইরূপ ভ্রম-প্রমাদ থেকে আগে রক্ষা  
করে, শেষে আমি কয়েদ হোলেম,—রাজপুত্র  
যে হাতীর উপর-সোয়ার হয়ে বসেছিলেন,  
একটি তীর এসে তার মাহতের প্রাণ

সংহার কোলে, হস্তাটি ক্লিপ্তপ্রায় হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো, যে তখন বশতাপন্ন হোচ্ছিল না, আরঙ্গজেব তাই দেখে নেমে পড়বার উদযোগ কোলেন, এই সময় আমি চীৎকার কোরে বোলেন, “আপনি বোসে থাকুন, কদাচ নামবেন না, দারার কথা স্মরণ করুন, তিনি হাতী থেকে নামাতেই সে দিনটি জলাঞ্জলি দিলেন।” আমি যখন তাঁকে ঐ কথা বলি, তখন আমার অজ্ঞ দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই সময় আমার উরুতে একটা তীর বিদ্ধ হলো, তার পরক্ষণে আর একটি তীর স্বরূপ ভেদ কোলেন, আমি টাল সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে পোড়ে গেলেম, তখন কতকগুলি শত্রুপক্ষ পোড়ে আমার ঘেরে কেলেন, তারা আমার ধোরে নিয়ে তাদের তাঁবুর মধ্যে লোয়ে গেল।

আরঙ্গজেবকে সতর্ক কোরে দিয়ে যেরূপ প্রমাদ থেকে বাঁচিয়ে দিছিলাম, সুলতান সুজা অবিকল সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হোলেন, কুমার যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে বাধ্য হোলেন। তাঁর সৈন্তেরা তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠে দেখতে না পেয়ে স্থির কোলেন, তবে সুলতান মারা পোড়েছেন, তাই তারা ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছাড়িয়ে পোড়ল, এক্ষণে অশুশ্রু পূর্বক যার যে স্থানে অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। একটি কণ্ঠস্বর, সে স্বর আমি ভালরূপ পরিজ্ঞাত ছিলাম, টেচিয়ে বোলেন, “সাদক! আর সময় নাই, আমরা পালিয়ে প্রস্থান কোলেন, তুমি তোমার সৌভাগ্যবান রাজপুত্রের নিকট অবিলম্বে চোলে যাও, আমি আমার পরাভূত সুলতান সুজার পশ্চাদ্বর্তী হোলেম।”

দেলজানের ভ্রাতা ইউসোফ, তাঁরি ঐ কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে, বিশেষতঃ তিনি যে তত হৃদয়বান হয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা কোলেন, তাই মনে কোরে আমার অন্তঃকরণ তাঁর জন্তে অতিশয় কাতর হলো, তখন আর কিছু স্মরণ না হয়ে, অকস্মাৎ দেলজানের নাম উচ্চারণ কোরে কেবল অশ্রুপাতচ্ছলে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর কোলেন।

ইউসোফ বোলেন, “কি আক্ষেপ! সে কোথা? দেলজান এক্ষণে কোথা? আমি কতই অসুসজ্জন কোরেছি, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাইনি।”

আমি বোলেন, “ইউসোফ! দেলজানের পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে।” ইউসোফ এই দুর্দান্ত নিষ্ঠুর সংবাদে কালপ্রহার থেকে কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হয়ে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরবেন মনে কোরেছেন, এমন সময় কতকগুলি সৈন্ত তাঁকে ডেকে নিয়ে বোলেন, এই বেলা প্রস্থান কর, নচেৎ আরঙ্গজেব হুকুম দিয়েছেন, সুজার অহুগামীদের মধ্যে যারা পশ্চাতে পোড়ে আছে, তারা যেন প্রাণ লোয়ে ফিরে যেতে না পারে, যাকে পাবে, তাকেই কোতল কোববে। ইউসোফ কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না কোরে, তাঁর ভগ্নীর অদৃষ্টের সবিশেষ বৃত্তান্ত শোনার জন্য র্যাকুল হোলেন, আমি তাঁর বিষাদাবহ দুঃখের কথাগুলি বোলে শেষ কোত্তে পারিনি, এমন সময় আমাদের কতকগুলি পদাতিক তাঁবুর মধ্যে হড় হড় কোরে ঢুকে পোড়ে দুর্ভাগ্য ইউসোফকে গ্রেপ্তার কোলেন, তাঁকে নিয়ে তখন বলিদান দেয় আর কি, আমি তখন আরঙ্গজেবের দোহাই দিয়ে তাদের ক্ষান্ত হোতে বোলেন, যে পর্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হয়, সে পর্যন্ত তারা যেন ক্ষান্ত থাকে, এই কথা বোলেন, তখন আমি সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পোড়ে আছি, লঙ্ঘনের তত দুরবস্থাপন্ন দেখেও আমার নিষেধটি অমান্য কোলেন না, ইউসোফ কিন্তু তাদের হাতে বন্দী হোয়ে রইলেন।

আমি রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোলেন, কুমার আমার কোল দিয়ে, আমি তাঁর বিষম বীরবন্ধ, এই নাম প্রদান কোরে, আমার গোরব বাড়ালেন; বোলেন, আমার নিকট তিনি বিস্তর স্বামী হয়ে আছেন, আমি বুকের ফটনা উপলক্ষে হৃদ-স্তাবক হয়ে আনন্দমনে মঙ্গলবাদ কোলেন, সেই সময় ইউসোফের অহুকুলে প্রার্থনা কোত্তেও সাহসী হোলেম। আমার প্রার্থনা সকল হলো, তব্দির কুমার



মুক্তিপ্রাপ্ত যুবাকে একটি অর্থ প্রদান কোত্তেও অহুমতি কোল্লেন, ঐ অর্থে আরুঢ় হয়ে ইউসোফ তাঁর পলায়নপর সরদারের অহুমগম-নই করুন, অথবা যেখানে তাঁর প্রাণ চায়, সেই খামেই যান, যা ইচ্ছা তাই করুন, আরদজেব এই হুকুম দিয়ে দিলেন ।

ইউসোফ আমার অস্বচ্ছল সাধুবাদ কোরে বোল্লেন, তিনি আগরায় যাবার মনন কোরেছেন, সেই স্থানে নিরুৎকর্ষ হয়ে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে বাস কোরবেন, যেহেতু, সূজা নিতান্তই অধঃপাতে গৈছেন, আর তিনি বীর প্রভাবে তেজস্বী হয়ে পৌরবাসনের শোভা হবেন না, তবে এক্ষণে তাঁর অহুমসরণ করা উম্মাদের কার্য্য । পক্ষান্তরে, সূজার শত্রুর দলে মিলিত হোলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, প্রাণদণ্ডে তাদৃশ মানির ভাজন ইউসোফ কখনই হবেন না । আমি তাঁর খুল্লতাতে বরকন্দাজ খাঁর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ইউসোফ বোল্লেন, নর্মদা তীরের যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃতকল্প হোতে দেখেছি, তন্নিবর্তিত তাঁর ব্যবহারে দারা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ কোরেছেন, তিনি কেন পূর্বে পরপারে এসে আরদজেবের নদীপার হওয়া অবরোধ কোল্লেন না, সেই অপরাধে দোষী কোরে দারা তাঁকে হতশ্রদ্ধা কোত্তে লাগলেন, বরকন্দাজ খাঁ আপনার সাক্ষাৎয়ের নিমিত্ত বোল্লেন, তৎকালীন কানীম খাঁ সেনাপতি, আমি মনে কোল্লেম, পরাধিকারে হস্তক্ষেপ কোত্তে আমার ক্ষমতা নাই । ঐ কথা শুনে জোখে দারার খাসাব-রোধপ্রায় হইল । ইউসোফ বোল্লেন, আমি তো এই সকল কথা শুনেছি, তবে সত্য কি মিথ্যা, তা বোল্লেতে পারি না । তাঁর প্রিয় ভগ্নীর শোকাবহ মৃত্যুর কথা শোন্বার জন্ত ইউসোফ আমার বারংবার অহুরোধ কোত্তে লাগলেন, তখন স্ত্রমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোরে গালাগালি দিতে লাগলেন, তিনি বোল্লেন, নিঃসন্দেহ সেই পানীরসীর জন্মে কালের ভাঙারে বোরদও সঞ্চিত হয়ে আছে ।

আমরা পরস্পর বিদায় হোল্লেম, শিবিরের

হাকিম আমার দেখতে এলেন, ক্ষতগুলিতে পটী প্রদান কোরে আফিং-ঘটিত ঔষধ সেবন কোত্তে অহুমতি কোল্লেন, ঐ মাদক আর সেই দিবসের অবসাদ আমার স্তমধুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত কোল্লেন । পরদিন শুন্লেম, রাজপুত্র আমীর জেমলাকে, তাঁর পুত্র সুলতান মহ-ম্মদকে, একদল বলমত্ত সৈনিকের বাহিনী-পতি করেছেন, তাঁরা ঐ সৈন্যদল লয়ে সুলতান সূজার বিরুদ্ধে রণযাত্রা কোরবেন । রাজকুমার এই স্থলে তাঁর অপরিমিত সতর্কতার, তাঁর প্রচুর ধূর্ততার পরিচয় প্রদান কোল্লেন, আমীরের বুদ্ধিপ্রভাব, তাঁর বীরবিক্রম, কুমারের অস্তঃকরণ ভয়ে পরিপূর্ণ করেছিল । তাঁর পুত্রও পিতৃশাসনে অবস্থান কোত্তে অধীরতা প্রদর্শন করেছিলেন । সুলতান মহম্মদ অহঙ্কার পূর্বক আপনার নৈশ্চরণের প্রতি, আপনার বীরপ্রতাপের প্রতি নিয়তই স্নান কোত্তেন । আরদজেব আমীর জেমলাকে যাবজ্জীবন বন্দের রাজত্ব প্রদান কোরবেন বোলে অঙ্গীকার কোল্লেন, তাঁর অবর্তমানে সুলতান মহম্মদ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমীর-উল-ওমরা অর্থাৎ ওমরাহপ্রধান হবেন, এই কথা স্বীকার কোল্লেন । দারা এক্ষণে পলায়িত হয়ে কখন তাঁর আপনার মন্ত্রীদেব অসৎ পরামর্শের উপর, কখন বিশ্বাস-অপহারক রাজারাজড়া-দিগের কথার উপর অবলম্বন কোত্তে লাগ-লেন । তিনি আহামাদাবাদে প্রবেশ কোরবার উদ্যোগ করাতে তথাকার অধিনায়ক সিংহ-বার অবরুদ্ধ কোরে রাজপুত্রকে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে দিলেন না, সে ব্যক্তি কিছ তাঁর আপ-নার চিহ্নিত লোক, আরদজেব অর্থ দ্বারা জয় কোরে নিজপক্ষে এল্লৈছিলেন । এক্ষণে সে ব্যক্তি সমরদরজা অবরুদ্ধ করার দারা নিরুপায় দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন, ইত্যবসরে সূজা বঙ্গদেশে সমরানল প্রজলিত কোল্লেন, দারা টাটা নামক দুর্গের আশ্রয় লইলেন, টাটার অধিনায়ক তাঁকে রক্ষা কোরবেন বোলে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হোল্লেন, তথায় কিছ বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহ হতে দারা সে দুর্গ পরিত্যাগ কোরে স্বীহন খাঁ নামক পাঠানের



শরণাপন্ন হোলেন, সে পাঁপাত্মা অর্ঘ্য পূর্বক অর্ঘ্যগুলি অপহরণ করে লোরে, কুমারকে মৃন্দরূপে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে বন্ধন করে, পাঁপাতে একটি জল্লাদ বসিয়ে তাঁর বিজয়ী দাতা আরজজেবের নিকটে দিল্লিতে লোরে চলে।

দারা আমার প্রতি চিরনির্দয় ছিলেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে তাঁর দুর্দশা দেখে করুণাচক্ষে সমাদর না করে থাকতে পারেন না। পূর্বে পূর্বে সৌলনদীপজাত বিরাটাকার প্রকাণ্ড প্রভাবাপন্ন হস্তীর উপর আরুঢ় হতেন, হস্তীটি আবার প্রগল্ভবেশবিশ্বাসে বিরচিত হইত, একখানি স্বর্ণজড়িত চিত্র-বিচিত্রিত মনোহর ঢোকা ঐ হস্তীর পৃষ্ঠে বিরাজ করিত, তার উর্দ্ধে একটি উজ্জলদর্শন রমণীয় চম্পাতপ শোভা করিত, সেই অভাগা রাজপুত্র আজ একটি হাড়দুঃখী অস্থিচক্ষু অবশিষ্ট, বিষ্ঠাক্রমে আপাদমস্তক পরিপূর্ণ হস্তীর উপর যানবদনে বসে আছেন, দেখ-লেম, তাঁর বিজলীসদৃশ মতির হার, যে হারের গৌরবে হিন্দুস্থানের বাদশাজাদারা চির-প্রসিদ্ধ, এক্ষণে আর তাঁর রাজকণ্ঠে শোভা কহে না, সে মণিময় জড়াও পরিচ্ছদ নাই, সে বৃট্টাদার কারচুপি চিকণ পাগড়ীও নাই, কেবল পুত্র মাত্র সঙ্গে, সে ব্যক্তিও অতি জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধান করে তাঁর পিতার পার্শ্বে বোসে আছেন, বস্ত্রগুলি অসভ্যের দ্বারা অতি গোবন্দা, অতি স্থূল, মস্তকে একটি দীনদুঃখী মলিন পাগড়ী, কাশ্মীরী পশমের একপাটার সঙ্গে জড়ান, সরুপ কুৎসিত পাগড়ী ইতর-লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে।

এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত করে, দারাকে আর তাঁর পুত্র সলিমান সিন্ধুকে নগর, বাজার ও রাজপথের মধ্য দিয়ে লোরে চলেছে। এই অপমানপূর্ণ লজ্জাকর হীনদশা দেখবার জন্য প্রকাণ্ড ভিড় উপস্থিত হলো, হতভাগ্য দারার অদৃষ্টের প্রতি নিরীক্ষণ করে, অনেকের অশ্রুপাত হতে লাগল, স্ত্রীগণেরা, বালক-বালিকারা চীৎকার শব্দে রোদন করে গগন বিদার্য কোতে লাগল, তাদের করুণাবিলাপ

শ্রবণ কোরে, জান হোতে লাগলো, কি যেন একটা ঘোর বিপৎপাত হয়েছে। বিখ্যাত-সাপহারক বীহন খাঁ, যে ব্যক্তি রাজপুত্র দারাকে ধৃত-কোরে আরজজেবের হস্তে সম-র্পণ কোলে, সে ব্যক্তি নিজে একটি বোড়ার উপর সোয়ার হয়ে হস্তীর পাশে পাশে চোলে আসছিল, দুরাত্মকে দেখে, সহরের যাবতীয় লোক গালাগালির তরঙ্গ উপহার দিয়ে, তার সমাদর কোর্তে লাগলো, শুধু তাতেও তারা কান্ত হয় নাই, ইট পাথর পর্যন্ত ছুড়ে ছুড়ে মাতে লাগলো। দারার দুরবস্থা দর্শন কোরে, লোকে উত্তর পর্যন্ত বিরক্ত হয়েও বন্দী-রাজপুত্রের উদ্ধারের নিমিত্ত কাহারও প্ররতি প্রবাহিত হলো না, অবশেষে রাজপুত্র কান-গৃহে প্রেরিত হোলেন। পক্ষান্তরে দারার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হবে, সেই বিষয় স্থির করবার নিমিত্ত মন্ত্রণাসভার আহ্বান করা হলো আমিও ঐ সভার উপস্থিত ছিলাম। সভার অর্দ্ধেক লোক দারার মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান কোলেন, কিন্তু আমি বিপরীত মত দিলাম। আমি যেমন আমার বক্তৃতা শেষ কোরে বোসেছি, এমন সময় রসিনারা বেগম উদ্ভূত ক্রোধে অধীরা হয়ে, “দারার প্রাণদণ্ড কর”, মুক্তকণ্ঠে এই রব কোন্তে কোন্তে সেই মন্ত্রণার ঘরে সবগে প্রবেশ কোলেন। দারার সঙ্গে রাজকুমারীর অনেকদিনাবধি অভিশয় শত্রুতা ছিল, তাই রাজবালা দুঃসময় বুঝে আপনার নির্ভর প্ররতি চরিতার্থ কোন্তে উপস্থিত হোলেন। ভয়ীর মুখে ঐ কুরব শ্রবণ কোরে আরজজেবের হঠাৎ প্ররতি হওয়ার, তাঁর মন্দভাগ্য সহোদরের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। নাজীর নামে একজন ক্রান্ত-দাস ছিল, তারি উপর বদদেগের ভার সমর্পণ করা হলো, কোন কালে নাকি দারা তার সঙ্গে দুর্য্যবহার কোরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি হঠমনে এই নির্ভর ভার গ্রহণ কোলে।

স্থগাতের পূর্বে দারার ছিন্নমস্তক বিজয়ী-পুরুষ আরজজেবের সম্মুখে নীত হলো, আরজজেব এক বিন্দু বা হুবিন্দু অশ্রুপাত কোরে, উচ্চরবে আক্ষেপ কোরে বোলেন,

“আঃ বদ্ব্যক্ত ! এই বোর মর্ম্মখাতী দর্শন দ্বারা আর আমার চক্ষুদ্বয়কে দগ্ধ করিস না। মন্তকটি এখান থেকে উঠিয়ে লোয়ে কবর দাও ।” তার পর আমার আহ্বান হওয়ায়, আমি আরজজেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখি, রাজকুমার প্রসন্নচিত্তে পায়চারি কোচ্ছেন আমার দেখে বোলেন, “সাদক ! সেই বিশ্বাসঘাতী রীহন ঐ বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত পুরস্কারের প্রার্থনা করেছে, আমিও তাকে পুরস্কার করেছি। তার প্রতি আমার যে কত ঘণা, তার পরিমাণ বোলতে পারি না। দেখো, সে যেন নির্ঝিরে প্রাণ লোয়ে তার কেল্লার পৌছিতে না পারে।” প্রাণ-বধরূপ এই নৃশংস রাজাজ্ঞার আশ্বাদন আমার মনে বড় সুরস বোধ হলো না, তথাচ অস্বীকার কোত্তে সাহসী হোলেম না, প্রাণে বড় ভয় হলো, তাই প্রণতমস্তকে নমস্কার কোরে সেখান থেকে চোলে এসে, লোকজনের উপর আশঙ্কামত হুকুম দিয়ে দিলেম। রীহন ঐ যে পুরস্কার পায়, তাঁর মূল্য তারা অবগত ছিল, তদ্বির যে ব্যক্তি যে বিস্তর অর্থ লয়ে চলেছে, তাও তারা জ্ঞাত ছিলো, তাই লোকজনেরা আমার মুখে ঐ অসাত্ত্বিক নিষ্ঠুর অভ্যুত্থির কথা শুনে আহ্লাদে নৃত্য কোরে উঠলো, তখন তারা সেই নৃশংস অমুসেবার অতুষ্ঠান কোত্তে আর স্বর্ণকালও বিলম্ব শোলে না।

তারা যে আমার আদেশ পালন করেছে, তারি প্রমাণস্বরূপ বিশ্বাসঘাতীর মন্তকটি আমার সম্মুখে উপস্থিত কোলে, আমি যখন রাজকুমারকে ঐ সংবাদ অবগত করালেম, তাঁর মুখাবয়বে সজ্জোষের হাসি দ্রৈব প্রদীপ্ত হলো। কুমার হেসে বোলেন, “সাদক ! বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে, এখন তোমার অচলা প্রভুভক্তির, তোমার অতুল বীর-বিক্রমের পুরস্কার কোরুব,” ঐ কথা বোলে একজন খোজাকে ডেকে তার কানে কানে কি বোলেন, খোজা অল্পকণের নিমিত্ত আমাদেব সম্মুখ থেকে চোলে গেল, আবার তখনি কিরে এলো, সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক,

আপাদমন্তক ঘোমটার আবৃত, ফুলে ফুলে কাঁদতে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আরজজেব বোলেন, “এটি আমার হতভাগ্য ভ্রাতা দারার কন্যা, সাদক ! আমি তোমার দান কোলেম, তুমি এই এই কন্যাটিকে বিবাহ কর, তুমি দেখতে পাবে এটি পরমাসুন্দরী এবং সাধবীও বটে। এটি রাজকন্যা, সেটি যেন স্মরণ থাকে।” আমি শুনে বিস্ময়াগ্নয় হোলেম, সেই সময় দেলজানের অনুরাগ স্মরণ হোতে লাগলো, আমার মুখ দিয়ে কথা সলোনা, আমি তো তো কোত্তে লাগলেম, তখন এমনি হলো যেন ঘুরে পোড়ে বাই আর কি, কিন্তু অপার্যমান হয়ে রাজপ্রদত্ত সন্মান আমার স্বীকার কোত্তে হলো। একটি যুবতী, বীর রীতিচরিত্র আমি কিছুই অবগত নই, তাঁকে পরীক্ষণে গ্রহণ কোত্তে হবে, তাঁর মুখাবয়ব এ পর্যন্ত চক্ষে দর্শনও করি নাই। আমি যুবতীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিশেষতঃ তাঁর পিতা আমার পরম শত্রু ছিলেন। যে সন্মান আমার প্রদান কোত্তে রাজকুমারের বাসনা হয়েছে, আমি যদি তা গ্রহণ না কোত্তেম, তবে মন্তকটির মায়া পরিভাগ কোত্তে হতো, কিন্তু সেটি গ্রহণ কোরে মন্তকের পরিবর্তে অমেকগুলি দীর্ঘ-নিশ্বাসের মায়া পরিভাগ কোত্তে হলো। এক্ষণে মুরাদবাকী মাত্র আরজজেবের ক্রোধের ভাতন হয়ে আছেন। মুরাদ গুজরাটে রাজত্বকালীন একজন সৈয়দের প্রাণদণ্ড করেন, তার পুত্রেরা এক্ষণে সম্মুখীম হয়ে বিচার প্রার্থনা করেছে। এই ঘটনা আরজজেবের পক্ষে সুন্দর ছলনা হলো, এই ছলে সহোদরের হাত থেকে উদ্ধার হোলেন, সকলের সাক্ষাতে মুরাদের মন্তকটি ছিন্ন করা হলো। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমান সিকুর হস্তপদে শৃঙ্খল পরিয়ে বন্দীর অবস্থার আরজজেবের নিকটে উপস্থিত কোলে, সিকুর প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, তিনি কারাবাসী হয়ে গোয়ালীরে অবস্থান কোরবেন। যুবা রাজকুমারের পদতলে পোড়ে সকাভরে এই প্রার্থনা কোলেন, যদি

পোস্তপান কোত্তে দেওয়া তাঁর অভিপ্রায়  
ইয়; তবে সে নির্ভর যত্ননা না দিয়ে একে-  
বারেই তাঁর প্রাণবধ করেন। আরজজেব  
শপথ কোরে বোলেন, তাঁর সে অভিপ্রায়  
নহে, তার পরেই কুমারকে অন্ধকারাবাসে  
প্রেরিত করা হলো।

আমি ইউসোফের অনুসন্ধান কোল্লেম,  
বাসনা যে, আমার এই বলপূর্বক বিবাহের  
বিষয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোরুব, শুনলেম,  
তিনি সুজার সঙ্গে চোলে গিয়েছেন। ইউ-  
সোফ স্বমুখে যে অভিপ্রায় স্পষ্ট অভিধানে  
ব্যক্ত কোরেছিলেন, তাঁর ঠিক বিপরীত  
কার্য্য কোরেছেন।

আমি কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত শীঘ্র  
শীঘ্রই এ বিবাহদায় থেকে পরিভ্রাণ পেলেম,  
এ বিবাহের প্রস্তাব শুনে আমার মনে যত  
অসুখ হোক আর নাই হোক, রাজকন্ডার  
মনে কিন্তু অতিশয় কষ্ট হয়েছিল। শুনলেম,  
যুবতী পিতামহ শাজাহানের নিকটে দিবা-  
রাত্র মনের অসন্তোষ জানানতে লাগলেন,  
তাই বৃদ্ধ নরপতি মধ্যবর্তী হয়ে এ পরিণয়-  
কার্য্য নির্বাহ হোতে দিলেন না। শাজাহান  
যদিও এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে আরজজেবের  
বন্দী, তথাচ তাঁর সর্ববলবান্ পুত্রের উপর  
কতক প্রভুত্ব এখনও আছে। বৃদ্ধ সৈন্যটি  
বারংবার বিশেষ যত্ন পাওয়াতে যুবতী অল্পত  
অবস্থার পিতামহের সঙ্গে একত্রে বাস কোত্তে  
লাগলেন, আরজজেব তাতে প্রতিবাদী  
হোলেন না, তাঁর মনে এই ধারণা হলো,  
এ বিবাহ খণ্ডিয়ে যাওয়াতে আমার অনিষ্ট  
হয়েছে, তাই রাজপুত্র প্রকাশ্য দরবারে  
রাজকিরোপা প্রদান কোরে আমার সেই  
অপকারের প্রতীকার কোল্লেন, আমি যে  
সময়স্থলে বীরমদে মত্ত হয়ে বুদ্ধি কোরে-  
ছিলেম, এই শিরোপা তারি সর্ববাদী  
সাক্ষীর স্বরূপ হলো।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

“মা না বেয়ালে, বেয়ালে মাসী, ঝাল  
থেয়ে মলো পাড়াপোড়সী।”

মুলতান সুজাকে বেড়াজালের জায় চারি-  
দিক্ থেকে ঘেরে ফেলেছিল, আমীরজেমলা  
তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হওয়ায় তিনি  
পালিয়ে আরাকানে প্রস্থান কোল্লেন। এখন  
সকলের মনে স্থির বিবেচনা হলো, সুজা  
একেবারে নির্জীববৎ অবসর হয়ে পড়ে-  
ছেন, এক্ষণে তিনি আর আরজজেবের  
উৎকর্ষার বিষয় নহেন। আরজজেব আপাততঃ  
সমগ্র হিন্দুস্তানের রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে  
সিংহাসন গ্রহণ কোল্লেন। তাতার, পারস্যান,  
সিদ্ধিয়া প্রভৃতি নানা দেশ-প্রেরিত রাজপ্রতি-  
নিধিগণকে আহ্বান কোত্তে লাগলেন,  
রাজপ্রতিনিধিরা সর্ববাদিসম্মত হয়ে প্রণত-  
মস্তকে আরজজেবকে ভারতেশ্বর বোলে  
অভিষাদন কোল্লেন। যে সকল জনপদবাসী  
মঙ্গলবাদার্থী হয়ে ছুঁদাস্ত বলবান্ আরজ-  
জেবের পদাশনের নিকট সমাগত হয়ে-  
ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাবুলরাজ্যের  
অন্তর্ভুক্ত গিজনির অনেকগুলি সদাগর উপ-  
স্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই গিজনিবাসী।  
গিজনি কাবুলের অন্তর্গত। মহাজনেরা উপ-  
হার দিবার নিমিত্ত বিস্তর বহুমূল্যের রত্ন  
সঙ্গে লয়ে আসেন, কিন্তু হামেত নামক  
সদাগরের প্রদত্ত উপহারের উজ্জল কান্তির  
সঙ্গে কাহারও তুলনা ছিল না। লোকের মুখে  
ব্যক্ত আছে, সে ব্যক্তি নানা উপায় দ্বারা  
অসঙ্গত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন।  
আমি একটি সদাগরকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,  
হাতেম কিরুপে তত অপরিমিত অর্থের প্রত্ন  
হোলেন? সদাগর ঐ কথা শুনে হাতেমের  
‘আজোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত কোরিয়ে সভাসদ-  
বর্গকে অতিশয় আপ্যায়িত কোলে। তদ-  
বৃত্তান্ত এই :—

এক সময়ে কাবুলে আর কান্দাহারে  
সদাগর অতিশয় উপক্রম ছিল, তাই এখন দেশ

কি এমন ব্যক্তি ছিল না যে, ঐ দুটি দেশের দুর্নাম তারা কখন শুনে পেলো না কি জানতে পারতো না। দস্যুভয়ে ঐ দুটি দেশ সর্বত্র পরিচিত হয়েছিল। দস্যুরা যে স্থানে বাস করিত, তার চারিদিক পর্কিতে বেষ্টিত, তদ্বিন্ন দুর্ভেদ্য দুর্গম গড়ও তাদের আশ্রয়স্থল ছিল। দুর্গাচারেরা দলে দলে দলবদ্ধ হয়ে, ঐ সকল পাছাড়ে, ঐ সকল দুর্গম স্থানে সর্বদা গতিবিধি করিত। কাবুলের অন্তর্গত একটি সহর আছে, সহরের নাম গিজনি, ঐ গিজনি সহরের নিকটে একদল দুর্ভীক্স কালান্তক দস্যু বাস করিত। তাহারা সদাসর্বদা যে সকল স্থানে গমন করিত, সে সকল স্থান সহর থেকে অধিক দূর নহে, এ কথা আবার ছোট বড় সকলেই অবগত ছিল, অবগত ছিল সত্য, কিন্তু কোথায় তাদের আড্ডা, কোথায় তাদের ঘাঁটি, সে সকল সন্ধান কেহই জানিত না। সেই সকল দুর্বার দস্যুদল পূর্বে পূর্বে পশ্চিম-মধ্যে রাহাজানি কোরে পাছ আর মহাজন-দিগকে সর্বস্বাস্ত করিত, ইদানীং আর সে প্রণালীর দস্যুত্বভিত্তি পরিত্যক্ত না হয়ে, গিজনিবাসী ধনবান্দিগের নিকটে জ্বরদস্তি কোরে বিপুল অর্থ চাহিয়া পাঠাইত, ঐ ধনবান্দিগের মধ্যে তাহারা প্রাণের মায়া করিতেন, তাহারা কাজে কাজেই ঐ অর্থ সহমানে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন।

দস্যুদের সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র প্রকাশ ছিল যে, তাদের সরদারের নাম “কালমাক্”। যিনি যত দুর্দান্ত বলবান্, যিনি যত দুর্দান্ত দুঃসাহসী হউন না কেন, কেউ যদি তাঁর কাছে কালমাকের নাম করিত, অমনি তাঁর প্রাণ-পুরুষ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিত। দস্যুদিগের সম্বন্ধে অল্প কোন পরিচয় জানা ছিল না, অথচ তাহাদের সরদারের নামটি সর্বত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে। শুদ্ধ সরদারের নামটি কি কোরে প্রকাশ হলো, এই প্রশ্ন পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর উত্তর এই, গিজনিবাসী লোকেরা এই কথা বলে, সেই সকল সর্ব-প্রাণী দুর্ভীক্স অপহারকেরা এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে এই বর্ষে একখানি পত্র লিখিয়া

পাঠাইত, যথা,—“তুমি আমাদের চিহ্নিত লক্ষ্যভাজন হইলে,” যে অর্থ তাহাকে দিতে হবে, তার পরিমাণও ঐ পত্রে নির্দিষ্ট করা হইত। এই পত্রের আকরস্থলে বড় বড়, স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে কালমাকের নাম অঙ্কিত থাকিত, ঐ নামের নীচে দুটি কৃষ্ণচেরার মধ্যে লোহিত বর্ণে চিত্রিত একখানি ছোয়ার প্রতিমূর্তিও অঙ্কিত থাকিত। এই পত্র প্রাপ্ত হবার পূর্বে লক্ষিত ব্যক্তির সদর দরজার গায় একটি কৃষ্ণ চেরার চিহ্ন দেওয়া হইত, সেই কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নটি সহরের যাবতীয় লোক স্পষ্ট দেখিতে পাইত, পত্রখানি যে আজকাল কি দুচার দিন বিলম্বে তাঁর নিকটে অবশ্য অবশ্যই পৌঁছবে, ঐ কৃষ্ণচিহ্নটি তাঁর অব্যর্থ নিদর্শন। ঐ পত্রের অনাদর কোলে বেরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রতিফল দেওয়া হইবে, সে কথা ঐ অর্থদাবির পশ্চাতেই শপথবাক্যে লিখে দিয়ে, লক্ষিতব্যক্তিকে পূর্বাঙ্কেই সাবধান কোরে দেওয়া হইত। সেই কালান্তক চিহ্নটি দর্শন কোরে সাপেক্ষিত পত্রের বাহককে ধৃত করবার নিমিত্ত কতই কৌশল, কতই উপায় করা হয়েছিল, কত লোক কতই অহু-সন্ধান কোরে ফিরেছিল, কিন্তু সে সকল চেষ্টা, সে সকল যত্ন কখন সফল হোতে শোনা যায় নাই। কখন কোন্ ব্যক্তি পত্রখানি পৌঁছে দিত, সে ছয়বগাহ সন্ধান জানুবার উপায় ছিল না। যার নামে পত্র, তার কাছে অবশ্যই পৌঁছবে, অথচ কেহই তার সন্ধান জানতে পারতো না। কি বাড়ীর, কি পাড়ার কোন লোকই বলতে পারতো না পত্রখানি কি কোরে পৌঁছিল। যে অব্যক্ত কৌশলে পত্রখানি লক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞাতে তার বাড়ীতে, কি তার নিকটেই রেখে দিয়ে বাইত, সেটি কাহারও অহুভবের বিষয় ছিল না। পত্রখানি হয় ত তার বাড়ীর কোন কাঁকা জায়গায় গোড়ে থাকত, স্তুরাং হঠাৎ কারও নজরে গোড়ে যেতো, নয় ত খাতাপত্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে পোড়ত, কখন বা কাপড়ের বোচ-কার মধ্যে গোঁজা থাকত। যে ব্যক্তির উপর অর্থের দাবি করা হতো, কখন বা স্বয়ং সেই

ব্যক্তির কাছেই পত্রখানি পাওয়া যাইত। নির্ভর হুঁরাওয়ার প্রায়ই হাজার খান মোহর চাহিয়া পাঠাইত। নিশীথরাত্রে সহরের বাহিরে ময়দানের মধ্যে কোন নির্দিষ্টস্থানে সেই লক্ষিত ব্যক্তিকে স্বয়ং পৌছিয়ে দিতে বলিত। সেই প্রগল্ভ পত্রখানির নামও “কালমাক,” লোকের মুখে শোনা যায়, একটি মহাজন ঐ কালমাক পেয়ে কতকগুলি হাতি-স্বারবাধা লোক সঙ্গে কোরে যথানির্গত স্থানে উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি এই মনে করে-ছিল, দুর্বার দস্যুরা যখন টাকা লইতে আসিবে, সেই সময় তাহাদিগকে ধৃত করিবেন। রাত্রি প্রভাত হলো, কাকেও দেখতে পেলেন না, সুতরাং অর্থগুলি লোয়ে গৃহে ফিরে এলেন, অর্থগুলি দ্বিতে হলো না বোলে আশ্বাসে মহা আশ্চর্য্যলব্ধ কোত্তে লাগলেন। দুর্বার দস্যুদিগের পত্রের মান রক্ষা করাই কিন্তু তাঁর পক্ষে কল্যাণকর ছিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই লোকে স্পষ্ট দেখতে পেলে, সেই ব্যক্তি শবাকার হয়ে পথের মধ্যে পোড়ে আছে! নিদারুণ দস্যুরা অপ-বাস্ত দ্বারা তাঁর প্রাণ নষ্ট করেছে!

এককালের তত সুখশোভনের সহর — গিজনি ইদানীং শুদ্ধ হাহাকারের আলয় হয়ে উঠলো। না জানি, কখন কায় প্রাণ যায়, কখন কি বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় লোক আহারনিজ্ঞা পরিত্যাগ কোলে, অর্থ আর প্রাণ লোয়ে দিবারাত্র শশব্যস্ত। স্ত্রীলোকেরা স্বামীহীন হয়ে পথে পথে হাহাকার কোরে কিস্তে লাগলো। পিতা পুত্রশোকে, পুত্র পিতৃশোকে ভাসতে লাগলো, অনাথ অনাথা বালক-বালিকার করুণাগর্ভ-রোদন-ধ্বনিতে সহরের স্বাসাবরুদ্ধপ্রায় হলো, আঙ্গিক-পূজা প্রায় রহিত হবার উপক্রম হলো, লোকের ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্তপ্রায় হলো, চতুর্দিকের বিলাপধ্বনিতে কর্ণ বধির হোতে লাগলো। হাট-বাজার কারকারবার বন্ধ হলো, রাত্তা-ঘাটে লোকজন্মের চলাচল প্রায় রহিত হয়ে পোড়লো। কেউ কাহাকে বিশ্বাস করে না, এ তারে, সে উহারে, এইরূপ পরস্পর সন্-

দেহ সকলকে সন্দেহ কোত্তে লাগলো, সহরময় সন্দেহের আর অবিশ্বাসের তরঙ্গ খেলতে লাগলো। কেউ কাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে না, গুরুজনের প্রতি মাত্ত কি সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রায় উঠে গেলো, লোকে সামান্ত ক্রটিতে পরমমিত্রের জাতশত্রু হোতে লাগলো, এইরূপ উচ্ছ্রাল হয়ে সহরময় মহা-ডামাডোল 'পোড়ে' গেল। কাশ্মীর প্রভৃতি দেশদেশান্তর থেকে কত শত মহাজন গিজনি সহরে সমাগত হোতেন, তাঁহাদের আস্বার সময়ও নিরুপিত ছিল, আর যখন আস্বার সময়, তিনি সেই সময়ে আড়ম্বর কোরে উপস্থিত হোতেনই হোতেন। কিন্তু এক্ষণে আর গিজনির বাজারে সেরূপ ক্রয়বিক্রয়ের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায় না, সে সকল মহাজনের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে পোড়েছে। এক বৎসর গত হলো, তথাচ সহরে একটিও মহাজন দেখতে পাওয়া গেল না, আর যে কেউ কখন আসবেন, সে প্রত্যাশাও নাই, তাই মনে কোরে সহর-বাসীরা হতাশে অবসন্ন হয়ে পোড়লো। এইরূপ উৎকর্ষায় উদ্বিগ্নে কিছুদিন কেটে যায়, ইতিমধ্যে হঠাৎ সহরে জনরব হলো, একটি সওদাগর কাশ্মীর থেকে রওনা হয়েছেন, সহরে পৌছবার বড় বিলম্ব নাই, বড় বড় গাড়ী বোঝাই কোরে বিস্তর জিনিসপত্র লোয়ে চোলে আসছেন, লোকমুখে বিপদ-ভয়ের কথা শুনেও সওদাগর সে কথা গ্রাহ্য না কোরে নির্ভয়ে চোলে আসছেন। এই জনরবও যেমন দিন দিন প্রবল হোতে লাগলো, লোকের উৎসেগও তেমনি দিনদিন বৃদ্ধি হোতে লাগলো, উৎসেগ হবার তাৎপর্য্য এই মহাজনকে নাকি দস্যুদিগের প্রতি স্পর্ধা কোরে চোলে আসতে হয়েছে, পাছে পথের মধ্যে তাঁর কোন বিষ ঘটে, তাই লোকের মনে ভয় হোতে লাগলো। সে ব্যক্তি নিরীক্সে পৌছিতে পারবে কি না, তাহাদের মনে সে সন্দেহও হোতে লাগলো। সওদাগর যেন নিরাপদে পৌছিতে পারেন, সেই জন্য সহরবাসীরা দেবদেবীর কাছে

ছাগমেঘ মেনে তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা কোতে লাগলো।

অবশেষে বহুদিনের প্রত্যাশার স্থল সেই সদাগর স্তম্ভার সম্পন্ন উটদল সঙ্গে কোরে সহরে প্রবেশ করুবেন, তার দিন নিকট-গত হয়েছে। যে দিন মহাজনের পৌছবার কথা, সেই দিন তার গৌরব-আস্থানের নিমিত্ত বিশ্বর লোক একস্থানে জমা হলো, গিজ্জি সহর লোকারণ্য হয়ে পোড়লো। অনেকে তামাসা দেখবার আমোদে আমোদী হ'য় সেখানে উপস্থিত হোলেন, অনেকে আবার আপনার আপনার প্রয়োজনের নিমিত্তেও তথায় গমন কোলেন। সমাগত দর্শকের মধ্যে খোজে নামে এক ব্যক্তি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। খোজে একজন সহরের নামজাদা সদাগর, এ ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল, সস্তাদরে অনেক জিনিসপত্র খরিদ করেন, সেই মনন কোরেই তিনি বাজারে এসেছিলেন। আসবার সময় মনে মনে আশা কোরেছিলেন, বাজারে গিয়ে দেখবেন, শাল, রুমাল, মণিমুক্তা হীরাজহরত প্রভৃতি বহুমূল্যের সম্পত্তি স্তম্ভাকার হয়ে পোড়ে আছে, সহরের তাবৎ লোক খরিদ কোতে যুঁকেছে, নতুন মহাজনের নিখাস ফেলবার অবকাশ নাই, খন্দেরের এত ভিড় যে বিক্রী কোরে উঠতে পাচ্ছে না, সদাগর শশবাস্ত হয়ে পোড়েছেন। কিন্তু খোজে যে, সমারোহ দেখবার আশা কোরে বাজারে এসেছিলেন, সে আশা-অনুরূপ কিছুই দেখতে পেলেন না, তার পরিবর্তে এই দেখলেন, স্তম্ভের সমুদায় লোক একটি যুবাকে ঘেরে ঠেসে রয়েছে, সে যুবাটি “আল্লা! আমার দশা কি কলি! আল্লা! তোর মনে কি এই ছিল! আমি এখন যাই কোথায়! দাঁড়াই কার কাছে!” এইরূপ বারংবার আল্লার নাম লোরে হাহাকার কোরে মর্ধ্যস্তিক রোদন কোছে, রোদন কোতে কোতে দর্শকদিগকে সন্বেদন কোরে এই কথা বোলছে, “আমি বড় হতভাগ্য, আমার হুঃখের কাহিনীটি আপনারা স্থির হয়ে

শ্রবণ করুন।” ককণাচিভ খোজে রাজ-কাক্সিপ্রফুল্লিত একটি নবীন পুরুষকে শোকে অভিভূত হোতে দেখে অতিশয় কাতর হোলেন। সদাগর জিজ্ঞাসা কোরে শুনলেন, যিনি কাশ্মীর থেকে আসছিলেন, যার আসবার কথা অনেক দিন অবধি শোনা যাচ্ছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি, গিজ্জি থেকে কয়েক ক্রোশ অগ্রে দুর্দান্ত “কালমাক্” দস্যুরা পথের মধ্যে রাজাজানি কোরে তাঁর যথাসর্বস্ব লুটে নিয়েছে। খোজে ঐ কথা শুনে শোকাভূত যুবক নিকটে গিয়ে চীৎকার কোরে বোলেন, “কি হয়েছে? তুমি কি কালমাকের হাতে পোড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছো?” যুবা রোদন কোতে কোতে বোলেন, “আর মহাশয়! কেন আর আমার হুঃখের অনল বৃদ্ধি করেন? আমার যথাসর্বস্ব হাত মুচড়ে কেড়ে নিয়েছে, আমি আমার পিতৃদত্ত সমুদয় অর্থ সদাগরি ব্যবসাতে সমর্পিত কোরেছি, এক্ষণে আমি অনাথ হয়ে পোড়লেম, হায়! আমি কি হতভাগ্য! এ বিতর্পী সংসার-অরণ্যে বাস কোরে পথের কান্দালী হোলেম! হায় আল্লা! তুই আমার কৃপা কর! আমার আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর! আমি এখন যাই কোথা! দাঁড়াই কার কাছে!”

খোজে তত মনোহর নবীন পুরুষের হুঃখে অতি কাতর হয়ে, কালের স্বরূপ সেই দুর্ভাগ্যের পাশে দস্যুদিগের দোরাণ্ডো অঙ্গীর হয়ে, সমাগত লোকদিগকে সন্বেদন কোরে বোলেন, “হে সহরবাসী ভ্রাতারা! এই দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর কাল দস্যুদিগের অঙ্গুগত হয়ে আর আমাদের কত কাল চলিতে হইবে? সেই কাল-দস্যুদিগের হস্তে পাড়য়া আমাদের অর্থের, শুধু অর্থের কেন, আমাদের জীবনেরও পরিজ্ঞান নাই। যে সকল সামান্ত সামান্ত জিনিসপত্রের অভাবে লোকের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় না, যে সকল অবশ্য আবশ্যকীয় বাণিজ্যব্যবসার উপর অবলম্বন করিয়া জল আহারের, স্তায় আমরা কোনরূপে দিনপাত করিয়া থাকি এবং বাহা

নিরীহ লাম্বু মহাজনেরা আমাদের সহরে  
সময়ে সময়ে আনয়ন করেন, এক্ষণে সে সমু-  
দয় দ্রব্য রাহাজানী দ্বারা অপহৃত হইতেছে,  
তাহাও আবার অধিক দূরে নয়, আমাদের  
গৃহের দ্বারে বলিলেই হয়, সহরের প্রাচীর  
থেকে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের এত  
নিকটে অপহরণ হইতেছে!! আমরা-যে  
জনকয়েক মাত্র কালদস্যুর হাতে পড়িয়া  
মনোপ্রাণে মারা যাইতেছি, তারা যে আমা-  
দের এত লাঞ্ছনা, এত দুর্গতি করিতেছে,  
আমরা যে তথ্য তাহাদের জন্যে বাঞ্ছনাম্পত্তি  
করিতেছি না, আমরা মনে সে কালপাশও-  
দের ক্রীতদাস হয়ে পোড়েছি, তাই তাহা-  
দের মনে বাহা উদয় হইতেছে, তাহাই করি-  
তেছে। হে সহরবাসী ভ্রাতারা! সেটি কি  
লঙ্কার কথা নয়? সেটি কি আমাদের  
পক্ষে গ্রানির বিষয় নহে? তবে এসো,  
আমরা সকলে একত্র হয়ে একদল সৈন্তের  
নিমিত্ত বাদশাহের নিকটে প্রার্থনা জানাই,  
এস, আমরা সকলে একবাক্য হয়ে আপ-  
নাদের ধন প্রাণের রক্ষক আপনারা হয়ে  
দাঁড়াই।”

বক্তৃতা সমাপ্ত হোলে “ভাল ভাল বোলে”  
সকলেই তাঁর মতে মত দিলেন, খোজের  
অভিমন্যব সৈন্তের নিমিত্ত বাদশাহের  
কাছে দরখাস্ত কোত্তেও চোলেন। পক্ষান্তরে  
উর্ভাগ্য কান্দীর মহাজনের উপকারের নিমিত্ত  
একটি মাথট করা হয়, সেই জন্তে খোজে  
সকলকে পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগলেন।  
সদাগর বোলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের  
অহুরোধে প্রাণের মারা পরিত্যাগ  
কোরে বিদেশযাত্রা কোরেছে, যে ব্যক্তি  
পথের মধ্যে এত বিপদাপন্ন হয়েছে যে,  
কেবল কোন গতিতে প্রাণদান পেয়ে পালিয়ে  
এসেছে এবং যে ব্যক্তি আপনার জীবন  
সংশয়াপন্ন কোরে বাণিজ্যবৃত্তির মহিমা রক্ষা  
কোরেছে; তার প্রতি কৃপা কোলে জগদীশ্বর  
আপনাদের প্রতি কৃপা কোরবেন। এ ব্যক্তি  
শুধু আমাদের অহুরোধেই বেরূপ দুঃখ-  
হলে কল্প প্রদান কোরেছে, তাতে কোরে

তার প্রাণ হারানো বিচিত্র কথা ছিল না।”  
শোকাভিভূত বিষমচিন্তিত কান্দীর মহাজন  
অমৃতরসের দ্বারা ঐ সকল প্রতিবেদনার কথা  
শ্রবণ কোরে খোজের পদতলে পোড়ে কৃত-  
জ্ঞতারূপ অশ্রু-বর্ষণ কোত্তে লাগলেন, যুবাকে  
তত কাতর হোতে দেখে, অনেক প্রধান  
প্রধান সদাগর তাঁর দুঃখের আশুপ্রতীকার  
করবার নিমিত্ত চাঁদার বহিতে দস্তখত কোত্তে  
স্বাক্ষর কোলেন।

খোজে যেমন সদয়চিত্ত, তেমনি আবার  
অতিথ্যাত্মক ছিলেন। নিরাশ্রয় কান্দীর-  
সদাগরকে আপাততঃ তাঁর গৃহে বাস কোত্তে  
অহুরোধ কোলেন। যে ব্যক্তি অসহায়  
অহুপায় হয়ে পোড়েছে, তার পক্ষে এ  
অহুরোধ কখন অর্নাদরের হোতে পারে না,  
তাই যুবা ঐ আমন্ত্রণ পেয়ে ধীরস্থভাবে  
অতিথ্যাত্মক নৃপ্রাজ্ঞবর খোজের অহুগামী  
হয়ে তাঁর প্রশান্ত উদারাবাসে হোলে  
গেলেন।

খোজের কন্যা খোজেস্তা, তাঁর ঐ একটি-  
মাত্র সন্তান। খোজেস্তা পিতাকে একটি  
অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে কোরে গৃহে  
প্রত্যাগমন কোত্তে দেখে, অল্প বিস্মিত হোলেন  
না। খোজেস্তা শুনলেন, সেই অপরিচিত  
যুবা তাঁর পিতার সঙ্গে একবাড়ীতে বাস  
কোরবেন, ঐ কথা শুনে যুবতী আরও হত-  
বুদ্ধি হোলেন। খোজে তাঁর অতিথিকে বেরূপ  
দয়বস্থায় প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই কথা  
কন্যাকে অবগত কোরিয়ে বোলেন, যুবা যে  
কয়েক দিন তাঁর গৃহে অবস্থিত কোরবেন,  
তাঁর প্রতি যেন যত্নের বা সমাদরের ক্রটি না  
হয়। খোজেস্তা সেই প্রিয়বক্তা, সদ্যবহার-  
প্রাজ্ঞ অতিথির চারু-কোমল প্রকৃতি দর্শন  
কোরে তাঁর দেবোপম প্রশান্ত বিন্দু-মূর্তির  
প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে বিমুগ্ধ হোলেন, তাই  
অপরিচিতের প্রতি যত্নের নিমিত্ত যুবতীকে  
আর দ্বিতীয়বার অহুরোধ কোত্তে হলো না,  
বেশন অবস্থা, খোজেস্তা তার মত ব্যবস্থা  
কোরে বাসস্থানের তাবৎ আয়োজন প্রস্তুত  
কোরে দিলেন। খোজেস্তার বিবাহ হয়



নাই, বালা এ পর্য্যন্ত অপরিণীতা যুবতী । মহিলাদের মধ্যে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রবৃত্তির প্রবাহ হয়ে থাকে, খোজেন্তার মনের অবস্থা সেরূপ ছিল না, অনেকের স্বভাব অপেক্ষা যুবতীর স্বভাব বিস্তর বিভিন্ন । খোজেন্তা বিনোদ-বেশ কোরে শরীরের কান্তি উদ্দীপ্ত কোত্তে শিক্ষা করেন নাই, মণিময় হারের প্রতি তাঁর রুচি ছিল না, রত্ন-অলঙ্কার পত্তে তাঁর প্রবৃত্তি হতো না, তাঁর চারুকণ্ঠ কি কোমলবাহ কখন হীরা-মুক্তা-স্বর্ণে জড়িত হোতে দিতেন না, বালার কবরী কখন রড়ে খচিত হয়ে বিজলী-প্রভা দীপ্তি কেপ্তো না, তাঁর পদ্যনেত্র দুটি বিনোদ-রাগে রঞ্জিত কব-বার নিমিত্ত তাঁকে কখন একখানি দর্পণ নিয়ে ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টা বোসে থাকতে দেখা যাইত না । বালার সমবয়সী মহিলারা কত প্রকার সরস ভঙ্গিমায় কেশতরঙ্গের বিভ্রাস কোরে চারু শোভার আড়ম্বর কোত্তেন ; দেখে বোধ হতো যেন, কৃষ্ণকুন্তল-দামের বিজলীছটা যুবতীর লাবণ্য বেয়ে গোড়িয়ে পড়ছে । আমাদের খোজেন্তা কিন্তু সেরূপ বিনোদাডম্বর ভালবাসিতেন না, সে সকল গর্জপূর্ণ অসার অভিমানের পরিবর্তে যুবতী বরং তাঁর বুক পিতার প্রতি প্রকৃত্তি প্রদর্শন কোত্তেন, পিতা কিসে সন্তুষ্ট থাকবেন, কিসে তাঁর কষ্ট দূর হবে, সেই বড়ই অধিক করিতেন, তাতেই তাঁর অধিক সময় অতি-বাহিত হতো, এতদ্ভিন্ন এক জন বহুদর্শী প্রবীণ বিজ্ঞ মহাজনের ছায় সদাগরের কার-বার-সংক্রান্ত বিষয়কর্ষণও নিক্ষেপ কোত্তেন । খোজেন্তা এক্ষণে ১৭ বৎসরে পদ্যর্পণ কোরে-ছেন । সদাগরের চিরকুলপ্রথা এই, তাঁদের কন্যা শৈশবকালেই বাগ্‌দস্তা হন । খোজেন্তার কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাগ্‌দান হয় নাই,—তাঁর বিবাহের কথা এ পর্য্যন্ত কারও সঙ্গে স্থির হয় নাই, এটি কিন্তু তাঁদের কুলাচারের বহির্ভূত কার্য । বালার ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তাঁর মাতা পরলোকগমন করেন, বাণিজ্যের অল্প-রোদে তাঁর পিতাকে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ কোত্তে হয়েছিল, সদাগরের একটি ভগিনী

ছিলেন, বিদেশ যাবার সময় ঐ সহোদরাকে কন্যার অভিভাবক কোরে রেখে বাইতেন । মহামতি ভগ্নী মনে কোত্তেন, বিচারমত তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের পত্র কোত্তে পারেন না, সে অধিকার তাঁর নাই, তাই কন্যাকালপ্রাপ্ত অখচ বাগ্‌দানে অনাবদ্ধ ১৭ বৎসরের খোজেন্তাকে তাঁর পিতার হস্তে সম-র্পণ কোল্লেন । খোজেন্তা অনেক দিন প্রবাসে বাস কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোল্লেন, তাঁর অভিপ্রায়, আর কখন বিদেশে গমন কোরবেন না । তাঁর পরমাত্মদরী অখচ অতি বুদ্ধিমতী কন্যারদ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে স্নেহে ভাসতে লাগলেন, বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজনের মুখে হুহিতার গুণানুবাদ শ্রবণ কোরে আরও প্রকুল্লিত হলেন । কালক্রমে অনেক উপ-লক্ষে কন্যার অচলা প্রকৃতি অনুভব কোত্তে লাগলেন, তন্নির সদাগর দেখলেন, তাঁর কন্যা জ্ঞানবাদিনী, সত্যসন্ধান-কুশলা, স্থিরপ্রজা, নিশ্চিতকর্ষণ এবং মীমাংসাতুরা, বিশেষতঃ শুভঙ্করী বিজ্ঞায় এবং লিখন-পঠনে হুহিতার বিস্তর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে দেখতে পেলেন । বালা ঐ সকল গুণের প্রভাবে বাণিজ্য-কার-বারে তাঁর পিতার একজন বিচক্ষণা সহায়িনী হয়ে দাঁড়ালেন । সদাগর এই সকল গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কন্যা যে বাগ্‌দস্তা হন নাই, তাঁর জন্ত হুঃখিত হোলেন না, বরং মনে মনে জাবলেন, তিনি যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন যেন বিবাহের কথাই উত্থাপিত না হয়, তা হোলে কন্যারদ্বের দর্শনে বঞ্চিত না হয়ে দিবারাত্র বালাকে চক্ষের উপর দেখতে পাবেন, তন্নির কার-কার্য্যের সম্বন্ধে তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকারও পেতে পারবেন । খোজেন্তার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সদাগরের অতিশয় প্রজ্ঞা জন্মিয়াছিল, তাই তাঁর স্থির জানা ছিল, বালা যেরূপ বুদ্ধিমতী, তিনি যদি কখন স্বামী গ্রহণ কোত্তে ইচ্ছা করেন, তবে সংপাড়ের উপরেই অল্পস্বামী হবেন, অসং-পাড় কখনই তাঁর মনে স্থান পাবে না । এই বিবেচনার অল্পস্বামী হয়ে সদাগর মনে মনে স্থির কোল্লেন, কন্যার বিবেচনার বাহা

ভাল বোধ হয়, তাই সে করুক, তিনি তাঁর মতামতের উপর কোন কথাই বোলবেন না, তাই খোজেন্তার প্রতি কে অহুরাগী হলো আর না হলো, তিনি সে বিষয়ের কোন সন্ধান রাখতেন না। সেটি কিন্তু বড় বিচিৎর কথা নয়, যেহেতু, তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল, কস্তার মতামতের উপর তিনি হস্তক্ষেপ কোরবেন না। খোজের প্রাচীন বন্ধু খোদাবত, সদাগরের পুত্র হামেত। হামেত অতি যুবাশ্রুত, তাঁর হৃদয় খোজেন্তার অহুরাগে প্রাণিত হয়, খোজে কিন্তু সে বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি জানতেন, হামেত একজন ঝটপুট স্থলকার যুবাশ্রুত, অতিশয় পরিশ্রম কোত্তে পাতেন, তাতে তাঁর আলস্ত ছিল না, মিষ্টভাষী, সরলচিত্ত, অচ্যুত নিতান্ত অচতুর, তাঁর এমন কোন গুণ ছিল না যে, যুবতীদের অহুরাগের পাত্র হন, তাই সদাগর মনে কোরেছিলেন, এ ব্যক্তি তাঁর কস্তার সুস্বাদু কোমল অহুরাগ উদ্দীপ্ত কোত্তে পারবে না, হামেত সেরূপ উপযুক্ত পাত্রই নহে। যুবা হামেত খোজেন্তার বুদ্ধিপ্রভাবের অতি গৌরব কোন্তেন, যুবতীর রূপলাবণ্য দেখেও দিন দিন মুগ্ধ হোতে লাগলেন। হামেত আপনার অন্তঃকরণের কথা খুলে বোলতে পাতেন না, তাঁর মন সংশয়ে মগ্ন হয়ে ছিল, যেহেতু, তাঁর তাদৃশ গুণও ছিল না, রূপও ছিল না, সুতরাং খোজেন্তার প্রণয়ানন্দ হবেন, এ আশা কোত্তে তাঁর সাহস হতো না, তাই সর্বদা সলজ্জিত হয়ে মনে মনে স্নান হয়ে থাকতেন। হামেতের কিন্তু ঐ সলজ্জিত স্নান মূর্ত্তি খোজেন্তার পক্ষে মহা অহুরোধস্বরূপ হলো, তাই বালা তাঁকে নিরীহ হামেত বোলে ডাকতেন। হামেত যে দিন সাক্ষাৎ কোত্তে না পাতেন, সে দিন খোজেন্তার নৈরাশ হবার অপেক্ষাও অতিরিক্ত দুঃখিত হতেন। যুবারা প্রায়ই কবিদিগের কাব্যরসের আড়ম্বর কোরে প্রণয়িনীর গৌরব বাড়িয়ে থাকেন, যুবতীর মন প্রকৃষ্টিত করবার নিমিত্ত কবি উক্ত রস প্রাঞ্জল বাক্য-ছটাও অবলম্বন কোরে থাকেন। হামেত কিন্তু

সেরূপ মনযুক্তকর বিচার দীক্ষিত ছিলেন না, কিরূপ স্ততিমিনতি কোরে প্রণয়িনীর স্তব কোত্তে হয়, সে বিজ্ঞা তিনি ভুলেও শিক্ষা করেননি। সে বিজ্ঞা নাই জাহ্ন আর নাই শিক্ষা করুন, হামেত যে মনে মনে খোজেন্তাকে কত ভালবাসতেন, তাঁর কত গৌরব, কত সমাদর কোন্তেন, সেটি তাঁর ভাব-ভঙ্গিমা আর ব্যবহার দেখে স্পষ্ট অনুভূত হইত। হামেত প্রথম প্রথম খোজেন্তার যেরূপ গৌরব, যেরূপ সমাদর কোন্তেন সেই গৌরব, সেই সমাদর ক্রমে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়ে সুস্বাদু কোমল প্রণয়রাগে পরিণত হয়। ইদানীং হামেত জান্তে পেরেছিলেন, তাঁর উপর খোজেন্তার অহুরাগ জন্মেছে, তাই যুবা নিতাই মনে কোন্তেন, আজ আমি অবসর পেলেই খোজেন্তাকে অন্তঃকরণের কথা খুলে বোলবো, কিন্তু যুবতীর কাছ থেকে বিদায় হয়ে যাবার সময় তাঁর সে অন্তরের কথা অন্তরেই নিমগ্ন থাকতো, সাহস কোরে প্রকাশ কোত্তে পাতেন না। হামেতের মনে এই ষ্টুদর হোতে লাগলো, খোজেন্তা যদি তাঁর অহুরাগের সমাদর না করেন, তবে তাঁর বেঁচে থাকা কোন মতেই প্রাণনীয় নয়। কত ভয়, কত সংশয়, কত চিন্তার সমুদিত হয়ে যুবার মন মগ্ন কোত্তে লাগলো, কাল দুর্জ-বনা তাঁকে যেন উন্নত কোরে তুলে, হামেতের মনে যৌর জুষ্টিভার তোলপাড় হোতে লাগল। তাঁর চক্ষে সংসারান্দ্রম কণ্টক-ময় জ্ঞান হোতে লাগল, তাই আর সহ কোত্তে না পেয়ে হামেত শেষে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, আজ আমার মনঃকষ্টের পূর্ণ আহতি দিব, আজ আমি আমার প্রণয়রাতা খোজেন্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেই বোলবো, 'খোজেন্তা! আর আগুন বাড়িও না, আর আমি দগ্ধ হোতে পারি না, তুমি আমার পাণিগ্রহণ কোত্তে অনুমতি কর।' এইভাবে মনে যেমন উদয় হয়েছে, হামেত অমনি জাড়াডাড়া খোজের বাড়ীতে চোলে গেলেন। যে ঘরে সদাগরের কস্তাকে নিতাই একাকিনী বোসে থাকতে দেখতেন,

সেই ঘরে যেমন প্রবেশ কোভে যাবেন, অমনি একটি পুরুষের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে প্রবেশ কোলে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই আবার খোজেন্তার হাত্তরব শুন্তে পেলেন, যুবা অমনি শিউরিয়ে উঠে ধমকে দাঁড়িয়ে গেলেন । তিনি গোপনে কান পেতে শুন্-ছেন, এ সন্দেহ কেউ না কোভে পারে, বিশেষতঃ ঘরের মধ্যে কি কোতুক কি পরি-হাস হোচ্ছে, তাই দেখবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, হামেত সহসা গৃহের মধ্যে প্রবেশ কোলেন, প্রবেশ কোরে দেখলেন, খোজেন্তা একটি দেবকান্তিবৎসুপুরুষ যুবার সঙ্গে কি গল্প কোচ্ছেন, যুবার আকৃতি তিনি কখন পূর্বে দর্শন করেন নাই । হামেত দেখলেন, তাঁকে দেখে খোজেন্তা ঈর্জিতা হয়ে হড়-বড়িয়ে গেলেন, কিন্তু যুবতীর মিত্র তাঁর মধুর মূর্ত্তি আকৃষ্ট কোরে নিষ্ঠুর কোপভঙ্গী দ্বারা অসন্তোষ জানালেন, সহসা গৃহে প্রবেশ কোরেছেন বোলেই অসন্তোষ জানালেন এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখে শুনে হামেতের পণপ্রতিজ্ঞা তত দৃঢ় হয়েও প্রাতঃসূর্য্যের অগ্রে শিশির-বিন্দুর স্রাব তিরোহিত হয়ে গেল । হামেত তখন সেখান থেকে চোলে যাবার মনন কোলেন, খোজেন্তা তাঁর মনঃ-কষ্ট বৃত্তে পালেন । হামেত দেখলেন, বিদেশী পুরুষ তাঁর কণ্ঠে প্রজ্বলিত হয়েছেন, তাই যুবা ওখান থেকে চোলে যান যান, এমন সময় খোজেন্তা উঠে দাঁড়িয়ে মধুর চটায় হাসতে হাসতে বলেন "এসো ভাই হামেত, আমিও মনে ভোচ্ছিলেম তোমায় ডাকতে পাঠাই, আমাদের অতিথি বন্ধু কেসোয়াং খাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়, আমার বড়ই ইচ্ছা । কেসোয়াং খাঁ একজন কান্সীর সদা-গর, তাঁর বড় মন্ব অদৃষ্ট, কাল আমাদের হত-ভাগ্য গিজনি সহরে উপস্থিত হয়েছেন ।" হামেত মনে কোলেন, তবে এ ব্যক্তি দুঃ-বস্থায় পড়ে আশ্রয় লয়েছে, তাই তৎ-কালীন-রাগ-দেব-ভয় বিমূর্ত্ত হয়ে অন্নান-মনে কান্সীর মহাজনের বধেষ্ট সমাদর কোলেন, তাঁর সর্ব্ববাস্ত হওয়ার কথা উপাশন কোরে

বিস্তর আক্ষেপও কোভে লাগলেন, তাঁর যেন নিজের ক্ষতি হয়েছে, এইরূপ হৃৎখ জানাভে লাগলেন । কান্সীর সদাগর হামেতের সকল কথার উত্তর কেবল একবার বাড় নেড়ে সেরে দিলেন, মুখে কোন কথাই বোলে নাই, তার পর আপনার স্থানে গিয়ে বোসে, পূর্ব্বের মতন স্থির প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হয়ে খোজেন্তার সঙ্গে গল্প যুড়ে দিলেন, সে স্থানে যেন তিনি আর খোজেন্তা বই দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না, এইরূপ ভঙ্গি কোরে, চুটুকি চুটুকি গল্প তুলে, আমোদ প্রমোদের, হাস্য-পরিহাসের, অল্পনয়-বিনয়ের মহা আড়ম্বর ফেঁদে বোসলেন, সেগুলি যেন তাঁর হয়ে হামেতের হৃদয় ভেদ কোভে লাগলো । কেসোয়াং খাঁর গল্পের তালভঙ্গ ছিল না, খোজেন্তা শুন্তে শুন্তে তারি মধ্যে যখন একটু ফাঁক পাচ্ছিলেন, সেই সময় "হামেত ! তুমি কেমন আছ, তোমার পিতা কেমন আছেন," এই সকল কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোভে লাগ-লেন । খোজেন্তার অমৃতময় স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে হামেতের মন অনেক সুস্থির হলো সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ভাবনার শেষ হলো না, হামেত তাঁর মনঃকষ্ট থেকে এককালীন অব্যাহতি পেলেন না । যুবা মনের ভাব চাক্‌বার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন কোচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু সে যত্ন সকল কোভে পালেন না । যে নারকের হৃদয় সংশয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর যদি প্রণয়ের প্রতিবাদী থাকে কি তাঁর মনে যদি সন্দেহও হয়, এক জন প্রতিবাদী আছে, কি যদি প্রণ-য়িনীর কাছে সে প্রতিবাদীকে উপস্থিত থাকতে দেখেন, তবে তাঁর মন প্রণয়ান্তিলাবে আরও দ্বিগুণ উন্মত্ত হয়, তাঁর যেন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন তাঁর এইরূপ জ্ঞান হয় । হামেত খোজেন্তার গৃহে পদার্পণ কোরেই মনোহত হয়ে হতবুদ্ধি হতজ্ঞানপ্রায় হন, এক্ষণে কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা সেরূপ নাই, পূর্ব্বা-পেক্ষা অনেক সুস্থ, অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে, শুধু সুস্থস্বচ্ছন্দও নয়, তাঁর মন এখন প্রণয়-রাগে দ্বিগুণ মত্ত হয়ে উঠেছে, তাই যুবা মনে মনে স্থির কোলেন, একবার অবসর

গেলই খোজেন্তাকে তাঁর অন্তঃকরণের কথা-  
গুলি প্রকাশ কোরে বোঝবেন, কিন্তু আজ  
সে অবকাশ পাবার কোন আকার নাই,  
কেসোয়াৎ খাঁর গল্প বান-প্রবাহের দ্বারা মহা-  
ছোড়ে একটানা চলেছে, ভাল ফাঁক যাচ্ছিল  
না, তাঁর ভাবগতি দেখে বোধ হলো না, আজ  
তিনি মনোমগ্ন খোজেন্তার মধুর সম্মুখ থেকে  
ঠঠাৎ উঠে চোপে যাবেন। হামেত দীর্ঘনিশ্বা-  
সের উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন,  
বিশেষতঃ তাঁর কাল-প্রতিবাদী প্রণয়িনীর  
সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস কোচ্ছেন, তাই ভেবে  
আরও ব্যাকুল হোতে লাগলেন, কিন্তু একটি  
কথা মনে পড়াতে অমৃত-বর্ষণ হয়ে তাঁর  
তত ঈর্ষানন্দ মন শান্তিরসে স্নিগ্ধ হলো।  
হামেত বিবেচনা কোলেন, কান্দীর সদা-  
গরের সঙ্গে খোজেন্তার ছুদিনের আলাপ বই  
নয়, তাই তাঁর মনে অনেক সাহস হলো, ঐ  
সাহস নিজের অপর পাশায় রেখে ভাবলেন,  
তবে আর আমি ভয় করি কেন, বরং এখন  
রাগ-দেহ-ভয়কে পরাস্ত কোল্লেম মনে করা  
উচিত। হামেতের বদন আনন্দে ভাসতে  
লাগলো, তাঁর চক্ষু দিয়ে আত্মাদের ছটা  
নির্গত হোতে লাগলো, এখন তিনি প্রফুল্লিত  
হয়ে হুট-মনে আলাপ কোত্তে বোসলেন।  
এ কথা সে কথার পর হামেত একবার মাথা  
তুলে কান্দীর ঘুবার দিকে চেয়ে দেখলেন,  
দেখেই বুঝতে পারলেন, কেসোয়াৎ খাঁ হয়  
তাঁর অন্তঃকরণের কথা জানতে পেরেছেন, নয়  
তাঁর মনের ভাব অনুভব কোত্তে পেরেছেন।  
হামেত দেখলেন, কান্দীর ঘুবা ছুটি কটাক-  
পাত কোরে মনের অন্তোন্মত্ততা ব্যক্ত  
কোচ্ছেন, তাঁর অন্তঃকরণ ক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছে,  
তাঁর পুরুষবৎ চারু কমনীয় মূর্তি এত স্নান,  
এত বিবর্ণ হয়ে পোড়েছে যে হামেত, সে  
মূর্তি দেখতে না পেরে অল্প দিকে চক্ষু  
ফিরিয়ে নিলেন, নিরে মনে কল্লেন, তিনি  
যেন এখন সুস্থ হোলেন।

কালমাক্ এবং কালমাকের দলবল সম্বন্ধে  
গল্প চোল্ছিল, কি উপায়, কি কৌশল কোত্তে  
তারা নিপাত হয়, সেই কথাই হোচ্ছিল।

কেসোয়াৎ খাঁ, যিনি সম্প্রতি তাদের হাতে  
পোড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, রেগে রেগে,  
হেঁকে হেঁকে তাদের গাতিমন্দি দিচ্ছিলেন,  
বিশেষতঃ তাদের সরদার ডাকাতের উপর  
আরও রেগে রেগে বোঁকে বোঁকে উঠে, মহা-  
আফালন কোরে বোল্ছিলেন, “এক দিন সেই  
কাল পাষণ্ডের সঙ্গে তলোয়ারে তলোয়ারে  
সাক্ষাৎ হয় তো ভাল হয়।” আবার আক্ষেপ  
কোরে এ কথাও বোলেন, “কি কোরবো,  
অর্থ নাই, নচেৎ চোনা চোনা জন কয়েক মুষ্-  
চোয়াড় চাকর রেখে দিতেম, তাদের শোয়ে  
ডাকাতদের নির্জনে অন্ধরূপে গিরে মহামারি  
কোত্তেম, তাদের জড়গুজ নিপাত কোরে  
দিতেম।” হামেত নীরব হয়ে শুন্ছিলেন,  
খোজেন্তার ইচ্ছা, হামেত এ কথাই কি উত্তর  
দেন, তাই শুনেন। যুবতীর নিজের কি মত,  
তাই বোলবেন, এমন সময় তাঁর পিতা  
সেখানে উপস্থিত হওয়ার তাঁদের কথাবার্তা  
বন্ধ হলো। হামেত বোলেন, “আমুন, কি  
খবর মহাশয়!”

খোজে। পুত্র! খবর আর কি! মন  
খবর! আজ প্রাতে যখন তুমি বাড়ীর বা-  
হর, তখন তোমার চক্ষুহুটি কোথায় ছিল?”

হামেত অবাক হয়ে খোজের মুখে  
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রোইলেন, ও কথা  
মর্মে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

খোজে। অবাক হয়ে রইলে যে  
বল না? তোমার চক্ষুহুটি তখন কোন্ দিকে  
ছিল? তোমাদের দরজার গায় কালের স্বর  
সেই কক্ষ চেরার চিহ্ন কি দেখতে পাওনি?

“হা! আল্লা! সত্য সত্যই কি তা  
ঘটেছে!” এই কথা বোলে হামেত চীৎকা  
কোরে উঠলেন। “আমরা তো তার কা-  
কোপে পোড়েইছি, এর পর না জানি আর  
কত ব্যক্তিকে তার কোপাগ্নিতে পুড়ে মো-  
হবে! দুর্ভাগ্য কালমাকের কি যম নেই?”

কেসোয়াৎ খাঁ বোলেন, “এটি এর  
অদ্ভুত কাণ্ড, আমি মনে কোরেছিলেম দুর্দ  
দস্যুরা সম্প্রতি আমার কাছ থেকে  
কোরে বা পেয়েছে, তাই লোয়েই তারা কি

কাল সন্ধ্যা থাকবে, আবার যে এত শীঘ্র শীঘ্র নিরীহ গিজনিবাসীদের উপর উৎপাত আরম্ভ করবে, এটি স্বপ্নের অগোচর । হে আল্লা ! এ পাষাণদের যেন নরকে বাস হয় ।” এই কথা বোলতে বোলতে কেসোয়াৎ খাঁর দুই চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগলো, সাধুবৎ ক্রোধে তাঁর সর্বশরীর দিয়ে যেন তেজোরানি প্রদীপ্ত হোতে লাগলো ।

হামেত তাঁর বিষয়চিত্ত পিতাকে সান্ত্বনা করবার জন্য বাড়ীতে যাবেন বোলে উঠে দাড়ালেন, খোদা হাকেমের নামোল্লেখ কোরে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় হোলেন, কিন্তু ঘরের বার হোতে না হোতে, খোজেন্তা দরজা খুলে বাইরে এসে ইশারা কোরে ডেকে বোলেন, “হামেত, একটা কথা বলি, শুনে যাও ।” ছুজনে চোলে গিয়ে একটি কাম্ভার মধ্যে প্রবেশ কোলেন । খোজেন্তা বোলেন, “হামেত !” দেহাই আল্লা ! আজ প্রাতে তোমায় বড় ম্লান দেখেছি, কেন বল দেখি ?”

হামেত বোলেন, “আমি কিছু তখন দর-জার রুম্বা ঢেরা দেখে আসিনি, তবে আমার মন অনরূপ তুর্ভাবনার নিমগ্ন ছিল, আমি মনে কোরেছিলাম, এখানে এসে তুমি একলা আছ দেখতে পাবো ।”

খোজেন্তা । তাই বটে ! তুমি আগায় একলা দেখতে পাওনি সত্য, তাই জন্তেই কি তোমার চেহারাটি তত মলিন দেখলেম ?”

হামেত । আমি দেখলেম, তুমি বেশ আমোদে আছ, তার জন্তে আমি কেন চুঃখিত হতে বাব, চুঃখিত হবার কি সম্বন্ধ আছে ? সে কথা সত্য বটে, কিন্তু খোজেন্তা ! আমি কিন্তু চুঃখিত না হয়ে থাকতে পারেনি না, আমার যেন কেউ ধোরে বেঁধে জোর কোরে চুঃখিত কোলে, তোমার হঠাৎ অন্ত পুরুষের সঙ্গে হস্ত-কৌতুক কোন্তে দেখে, আমার যেন অন্তর্দীপ্ত হোতে লাগলো, প্রাণের ভিতর জলে পুড়ে থাক হয়ে যেতে লাগলো” ।

খোজেন্তা বোলেন, “হামেত ! তুমি তাই

এক রকমের লোক, তবে কি আমি যথেষ্ট ছোটো আমোদ আফ্লাদও কোরবো না ?”

হামেত । কোরবে না ? সে কি কথা ! এ কথা কে বলে ? আল্লা করুন, তুমি কেবল আমোদ আফ্লাদ কোরেই বেড়াও ; তুমি আমোদ আফ্লাদ করবার উপযুক্ত পাত্রী ।”

খোজেন্তা । ভাল, সেই কথাই ভাল, হামেত ! যাই হোক, অতিথিটিকে পেয়ে বড় সুখী হয়েছি, সে কথা আমি আপন মুখেই ব্যক্ত কোছি । আর—”

“সে কথা বোলতে হবে কেন, আমি তা দেখতেই পাচ্ছি,” হামেত হঠাৎ এক কথা বোলে বোলেন, “ঐ দুইটি পদ্মচক্ষু পূর্বে কখনই তত প্রফুল্লিত হোতে দেখিনি তাতেই বেশ জানতে পেরেছি তুমি সুখী হয়েছো, তন্তির সদাগর দেখতেও অতি সুপুরুষ, আর -” খোজেন্তা অমনি বোলেন “তুমি বুঝি মনে কোরেছো, দুদিনের আলাপ হয়েই আমি তার রূপগুণে একবারে চোলে পোড়েছি ? হামেত ! তা নয়, তবে সে ব্যক্তি সভ্য-ভব্য ভাল, তা মিথ্যা কথা বোলবো কেমন কোরে ?” হামেতের যেন অনুমান হলো, এই কথার পরেই একটি মুহূমন্দ গভীর নিশ্বাসপাত হলো । যুবা নায়ক বোলেন, “তার সন্দেহ কি, সে ব্যক্তি বেশ খোস্ আলাপী, বেশ খোস্-মেজাজী ।”

খোজেন্তা বোলেন, “আহা ! সত্যই বটে, তিনি এক জন প্রকৃত উপহিত বক্তা, কথার ছটাও ভাল, তাতে আবার রসও বেশ আছে, সরস উত্তর তাঁর পেটে যেন জাও-য়ানো আছে, স্বভাবও বেশ আয়ুদে, এত যে দুরাবস্থায় পোড়েছেন, তবু তাঁর মেজাজ আমোদের উপরেই আছে । তা বা হোক, হামেত ! আজ প্রাতে তুমি তত মন ভার কোরে ছিলে কেন ? ডাকাতির নিষ্ঠুর অভ্যাসের কথা শুনে সে ব্যক্তি যখন বীরক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছিল, তাঁর চোক মুখ দিয়ে যখন বীরতেজ ফেটে বেরুচ্ছিলো, তখনও তুমি বোবার জায় হততথা হয়ে বোসে ছিলে ! কেন বল দেখি ?”

হামেত বোলেন, “অচেনা কি অজানা লোক কাছে থাকলে আমি সাপধান হয়ে চোলে থাকি, মুখে তত বড়াই কবি না, কিন্তু কাজের সময় সকলের আগে মাথা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।” খোজেন্তা বোলেন, “হামেত ! তোমার এই সন্ধিবেচনার অনাদর কোত্তে পারিনে সত্য, আমি কিন্তু অতিশয় স্নেহঃপূঞ্জ বীরাকালন দখতে বড় ভালবাসি। কেসোয়াৎ খাঁ বেশ এক জন সম্বন্ধা, তাঁর বীরবিক্রমের বাক্য শুনে, তাঁর বীরক্রোধের অজস্রক্রিয়া দেখে, বোধ হয় যেন তিনি কালমাকের সঙ্গে সত্যসত্যই লড়াই কোচ্ছেন, কখনও রণমদে মত্ত হয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে ঠনঠনি কোচ্ছেন, কখন তেজাকালন কোরে বিপক্ষের প্রতি দঙ্গ কড়মড় কোচ্ছেন, একবার যেন দেখছি কেসোয়াৎ খাঁ তলোয়ারখানি এমনি বাগিয়েছেন, বোধ হোলো যেন, এই চোটে কালমাক্ ভুটুকরো হবে, আবার তার পরক্ষণেই যেন দেখতে পাচ্ছি, কেসোয়াৎ খাঁ কালমাকের বীরপ্রহার সম্বরণ কোরে আপনার প্রাণ বাঁচালেন। এইরূপ মুর্তিমান্ অভিনয় অস্তরপটে চিত্রিত কোরে মনে মনে তা দেখতে বড় ভালবাসি। হামেত, এটি যে শুকাও অভিনয়, তুমি তা অস্বীকার কোত্তে পারেন না।”

হামেত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ কোরে বোলেন, “খোজেন্তা ! তোমার চরণতলে ভিন্ন আর যেখানে সেখানে আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই।”

“হামেত ! তাই বটে, কেন বল দেখি ?”

“খোজেন্তা ! উঃ ! এ কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক্, এমন নিষ্ঠুর বাক্য তোমার মুখ দিয়ে বার হওয়াই উচিত ছিল না। বিশেষতঃ আমার কাছে যে,—হামেতের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না, তাঁর গলা যেন বোলে গেল, তখন খোজেন্তার মুখ দিয়েও ‘আর কোন কথা সলো না। হামেত সত্যক-নয়নে যুবতীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে, তাঁর একখানি হাত কোলের উপর রেখে, আস্তে

আস্তে টিপ্তে লাগলেন, টিপ্তে টিপ্তে বোলেন, “খোজেন্তা ! আমি স্তাবক নই, স্তুতি-বাদ কোরে মন যুক্ত কোত্তে জানি না, সে সকল বিদ্বায় আমি নিতান্ত অপটু, কেসোয়াৎ খাঁর মতন আমাতে বাক্পটুতার গুণও নাই, লতা-পাতা কেটে, চিত্র বিচিত্র কোবে, দশ রকম ফল ফুল দিয়ে কথার ডালি সাজ-তেও আমার এসে না, আমার কোনও গুণ নাই বোল্লেই হয়, তবে এক মাত্র হৃদয় আছে, সেই সবে ধন হৃদয় তোমায় দান কোরেছি। আমার স্নেহপূর্ণ, আমার প্রেমপূর্ণ, আমার অনুরাগপূর্ণ হৃদয় তোমায় আমি সমর্পণ কোরেছি। আমি তোমার একান্ত অনুরাগত, একান্ত অনুরক্ত, একান্ত আশ্রিত, তুমি বই আর কাকেও জানি না, আর কাকেও চিনি না। ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, আমি তোমার গুণে মোহিত, আমি তোমার বিস্তর অনুরাগও কোরে থাকি, বেশী কথা বোলবো কি, আমি তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমার ভুলে আমি উন্নত—খোজেন্তা, চোলে যেও না, আর একটু থেকে শুনে যাও”।

খোজেন্তা বোলেন, “হামেত ! আর আমি থাকতে পারিনে।” “আর এক লহমা বই তুমি আমার হবে, কেবল এই আশা মাত্র আমার দিয়ে যাও, আমি যেন এক দিন ‘আমার খোজেন্তা’ বোলে গর্ব কোত্তে পারি ; আর—”

“হামেত ! কাল, কাল, আজ নয়, কাল,—এক্ষণে আমার বিদায় দাও, তার পর সকল কথা খুলে বোলবো, আচ্ছা, তবে আমি চোল্লম।” হামেত বোলেন; “তবে আচ্ছা খোজেন্তা ! এখন যাও, আমার দুঃখেই ভোবাও আর সুখেই ভাসাও, যা হয় কাল তোমার শ্রীমুখের বাক্য শোনা যাবে, আমার এমনি জ্ঞান হোচ্ছে, তুমি অভাবে যেন আমি আর প্রাণে বাঁচবো না।” হামেত বিদায় হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর প্রচাম্পদ পিতার নিকট চোলে গেলেন, খোজেন্তা তাঁর উদাস গৃহে গিয়ে নির্জনে শয়ন কোলেন।

কিছু দিন পূর্বে হোলে, খোজেন্তা বরং প্রফুল্লচিত্ত হয়ে তাঁর মন-প্রাণ সাধুবৎ নিরীহ হামেতের উপর সমর্পণ কোত্তে পাঠেন। যুবতী হামেতের গুণগৌরবের সমাদর, তাঁর সাধুচরিত্রের অমুরাগ বিস্তর কোত্তেন, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীর সগাগরের দেবকান্তি চক্ষে দর্শন কোরেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে তাঁর গুণে মোহিতও হয়েছেন। কাশ্মীর যুবা যুবতীর সংসর্গে সুখী হবার ত কথাই বটে, বরং দিন দিন আরও প্রফুল্লিত হোতে লাগলেন। আবার যুবতীর পক্ষেও যুবার সংসর্গে অল্প আনন্দজনক হয় নাই, সে আনন্দ বালা কারুরি কাছে গোপন কোত্তেন না, যুবতী মনে মনে ভৌল কোরে দেখলেন, কাশ্মীর যুবার বাক্যকৌশলের ছটা অতি মনোহর, অতি মধুর, অতি উজ্জ্বল, শুন্লে জ্ঞান হয় যেন মনের সঙ্গে কথা কোচ্চেন, কি মনের কথা যেন টেনে নিয়ে বোল্চেন। হামেতের কথার ভঙ্গিতে সেরূপ চারু উজ্জ্বল ছটাও নাই, সেরূপ মধুর রসও নাই, না মনের সঙ্গে কথাই কয়, তাও কয় না। তাঁর বাক্যগুলি রসহীন, অতি কটু, রূক্ষ, অথচ জ্ঞানবানের মত প্রাজ্ঞ। বালা গুণের বিচার শেষ কোরে, রূপের বিচার কোত্তে বোসলেন, কেসোয়াং খাঁর সহাস্ত্র বদনের প্রতি, তাঁর চারু মনোহর মূর্তির প্রতি, তাঁর ললিত ভঙ্গিমার প্রতি, নেত্রপাত কোলে মনোমোহিত হয়ে তাঁর রূপকান্দে ধরা পোড়তে হয়। হামেতের শ্রীহাঁদ অতি কদম্বা, না তাঁর রূপই আছে, না লাবণ্যই আছে, দেহটি আবার মানানসই নহে, দেখতে অতি বেচণ, অতি বেড়ৌল, তেমন বেচণ কদাকার চেহারা আর কারুরী দেখা যায় না। কেসোয়াং খাঁর রূপলাবণ্য যেমন নিখুঁৎ, যেমন নির্দোষ, তেমন আবার কারুরই নাই, দেখলে বোধ হয় যেন, তাঁর দেহ ফুড়ে কাস্তির উজ্জ্বল ছটা কেটে বেরুচ্ছে, তেজঃপ্রভার শরীরময় যেন ধক্ধক্ কোরে জল্ছে, বীরোৎসাহ-অনলে সর্কশরীর যেন দীপ্ত কোচ্ছে। বালায় পিতাও কাশ্মীর যুবাফে অভিশয় স্নেহ কোত্তেন,

তাতেই স্পষ্ট জানা ছিল, যুবতী যদি তাঁকে বরমালা প্রদান করেন, পিতার পক্ষ হোতে কোন আপত্তি হবে না, তবে এক্ষণে কথা এই, বালা তাঁকে মালা দান কোরবেন কি কোরবেন না, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করা উচিত কি না করা উচিত? যুবার কি স্বার্থই মম হয়েছে বালা তাঁকে বিবাহ করেন, যদি সেই মনই হয়ে থাকে, তাঁর সঙ্গে কিন্তু ছুদিনের আলাপ বই নয়, এতে কি কোরে আপনার অমূল্যদন হৃদয় দান কোরে, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ কোত্তে পারেন? এই সময় যুবতী আপনা-আপনি বোলে উঠলেন, “তবে স্মৃতরাং সে আশা স্বপ্নের ছলনা মাত্র, সে ব্যক্তি সুপুরুষ বটে, তবে তার মন! অঃ! সেই কথাই কথা! সেই কথাই তো কাজের কথা! আসল কথাই তো সেই! আমি তাঁর অন্তঃকরণের আরাধ্যবস্তু হয়েছি কি না, বোল্তে পারি না, তাঁর অন্তরের কথা আমি কি কোরে জানবো? তাঁকে নিয়ে সুখী হব না, হামেতকে নিয়ে সুখী হব, সে বিষয় আমি স্থির কোত্তে পাচ্ছি না, হামেত কিন্তু আমায় প্রাণের তুল্য ভালবাসেন, অভিশয় স্নেহ করেন, এখন আমি তাড়াতাড়ি কোরবো না, আগে একটু স্থির শাস্ত্র হয়ে বিবেচনা কোরে দেখি।” যুবতী এই সকল কথা তোলাপাড়া কোত্তে কোত্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন, নীচে গিয়ে দেখেন, কাশ্মীর যুবা আর তাঁর পিতা মুখোমুখি হয়ে কি কথাবার্তা কোচ্চেন, খোজেন্তাকে দেখে কেসোয়াং খাঁর মুখ চোখ যেন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগলো।

এখন এই ছুই জনে আলাপ কোত্তে বোসলেন। যুবতীর বিভাবৃদ্ধির প্রভাব দেখে, বালায় মুখে সন্নিচারের কথা শুনে, কাশ্মীর যুবা চমৎকৃত হয়ে গেলেন, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় কল্পিন্‌কালেও তাঁর মনে উদয় হতো না, যুবতী সেই সকল বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তিনি বরং কিঞ্চিৎ শশব্যস্ত হয়ে পোড়লেন। খোজেন্তা খতই সেই সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যুবা ততই যুবতীর রূপ-



গুণের কথা এনে ফেলেন, যুবা ততই রূপের গৌরব, গুণের মহিমা বাড়িয়ে দিয়ে বালাকে ফলিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন। কেসোয়াং খাঁর মনোগত ইচ্ছা যে, কোশল কোরে ঐ সকল প্রস্তাব-প্রবাহের বেগ ফিরিয়ে যুবতীর তোষামোদরূপ শ্রোতের মুখে মিশিয়ে দেন, খোজেস্তা কিন্তু তেমন মেয়ে ছিলেন না। যে প্রশংসার কথা শুনে হঠাৎ মুগ্ধ হন, তাই যুবতী তাঁর প্রশংসায় ভুলে গিয়ে আপনার আশ্রয় পরিভাগ কোলেন না। যুবা কতদূর ধর্মাত্মা সাধু, সে বিষয় মনে মনে স্থির কোরে কাশ্মীরে তাঁর পরিবার-ঘটিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোন্তে লাগলেন, জিজ্ঞাসা করবার সময় সত্য হইলে তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতেছিলেন। যুবতী দেখলেন, তাঁর কথার উত্তর দিবার পূর্বে যুবার মুখশ্রী বিরক্ত ও বিবর্ণ হোতে লাগলো, যুবা বোলেন, “আমার পিতা একজন রাজপারিষদ ছিলেন। যুবতী জিজ্ঞাসা কোলেন, “কাশ্মীরে কি রাজপারিষদের পুত্রেরা সদাগর হয়? এই কি সেখানকার রীতি? কি আশ্চর্য্য! তোমার মত যুবা পুরুষের উচিত যুর্দাবত্তা শিক্ষা করা, সে কথাও বা হউক, তোমার পিতার মৃত্যুর পর তোমার উচিত ছিল রাজদরবারে একটা উচ্চপদে অভিষিক্ত হওয়া।” যুবতীর মুখে ঐ কথা শুনে, কেসোয়াং খাঁ হতবুদ্ধিপ্রায় হোলেন, কি উত্তর দিবেন, ভেবেই অস্থির হোতে লাগলেন, কিন্তু সেই সময় প্রফুল্লিত হবার মত চোক-মুখের ভঙ্গিমা কোরে, মধুর ছটায় হাসতে হাসতে বোলেন, “খোজেস্তা! আমি যে সেপাই কি রাজপারিষদ হইনি, সেটা আমার সৌভাগ্য বোলতে হবে, তা হলে গিজনির সদাগর খোজের মনোমগ্নী কন্যাকে সন্দর্শন কোরে আমার চক্ষু সার্থক কোন্তে পাকেন না, তাঁর অন্তঃকরণে অমধুর কঠোর প্রবণ কোরে কর্তৃত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ কোন্তে পাকেন না।” কোশল কোরে এত চাতুরীভাষা বিস্তার কোলেন, সরল মধুর ভঙ্গিমা কোরে যুবতীর এমনি মান, বাড়াইলেন, খোজেস্তা শুনে লজ্জিতা হোলেন;

তাকে সেখান থেকে উঠে চোলে যেতে হলো, স্তম্ভরাং তিনি আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যুবার স্বরসন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা কোন্তে পালেন না। খোজেস্তার বুদ্ধি-বিবেচনা ভাল ছিল সত্য, পণ-প্রতিজ্ঞাও দৃঢ় ছিল সত্য, সে সবই সত্য বটে, তথাচ তিনি স্রীজ্ঞাতি, তাই আপনার প্রশংসার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হোলেন না, বিশেষতঃ কথাগুলি আবার লগ্নমত বলা হয়েছিল। কিন্তু বাই হউক, যুবতী আপনার চতুরতাগুণে কাশ্মীর যুবার কোশল, তাঁর চাতুরী বুঝতে পেরেছিলেন। সদাগর খোজেস্তার কথায় ধরা পোড়তেম, ধরা পোড়লে তাঁকে অপ্রতিভ হোতে হতো, সেই অপ্রতিভ থেকে বেঁচে যাবার নিমিত্ত যুবা তত আড়ম্বর কোরে যুবতীর মান-গৌরব বাড়াতে লাগলেন, নচেৎ সুদূর তাঁকে প্রফুল্লিত কি পরিতুষ্ট করবার নিমিত্ত তিনি তত আড়ম্বর কোরে তাঁর রূপগুণের প্রশংসা করেন নি, তাই যুবতীর মনে ভয় হলো, তবে বুদ্ধি যুবার প্রকৃতি ভাল না হবে, হয় ত তাঁর কপট স্বভাবই হবে, এই মনে কোরে নিশ্চয় হইলে ভাবতে লাগলেন, তার একটু পরেই খোজেস্তা সে ঘর থেকে চোলে গেলেন।

পরদিন খোজেস্তা ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছেন, জানালার কাঁক দিয়ে গলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন, হামেত কতক্ৰমে আসবেন, এমন সময় খোজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোলেন, পিতাকে দেখে, নেমে গিয়ে, তাঁর সমাদর কোলেন। পিতা বোলেন, “তুমি ওখানে কি কোচ্ছিলে, এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিলে কেন?” যুবতী বোলেন, “হামেতের আসবার কথা ছিল, এই সময় তাঁর আসবার কথা, তবে এখনও এলেন না কেন, তাই ভাবছি। বাবা। আপনি তো জানেন, হামেত কেমন বাকনিষ্ঠ, তাঁর যে কথা, সেই কাজ।” খোজে বোলেন “তা সত্য বটে, সে ব্যক্তির শরীরে আলস্য নাই, তার উপর তোমার কিছু অধিক যত্ন দেখতে পাচ্ছি।”

“বাবা! তা নয়, তবে কথা কি, তাঁর শরীরে যদি গুণ থাকে, আর তাঁর চরিত্র যদি ভাল

২২, তবে তাঁরে যত্ন না কোরবো কেন ? তার চেয়ে ভাল আর কোথায় পাব যে, এরে ফেলে তারে যত্নে কোরবো' ।

খোজে বোলেন “খোজেস্তা ! অমন কথা বোলোনা, ও কথা মুখেও এনোনা, তবে বোলতে পাও, যদি রূপে গুণে সমতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ না হতো, হাঁ ! তা না হলে এক দিন কথা ছিল বটে । সে ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনা, তার দৈর্ঘ্য কাস্তি বরং তোমার অপেক্ষা আরও চমৎকার ।”

যুবতী বোলেন “বাবা ! আপনি কি কেসোয়াং খাঁর কথা বোলছেন ? ” হাঁ সেই কথাই, বোলছি, তাঁর কথা তোমার বোলতে এসেছি, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ কোত্তে বাসনা করেন, সে কথা শুনে আমার মনে বড় আনন্দ হইছে । পুত্র ! তবে হামে-তকে আর মনে করোনা, সে দেখতে চামার মত অতি কদাকার, অতি অসভ্য, অতি মুখ কৌশল চতুরতা কাকে বলে তা সে জানে না, ভদ্রলোকের কাছে দুটো কথা বোলতে হলে, তার কালঘাম বেরিয়ে পড়ে । আমি কাশীর যবার কাছে চোলেম, তুমি তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত আছ এই কথা বলিগে ।”

পিতার মুখে ঐ কথা শুনে খোজেস্তা যেন গাছ থেকে পোড়লেন, বিশেষতঃ কেসোয়াং খাঁ যে, তাঁর পিতার আশ্রয় ধরে বিবাহের প্রস্তাব কোরেছেন, তাই মনে কোরে যুবতী আরও বিস্ময়গ্ৰস্ত হোলেন । যুবতী বোলেন ‘আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন, “যারে আমি স্বামী বোলে বরণ কোরবো, তিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করেন কি না, তিনি আমায় আন্তরিক প্রদা আন্তরিক যত্ন করেন কি না, সে বিষয় আমি আগে জানুবো, তবে গো আমি পানি-গ্রহণ কোত্তে অনুমতি কোরবো, শুধু কথায়, কি শুধু স্তব্ধতিতে ভাল বাসা জানালে সে, ভালবাসা সিদ্ধ নয় ; শুধু মুখে স্নেহ জানালে সে স্নেহ সপ্রমাণ হয় না, সে স্নেহের মূল্য নাই, সে স্নেহের গৌরব নাই । খোজে বোলেন “পুত্র ! সে সত্য বটে, তবে কথা

কি, এ সকল দেখা দস্তুর কথা, আমি তাঁরে কি কোরে বোলবো : তাতো আমি পারুবোনা তবে কৌশল কোরে বলা যাবে । অভিপ্রায় জানানো লয়েই বিষয়, তাই দুটো মিষ্ট কোরে, তোমার অভিপ্রায় তাঁকে জানানো যাবে, তাহলেই তো হলো ? এর পর স্তব্ধতা বুকে তুমি নিজে নয় তাঁকে জানিও তোমার যে পণ প্রতিজ্ঞা তা তাঁকে বোলো, তবে এখন আমি চোলেম’ ।

‘একটু দাঁড়ান, আপনার প্রাচীন বন্ধু খোদাবাদের পুত্র হামেত যে প্রস্তাব কোরে-ছেন ঐ প্রস্তাবের কথা আপনারকে বোলবো মনে কোরেছিলাম’ ।

খোজে বোলেন ‘সে প্রস্তাবে অবশ্যই তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, তা কখনই গ্রহণ করোনি দেখতে পাচ্ছি’ । খোজেস্তা বোলেন, ‘না, বাবা ! তা নয়, আমি তাঁর প্রস্তাবের অনাদর করি না, আমি যে তাঁর গুণগৌরব জানতে পেরেছি, তাই তাঁরে যাত্ৰমান কোরে থাকি, চিরকালই যাত্ৰমান কোরে আসছি ।’

খোজে বোলেন, ‘আগে মান্য কোত্ত, এখন বুদ্ধি স্নেহ কোরে থাক’ ? খোজেস্তা ওকথার কোন উত্তর দিলেন না, তাঁর পিতা খানিকক্ষণ কি বিভ্রিভি কোলেন, তার পর বোলেন ‘খোজেস্তা ! আমি এইমাত্র চাই, যেতুই পাত্র উপস্থিত, তার মধ্যে বাকে বরণ কোত্তে হয়, কর, কিন্তু তাড়াতাড়ি করোনা, স্থির শাস্ত হয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কোরে বরণ কোরে । অতিথি যুবাকে অবকাশ দাও, আচ্ছা, তিন মাস তাঁর ব্যবহার দেখ, তা হলে জানতে পারবে তোমার প্রতি তাঁর কিরূপ মন, হামেতের অপেক্ষা তিনি যদি সর্বাত্মক শ্রেষ্ঠ না হন, তখন না হয় তুমি যারে মন চায় তারে বিবাহ কোরে’ ।

খোজেস্তা বোলেন, ‘বাবা ! তবে সেই কথাই ভাল, আমি আপনার নিকট দিব্যি কোরে বোলছি, তার পূর্বে এ বিষয় স্থির কোরবো না, আপনি এখন কেসোয়াং খাঁকে গিয়ে এই সকল কথা খুসে বলুন, তা

হলে যুস্তো একটা অন্ত্রের দুর্ভার থেকে নিষ্কৃতি পাই' ।

খোজে বোলেন, 'আচ্ছা, আমি তাঁরে ঐ কথা বোলবো। খোদাবাদ বড় মনের অন্ত্রখে আছেন, আমি তাঁকে দেখতে চোলেম, হামেতকেও তোমার অহুয়াগের বিষয় জানাবো ।'

এই কথা বোলে খোজে চোলে গেলেন, খোজেস্তা একাকিনী বোসে চিন্তা কোত্তে লাগলেন। যে বিষয় শরনে স্বপনে তাঁর মনে জাগছে, সেই বিষয়ের চিন্তা কোত্তে লাগলেন। খোদাবাদের বিপদের কথা শুনে ভাবলেন, তবে বুঝি সেই জন্তেই হামেত আজ আস্তে পারেন নি, বোধ হয় তাঁর পিতা কি কোব্বেন না কোব্বেন, তাঁকে শোয়েই তারি একটা পরামর্শ কোচ্ছেন। খোজে কাশ্মীর যুবাকে আপনার কত্কার কথাগুলি বোলে বাহিরে চোলে গেলেন। কাশ্মীর যুবা তাঁর প্রণয়ের প্রতিবাদী হামেতকে চাষা, গোয়ার, মুখ বোলে রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে, গালাগালি দিতে লাগলেন, কিন্তু তবু তিনি নৈরাশ হোলেন না, মনে মনে সাহস বাধলেন। ভাবলেন, হামেত অতি মুখ, অতি চাষা, না ক্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, না বিজ্ঞাই আছে, না বুজ্জিই আছে, তবে আর তাকে ভয় কোত্তে যাবো কেন? আমি দশটা ফোঁপার দালালির কথা বোলে, পাঁচ রকম চালাকি দেখিয়ে, যুবতীকে প্রফুল্লিত কোত্তে পারবো, তার মনও যুজ্জ কোত্তে পারবো। হামেত বাতে উদাস অন্ধকারে চাপা পড়ে তা কোও হবে। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনার দৌড় বেশ আছে সত্য, তা আছে আছেই, তখাচ স্বীলোক বই নয়, স্বীলোকে মন ভুলে যেতে কতক্ষণ। একটু সলিয়ে কোলিয়ে ছুট অহুনয় বিনয় কোল্লো পাঁচটা মন যোগান কথা বোলো, দশ রকম শূন্যসি ঠাট্টার আমোদ কোল্লো, যুবতীর মন অনারাসেই ফিরে দাঁড়াবে।

খোজে গিয়ে শুন্লেন, তাঁর বন্ধু খোদাবাদ বাড়ীর ভিতর একটি নির্জন কামরার একলা

চুপটি কোরে বোসে আছেন, পাছে কোন গতিকে কালমাকের কালপত্র তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোচ্ছেন না। খোজের কিন্তু যাবার নিষেধ ছিল না, তিনি গিয়ে সান্ত্বনা কোরে বোলেন, হয়তো সে পত্র আদৌ পৌঁছিবেনা, তবে যে দরজার গায় কুম্ভ চেরা দেখতে পেয়েছেন, তা বোধ হয় কতকগুলি নিষ্কণ্ডা চেকড়া বালকেরা ভয় দেখাবার নিমিত্ত ঐরূপ চিত্র কোরে রেখেছে, নচেৎ ডাকাত দ্বারা কখনই তা হয়নি। এই রকমে অনেক বুঝিয়ে শেষে বোলেন, হয়ে থাকেতো হয়েছে, তার আর চারা কি, ভাবনা চিন্তা এখন ছেড়ে দাও, আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার সময় আজ আমার বাড়ীতে খাবে, হামেতকেও যেতে হবে, ভয়ে ভাত পা ছেড়ে দিয়ে ওরূপ কোরে হা হতাশ কোল্লো আর হবে কি, বিশেষতঃ যে ভয় কোচ্ছো, সে ভয় সত্য কি মিথ্যা তারি বা ঠিকানা কি। খোদাবাদ মূঢ়াত্মা হয়ে একেবারে মুখের উপর বোলেন, "না, আমি যাবনা, আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবনা"। কিন্তু খোদাবাদ তাঁর প্রাচীন বন্ধুর প্রফুল্ল মূর্তি দেখে, তাঁর মুখে সাহসের কথা শুনে, তাঁর মনের অপ্রফুল্লতা কতকদূর হলো, তাই শেষে বোলেন, তোমার বাড়ীতে না হয়ে আজ আমার বাড়ীতেই উদযোগ হোক। তুমি, তোমার কত্কা, আমাদের অতিথি বন্ধু, আজ আমার বাড়ীতে সাময়িকালে আহাির কোরবে, আমি আরও জন কয়েক বন্ধু বান্ধবকে আহ্বান কোব্বো, খোজে বোলেন, তবে তাই ভাল, তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, এই কথা বোলে হামেতের ঘরে চোলে গেলেন। সেই একান্ত প্রণয়ময় যুবা খোজেস্তার অভিপ্রায় শুনে হঃখে নিমগ্ন হলেন। তিনি মনে কল্লেন, খোজে কাশ্মীর যুবার অহুকুল পক্ষ বোলেই এই বিপদটি ঘটবে। হামেত ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে স্থির কোল্লেন, খোজেস্তার প্রতি পূরীপেক্ষা আরও অধিক যত্ন, আরও অধিক অহুয়াগ দেখাবেন। যুবা

অন্তরে জানতেন, তাঁর প্রতি খোজেন্তার প্রদা-  
ভক্তি ভাল রূপই আছে । হাযেতের উদাস-  
ভাব দেখে খোজে অসন্তুষ্ট হোলেননা, তিনি  
ওখান থেকে বিদায় হয়ে একবার সহর  
বেড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলেন ।

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

“বড় বাড়ীলৈ ঝড়ে ভাঙ্গে ।”

খোদাবাদের বাড়ীতে আহ্বান হয়েছে  
শুনে কেসোয়াং খাঁ মনে মনে ভারি দুঃখিত  
হলেন, দুঃখে ঘেন মোরে গেলেন । খোজেন্তা  
যুবর প্রফুল্লিত কোমল বদনের স্নানভঙ্গীয়া  
দেখে, বালা মনে কোলেন, যুবা খোদাবাদের  
নিমন্ত্রণে যাবেন না, তাই একটা ওজর তো  
কোত্তে হবে, কি ওজর করবেন তাই ভাব-  
ছেন । বালায় কিন্তু এ অহুমান ঠিক হয়নি ।  
যুবর নিমন্ত্রণে যাবার অনেক হেতু ছিল,  
তাকে সেখানে যেতেই হতো, তাঁর প্রতিবাদী  
যদি সেখানে উপস্থিত না থাকতেন, এ নিমন্ত্রণ  
পেয়ে বরং তিনি আরও প্রফুল্লিত হতেন ।  
কেসোয়াং খাঁ বোলেন, “খোজেন্তা ! আজ  
সন্ধ্যাকালটা কি কোরে কাটানো যাবে,  
আমাদের দুটো আমোদ আছ্লাদ করা কি  
কোরে হবে” । খোজেন্তা বোলেন, “কেন ?  
আমিও তো সেখানে যাবো, তুমি তো  
বোলেছো, হেজে যাক্, পুড়ে যাক্, মজে যাক্,  
তার ক্ষতি নেই, আমি মাত্র তোমার কাছে  
থাকি, তা হলেই তুমি প্রফুল্লিত হবে, এ কথা  
না হবে তো তুমি আমার হাজারও বার  
বোলেছো, তা ছাড়া তুমি আরও কত কথা  
বোলেছো, তুমি আর কিছু চাওনা, আমার  
দেখতে পেলেই সুখী হও” ।

কেসোয়াং খাঁ বলেন, “সে কথা তোমিখ্যা  
নয়, তার এক তিলও মিথ্যা নয় । তুমি  
সেখানে যাবে আমি তা জানি তুমি মনে  
কোরো না, আমি তা জানিনে । তোমার

সেখানে দেখে আমি সুখী হবোনা সেটাও  
মনে কোরোনা, তবে—”

খোজেন্তা বোলেন, “তবে, আমার  
সেখানে অষ্টপ্রহর দেখতে পাবেনা, তাই বুঝি  
তোমার মনে অসুখ হচ্ছে ? কেমন এই  
কথা না ।।

কেসোয়াং খাঁর মুখে আর কথা নাই,  
খোজেন্তা বোলেন, “কেমন এই কথা তো  
বটে ?” যুবা ঝড়নেড়ে সাব্ব দিলেন ।  
খোজেন্তা বোলেন, “সেটা তোমার উপরেই  
নির্ভর কোছে, তুমি যদি মাথা হেঁট কোরে  
বোসে রও, চোক মুখ ভার কোরে, মুখ অন্ধ-  
কার কোরে থাক, তবে তোমার নিকটে  
আমার যেতেই ভয় হবে, তা হলে কাজে  
কাজেই যেখানে আমোদ আছ্লাদ দেখতে  
পাবো, সেইখানেই যেয়ে বোসবো । মনে  
কোরেছি আজকের দিনটা বন্ধুর বাড়ীতে  
খুব আমোদ আছ্লাদ কোরবো ।”

কাশ্মীর সদাগর বোলেন, “তা যথার্থই তো  
বটে, না কোরবেই বা কেন, আমি দুঃখিত  
হোয়েছি বোলে তুমি আমোদ আছ্লাদ  
কোরবে না একি একটা কথা, আমি কি  
এতই হাবা যে, বুঝতে পারিনে ! আমি যতই  
দুঃখিত হই না কেন তার জন্তে তোমার  
আমোদ প্রমোদের বাধা হবে কেন ?”

খোজেন্তা কিঞ্চিৎ রাগত হয়ে বোলেন,  
“কি বালাই, আমি কি ছাই, তাই বোলছি !  
আমার কথার মর্ম তা নয়, যে সাধ কোরে  
মিছামিছি দুঃখিত হয়, তার দুঃখে দুঃখিত  
হব কেন ? যার দুঃখের প্রকৃত কারণ থাকে,  
তার দুঃখে দুঃখিত হোতে পারি, তার গলা  
ধরে কাঁদতেও পারি, কেঁদেও থাকি এ  
কথা তোমার কতবার বোলেছি । কেসো-  
য়াং খাঁ যুবতীর দুখানি হাত ধোরে বোলেন,  
“খোজেন্তা ! জীজাতির মধ্যে তুমি একটি  
বুড়, তুমি আমার ক্ষমা কর, তবে একটি  
কথা আমার আছে,—আমার কি সেখানে  
অসুখের কোন কারণ নাই ? হামেত কি  
সেখানে উপস্থিত থাকবেন না ?”

খোজেন্তা বোলেন, “থাকবেন না কেন ?

অবশ্যই থাকবে; কিন্তু তাই বোলে ভূমি দুঃখিত হবে কেন? যাও! ও সকল কথা ছেড়ে দাও! এখন নিমন্ত্রণে যাবার উদ্দেশ্যে কর, এ তো নিমন্ত্রণ নয়, তোমার পক্ষে বাধ দেখতে পাচ্ছি। আমার কথা যদি মানো, তবে শুন বলি, এ নিমন্ত্রণে তোমায় দুঃখিত হোতে হবে, এমন ক্রটি আমা হোতে হবে না।” এই কথা বোলে, মধুর ভঙ্গিতে একটু মুচ্কে হেসে, যুবতী সে ঘর থেকে চোলে গেলেন। কেসোয়াং খাঁ উঠে আপনার ঘরে গিয়ে পায়েচারি কোন্ডে লাগলেন। নিমন্ত্রণে যাবার জন্ত তাঁকে ততটা যত্ন করবার আবশ্যক ছিল না, আপনার তাড়াতেই, তাঁকে সেখানে যেতে হতো। সন্ধ্যা হলো, নিমন্ত্রণে যাবার সময় উপস্থিত, কাশ্মীর ধূবা খোদাবাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, যে যার স্থানে গিয়ে বোসেছেন, একদল তায়ফাওয়ালী দেখে তাঁর মন অনেক সুস্থ হলো। নাচওয়ালীরা মনোহর ভঙ্গীতে ভোজদাতাকে সেলাম কোরে তাঁর সঙ্গে কথা বার্তা কহিতে লাগলো,—ভোজদাতা ভীত হয়েছেন শুনে, তাঁর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তারা অনেক আক্ষেপ কোন্ডে লাগলো, মুখে আবার সাহসও দিতে লাগলো। আল্লা না করুন তেমন ঘটনা হয়। বোধ হয় পাষাণ ডাকাতেরা আর কোন উচ্চবাচ্চ কোরবে না, ঐ কৃষ্ণ চেরা দিয়েই খতম হবে।

খোদাবাদ মনের সাধ মিটিয়ে, যা মুখে আসছিলো, তাই বোলে গালাগালি দিতে লাগলেন। সে স্থানে আরও অনেকগুলি সদাগর উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে কেসোয়াং খাঁর পরিচয় দিয়ে দিলেন, যুবায় দুঃখের কাহিনী শুনে, তাঁরা অনেক দুঃখ জানাতে লাগলেন, তাঁকে গিজ্জিতে বাস করাবার নিষিদ্ধ বিস্তার যত্নও কোন্ডে লাগলেন। সদাগরেরা বোলেন, “বাণিজ্য ব্যবসারের তো এক প্রকার অপ্রবাহই হোয়ে পড়েছে, তখাচ যা কিছু লাভ ভাব আছে, তাতেই কোনমতে জলাহার কোরে দিনে নির্ভাহ হতে পারবে,” এই কথা বোলে সেই

লাভ ভাবগুলি মুখে মুখে যেন দেখিয়ে দিলেন। সদাগরদের মুখে কল্যাণ প্রার্থনার কথা শুনে, কেসোয়াং খাঁ আপনার কাছে জ্ঞান কোরে বোলেন, “এর পর আমি কি কোরবো, কোথায় যাবো, সে কথা আমি এখন নিশ্চয় কোরে বোলতে পাচ্ছি, মনে মনে একটা অভিপ্রায় আছে, সেই অভিপ্রায়ের উপর আমার অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে।” এই কথা বোলে, একবার আড়চক্ষে খোজেস্তার দিকে চেয়ে দেখলেন, খোজেস্তা তখন অবগুষ্ঠনবতী হোয়ে হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্ছিলেন। তত লোকের মধ্যে ঘোমটাটি তাঁকে যত্ন কোরে রাখতে হোয়েছিল।

খোজেস্তা একবার কাশ্মীর যুবায় প্রতি ফিরে চেয়ে, আবার হামেতের সঙ্গে কথা কহিতে লাগলেন, হামেতের দিকে কেসোয়াং খাঁ একবার ঘণার ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত কোলেন, হামেত কিন্তু সেটি লক্ষ্য কোন্ডে পারেন নি। আমন্ত্রিতেরা কারুচোপের বিছানার উপর জড়াও বুটিদার তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘর যুড়ে বোসে গিয়েছেন। কাফি আর আলবোলা এসে পোড়লো, নাচ আরম্ভ হলো। খোজেস্তা হামেতের খুড়ির পাশে গিয়ে বোসলেন, সেখানে আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলেরি মুখাবয়ব ঘোমটার আবৃত। স্ত্রীলোকেরা অবগুষ্ঠনবতী হোয়ে আপনার আপনার বাড়ীর মোজ্জলিসে গিয়ে বসা সে দেশের রীতি। কাশ্মীরধূবা ভোজদাতার দক্ষিণ দিকে বোসেছিলেন, নানা প্রকার হস্তপরিহাসের আমোদ চোলে ছিল, তাতে বোধ হলো যুবা বেশ প্রফুল্লচিত্তেই আছে, তাঁর খোজেস্তা একটু দূরে বোসেছিলেন সত্য, কিন্তু হামেতেরও নিকটে ছিলেন না, তাই দেখে তাঁর মনে আর কষ্ট হলো না। তায়ফাওয়ালীর প্রথমবারের যুক্তরো শেষ হয়ে গেলে, স্ত্রীলোকেরা যে যার বাড়ী চোলে গেলেন, পুরুষেরা খানিক রাত পর্যন্ত আমোদ আলাদা কোন্ডে লাগলেন। খোদাবাদ তামাকের নিম্বকি নেশায় প্রফুল্লিত হোয়ে, নাচগাওয়ার আমোদে যেতে

উঠলেন, তখন সেই অপরাহ্ন কালকৃষ্ণ  
ঢেংগার কথা একেবারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন,  
একদল ডাকাত আছে যে, সে কথাও ভুলে  
গেলেন, তখন শুধু “বাহবা, ক্যাথুব, আচ্ছি  
পাখি হ্যার” মুখে কেবল এই বোল লেগেছিল ।  
খুসি খোবুরামির, হাসি ঠাট্টার হোবুরা উঠতে  
লাগলো, আমোদ প্রমোদের তুফান চোলতে  
লাগলো, অনেক রাত পর্যন্ত মজলিসের গঠরা  
চলেছিল, তারপর ভেঙ্গে গেল । খোদাবাদ  
সদরদরজার দাঁড়িয়ে বন্ধুদিগকে সমাদরের  
বিদায় কোব্বেন বোলে চাকরকে বোলেন,  
“আমার জুতো নিয়ে আয় ।” জুতো, যেমন  
পায় দিতে যাবেন, এক পাটী জুতোর মধ্যে  
পা ঢুকলো না, কিসে যেন বেধে বেধে যেতে  
লাগলো, তাঁর, ক্রীতদাসকে ডেকে বোলেন,  
“দেখতো জুতোর মধ্যে কি ঢুকেছে ।” সে  
বালকটী তখন তার ভিতর থেকে এক খানি  
চিঠি টেনে বার কোলে, তার খামের উপর  
কৃষ্ণচেরা অঙ্কিত রয়েছে সকলে দেখতে  
পেলে । খোদাবাদ ঐ কালচিহ্ন দেখে অমনি  
মুচ্ছিত হোয়ে গদির উপর পোড়ে গেলেন,  
হামেত আতকে কাঁপতে লাগলেন, বাড়ীময়  
হাহাকার পড়ে গেল, চারিদিকে মহা গণ্ডো-  
গোল বেধে উঠলো । অনেকক্ষণের পর  
খোদাবাদের চৈতন্য হলো, মাথা তুলে চেয়ে  
দেখেন হামেত অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন,  
খোজের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, তাই দেখে  
হতাশ হয়ে আবার মুচ্ছিত হবার মত  
হোলেন । হামেত বোলেন, “এখন কি করা  
কর্তব্য ।” কারও মুখে কথাটি নাই, কেসো  
রাংখা সকলকে নীরব দেখে বোলেন,  
“আমার মত, হয় পত্রখানি পুড়িয়ে, নয় ছিড়ে  
ফেলে দেওয়া হয়, তাই কোরে আর ওবিষয়  
মনে কোবো না । খোদাবাদ বোলেন, “ছিঁড়ে  
কি পুড়িয়ে ফেলে কি দণ্ড হবে, তা নাকি  
তুমি অবগত নও, তাই অমম কথাটা হঠাৎ  
বোলে ফেলে, কালমাকের হুকুম আমি মাথায়  
কোরে বোইবো, তা না কোরেই বা করি কি.  
নচেৎ জীবনটিকে গুনগারি দিতে হবে ।  
হামেত ! পত্রখানি খুলে পড়, আমি শুনতে

প্রস্তুত আছি, আমার মনে এখন বল হয়েছে,  
কি লিখেছে শুনে ভয় পাবো না ।

পত্র ।

“খোদাবাদ সদাগর !”

“এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পর তৃতীয় রাজে  
পাঁচ হাজার থান মোহর পৌছিয়ে দিবা, চারি  
পর্কতের নিকটে যে প্রাক্তর আছে, ঐ প্রাক্তর  
মধ্যস্থিত ভগ্ন মসীদে পাঠাইয়া দিবা । যে  
ব্যক্তি অর্থ লইয়া আসিলে, সে যেন বিশ্বাসী  
পাত্র হয়, তাহার যদি প্রানের মায়া থাকে, সে  
যেন একালা আইসে । দেখিও ! খবরদার !  
পত্রের অপমান না হয়, তা যদি হয়, তবে  
কালমাকের ঘোর দণ্ড স্বরণ করিও ।” খোদা-  
বাদ টাকার দাবি শুনতে প্রস্তুত ছিলেন সত্য,  
কিন্তু পাঁচ হাজার থান মোহর অল্প অর্থ নয়,  
সদাগর মনে করেন নি তাড়া তত অসম্ভব  
দাবি কোববে, তাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে  
বোলতে লাগলেন, “বন্ধু ! আমার সর্বনাশ  
উপস্থিত, এইবার মোজ লেম, মনে প্রাণে  
মোজ লেম, কি সর্বনাশ ! দুটাকা নয়, দশ  
টাকা নয়, পাঁচ পাঁচ হাজার থান মোহর  
আমায় দিতে হবে, তবে আর আমার বাঁচতে  
হবে না, এইবার আমার অদৃষ্টে মৃত্যু  
লিখেছে ।” কেসোয়াং খাঁ বোলেন, “এ দাবির  
টাকা কি না দিলে চলে না ? কোশল কোরে  
কি এ দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না ?”  
খোদাবাদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোলেন, “না  
ভাই, তার কোন উপায় নেই, টাকা না  
দিলেও মস্তে হবে, দিতে গেলেও মস্তে হবে,  
সমানই কথা, মৃত্যু ছাড়া ছাড়ি নাই ।” খোজে  
বোলেন, “তবে এখন উপায় কি, কি করা  
কর্তব্য ।” কেসোয়াং খাঁ বোলেন, “তবে টাকা  
কোরে দশজন মিলে টাকাটা দেওয়া যাক,  
আপনি আমার নামে চাঁদা করে, যে টাকা  
সংগ্রহ কোরেছেন, তার মায়া আমি অগ্নান  
মনে পরিত্যাগ কোতে প্রস্তুত আছি, তাই  
মাত্র আমার পুঁজি, আর সম্বল আমার কিছুই  
নাই, তবে আপনারা যা দিবেন, তার উপর  
ঐ টাকা দিলে কথঞ্চিৎ উপকারে আসতে  
পারে ।”

খোদাবাদ কেসোয়াং খাঁর এক খানি হাত চেপে ধোরে বোলেন, “বিদেশী বন্ধু! আপনার অতি মহৎ অন্তঃকরণ, আপনার অতি উদার স্বভাব, আপনি তো যথাসর্বস্বই বিসর্জন দিয়েছেন, তার পর চাঁদা কোরে যা বৎকিঞ্চিৎ পেয়েছেন, তাও আবার আমার কেড়ে নিতে অহুমতি কোচ্ছেন, আল্লা-না করুন আমার সে প্রবৃত্তি হয়, আপনার যা বৎকিঞ্চিৎ আছে, তা আপনারই থাক, আমার তো আরও দশজন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা অবশ্যই আমার কৃপা কোরবেন”। খোদাবাদ অর্থের শোকে মতিচ্ছন্নপ্রায় হওয়ায় তাঁর বুদ্ধির ভ্রম জন্মে, তাই তিনি মনে মনে চাঁদার আশা কোলেন, সে আশায় কিন্তু বঞ্চিত হোতে হলো, যারা যারা তাঁর বাড়ীতে খেতে এসেছিলেন, ঐ চাঁদার কথা শুনে একটি একটি কোরে সকলেই আস্তে আস্তে সোরে পোড়লেন, শেষে খোদাবাদ, তাঁর পুত্র হামেত, খোজে আর কেসোয়াংখাঁ এই চারিটি মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট রইলেন, এখন তাঁদের বিচার বিবেচনায় যা ভাল হয়, তাই কোত্তে হবে। কাশ্মীর যুবা অভ্যাগতদিগের অভ্রাতৃক আচরণ দেখে অতিশয় রাগত হোলেন, যুবা একান্ত মনে কোরেছিলেন, তাঁরা অনেক টাকা চাঁদা দিবেন, খোজে কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে এই কথা বোলেন, “তাঁরাও ভয়ে কাপছেন, না জানি কবে আবার তাঁদের উপরেও তৃষ্ণাতুর অতৃপ্য কাল্মাকের দাবি এসে চেপে পোড়বে। হয়ত আজ বাদে কালই তাঁদের মধ্যে কাহারও তলব হোতে পারে”। কাশ্মীর যুবা পুনরায় খোদাবাদকে বোলেন “আমার যা কিছু আছে আপনি গ্রহণ করুন”। তাঁর টাকা গ্রহণ কোত্তে খোদাবাদের প্রবৃত্তি হলো না, তাই তিনি বোলেন “তোমার টাকা কড়ি দিতে হবে না, এখন করি কি বরং তারি একটা ভাল পরামর্শ দাও”। কেসোয়াংখাঁ বোলেন, “আমিতো দস্যুদের বিষয় কিছুই অবগত নই, তাই তাদের সম্বন্ধে কোন পরামর্শ আমার দেওয়াই উচিত নয়। তা যাই হোক

একটা পরামর্শ এই আছে, আগে টাকাটা না পাঠিয়ে জন কয়েক বিদ্বাসী লোক সেই ভগ্নমন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া যাক, তারা যদি পাঁচ কথা বোলে কোরে, দশটা অহুনয় বিনয় কোরে, টাকার দাবিটা কমাতে পারে তো ভাল হয়, এর জন্তে তাদের যদি হাতে ধোত্তে হয়, পায় ধোত্তে হয়, তাও করা উচিত, তাতেও যদি কার্য সিদ্ধি না হয়, তবে টাকাটা সংগ্রহের নিমিত্ত আরও যদি কিছু সময় বাড়িয়ে দেয়, তা হলেও হানি নাই”।

খোজে বোলেন, “তবে এই পরামর্শ ভাল, হাসেনের কথা কি স্মরণ নাই? সে তো আর অধিক দিনের ঘটনা নয়, ডাকাতেরা তাঁকে অনেক টাকা ছেড়ে দিয়েছিল।” কেসোয়াংখাঁ বোলেন, “কে গেছিল? কাকে পাঠিয়েছিল?”

খোজে বোলে, “তার পুত্র গিয়েছিল।” খোদাবাদ হামেতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, হামেত যাবেন বোলে তখন প্রস্তুত হলেন। খোদাবাদ বোলেন, “হামেত! তুমি বড় সন্মানশ বালক, তোমার বড় উদার অন্তঃকরণ।” কেসোয়াংখাঁ বোলেন, “হামেত! তুমি বড় সুপুত্র, তোমার বড় পিতৃভক্তি, তবে যাও, গেলেই কার্যসিদ্ধ হবে। খোজে বোলেন, “ভয় করোনা, আল্লা তোমায় রক্ষা কোরবেন, নির্ভয়ে চোলে যাও, নিরঙ্কিমে ফিরে আসতে পারবে, তবে যাও।” হামেত বোলেন, “ভয় কোত্তে যাব কেন, আমার প্রার্থনা যদি না শুনে, নাই শুনবে, ঐ রাজ্যেই চোলে এসে আবার ঐ রাজ্যেই টাকা পৌছে দেবো”। ঐ কথা শুনে খোদাবাদ শোকে গৌঁ গৌঁ কোরে গোলরাতে লাগলেন, কেসোয়াংখাঁ মুক্তকণ্ঠে হামেতের শুণাছুবাদ কোরে বোলেন, “ডাকাতেরা অবশ্যই তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ কোরবে, কার্যসিদ্ধ অবশ্যই হবে, তার কোন সন্দেহ নাই।”

খোজে বোলেন, “তবে এই কথাই হিঁর, আরো এখন বিদায় হোলোম, সেই তৃতীয় দিনের রাজ্যে এসে পুনরায় সাক্ষাৎ কোরবো, সহরের সদর দরজা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে



যাবো, তার পর তুমি চোলে বেণু, আমরা বিদায় হয়ে কিরে আসবো।”

খোজে আর কেসোয়াং খাঁ পথে বোলতে বোলতে চোলেন, “খোদাবাদের বড় ত্রাস হয়েছে, হোতেই পারে, হবারি কথা, হামে-তের বেশ পিড়ভক্তি আছে; সে ব্যক্তি প্রশংসার ভাজন বটে।” কেসোয়াং খাঁ বোলেন, “আপনারা এমন ভয়ানক বিপদাপন্ন স্থানে কি কোরে বাস কোচ্ছেন, আপনাদের তো ভরসা কম নয়, খোজেস্তা যদি আমার মাল্যদান করেন, তবে কতই সুখী হই, এই ঘণিত সহর পরিত্যাগ কোরে সকলে কাশ্মীরে গিয়ে বাস করি, সেখানে গিয়ে স্বচ্ছন্দে নিরুদ্ধেগে দিনপাত কোত্তে পারি, আমার প্রতি সদয় হবার নিমিত্ত আপনি বেশ একটু যত্ন পাবেন, খুব পেড়াপেড়ীও কোরবেন।” খোজে বোলেন, “বড় দুঃখের বিষয় যে, আমি আপনার এ অল্প-রোধটি রক্ষা কোত্তে পারবো না, আমার সে ক্ষমতা নাই; বালা কারে স্নেহ করেন, কারে না করেন, আমি তার কিছুই অবগত নহি, অবগত হোতেও চাই না, তুমি যেমন চেষ্টা কোচ্ছো, করো, হয় ত তোমারি মনোরথ পূর্ণ হবে।” আর কোন কথা না হয়ে তাঁরা বাড়ীতে পৌছিলেন; খোজেস্তা চোলে এলে খোদাবাদের বাড়ীতে যে যে কাণ্ড হয়েছে, পরদিন প্রাতে খোজে কতকো তথ্যবৎ অবগত করালেন, কেসোয়াং খাঁও তৎকালীন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, ডাকাতদের গুপ্ত আবাসে হামেত একলা যাবেন স্থির হোয়েছে শুনে, খোজেস্তার মহাপ্রাণী কঁপে উঠলো, যুবতীর মুখাবয়ব বিবর্ণ হলো, কাশ্মীর-মুবা সে ভাবটি লক্ষ্য কোলেন। যুবতী মুখে মাত্র এই কথা বোলেন, “হামেত বড় সদাশয়, তার বড় মহৎ স্বভাব, আল্লা তাঁর মানন পূর্ণ কোরে নির্কিয়ে যেন গৃহে এনে পৌছে দেন, ঘরের ছেলে ঘরে এলেই সকল দিক্ রক্ষা হবে।” খোজে বোলেন, “সে নির্কিয়ে কিরে আসবে, তার সন্দেহ নাই, কালমাক্ অর্থ চায়, সে রক্তপাত কোন্ডে চায় না, বিশেষতঃ আজ-কার বাজারে মুখ দিয়ে বাদ কোত্তে না

কোত্তেই তত অর্থ কখনই পাবার আশা করে না, ভা কি সে বুঝে না, না, জানে না।”

খোজেস্তা চোলে গেলেন, যাবার সময় একবিন্দু অশ্রু তাঁর গণ্ডবেয়ে গোড়িয়ে পড়লো, কেসোয়াং খাঁ সে অশ্রুবিন্দুটি দেখতে পেলেন, তাঁর পক্ষে ঐ অশ্রুবিন্দুটি অগাধ জানদাতার স্বরূপ হলো। কেসোয়াং খাঁ যেন তা দেখতে পাননি, এইরূপ ভাণভজিয়া কোলেন, তার পরেই হামেত সেখানে উপস্থিত হোলেন, খোজেস্তা তাঁর আসবার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, “এখনও এলেন না কেন, এখনও এলেন না কেন” বোলে মনে মনে বাস্তব হোচ্ছিলেন, এক্ষণে হামেতকে দেখতে পেয়ে, আপমার ঘরে নিয়ে গেলেন। কেসোয়াং খাঁ হামেতকে সদর দরজা দিয়ে আসতে না দেখে বিশ্বয়াপন্ন হোলেন, হামেতকেমন আছেন, তাঁর সব মঙ্গল তো, এই সকল কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে তাঁর ঘরে প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজেস্তা তাঁর প্রতিবাদীর বৃকের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছেন, তাই দেখে তাঁর মনে কিরূপ কষ্ট হলো, পাঠক তাহা আপনিই অনুভব করুন। কেসোয়াং খাঁ তাই দেখে একেবারে জলে পুড়ে উঠলেন, তাঁর মনে যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিলে, অন্তর্দাহে ছটফট কোত্তে লাগলেন, খোজের কাছে গিয়ে চীৎকার কোরে বলেন, “এ দিকে কি কাণ্ড, কি কারখানা হোচ্ছে, আপনি এসে একবার চক্ষে দেখুন, আমি যে আপনার জামাতা হবো, তার আর আকার কই, তার আর আশাই বা কি আছে।”

খোজে হুপা এগিয়ে গিয়ে, তাঁর অতিথির চিত্তমানকর অভিনয়টি চক্ষে দর্শন কোলেন, কেসোয়াং খাঁর প্রার্থনা খোজেস্তা গ্রহণ কোরবেন বোলে, তাঁর মনে যে আশা ছিল, এই কারখানা দেখে সে আশা তখনি তিরো-  
হিত হলো। হামেতকে মনে মনে কত ভাল-বাসতেন, খোজেস্তা পূর্বে তার পরিমাণ জানতেন না, এখন নাকি হামেত তাঁর হৃদয় ছিঁড়ে নিয়ে চোলে যাচ্ছেন, আর নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা না হোলেও হোতে পারে, তাই

যুবতী তাঁর অনুরাগের পরাক্রম অল্পভব কোম্পো পাল্লেন, এক্ষণে হয় ত আর কখন হামেতের অকপট সরলমূর্ত্তি দর্শন কোরে মন প্রকলিত কোম্পো পারবেন না, সে আনন্দে হয় ত জন্মের মতই যুবতী বঞ্চিত হবেন, তাই বালা আজ মনে মনে বুঝতে পাল্লেন, হামেতের গুণে তাঁর হৃদয় কতদূর মুগ্ধ হয়েছে, যুবতী এক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, কেবল হামেতকেই তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ কোরবেন। বালার পিতা অনেক কষ্ট কোরে প্রকলিত অথচ কম্পিতহৃদয় হামেতের অনুরাগময় ক্রোড থেকে খোজেস্তাকে ছাড়িয়ে নিলেন, নিয়ে যে ঘরে কাশ্মীর সদাগর বাস্তু মনে পায়েচাির কোচ্ছিলেন, সেই ঘরে চোলে গেলেন। কাশ্মীর যুবা আর হামেত এই উভয় নায়ক প্রতিনায়কের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ যে কি আনন্দের, পাঠক তাহা আপনিই অনুভব কোরে বুঝুন। উভয়েই বিরক্ত হলো, উভয়েরি জিহ্বা যেন বেধে বেধে আস্তে লাগলো, তাই কারুরি মুখ দিয়ে কথা বেরলো না। কেসোয়াৎ খাঁ একটা ছল কোরে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে চোলে গেলেন, তাই দেখে নায়কনায়িকার অন্তঃকরণ অনেক স্নহ হলো, তখন তাঁদের মনে হলো, তাঁরা যেন এযাত্রার মত বেঁচে গেলেন। যখন নায়ক প্রতিনায়ক উভয়েই চোলে গিয়াছেন, খোজে সেই অবকাশে খোজেস্তাকে বোল্লেন, ‘কেসোয়াৎ খাঁ কাল রাত্রেও আমার বোলে-ছেন, তাঁর একান্ত মানস তোমার পাণিগ্রহণ করেন।’

খোজে ঠা বোল্লেন, “আমি এ পর্যন্ত জান-তেম না হামেত আমার এতদূর মুগ্ধ কোরে-ছেন, হামেতই আমার অনুরাগের পাত্র, তিনি ভিন্ন আর কেহ আমার প্রিয় নয়। কাশ্মীর যুবা যে আমার গৌরব করেন, আমি তা জানি, কিন্তু জেনে কোরবো, কি, আমার মন তাঁর প্রতি প্রসন্ন নয়, যেখানে মনোদান করি নাই, সেখানে পাণিদান কোম্পো পারি না, আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন।” এই কথা বোলে যুবতী উঠে আপনার ঘরে

চোলে গেলেন, আজ কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে ভো ভাল হয়। খোজে গিয়ে কেসো-য়াৎ খাঁকে বোল্লেন, ‘হামেতের প্রতি তাঁর কথা অনুরাগিনী হয়েছেন, ঐ হামেতই যুবতীর মন মুগ্ধ কোরেছেন,’ এই কথা বোলে খোজে বিস্তর আক্ষেপ কোল্লেন। কেসোয়াৎ খাঁ শুনে খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোম্পো লাগলেন, এ অন্তঃসংবাদ যদিও তাঁরপক্ষে নূতন নয়, তথাচ কথাটা হঠাৎ শুনে অতিশয় স্তম্ভিত হোলেন, শেষে বিস্তর দুঃখ কোরে বোল্লেন, ‘খোজেস্তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল ছিল,’ এই বোলে যুবতীর মান গৌরব বিস্তর বাড়িতে লাগলেন, শেষে বোল্লেন যে ‘পুরুষের প্রতি বালা প্রসন্নহৃদে চেয়েছেন, তাঁরে নিয়ে ভিনি যেন চিরস্বামী হন। নায়ক হয়ে যদিও আমি তাঁর রূপার পাত্র হতে পাল্লেন না, কিন্তু যুবতী আমার যেন অকপট বন্ধু বোলে জ্ঞান করেন, আমার যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে অরণ্যে স্থান দান দেন।’ খোজে অতিথি যুবায় মনস্তাপ, তাঁর উদাস ভাব, বিশেষ তাঁকে তত বিনয়ী দেখে, আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, ‘খোজেস্তার কেন এমন দুর্বুদ্ধি হলো কেন তিনি হামেতকে মনোদান কোল্লেন বোলেতে পারি না, তার এ বুদ্ধি বরং না হওয়াই ভাল ছিল। পরাস্তরে যুবাকে বিস্তর সাধ সাধনা করে বোল্লেন, ‘তিনি যেন তাকে পরি-তাগ করে চোলে না যান। যুবাকে গিজনিতে বাস করাবার নিমিত্ত আপনার বাণিজ্য লাভ অংশ কোরে দিতে স্বীকৃত হোলেন, যাতে তিনি স্বেচ্ছাশ্রমে থাকতে পারেন, তার চেষ্টা কোরবেন বোল্লেন। কাশ্মীর সদাগর বোল্লেন, ‘স্বামী যা হবার তা হয়েছে, বিধাত আমার অদৃষ্টে স্নহ লেখেন নাই, তবে আপ-নার মিত্রবৎ সাক্ষাৎলাভ কোরে মন অনেক স্নহ হোতে পারে সত্য, কিন্তু তাতে কো-অন্তঃকরণের কষ্ট দূর হবে না, আমার ইচ্ছা অন্তঃকরণের বেগ চেপে রাখি, কিন্তু পে-উঠছি না।’ খোজে বোল্লেন, ‘তোমার অভি-লাষ পূর্ণ হলেও হোতে পারে, এখনও তার সময় যায় নি। যুবা বোল্লেন, ‘সে কি কথা।’

মিথ্যা আশা দিবে আর আমার যন্ত্রণা বাড়াবে না।’ খোজে বোলেন, ‘ভাল ভাল, তাই ভাল, আপনি রাগত হবেন না, আমার বলবার মানে এই, ( গলার স্বর কমিয়ে ) হামেত ফিরে না এলেও পারে, ( কাশ্মীর সদাগরের চক্ষু দিয়ে আনন্দক্ষুণ্ণ দীপ্তি কোন্ডে লাগলো ) হামেতকে মেয়ে কেলেও কেলতে পারে, বন্দী কোরে রাখলেও রাখতে পারে, হুয়েরি সম্ভাবনা।’ এই কথা শুনে যুবীর সর্কশরীর যেন উৎসাহচ্ছটার প্রফুল্লিত হলো, আবার তিনি চিন্তার মগ্ন হলেন, কি ভাবতে লাগলেন, শেষে বোলেন, ‘ডাক্তারেরা যদি তাঁকে ধোরেও রাখে, তখাচ খোজেস্তা তাঁর মুখ চেয়ে থাকবেন, তাঁর ফিরে আসবার আশায় কাল হরণ কোরবেন, তা না হয়ে হামেত যদি যথার্থই মারা পড়েন, সে কথা শুনে খোজেস্তা কি আর প্রাণ রাখবেন, কখনই রাখবেন না, তিনি তখনি আত্ম-ঘাতিনী হবেন। যুবতী তাঁকে এত ভালবাসেন যে, প্রাণত্যাগ কোরবেন, তবু প্রণয় ত্যাগ কোরবেন না, তাঁদের প্রণয় কদাচ ছাড়াছাড়ি হবার নয়।’

যাদের হৃদয় প্রণয়রসে একান্ত মগ্ন, যারা প্রেমরাগের একান্ত অধীন, তাঁদের মনে যে কিরূপ সুন্দর সুন্দর ভাবের উদয় হয়, সে রসে খোজে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বোলেন, ‘না, না, এমনটা হবে কেন? আমি যা বলি শুন, কিছু দিন পরেই দেখতে পাবে, হামেতের সে যেমন সুখী হবে মনে ধোরেছে, ! ওঁর সহবাসেও তেমনি সুখী হয়েছে যে কোর।’ কেসো-রাৎ খাঁ মাথা নেড়ে বোলেন, ‘আমরা যে সম্ভাবনার কথা মনে কোচ্ছি, হরত তা ঘটেও নি, ঘোটবেও না। হামেতকে বন্দী কোরে রাখলে, কি তাকে প্রাণে মেয়ে কেলে, ডাক্তারদের কি ইষ্ট সিদ্ধ হবে, থাক, ও কথা আর মুখে আনবেন না, খোজেস্তার বন্ধুবৎ রূপা থাকলেই চরিতার্থ হবো, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো, হামেতের যদি কিছু ভাল মন্দ ঘটে, তখন এই বন্ধুবৎ রূপা ক্রমে পরিপাক পেরে

প্রণয় অহুরাগে পরিণত হবে, তা যদি না হয়, সে অপরাধ আমারি, হামেতের নয়।’ এই পর্যন্ত হয়ে, তাঁদের কথাবার্তা ভেঙ্গে গেল। কেসোরাৎ খাঁ ব’ড়ী থেকে বেরিয়ে, সহরের চারিদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে চোলেন, তাঁর মনোভঙ্গ হয়েছে, তাই কি চিন্তা কোন্ডে বেরিয়ে গেলেন। খোজেস্তার সে দিন ইচ্ছা ছিল না, তাঁর ঘরে থেকে বাহিরে আসেন, খোজে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বোলেন, ‘কেসো-রাৎ খাঁ তাঁর অকুপার কথা শুনে, অতিশয় উদাসচিন্ত হয়েছেন, এ দুঃখটি যথার্থই তাঁর মন্বাস্তিক হয়েছে, সে ব্যক্তি মুখ ফুটে বোলেছে, বিবাহতো হলোই না, তাঁর প্রতি যেন তোমার বন্ধুবৎ রূপা থাকে।’ এই সকল কথা শুনে যুবতীর মন অনেক নরম হলো, তাই তাঁর পিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে চোলে এলেন, এশে দেখেন, বুবা অতি বিমর্ষ হয়ে বোসে আছেন, অনাদরপ্রাপ্ত ক্ষুণ্ণচিত্ত নায়ক সবিনয়ে যুবতীর সমাদর কোলেন বটে, কিন্তু পূর্বের মতন তত প্রফুল্লমনে নয়। খোজেস্তা হাত-পরিহাসের গল্প কোরে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন করবার চেষ্টা কোন্ডে লাগলেন। বালা বোলতে লাগলেন, ‘বাবার মুখে শুনেছি, আপনার বড় উদার মন, খোদাবাদের উপকারের নিমিত্ত আপনার যা যৎ-কিঞ্চিৎ আছে, তাই দিতে আগ্রহ হয়েছেন, ঐ কথা শুনে আপনার উপর আমার বড় প্রজ্ঞা জন্মেছে, এরূপ নিঃস্বার্থ রূপা মহতেরই চিহ্ন। আমাদের গিজনিবাসী সদাগরদের ব্যবহার দেখে লজ্জা পেতে হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী, এত ধনী যে, যদি কেউ উপকার কোন্ডে চাইতেন, সে উপকার করা তাঁর পক্ষে প্রাধান্য বিষয় হতো না। আপনি যে আপনার সবেধন মাত্র দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তাই শুনে চমৎকৃত হয়েছি, আপনার এই উদারভূমির প্রশংসা কোরে উঠা যায় না, আপনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি, তা একমুখে বোলে কুরাতে পারিনে, আপনি যথার্থই বড় লোক।’ কেসোরাৎ খাঁ অল্প বাড় বুঁকিয়ে বোলেন, ‘যিনি আমাদের তত্ত্ব বনা-

দর পূর্বক আহ্বান কোরেছেন, তাঁর উপকারের নিমিত্ত আমার যদি প্রতিশ্রুতি না হতো, কি আমি যদি পুঁটে তেলির মত তত ক্ষুদ্রাশর ধোতাম, একটি পরসী যদি আমার গায়ের রক্ত হতো, তবে জীবনের প্রতি আমার ঘৃণাই জন্মিত।' খোজেন্তা বোলেন, 'খোদাবাদ নিশ্চয়ই আপনাকে বন্ধুর অগ্রগণ্য জ্ঞান কোরবেন, তিনি কখনও কারুর অঙ্গগ্রহ বিম্বত হন না, তাঁর সেরূপ স্বভাবই নয়।' তার পর যেরূপ আশ্চর্য্য গতিকে কালমাকের পত্র লক্ষিত ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে, সেই পল্ল উত্থাপন কোরে, খোজেন্তা বোলেন, "পত্রখানি জুতোর ভিতরে কি কোরে গেল? তার এক ঘণ্টা কি দুঘণ্টা পূর্বে জুতো জোড়া কেবল ছেড়ে রেখে বোসেছিলেন, এর মধ্যেই কে কি কোলে! তাঁর যে নফর, সে তো বালক, সে কখনই ঘুস থেয়ে এ কাজ করেনি।" খোজে বোলেন, "না না, সে কোব্বে কেন, আমি জানি, তার কোন দোষ নাই, সে ভামাম রাত তার ঘুমিবার পিঠের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বড় ঘুমিব-ভক্ত।" কেসোয়াং খাঁ বোলেন, "বোধ হয়, কালমাকের চর আছে, তারা গোপনে গোপনে গৃহস্থের বাড়ীতেও যায়, মজলিসেও ফেরে, কিংবা হয় তো নাচনেও রাগীরাই পরসার লোভে এ কাজ কোরে থাক্বে।" খোজে বোলেন, "তাই হবে, নচেৎ সেখানে খোদাবাদের আশ্রয়-বন্ধু ভিন্ন আর তো কেউই উপস্থিত ছিল না।" খোজেন্তা বোলেন, "যাই হউক, কলে এ একটা অদ্ভুত কারখানাই সত্য, কারুর পরিজ্ঞান নাই, কারুর নিস্তার নাই, লোকজনকে বাড়ীতে আসতে না দিলেও দোর, দিলেও দোর, আমরা যেন আপনা আপনিই কালমাক হয়ে পোড়ছি, সে বদমাইস্দের কৌশলজাল থেকে কেউই বেঁচে যেতে পার্বে না।" খোজে বোলেন, "সত্যই বটে, আমি যখন ঘুমে থেকে উঠি, কাপতে কাপতে উঠি, ভয় হয়, পাছে দরজার কাছে গিয়ে কক্ষ চেরা দেখতে পাই, রাজিটি নির্ভাবনার কাটাবার উপায় নাই, প্রতিদিনই

শুতে গিয়ে মনে করি, হয় ত রাজি প্রত্যাহত হলে আমি তাদের কালকোপে পড়ে যাবো।" কেসোয়াং খাঁ বোলেন, "আপনার সে ভয় হোতে পারে সত্য, যেরূপ অভ্যাচারের কথা শুনতে পাই, তাতে কোরে গিজনির ভিতর বাস কোরে নির্ঝিয়ে আছি, এরূপ কারুরি মনে করা উচিত নয়, আমি কিন্তু গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোরে থাকি, আপনার যেন কোন বিপদ না ঘটে, আপনাকে যেন তারা ভুলে যায়।" তার পর খোজে সে ঘর থেকে চোলে গেলেন, কেসোয়াং খাঁ খোজেন্তার মধুর সম্মুখে এসে বোলেন, "তোমার পিতার মুখে শুনলেম, তুমি নাকি হামেতকেই মনোদান কোরেছো, সে বিষয় নাকি স্থিরই হয়ে গেছে, তখাচ তোমার মুখে একবার শুনতে চাই, তা হোলে আমি অভিযাঘর নির্স্বাধা হয়ে নিশ্চিন্ত হই, আমার দশটি কি হলো, সেই কথা একবার তুমি মুখে বলো শুনি, আমি কি এতই ঘণার পাত্র হোলেম, আমি কি—"

খোজেন্তা বোলেন, "না না, অমন কথ বোলছেন কেন? ঘণা কোব্বো কেন? আমি বরং আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধাই কোরে থাকি, যদি হামেতকে কখন চক্ষে না দেখতেম, যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বঞ্চাল পূর্বে হামেতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না হতো, তবে তোমার ভিন্ন আর কারকে আমি মালাদান কোন্তেম না। আমাদের বন্ধুবৎ প্রণয় চিরকালই যেন একভাবেই থাকে, হামেতকে কিন্তু আমার হৃদয়, আমার মন, আমার স্নেহ, আমার অন্তরাগ উপহার দিয়ে বরণ কোরেছি। কেসোয়াং খাঁ! আপনি আর রাগত হয়ে আমার প্রতি কোপভঙ্গি কোরবেন না, আর মুখ-চোখ অন্ধকার কোরে মুখ ফিরিয়ে চোলে যাবেন না।" মুখা বোলেন, "খোজেন্তা! আমি রাগত হোয়ে আঁধার মুখ কোরে থাকি না, আমি হৃষিক্ত হয়েই, শোকার্ত হয়েই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা মনে কোরেই মুখ ফিরিয়ে চোলে গিয়ে থাকি, মুখ আঁধার করা দূরে থাকুক, আমি যখন

তোমার দেখতে গেলে প্রফুল্লিত হই; আমি তোমার প্রাণের অধিক ভালবাসি, তুমি আমার প্রণয়রাগের অপমান কোরবে না, একবার এই মধুর আশা পেয়ে আত্মলাভে ফুলে উঠেছিলেম। বিধাতা সকলের মন, সকলের অন্তঃকরণ দেখিতে পান, তিনিই আমার মনের, আমার অন্তঃকরণের দোষ-গুণ বিচার কোরবেন।” যুবতী বোলেন, “কেসোয়াৎ খাঁ! তুমি যেন আমার ভাই, আমরা যেন এক মায়ের পেটে জন্মেছি, এখন এইরূপ ভক্তিতে আলাপ করাই ভাল, আপনি মুখে থাকুন, এ প্রার্থনা চিরকালই কোরবো, আপনি তো আমাদের ছেড়ে কোথাও চোলে যাবেন না? এখানে থাকবেন তো? আমার পিতার হস্তে অনুরোধ করছি, আমিও বোলছি, আপনি থাকুন।”

কেসোয়াৎ খাঁ বোলেন, “আপনাদের অনুরোধে আমি এখানে আজন্ম কাটাতে পারি, তবে কথা এই, পাশা পড়ে চুকেছে, পড়তা উলটে দাঁড়িয়েছে, তুমি যে কথা শুনিয়া দ্বিগ্ন হইয়াছো, তাতেই আমাকে ভাড়িয়েছে; আর আমার গির্জাঘরে মুখ দেখাতে হবে না।” যুবতী বোলেন, “সে কথা নয়, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না, আপনাকে হারালে বড় অন্তরী হবো।” যুবা উত্তর কোরবেন, এমন সময় খোজে এসে উপস্থিত হোলেন, স্ত্রীর তাদেব কথা বন্ধ হলো। পরদিন হামেত্ খোজেন্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নির্ঝিবায়ে কথাবার্তা কহিতে লাগলেন, এখন কিন্তু অনেকক্ষণ ধোরে আলাপ কোরবার সময় নয়, যুবতীর পার্শ্ব ছিন্ন কোরে, তাঁর হস্ত ভগ্ন কোরে, হামেত্ বসপূর্বক লয়ে যাবার সময়, সে সময় আগন্তপ্রায়, সে সময় যেন তীরের ভায় বেগে ছুটে আসছে, তাই ভেবে যুবক-যুবতী মর্শাস্তিক ব্যথার পীড়িত হয়ে কতই অশ্রু-পাত কোলেন, তাঁদের দুঃখামলগন্ধ হৃদয়ের হাহাকারধ্বনি শুনে পাষণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হতো।

যে রাত্রে হামেত্ নির্ভর হোয়ে কাল-

মাকের নির্জন আশ্রমে একলা চোলে যাবেন, তার পূর্বদিন নতুন কোন ঘটনা হয় নাই। খোজে আর কেসোয়াৎ খাঁ পূর্বকার কথা-মতন সহরের সিংহদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চোলেন, হামেত্কে বিদায় দিয়ে বোলেন, “তোমার কোন ভয় নাই, কোন বিয় নাই, যেতে না যেতেই ফিরে আসতে পারবে, আমরা আশীর্বাদ কোচ্ছি, তোমার মঙ্গল হউক।” খোজে আর কেসোয়াৎ খাঁ মুখে তো আশীর্বাদেব উপর আশীর্বাদ কোয়ে ঝড় বোইয়ে দিলেন, মনে মনে কিন্তু বোলতে লাগলেন, “আল্লা করুন, হামেত্কে যেন আর ফিরে না আসতে হয়, এ বিদায় যেন জগের শোধ বিদায় হয়।” বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু উভয়ের কেউই গুরুপ অকরণ নিষ্ঠুর বাক্যগুলি মুখ দিয়ে বার কোলেন না।

খোজেন্তা হামেত্কে বিদায় দিয়া মনে মনে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগলেন, হামেত্ আমার মন প্রাণ কিনে নিয়েছে, প্রণয়-ধন দিয়ে, অকপট মন দিয়ে আমার মন-প্রাণ কিনে নিয়েছে, কেসোয়াৎ খাঁর মন সরল নয়, তাঁর মনে বিস্তর ছলনা, বিস্তর চাতুরী আছে, তিনি অনেক ছলের কথা, অনেক চাতুরীর কথা বলেন। আমার মন তো এখন আমার নয়, আমার মন এখন হামেতের, হামেত্ চোলে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমারও মন গিয়েছে, পোড়া মনের কি দশাই হলো! হামেত্কে যেন পলকে পলকে চক্ষে হারায়, এক দণ্ড দেখতে না গেলে অমনি যেন সারা হয়ে যায়, মনের এ কি রোগ হলো? কেসোয়াৎ খাঁ শঠ লোক, তার সন্দেহ নাই, তার কথাগুলিতে বেশ রস আছে সত্য, যেন মধু ঢেলে দেয়, কথার ছটাও ভাল, তিনি যতই তেতে পুড়ে আসুন, কেসোয়াৎ খাঁর মুখে ছট কথা শুনে অমনি যেন শীতল হয়ে যান, তাঁকে তা হতেই হবে। যুবা হান্তকোতুক, আমোদ-প্রমোদ কোত্তেও বেশ জানেন, কিন্তু তাতে কি করে! মন ভাল হওয়া চাই, সে ব্যক্তি শঠ, তার মনও

ছুটিল, আমি জেনে শুনে সাপের মুখে হাত দিতে পারি না।

এক ঘটনা গত হলো, দুর্ঘটনাও গত হলো, তবু হামেত ফিরে এলেন না, রাত্রি একপ্রহর হয় হয় হলো, তবু হামেতের সঙ্গে দেখা নাই। খোজেন্তা অস্থির হয়ে পোড়লেন, হয় ত এত-ক্ষণে এসেছেন, এই ভেবে বালা শশব্যস্ত হয়ে খোদাবাদের বাড়ীতে লোকের উপর লোক পাঠাতে লাগলেন, তারা ফিরে এলে কাতর হয়ে যেমন জিজ্ঞাসা করেন, “কেমন, এসেছেন কি?” তখন “না, এখনও পৌছে-ননি,” এই নির্ভর সংবাদ শুনে অমনি শিউরে উঠে মুচ্ছিতপ্রায় হন। খোদাবাদের বাড়ীতে যতবার লোক পাঠালেন, তত বারই “হামেত এখনও ফিরে আসেননি,” এই মর্শাস্তিক অক-রুণ নির্ভর বাক্য শুনে তাঁর মহাপ্রাণী কঁপে কঁপে উঠে অবসন্ন হোতে লাগল। রাত্রি দুই প্রহর হলো, তখাচ হামেতের কোন খবর নাই, চোকিদার প্রথম চোকি হৈকে গেল, তবু এখনও যুবা এসে পৌছান নি, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল মলিনপ্রভা হয়ে, দুটি একটি কোরে বিলুপ্ত হোতে লাগলো, তবু হামেত এলে এখনও পৌছাননি। কি খোজেন্তা, কি খোদাবাদ, কারুরই চক্ষে ঘুম নাই, দুর্ভাব-নায় তামাম রাত ছট্-ফট্ কোচ্ছিলেন, আর এক একবার ছুটে গিয়ে গলীপথ দেখে আসছিলেন, খোজেন্তার চক্ষের পলক ছিল না, বালা তামাম রাত আকাশের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, রাত্রি ক্রমে অবসান হয়ে প্রভাত-ছটার ঈষৎ স্বেতরেখায় গগন উদ্দীপ্ত হলো, বালা তা দেখতে পেলেন। অরুণো-দয় হয়ে ক্রমে দিন প্রকাশ হলো, তখাচ হামেতের সঙ্গে দেখা নাই, তখনও তিনি ফিরে আসেন নি। খোজেন্তা শিরে করাঘাত কোরে আর্তনাদ কোতে লাগলেন, “কেন আমার মাথা খেয়ে তাঁকে যেতে দিলেম, ধোরে রাখলেম না কেন, নিবেধ কোলেম না কেন, নিবেধ কোলে কখনই যেতেন না, আমি আপনার দোষে তাঁকে হারালেম, হায়! কি কাল ঘটালেম, কি সর্বনাশ

কোলেম, কেন তাঁকে একলা যেতে দিলেম।” খোদাবাদও আত্মতর্সনা কোয়ে বোলতে লাগলেন, “হায়! আমি আপনি না গিয়ে কেন তারে একলা পাঠালেম, এ দুর্ভাগ্য আমার কেন হলো, হা পুত্র! আমার মনে হচ্ছে, তুমি নাই, নির্ভর ডাকাতেরা তোমাকে নিশ্চয়ই খুন কোরেছে, তুমি অভাবে আমি কি কোরে প্রাণে বাঁচবো, হায়! আমি পুত্রের মায়া না কোরে টাকার মায়াই অধিক কোলেম, আমি পিতা হয়ে কোন প্রাণে তোমাকে যমের মুখে পাঠালেম। হামেত আমার দুধের ছেলে, তাতে আবার তার মা নাই, আমি কেন মা-খেচো ছেলেকে শত্রুর মুখে জেনে শুনে পাঠালেম, রাতা-রাতির মধ্যে ফিরে আসবার কথা, তাতে এতখানি বেলা হলো, তবু তার খোজখবর নাই, হায়! কি বিড়ম্বনা!” খোদাবাদ এট-রূপ আরও কত আর্তনাদ কোরে বিলাপ কোতে লাগলেন, পিতার তো সান্ত্বনা হবার কথাই নাই, প্রণয়িনীর আশাও প্রণয়িনীর হৃদয়মধ্যে বিলুপ্ত হলো, খোজে আর কাশীর যুবা মুখে বিলক্ষণ দুঃখ জানাতে লাগলেন, মনে মনে কিন্তু আত্মলাদে গোলে পড়তে-ছিলেন, যারা প্রকৃত শোকে শোকাকুল হয়ে বিলাপ কোচ্ছিলেন, তাঁদের অনেক আশা-ভরসা দিয়ে সান্ত্বনা করবার চেষ্টা কোতে লাগলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হলো। আজ কি দুঃখের প্রভাত, আজ খোজেন্তার পাশে হামেত নাই, শুধু আজ বোলে নয়, এমন কত দুঃখের প্রভাত যুবতীকে কেঁদে পোন্নাবে হয়েছে। এক হণ্টা গত হলো, তখাচ হামে-তের কোন সংবাদ নাই। যুবতী অহোরাগ্ৰ বিমর্ষ হয়েই থাকেন, কি শুয়ে, কি বোসে কিছুতেই তাঁর মনের সুখ নাই, তাঁর মুখখানি দিবারাত্রি বিরস, তাঁর মনটিও দীন-দরিদ্রের মতন দিবারাত্রি ভ্রিয়মাণ। বালা শেষে এক প্রকার ঘোর অপ্রফুল্ল উদাস বিবাদে নিম-হোলেন, কেসোরাৎ খাঁ তাঁকে প্রফুল্লিত কর-বার নিমিত্ত অনেক কৌশল, অনেক যা-কোলেন, কিন্তু যুবতীর মন কিছুতেই প্রস-

কোন্টে পারেন না, তার তাৎপর্য এই, খোজেন্তা মনে কোল্লেন, হামেত নাই, নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন, বিশেষতঃ ডাকাতেরা যে খোদাবাদের উপর টাকার জঙ্ক পীড়া-পীড়ি কোচ্ছে না, তাতে কোরেই ঐ সন্দেহ দিন দিন আরও প্রবল হোতে লাগলো, আগে আগে যুবতী প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, রসিকা ছিলেন, চতুরা ছিলেন, পরিহাসপ্রিয়া ছিলেন, এক্ষণে হামেতের মৃত্যুর বিষয় ভেবে ভেবে বিষন্ন হোলেন, স্নান হোলেন, নিরানন্দ হোলেন, শোক-বিষাদে জড়ীভূত হয়ে দিন দিন শীর্ণ হোতে লাগলেন। একদিন পিত্তা দেখলেন, তাঁর কস্তা মড়ার মতন চিকুতে চিকুতে বাড়ীর বাহিরে চোঁলেছেন, তাঁর সে চেহারা নাই, সে আকার নাই, সে স্ফূর্তি নাই, অস্থিচর্ম অবশিষ্ট হয়ে দেহমাত্র খাড়া আছে, মুখে হাসিও নেই, আছাদ প্রকাশ করাও নেই, তাই দেখে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন বটে, কিন্তু কন্যার মনে সাহস দিয়ে তাঁকে প্রদ্বন্দ্ব করবার চেষ্টা কোল্লেন না, হামেত যে মারা পোড়েছেন, বরং সেই সন্দেহ যুবতীর মনে আরও প্রবল কোরে দিলেন, বাংলার মনে সে সন্দেহ যাতে আরও বলবৎ হয়, সেই কথা উত্থাপন কোরে তারি পোষকতা কোন্টে লাগলেন, তার মর্ম্ম আর কিছুই নয়, খোজেন্তা মনে কোল্লেন, হামেত নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন, জানতে পাল্পে যুবতী তাঁর ফিরে আসবার আশায় এককালীন জলাঞ্জলি দিবেন, হামেতের প্রাণে দৈববশিত হোলে কাম্বীর যুবাকে পাণিদান কোরবেনই, তার সন্দেহ নাই, সেটি কিন্তু তাঁর মনের ভুল, এ বিষয়ে তাঁর বড় ভ্রম হলো। খোজেন্তা হামেতের কালশোকে নিলজ্জ হয়ে একেবারে মুখ ফুটে বোলে ফেল্লেন, তিনি আর বিবাহই কোরবেন না, পতিপদে আর কারুকে বরণ কোরবেন না, সে বিষয় বালা হাত ধুয়ে পরিকার করে বোসেছেন। কেসোয়াৎখা দেখলেন, তাঁর স্তব্ধভিত্তি, তাঁর অছন্ন-বিনয়, তাঁর সাধ্যসাধনা, তাঁর উপাসনা কোন কর্ণেই

হলো না, কোন উপকারেই লাগলো না, তাঁর সব বড়ই ব্যথা হলো, তাই দেখে যুবা জন্মের মত খোজের গৃহ পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে প্রস্তুত হোলেন। খোজেন্তা তাঁর মনো-মত বন্ধুকে হারাবেন বোলে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন, যুবাকে গিজনিতে রাখবার নিমিত্ত কতই প্রলোভন দেখালেন, যুবা তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত কোল্লেন না, সে সকল লোভ-লালসার কথায় একেবারে বধির হলেন, খোজেন্তা তাঁকে গৃহ রেখে বিস্তর যত্ন করে-ছিলেন বোলে কাম্বীর যুবা অনেক অছন্ন-বিনয় কোল্লেন, খোজেন্তার কাছে দুঃখের বিদায় গ্রহণ কোল্লেন, সর্বশেষে গিজনিকে এবং গিজনিবাসী বন্ধুবান্ধবকে নমস্কার কোরে প্রস্থান কোল্লেন।

আজ একমাস অতীত হলো, কেসোয়াৎখা গিজনি থেকে চোলে গিয়েছেন। খোজেন্তা এ পর্য্যন্ত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁর পিতাও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, রাগতও হয়েছিলেন। আগে যেমন কস্তার সঙ্গে দেখা কোরে হেসে স্নেহ কোরে কথা-বার্তা কইতেন, ইদানীং আর তাঁর সেরূপ স্নেহ যত্ন ছিল না, খোজেন্তা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন, খোজেন্তা প্রায়ই একলা বোসে থাকতেন, তবে কখন কখন পাড়ার মেয়েরা এসে তাঁর সঙ্গে গল্পটা গল্পটা কোতো, তাও আবার কচিং কখন, সর্বদা নয়। ইয়ামন্ বোলে একটা প্রতিবাসীর কস্তা যখন তখন এসে তাঁর সঙ্গে আমোদ আছাদ কোতো। পিতার স্বভাব ফিরে গিয়েছে, তাঁর আর পূর্বের মত তাঁর প্রতি মায়াদয় নাই দেখে যুবতী মনে বড় ব্যথা পেলেন। একদিন তাঁর দুঃখের কথা বোলবেন বোলে মনে কোরে-ছেন, এমন সময় দেখলেন, তাঁর পিতা অতি বিমর্ষ হয়ে বাড়ীতে প্রবেশ কোছেন, শুন্লেন, খোদাবাদের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির একদিনও বিরাহ ছিল না, তাঁর মন্দ-ভাগ্য পুত্রের নিমিত্ত দিবারাজ রোদন, দিবারাজ বিলাপ, দিবারাজ আর্দ্রনাদ কোন্টেন, কারুকার্যের একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন,



লাভ হলো কি লোকসান হলো, একবার ফিরেও চেরে দেখতেন না, মাসাবধি আহা-রই কোলেন না, অনাহারে ও শোকে শরীর ক্রমে পাক পেয়ে যেতে লাগলো, খোদাবাদ শীর্ণ হয়ে পোড়লেন, শেষে প্রাণত্যাগ হয়ে তাঁর যন্ত্রণার অবসান হলো। খোজেন্তা দুঃখের সংবাদটি শুনে নিতান্ত কাতর হয়ে পোড়লেন, পরের দুঃখে দুঃখিত হোতে গিয়ে আপনার দুঃখ বিস্মৃত হয়ে গেলেন, তাই আর সে দিন পিতাকে বলা হলো না, তাঁর মনের ভাবান্তর হয়েছে। পরদিন অতি প্রাতে তাঁর পিতার উঠবার অগ্রে মৃত খোদাবাদের উজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুবেন মনে কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, অধিক পথ যেতে পারেন নি, এমন সয় একটি ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে ডিক্কা চাইলে, যুবতী তাকে একটু অপেক্ষা কোন্তে বোলে। তাঁর হাতে একটি সাজি ছিল, বালা যখন বাড়ী থেকে বেরুতেন, ঐ সাজিটি হাতে ঝুলিয়ে নিতেন। বালা ফিরে এসে দেখেন, কালমাক ডাকাতের কালকুণ্ড ঢেরা তাঁর বাড়ীর দরজার গায় চিত্রিত রয়েছে, দেখেই প্রাণ কেঁপে গেল, সর্ষাক শিউরে উঠলো, তাঁর পা আর চলে না, থবু থবু কোরে কেঁপে মুর্ছিতপ্রায় হয়ে দরজার উপর পোড়ে যান যান হোলেন। অনেক কষ্টে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে ‘বাবা বাবা’ বোলে জন্তমনে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। খোজে তাড়াতাড়ি ধরিয়ে এসে ফুলকোটোকো হয়ে জিজ্ঞাসা কোলেন, “কেন? কি হয়েছে মা? কিসে এত জাস হলো?” বালার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, কেবল অঙ্গুলি দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন। খোজে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলেন, খুলে দেখেন, কালমাকের সেই কালঘাতী কুণ্ডচেরা অঙ্কিত রয়েছে, তাই দেখে চীৎকারশব্দে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর কারা শুনে ঐ দরজার কাছে দ্বিতর লোক জমে গেল। বার সর্ষনাশ উপস্থিত, বার মৃত্যু সম্মুখে মুখ বাড়িয়ে আছে, তাকে প্রবোধদ্বাক্য দিয়ে কে সাজনা কোন্তে

পারে? আতঙ্কের বেগ ধরু হালে খোজে সর্ষ-প্রথমেই খাঁতাপত্র খুলে দেখতে বোললেন, আপাততঃ কত টাকা তাঁর তহবিলে মজুত আছে, সেইটি জানবার তাঁর অভিপ্রায়। খাতা খুলতেই কালমাকের ভয়ঙ্কর অকরণ পত্র-খানি বেরিয়ে পোড়লো, যে পাতার তিনি হিসাবপত্র দেখবেন, সেই পাতার ভিতরেই পত্রখানি গুঁজে রেখেছিল। তখন আতঙ্কে বোধ হলো যেন, পত্রখানি তাঁর মুখের দিকে কটমট কোরে তাকাচ্ছে। খোজে হত্যাশে চীৎকার কোরে উঠলেন, ঐ চীৎকার শুনে কি হয়েছে, কি হয়েছে বোলে খোজেন্তা এসে উপস্থিত হোলেন, তখন সদাগর দুটি আঙ্গুল দিয়ে পত্রখানি ধোরে আছেন। যুবতী পিতার গলা জড়িয়ে ধোরে পিতৃস্নেহবশে মুখচুশন কোন্তে লাগলেন, দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা পোড়ে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগলো। পত্রের শিরোনামা পোড়েই শরীর অবশ হয়ে পোড়লো, তার মর্মার্থ অবগত হোলে মনের গতি যে কি হবে, তা পাঠক আপনাই অনুভব করুন। পত্রখানি খুলে পোড়বেন কি না, সাত পাঁচ ভাবতে লাগলেন, একঘণ্টা দুয়না কোরে কাটালেন, শেষে কপাল ঠুকে, যা থাকে অদৃষ্টে বোলে পত্রখানি খুলে পোড়লেন, তাতে এই লেখা ছিল।—

“কালমাক খোজে সদাগরের প্রতি।

পত্রে জানিবা। আগত মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে এই চারি পুরুতের নিকট ভগ্ন মসজিদে তোমার কন্ডাকে পাঠাইয়া দিবা, তাঁহাকে পদব্রজে চোলে আসিতে হইবে, প্রয়োজন হয় ত একটি দাস কি দাসী সঙ্গে আসিতে পারিবে, তাঁর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু যুবতী আর কখনই গিজরি সহরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না, এ কথা পূর্নাহুই বলিয়া রাখিলাম। আমি কালমাক, আমি তোমার কন্ডাকে উপপত্নী করিব বলিয়া চাহিতেছি। তোমার কন্ডার আগমন উপলক্ষ্যে নাচতামাসার ও খানার সমারোহ হইবে, অতএব যুবতী যেন প্রচুর সিরাজ

মদিয়া, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল, তত্ত্বের হাজার ধান মোহর সঙ্গে লইয়া আইসেন। দেখো, যেন আমার হুকুমের অজ্ঞা না হয়, অন্যথা হইলে প্রাণটি হারাষ্টবা। ইতি কালমাক।”

দন্তধতের নীচে লালরঙে চিত্রিত ছোরা ও কৃষ্ণচোরা অঙ্কিত ছিল, দন্তধটি বড় বড় অক্ষরে অতি স্পষ্ট কোরে, অতি পরিষ্কার কোরে লেখা ছিল, ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খোজে বোলে উঠলেন, “আর আমার কি হবে। মনো-দুঃখ বা পাবার তা পেলাম; রে দুঃখতি ডাকাত! তোরা মনে করিসনে, আমি তোদের হুকুমবরদার চাকর, সহস্রবার মোস্তে হয় মোরবো, তখাচ কস্তাকে. কখনই কলঙ্ক-পঙ্কে পতিত হোতে দিব না, অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খোজেস্তা! তোমাকে এ প্রাণ থাকতে কখনই পাঠান হবে না, বরং আপনি হাত দিয়া এ প্রাণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তখাচ নরহস্তা খুনে ডাকাতের কাছে কখনই তোমাকে পাঠাবো না, পাঠানো দূরে থাকুক, সে কথা মনে মাত্র উদয় হোলে গায়ের রক্ত জল হয়ে সর্পিণীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যা! তুমি কেঁদো না, আমার জন্ত তোমার কঁদতে হবে না, ভয় কি! আমি কালমাকের চোক রাস্তানীতে ডরাইনে, আমি তারে বোলে পাঠাবো, তোর যা সাধ্য থাকে করিস, আমি তোর কথা মানি না।” খোজেস্তা বোলেন, “বাবা! অমন দুঃসাহস কোরবেন না, অমন কথা বোলবেন না, সাব-ধান হয়ে চলা ভাল, দোষ্মনকে মোরিয়া কোরে তোলা ভাল নয়, আপনি একলা বাইরে যাবেন না, ঘরের মধ্যেও অস্ত্র-শস্ত্র লোরে থাকবেন, হায়! আমার যদি অসতী না হতে ছতো, তবে বেরুপেই ইউক, আপনার প্রাণ-রক্ষা কোরে দিতুম।” এই কথা বোলে পিতায় কন্ডায় চক্কর জলে ভাসতে লাগলেন। খোজে এত যে আফালন কোলেন, তবু শোক দুঃখ ভরে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বৃকে করাঘাত কোরে, হাধাকার কোন্ডে লাগ-লেন, শেষে সর্বাঙ্গ অবশপ্রায় হয়ে অকাতর

নিদ্রায় অভিভূত হলেন, খোজেস্তা ভাই দেখে আপনার ঘরে চোলেন, এমন সময় তাঁর সম-বয়সী ইমামন এসে উপস্থিত, ইমামন বোলেন, “সখি! তুই আর কৃষ্ণচোরার কথা মনে করিস নে, যা অদৃষ্টে লেখা আছে, তাই হবে, আমি তাই তোকে গুটিকত কথা বিজ্ঞাসা কোন্ডে এসেছি, তুই ভাই আমার ভাঁড়াসনে, সত্যি কোরে বলিস।” খোজেস্তা বোলেন, “এই শোক-তাপের সময় তুই ভাই আমার কি কথা বিজ্ঞাসা কোন্ডে চাস, তোরে আজ বড় আশুদে আশুদে দেখছি, এখন ভাই ঠাট্টাতমা-সার সময় নয়।” ইমামন বোলেন, “হাসি-তামাসার কথা নয় ভাই, মনটা বড় ধুক-ধুক কোন্ডে, তাই কথাটা বিজ্ঞাসা না কোরে স্থির থাকতে পাচ্চিনে, প্রাণের ভিতর যেন আই-টাই কোন্ডে, তুই ভাই কেসোয়াংখাঁকে সাধে-সাধে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলি কেন? সে ব্যক্তি তোর পায়ে ধল্ল, হাতে ধল্ল, তবু তোর মন নরম হইলো না, এমন মনও তো কোথাও দেখিনি ভাই, মেয়েমানুষের যে তত শক্ত মনোহয়, বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে, তা তো আগে জান্তেম না, তোর কি চক্ক পদা নেই, না প্রাণে মার্যা-দয়া নেই, তাই অমন কোরে অমন সুপুরুষকে কল-মুখে বিদায় কোরে দিলি?” খোজেস্তা বোলেন, “তুই ভাই একরকমেরই লোক, মন কি কারবু বাধ্য, মন কার প্রতি রুট, কার প্রতি তুট, কেন যে হয়, তা কেউই বোলতে পারে না, এমনি কথায় বলে, “যার প্রতি যার মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম্,” আমি কি সাধ কোরে তাঁরে ক্ষুণ্ণ কোরেছি, আমার মনু যে তাঁর অঙ্গুগত হোলো না।” ইমামন বোলেন, “তোর মনটাকে একবার দেখাতে পারিস, একবার দেখতে পেলো হয়, তখন কোমর বেঁধে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিই, এমন মন রাখিস কেন, তোর পোড়া কপাল যে, এমন মন নিয়ে ঘর করিস। কেসোয়াংখাঁ দেখতে যেন কন্দর্প, তাঁর রূপ দেখে কার মন না তুলে যায়, মুখেরই বা কেমন শ্রী, চোক-নাকেরি বা কি টানা গড়ন, যেন তুলি

দিয়ে চির কোরেছে, ছদ্মও দাঁড়িয়ে দেখতে করে, হামেতটা আর কি, না লীই আছে, না ছাঁদই আছে, ঠিক যেন চাবার বলদ, গুণের মধ্যে গাধার মত হাড়কালা মেহনত কোত্তে পারে, আর তো কোন গুণ দেখতে পাইনে, তুই ভাই তারে যে কি চক্ষে দেখেছিস্, তা তুইই জানিস্. হামেত. যেন তোমার প্রেমের গোপাল হয়ে বোসেছে।” থোজেন্তা বোলেন, “আর ভাই ও আগুন তুলিস্নে, তুই ভাই আর কাটা খায় হুণের ছিটে দিস্নে, একে তো আপনাকে ধেরে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন, আঁধার দেখছি, তার উপর তোর আবার ঠেসের কথা নয় না, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালা দিস্নে, কেসোয়াং খাঁর গুণ কেসোয়াং খাঁতেই থাক, আমি তাঁর গুণও চাই না, তাঁর রূপও চাই না, আমি মন চাই, কেসোয়াং খাঁর মন ভাল নয়, তার অন্তঃকরণ পরিষ্কার নয়, আমি হামেতের গুণ একমুখে বোলে ফুরতে পারিনে, কেসোয়াং খাঁর নতুন নতুন বেশী যত্ন, পুরাণো হোলে তত থাকতো না, কখনই থাকতো না, আমি হামেতের চরণে বিক্রী হয়েছি, তিনি কিরে আসবেন বোলে আশা দিয়ে গেছেন. তাই এখনও তাঁর আশাপথ চেয়ে আছি, সখি ! আমাদের কেবল নবীন প্রণয়, কিন্তু অন্ধুরে আঘাত হলো, কি বিড়-ঘনা, হঠাৎ এমন বজ্রাঘাত হবে, স্বপ্নেও মনে করিনি।” ইমামন্ বোলেন, “যাই বল ভাই, ও কথার আমার মন ভিজলো না। যদি ভাল-বাস্তে হয়, তবে কেসোয়াং খাঁর মতন সুপুরুষ দেখে ভালবাসাই ভাল, এমন পুরুষ না হয়েছে, না হবে, না দেখেছি, না দেখবো। সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়ের উদাসীন, তার মান রাখাই উচিত ছিল, তাকে অমন্ কোরে কঁাদিয়ে বিদায় করা কি ভাল হয়েছে ? কান্দীর বুঝে যেন রসের তরঙ্গ, তার সঙ্গে আলাপ কোরে সুখে ভাসতে হয়, তার সুরসম্পূর্ণ বাক্যছটা শুনেলে শরীর অলস হয়, প্রকৃষ্টরসে অলস হয়, তাকে ভাই তুই প্রথম প্রথম কত আশাই দিছিলি, আমি তো

তোমারই আছি, কোথা গিয়েছি, আমি চাভ-কিনী, তুমি আমার ধারাপথ, আমি তোমার জীবনের মরণের সাধী ! তুই ভাই কত খেলাই খেলি, তখন তখন তোমার নতুন প্রণয়ের কথা তুলে অমনি যেন লজ্জায় মোহে যেতে, সাপের মত বাসি হোলে খাটে না, তোমার সে সকল কথা, তাই হলো না কি ? যাড় হেঁটে কোরে রইলে যে ? মুখ তোলো না ? কথা কও না ? এখন কি তোমার সে প্রণয় বাসি হলো ? তাই বুঝি অকুচি জন্মেছে ?” থোজেন্তা বোলেন, “তুমি ভাই আর বাড়াবাড়ি কোরো না, এমনিই তো জোলে পুড়ে মচি, আগুনের উপর আগুন জেলে দিয়ে আর আমার পুড়িও না, আমার আর মরণের বেড়ি অপেক্ষা নাই, এ পাপ প্রাণে আর কত সব বল ! কেসোয়াং খাঁর প্রতি তোর যদি মনে মনে এতই পড়তা হয়েছিল, তবে সে কথা তারে খুলে বোলেই তো হতো, সে কখন তোর ছেড়ে চোলে যেতো না, তুইই বা তাকে ছেড়ে দিলি কেন, ধোরে রাখলেই তো পাতিস্, তোর মত যুবতীর অহরোধ সে কখনই এড়াতে পারতো না, আমি যদি আগে জানতেম্, তুই তারে সোনার চক্ষে দেখেছিস্, তা হোলে নয় ঘণ্টা-কালিই কোরে দেখতেম্, আমি হামেতকে ভালবাসি কেন, কেসোয়াং খাঁকে ভাল-বাসিনে কেন, এ কি একটা কথা, তাই উত্তর দেবো. ছিঃ ! এ কি কবার কথা, না জিজ্ঞাস করবার কথা, এ কথা কি দেশে দেশে ঢোল মেরে দিতে হয় নাকি, যে বলে, সে বলুক. যে করে, সে করুক, আমি তো তাদের বলাতেও নেই, কথাতেও নেই। কেসোয়াং খাঁকে তোমরা দূর থেকে চোকে দেখেছো, কানে শুনেছো, এই বই ত নয়, আমি অষ্ট প্রহর নিকটে থেকে তার চরিত্র জেনে নিয়েছি তার সঙ্গে প্রণয় হোলে তেরাজও কাটতো না, দুদিন বই কেলে পালাতো, বাসি হোতে পারতো না, তার বাতাস যেন কারুরই গার না লাগে, এমনি কবার বলে, ‘যার খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে, সে কয় কি না কয় কথা ডেকে’

এমন চরিত্রের লোক যে, তার জন্তে খেদই না কি, দুঃখই বা কি, শুধু রূপ-গুণ দেখলে ত্যো হয় না, মন দেখা চাই।’ কেসোয়াং-র মুখটি যেন সুধার সরবর, তার মন কিন্তু তেমন নয়, এমনি কথায় বলে, মুখে নবু কদে ক্ষুর, তার নাম বিষম কুর। ইমামন্ বোলেন, “তুই খুব পুরুষ চিন্তে পারিস, তোর বুঝি ভাই পুরুষ চেনা রোগ আছে, যাঁই ভাই, বাড়ী যাই, আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নাই, তোমায় যে কথায় পেরে উঠে, সে আজ্ঞা জমেনি, বেলাবেলি বাড়ী বাবার কথা, তাতে এতখানি রাত্ হোলো, মা কত বোকুবে এখন, তোর ভাই অল্প পাওয়া ভার, তোর মনের গুজন পাওয়া সহজ কথা নয়, তবে এখন চোলেই।” খোজেস্তা ছল ছল-চক্ষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মুখে খুব মিঠে, কিন্তু নিম্ন নিসিন্দে পেটে। খোজেস্তা ভয়ে ধবু ধবু কোরে কাঁপছেন, আতঙ্কে একএক বার শিউরে শিউরে উঠছেন, কাল্মাকের পত্রখানি তাঁর চক্ষের উপর পোড়ে আছে, পত্রখানি একবার পোড়ছেন, পোড়তে পোড়তে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হোচ্ছেন। এইরূপ কোঁড়ে কোঁড়ে হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো, কাল্মাকের মহা আজ্ঞা পালন করা শ্রেয়, তার সে আজ্ঞা পালন কোলে পিতারও প্রাণরক্ষা হবে, তাঁর আপ-নারও মান রক্ষা হবে। যুবতী একটি কৌশল চিন্তা কোরে, “হাঁ, তাই করাই কর্তব্য,” এই বোলে আপনা আপনি চেষ্টিয়ে উঠলেন, মনে মনে বোলেন, হাঁ, এত দিনের পর গিজনি উদ্ধার কোত্তে পারুবো, কাল্মাককেও নিশাত কোত্তে পারুবো, তার দলবলকেও নিশাত কোত্তে পারুবো।

যুবতী বেশ জানতেন, তাঁর পিতা তাঁর কথায় কর্ণপাত কোরবেন না, তাঁর কৌশলেও

সম্মত হবেন না। তাই বালা মনে মনে স্থির কোলেন, তাঁর মনের কথা পিতাকে বোল-বেন না, কেবল যে লোক না কোলে নয়, বারে উপলক্ষ কোরে কথ্যটি উদ্ধার হবে, তাহে ভিন্ন আর কাহাকেও সে কথা প্রকাশ কোরে বোলবেন না। জুদাক নিষ্ঠুরতার সহিত কোর, ভয়ঙ্কর নিজনি আবাসে তাতে চান একাকিনাই প্রবেশ কোরে হবে, বালা মনে মনে সেই বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগলেন, তখন তাঁর অন্তরাগ্না ভয়ে কেপে উঠেতে লাগলো, প্রাণের ভিতর হতাশ কোত্তে লাগলো, তাঁর মহাপ্রাণী যেন শুষ্ক হয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে বাসেন, তা সিদ্ধ কোত্তে পারবেন, এই সাহসে তাঁর প্রাণে আবার বলও হোতে লাগলো, বালা এ পর্যন্ত বিষম বিষম হোয়ে সময় কাটাচ্ছি-লেন, একপে সুখী হোতে পারবেন মনে কোরে তাঁর বিমল বদনকান্তি আছাদাছটায় ভাসতে লাগলো। বালা যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরে কিরে আসতে পারেন, তবে এ কাগাটি তাঁর পক্ষে কতই পুরস্কারের স্বরূপ হবে—তাঁর পিতার প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর নিজের সত্যায় রক্ষা হবে, গিজনি সহর কালান্তক কাল্মাকের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি পাবে, এতদিন হামেত যদি এপর্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকেন, তবে তিনিও বালার হস্তে মুক্তিদান পাবেন। এই সকল কুশল-সম্ভাবনার চিন্তা কোরে বালা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না, যুবতী তখনই নেবে এসে তাঁর পিতা যে ঘরে ঘুচ্ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোলেন, প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজেস্তা তখনও নিদ্রায় অভিভূত আছেন, যুবতী ভাবলেন, তবে ভাল সুবিধাই হোয়েছে, এই অবকাশে চুপে চুপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনার কাপ্তানিকির পথ পরিষ্কার কোত্তে চোলেই। বালা উন্মাদিনীপ্রায় হোয়ে উদ্ধারসে দৌড়লেন, এ গলি সে গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটি আবুমানির বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন, সে ব্যক্তি জাঁতিতে জুঁড়ি, সরাবের ব্যবসায় করে,

আরমানি বালাকে দেখে তটস্থ হোয়ে জিজ্ঞাসা কোলেন, “আপনি কেন এসেছেন, আপনার কি প্রয়োজন, আজ্ঞা করুন।” বালা তখনও তাঁপাচ্ছিলেন, তাই একটু জিরিয়ে সামলিয়ে, একটু দম্ব নিয়ে বোলেন, বিস্তর শিরাজ সরাব দিনেক দুদিনের মধ্যে আব-শ্যক হবে, এই কথা তাঁর পিতা বোলে পাঠিয়েছেন, তাই বালা স্বয়ং বোলতে এসেছেন, তিনি যেন এই দণ্ডেই তিন কুড়ি বারো বোতল সরাব প্রস্তুত কোরে রাখেন, আসবাব-মাত্র যেন পাওয়া যায়। আরমানি বোলেন, “সে আজ্ঞা, তাই হবে।” বালা ঐ কথা শুনে সেখান থেকে চোলে এলেন, আসবার সময় বোলেন, “এ কথা যেন কেউ শুনগেও জানতে না পারে, এ বিষয় যেন শুরুময়ের নাম গোপনে থাকে, তাঁর পিতা অতি মর্শ্বনিষ্ঠ বয়লমান, তাই এ বিষয় যদি লোকে জানতে পারে, তবে তাঁর পক্ষে বড় গ্লানির কথা হবে।” আরমানি বোলেন, “এ সংক্ষে তিন কন্ডা দুই ঠোঁট এক করবেন না, যিনিই হউন, কারুরই কাছে না।” খোজেন্তা বায়নাধরুপ কিছু দিলেন, হুঁড়ি পেয়ে সরে হলো। খোজেন্তা এফণে একটি কিমিয়াকারের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সে ব্যক্তি বালাকে দেখে বোলে, “আপনি একটু বসুন, একটু অপেক্ষা করুন, এই লোকটিকে বিদায় কোয়ে শীঘ্রই আসছি।” যে লোকটি তাঁর কাছে বোসে ছিল, সে চোলে গেল, কিমিয়াকার খোজেন্তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে ইশারা কোরে বোসতে বোলেন। যুবতী বোলেন, “ক্ষাহিল! একটা বড় গোপনীয় কথা আছে, কারুর কাছে প্রকাশ কোরবেন না তো? দেখবেন! প্রকাশ না কোরে থাকতে পারবেন তো?” কিমিয়াকার বোলে, “না বোলে থাকতে পারবো না কেন? আমি কাউকেও বোল্বে, না, আমার যদি নিজের কোন গরজ না থাকে, তবে তঁা শুন্তেও চাই না।”

খোজেন্তা বোলেন, “গরজ তোমারও

আছে, আমারও আছে, সে কথা নিয়ে সংসার শুদ্ধ লোকের গরজ আছে বোল্লেই হয়, আগে কোরান ছুঁয়ে দিবা করুন, আমি যে কথা বোল্বে, জনপ্রাণীর কাছে প্রকাশ কোরবেন না, তবে আমি যখন প্রকাশ কোত্তে বোল্বে, তখন কোরবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন।” কিমিয়াকার বোলেন, “আমি কোরান ছুঁয়ে মহশ্বদের নাম কোরে, বারো ইমামের নাম কোরে দিবা কোছি, আমি সে কথা যথাগ্রে আনবো না, এখন আপনার কি কথা আছে, বলুন।” খোজেন্তা বোলেন, “আপনি তো বেশ অব-গতই আছেন, গিজনির অদৃষ্টে কিরূপ ঘোর বিপদ উপস্থিত, তা আপনি জানতেই তো পাচ্ছেন, কাল কালমাকের আর তার পাষণ্ড দলবলের কথাই বোল্ছি।” কিমিয়াকার বোলেন, “আমি জানিনে তো জানে কে? নিজে ঠেকেছি, ভুলেছি, বিলক্ষণ ঠেকেছি, বিলক্ষণ ভুলেছি।” খোজেন্তা বোলেন, “তবে তো আরও ভাল হলো, তুমি একটু মনে কোলেই ঐ কালমাককে দল বল শুদ্ধ নিপাত কোত্তে পারি। তাদের জন্যে কারুর খেয়ে শুয়ে সোয়াস্তি নাই, গিজনি যেন যমালয় হোয়ে উঠেছে।” কিমিয়াকার শুনে চোমকে উঠে খোজেন্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইছেন, তাঁর যেন ধাঁধা লেগে গেল, শেষে বোলেন, “এত বড় মহৎ কার্যে আমা হোতে কি উপ-কার হবে বলুন, আমার দিবা, যদি না বলেন, তুমি আমার ঠাট্টা কোচো, বোধ হয়।” খোজেন্তা বোলেন, “না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যই বোল্ছি, কালমাক উপপন্নী কোরুরে বোলে আমায় চেয়ে পাঠিয়েছে।” কিমিয়াকার শুনে শিউরে উঠে বোলেন, “এর পর আরও না জানি, কতই শুন্তে হবে!! সে পাষণ্ড যেন নরকাগিতে দগ্ধ হয়, তার পেট কি ভোরবে না! তার তৃষ্ণার কি শাস্তি হবে না, তুমি যাবে না দেখতে পাছি।” খোজেন্তা বোলেন, “আমার যাওয়াই উচিত, তার কথা অমান্য কোত্তে পার্বে না, বাবো বোলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি।” কিমিয়াকার

বোল্লেন, ‘আমা হোতে কি উপকার হোতে পারবে বলুন ।’

খোজেস্তা বোল্লেন, ‘তবে বলি, মন দিয়ে শুনুন । আস্তে আস্তে চতুর্থ তারিখের রাত্রে একজন দাস, কি দাসী সঙ্গে কোরে, বিস্তর শিরাজ সরাব্ নিয়ে ভগ্ন মসজিদের কাছে আমার যেতে বোলেছে, আমি মনে কোরেছি, ডাকাতদের পক্ষে এই যেন শেষ সরাব পান করা হয়, সে সুখা যেন আর তাদের মুখে ঢালতে না হয়, সেটি কিন্তু তুমি না অনুগ্রহ কোলে হয়না ।’ কিমিয়াকার বোল্লেন, ‘তবে বুঝতে পেরেছি, বিষ,—তুমি আমার বিষ দিতে বোল্ছো ।’

যুবতী বোল্লেন, ‘কোন প্রকার মাদক হোলেও হবে, যাতে শীঘ্র শীঘ্র অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়ে, সেই দিতে দেবেন ।’ ফাইল বোল্লেন, ‘তা হোলে পারি, এক প্রকার গুঁড়ো আছে, সরাবে নিশিয়ে কদিন কি দুদিন খ দেওয়া যায়, তার পর যে পান কোরবে, তাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতে হবে, দেখে বোধ হবে যেন সে অগাধ অচেতনে ডুবে আছে, কানের কাছে কামান লাগলেও তার চৈতন্য হবে না । তবে সে সরাবগুল আমার কাছে এনে দাও, কালমাকের নিপাতে আমরা সকলেই আনন্দে মৃত্যু কোরবো, আমাদের ভদ্র আত্মীয়ের কন্যাকে সে উপপত্নী কোত্তে চায়, সে ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা !’ যুবতী বোল্লেন, ‘সরাবের ফর্মাস দিয়ে এসেছি, সরাব নিয়ে যা কোরবো, আগাকে সে কথা ভেঙ্গে বলি নাই ।’ কিমিয়াকার বোল্লেন, ‘সেইটিই বুদ্ধির কাজ কোরেছো, তবে তুমি পারবে, কালমাককে যদি গিজনিতে জ্যাস্ত ধোরে নিয়ে আসতে পার, তবে সহর-গুদ্র লোক তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল স্মরণ কোরবে, তোমার এ ধার কখনই তারা পরিশোধ কোত্তে পারবে না ।’

খোজেস্তা বোল্লেন, ‘আমিও তাই মনে কোরেছি, তাকে জ্যাস্তই ধোরে নিয়ে আসবো, একখানা ডুলির কিন্তু প্রয়োজন

হবে, সে ভার আপনার উপর, ঐ ডুলি নিয়ে আপনাকে সেই ভগ্ন মসজিদের কাছে দাড়িয়ে থাকতে হবে, আমি সেই ডাকাতের সর্দারকে অচেতন অবস্থায় হাতে পায় বেঁধে, সেইখানে নিয়ে আসবো ।’ ফাইল বোল্লেন, ‘আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, বাকি দল-বলের দশা কি কোরবেন ?’ যুবতী বোল্লেন, ‘সে ভার আমার উপর, যা কোরবো, তা মনে মনে ঠাউরিয়ে রেখেছি, তাদের আর গিজনিতে উৎপাত কোত্তে হবে না ।’ কিমিয়াকার বোল্লেন, ‘তোমার পিতা এ কথা জানেন ?’ যুবতী বোল্লেন, ‘তিনি এর বাশ্পও জানেন না, সেই জন্যই তোমায় আগে ভাগে দিয়া কোরিয়া নিইছি, এ কথা কারুরই কাছে প্রকাশ কোরে বোলবে না । আমাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হোলে কি হয়, আমাদের অভিপ্রায় পিতা যদি সুধায়ে জানতে পারেন, তবে আমার তখন আটক কোরে ফেলবেন, বাড়ীর বার হোতে দেবেন না, বরের মধ্যে পূরে চাবী দিয়ে রাখবেন, তা হোলে তিনি নিশ্চয়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ নির্দয় কালমাকের ক্রোধের ভাঞ্জন হবেন । আমাদের কাজী দাস সিদ্দিসুফাকের হাত দিয়ে সরাব, ফল আর অর্থ পাটিয়ে দেবেন স্থির কোরেছেন । সিদ্দিসুফাককে আমাদের অভিসন্ধির কথা এখনও ভেঙ্গে ধোজিনি, সে কিন্তু আমার অবাধ্য হবে না । ফাইল ! আপনার কাছে সরাব পৌছবে, তবে এক্ষণে আমি চোল্লোম ।’

খোজেস্তা বাড়ী এসে দেখেন, তাঁর পিতা ঘুমে থেকে উঠে আপনার বিপদ স্মরণ কোরে, কি কোরবেন তাই ভাবছেন । খোজে বোল্তে লাগলেন, ‘হায় ! এ সময় যদি কেসোয়াং খাঁ উপস্থিত থাকতেন, তবে কত উপকারই হোতে পাত্তো, এ দুঃসময় কত ছলা পরামর্শ দিতে পাত্তেন, খোজেস্তা ! তুমিই তাঁকে ডাড়িয়েছো, সে ব্যক্তি থাকলে আমাদের মৃত্যু-যুধ থেকে রক্ষা কোত্তে পাত্তো ।’ খোজেস্তা শুনে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন, দেখলেন, তাঁর পিতা শোকাহুল

হোয়ে বুকি-বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তাই আর কোন কথাই উত্তর কোলেন না। পরদিন যুবতী সিদ্দিসুফাককে ডেকে আপনার মতগবের কথাটি চুপে চুপে বোলেন, কাফ্রি শুনে আফ্লাদে চুল্ বুল্ কোত্তে লাগলো, গিল্ খিল্ কোরে একগাল্ হেসে বোলেন, “আমি এট দণ্ডেই প্রস্তুত আছি।” খোজে তারে সরাব আন্তে পার্টিয়ে দিলেন, কাফ্রি দাস ঐ সরাব্-সংসার বাড়ীতে না এনে কিমিয়াকারের কাছে নিয়ে গেল, কিমিয়া-কার পোজেস্তার অভিপ্রায় মতন তাতে মাদক মিশিয়ে দিলেন। ফল আর অর্থ তাঁর প্রস্তুতই ছিল, এক্ষণে সরাব পেয়ে খোজে কাফ্রি দানকে ডেকে বোলেন, “এই সকল জব্বা আর অর্থ ভগ্নমাসদে পৌছিয়ে দিতে হবে।” সিদ্দিসুফাক জাতিতে কাফ্রি, দীর্ঘাকার, স্থূল-কায়, সে মনে কোলে, হয় ত তবুর প্রাণ লয়ে টানাটানি পোড়বে, তাই সে যাবে কি না যাবে, ছুমনা হোয়ে সাত পাচ ভাবতে লাগলো, তার ইচ্ছা যে, সে যাবে না, কিন্তু তাঁর মূনিব বারম্বার বোলতে লাগলেন, “তোম্বু কোন ভয় নাই, তোরে প্রাণে মেরে, কি তোরে বন্দী কোরে রেখে ডাকাতদের কি লাভ হবে?” তাই শুনে কাফ্রি দাস বেতে প্রস্তুত হলো। খোজেস্তা সে রাত্রের মত পিতার কাছ থেকে বিদায় হোয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোলেন, খোজেও আপনার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুতে লাগলেন। একটু পরে যুবতী উঠে দেখেন, তাঁর পিতা সচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাই দেখে বালা একখানা সাল ওড়বোড় কোরে গায় জোড়িয়ে মস্ত ঘোমটা টেনে দিয়ে নিঃসাড়ে নেবে এসে, দরজা খুলে বেরিয়ে পোড়লেন, রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশে একটিও নক্ষত্র ছিল না যে, তার মলিনপ্রভা যুবতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সহর নিঃশব্দ, এত নিঃশব্দ যেন, কবরস্থানের হায় বোর ভীষণ মূর্ত্তি জ্ঞান হোতে লাগলো। যুবতীর ত্রাস হলো, তিনি তখন ভাবতে লাগলেন, হয় ত এইবার শেষ হলো, আর তাঁকে ঘরেও কিরে

আসতে হবে না, দরজা পার হোয়ে বাড়ার বাইরেও যেতে হবে না। বালা! আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন, তাঁর মহা-প্রাণী কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। স্বদে-শের মঞ্চলের নিমিত্ত বাত্মা কোরে বোরয়ে-ছেন, শেষে এই কথাটি মনে উদয় হোয়ে যুবতী মরি বাঁচি কোরে বাবার একটানা চোলে যেতে লাগলেন, চোলতে চোলতে কাফ্রি দাসের সঙ্গে যে স্থানে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, সেই সাক্ষেতিক স্থানে এসে পৌছিলেন, পৌছে দেখেন, একটা উটের পিঠে ছোটো বড় বড় রোয়াই ঝাঁকা বুলুছে, তাঁতে ফল আর সরাব আছে। মস্ত কাঁড়া-পুরু পাঁচহাত লম্বা প্রকাণ্ড বলবান্ সিদ্দি সুফাক্, তার পাশে দাড়িয়ে। কাফ্রি দাস খোজেস্তাকে দেখতে পেয়ে কোন কথাবাণী না কোয়ে উট ইকিয়ে আগে আগে যেতো লাগলো, যুবতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেন। যমালয়ের স্বরূপ ডাকাতদের কালান্তক আবাসের যত নিকট-বর্তী হোতে লাগলেন, ভয়ে আর হতাশে যুবতীর হাঁটু তক্তই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়তে লাগলো, তাঁর মনে অতিশয় ত্রাস হলো, প্রাণ অস্থির হোয়ে পোড়লো। উটটি গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, তাই বালা জানতে পারেন, ভগ্ন-মাসদে এসে পৌছেছেন, সেখানে কিন্তু জন-মানব উপস্থিত ছিল না, শব্দটি মাত্রও শোনা যাচ্ছিল না, যুবতী কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ডাকাতদের যে কথা, সেই কাজ, তারা এখনই এসে উপস্থিত হোলো বোলে, তাই ভেবে কাফ্রি দাসকে মোট ছুটি নাবাতে বোলেন, মোট ছুটি যেমন নাবান চরকে, অমন একটি শব্দ শুন্তে পেলেন, মসিদের সমুখে কেউ যেন আস্তে আস্তে দরজা খুলছে বোধ হোলো, ঐ শব্দ শুনে বালা থব্ থব্ কোরে কাঁপতে লাগলেন, তখন তাঁর মনে আক্ষেপ হোতে লাগলো, এমন অসম-সাহস কেন কোলেন, যাই হউক, এক্ষণে আর চারা নাই, কিরে বাবারও উপায় নাই। মর্চে পড়া পুরাতন দরজার কাঁচ কাঁচ শব্দের সঙ্গেই



গলায় স্বর, অস্ত্রের কানুখনি শুনে পেলেন, তার পরক্ষণেই ডাকাতেরা এসে যুবতীকে ঘেরে দাঁড়ালো, আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি না কোরে দুইটি মাত্র পুরুষ ঐ চাক অল্পম রত্নকে আঁতু কোলে, বাকী কয়েক জন কাফ্রি দাসকে হত্যাগত কোরে শিরাজ সরাবগুলি গহণ কোলে । খোজ-জ্ঞাকে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটি গলির মধ্যে লোয়ে গেল, লেগে বোধ হলো, গলিটির যেন অন্ত নাই, তার যেন শেষ নাই, ঐ গলির প্রান্তে এসে সমুদরেরা একটা মস্ত লম্বা শিশ দিলে, ঐ শিশ শুনে একটা চোরা দরজা কপ্পে আঁকল থলে গিরে কতকগুলি সিঁড়ি বেবিয়ে পো না ।

চলেছেন, তাঁর পেছনে কাফ্রি দাসও চোলেছে, সরাবের কাঁকাও চোলেছে, ঐ সিঁড়ি বেয়ে নেবে মস্ত একটা থিলান শরের মতো সকলে উপস্থিত হোলা, দরজার ডিওর বিশ্বর বাতির আলো অলুচ্ছিলো । এইবার কাল্মাকের হফে পোড়বেন মনে কোরে যুবতীর দাস চোলে, ততাত্তে তাঁর প্রাণের ভিতর গড়গড় কোতে লাগলো, কালার মনে এই ভয় হোলো, যে সকল লোক তাঁরে ঘেরে নিয়ে চোলেছে, তাদের অপেক্ষা কাল্মাকের মুক্তি অসম্ভব আরও নিষ্ঠুর হবে । ডাকাতেরা নেবে চোলে গেলে চোরা দরজাটি বন্ধ হোলো, খোজ-জ্ঞাকে নিয়ে একটা গদীর উপর বসালে, “দুরন্ত বীরপুরুষ কাল্মাককে এখানেই দেখতে পাবেন,” ঐ কথা বোলে যুবতীর ধোঁমুটি পশুবৎ নিষ্ঠুরের মত জোর কোরে টেনে থলে ফেলে দিলে, তার তাৎপর্য্য এই, কাল্মাক যেন তাঁর মুখকান্তির বিমলছটা স্নন্দররূপে দেখতে পান । যুবতী এখন অর্দ্ধ-নগ্নপ্রায় হয়ে কমবেশ কুড়ি জন নির্দয় মূঢ় ডাকাতের মধ্যে বোসে পোড়লেন, সিঁদিসু-ফাক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, সে তাঁর কানে কানে বোলে, “এ অপমান মনে কোরো না, এ অপমান কতকণের জন্ত, শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তুমি ভয় পেও না, তোমার সাহসের উপর সব নির্ভর কোচ্ছে ।” ঐ সকল কথা

বোলে কাফ্রি দাস যুবতীর মনে উৎসাহ দিতে লাগলো ।

কাল্মাকের অসুস্থতি ছিল না, তিনি ভিন্ন আর জনপ্রাণীও বালার নিকটে গিয়ে যেসে বসে । যুবতী যখন ঘোমটা খুলে চন্দ্রবদন বার কোরে গদীর উপর বোসলেন, তাঁর মুখকান্তির বিমল ছটা দেখে “সাবাস! কাশ্বব! বাহবা! বাহবা!” বোলে সকলে তাঁর রূপের একচেটে পোড়ামি কোতে লাগলো । বালা চোরা আসামির মত খুঁ খুঁ কোরে কাঁপতে লাগলেন, ভয়ে তাঁর চন্দ্রবদন মগ্নিন হোলো, কাল যেম যেন শরৎপ্রভা ঢেকে ফেলে, ডাকাতেরা কানে কানে বলাবলি কোতে লাগলো, “ছুঁড়ি একে তো অমনিই দেখতে ভাল, তার উপর আবার চুলচল ফিরিয়ে শরীরের পাটখাট কোরে বেহদ বাহার দিয়ে এসেছে, যেন বোদার উপর গোধকারী কোরেছে । কাল্মাক একটা প্রধান দেওয়াল, এক চিটা বাতী কোরে ক-টা কাঁই ধরে এনে মজত কোড়ে, আজকাল তাঁর পড়তা ভাল, সেই পড়তার কোরেই এই শিকারি তাঁর হাতে লেগেছে, দপেও তেমন কমাকসি কোতে হয় নি, বেশ, সস্তা দরেই পেয়েছেন, এখন রক্ত-তামাসা দেখিয়ে, রক্ত-ওয়ারি, ইয়ারুকি দিয়ে, মজাদারি মজাদারি বোলচাপ শুনিয়ে তার মনটা আমোদে মাতিয়ে তুলতে পায়ে হয়, আজ না হয়, কাল হবে, এত তাড়াতাড়িইমা মি ?” প্রস্তরাক্ষিত রেখা, আর বালম্বভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না, তেমনি আবার ছোট লোকের অসত্যতা, কি তাদের বে-আদবীপানা চট্ কোরে ধাবার নয়, তাই ডাকাতেরা জাতীয় হবে, মরদানা গলায় চাঁৎকার কোরে আপনাদের কারুদানি মরুদানি দেখাতে লাগলো ।

সওকিন গোছের ছবি টানিয়ে, রক্ত-বর-কম লতা-পাতা চিত্রিত কোরে, তার উপর আরও কতকগুলি বাতির আলো জ্বলে দিয়ে ঘরটি বেহদ বাহার কোরে সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল । দরজার কাছে আনুকা আনুকা চেহারার ভিড় লেগে গেল, তাতেই যুবতী

নিশ্চয় জানতে পারেন, কাল্মাকের আগমন হচ্ছে। একজন ডাকাত বোলতে লাগলো, “ভদ্রান্ত কাল্মাকের জয় হউক, কাল্মাক হুনিবার, দুর্জয়ী, দুঃসাহসী, তাঁর মঙ্গল হউক।” এই সময় ঐ কাল অবতার মহাপুরুষ কার্ণাচোপের পোষাক পোরে, পোষাকটি বকুমক্ বকুমক্ কোচ্ছিলো, মাথায় একটি সাদা পাগড়ী, মুক্তা দিয়ে মোড়া, কোমরে একখানা ছোরা, তার যুটটি হীরাপান্নায় জড়িত, এক পা দু পা কোরে, ধীরে ধীরে বন্দীদার মধুর সম্মুখে উপস্থিত হোলেন। তাঁর আসবার পূর্বে যুবতী রোয়ে রোয়ে চোমকে চোমকে উঠছিলেন, এক্ষণে ভয়ে জড়সড় হোয়ে পোড়লেন, তাঁর সাহস হোলো না, মাথা তুলে কাল্মাকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কাল্মাক বালার নাম ধোরে ডাকলেন, বালা স্বয়ং শুনে শিউরে উঠলেন, সে স্বয়ং মিত্রবৎ পরিচিতের স্তায় জ্ঞান হলো, তখন যুবতী সাহস কোরে চোক মেলে মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, দেখেই গদির উপর মূচ্ছিতা হোয়ে পোড়লেন, বালা কাল্মাককে চিন্তে পারেন, এ ব্যক্তি সেই চারুদর্শন কেসোয়াংবুর্বা, কান্দীর সওদাগর!! যুবতী মনে যে ভয় পেয়েছিলেন, সে ভয় থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে স্বপ্রোথিতের স্তায় হঠাৎ বোলে ফেললেন, “আমি কি স্বপ্ন দেখছি! তুমিই কি কাল্মাক ডাকাত!” কাল্মাক বোললেন, “হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি বটে, আমি তোমার উপাসনা কোন্তে ক্রটি করি নাই, তোমার অহ্নয় বিনয় কোন্তে ক্রটি করি নাই উদার মনে, অকপট চিন্তে তোমার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার কোরেছি, তুমি কি না একটা কদাকার আনাড়ী চাসার প্রণয়ে পোড়ে আমার প্রার্থনার অনাদর কোল্লে। এখন কি হবে মনে কোরে দেখো দেখি, বিনা দানে মথুরা পার নাই, আমার সঙ্গে পুনরায় ওরূপ ব্যবহার কোল্লে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না, শুধু কথায় পার পাবে না। কথা কও না যে? তুমি অবাক হোয়ে গেছো দেখতে পাচ্ছি, বিপদাপন্ন কান্দীর

সওদাগরের বেশ ধোরে তোমার বাড়ীতে গিছিলেম, আমার কি দুঃসাহস, তাই ভেবে তোমার বুঝি বিনয় জ্ঞান হোচ্ছে, আমি ধড়ীবাজ, আমি শঠ, আমি উপকার মানি না এই বোলে এ ভিন্ন আরও কত মানির কথা বোলে, তুমি আমার নিন্দা মন্দ কোন্তে শুনেছি, আমার দেখে ঘৃণায় যথ ফিরিয়ে অহ্নদিক দিয়ে চোলে যেতে, সেই আমি, এখন তোমার কাছে আমি কাল্মাক ডাকাত, তুমি আপন মুখেই আমার ডাকাত বোলেছো, বোলেছো বোলেছো, তাতে কিছু আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ক্ষোভও নাই, দুঃখও নাই, এক্ষণে স্বরে বোসেই আমার অতি যত্নের নিধিটি পেয়েছি, আমার রক্তটি বাড়ীতে এসে পৌছেছে। তোমার পিতা আমার মহা আজ্ঞার বেশ মান রেখেছেন, আমরা আমোদ-প্রমোদ কোর্বো বোলে তোমার পাঠিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে সরাব পাঠিয়েছেন, খাবার পাঠিয়েছেন, অর্ঘ্যও পাঠিয়েছেন। খোজেন্তা! আমাদের হস্ত-পরিহাসের মধ্যে, আমাদের আমোদ অহ্লাদের মধ্যে তুমি কি থাকবে না?” যুবতী বোললেন, “আমি আপনার অবাধ্য নই, আপনার যেমন অহ্ন-মতি হয়, আমি আপনার কথা অমান্য কোন্তে পারিনে।” কাল্মাক বোললেন, “এই তো চাই! তোমার চারুমুখে যে বিনয়-বাক্য বেরিয়েছে, তাই শুনেই আমি চারুতার্থ হলেম, এখনও বাকী আছে, এখনও কাল্মাককে ভাল-বাসতে বাকী আছে।” এই কথা বোলে বাকী ডাকাতদের প্রতি আদেশ কোরে বোললেন, “তোমরা এখন খাবার আয়োজন কর, কয়েদির প্রতিও বেন দৃষ্টি থাকে।” খোজেন্তা বোললেন, “কয়েদী কে?” কাল্মাক বোললেন, “গিজনির সওদাগর খোদাবাদের পুত্র হামেত, নামে এক ব্যক্তি আমাদের কয়েদী, বোধ হয়, তোমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় আছে।” খোজেন্তা শুনে প্রাণের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন, তাঁর বেন চম্কা-বাই হলো, বাহিরে কিন্তু স্থির শাস্ত হয়ে অগ্নানভাবে বোসে রোইলেন।

মনের ভাব সন্ধান করা আবশ্যক জেনে কাল-  
নাকের কথায় যেন বিশ্বাস কোল্লেন না, যুথের  
ভজিমায় এই ভাবটি জানালেন, কালমাক  
বোল্লেন, “তাকে দেখতে চাও তো দেখাতে  
পারি।” এই কথা বোলে জেবের ভিতর থেকে  
এক তাড়া চাবি বার কোরে খোজেস্তাকে  
দেখাতে লোয়ে চোল্লেন। একটি লোহার  
দরজার কাছে গিয়ে দরজাটি খুলে একটি অন্ধ-  
কূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, কালমাকের  
হাতে আলো ছিল, সেই আলোয় দেখেন,  
হতভাগ্য হামেত, একটা লোহার ঘেরার মধ্যে  
একটা জল-সপসপে দেওয়াল ঠেস দিয়ে  
বোসে আছেন। ঘেরাটি অতি ক্ষুদ্র, অতি  
অপ্রশস্ত, পাশ ফেরবার স্থান সেই, ঘরটিও  
ঘোর অন্ধকারময়, যমালয় বোল্লেন ও হয়। এক  
সময়ে যার অধরের চারু হাসির প্রফুল্ল ছটায়  
উল্লাসিত হোতেন, তাঁর এই নির্দয় বন্ধন-  
অবস্থা দর্শন কোরে যুবতীর মনে অতিশয় কষ্ট  
হলো। আলো দেখতে পেয়ে হামেত উঠে  
বোসলেন, তাই দেখে কালমাক অমনি তাড়া-  
তাড়ি খোজেস্তাকে টেনে ইঁচড়িয়ে তফাতে  
নিয়ে গেলেন, দরজাটি সজোরে বন্ধ কোরে  
চাবিগুলি পুরের মত আপনার কাছে রেখে  
দিলেন। তার পর বড় ঘরে এসে কালমাক  
বোল্লেন, “কেমন, এখন বিশ্বাস হোয়েছে  
তো?” যুবতী বোল্লেন, “তা হোয়েছে, ও  
ব্যক্তি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছে  
যে, তাঁকে কয়েদ অবস্থায় রেখে এত লাঞ্ছনা  
কোচ্ছেন।” কালমাক বোল্লেন, “সেই কথা  
আবার মুখে আনছো, ঐ ব্যক্তিই তো যত  
নষ্টামীর মূল, ঐ তো আমার অভিলাষ পূর্ণ  
হোতে দেয়নি, তার নামে আমার ঘৃণা হয়,  
তুমি আমার কাছে আর তার নাম কোরো  
না।” খোজেস্তা বোল্লেন, “সরদার সাহেব!  
আপনার অভিপ্রায় কি, ভেঙ্গে বলুন।” কাল-  
মাক বোল্লেন, “তোমারই উপর তাঁর অদৃষ্ট  
নির্ভর কোছে, তুমি যদি আমার হকুম অমান্য  
কোন্তে, তবে এই রাত্রেই তাঁকে সাবাড়  
কোরে ফেল্তেম।” খোজেস্তা বোল্লেন,  
“উঃ! তুমি তাঁরে খুন কোরে ফেলতে, না ?

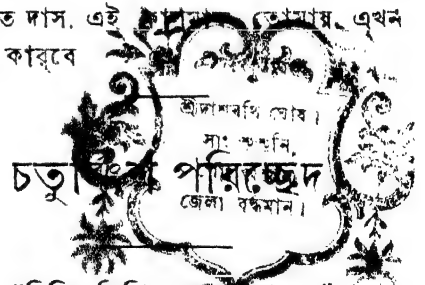
বোধ হয়, খুন তাকে কখনই কোন্তে  
না।”

কালমাক অমান্যমুখে বোল্লেন, “খুন তাঁকে  
নিশ্চয়ই কোন্তেম। তুমি যেমন প্রকলিতমনে  
হাসতে হাসতে তাঁর কোলে যেয়ে ছুটে  
বোসতে, সেইরূপ আমোদিনী হোয়ে আমার  
কোলে এসে যদি না বসো, তবে সে নিশ্চয়ই  
প্রাণে মারা পোড়বে।”

খোজেস্তা মনে মনে বোল্লেন, “উঃ! কি  
দস্যু! কি কাল পাষণ্ড! এদের একটু দয়া-  
মার্য নাই! এই ব্যক্তিই কি আমার অভাগা  
পিতার আশ্রয় লয়েছিল! এই কাল  
নিষ্ঠুর কি তত চারু হাসি, তত মনোহর  
কান্তি দেখিয়ে আমাদের মন মুগ্ধ কোরে-  
ছিল?” কালমাক বোল্লেন, “যুবতি!  
তোমার মনে কি উদয় হোচ্ছে, আমি তা  
জানতে পেরেছি, আমি যেন তা দেখতে  
পাচ্ছি, আমি যেন তোমার অন্তরের কথা-  
গুলি পড়তে পাচ্ছি, আমি সেই কান্দীর  
সওদাগর হোয়ে কি কোরে একটি প্রাণীর  
মৃত্যুর কথা লয়ে আমোদ কচ্ছি, তাই  
তোমার বিশ্বাস জ্ঞান হয়েছে, কি কান্দী  
ছাড়া কাণ্ড নাই; আমিই তোমাদের মজা-  
বার গোড়া; হামেতকে এখানে আসতে  
আমিই পরামর্শ দিই, আমিই তার পিতার  
জুতোর মধ্যে পত্র রেখে দিই, আবার  
আমিই তোমার বাপের খাতার মধ্যে পত্র  
গুজে রাখি। খোদাবাদকে উচ্ছিন্ন দিয়ে  
ছারখার কোরবো, হামেতকে প্রাণে মেরে  
ফেলবো, এই দুটি আমার প্রতিজ্ঞাই ছিল।  
তুমি শুনে শীউরে যাচ্ছ, শীউরিয়ে যেতে  
পারো সত্য, শীউরিয়ে যাবার কথা কিন্তু  
আরও আছে, তবে বলি শুন। মনুষ্য আমার  
কি না লাজনা, কি না হৃদিশা কোরেছে,  
যন্ত্রণা দিতে সাধা-মতে ক্রটি করে নাই;  
আমার বিস্তর অর্থ, বিস্তর বৈভব ছিল, মনুষ্য  
কর্তৃক জ্বালামি সে স্তব্ধসম্পদে এককালীন বঞ্চিত  
হয়েছি; সেই দুঃখে, সেই রাগে আমি  
একপে মনুষ্য যাত্রেয় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি;  
ইদারী আমি যখন বে মানস করেছি, তাই

সিদ্ধ করে তুলেছি ; আমি যখন বাক্য লক্ষ্য কোরবো, কি যখন যার প্রতি আকোশ প্রকাশ কোরবো, তারে যদি ভুলিয়ে, ফুসলিয়ে কি চার ফেলিয়ে আমার জালে এনে না ফেলতে পারি, তখন আমি তলোয়ার ধরি, অথবা আমার অন্তরে তলোয়ার ধরে আমার অভিলাষের পথ পরিষ্কার কোরে দেয়।” পোজেন্তা ঐ কথা শুনে মনে মনে আঁধার দেখতে লাগলেন, ভাবলেন, এমন বেপরোয়া খুনে কালদস্তির হাতেও এসে পড়েছি। কালমাক বলতে লাগলেন, “হাঁ! সে কথা মিথ্যা নয়, আমি ফের সেই কথাই বোঝছি, শুনে যাও। মন্তব্য আমার সঙ্গে অতি নির্দয় অতি নৃশংস ব্যবহার কোরেছে, আমার প্রতি এত নির্ভর এত পায়ও হয়েছে যে, পৃথিবীর সমুদয় মন্তব্যের রক্তপান কোলেও আমার ঘোর আকোশরূপ ঝালতুকা নিবৃত্তি কোন্তে পারি কি না সন্দেহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বে একটিবারও স্তম্ভিত দয়ারস, কি নৃকোমল করণারস আমার হৃদয়ের কোণে প্রবেশ হতে দিইনি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে মনে মনে বল্লম, এই যুবতীটির প্রণয়স্বথ আবাদন কোন্তে পাল্ল এ প্রণালীর সংসারলীলা পরিত্যাগ কোরবো, এই স্থি-বৃত্তি লোয়ে সামান্যুর্জি হোয়ে ভদ্র লোকের মজ্জা হির শাস্ত হোয়ে থাকবো, এই কোমলাঙ্গী বালার অনুরোধে স্বজাতীয় মন্তব্যকে পাষাণের মতন নির্দয় পীড়ন কোন্তে ক্ষান্ত হবো। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তোমার কালবিত্তকা জমিল, আমায় তুচ্ছতাচ্ছল্য কোরে আমার উপাসনার অনাদর কোলে, সেই হাবা পশুটা যখন আমার কাঁদে পোড়তে যায়, সেই সময় দেখলেম্, তুমি তার কোলের উপর মাথাটি রেখে বোদন কোচ্ছো, হা আল্লা! তাও কি প্রাণে নয়? তাই দেখে সর্কান্ধে যেন আগুন জেলে দিলে, রাগে অন্ধকার দেখতে লাগলেম, তখন এমনি হলো, ক্রোধে ফেটে গিয়ে বিবেচনার বাঁহিরে পোড়তে হয়, বা তোমাদের হৃদয়ের বুক ছোরা বসিয়ে দিই দিই কোরে দিলেম না,

তখন যে কি কোরে মনের বেগ সম্বরণ কোলেম, এক্ষণে তা বোলতে পারিনে, শেষে কিন্তু এই মনে হল, তোমার স্রুথের পথে কাঁটা দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার বেশ আছে, বোধ হয়, তার জন্তেই নিরস্ত হোলেম, আরও মনে কোলেম, কোথা যাবে, একদিন অবশ্যই হাতে পাবো, সে দিন হামেতের মুখ অবশ্যই বন্ধ কোন্তে পাবো। যে অন্ধের উপর তুমি মাথা রেখে বোদন কোরেছিলে, তার সেই পাপ অঙ্ক একদিন করকার ছায় ঠাণ্ডা কোরে দিতে পারবো, একদিন তোমারে আপনার অন্ধের উপর রেখে আনন্দে ভাসতে পারবো, তখন তোমার অনুরাগে, উন্মত্ত হয়ে আমার হৃদয় নৃত্য কোন্তে পারবে, সেই দিন আজ উপস্থিত, তোমার অনুরোধে হামেতকে প্রাণে নষ্ট কোরবো না, তবে কথা এই যে, আমার যেকোন অভিলাষ, আমার যেকোন মনের আশা, তোমায় সেইরূপ চোন্তে হবে, আচ্ছ আর সে সব কথায় কাজ নাই। ঐ দেখ, আমাদের আহার প্রস্তুত হয়েছে, আর তোমায় ভয় কোরে চোন্তে হবে না, কালমাক এক্ষণে ডাকাত নয়, কালমাক এক্ষণে তোমার পদা-নত, তোমার শরণাগত, তোমার একান্ত আশ্রিত দাস, এই কালমাক তোমায় এখন রক্ষা কোরবে



“বিধির লিপি কপাল-কোড়া।”

সারি সারি আহারের পাত সাজিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সর্বদারকে লোয়ে ডাকা-তেরা পচিশটি প্রাণী মাঝ, তারা সকলেই আহার কোন্তে বোসে গেল। মোটা মোটা রটি, খেতে কিন্তু বেশ সুস্বাদু, শোয়া, ছাগ-লের মাংস, হরিণের মাংস প্রভৃতি নানা উপ-করণ প্রস্তুত হোয়েছিল। সিদিনকাক পোজেন-টার পচাতে দাঁড়িয়ে, যুবতী প্রধান হোয়ে

কাল্মাকের উচ্চ গদ্বির উপর বোসে আছেন। তাকাতেরা সম্প্রতি যে যে বিষয়ের 'চেষ্ঠা' কোরেছিল, তারা সকল চেষ্ঠাই সকল কোরে হুলেছে, অনেকবার মোস্তে মোস্তে বেঁচে গিয়েছে, অনেকবার অনেক জখম, অনেক ঝাঁকি মাথার উপর দিয়ে কেটে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এই সকল গল্পই অধিক চোলেতে লাগলো।

আহার শেষ হোলে খোজেস্তার আনাত শিরাজ সরাব আনতে বলা হলো, সকলেই এক এক গ্রাস পান্ন কোলেন, এটি যেন ভোজ-নামে আচমন করা হোলো। একটু গোলাবী নশার আমেজ হোয়ে এলে কাল্মাক সঙ্গী রাকাতদের ডেকে বোলেন, “আজ কেউ একটি ফাঁটাও ফেলতে পারবে না, পাত্র শুদ্ধ চেটে খজ্ঞে হবে, আজ খোজেস্তার গৌরবের নিমিত্ত মন খুলে, প্রাণ ভোরে, নিজস্ব চাঁকা যামোদ কোস্তে হবে, আজকের রাতটে কবল আমোদ ইয়াবুকি কোরেই কাটাতে বে, আজ সকলকে পেট ভোরৈ নেশা কোস্তে বে।” সিদিসুফাক্ একে চায়, আরে পায়, ই কথা শুনে ছুটে গিয়ে ঝাঁকা থেকে একটা বাতল টেনে বার কোরে, আচা কোবে ঝাঁকুরিয়ে নিয়ে, একটি রূপোর গ্রাসে কানায় কানায় ঢেলে কাল্মাকের হাতে এনে দিলে, গাই দেখে সকলে “আমার দাও, আমার দাও” বলে চৈচিয়ে উঠল, কাক্রিদাস অমনি তাড়াগাড়ি তাদের বেঁটে দিতে লাগল, বেঁটে দেবার বোতলটি একবার কোরে ঝাঁকুরিয়ে নিক্ষেপ, আসল কাজই সেই, সে কার্যটি সে লেছিল না। একটি গ্রাস কানায় কানায় ভরে গ্রাসটি মুখের কাজে ধরে কাল্মাক বালুতে লাগলেন, “খোজে সওদাগরের মল্যানের নিমিত্ত এই প্রথম পেয়ালা পান কাছি, আমি প্রতিজ্ঞা কোলেন, আর কখন ঝাঁকে বিরক্ত কোরবো না।” এই কথা বোলে ক নিশ্বাসে পাত্রটি শেষ কোরে খোজেস্তার ঝাঁকে ফিরে বোসলেন, খোজেস্তা তাঁর পিত্রায়ে কাল্মাকের সঙ্গে মুখে যেমন হান্ত-গতুক কোস্তেন, এখানেও তাঁর সঙ্গে সেই-

রূপ আমোদ-আহ্লাদের কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এ সরাবটি স্বার্থই অতি সুস্বাদু, অতি উপাদেয়। কাল্মাকের অকমতি পেয়ে সহচরেরা বেপরওয়া বেখবর হয়ে, নেশায় চুবুচুরে হোতে লাগল, তারা তখন সঙখিন গোচের খাসুইয়ার হোয়ে তুখড় ইয়াবুকিতে মেতে গেলেন, পোডো মসিদটি ঘেন থোস ইয়ারকির খুসিখোব্রামীর সিকপীঠ হোয়ে দাঁড়ালো, মদের গব্রায় মজলিস মেতে উঠলো, গ্রাসের উপর গ্রাস চোলেতে লাগলো, “ভবু সরাব, লাও সরাব,” ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল এই বোল বেঙতে লাগলো। যার একটু নেশা কম পোডতে লাগলো, সিদিসুফাক্ অমনি টাটকা গেলাসের রসান দিয়ে চানকে দিতে লাগলো। ঘরে যেন চাঁদের তাট বোসে গেল, গ্রাসের বোলবোলাও বেড়ে গেল, নেশার পসার দাঁড়িয়ে গেল। থোস-মজলিসের খাস ইয়ারেরা প্রাণ খুলে আয়েস কোস্তে লাগলো। সকলের চক্ষু যেন জ্বা-কল হোয়েছে, চৈচিয়ে চৈচিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে, ভবু “লাও সরাব, দেও সরাব” বোলে গলাবাজির উপর গলাবাজি কোস্তে ছাড়ছে না। সিদিসুফাক্ অমনি পেয়ালা উপর পেয়ালা দিয়ে সবুফরাজি দেখাতে লাগলো। এখন সকলেই নাকাল, সকলেই আপনার আপনার মতলব-মতন আয়েস-আমোদ কোস্তে মেতে গেল। কেউ আড় হোয়ে শুয়ে পড়লো, তার আর চলে না, গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ মুকসি-আনার কথাবার্তা কোয়ে বাহবার উপর বাহবা মাত্তে লাগলো, কেউ হেসে কেশে লোক জান্নয়ে, স্বর্গদেখানো ভয় দেখিয়ে চোক্ রাগাতে লাগলো, তার কিছু অপমান বোধ হোয়ে মনের মধ্যে ঘানি জন্মেছে। কেউ হটকো বোয়েদের মতন ঢুকুড় কোয়ে ছুটে একেবারে বাহিরে গিয়ে পোড়তে লাগলো, আবার তারে সেধে পেড়ে ধরাধরি কোরে ঘরে এনে ফেলতে লাগলো। কেউ কেউ আবাড়ে জমাট গলায় তা, না, না, না, সুরে তান্ ছেড়ে সকের আয়েস যেটাতে

লাগলো, কেউ আয়েস ভরা গোলাবী পানের খিলি থেয়ে, কেউ মজাদারি মজাদারি বোল-চালের চটক দেখিয়ে কেউ আনুখা আনুখা রসতামাসায় ছেয়ে দিয়ে মজলিস গুলজার কোন্ডে লাগলো। কেউ হাসির গটরায় মহা-ফেল গরম কোরে তুলতে লাগলো, আবার কেউ কেউ চোক্ ছুটি চল্‌ছলে কোরে একটি আড়াই-হাতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কান্দো কান্দো মখে চুংখের কতই কাঁছনি গাইতে লাগলো, যেন সত্য সত্যই সে কতই আতা-স্তরে পোড়েছে। কেউ আবার কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে আছড়া-আছড়ি কোরে লুটোপুটি যেতে লাগলো, কেউ হাঁসবে কি কাঁদবে বোলে কেবল তার পতন কেঁদে নিয়েছে, অমনি আর একটি মাতাল-ইয়ার মুখ চেপে ধোরে বোলে, “না বাবা, এখানে হাসতে কাঁদতে পারবে না, মদের ঝাঁজে নাক-মুখ জলে যাবে।” কেউ বিছানার উপর থুতু ফেলেছে, যেন উড়ো কাকে এক ধাবড়া হেগে দিয়ে গিয়েছে, কেউ বা বমি কোরে ভাসিয়ে দিয়ে হি হি কোরে এক গাল হেঁসে ফেলে, কেউ মদের ব্লক্‌চো কোরে গায় দিতে লাগলো, যার গায় দিলে, সে বোলতে লাগলো, “মাতালের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাতে হোলো।” কেউ বদমায়েসি ফর্চকিমি কোরে গায় থুতু দিয়ে পালাতে লাগলো, কেউ ঘরের এক কোণে গিয়ে ফালতো পরামর্শ আটতে বোসে গেল। আপনার আপনার কুচিমত সকলেই প্রাণ খুলে আমোদ কোন্ডে লাগলো, মাতামাতি, হটোহটি, নৃত্য-গীত, চীৎকার, হোরুয়া, গড়া-গডি, ঢলঢলি কোরে সকের আমোদ আরও কাঁপিয়ে তুলে, তখন খোজেন্তা যেন তাদের আয়েস-সাগরের তরঙ্গী হয়ে বোসেছেন। নেশা যতই চেপে ধোন্ডে লাগলো, ততই বদমাস ইয়ারদের আমোদ আছাদ ফুরিয়ে আস্তে লাগলো, খানিকক্ষণ পরে সকলেই ঝিম্‌ঝরা হয়ে পোড়লো, তখন আফিম-থেকো মণ্ডতাদির মতন, আকের রস-থেকো লড়ায়ের বুল্‌বুলি মতন ঝিমুতে আরম্ভ

কোলো, ঝিমুতে ঝিমুতে আগে ঝুঁকে ঝুঁকে শেষে ঢোলে ঢোলে পোড়তে লাগলো, তার পর প্রাক্ একেবারে গড়িয়ে চোলো, সকলে অজ্ঞান অচেতন হয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কাল্মাকের গোলাবী নেশা ছাপিয়ে উঠে এক্ষণে তিনি ভরপুর নেশায় হাবডুবু খাচ্ছিলেন। গ্রাসটি খালি হোতে না হোতে সিদ্দিস্বাক্ অমনি কানায় কানায় ছাপাছাপি কোরে দিচ্ছে, তাতে আর সর্-ফরাজির খাঁজি ছিল না। গ্রাসটি পূর্ণ কোরে কাল্মাকের হাতে দিয়েই একটা লম্বা চোড সেলাম কোরে, একটু সোরে গিয়ে তফাতে দাঁড়াতে লাগলো, খোজেন্তা দেখলেন, তিনি ষা ভেবেছিলেন, সেইটিই ঘোটে আসছে। সুন্দরী এক্ষণে অন্তর ঢেকে রেখে বাইরে হাস্যমুখী হয়ে কাল্মাকের সঙ্গে গল্প কোন্ডে বোসে গেলেন, কাল্মাক্ আছাদে উন্নত হয়ে হেঁসে খেল, ঢোলে ঢোলে, গোড়িয়ে গোড়িয়ে পোড়তে লাগলেন, শেষে যে তাঁর কি দুর্দশা হবে, সেটি তিনি স্বপ্নেও জানতে পারেন নি। মাদকের প্রভাবে দলবলেরা অধোর অচেতন হয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো, ঐ মাদকের বিক্রম এক্ষণে স্বয়ং কাল্মাকের উপর চেপে বোসেছে, তাঁর মাথাটি বৃকের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে পোড়তে লাগলো, চক্ষু দুটি ভারি হয়ে দুলু ঢুলু কোন্ডে লাগলো, শরীর এক পাশে টোলে টোলে পোড়তে লাগলো, এখন এমনি দুর্দশা হলো যে, যার সঙ্গনাশ কোর-বেন বোলে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, এখন তারই হাতে আপনি এসে ধরা দিলেন, আর যে নোড়্‌বেন চোড়বেন, সে পথ নাই। কাল্মাক্ এক্ষণে ক্রমে অবসন্ন হয়ে মড়ার মত আড়ষ্ট হয়ে পোড়লেন। দলের মধ্যে তিন জনের মাত্র চৈতন্য ছিল, তাদেরও চক্ষু ক্রমে মূদিত হয়ে এলো, জন্মের মতন মূদিত হয়ে এলো, সে চক্ষু আর তাদের উন্নীলন কোন্ডে হবে না। সিদ্দিস্বাক্ যে কার্ণা কোন্ডে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, এক্ষণে সেই কাজে প্রবৃত্ত হলো, সরাবের ঝাঁকার ভেতর

থেকে একখানা মস্ত দুমুখো ধারাল কষায়ের ছাড়া “বোগন্দা” বার কোরে মহামারী দারস্ত কোরে দিলে। কাফ্রি দাসকে স্থির-  
 তে তত প্রাণীর মস্তক ছিন্ন কোত্তে দেখে  
 খোজেন্তার অকুণার জন্ম যান হলো, তাঁর  
 প্রাণী শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো।  
 ঐ অতি পাষণ্ডবৎ নির্দয় অভিনয় সত্য,  
 কিন্তু যুবতী ভেবে দেখলেন, তাদের প্রাণে  
 হাজার করাই তাঁর কর্তব্য কর্ম, নির্ভর হলেও  
 ঐটি তাঁর করা উচিত, তবে কি তাঁর মনে  
 শয় কষ্ট হতে লাগলো, সে কষ্টের উপায়  
 ক, অবশেষে চব্বিশটি নির্মস্তক ধড় এদিকে  
 এদিকে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।  
 কণে মাত্র পাষণ্ড কালমাক, যিনি ডাকা-  
 তর সরদার; তিনিই কেবল অধোর নিজায়  
 ভিত্তি আছেন। খোজেন্তা তাঁর চারু মুখ-  
 স্থির ছটায় মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে  
 তাকিয়ে দেখছিলেন, তখন সেই সরদার  
 কাত নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নমনে অকাতর নিজায়  
 তাঁর আচ্ছন্ন ছিলেন। যুবতী মনে মনে ভাব-  
 লেন, যদি এ ব্যক্তিকেও প্রাণে নষ্ট করবার  
 অভিপ্রায় থাকতো, তখাচ তার উপর কোপ  
 ক্রিয়ার সময় যুবতী সিঁদিল্লুকাকে নিবেদ  
 করে বোলতেন, “থাক থাক, এ ব্যক্তিকে  
 গণে নষ্ট কোরো না।” বালা তাঁর চক্ষের  
 পর এমন চারু কান্তির নিপাত হোতে কথ-  
 ই দিতেন না, তাই খোজেন্তার মনে এই  
 স্তম্ভি হলো, অস্তের বিচারে যা হয় হউক,  
 কালমাকের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক, তিনি কিন্তু  
 মজ্ব হস্তে তাকে খুন কোরবেন না। এক্ষণে  
 ভীণ্য হামেতকে উদ্ধার করা বালার মুখ্য  
 অভিপ্রায়, তাই সরদার ডাকাতের কোমর  
 থেকে চাবির তাড়া খুলে নিয়ে গারদখানায়  
 টে চোলেন। দরজা খুলে দেখেন, ভীণ্য  
 হামেত একটা ছেঁড়া ঝাঁতলার উপর পোড়ে  
 মুচ্ছেন। “হামেত হামেত” কোরে ডাক-  
 লেন, হামেত যুবতীর স্বর শুনে ধড়মড়িয়ে  
 ঠে বোসলেন, উঠে বোসেই বোলেন, আমি  
 কাথার? খোজেন্তা! তুমিই কি ডাকছো?  
 হুঁতগা! আগে যারে বন্ধু বোলে জানতে,

সেই বিশ্বাসঘাতকের হাতে পোড়ে তুমিও  
 কি কয়েদ হয়েছো?”

খোজেন্তা বোলেন, “হামেত! তা নয়,  
 তা নয়, আল্লা তা না করুন, তুমি এক্ষণে  
 পরিজ্ঞান পেলে, এখন উঠে বাইরের ঘরে  
 এসো, সেই বড় ঘরে এসে দেখ, সেখানে কি  
 কৌশল করা হয়েছে, এ যণিত কারাবাসে  
 আর জন্মেও তোমার আসতে হবে না।”  
 হামেত তখনও হতবুদ্ধি হয়ে হবুজবুর মতন  
 হয়ে আছেন, যুবতীর কথার মর্ম গ্রহণ কোত্তে  
 পারেন না, তা নাই পারুন, বালার সঙ্গে সঙ্গে  
 কিন্তু চোলে এলেন। একটু পূর্বে যে ঘরে  
 আমোদ-প্রমোদের, হাস্য-পরিহাসের বাজার  
 বোসে গেছিল, সেই বড় ঘরে এসে দেখেন,  
 গড়া গড়া মৃতদেহ পোড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে,  
 সকলেরই শিরচ্ছেদন, করা হয়েছে, কেবল  
 দুরাচার মৃত কালমাক কালনিদ্রায় ভিত্তি  
 হয়ে থাকবার ভায় গভীর অচেতন হয়ে পড়ে  
 আছে, তাই দেখে হামেত চীৎকার-শব্দে  
 বোলেন, “খোজেন্তা! দোহাই আল্লার! এ-  
 সব কি কারখানা? আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে  
 স্বপ্ন দেখছি, না ডাকাতেরা যথার্থই ঝাড়ে  
 বংশে নির্মূল নিপাত করেছে, তাই দেখছি?”  
 খোজেন্তা বোলেন, “স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক তাই  
 বটে, এ বড় ভয়ানক দর্শন, এ দর্শনটি পাষণ্ডবৎ  
 মূঢ়াশ্রকণ্ড বটে, কিন্তু এক্ষণে নৃশংস উপায়  
 অবলম্বন না কোরে ক্ষান্ত থাকতে পারেন না,  
 সেটা নিতান্তই আবশ্যক হয়ে উঠলো, এখন  
 আমি দিন কিনে নিয়েছি, কার্য্য সুসিদ্ধ  
 কোরে তুলেছি, আমাদের শত্রু যে, সে তো  
 অধোর নিজায় অচেতন হয়ে পোড়ে আছে,  
 তার দলবল যারা, তাদের আর কশ্মিন্ কালেও  
 গাজোখান কোত্তে হবে না।” হামেত  
 বোলেন “খোজেন্তা! তবে তোমা হোতেই  
 গিজনি সহরটি পরিজ্ঞান পেলে, তবে তুমিই  
 স্বহস্তে করাল নরহস্তাদের নিপাত কোরেছো,  
 তুমি এ নিবিড়নির্জন আবাসে কি কোরে  
 প্রবেশ কোলে, সে কথা আমায় আগে বল।”  
 বা বা-বটোছিল, খোজেন্তা আন্তর্পরিক হামে-  
 তকে শুনালেন, হামেত শুনে খোজেন্তার গুণ-



মহিমা স্মরণ কোরে মুগ্ধ হোতে লাগলেন । কাফ্রি দাস হাতকড়ি বেড়ি প্রভৃতির যোগাড় কোরে রেখেছিল, তিনজন মিলে কাল্-মাকের হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে কিম্বাকার যে ডুলি নিয়ে বান, তাকে সেই ডুলির ভিতরে ফেলে নিয়ে খোজেন্তা আর হামেত ঐ ব্যক্তেই সেখান থেকে রওনা হোলেন, বাকী চন্দ্রিশজন ডাকাতের ছিন্ন মস্তকগুলিও সঙ্গে নিলেন । ভোরও হোলো, ঠারাত এসে গিজনি সহরে উপস্থিত হোলেন । পাপিষ্ঠ কালমাকের তখন চেতনা হয়েচে, চৈতন্য হয়ে দেখে, খোজেন্তার কাল কৌশলজালে জড়িয়ে পোড়েছে, এক্ষণে নিরুপায়, আকাশ পাতাল অন্ধকার দেখতে লাগলো । খোজেন্তা আর হামেত তাকে লোয়ে বাদশাহের কাছে ধরে দিলেন, ছিন্ন মস্তকগুলিও ভেট দিলেন । বাদশাহ খোজেন্তার কুশলবুদ্ধির বিস্তর অমুরাগ কোতে লাগলেন, বোলেন, “তোমার এ দার গিজনি-বাসীরা কখিনকালেও পরিশোধ কোতে পারবে না, তোমার এ ঋণ পরিশোধ হবারই নয়, তোমার এই কীর্তি চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবে ” কালমাকের প্রতি কান্দোবেল ভকুম হোয়ে এক্ষণের মত গারদে কয়েদ রেখে দেওয়া হলো । পাপমতি কালমাক ধরা পোড়েছে, তার দলবলও সমূলে নিপাত হোয়েছে, এই কথা জনরব হোয়ে সহর জুড়ে উল্লাসের উৎসব হোতে লাগলো । পাপাত্মা কালমাককে দেখবার নিমিত্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পদপালের ছায় রাস্তা ছেয়ে চোল্লো, গারদখানা লোকারণ্য হোলো, মস্ত ভিড় দাঁড়িয়ে গেল, সকলে কোলাহল কোরে খোজেন্তার জয়জয়কার কোতে লাগলো ।

দুরাচার কালমাক গারদে পোড়ে পোচতে লাগলো, তার কান্দার দিন অজ্ঞাপি অবধারিত হয় নাই, দিনান্তে একখানি রুটি আর এক গ্লাস জল, এইমাত্র অবলম্বন কোরে পাপিষ্ঠ কোনরূপে প্রাণধারণ কোরে আছে : শরীর শীর্ণ হোয়ে গিয়েছে, বর্ণ মলিন

হোয়ে পোড়েছে, চক্ষু কোটরে প্রাণ কোরেছে, সে চাক্র কান্দি নাই, সে চাক্র হা নাই, এক্ষণে যান, বিষয়, চিন্তাকুল, মা মধ্যে খোজেন্তার চাতুরির কথা মনে পো ক্রোশে কাল-অগ্নির ছায় হোয়ে উঠবে কিন্তু আবার মনের ক্রোধ মনেই বি কোস্তেন, বাইরে প্রকাশ হোতে দিতেন ন কি ছিল কোরে জেলখানা থেকে বেরি পড়বেন, খোজেন্তা যেক্রপ চক্র কোরে ত সঙ্গে রূপট ছিলনা কোরেছেন, কবে পাপীয়সীকে উচিত-মত শাস্তি দিতে পা বেন, কালমাক এই সকল চিন্তা লোয়ে দি রাত্র মনের মধ্যে তোলাপাড়া কোতে লা লেন । জেলখানার মধ্যে এক ব্যক্তি নিষ্ঠ শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান্ মোল্লা ব কোস্তেন, যখন যে ব্যক্তি পাপপঙ্কে প পোড়ে ঐ জেলখানার বন্দী হোতো, মো তাঁর প্রতি সন্তানের মতন স্নেহ দেখাতে বিস্তর আদর-দয়ও কোস্তেন । পাপিষ্ঠদি মনের গতিপ্রবর্তি অবগত হবার জন্ত, ত তাদের পাপকর্মে মতি হলো, এই সম্ব জ্ঞানবার জন্ত ঐ মহাপুরুষ তাদের সঙ্গে ব বনিষ্ঠতা কোস্তেন । তাঁর মনে এই ধা ছিল, বিত্তর লোক ধর্ম্মধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ পারে না বোলেই দুর্দর্মে প্রবৃত্ত হ মোল্লা মনে কোস্তেন, কতক লোক জা শিক্ষা না পেয়ে দুর্দর্মে দাস হয়, কত লোক দ্বাদ্বিপ্রমাদে পোড়ে সাধুপথ পরিতা করে, আবার কতক লোক নিরুপায় হো হিতাতিত বিবেচনায় পরাস্থা হয়, তারা সংগুরুর নিকট জ্ঞানোপদেশ পায়, তবে সে সব লোকের মধ্যে অনেকেই পবিত্রমন হো সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, তাই যখন পাপাত্মা দুর্দর্মে ধরা পোড়ে বন্দী হো জেলখানায় বাস কোস্তো, মোল্লা তারে স জ্ঞানের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তার সঙ্গে ব আদ্বীয়তা কোস্তেন । তাঁর মনোগত আ প্রায় এই যে, বন্দীর সঙ্গে আস্থগতা কো কেন তার পাপকর্মে মতি হলো, সেই অস সন্ধান অবগত হন । বিস্তর বন্দীর স

রক্তা কোরে মোল্লার মনে এই দৃঢ়  
নীতি তোষেছিল যে অজ্ঞান-অন্ধকারে অন্ধ  
..... দুরাত্মা হয় না,  
নেকে মনে করে, ছলনা, চাতুরী, কি প্রব-  
ন কোরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করায় কোন  
ন নাই, তাতে পাপ স্পর্শ করে না, অনেকে  
সর অবোধের কায় এ কথাও বলে যে,  
পরিবারের অনুরোধে চুরি ডাকাতি করায়  
কর না, না করিলে বরং দোষ আছে,  
তবু, তাদের সংসার নির্বাহের অল্প উপায়  
কতক লোক স্বথসম্পদে নৈরাশ হোয়ে  
পাপকর্মের অন্তর্ধান করে, তারা মনে  
যারা তাদের নৈরাশ করেছে, তাদের  
নিদ্রয় বাবহার কোরে অধম হয় না ।

মোল্লা পাপমূর্তি কালমাকের সঙ্গে ঘনি-  
কোরে তার মনের অবাঙালি টেনে  
কোলেন, অদ্যোপাত্ত রক্তাশুণ্ডি  
কোরে তার প্রতি মহাপুরুষের দয়া  
লা, সেই দুর্জন পাপাত্মাকে কৃপাচক্ষে  
দেতে লাগলেন । মহাপুরুষ অনেক দরবার  
গরে কালমাকের লৌহশৃঙ্খল বিমুক্ত  
গরে দিলেন, আর তারে উঠতে বোসতে  
নবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগলেন, কাল্-  
কও একান্ত অশুভগতের কায় মহাপুরুষের  
তি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে লাগলেন । পাপি-  
র ভক্তি শ্রদ্ধার আড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে,  
কথাকথির কায় তার মুখে জ্ঞানবানের মত  
ধাবার্তা শুনে অচতুর মোল্লা মনে কোলেন,  
কালমাকের জ্ঞানোদয় হোয়েছে, মনের  
স্তিও দূর হোয়েছে, তার এক্ষণে ধর্ম্মে মতি  
গিয়েছে !!

এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় কাল্-  
ক আর সেই মহাপুরুষ একটি নির্জন ঘরে  
য় আছেন, তার পাশের ঘরে জেল-  
রোগাও শুয়ে আছেন । মোল্লা আর দারোগা  
ময়েছেন দেখে, কালমাক মোল্লার গায়ের  
লখানা অপনার গায়ে জড়িয়ে নিলেন, তাঁর  
বিছড়াও গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, কোরাণ-  
না হাতে করে নিলেন, এই ছন্নবেশের ছল  
য় দরজা খুলে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পোড়লেন,

বাইরে এসে শিকলটি টেনে দিয়ে দরজাটি  
বন্ধ কোরে দিলেন, এখন তাঁরে না দেখতে  
পেয়ে মোল্লা আর দারোগা চৌচিয়ে চৌচিয়ে  
দয় ফেটে যদি মরেও যান, তবু তাঁদের গদ্যার  
সর-পাহারাওলারা শুন্তে পাবে না । যেখানে  
প্রহরীরা পাহারা দেয়, কালমাক সেইখ  
এসে দেখেন, এটি প্রাণীও নাই, কেবল  
মাত্র বুক বোসে আছে, তারিও আবার ক  
দাবাখেলা নিয়ে উন্মত্ত ছিল, কেবল  
মাত্র প্রহরী এক হাতে ভাঁকো, আর হাতে  
বন্দুক নিয়ে একবার এদিক, একবার সে দিক  
কোরে টৌলে বেড়াচ্ছে, তারে দেখা  
ফিরিয়ে চেয়ে দেখবেন, কালমাকের সে  
সাহস হলো না, তখন যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে,  
নির্ভয় হোয়ে, সটান চোলে গিয়ে বেরিয়ে  
পোড়লেন, জন-মানবও তাঁর গমনের প্রতি-  
বাদী হলো না । বৈয়ন তিনি ঘুরে ফিরে  
ডাইনের দিকে একটি খুঁড়ি গলির মধ্যে  
প্রবেশ কোরবেন, সেই সময় একজন পাহারা-  
ওলা তাঁর সমুখে এসে নিষেধ কোরে দিলে,  
“এদিকে এসো না, ঐ দিক যাও ।” কালমাক  
অমনি সমুখের পথ ধরে বরাবর সিধে এক-  
টানা চোলতে লাগলেন, চোলতে চোলতে  
সহর ছাড়িয়ে একটি ময়দানে এসে পোড়-  
লেন । তাঁর হৃদয় এখন আত্মলাদে নৃত্য কোতে  
লাগলো, তিনি এখন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে  
পোড়লেন, সে আনন্দ শুধু তাঁর অবস্থার  
লোক ভিন্ন আর কেউই অনুভব কোতে  
পারে না । কালমাক এখন ময়দানে পোড়ে  
ইপ ছেড়ে দম নিয়ে বাতাস খেয়ে বাচলেন

কালমাক এক্ষণে হেটাচ্যাংরা, আবুড়ো  
ধাবুড়ো পর্কতের উপর দিয়ে লাফিয়ে  
লাফিয়ে চোলতে লাগলেন, দরাজ দরাজ  
নদীগুলি সাঁতারিয়ে পার হোতে লাগলেন,  
বনের হরিণগুলি অসমান কর্ণশ মাটির উপর  
দিয়ে যেমন না দৌড়িয়ে যায়, কালমাকও  
অবিকল সেইরূপ উর্দ্ধম্বাসে দৌড়িতে লাগ-  
লেন, দৌড়িতে দৌড়িতে একটি ঘোর জঙ্গ-  
লের মধ্যে প্রবেশ কোলেন, প্রবেশ কোরে  
একটি মিত্রবৎ বৃক্কতলার আশ্রয় লোয়ে, সেই-

খানে জিরিয়ে, বিশ্রাম কোরে, নিখাস ফেলে  
প্রাণ বাচালেন। মোল্লার কোরাণ, তসবি,  
আর সাল দোড়বার মুখে ফেলে দিয়ে গায়ের  
বোঝা পুর্কেই খালস করে রেখেছিলেন।  
একশে সন্ধ্যার কক্ষছায়া এসে চতুর্দিক ঘনাবৃত  
কোল্লো, তাই দেখে একটি বিরাট বৃক্ষের উপর  
আরোহণ করে, তার শাখামণ্ডপের অন্ত-  
হালে আশ্রয় নিলেন, মনে কোল্লেন, এই  
দীর্ঘরাত্র শেইখানে বোসেই প্রভাত কোরবেন।  
গিজনিবাসীরা তাঁর চিরশত্রু, 'তাদের হাত  
থেকে যে আশ্চর্যরূপ রক্ষা পেয়েছেন, তাই  
মনে করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন।

এদিকে জেল-দারোগা আর মোল্লা চৌচিরে  
চৌচিরে গলা ফাটাতে লাগলেন, তাঁদের গলার  
আওয়াজ কেউ শুনে পাচ্ছিল না, সুতরাং  
তাই কেউ দরজা খুলে দিলে না, শেষে জোর  
কোরে হেঁকে ফেলার চেষ্টা কোল্লেন, তাও  
পেরে উঠলেন না, অবশেষে নিরুপায় দেখে,  
কতক্ষণে এক ব্যক্তি এসে দরজাটি খুলে দিয়ে  
তাঁদের পরিভ্রাণ কোরবে, তাই বোসে  
ভাবতে লাগলেন।

জেলদারোগার মনে ত্রাস হলো, ত্রাস  
হবার অনেক বলৎ কারণ ছিল, তিনি সাধ  
কোরে, কি শুধু কাজীর ক্রোধ অরণ কোরে  
ভয় পাননি, তাঁর ভয় পাবার আরও হেতু  
ছিল। কাল্মাক পালিয়ে প্রস্থান করায়  
সহর শুদ্ধ লোক নৈরাশ হয়ে পোড়েছে, তাই  
তাঁকে কাজে কাজেই সহর শুদ্ধ লোকের  
ক্রোধের ভাজন হোতে হয়েছে, তাঁর মনে  
সেই ত্রাস হলো, বিশেষতঃ আর এই ভয়  
হলো, তিনি যতই কিরে দিব্যি কোরে বলুন,  
যতই ধর্ম্মতঃ শপথ কোরে বলুন, কাল্মাক  
যে তাঁর আজ্ঞাতে, কি তার অগোচরে প্রস্থান  
কোরেছে, কি তিনি যে তার প্রস্থানের অন্ত-  
র্যন্তী ছিলেন না, সে কথা বিশ্বাস কোরবে  
না। মোল্লারও মনে সেই ভয় হোতে  
মাগলো। তবে কথা এই, তিনি উদাসীন  
ককির, সংসারে লিপ্ত নন, তাই তাঁর একটা  
কথা বলবার পথ ছিল। তখাচ হলে কি হয়,  
লোকের মনে সন্দেহ হোতে পারে," তাঁর

অজানত কাল্মাক কখনই প্রস্থান কোরে  
পারেনি, একথা গিজনিবাসীরা বোলে  
বোলতে পারে। দৈব তৃত্যগ্যবশতঃ নিরী  
নিরপধারী দুটি ব্যক্তিকে একঘরে এক  
আবদ্ধ হোয়ে থাকতে কখন দেখা যায়নি,  
এরূপ কোরে এক ফাঁদে জিরিয়ে পোড়তে  
কখন শোনা যায়নি। দরজা খুলে দাও, দরজা  
খুলে দাও বোলে তাঁরা যেমন প্রাণপণ  
চীৎকার কোরেছিলেন, তেমন চীৎকার  
কোন্তেও আর কখন শোনা যায়নি  
জেলদারোগার কি মোল্লার মঙ্গলামঙ্গলে  
প্রতি দৃকপাতও না তাঁকোরে শেই ধরিবার  
বজ্জাত কাল্মাক তামাণ্ডুর দিয়ে নিখা  
পর্যন্ত চেপে রেখে আস্তে আস্তে বেরি  
পোড়েছে, এর পুর্বে অন্ধকূপের দ্বায় একট  
আঁধারে ঘরের এক কোণে তাকে পো  
থাকতে হোয়েছিল, এক গল্পব জল দি  
উপকার করে, এমন গোকণ ছিল  
কেবল এক একবার কটা পত  
বিষাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস বোলতে  
“তাঁর সম্বন্ধে না জানি পৃথিবী এক  
রাখের মত চক্ষু মুদিত হবে

দুটি বৃদ্ধ মুসলমান যৎকালীন দাবা নি  
মত্ত ছিলেন, জেলের জমাদার বেসাঁস হো  
দাবার উপর বুক পোড়ে উপর-চাল দে  
ছিলেন, এ খেলাতে তাঁর কিছু স্বার্থও ছিল  
তিনি যৎসামান্ত গোচর একটি বাজী রে  
ছিলেন। যারা খেলছিল, জমাদার তা  
জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “দারোগা কোথা  
তিনি কোথায় গেছেন? কি তাজ্জ  
তাঁকে দেখতে পাইনে কেন?” তারা বো  
“মোল্লার আসা পর্যন্ত তাঁকে দেখা  
পাই নে।” জমাদার বোল্লেন, “ত  
কি মোল্লা জেলখানার মধ্যে আছেন?”  
পাহারাওয়াল তামাক খাচ্ছিলো, সে বো  
“না না, অনেকক্ষণ হলো, তিনি গিয়েছেন  
জমাদার বোল্লেন, “কি আশ্চর্য্য! ত  
দারোগা সাহেব কোথায়? রাত্র হো  
এলো, পাহারা বিলি কোন্তে হবে, তাঁকে  
এখনই দরকার।” এই বোলে জেলখান

মধ্যে দারোগা কোথায় আছেন, দেখতে চােলেন। জেলখানার ভিতর ঢুকতেই প্রথম ঘরটিতে কালমাক্ বাস কোত্তো, সে ব্যক্তি গ্রন্থান কব্বার সময় তার ঘরে চাবি দিয়ে চাবিটি সেইখানেই ফেলে রেখে যায়, জমাদার ঘরটি খুলে দেখেন, তার মধ্যে কালমাক্ নাই, ঘরটি শূন্য পোড়ে আছে, তাই দেখে চোম্কে গেলেন, অমনি মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়লেন, তাঁর প্রশ্ন যে কেঁপে গেল, সে কথা আর বোলতে হবে কেন? জমাদার “দারোগা সাহেব, দারোগা সাহেব” বোলে মোরে ফুটে চোঁচাতে লাগলেন, জেলদারোগা তারই পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি ধরাস্ ধরাস্ কোরে দরজার গায় লাথি মাত্তে লাগলেন, “দরজা খুলে দাও, খুলে দাও” বোলে চীৎকারও কোত্তে লাগলেন। জমাদার ঐ বে-আড়া চীৎকার শুনে কলকোচোকো হলেন, কেন তত চীৎকার করা হচ্ছে, তার নিরাকরণ কোত্তে পাচ্ছিলেন না, তাই, সে ব্যক্তি ভাড়াভাড়ি কোরে ঘরের শিকলি খুলে দিলেন, মোল্লা তখন পিঠ দিয়ে দরজাটা ঘরের দিক্ দিয়ে চেপে রেখেছিলেন, জমাদার যেমন মজোবে ধাক্কা মেরে কপাটের দুটো বল খুলে ফেলে দিলেন, মোল্লা অমনি ঠিকরে গিয়ে দারগার হাতের উপর চিৎপাত হোয়ে পোড়লেন, জমাদার দেখে অমনি শিউরিয়ে উঠলেন। তখন জেলদারোগা “কয়েদি কোথায় গেল, কালমাক্ কোথায় গেল” বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে জেলখানা যেন মাথায় কোরে নিলেন। জমাদার বোল্লেন, “কালমাক্ কোথায় গেল, তা আমি কি জানি! সেপাইরা পাহারায় বসবার পর জেলখানা থেকে কাহাকেও বাহিরে যেতে দেখিনি।” ঐ কথা শুনে জেলদারোগা চীৎকার কোরে বোল্লেন, “হা আল্লা! দায় যে আমারই, তার জন্তে আমিই যে দায়ী, এখনি যে আমার মন্তকটি গুনগারি কোরে নেবে। তবে আর গাফিলি কোরে কাজ নেই, এই দণ্ডেই তেঁরা মেরে দাও যে, কালমাক্ জেলখানা ভেঙ্গে পালিয়েছে, তারে গ্রেপ্তার

কোত্তে চারিদিকে লোক দৌড়িয়ে দাও, সে এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি।” মোল্লা তখন চোঁচিয়ে বোল্লেন, “সে ব্যক্তি আমার লাল, কোরাণ ও তসবি লোয়ে গ্রন্থান কোরেছে, উঃ! বেটা কি পাষণ্ড! কি নরাধম মহাপাতকী!” জেলদারোগা বোল্লেন, “তবে সে আপনার বেশ ধোরে পালিয়ে গ্রন্থান কোরেছে, তাই সে গ্রহরীদের চক্ষে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে, নচেৎ এত কড়াকড় পাহারা থেকে সে কখন ফাকি দিয়ে যেতে পাত্তোনা।” মোল্লা একটু বাদস্বরে মুখ বাঁকিয়ে বোল্লেন, “কড়াকড় পাহারা! পাহারাওয়ালাদের হাবাগোবা দেখেই তো সে পালিয়েছে, তাদের গাফিলি না থাকলে কি সে পালাতে পারে? সুস্থি গতবুজ্জমা পাহারাকে ভূমি বুঝি কড়াকড় পাহারা বোলে থাক।” জেলদারোগা চীৎকার কোরে বোল্লেন, “হায়! কি সর্বনাশ হলো! কি বিপদ্ পোড়িলো! আমি এখন কি, আমাকেই যে ভুগতে হবে।” সে সময় যে ব্যক্তি পাহারা দিচ্ছিলো, তাকে ডেকে তদ্বি কোত্তে লাগলেন, “হারাম্-জাদা! আমি যখন জেলখানার মধ্যে ছিলাম, তুই কাকেও বাহিরে চলে যেতে দেখেছিস? তোর স্মৃখ দিয়ে কে গেছেলো?” পাহারাওয়ালা বোল্লেন, “হজুর! আর তো কেউ নয়, মোল্লাসাহেবকে যেতে দেখেছি।”

জেলদারোগা বোল্লেন, “দর বাটা হাবা পাগোল! তিনি যাবেন কেন? সেই ব্যক্তিই হয় তো কালমাক্ ডাকাত হবে, তবে সেইই চোলে গিয়েছে।” ঐ কথা শুনে ভয়ে পাহারা-দারের দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো, সে হতবুদ্ধি হোয়ে ফাল্ ফাল্ কোরে চেয়ে রইলো, হুকো আর বন্দুক তার হাত থেকে খোসে পোড়ে গেল। সে তখন হতভম্বা হোয়ে, মূর্খিমান্ আতঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এক্ষণে জেলখানাটি কাল হতশের, কাল জ্বাসের আবাস-মন্দির হোয়ে উঠলো, চারিদিকে লোক ছুটলো, সহর ওলট পালট হোতে লাগলো, “কালমাক্ পালিয়েছে,” এই ভয়ঙ্কর জনরব হোয়ে সর্বত্র ছেয়ে

পোড়লো, আতঙ্কে গিজনির মূল শুদ্ধ যেন ঠক্ঠক কোরে কেঁপে উঠলো। কাল্মাক পালিয়েছে শুনে হাতেমের আর খোজেন্তার মনে যতখানি ভয় হলো, ততখানি আর কারুরই হলো না, তাঁদের শিরে যেন বজ্রাবাত হলো, কাল্মাক যে একদিন তাঁদের উপর মনের সাথে ঝাঁপ ঝাড়বে, তার সন্দেহ নাই, তাই তাঁরা প্রাণের ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। মোল্লার কথাক্রমে দুর্ভাগ্য জেল-দারোগার প্রাণটি বেঁচে গেলো, কিন্তু তাঁক তৎক্ষণাৎ কর্ম থেকে বরখাস্ত কোরে দেওয়া হলো, কঁড়ে, গতরজমা, উন্পাছুরে, লম্বী-ছাড়া পাহারাওয়ালাদেরও ঐ দশা ঘটলো, তাঁদের দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, লোকে যে নৈরাশ হোয়ে মনে মনে কত দুঃখিত হলো, সে কথা আর বলবার নয়, বিশেষতঃ যারা কাল্মাকের কাঁসী দেখবেন বোলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, এই মর্খ-বেদনার কথা শুনে তাঁরা যে কত স্নান, কত ক্ষুণ্ণ হোলেন, সে কথা মুখে বোলে উঠা যায় না। খোজে শুনে একেবারে মস্তশব্দ হোয়ে পোড়লেন, তাঁর আতঙ্কের কুল-কিনারা ছিল না, খোজেন্তা তাঁর চক্ষের পুত্তলি, তাঁর স্নেহের আঁধার, সেই কত রত্নের অদৃষ্টে না জানি কি ঘটে, তাই ভেবে মনে মনে আঁধার দেখতে লাগলেন। খোজের অত্যন্ত আস-হলো, সেই আসে নিদান লক্ষটাপর হোয়ে এখন তখন যান-যান হোলেন, তাঁর পিতৃবৎসলা কত্বা একাদিক্রমে দিবারাত্র সন্ত-পণে সেবা শুশ্রূষা করার ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ কোলেন। আরোগ্য হোলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কাল আশঙ্কা সর্বদা লেগেই ছিল। খোজের মনে এই ভয় হলো, হয় ত কাল্মাক প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কি একটা ভয়ঙ্কর কুচক্র কোচ্ছে, তার ফেতরাজি কেব-ববাজি, তার ধুঁটি, নষ্টামি বুকে উঠে কার-সাধ্য, সে দুর্জনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য বোলেই হয়। খোজেন্তার মনে মনে যাই থাক, মুখে কিন্তু পিতাকে খুব সাহস দিতে লাগলেন, যুবতী বোলেন, “কাল্-

মাক যে পুনরায় গিজনিতে ফিরে আসবে, সে কোন-কাজের কথাই নয়, সে তেমন হা-নয় যে, তত দুঃসাহসের কাজ কোরবে, বিশেষতঃ তার শোণিতপান করবার নিমিত্ত গিজ-নিবাসী লোকদের যেন সন্নিপাতের তৃষ্ণা হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এসকল ক্ষেত্রে শুনে গিজ-নিতে বারান্তর পদার্পণ কোন্তে সে পাপিষ্ঠের কখনই সাহস হবে না।” পিতৃবৎসলা স্নেহময়ী কত্বা এইরূপ আরও কতকগুলি প্রবোধ-বাক্য বোলে পিতাকে সান্ত্বনা কোলেন। খোজে এখন কতক সুস্থির হলেন।

পলাতক কাল্মাককে প্রত্ন করবার নিমিত্ত দুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি কোরে লোকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল, পায়ের বাধন ছিঁড়ে গেল, তবু সে পার্থক্য ধরা পোড়লো না, সে ব্যক্তি তখন সাত গাঁ সাতারিয়ে বৈতরণী পার হয়ে বোসেছে, আর তারে হাত বাড়িয়ে পাবার উপায় নেই। সে দুর্জন যখন নিতান্তই ধরা পোড়লো না, তখন কাজে কাজেই সে চেষ্টার ক্ষান্ত দিতে হোলো, না দিয়েই বা করে কি, আর উপায় কি? লোকে তখন এই বোলে মনেরে প্রবোধ দিতে লাগলো, “কাল্মাক হাতের মধ্যে এসেও পুনরায় পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তা কোরেছে কোরেছে, তাতে বিশেষ হানি কি হোয়েছে, তার দল-বল তো ঝাড়ে মূলে নিপাত হোয়েছে, তাই যথেষ্ট।” বদমাস কাল্মাক যে পুনরায় দলবল বেঁধে উৎপাত অত্যাচার কোরবে, তা পারবে না, সে ভয় আর কোন্তে হবে না, তাই ইদানীং তার নামও কেউ মুখে আনতো না। কার্কারবারের ক্ষুধা হোতে লাগল, বাণিজ্য প্রবল হোয়ে উঠল, গিজনী শহর আবার সাবেক মত গুলজার হোয়ে দাঁড়ালো। খোজেন্তা নিরুৎকণ্টা হয়ে হেসে খেলে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর শুভ পরিণয়ের উদ্-যোগ হোতে লাগল।

আমোদ-আহ্লাদের দিন ক্রমে নিকট হোয়ে আসতে লাগল, ইতিমধ্যে যুবতী হঠাৎ একদিন হামেতকে চিন্তায় ভ্রিয়মান দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন, জিজ্ঞাসা-

কাল্লেন, আজ কেন তাঁকে তত বিমর্ষ দেখছেন। হামেত একটি বিবাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বোল্লেন, “প্রণয়বৎসলে! আমি যে কেন ভ্রিয়মান হয়ে আছি, সে কথা তোমার ভেঙ্গে বলাই উচিত, তুমি একটি পথের ভিক্রককে বিবাহ কোত্তে চোলেছো, তাই আমার তত শ্লান দেখছো।” খোজেত্তা শুনে চমকে উঠলেন, ভাবলেন, এ আবার কি কথা! যুবতীর মনে বিশ্বয় জ্ঞান যত হলো, প্রণয়ভক্তের ভর তত হলো না। হামেত বোল্লেন, “সুন্দরি! আমি তোমার প্রবন্ধনার কথা বলছি না, যথার্থই তাই বটে, আমি তাড় হুখী হয়ে পোড়েছি, আমার পেট চলা ভার হয়েছে, আমার দিন কাটে না। আমার পিতার যে কিছু কারুকার্যবার ছিল, এক্ষণে তা আর নাই, শেষে যে কারুবার আরম্ভ করেন, তাতে তাঁর লোকমান হয়, তুমিও তা জানো, ইদানীং সহরের সকল কারুবার একেবারে বন্ধ হয়েছে যাওয়ার পিতার সর্বস্বাস্ত হয়, ঘরে যা কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ছিল, পাঁচগু কাল্যাক তা অপহরণ করে। উত্তরাধিকারী হয়েছে পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে তুই চারিটা রেসমের গাঁইট মাত্র আমার হস্তগত হয়েছে, তাই মাত্র আমার সম্বল, সেই মাত্র আমার ভরসা। নগদ টাকা কিছু মাত্র নাই, তবে তোমার টেনে লয়ে হুঃখের ভাগিনী করা কত অনুখের বিষয়, তা মনে একবার ভেবে দেখো। তোমার পিতা কিছু তাদৃশ ধনী নন, তাঁর যা যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান আছে, তিনি জীবিত থাকতে তুমি সে ধনের অধিকারিনী হবে না। আমাদের দুই হাত একত্র হওয়া এক্ষণের মত রহিত কোত্তে হোরেছে, এ কথা মনে উদয় হোলেও জ্ঞান হয় যেন, আমার প্রাণে কেউ শূল ফুটিয়ে দিচ্ছে, আমার হৃদয় যেন ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড কোচ্ছে, এ অবস্থার কিছু তাড়াতাড়ি বিবাহ করা উন্মাদের কাজ। তবে আরও কিছু দিন এইভাবে কেটে যাক, ইত্যাবসরে পরিশ্রম কোরে কোরে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোরবো, তাতে যদি কিছু অর্থের সংস্থান কোত্তে পারি,

সেই অর্থ লয়ে তোমার আমার মুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত কোত্তে পারব, তবে আর পেটের দারে পরের উপাসনা কোত্তে হবে না। লোকে মনে করে, আমার কতই অর্থ আছে, তায় কতি কি, দরিদ্র হুর্নাম হোতে ধন পরিবাদ ভাল। সহরের লোক জানে, আমার পিতা অসুখ্যার অর্থ রেখে গিয়েছেন, সে অর্থ বাড়ীতে পোতা আছে, সে কিন্তু সর্বৈব মিথ্যা, অর্থ যত আছে, পরমেশ্বরই তা জানেন। খেজেত্তা! আমি শুদ্ধ তোমার প্রণয়ধনে ধনী!” খোজেত্তা হামেতের একখানি হাত মাত্র চেপে ধরে রেখেছিলেন, মুখে ভালমন্দ কোন কথাই বোল্লেন না, তাঁর মন তখন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, বালার অন্তরের মধ্যে তোলাপাড় হোচ্ছিল, তাই কণ্ঠ রোধ হোয়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা সোচ্ছিল না, কথা কইবার ক্ষমতাই ছিল না। অনেকক্ষণের পর একটু স্থির, একটু সুস্থ হোয়ে, কি সুন্দর একটু মধুর হাসি হেসে বোল্লেন, “হামেত! তোমার কি অঁকপট মন, তোমার সরল মনের বালাই লোয়ে মোত্তে ইচ্ছা হয়, তোমার যে কত গুণ, তা একমুখে বোলে উঠা যায় না, আমি যেটি মনে ভাবতেম, সেইটি আজ চক্ষে দেখতে পেলেম, এ বড় নিদারুণ মনস্তাপ সত্য, আমাদের চির-অভিলাষ পূর্ণ হোতে বিলম্ব হবে, তাও সত্য, কিন্তু সাধু পরিশ্রম কখনই বৃথা যাবে না, আজ হোক, কাল হোক, দুদিন পরেই হোক, অবশুই সফল হবে। হামেত! দুদিন দেরি হবে বোলে দুঃখিত হয়ো না, কি অদৃষ্টে বিবাহ নাই বোলে একেবারে হতচিন্ত হোয়ে পোড়ো না, আল্লা অবশুই একদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।” বালার মুখে ঐ সকল প্রণয়পূর্ণ স্নেহের কথা শুনে হাতেম তাঁর প্রাণসমা খোজেত্তাকে আপনার অহুরাগপূর্ণ হৃদয়ের উপর রেখে চেপে ধোল্লেন, বালার পিতাকে এঁই হুঃখের কথা অবগত কোত্তে বোলে কাঁদতে কাঁদতে উঠে চোলে গেলেন, ঢকের জল কোনক্রমেই নিবারণ কোত্তে পাচ্ছিলেন না। খোজেত্তা পিতার কাছে

যাযেন কি, হামেতের মুখে চিরস্বথের বিড়-  
ঘনার কথা শুনে মনস্তাপে দহ হোতে লাগ-  
লেন, ঘরে গিয়ে ফুলে ফুলে, ডুকুরিয়ে ডুকুরিয়ে  
কাঁদতে লাগলেন। সিদি খোজা যে সে ঘরে  
ছিল, বালা তা জানতেন না, সে ব্যক্তি যুব-  
তীকে রোদন কোত্তে দেখে চোঁচিয়ে বোলে,  
“ওরে হতভাগিনী খোজেন্তা! তোকে কি জগ-  
দীশ্বর হেসে খেলে বেড়াতে দেন্নি, আহ্লাদ-  
রূপ সূর্য্যের কিরণ-ছটায় তোকে কি কখন  
প্রফুল্লিত হোতে দেবেন না? আমার ভয়  
হোচ্ছে, আমি বুঝি কখন তাঁর দাস হোতে  
পারবো না।” যুবতী মাথা তুলে দেখেন, কাফ্রি-  
দাস দাঁড়িয়ে, দেখে হড়বড়িয়ে গেলেন। বালা  
চোমকে উঠে বোললেন, “সিদি! তুমি এখানে  
কেন?” কাফ্রি দাস ও কথার উত্তর না দিয়ে  
বোলে, “খোজেন্তা! তুমি কাঁদছো কেন? আজ তোমার  
হুঃখিনীর মত তত কাতর  
দেখছি কেন?” যুবতী নীরব হয়ে আছেন,  
কাফ্রি দাস বোলতে লাগলো, “আমি মনে  
কোরেছিলেম, এতদিনের পর সব লেঠা  
লেজাড মিটে গেল, এখন তুমি আমোদ-  
আহ্লাদ কোরে বেড়াবে, আজ প্রাতে কর্তা  
আমার ডেকে বোলেন, তোমার বিবাহের  
আর বড় দেরি নাই, তার উজো” হোচ্ছে।  
তবে কেন তুমি চক্ষের জলে ভেসে চোলেছো,  
হামেত কি বেইমানি কোরেছে? সে  
তোমার কি বোলেছে? তোমার তত কাতর  
দেখছি কেন? থেকে থেকে একটা একটা  
গভীর দীর্ঘনিশ্বাস কেন্দ্রো, দেখে বোধ হয়,  
যেন বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।” যুবতী  
বোলেন, “সিদিমুফাক! সে কথা নয়, হামেত  
সেইরূপ স্ত্রীল, সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ  
সজ্জনই আছেন, পূর্বে যা ছিলেন, এখনও  
তাই আছেন, তবে হুঃখের বিষয় এই, তাঁর  
এখনও বিবাহ করবার সময় হয়নি।”

কাফ্রি দাস বোলে, “কেন হয়নি? চূপ  
কোরে রোইলে যে, আমার বুঝি গরিব দেখে  
কথা কইতে শ্রদ্ধা হোচ্ছে না, আমি গরিব  
হই, গরিবই আছি, তবু তোমার জন্তে প্রাণ  
দেবো, তোমার ভাল দেখে যদি মরি,

তাও ভাল, আমার মন তুমি না জানো তা  
নয়।”

খোজেন্তা বোলেন, “সিদি! তোমার  
বোঝবার ভুল হোয়েছে, তুমি উল্টো বুঝেছো,  
মনের কথা যতই গোপনীয় হোক, তোমার  
তা বোলতে বাধাই বা কি, ভয়ই বা কি?  
সে কথার কথা নয়, হামেত পথের কাদালী  
হয়ে পোড়েছেন, তাঁর পিতা কিছুই রেখে  
যাননি, আমার নিজেরও অধিক সম্পত্তি  
নাই, তবে আর কি কোরে বিবাহ হোতে  
পারে।” সিদি বোলে, “তাই তত কাঁদছো!”  
এই বোলে যুবতীর কানে কানে বোলেন,  
“আর তো কিছু নয়?” খোজেন্তা বোলেন,  
“না, আর কিছু নয়, এর উপর আবার কি  
চাই, এ কি কম মনস্তাপ, আমার প্রাণের  
ভিতর কি যেন হোচ্ছে, প্রাণটি যেন মুচড়িয়ে  
ভেঙ্গে যাচ্ছে, হামেত কখনই তত অর্থের  
মালিক হোতে পারবেন না।”

সিদি বোললে, “সেটা অসম্ভব বটে, কিন্তু  
তিনি না পারুন, তাঁর হয়ে আর কেউ তত  
টাকা দিতে পারবে। কত হাজার মোহর  
তোমার দরকার? বিশ হাজার? ত্রিশ  
হাজার? চল্লিশ হাজার? এই বই তো নয়,  
তার জন্তে আবার কান্না কেন।”

যুবতী বোললেন, “সিদি! হয় তুমি ক্ষিপ্ত  
হয়েছ, নয় আমার ঠাট্টা-শ্লেষ কোছো,  
সংসারটি ত দেখতে তত বড় দরাজ, কিন্তু  
হাজারখান মোহর দিয়ে উপকার করে,  
এমন লোক তার মধ্যে কে আছে? তেমন  
দরদেব লোক কোথায় পাবো?”

সিদি বোলে, “কে দেবে! আর কে দেবে,  
তোমার হুঃখী গোলাম দেবে, বিশ হাজার  
কেন, তার ছনোছনি, তার ভিন গুণও সে  
দিতে পারে। যাও, আর কাঁদতে হবে না,  
যাও, এখন চক্ষের জল মুচে কেনো, হামেতের  
সঙ্গে দেখা হলে হেসে খেলে কথা কইও।”  
যুবতী বোলেন, “সিদি! সত্য সত্যই তোমার  
বুদ্ধির দোষ জন্মেছে, তোমার মনের গতিক  
বড় ভাল দেখছি না, তোমার বুদ্ধির ভ্রম  
হয়ে দাঁড়িয়েছে, এত টাকা তুমি কোথায়



পাবে, মনে কর, সত্য সত্যই যেন তোমার তত টাকা আছে, আমি কেন তা নিতে যাব ? তোমার বঞ্চিত কোরে কেন আমি তা নিতে যাব ।” সিদি বোল্লে, আমি কি এতকাল পথে পথে ভেসে ভেসে বেড়িইছি, আমি কি চালের তলে বাস কোরে এত বড় মানুষ হইনি, না খেতে পোস্তে না পেয়ে দোর টো টো কোরে আমার ফিতে হয়েছে, আমার মনিব ভো আমার গোলাম বোলে মনে কোরে থাকেন না, তিনি আমার সম্ভানের মত রেহ করেন, তুমি যে তাঁর কথা হয়ে দিবারাত্রি ভেবে শীর্ণ হয়ে যাবে, সেটি আমি চক্ষে দেখতে পারবো না, বিশেষতঃ যে বিষয়ের দরকার, তা যখন আমার হাতের মধ্যে আছে, তখন আর কথা কি, বিষয়টি আমার হাতে আছে সত্য, কিন্তু যথার্থ পক্ষে সেটি তোমারই বিষয় ।”

খোজেন্তা বোল্লে, “সিদি ! ‘সে আমারই বিষয়,’ একথা কেন বোল্লে ? আমার তো ধন নাই ।” কাফ্রি দাস বোল্লে, “তোমার অর্থ নাই সত্য, কিন্তু আমার তো আছে, তুমিই মূল্যধার হোয়ে সে অর্থ আমার হাতে তুলে দিয়েছো ।” তার পর সিদি কানে কানে বোল্লে, “দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো ।” যুবতী সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন বটে, মনে মনে কিন্তু অবাক হোতে হোতে চোল্লেন, কারখানাটা কি, এসকল কথার মানে কি, এই ভাবতে ভাবতে চোল্লে । সিদি একটি নির্জন ঘরে প্রবেশ কোরে, সে ঘরে প্রায় কারুরই কখন যাতায়াত ছিল না, মেজে থেকে একখানি চোরা-পাথর উঠিয়ে আঙ্গুল দিয়ে একটা সিন্দুক দেখিয়ে দিলেন, খোজেন্তা সিন্দুকের ডালা উঠিয়ে দেখেন, তার মধ্যে বকমক বকমক কোছে, যেন মণি জ্বলছে, সিন্দুকটির মধ্যে সোণাকপো ঠাসা রোয়েছে । খোজেন্তা দেখে শিউরিয়ে উঠে বোল্লেন, “সিদি ! তুমি এত অর্থ কোথায় পেল, কি কোরে সংগ্রহ কোল্লে, আমার দিবা, আমার মাথা খাও, যদি না বল ।” সিদি বোল্লে, “তুমি যেখানে চিরকালের নিমিত্ত

অপমানিনী হোতে গেছিলে, সেইখানেই পেয়েছি ।” খোজেন্তা বোল্লেন, “কি বোল্ছো, তুমি কি ডাকাতদের চোরা তাঁধারে ঘরে এত অর্থ পোড়ে পেয়েছো ?” সিদি সুফাক খাড় নেড়ে সায় দিয়ে বোল্লেন, “তবে এ টাকার অধিকারী কে হোতে পারে ? তুমি কি প্রাণটি হাতে কোরে সেখানে যাওনি ? ভাল, প্রাণের কথাই যাঃহোক, প্রাণের চেয়ে যেটি আরও গৌরবের বিষয়,—তোমার ইজ্জত, কালমাকের হাত থেকে সহরটি বাঁচবার নিমিত্ত তুমি যে তাদের মুখে গিয়ে পোড়েছিলে, তাতে কি ইজ্জত যাবার আশঙ্কা ছিল না ? অতএব এ অর্থ তোমারই, তোমার কাছে আমি এই মাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি আমার সঙ্গে কোরে নিও, তোমার কাছেই আমার রেখে দিও, যতদিন বাঁচবো, তোমার প্রহরী হারে থাকবো ।”

খোজেন্তা চক্ষের জল নিবারণ কোত্তে না পেরে অশ্রুপাত কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, “সিদি ! তুবি বড় সদাশয়, তুমি বড় মহাত্মা, তুমি বড় সাধুবাক্তি, তোমার মন মহাপুরুষের স্তায় অবিচলিত, আমি যদি অর্থগুলি গ্রহণ না করি, তুমি মনে দুঃখ কোরবে, তবে কথা এই, আমার তত অর্থের প্রয়োজন নাই, কতক পেলেই হবে, বাকী তোমারই রইল ।”

সিদি একটু মুচকে হেসে বোল্লে, “আমি একজন দীন দুঃখী কাফ্রিদাস, তোমারই আশ্রয়ে আছি, মনের সুখে খেতে পোস্তে পাচ্ছি, আমি তত অর্থ নিয়ে কি কোরব, অর্থ পেয়ে যদি বেয়াড়া বেহুদা থরচ পত্র করি, লোকের মনে সন্দেহ হবে, তারা বোলবে, এ ব্যক্তি এত টাকা কোথায় পেল, শেষে এই ফল দাঁড়াবে, হয় ত সকলে আমার সাধু চরিত্রের উপর দোষারোপ কোরবে, নয় ত ল্পষ্টাকরে চোর বোলেই স্থণা কোরবে । না না, আমি একটি কাণাকড়িও ছোঁবো না, এ টাকা তোমারও হোলো, হামেভেরও হোলো । সহরের লোক বলে, হামেভের পিতা বিশ্বর অর্থ বাড়ীতে পুঁতে রেখেছে, হামে-

তের কিছু নাই বোলে তাদের চোক খুলে দিতে যাবো কেন, তাদের যে ভ্রম আছে, তাই থাক, তবে আজ রাতে এই টাকা বোয়ে হামেতের বাড়ীতে দিয়ে আসবো; তাঁর যথানে ইচ্ছা হয়, পুতে রাখবেন, তার পর লোকে যখন বলাবলি কোরবে, হামেতের গুপ্তধন গাড়া আছে, তখন তাদের সত্য কথাই বলা হবে।”

খোজেন্তার নেত্রকোণ দিয়ে আল্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগল, কুন্তলতার অশ্রু-ধারায় যুবতীর বক্ষ প্রাণিত হলো, বালা জিজ্ঞাসা কোলেন “সিদি! তুমি কি কোরে ডাকাতদের গুপ্তধনের সন্ধান জানতে পাও?” সিদি সিদ্ধকের ডালা বন্ধ কোরে, তার উপর চোরা পাথরখানি চাপিয়ে দিয়ে, বেশ কোরে ঢেকে রেখে সে ঘর থেকে চোলে অল্প একটা ঘরে এসে বোলে, “খোজেন্তা! তুমি তো কালমাক্কে বেধে লয়ে সেখান থেকে চোলে এলে, আমি মনে কোল্লেম, ডাকাতদের চোরামাল অবশ্যই আছে, আছেই আছে, তাই একটা আলো নিয়ে তাদের এঁধো ঘরগুলি পাতি পাতি কোরে খুঁজতে লাগলেম, খুঁজতে খুঁজতে একটা চোরা দরজা দেখতে পেলেম, চাবির তাড়া তো আমার কাছেই ছিল, তা থেকে একটা চাবি নিয়ে দরজাটি খুল্লেম, খুলতেই কতকগুলি ধাপ বেরিয়ে পোড়লো, ঐ ধাপ বেয়ে বরা-বর নেবে গিয়ে একটা আঁধারে ঘরে এসে পোড়লেম, যখন নেবে যাই, চারি দিক থেকে পচামড়ার ভাপনা গন্ধ বার হোতে লাগল, তার ভূর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, বমি কোন্তে কোন্তে নাড়ি ছিড়ে গেল, তখাচ আমি যেতে ছাড়লেম না, বরাবর চোলে গিয়ে যখন সেই অন্ধকূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, তখন বোধ হলো যেন অনেক দিনের পচা মড়ার গুদমে এসে ঢুকলেম, গুদমো গন্ধে নাক বুক চোক ছেঁছিরে যেতে লাগল। ঘরের মেঝের একখানা চোরা-পাথর উঠিয়ে কেলার একটা সিদ্ধক বেরিয়ে পোড়লো, খুলে দেখি, সিদ্ধকটি বোহরে আর টাকার

ঠাসা রোয়েছে, সেই সিদ্ধক ঐ বা চক্ষে দেখ্লে। কি কোরে আনলেম, সে কথা বল-বার আবশ্যক নাই, কলে অনেক কষ্ট কোরে আনতে হোয়েছিল। সহরে এসে পৌছিলে পাহারাওয়ালারা খানাতল্লাসি কোন্তে চেয়ে-ছিল, আমি বোল্লেম, কাল রাতে চন্নিশজন ডাকাতের মাথা কেটে ফেলেছি, তাদের কাটা ধড় নিয়ে বাদশাহকে দেখাতে চোলেছি, এই বোলে কতকগুলি কাটা ধড় দেখিয়ে দিলেম, তাই দেখে কাঁকার মধ্যে কি ছিল, তারা আর অহুস্জান কোল্লেন না, বরং খুসি হোয়ে আমার আরও যেতে অহু-মতি কোল্লেন।” সিদির প্রশংসা খোজেন্তার মুখে আর ধরে না, তার গুণ গেয়ে তার যশ গেয়ে কুরিয়ে উঠতে পারেন না, যুবতীর মুখ দিয়ে যেন সরস্বতী বর্ষণ হোতে লাগল।

বালা বোল্লেন, “সিদি! হামেতকে ডেকে নিয়ে এসো, এ শুভ-সংবাদ তাঁকে বোল্তেই হবে।” কাফ্রি অমনি ছুটে গিয়ে হামেতকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলো, হামেত জানেন না যে, তাঁর অদৃষ্ট প্রসন্ন হোয়েছে, এসে দেখেন, খোজেন্তার মুখে হাসি ধোছে না, তাই দেখে হামেত অবাক হোয়ে গেলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আজ তাঁর মুখ দিয়ে তত হাসির ছটাকেন বেরুচ্ছে। যুবতী বোল্লেন, “হামেত! তোমার অর্থ নাই বোলে দুঃখিত হোয়ে-ছিলে, এখন কিন্তু একজন মন্ত নামজাদা ধনী হোয়ে পোড়েছো।” হামেত বোল্লেন, “খোজেন্তা! তুমি আমার সঙ্গে রজ কছো, তোমার কথার ভাব বুঝতে পাচ্ছিনে।” যুবতী বোল্লেন, “আমাদের বিবাহের প্রতিবন্ধক দেখে কোন বন্ধু অজস্র অর্থ দিতে অগ্রসর হোয়েছে।” হামেত বোল্লেন, “এমন বন্ধু কে আছে যে, তত টাকা দিয়ে উপকার করে? তেমন বন্ধু তো আমার কেহই নাই।” খোজেন্তা বল্লেন, “হামেত! ওটি তোমার ভ্রম, তোমার তেমন বন্ধু অবশ্যই কেউ আছে, সে ব্যক্তি অতি মহাত্মা, অতি সদাশয়, অতি উদারচিত্ত, তাকে তুমি এই দণ্ডেই দেখতে পাবে।” এই

বোলে সিদ্ধি স্ফূটক্কে ডাকলেন, সে ব্যক্তি তখন দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েছিল, সিদ্ধি বরের মধ্যে প্রবেশ করে, ভূমিষ্ঠবৎ হোয়ে একটি সেলায় করে দাঁড়ালো। যুবতী বোলেন, “হামেত ! তোমার সেই বন্ধু এই।” ঐ কথা বোলে যেক্রমে গুপ্তধন হস্তগত হোয়েছে, সে বৃত্তান্তগুলি যুবতী হামেতকে অবগত করালেন, হামেত শুনে আহ্লাদে ভাস্তে লাগলেন, মুখে বোলেন, “সিদ্ধি ! তুমি বড় মহাপুরুষ, তোমার বড় উদার স্বভাব, তোমার এ ধার কি কোরে পরিশোধ কোরবো।” সিদ্ধি স্ফূটক্কে বোলেন, “আমাকে আপনার কাছেই রেখে দেবেন, আর যে কদিন বাঁচবো, আপনার সেবাতেই নিযুক্ত থাকবো।” হামেত বোলেন, “সে কথা আর বোলতে হবে কেন ? এমন দয়ালু বন্ধু আর কোথায় পাবো, তবে খোজের কি, অভিপ্রায়, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক, তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমার আপত্তি কি।” সিদ্ধি বোলেন, “আচ্ছা, সে কথা ভাল, যদিও আর আমাকে ক্রীতদাস বোলে জান না কর, তথাচ কিস্ত আমি সেই অনুগত সিদ্ধিস্ফূটক্কেই থাকবো, আমি সেই অনুগত হয়েই থাকবো, দেখতে পাবেন।”

খোজে তাঁর চিরদাসের উদার চরিত্রের কথা শুনে বোলেন, “আজ অবধি তোমার দাসত্বের মোচন হলো, আজ অবধি তুমি আমার পরম বন্ধু এবং প্রকৃত উপকারদাতা।” খোজেস্তা বোলেন, “বাবা ! আপনাকে যে বোলেছিলেম, অপরিচিত ব্যক্তিকে, অজ্ঞাত-কুল-নীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস কোরবেন না, সে কথা এখন খাটলো তো, এখন হাতে হাতে দেখতে পেলেন তো ?” খোজে বোলেন, “হাঁ, সে কথা খেটেছে সত্য, এখন জানলেম, রূপ থাকলেই যে গুণ থাকবে, সে কোন কাজের কথা নয়, স্বাভাবিকের সরস-মধুর রসনার অন্তরালে দানববৎ কুটিল হৃদয় লুকায়িত থাকে ; আবার মন, অকপট হৃদয়, সরল প্রকৃতি, কদাকার কর্ণশ রূপের অভ্যন্তরে বাস দেখা যায়।” খোজেস্তার সঙ্গে হামে-

তের বিবাহ উপলক্ষে সহর শুদ্ধ লোক তাঁদের বাড়ীতে এসে আমোদ-প্রমোদ কোত্তে লাগলো। খোজেস্তা বীরসাহস দেখিয়ে সকলের প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন বোলে, তাঁর বিবাহের দিনে সকলে আশীর্বাদ কোরে তাঁর মঙ্গল হোক, বোলতে লাগলো, যুবতী যেন দীর্ঘায়ু হোয়ে সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করেন, এই মঙ্গলবাদ কোত্তে লাগলো। হামেত নিষ্ঠ স্বভাবের নিমিত্ত, তাঁর পুরুষবৎ নির্ভর প্রকৃতির নিমিত্ত সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাই লোকে চিরকালই তাঁর অহুসার কোত্তো, এক্ষণে তাঁর বিবাহের উৎসব উপলক্ষে লোকে আনন্দে করতালি দিয়ে ঘন ঘন জয়কোলাহল কোত্তে লাগলো। কনকশী খোজেস্তা লোকের তত প্রকৃতিতে দেখে আহ্লাদে গলে পোড়তে লাগলেন, স্মীল হামেত অক্ষুণ্ণহস্তে দুঃখীদিগকে অন্ন-বস্ত্র দান কোরে চরিতার্থ হোতে লাগলেন। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল, নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেন, তাঁরা হামেতের বাড়ীতে আগমন পূর্বক ভোজন কোরে আমোদ-প্রমোদ কোত্তে লাগলেন।

বিবাহের জনরব শুনে অনেক দুঃখী, কান্দালি, ককির হামেতের বাড়ীতে হুড় হুড় কোরে ঢুকতে লাগলো, বাড়ীর ভিতর রেও রবাহতোর মস্ত ভিড় লেগে গেল, পেটাখী-দের আজ মাছেজ্রাযোগ, যে বত পারে, আকর্ষ উদর পরিপূর্ণ কোরে ফেললে, অনেকেই আহারাদি কোরে বিদায় হয়ে চলে গেল, কেবল জন কয়েক ককির মাত্র সেখানে অবস্থান কোলুলে তারা খেয়ে দেয়ে বা অবশিষ্ট ছিল, সেইগুলি টেচে মুচে নিয়ে বুজির মধ্যে পুচ্ছিলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐখানে সে রাজে বাস করবার মনন কোরে পীড়ার ভাগ কোয়লো। একজন ককির হঠাৎ পীড়িত হয়েছেন শুনে হামেত তৎক্ষণাৎ অন্দর-বাড়ীর একটা উত্তরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। খোজেস্তা লোকজনকে বোলে দিলেন, “ককিরের প্রতি যেন যত্নের জটি না হয়।” হুজন লোক ধরাধরি কোরে ককিরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বেতে

হয়েছিল, করুণহৃদয় হামেতও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ফকির বেদনার যেন কতই যাতনা পাচ্ছেন, সেইরূপ ভাণ কোরে ছটফট কোত্তে লাগলেন, কৌকোত্তে লাগলেন, গেলরাত্তে লাগলেন, এক একবার পেটে হাত দিয়ে চেপে চেপে ধোত্তে লাগলেন। হামেতের অহুমতি ক্রমে একটি বাতি জ্বলে রোগীর বিছানার কাছে রাখা হলো, হামেত বিনয় কোরে বোলতে লাগলেন, “ভয় কি, কাল আরোগ্য হবেন। এ তোমার আপনারই বাড়ী, যত্নের ক্রটি হবে না। আমি যে ঘরে শুই, তোমার পাশেই সে ঘর, রাত্রির মধ্যে যদি কোন আবশ্যক হয়, দরজায় এসে যা মেরে জাগাবেন, আমরা কেউ তখনি উঠে আসবো।” ফকির বিভিড় কোত্তে লাগলেন, বোধ হোলো, যেন আশীর্বাদ কোল্লেন, হামেত আপনার ঘরে শয়ন কোত্তে চোলে গেলেন। হামেতের ঘর আর ফকিরের ঘর প্রায় পাশাপাশি, কেবল মধ্যে একটা ছোট গলি-পথ মাত্র ছিল। রাত্রি ঝাঁঝ কোছে, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, সকলে নিরুদ্বে নিশ্চক, ফকির উঠে বোসলো, কান দুটি খাড়া কোরে রাখলে, তার বোধ হোলো যেন, পায়ের শব্দ শুন্তে পাচ্ছে, শেষে ভেবে দেখলে, সেটা তার ভ্রম, কোন দিকে কোন শব্দটি মাত্র নাই। ফকির এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আশ্তে আশ্তে, তয়ে তয়ে, হামেতের ঘরের দরজার কাছে গেল, হামেত অকাতরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর নাক ডাকছিল, ফকির পা দিয়ে আশ্তে আশ্তে দরজাটা একটু ঠেল্পে, ভিতরের দিক দিয়ে বন্ধ ছিল না বোলে দরজাটা একটু কঁক হসে পোড়লো, ফকির ফিরে গিয়ে একটা আলো আন্লে, এবার তার সাহস হয়েছে, আলো এনে দরজাটি খুলে ফেল্পে, খোলবার সময় দরজাটা কড়াং কড়াং কোরে শব্দ কোরে উঠলো, ফকির অমনি ছম্কে উঠে আলোটি ঢেকে ফেল্পে, পাছে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, তাই তার মনে ভয় হোলো, ফকির আবার আপনার ঘরে ফিরে এলো, এবার

সে ঘরের দরজাটি হাঁ কোরিয়ে খুলে রেখে দিলে। রাত্রি গভীর হয়েছে, শাশানভূমির ভ্রায় সব নিশ্চক, ফকির পুনরায় হামেতের ঘরে প্রবেশ করবার চেষ্টা কোল্পে, দরজাটা আরও একটু কঁক করবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু কঁচ কঁচ শব্দের ভয়ে পাল্পে না, এক হাতে প্রদীপ, আর এক হাতে একখানি নর-হস্তা ছোঁরা বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আছে, হামেতের ঘরের দরজা আর একটু কঁক না কোল্পে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু পাছে কঁচ কঁচ শব্দ হয়, ফকির সেই ভয় কোত্তে লাগলো। একটু থেমে, একটু ভেবে, একটু চিন্তা কোরে ছোরার অগ্রভাগটি প্রদীপের তেলে ডুবিয়ে তা থেকে দু চার ফোটা তেল দরজার কবজার গায় মাখিয়ে দিলেন, তখনও কোন দিকে সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না, বরং তখন হামেতের কি খোজন্তার নিশ্বাস গড়বার শব্দ পর্যন্তও শোনা যাচ্ছিল না। একপে দরজাটি নিঃসাড়ে খুলে গেল, প্রাণহস্তা ফকির ছোঁরাখানি উপর দিকে খাড়া কোরে ধোরে নিঃসাড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, যেমন তিনি আর এক পা বাড়াবেন, অমনি সিদ্দিসুফাকের পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণ-ত্যাগ কোল্লেন। সিদ্দিসুফাক একখানি প্রকাণ্ড বোগদা নামক ছোঁরা পেটে বোলিয়ে দিতেই ফকির ধড়াস কোরে তার পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্পে, সিদ্দিসুফাক অমনি বোলে উঠলো, “রে নরাধম! রে পায়ণ্ড! আমার প্রভু যে তোরা প্রতি তত স্নেহ, তত যত্ন কোল্লেন, তার কি এই ফল, তার কি এই পুরস্কার, তাঁরে তুই খন কোত্তে এসেছিস? হা! কি তামাসা! হা! কি তামাসা! প্রভু উঠুন। ঘরের ভিতর কি তামাসা, দেখুন এসে!!”

হামেতের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তত নিশীথ রাত্রে সিদ্দিসুফাকের কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ে হড়-বড়িয়ে গেলেন, ঘরে আলো জল্ছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে সেই আলোটি হাতে কোরে এনে দেখেন, ফকির মূর্তি ফকিরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের মেঝে রক্তের তরঙ্গ

খেলছে, ফকির সেই তরঙ্গের উপর ভাসছে ! ! !

হামেত চমকে উঠে বোললেন, “সিদি ! কি কোরেছো ! তুমি তো পুণ্যাখ্যা ফকিরকে খুন করোনি ?” সিদিমুফাক অজুলি দ্বারা ফকিরের ছোরাখানি দেখিয়ে দিয়ে বোলেন, “তুমি যেকোন স্নেহ কোরে ওকে এখানে স্থান দিয়েছিলে, তারই ফল যা হোতো, তা ঐ চক্ষে দেখ, অদৃষ্টের বড় জোর, তাই ঐ মহাপাতকীর পায়ের শব্দ শুনে পেয়েছিলেন, সে-ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে যেমন আর এক পা বাড়িয়ে তাঁমার বিছানার কাছে যেমন যাবে, অমনি ছোরা মেরে একেঁড়, ওকেঁড় কোরে দিয়েছি, তাই যা এক্ষণে চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন ।”

গোলমাল শুনে খোজেন্তাও উঠে এলেন, বাড়ীশুদ্ধ জেগে উঠে গোলমাল কোত্তে লাগলো । কাফ্রি দাস মৃত ফকিরের কোমর থেকে আর একখানি ছোরা বার কোলে, সেই ছোরাখানি দেখে সিদির মনের সংশয় মিটে গেল, তখন তার মনে স্থিরজ্ঞান হলো, এ ব্যক্তি নিশ্চয় খুন কোত্তে এসেছিল, একখানা ছোরা দ্বারা যদি কার্য্যসিদ্ধি না হোতো, কি সেখানা যদি তার হাত থেকে মুচড়িয়ে কেড়েই নিতো, তাই বোধ হয় দুখানি ছোরা সঙ্গে কোরে এনেছিল । খোজেন্তা বাতির আলোতে মৃত ফকিরের চেহারা ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, দেখেই শিউরে উঠে চীৎকার কোরে বোলেন, “হা আল্লা ! এ যে আমাদের সেই কালশত্রু কাল্মাক ডাকাত !” হামেত আর সিদি ঐ কথা শুনে স্তব্ধপ্রায় হোয়ে নিকটে এসে ঠাউরে ঠাউরে দেখে বোলেন, “হাঁ ! যথার্থই ত কাল্মাক ডাকাত !” হামেত আর খোজেন্তা তাঁদের চিরবিখ্যাত কাফ্রি দাসকে বিস্তার প্রশংসা কোত্তে লাগলেন, বোললেন, “সে ব্যক্তি ছিল বোলে তাই এ যাত্রা-রক্ষা পেলেন, তার অব্যর্থ সন্ধানের, তার সন্তর্কতার যে কত গুণ, তা বুঝে বোলে উঠা যায় না ।”

কাল্মাক যে কেন আপনার ছুর্তিসিদ্ধি সফল কোরে তুলতে পারেন না, সে কথা প্রকাশ কোরে বলা আবশ্যক । হামেত ফকিরকে বোলেন, তাঁর ঘরের পশ্চাতেই তাঁর (হামেতের) ঘর, সেই ঘরে তিনি (হামেত) শয়ন করেন, তাঁর (ফকিরের) কোন প্রয়োজন হোলে দরজায় আঘাত কোরবেন, তার ভাবার্থ এই—সিদিমুফাক উঠে ঐ ফকিরের তত্ত্বাবধান কোরবে । তাই ফকিরবেশধারী কাল্মাক মনে কোলে, তবে আর চিন্তা কি, তার লক্ষিত ব্যক্তি যে ঘরে থাকে, তা তো তিনি জানতেই পারেন, কাল্মাক স্বপ্নেও জানতেন না যে, যে দরজায় করাঘাত করবার কথা বলা হয়, সে ঘর সিদিমুফাকের, তার পাশে যে ঘর, সেই ঘর হামেতের । কাল্মাক যে নিশ্চাসের শব্দ শুনে পেয়েছিলেন, সে কাফ্রি দাসেরই নাসিকা-গর্জন । সিদিমুফাক তত অকাতর হোয়ে নিজা যাচ্ছিল না, তাই দরজায় কঁচাচকোঁচ শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোক মেলে চেয়ে দেখে, প্রদীপের ছটা গিয়ে তার ঘরে পোড়েছে, ঐ আলো দেখে নিঃসাড় উঠে বোসলো, বোগদানামক কালান্তকপ্রায় প্রকাণ্ড ছোরা একখানি হাতে কোরে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়াতেই তার বোধ হোলো, কেহ যেন অতি সতর্ক হোয়ে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছে, বিষয়টা জানবার নিমিত্ত কাফ্রি দাস কপাটের কবজার উপর কান পেতে রইলো, সেই সময় কাল্মাক ঐ কবজার উপর ফোঁটা ফোঁটা কোরে তেল ঢেলে দিচ্ছিলো, সিদিমুফাক প্রদীপের আলোয় দেখলেন, কাল্মাকের হস্তে একখানি ছোরা, ছোরাখানি ঝক্ ঝক্ কোচ্ছে, তাই দেখে অনধিকার-প্রবেশকের অভিপ্রায় বুঝতে পারেন, তখন সিদি নিজের বোগদাখান্নি খুব কোসে বজের মতন শক্ত কোরে ধোরে দাঁড়িয়ে রইলো, কাল্মাক একটি পা ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটি পা যেমন বাড়াবে, কাফ্রিদাস অমনি পেটে ছোরা মেরে একেঁড়, ওকেঁড়ে কোলে, কাল্মাক

তখন নিঃশব্দে ভূমিসাৎ হোলো, আর তাকে উঠতে হোলো না।

কাল্মাকের বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল, তিনি অতি শঠও ছিলেন, যে কোন বিষয় হোক, অন্যারাসেই তার মর্থ গ্রহণ কোতেন। কাকে ন্যায়, কাকে অজ্ঞায় বলে, সেই বিষয়ে তাঁর ভ্রম হওয়ায়, কাল্মাক মনে কোলেন, তিনি নিজে যখন জ্যেষ্ঠ সহোদরদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত, উৎপাতগ্রস্ত হয়েছেন, তখন অজ্ঞের প্রতি তিনি উৎপাত অত্যাচার না কোরবেনই বা কেন? তাদের প্রাণেই বা না মেরে ফেলবেন কেন?

পরম শত্রু কাল্মাকের মৃত্যু হয়েছে, এই অবধারিত সংবাদ দেশময় জনরব হওয়ায় গিজনিবাসীরা অজ্ঞানে ভাসতে লাগলো, যে কঁাসীকাঠে কাল্মাকের জন্ম পূর্বে প্রস্তুত হয়েছে খোকে, সেই কঁাসীকাঠে কাল্মাকের মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কাল্মাক পাণিয়ে প্রস্থান করা অবধি খোজের মনে একদিনের নিমিত্তেও সুখ ছিল না, পতিপ্রাণা খোজেন্তা তাঁর প্রিয় স্বামী হামেতকে লোয়ে নির্বিঘ্নে স্নেহে কালযাপন কোতে লাগলেন।

তাতার বংশজাত তাইমুর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিন পুত্র, কাল্মাক সর্ক-কনিষ্ঠ। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক অর্থ ছিল, কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে তাঁর অগাধ বিষয়-বৈভবও ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র কাল্মাককে অতি-শ্রম স্নেহ কোতেন, সেই তাঁর প্রিয় পুত্র ছিল। কাল্মাক যখন যে আবদার কোতেন, তাইমুর তখন তা পূর্ণ কোতেন, তাই দেখে জ্যেষ্ঠ সহোদরদের মনে ঈর্ষা জন্মিল, তাদের চোকে টাটালো, তাঁরা প্রতিজ্ঞা কোলেন, যাতে কাল্মাক ছারে ধারে যাব, যাতে সে নিপাত হয়, তার উপায় তাঁরা কোরবেনই কোরবেন। তুর্কি দেশের একটি পরমা-শুদ্ধী জী তাঁদের পিতার উপগণ্ডী ছিল, ঐ জীলোকটিকে মধ্যবর্তিনী কোয়ে জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা মনোগত দুর্ভিত্তিকি সুসিদ্ধ করেন। সহোদরেরা জীলোকটিকে ডেকে

বোলেন, তিনি যদি তাঁদের দুই অভিপ্রায় সিদ্ধ কোরে তুলতে পারেন, তা হলে বিস্তর অর্থ দিয়ে তাঁকে সম্ভ্রষ্ট কোরবেন। জীলোকটি অতি শঠ, অতি মূর্খ ছিলেন, কোন কুখ্যারটিয়ে দিয়ে কাল্মাকের পিতা তাইমুরের কান বিবাক্ত কোরে দিলেন। তাইমুর দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুরবগাহ চক্রে জড়িয়ে পোড়ে কাল্মাককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দূর কোরে দিলেন। অল্প দিন পরেই পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় তাঁর সমস্ত বৈভব দুই সহোদর আপনাদের মধ্যে ভাগ বাঁটওয়ারা কোয়ে মিলেন। কাল্মাক বাল্যকাল হোতে সুখ-সম্পদে থেকে ভোগরাগে লালিত হোয়ে এসেছেন, যখন যে বাসনা হোয়েছে, মনের সাথে তা পূর্ণ কোরেছেন, এক্ষণে কষ্ট কোরে দিনপাত করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠলো। সহোদরদের উপর কালক্রোধ জন্মিল, মনে কোলেন, এ সংসার শুদ্ধ ছলনার চক্র, এ সংসারের অন্ত পাওয়া ভার, বঞ্চনা, প্রতারণা আদি না না মায়া এ সংসারের অন্তবাহিনী নদী, যাদের ক্রুর মন, ধারা ধলতা শঠতা প্রভৃতি না না দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার কোতে পারেন, এ সংসারে তাঁদেরই চোচাপটে জিত। তাই মহস্য নাগে কাল্মাকের কালক্রোধ জন্মিল। একদল দুঃসাহসী ডাকাত, যাদের প্রাণে ভয় নাই, তাদের সঙ্গে কাল্মাক মিশে গেলেন, কিছু দিন পরেই তিনি সেই দলের সরদার হোয়ে দাঁড়ালেন। কাশ্মীর সহরে বিস্তর থানা, বিস্তর কঁাড়ি, বিস্তর কোতোয়ালি ছিল, কর্তৃপক্ষেরাও অতি সতর্ক হোয়ে চোলেতেন, তাই বদমাসেরা সেখানে নিরুৎসাহে উৎপাত অত্যাচার কোতে পারে না। কতকগুলি ডাকাত ধরা পোড়ে কঁাসি হলো, কাল্মাক ধরা পোড়তে পোড়তে বেঁচে গিছিলেন, মচেন তাঁর অদৃষ্টেও সেই দশা ঘটতো। এক্ষণে কাল্মাকের দলের মধ্যে কেবল চক্কিশটি মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট ছিল, কাশ্মীরে পুলিশের বড় আঁচা আঁটি, বড় কড়াকড়ি, তাই দেখে কাল্মাক, (এখন তিনি দলের সরদার) মনে মনে স্থির কোলেন,



এবার একটা নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ কোরবেন। তাঁর দলের একটি লোক অনেক দিন গিজনির নিকটে বাস কোরেছিল, সে ব্যক্তি বোন্সে, তবে কারুলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, তাই সেই ভগ্ন-মন্দিরের অতল অন্ধকারময় গহবরে আশ্রয় নিলেন। সেই অন্ধপাতালপুরে অবস্থান কোরে তথাকার ফাঁড়ি, থানা, কোতোয়ালি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ, সেখানকার লোকের অর্থের সৌষ্ঠবই বা কিরূপ, সেই সকল সন্ধান অবগত হবার জন্ত সহরে চর পাঠাতে লাগলেন। গৃহ-পুরুষদের মুখে তথ্য অবগত হোয়ে কালমাক বিবেচনা কোল্লেন, গিজনিতে অর্থের যেরূপ সুপ্রতুল থানা ফাঁড়ির বেরূপ গাফিলি, তাতে কোরে তাঁর সকল আশাই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা, পুলিশের কোন হাক্কাম নেই বোল্'লই হয়, সহররক্ষকেরা বেরূপ অসতর্ক, তাতে কোরে দরী পড়বার প্রায় আশঙ্কা মাত্র নাই। এ সময়ে গিজনি সহরে বাণিজ্য প্রভৃতি কারুকার্য-বারের ভারি সমারোহ চোলেছিল, কাশ্মীর প্রভৃতি নানা দেশ থেকে হীরামুক্তাদি রেশমের আমদানি হোয়ে সুপাকার হতো। চাকাতেরা পথের মধ্যে রাহাজানি কোরে সেই সকল বাণিজ্য-দ্রব্য লুটে নিতে আরম্ভ কাল্লে, ইদানীং ভয়ে দেশবিদেশের মহাজনেরা বহুমূল্যের জিনিস-পত্র পাঠাতে কান্ধ হলো, তাই দেখে কাল্মাক অসমসাহসী হোয়ে গিজনিবাসী মহাজনদিগের সজ্জিত অর্থ অপহরণ করবার পরামর্শ দ্বির কোল্লেন। দারা তাঁর পত্রের অগৌরব কোরে লিখিত দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার কোস্তেন, নির-বচ্ছিন্ন তাঁরাই কেবল প্রাণে মারা পোড়তে লাগলেন, কাল্মাকের হাত থেকে একটি প্রাণীরও পরিজ্ঞান ছিল না। কিছু দিন এই ভাবে কেটে গেলে, সহরে আরও কত ধনী লোক আছে, সেই সন্ধান জানবার নিতান্ত আবশ্যক হলো, নচেৎ যার ভার উপর লক্ষ্য কোল্লেন কি ফল হবে, বেছে বেছে ধনী লোককে ভয় না দেখালে আর কে সেই সর্ব-গ্রাহী দাবীর টাকা দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত

কোরবে; সেই সকল সন্ধান জানবার নিমিত্ত কাল্মাক স্বয়ং সহরে গমন কোরলেন। এই কথা স্থির হলো, কাল্মাক বেরূপ বিনয়ী, সভ্য-ভবা, তাতে কোরে তাঁর মনে প্রব জ্ঞান ছিল, তিনি অনায়াসেই বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কোস্তে পারবেন। তাঁর অল্পগত লোকেরা নানা বেশ-ধোরে সহরের ভিতর সর্বদা যাতায়াত কোস্তো, তাঁরাই রটিয়ে দিলে, কাশ্মীরের একটি মহাজন বিস্তর বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে গিজনিসহরে আগমন কোচ্চেন। শেষে কাল্মাক যথাসময়ে সহরের ভিতর প্রবেশ কোরে হাহাকার শব্দে রোদন কোতে লাগলেন, সহর শুদ্ধ লোককে জানালেন, তাঁরা বহুকাল হোতে যার আগমনের প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, তিনিই সেই মহাজন, পথিমধ্যে কাল্মাক ডাকাত দলবল শুদ্ধ পোড়ে তাঁর সমুদায় জিনিস-পত্র লুটে নিয়েছে, কাণাকড়িটি পর্যন্ত পরিত্যাগ কোরে যায়নি, তিনি অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন। তার পর কাল্মাক প্রতিপন্ন হোয়ে খোজের গৃহে বেরূপে বাস করেন, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কাল্মাক ছদ্মবেশের অবস্থায় যদি খোজেন্তার মধুরমূর্তি দর্শন না কোস্তেন, তবে আরও কিছুকাল ডাকাতি বাটপাড়ি কোরে মেয়ে কেটে বেড়াতেন। স্বর্গশী খোজেন্তার প্রতি নেত্রপাত কোরে কাল্মাক মনে মনে স্থির কোল্লেন, যে গতিকেই হোক, যুবতীকে বিবাহ কোরেন। তিনি এ পর্যন্ত যখন যে অভিনাব কোরেছেন, তাই পূর্ব হোয়ে এসেছে, বিদ্র কাকে বলে, তা জানতেন না। খোজেন্তা তাঁর প্রণয়িনী হোলে অসৎ সংসর্গ, অসৎচরিত্র, পরিত্যাগ কোরে প্রসক্ত তত্রলোক হোয়ে, সংসারযাত্রা নির্বাহ কোস্তেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, যুবতী হামেতের অহু-রাগিনী, তিনি যখন দেখলেন, তাঁর উপাসনা নিফল হলো, তখন ক্রোধে কাল-অগ্নির দ্বার হলেন, প্রতিহিংসা-অনলে তাঁর অন্তর দগ্ধ হোতে লাগলো, তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যে কোন উপায়ে হোক, হামেতকে



আর খোজেন্তাকে আপনার হাতের মধ্যে নিয়ে আসবেন। যুবতী যদি সেধে ইচ্ছা কোরে তাঁর বাহুলতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তবে হামেতকে বলিদান দিবেন। সে সকল কৌশল যেক্ষেপে বধা হয়ে গেল, সে বৃত্তান্ত পূর্বেই বলা হয়েছে।

## ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

“মরে নারী উড়ে ছাই, তবু তায়ে  
বিশ্বাস নাই।”

আরজজেব পল্লটি প্রবণ কোরে, হামেতের বীরপ্রণয়িনী খোজেন্তার অতিশয় প্রশংসা কোন্তে লাগলেন, রাজকন্যাসদৃশরূপ একছড়া উজ্জ্বল মুক্তাহার হামেতকে প্রদান কোলেন, তদ্বির মুখে বোলে দিলেন, “হামেত বত দিন আগ্রাতে বাস কোরবেন, তাঁর প্রতি যেন বিশেষ যত্ন, বিশেষ গৌরব করা হয়।” আমি কিন্তু এক প্রকার আশাপ্রত্যাশায় বঞ্চিত হোলেম, রাজপুত্রের পক্ষ হয়ে যে সকল বীরকাৰ্য্য কোরেছি, তার মতন আমার কোন গৌরবের পদ হোলো না, বরং অপমানিতই হোলেম, সে অপমান সহ হবার নয়। একটি পদের নিমিত্ত প্রার্থনা করায় রাজপুত্র “পাবে না” বোলে মুখের উপর তুচ্ছ জবাব দিয়ে দিলেন, শুধু তা নয়, আমি দেখলাম, কুমার অন্ন স্বল্প সৈন্তের অধিনায়ক কোরে কেবল খাজনার সঙ্গে, কি বড় বড় মাজ লোকের সঙ্গে আমার রক্ষক কোরে পাঠাতে লাগলেন, তাতে কোরে স্পষ্ট বোধ হলো, আরজজেবের ইচ্ছা ছিল না, আমি তাঁর নিকটে থাকি। আরজজেব মুখে আমার বিস্তর গৌরব কোন্তেন, বোধ হয়, সেই প্রশংসার কথা শুনে, হয় সুলতান মহম্মদের, নয় সুলতান মাজমের মনে যে খদ্দে, তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউই আমার উপর অনন্তই হয়ে থাকবেন, তাই আমার পক্ষান্তে পোড়ে থাকতে হয়েছে। যাতে এই অপ-

মান থেকে পরিজ্ঞান পাই, তারই একটা উপায় স্থির কোলেন। একদিন আমদরবারে স্বয়ং আরজজেবের সম্মুখে আমার তলওয়ারখানি ধোরে দিলেম, ধোরে দিয়ে বোল্লেম, “জোনাবলী! সম্মতি যে সকল লড়াই হয়ে গিয়েছে, যে সকল লড়ায়ে এ তলওয়ার নিক্ষেপ হোয়ে বোসে ছিল না, হুজুর নিঃসন্দেহ মনে কোরেছেন, এ তলওয়ার অনেক খেটেছে, খাটতে খাটতে ভোঁতা হয়ে পোড়েছে, তার সাবেক মত তীক্ষ্ণ তেজ নাই, তাই এক্ষণে নিক্ষেপ হোয়ে পোড়েছে। আমি সহমানে তলওয়ারখানি পরিত্যাগ কোল্লেম, যে পদের গৌরবে তলওয়ারখানি আমার ভূষণ হোয়েছিল, সে পদও আমি সহমানে পরিত্যাগ কোল্লেম।”

আরজজেব আমার অশ্রুতপূর্ব্ব সহসা প্রশংস দেখে কালান্তক যমের স্রায় কটমট কোরে চাইলেন, চেয়ে বোল্লেম “যুবা! তোমার বড় সাহস! তোমার বড় অহঙ্কার! কিন্তু খবরবার! আমি দেখবো, তুমি কি কোরে আমার শত্রুর দলে প্রবেশ কর।” এই বোলে বস্ত্র আন্দোলিত কোলেন, তাই দেখে আমি অমনি সেখান থেকে চোটে এলেম, চোলে আসবার সময় সুলতান মাজমের সঙ্গে চোকাচোকা হওয়াতে দেখ্লেম, তিনি একটু সগর্বে হেসে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কোলেন। মাজম প্রফুল্লচিত্ত হোয়ে আমার অন্তর দোয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তেছিলেন। আমি এক্ষণে বেকার হোলেম, আবার দুদিন পরেই আহাড়াভাষে পেটের জালায় ছট্‌ফট্‌ কোন্তে হবে। সলিমানে যে যখন বোল্লেম, “আমি এতকা দিয়েছি,” ঐ কথা শুনে সলিমানের চেহারা যেন শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল, তার তৎকালীনের মৃতিটি চিরকায় মনে থাকবে, ভুলতে কখনই পারবো না। সলিমান কেন তত সন্দ্বিগ্ন হুঃখিত হলো না সে ব্যক্তি নিজেকে কষ্ট পাবে বোলে? সে কথা আমি এখন বোল্তে পারিনে। আমার মুখে অন্তর্যাক্ষর কথা শুনেই সলিমান তড়াকোরে লাকিয়ে উঠে বোলে, “হার রে! আমি

বদ্বক্ত সলিমান! হাররে! আমি কব্বক্ত গোলাম।” এ ভিন্ন সলিমান আরও কত অস্তিনাদ, আরও কত দুঃখের বিলাপ কোন্তে লাগল, তার রকম সকম দেখে আমি বিরক্ত হয়ে গেলেম। লুচার পরামাণিকও শুনে অতিশয় বিয়ল, অতিশয় রান হলো, সে কিন্তু বাঙনিম্পত্তি কোন্তে না। সন্ধ্যা হোতে না হোতে আমার চৈতন্ত হলো, তখন অল্পতাপ কোরে হার হার কোন্তে লাগলেম, বাস্ত হরে কি কুকাই কোরেছি, তখন মনে মনে এই দুঃখ হোতে লাগলো। ইরাস্মিনের মাতা কোথার আছেন, তাঁর সন্ধ্যা কোন্তে বেক-লেম। অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্তে, তারা আমার সম্পদের সময় আমার বন্ধু বোলে সম্বোধন কোন্তো, কিন্তু এক্ষণে ভালমুখে আলাপও কোন্তে না, ভালমুখে ডেকে জিজ্ঞাসাও কোন্তে না। তা না কোন্তে, নাইই কোন্তে, একজন মোল্লার সঙ্গে আমার আন্তরিক সম্বাব ছিল, কতক বয়সের গোঁরবে, কতক পবিত্র পদের গৌরবে ঐ মোল্লা উপ-দেশচ্ছলে আমার বিস্তর ভৎসনা কোন্তে লাগলেন, বোলেন, “যখন চাকুরী আমার একমাত্র অবলম্বন, তখন এতক্ষা দেওয়া অতি মুখের মতন কাজ হোয়েছে। মহাজনেরা, বেণেরা, সাহুরা আমার টাকা কর্জ দিতে অস্বীকার কোন্তে, দেবো না বোলে মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলে। এলুবাব পোষাক দালালের হাত দিয়ে বিক্রী কোন্তে দিলেম, দালালেরা বৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের স্বায় কিছু এনে দিলে, সে এত অল্প যে, কিছু না, দিবাতই মধ্যে। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চোলেছি, পথে লুচার পরামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, পরামাণিক বোলে, “আরও জেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মাহুদের লোক আমার খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাজপুত্র আজ আপ-তাপ বাগিচায় যাবেন, ওই সঙ্গে যাবার নিমিত্ত আপনাকে ডেকেছেন।” এই কথার পর লুচার বোলে, “হজুর, হজুর ত অদৃষ্ট খুলেই যাব।” আমি শুনে বড় উৎকণ্ঠিত হোলেম, যেখান থেকে ডাকবায় কোন সম্ভাবনা নাই,

সেখান থেকে কেন ডাক্তে এলো? এ আশ্বাসের অভিশ্রায় কি? সন্ধ্যা হর হর, এমন সময় আমি সেই বাগানে গিয়ে পৌছিলাম; পৌছিয়ে যেমন সদর দরজা পার হয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ কোরেছি, এমন সময় আমার স্মৃণ দিয়ে একটি স্ত্রীলোক হন হন ক্রোরে দৌড়িয়ে চোলে গেল, আমি কিন্তু মূর্ত্তিখানি দেখে তারে চিন্তে পাল্লেম। সে স্ত্রীলোকটি নারীবাতিনী নূরমহল। আমি যেমন ফিরে তাকে ধোঁর্ন্তে যাবো, সে অমনি একটা হুঁড়ি গলির মধ্যে প্রবেশ কোন্তে। গেটের দুপাশে বিস্তর গাছ, বিস্তর ঝোড় ছিল, তারি ভিতর দিয়ে কোথার লুকুলো, দেখতে পেলেম না। হুঁরমহল রাজপুত্রের বাগানে কেন এসেছে, আমার ধরবার নিমিত্ত কি জাল পাতা হয়েছে? না দৈবাৎ সে ব্যক্তিও এসে পোড়েছে, আমিও এসে পোড়েছি? দেখলেম, রাজপুত্র খেতকান্তির ফোয়ারার কাছে টোলে টোলে আলবোলা টানছেন, ছুটি বালক পশ্চাৎ থেকে চামর আন্দোলন কোরে মশা মাছি তাড়াচ্ছে। চামরগুলির হাতল হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁধান, দুজন লোক প্রকাণ্ড দুখানি পাখা লোরে সম্মুখে বাতাস কোছে, পাখাগুলিতে মধ্যে মধ্যে গোলাবজল ছিটিয়ে চদওয়া হোচ্ছিল, তাতে কোরে স্থানটি সুপ্রিঞ্চ সৌরভ-আমো-দিত হয়েছিল। সুলতান মাহুদ আমার ইশারা কোরে বোসতে বোলেন। আমি বস-লেম, রাজপুত্র একমনে আলবোলা টানতে লাগলেন, টানতে টানতে সন্ধ্যা হলো। লোকজনকে বিদায় কোরে দিয়ে আমার একটি বিরল ঘরে নিয়ে গেছেন, ঘরটি তাঁবুর দক্ষিণ পাশে। রাজপুত্র বোলেন, “সাদক! তোমার প্রতি ভালরূপ বিবেচনা হয়নি, আমার পিতা তোমার গুণের গৌরব কোন্তে না, তুমি তাঁর ব্যবহারে অলম্বিত হয়েছ।” আমি বোলেম, “তা হরেতি সত্য।” রাজপুত্র বোলেন, “সেটা তুমি বিচিঞ্জ মনে কোরো না, পিতা আমাকেও অবিশ্বাস কোরেছেন, আমার জেম্বাকে প্রধান সেনা-

পতি কোরে, আমার তার অধীন দ্বিতীয় সেনাপতি কোরেছেন, আমি যে তাঁর কত উপকার কোরেছি, তাঁর মুখ চেয়ে কত যে পরিশ্রম কোরেছি, বল হ তাঁর জন্তে শরীরটি এক প্রকার পতনই কোরেছি, এক্ষণে সেগুলি তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। সাদক! এত বেইমানি কি বরদাশ্ত হয়? উপকারে অল্পপকার, এত বেইমানি কার প্রাণে সহ্য হয়, তোমারও আমার মতে মত দেখতে পাচ্ছি, আমিও যা ভাবছি, তুমিও তা ভাবছো, প্রতিফল দেবার অভিনাষ তোমার মনেও জাগছে, আমারও মনে জাগছে।”

আমি বোল্লেম “আজ্ঞা না, আমার সে অভিনাষ নাই।”

“ছো! আমার সঙ্গে ভণ্ডামি কোরো না, সত্য কথা বোলো, আমার পিতা তোমার সঙ্গে বেইমানি কোরেছেন, তার প্রতিফল দিয়ে তাঁরে যে শিক্ষা দাও, এ ইচ্ছা তোমার মনে বেশ আছে, আমি যে তা দেখতে পাচ্ছি।”

“আজ্ঞা, আমি যে পূর্বে ধর্ম্মত: প্রতিজ্ঞা কোরেছি, তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোরবো না।”

“আমিও তোমার ধোঁকতে বলি না, কিন্তু সাদক! যখন আমার প্রজ্ঞাপদ, আমার গৌরবান্বিত পিতামহ শাহাজাহান জীবিত আছেন, তখন রাজসিংহাসনের উপর আমার পিতার কি সন্ত, কি অধিকরে আছে, এখন নাকি পিতামহ বন্দী হোয়ে আছেন, তাই মানিয়ে যাচ্ছে, তাই কোন কথা কেউই বোল্ছে না, তিনি যদি অব্যাহতি পান, তবে অন্যান্য দশ হাজার লোক তাঁকে তৎক্ষণাৎ বাদশাহ কোরে সিংহাসনে বসাতে প্রস্তুত হবে। উচিত কাজ কোরলে কি অস্ত্র বিচার করা হয়? তা তো হয় না। তবে তুমি ভয় কোচ্ছো কেন?” আমি বোল্লেম, “শাহাজাহান আমার মাথার মণি, পূর্বে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম যত দিন বাঁচবো, তাঁরই অল্পগত হোয়ে থাকবো, ইদানীং রোগে রোগে সম্রাটের শরীর ভয় হওয়ার আপনার খুবভাত দারার বার্থা

হোয়ে পোড়লেন, তাই তাঁর পক্ষ আমার ভাগ কত্তে হলো। দারার অধীন হোয়ে থাকলে আমার এতদিন প্রাণে বেঁচে থাকতে হোতো না।” সুলতান মায়ুদ বোল্লেম, “আমার পিতা যত মনে কোরেছেন, তাঁর সিংহাসন তত নিষ্কিয়ের হবে না, দিন কয়েক মাত্র আমাদের প্রাণপণে পরিশ্রম কোত্তে হবে। আরঙ্গজেব আমার পিতা বটেন, কিন্তু আমার মস্তক ছেদন কোত্তে তাঁর একটুও দুঃখ হয় না। দুর্ভাগ্য দারার মস্তকটি অনায়াসে ছিন্ন কোল্লেন, তাতে তাঁর একটুও মায়া হলো না।” আমি বোল্লেম, “তবে তো আমাদের আরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।”

রাজকুমার বোল্লেম, “তা সত্য, আমাদের খুব সতর্ক হওয়াই আবশ্যক। যে সকল লোক অতি সামান্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য, কি আলাপ করবার যোগ্য নয়, সেই সকল লোক লয়েই কাজ কোত্তে হবে, কেবল সতর্ক হবার নিমিত্তই। এই পরামর্শ অনুসারে চোলেতে হয়েছে।”

“হজুর! কোন প্রকার লোক নিযুক্ত কোত্তে মনন কোরেছেন?” সুলতান মায়ুদ বোল্লেম, “একটি জ্রীলোক আছে, সে বড় চতুরা, তার নাম জীবা, সে একজন তার্ককাওয়ালি।” আমি অমনি চমকে উঠে বোল্লেম, “আমি এই বাগানে আসবার সময় তাকে দেখেছি বোধ হয়।”

রাজপুত্র বোল্লেম, “তা হতে পারে, সে তখন আমার এইখানেই ছিল।” আমি বোল্লেম, “হজুর কি তাকে জানেন? সে ব্যক্তিটাকে?”

সুলতান মায়ুদ বোল্লেম, “না, আমি তাকে চিনি না, শুনেছি, সে একজন উত্তম গাইয়ে, তার খুব ফেরেবকন্দি এসে, সে দমবাজির ফেরেববাজির কান পেতে একটি সাম্রাজ্য সংহার কোত্তে পারে। যে জন্তেই হোক, আমার পিতার প্রতি তাঁর বড় বিষেব।”

আমি বোল্লেম, “সে ব্যক্তি আমারও

পক্ষ শত্রু, সে আমার অনায়াসে ধরিয়ে দিতে পারে, একবার ধর্মের দিকে চাইবে না, আমার প্রতি তার এত কাল যুগা।” এই কথা বোলে সে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যেক্রমে আমার আলাপ হয়, আলাপ কোরে যে ফলও হয়, সে সমুদায় রাজকুমারকে অবগত করালেম। রাজপুত্র শুনে মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, ভেবে বোলেন, “তাকে বোলে এ অকৌশল মিটিয়ে দেবো।”

আমি বোল্লেম, “আমি কি এক লহমার নিমিত্তেও তার প্রাণঘাতী কার্যটি বিশ্বত হোতে পার্বো মনে কোরেছেন? তা কখনই পার্বো না, তার সঙ্গে কখনই আমার মনের মিল হবে না।”

রাজপুত্র বোল্লেম, “এ বড় দ্বিধম সমস্যা! তোমাদের দুই জনকেই আমার প্রয়োজন, কাকেও ছাড়তে পারি না, তোমায় ধরিয়ে দিতে গেলে, সে যে আপনি ধরা পোড়বে, তার কি ঠাউরেছে। বল দেখি?” আমি বোল্লেম, “সে আমার ধরিয়ে দিতে একটুও কঠিত হবে না, আমার প্রতিফল দিতে পাল্লেই তার মনে আত্মদাদ হবে। হজুর! সে ব্যক্তি না থাকলে কি চলবে না? শুদ্ধ আমরা কি কার্যনিদ্রি কোরে তুলতে পার্বো না?” রাজপুত্র বোল্লেম, “বোধ হয়, পারবো না, ঐ জীবা, যাকে তুমি নরমহল বোল্লেছো, সে দিল্লী সেনাপতির উপপত্নী, সেনাপতি ঐ স্ত্রীলোকটির প্রণয়ে অন্ধ হোয়ে পড়েছেন, জীবা যে দিকে ফেরাবে, তিনি সেই দিকে ফিরবেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে মধ্যবর্তিনী কোরে হয় বন্দী শাজাহানকে মুক্ত কোর্বো, নয় কেল্লার মধ্যে ফোজ প্রবিষ্ট করাতে পার্বো, কিন্তু এ অমুঠানের পূর্বে দিল্লীর ভিতর এবং দিল্লীর চতুর্দিকে বন্ধ বাক্সের দল পুষ্টি করা আবশ্যক, বিশেষতঃ রাজপুত্র বশোবস্ত সিংহের আত্মকল্য আরও আবশ্যক। অগ্নি খাঁর পুত্রেরও সহায়তা প্রয়োজন কোছে, তার পিতাকে আরঙ্গজেব হক নাহক খুন কোরেছেন, তাই প্রতিফল

দিবার নিমিত্ত তার অন্তঃকরণ ছট্‌ফট্‌ কোছে। আমি বোল্লেম, “বন্ধুবাক্সের তত দল বন্ধ কোন্তে গেলে টাকার দরকার হবে।”

শুলতান মামুদ বোল্লেম, “সাদক! সে কথা সত্য বটে; এই সম্বন্ধে সেই তরফাওরাণী স্ত্রীলোকটি মিত্রবৎ হোয়ে দাঁড়িয়েছে।” ঐ কথা শুনে অবাক হোয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। রাজপুত্র বোল্লেম, “সাদক! সত্যই বোল্ছি। মাহিরদের সঙ্গে, ভিলেদের সঙ্গে কথা স্থির হোয়ে গিয়েছে, ভিল আর মাহিরেরা চুরি ডাকাতি কোরে, লুটপাট কোরে, লোকের কাছে থেকে জবরদস্তি কেড়ে কুড়ে নিয়ে আবশ্যক অর্থের আমদানী কোর্বে, তদ্বির শাজাহানের কাছে বহুমূল্যের রত্নও বিস্তর আছে, তবে আর খরচপত্রের অপ্রতুল হবার সম্ভাবনা কি?”

আমি বোল্লেম, “আরঙ্গজেব সে রত্নগুলি জবরদস্তি কোরে চেয়ে পাঠিয়েছেন।” রাজপুত্র বোল্লেম, “আমি তা জানি, আমার পিতামহ তাঁর দাস্তিক পুত্রকে যে কথা বলে পাঠিয়েছেন, তা শুনে পিতাকে আর রত্নগুলির জন্তে পিতামহকে বিরক্ত কোন্তে সাহস হবে না। শাজাহান বোল্লেছেন, ‘রত্নগুলির জন্ত পিতা যদি তাঁর কটক হন, তবে হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি চূর্ণ কোরে ফেলবেন, হাতুড়ীও তাঁর কাছে প্রস্তুত আছে।’”

আমি বোল্লেম, “তা হলেই ভাল, এক্ষণে এ অসম-সাহসের অমুঠানে আমাকে কি কোন্তে হবে?” রাজপুত্র বোল্লেম, “তুমি রাজপুতনায় গিয়ে রাজাদের সঙ্গে, ঠাকুরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, আমাদের মানস, আমাদের চেষ্টা, আমাদের অভিপ্রায় তাদের কানে ঝড়ার কোর্বে, আমি তোমায় ইজিত কোরে পাঠাবো, সেই ইজিত পেয়ে তাঁদের সৈন্তসামন্ত লয়ে একেবারে দিল্লীতে কুচ কোরে ঢোলে যাবে। চূর্ণ অবরোধ করবার ভার আমার উপর রইলো। আরঙ্গজেব যদি কাল প্রলয়ের স্তায় প্রচণ্ড ঝড়বৎ হয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোন্তে

আসেন, তখাচ তাঁকে নিরাকৃত কোরবো। সে তার আমার উপর রইলো। তাঁর নিজের বিশ্বর লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, তবে মনে কর, তারাও আমাদের পক্ষ হবে। বাদশাহ দীর্ঘজীবী হউন, সাজাহান দীর্ঘজীবী হউন, এই ঘোর নিনাদ শ্রবণ কোরে মৃতবৎ ব্যক্তির শরীরেও তেজস্কৃতি হোতে দেখতে পাবে। সাদক! তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার পিতার জীবন আমার কাছে অতি পবিত্র, যদিও আমার সম্বন্ধে তিনি পুত্রবৎসল নন; কিন্তু আমি কদাচ পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হব না। ছয়জন ধাউড়ে, দুই জন উটসোয়ার সঙ্গে কোরে নিও; সময়ে সময়ে পত্রদ্বারা আমাকে সংবাদ লিখও, কিন্তু সে পত্র চলিত প্রধায় লেখা হবে না, ইশারায় লিখতে হবে, আমি ভিন্ন অণু কেউই যেন বুঝতে না পারে। কখন কখন দেখাসাক্ষাৎ ইবারও আবশ্যক হবে, তুমি কিন্তু আমার এখানে এসো না। ঘনগড় গঞ্জ নামক স্থান এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে, সেই স্থানটি আমাদের আড়ডা-স্থল হবে, বেছে বেছে কতকগুলি প্রহরী সেইখানে নিযুক্ত কোরে রাখবো। এই আংটি দেখালে তোমার সেখানে যেতে দেবে। (একটি আংটি প্রদান করা হলো) “এন্সাক্” আমাদের সাক্ষেতিক কথা, সৈন্তসংগ্রহ ও বজ্রবান্ধব সংগ্রহ করবার পূর্বে একবার সে স্থানটা তোমার দেখা উচিত, আমি একজন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দেবো, সে তোমার সেই অপূর্ণ কার্যোপযোগী স্থানে নিয়ে যাবে, কাল সূর্য্য উদয় না হতেই সোয়ার হোয়ে এই বাগানের দিকে সরাসর চোলে এসো, সেই লোকটি তোমার সঙ্গী হবে, তার মুখে সাক্ষেতিক কথা শুনে তুমি বুঝতে পারবে, সে ব্যক্তি তোমার মিত্র বই শত্রু নয়, এই এক তোড়া মোহর লও, তোমার বিবেচনা যত খরচপত্র করিও। যে সকল রাজাদের কাছে সাহায্য পাবার আশা আছে, তাদের নামে আমি পত্র দেবো, তোমার পথপ্রদর্শক সেই পত্র তোমার জিন্দে কোরে দেবে, তস্তির উট, হুকরা, চোপদার, জমাদার

প্রভৃতি যা যা তোমার প্রয়োজন হবে, তারও বন্দোবস্ত কোরে দেবে।”

এই সকল কথা স্থির হোয়ে মোহরের তোড়াটি নিয়ে বিদায় হোলেম, যাবার সময় বোলেম, “যে পক্ষ ধর্ম, সেই পক্ষ থেকে সাধ্যা-স্বধায়ী উপকার কোত্তে চেষ্টা কোরবো।” বাড়ীতে এসে মনে কত কি উদয় হতে লাগল, কার পক্ষ হব, কার পক্ষ না হব, শুয়ে পোড়ে সেই চিন্তাই কোত্তে লাগলেম, আরজজেবের বণপ্রতাপ এক্ষণে সকলের অপেক্ষা প্রবল, শাজাহান শরীরগতিকেও দুর্বল হোয়ে পোড়েছেন, তাঁর বজ্রবান্ধবের দলও ক্ষীণ হোয়ে পোড়েছে। মনে করুন, সুলতান মামুদ যেন ভয়ানক হোলেন, কিন্তু যার জন্তে আমরা প্রাণ ওষ্ঠাগত কোরবো, তিনি আর কত দিন বেঁচেবেন, সে বিষয় সুলতান মামুদও চিন্তা না কোচ্ছেন, তা নয়।

রাজপুত্র মনে মনে স্থির কোরেছিলেন, শাজাহানের মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসন গ্রহণ কোরবেন, তবে আরজজেবের দশাটা কি হবে, সে বিষয়ে তিনি কি বিবেচনা কোরেছিলেন? সুলতান মামুদ কি মনে কোরেছেন, আরজজেব পদচ্যুত হোয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? না, কখনই না, সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাকবার লোক নয়, যত দিন অপদে থাকবেন, তত দিন কখনই নিশ্চিন্ত থাকবেন না। সুলতান মামুদ কিন্তু মনে মনে নকসা এঁকে স্থির কোরে রেখেছেন, আরজজেবকে যদি প্রাণে নষ্টও না করেন, কারাগারে যে বন্দী কোরে রাখবেন, তার আর সন্দেহ নাই। আমি যে একটা ঘোর শঙ্কটাপন্ন ঘোর সংশয়াপন্ন হুঃসাহসে আক্রান্ত হোতে যাচ্ছি, সেটা আমি বেশ বুঝতে পেরে-ছিলেম, কিন্তু হোলে কি হয়, আরজজেবের আচরণ স্মরণ কোরে আমার হৃদয় দক্ক হোচ্ছিল, তাই মনে মনে অহঙ্কার কোত্তে লাগলেম, আমি যে কত বড় উপযুক্ত লোক, এইবার তাঁকে জানিয়ে দেবো, আমাদের না কোরে তিনি যদি আমার সমাদর কোভেন, তাঁর যে ভ্রাতা কত বড় উপকার হোতো,

তাই একবার জ্ঞান দিয়ে দেবো। আরজ্জের কেন আমার অনাদর কোলেন, সেই কথা স্বরণ কোরে উদ্বেগে যতই অস্থির হোতে লাগলেম, ততই তাঁর আচরণগুলি মনে উদয় হোয়ে তাঁর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগলো। অধিকদিনের কথা নয়, সে দিনমাত্র আমি তাঁর জীবন রক্ষা কোরে দিইছি, সে দিনমাত্র আমি তাঁকে জয়ী কোরে দিইছি, তথাচ তিনি কেন আমার ঔদাস্য কোলেন? যারা আমার মত তত উপযুক্ত নয়, তারা আমার উপর পদে নিযুক্ত হলো, এ অবিচার আরজ্জের কেন কোলেন? সুলতান মায়ুদ কি এইরূপ ব্যবহার কোতে পরামর্শ দিয়েছেন? তাঁর অনুরোধের আমার নিযুক্ত কোরবেন বোলে রাজপুত্র স্বয়ং এ পরামর্শ দিলেও দিতে পারেন, তাও যদি না হয়, আরজ্জেরের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মাজুম আমার প্রতি সন্দেহ কোরে কুপরামর্শ দিয়ে থাকবেন, যাতেই যা হোক, ফলে আরজ্জেরের শরীরে যদি কণিকামাত্র কৃতজ্ঞতারস থাকিত, তবে এ সকল পরামর্শদাতার কথায় কদাচ কণপাত কোন্তেন না। সাত পাঁচ চিন্তা কোরে শেষে এই স্থির কোলেম, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের সময় বিখণ্ড বন্ধুদিগের গুণ গৌরবগুলি বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করা নিতান্ত উচিত, তাতে অধর্ম নাই, বিশেষতঃ তত খুন, তত হত্যা, তত শোণিতপাত কোরে যে ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার কোরেছে, সে ব্যক্তিকে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত বিধিমতে যত্ন, সাধ্যমতে চেষ্টা করা অতি কর্তব্য। একে তো হত্যাদর হতমান হোয়ে মর্যাদাসিক বেদনার ছটকট কোছি, তার উপর আবার দরিদ্রতার বিকট দংশনে আন্তরিক কষ্ট পেয়ে পিতৃবিরোধী পুত্রের দলে নিবিষ্ট হোলেম, মনে মনে স্থির কল্লেম, এ দুঃসাহসে লিপ্ত থেকে যাতে জয়লাভ হয়, প্রাণপণে তারই চেষ্টা কোরবো, শেষ রক্তক্ষোঁটাটুকু পর্যন্ত আহুতি দিয়ে যদি শরীর পতন কোতে হয়, তাও কোরবো। সলিমানকে বোল্লেম,

“আমি রাজপুতানার রাজন্বরেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোতে যাবো, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, লুচারেরও ইচ্ছা, আমার সঙ্গে যায়, কিন্তু আমি তারে সঙ্গে নিলেম না, তাই তার মনে অতিশয় কষ্ট হোলো, সে ব্যক্তি নৈরাশ হোয়ে কতই দুঃখ জানাতে লাগলো। লুচারকে সঙ্গে না নেবার তাৎপর্য্য এই, যে গুপ্তরাজপ্রসাদ আমার উপর সমর্পণ করা হয়েছে, সে বিষয় যতই অপ্রকাশ থাকে, ততই ভাল। লুচার বোলে, “আবার যেন মাহিরেরদের চক্রে ঘোড়িয়ে যাবেন না, এবার যেন খুব সাবধানে থাকা হয়।” আমি বোল্লেম, “এবার আর সে ভয় নাই, আমরা সে পথ দিয়ে যাবো না।” লুচার বোলে, “একটা কথা বোলতে ভুলেছি, কাল দৈবাৎ মায়ের সঙ্গে দেখাটা ঘটে গেল।” আমি বোল্লেম, “ভালই তো, সে তোমার কি বোল্লো?”

“না জজুর, বগাবলি কিছুই নাই, আজ কাল সে বড় কোসে গিয়েছে, তার ঠোঁট দুটি যুড়েই আছে, কখন খুলে দেতে দেখলেম না।” আমি বোল্লেম, “তবে সে তোমার উপর রেগে আছে।”

লুচার বোলে, “সেটা সম্ভব বটে, সে কথা আর নূতন কি, সে তো চিরকালই রেগে আছে, দশধান মোহর এখনও তার মনে লেগে আছে, আর জন্তে সে আমার কখনই ক্ষমা কোরবে না।”

আমি বোল্লেম, “তোমার মা! কোথায় থাকে? কোথায় সে চাকরি করে?”

লুচার বোলে, “দোহাই আল্লাহ! এই বারে আমার ভারি কেসাতে ফেলেন, আমি মায়ের সঙ্গে এগলি সেগলি ঘুরে ঘুরে বেড়া-লেম, কিন্তু সে যেখানে থাকে, সেদিকে সে মোত্তেও গেল না।”

আমার আর সময় নাই যে, বোসে বোসে পরামর্শগকের স্তাকামোর কথা শুনি, সলিমানকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেবিরে পোড়-লেম। যেমন আপত্তাপ বাগিছা ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, সেই সময় কঠোর দর্শন

অথচ মর্যাদাবান্ একটি পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সে ব্যক্তি একটি কুম্ভধূসর ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে আছে, একখানি মস্ত ল্যাক্স তলওয়ার তাঁর পাশে ঝুলছে, তলওয়ারখানির উভয় প্রান্তে সুতীক্ষ্ণ, কোমরে দুখানি ছোরা, ব্যাঘ্রচর্মকোষে আচ্ছাদিত, উৎকৃষ্ট লৌহকুর্ভি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত, তাঁর উপর মলমলের অর্জরাশা, মুখেতে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, নিবিড় জলনের স্রাব দাড়ি, দেখে বোধ হলো, ঐ দাড়িটি গভীর মর্মাক্ত আচ্ছাদিত কোরে রেখেছে, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর, মাথায় একটা বৃহৎ সবুজ পানড়ি, পায় পায়জামা, পূর্বে সাদা ছিল, এক্ষণে কাদামাটি লেগে মলিন হয়েছে, বোধ হয়, তাতে রক্তের দাগও লেগেছিল। এই দীর্ঘাকার পুরুষটি আমার সম্মুখে এসে “এন-সাক্,” এই সাক্ষেতিক বাক্যটি বোলেন। আমি তখন বোলেম, “তবে অগ্রগামী ইউন।” সলিমান দেখে শুনে বিবর্ণ হোয়ে গেল, সে মনে কোলে, এ পুরুষটি মল্লযুদ্ধের আহ্বান কোত্তে এসেছে, শেষে যখন দেখলে, আমরা নিরুদ্বেগে পথ বেয়ে চোলেছি, আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নাই, তখন প্রফুল্লিত হোয়ে সেরিমিয়ার টপ্পা গাইতে লাগলো, তৎকালীন আগরা সহরে ঐ টপ্পার বড় গোরব। সলিমানে প্রফুল্লচিত দেখে আমার মনে মনে হিংসা হোতে লাগলো, তার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলিয়ে দেখলেম, সে আমার চেয়ে অনেক সুখী, যতক্ষণ তাঁর উদরটি শান্ত থাকে, ততক্ষণ তার মনে কোন তাপপাপ থাকে না, ততক্ষণ সে কিছুতেই বিরক্ত হয় না। আমি আমার মাথা লয়েই ব্যতিবাস্ত, মাথাটা বাঁচাবার নিমিত্ত কতই চিন্তা কোচ্ছিলেম, কবে যে ছিন্ন হবে, তার ঠিকানা ছিল না, এমন স্থান নাই যে, সেই স্থানে মাথাটা রেখে নির্ভাবনা হই। খনগড়-গঞ্জ নামক পর্বত-কন্দরে পৌচবায় পূর্বে আমার সহচরের মুখে একটি কথাও শুনে পাই নাই, পথগুলি ছোট ছোট কোণে, আর ভুললে পরিপূর্ণ, তাই আরও মনে

মনে আকোপ কোত্তে লাগলেম, এমন বাগ্-দরিত্র কান্তির সঙ্গে কেন এলেম, সহপাঠিকের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোধ হোতে লাগলো, এ ব্যক্তি অতি মন্দ প্রকৃতির লোক। পর্বত-তলে পৌছ ঘোড়া থেকে নেবে পোড়লেম, নেবে পোড়ে শুলতান মাঝুদের নির্দিষ্ট পর্বতগুহার ভিতর প্রবেশ কোলেম, কন্দরের প্রবেশমুখটি অতি বৃহৎ, দেখে বোধ হলো যেন, আকাশ পাঁতাল ই। কোরে প্রাস কোত্তে আসছে। আমার সহচর সেই বিস্তৃতমুখ কন্দরের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে চোলে গেলেন, আমারও ইশারা কোরে ঘোড়া শুদ্ধ তার মধ্যে যেতে বোলেন। সলিমান আর আমি দেখে শুনে চমৎকৃত হোয়ে গেলেম, ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখি, বৃহৎ ময়দানের মতন চারিদিকে দ্ব্যাজস্থান পোড়ে রোয়েছে, সে স্থানটি কেবল অশ্বতে পরিপূর্ণ, অশ্বগুলির পা রশী দিয়ে বাঁধা, ঘাস খেতে খেতে এক একবার মাথা উচু কোরে চেয়ে দেখছিল, তিনটি নতুন ঘোড়া এসেছে, তাই যেন স্বাগত বোলে তাদের আহ্বান কোচ্ছিল, তাদের দেখে মিত্রবৎ হ্রস্বস্বর কোরে আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগলো। এস্থলে বিস্তৃত লোক উপস্থিত দেখলেম, তাদের মধ্যে অনেকেই আরবজাতীয়, সকলেই ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত, কেউ গা মোলছে, কেউ পা ধুয়ে দিচ্ছে, কেউ জিনপোষ, কেউ লাগাম, কেউ কজাই মেরামত কোচ্ছে, কেউ বা বোসে আছে, তাদের দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেম, এই সকল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রাণীদের সঙ্গে আমার বাস কোত্তে হবে, কিন্তু সেটি আমার ভুল। আমার পথপ্রদর্শক ইশারা করার আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোলেম। এই আন্তাবোলের দক্ষিণ পাশে আর একটি কন্দর আছে, তার সম্মুখে নিরেট ছিলেন গাঁধুনির একটি ছোট দরজা, আমরা তাঁর ভিতরে প্রবেশ কোত্তে গেলেম না, ঐ দরজা আমাদের পথ অবরোধ কোলে। ঐ ছোট দরজার গায় পাররাধোপের মত একটি ক্ষুদ্র কাটা দরজা ছিল, ঐ কাটা দরজার বগলে একহাত



লম্বা লোহার গরাদে দেখা যাচ্ছিল। আমার সহপাঠিক সেই ছোট দরজার উপর স্পষ্ট স্পষ্ট চারিবার সবলে আঘাত কোলেন, কাটা দরজাটি খুলে গেল, তার পর ভিতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে সেই গরাদের উপর মুখ রেখে, সাক্ষাতিক বাক্য “এন্সাক” উচ্চারণ কোলেন, তার পরেই দরজাটি আঙুলে আঙুলে খুলে নিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ কোলেম, সলিমানকে বাহিরে একটি স্থান দেখিয়ে দেওয়া হলো, সে সেইখানে আমার বোড়ার হেফাজত কোন্তে লাগলো। যে কন্দরে প্রবেশ কোলেম, সেটি যুদ্ধার রাখবার স্থান (শিলাখানা), উপরে পাহাড়, ঐ পাহাড়ের ছিদ্র দিয়ে তার মধ্যে আলো প্রবেশ কোন্তো। এখানে যে সকল লোককে দেখলেম, তারা আস্তাবালের লোক অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক ভদ্র। একটি লোক আনায় সেলাম কোরে কুশল জিজ্ঞাসা কোন্তে লাগলো, তার কণ্ঠস্বর আমার বেশ স্মরণ ছিল, আমি মনে কোরেছিলেম, সে কণ্ঠস্বর জন্মের মতন নীরব হয়ে গিয়েছে। এ ব্যক্তি কলমবেগ, নজফালী খাঁর কারুপদ্মদাজ, তাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, আমি যে তাকে চিন্তে পেরেছি, তাই জানতে পেরে সে ব্যক্তি অপ্রতিভের মত হয়ে লজ্জিত লজ্জিত হোতে লাগলো। তাকে জিজ্ঞাসা কোলেম, “কে” ও! কলমবেগ? তুমি না কলমবেগ?” “হাঁ, আমি কলমবেগই বটে, সেই বুদ্ধার নষ্টামী চক্রে পোড়ে প্রাণে মারা পোড়েছিলেম আর কি, নজফালী খাঁও আমার প্রতি সন্দেহ কোরেছিলেন। আল্লা রিচায় কোবুবেন, আমি তাঁকে অত্যাঁপি বিশ্বত হই নাই; আবার যদি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা,—”

আমি বোল্লেম, “থাক্ থাক্, আর দেখা কোন্তে হবে না, তিনি জীবিত নাই, কবরে না গেলে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।”

“কি বোল্ছেন আপনি? নজফালী খাঁ মোরেছেন? তিনি বেঁচে নাই?”

আর একটি স্রব্ধ আমি বোলে উঠলো,

“কি! সে কালনিষ্টুরের মৃত্যু হয়েছে? কিসে মোলো? লড়াই কোরে?” এটি রক্তমের কণ্ঠস্বর।

আমি বোল্লেম, “না, লড়াই কোরে মরেনি, মাহিরেদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় তারা একটি তাঁর মারে, সেই তাঁর তার বক্ষঃস্থল ভেদ করে।”

‘কলমবেগ’ বোল্লে, “তবে তার শৃগাল-কুকুরের মত মৃত্যু হয়েছে। ভালই হয়েছে, ঐরূপ পাপমৃত্যু তার হওয়াই উচিত ছিল। মাহিরেদের মধ্যে সে কি কোরে প্রবেশ কোলে?”

মাহিরেদের সঙ্গে নজফালী খাঁর যেক্রমে সাক্ষাৎ হয়, সে বৃত্তান্ত অবগত করালেম, তারা শুনে শিউরিয়া উঠে বোল্লে, “এইটিই তার অদৃষ্টে লেখা ছিল।”

দ্বিতম বোল্লে, “আপনি যে বোল্লেন, একজন নাচওয়ালা চক্রে কোরে আপনার লোকের হাত থেকে নজফালীকে ছিনিয়ে লয়ে যায়, সে প্রীলোকটি কে? কেন সে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? তার দরকার কি ছিল?”

এই সময় কর্কশদর্শন সহচর বোল্লেন, “আর কালতো কথা নিয়ে সময় নষ্ট কোন্তে কি হবে? এসো, এখন কাজে যাওয়া যাক।” এই কথা বোল্লেই অস্তুরের মত বজ্রতেজে আমার একখানা হাত চেপে ধোরে, একটি নির্জ্জন কোণে টেনে নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে বোল্লেন, “ও সকল লোকে ও সকল কথায় উত্তর দিতে নেই, তাদের সকল সন্ধান বোল্তে নেই, তুমি খুব সাবধান হয়ে চোল্বে। নূরমহল কিংবা যাকে আমরা জীবা বলি, তার নাম এদের কাছে কোরো না, তার সদক্ষে কোন কথা এদের কাছে বোলো না, নূরমহলের বিষয় এরা কিছুই জানে না। আমি শুনেছি নূরমহলের কথা-ক্রমে নজফালী খাঁ এদের কয়েদ করেন, এক্ষণে যদি তারা জানতে পারে, জীবা সেই নূরমহল, তা হোলে আমাদের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা, তখন এরা আমাদের কাজকথা একপাশে কেলে রেখে, নূরমহল কিসে জব্দ

হবে তারই চেষ্টা কোরবে, তাতেই তারা মত্ত হবে, নূরমহলও জানে না এ, সকল লোক এ পর্যন্ত বেঁচে আছে, এরা যে আমাদের কর্ষে ব্রতী হয়েছে, নূরমহল তাও জানে না, তাই তোমার চূপ কোরে থাকাই ভাল। আমি এই ইঙ্গিত পেয়ে অতিশয় বাধিত, অতিশয় আপ্যায়িত হোলেন, শুনুলেম, আমার সহচরের নাম বকারালী, সকলে কিন্তু বীর-কেশরী বোলে ডেকে থাকে। মুক্তিকা-উদর-স্থিত এই কন্দরে কিছু দিন বাস কোরে এখানকার স্বভাবতঃ অশ্লষ্ট আলো আমার অভ্যাসগত হলো, অনেক পরিচিত লোকের মুখ দেখতে পেয়ে তাদের চিন্তে পাল্লেন, আগে মনে করেছিলেম, তারা বহুকাল মানব-লীলাসংবরণ করেছে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকগুলি রজপুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, দারা কর্তৃক তারা গায়ালিয়রে বন্দী হোয়ে থাকে, সেখানে প্রাণহন্তা পোস্ত সরবতের প্রভাবে ক্রমে শীর্ণ হয়ে, ক্রমে জীর্ণ হয়ে কাল-গ্রাসে তত হোতে হয়, তাই দারাও স্থির কোর গেলেন, আমিও স্থির কোরেছিলেম, তারা অকালে মৃত্যুমুখে অবসান হয়েছে। দারার উপরামর্শমতে শাজাহানও কতকগুলি লোককে কয়েদ করেন, তন্মিত্ত আরঙ্গজেবও অনেকগুলি লোককে কারারুদ্ধ করেন, আজ সেই সকল লোককে পাতালপুরে বাস কোত্তে দেখলেম, আরঙ্গজেবের কয়েদীরা প্রতিফল দেবার নিমিত্ত ক্রোধে কালাগ্নির জ্বালায় হয়েচে, কতদিনে দাদু তুলবে, কতদিনে আড়ি সাধবে, তাই বাগ্র হয়ে বেড়াচ্ছে, যারা রাগদেব-হিংসায় উগ্রমূর্তি হয়ে মুখে আক্রোশ প্রকাশ কোচ্ছিলেন, অপহৃত বীরম সিংহের দুটি লুপ্ত সেই দলে দলভুক্ত ছিল। তারা পিতার মৃত্যুতে শোকারুল হয়ে দিবারাত্র বিলাপ কোতো, মুখে সর্বদা বোলতো, “আরঙ্গজেব কি পাপিষ্ঠ, পিতাকে প্রাণে নষ্ট কোরে কি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ কোরেছে, রাজকুমার চণ্ডালের মত, মুচির মত, হাড়ির মত ব্যবহার কোরেছে।” কীহন খাঁ রাজপুত্র দুদারাকে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোরে-

ছিল বোলেই তাঁর তত শ্রীকির পথ পরিষ্কার হয়ে পোড়েছে, তবে সে ব্যক্তিকে তাঁর সৌভাগ্যের মূল্যায়ন বোলতে হবে। ঐ কালমূর্তি যুবা রজপুতের হৃদয়ে প্রতিহিংসা-অনল ছরন্তবেগে প্রজ্জলিত হোচ্ছিল, দেখে বোধ হলো, তাদের ক্ষমতা থাকুলে আরঙ্গজেবকে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোতো। এই সকল লোক নিয়ে তিন হাজার রজপুত আমাদের পক্ষ হয়, মুখ দিয়ে এক কথা বেকলেই তখন তারা রণমত্ত হোয়ে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হয়।

গোয়ালিয়রের জেলখানার মধ্যে যে সকল লোক মরেছে বোলে জ্ঞান ছিল, শুনতে পেলেম, তারা যুগ্ম দিয়ে মুক্তিলাভ করে। বকারালী, যার পনাম সেসময়ে, ঐ জেলখানার অধ্যক্ষ ছিলেন, লাভের অন্তরোধেই হোক, কিংবা দারা কোরেই হোক, তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তিদান দিয়ে দারা ও শাজাহান উভয়কেই প্রতারিত করেন, রীতিমত তাঁদের আজ্ঞাপালন হোচ্ছিল কি না, সে বিষয় তারা স্বপ্নেও জানতেন না। বকারাল বোলেন, “একদা আমরা গুণ্টিতে পাঁচ-হাজার প্রাণীও হবো না, আরঙ্গজেব ইঙ্গিতে ত্রিশ হাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পারেন, ঐ ত্রিশ হাজারের সঙ্গে আমাদের একমুষ্টি লোক নিয়ে সমকক্ষতা করা উচিত হয় না। আমরা এখানে যে পঁচিশজন সরদার উপস্থিত আছি, ঐ পঁচিশজন চারিদিকে ছোড়িয়ে পোড়লে ভাল হয়, কি ব্যক্তিকে একটি সময় বেঁধে যেতে হয়, ঠিক সেই সময়ে পঁচিশত লোক সঙ্গে নিয়ে তাঁকে এখানে ফিরে আসতে হবে, পঁচিশতের অতিরিক্ত হোলে আরও ভাল হয়। রাজপুত্র হাজার যে লক্ষ্য-দল ছড়িভঙ্গ হোয়ে পোড়েছে, আমি তাদের একত্র কোরে হাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পারবো, তন্মিত্ত আরঙ্গজেবের লক্ষ্যের মধ্যে অসংখ্য জন্মিয়ে তাদের মনভঙ্গ কোরে দেবো, তাতেও তিনহাজার লোক হস্তগত হবার উপায় হবে। সাদক! তুমিও একজন বীর-পুরুষ, তোমাকেও চারিদিকে চেষ্টা কোরে লোক সংগ্রহ কোত্তে হবে। আমি তো

বুকেতে পাচ্ছি, আমাদের বীরবিক্রান্ত রাজ-  
পুত্রের মন প্রকৃতি কোত্তে পারবে, তিনি  
দীর দুর্ভাগ্য রূপ পিতামহকে উদ্ধার কব-  
ার নিমিত্ত শশবাস্ত হোয়ে বেড়াচ্ছেন।  
তোতে তাঁ' মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, সেটি আমা-  
দের করা উচিত।" ঐ কথা শুনে আমরা  
অমনি বোলে উঠলেম, "সম্রাট দীর্ঘজীবী  
হউন, শাহজাহান দীর্ঘজীবী হউন।" তার পরেই  
প্রতিজ্ঞা কোল্লেম, তাঁর জন্তে আমাদের প্রাণ  
পর্যন্ত পণ।

কিসে আমাদের জয়লাভ হবে, আমরা  
যখন সেই সকল কৌশল চিন্তা কোচ্ছিলেম,  
সেই সময় আতাবালের মধ্যে হঠাৎ একটা  
শোলমাল শোনা গেল, বোধ হোলো, বাহিরে  
যেন একটা আকস্মিক বেধে উঠেছে, তখন  
তার মধ্য কিছুই বুঝতে পারলুম না, কিন্তু  
মনে বড় ভ্রাস হলো, সকলেই তলওয়ার খলে  
সাড়িয়েছে, যেন কোরেছে, শত্রুপক্ষেরা আমা-  
দের কেল্লা উড়িয়ে দিতে এসেছে। সের-  
সাহেব মরদানা গলায় হেঁকে হেঁকে বোলতে  
লাগলেন, "আমার বীরপুত্র সকল! ভয়  
কি! সাহসের উপর নির্ভর কর! যে ব্যক্তি  
এর মধ্যে মাথা গলাবে, সে জাহান্নামে যাবে।"  
কলে তিনি তখন যমের দোসরের ছায়  
ভীষণ কালমূর্তি ধারণ কোরে দরজার সম্মুখে  
এসে দাঁড়ালেন, তাঁর দুমুখো তলওয়ারখানি  
জুহাত দিয়ে কোসে ধোরে, কাঁধের উপর  
রেখে প্রস্তুত হোয়ে রইলেন, যে কেহ দুঃসা-  
হস কোরে দরজার ভিতর মাথা দেবে, তাকে  
ভৎসনাৎ সংহার কোরবেন। কিন্তু তত ডামা-  
ডৌলের পর তোপ মুরচার ঘনগভীর ধ্বনির  
পরিবর্তে চারটি মাত্র কোমল আখাত শুনতে  
পেলেম, আমরা পাশকাটা দরজাটি টেনে  
খুলে ফেল্লেম, একটি লোক লোহার গরাদের  
কাছে "এন্সাক, এন্সাক" কোরে উঠলো,  
ঐ ইঙ্গিত-বাক্য শুনতে পেয়ে আমরা নির্ভর  
হোলেম, দরজাটি খুলে দেওয়া গেল, একজন  
মাহির সর্দার ক্ষতবিক্ষত হোয়ে কন্দরে  
প্রবেশ কোলে, প্রবেশ কোরেই মৃতবৎ অব-  
সন্ন হোয়ে ভূতলশায়ী হলো, বাইরে কিছু

পূর্বের মতই মহাগোলমাল মহাধুমধাম  
চোলেছে, জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, আজ-  
বেক, কাবুল, গিজনি প্রভৃতি দেশ-সংক্রান্ত  
কতকগুলি রাজপ্রতিনিধি আগরা থেকে  
অহুমার লুটের মাল নিয়ে স্বদেশে চোলে  
যাচ্ছিলেন, আমাদের একান্ত অহুগত অগত  
আমাদের অহুসেবার নিষুক একদল মাহির  
রাহাজানী কোরে তাঁদের সর্দার কেড়ে  
নিয়েছে, কাড়াকাড়ির সময় ভয়ঙ্কর কাটা-  
কাটি মারামারি হোয়ে গিয়েছে, সকলকেই  
ক্ষতবিক্ষত হোতে হয়েছিল, যার শরীরে  
অস্বাভাবের বিকট নিদর্শন দেখতে পাওয়া  
না, এমন লোকই ছিল না। অপজত সম্পত্তি-  
গুলি তৎক্ষণাৎ কন্দরের ভিতরে এনে রাখা  
হলো, ক্ষতগ্রস্ত মাহিরদের সেবা-শুদ্ধি  
চোলে লাগলো, সেরসাহেব বোল্লেন, "এই  
তো চাই, সবদিক ভালরূপই চোলেছে।  
আজ্ঞা! দেখ যেন বীররত্ন মাহিরদের প্রতি  
বেশ মেহ যত্ন টুকরা হয়, আরবীয় হাকিম  
বেনহামেত যেন তাঁদের চিকিৎসা করেন,  
হাকিম যেন মন দিয়ে দেখেন শুনেন, যখন  
আরোগ্য হোয়ে উঠবে, তখন তাঁদের পেট  
ভোরে মদখেতে দিও, তাতে যেন ক্রটি না  
হয়, মদ তাঁদের যত প্রিয়, পৃথিবীর অত  
কোন বস্তুই তত প্রিয় নয়, এসো এখন গাটি-  
গুলি খুলি, এরা লুট কোরে কি নিয়ে এসেছে,  
দেখাই যাক," আমরা খুলে দেখি গাটগুলি  
বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্যো ঠাসা বোয়েছে,—ধীরা,  
মুক্তা, চুনি, পান্না, সাল, রুমাল, রেশম, মোহর,  
সোনা, রূপো, স্তম্ভে স্থপাকার কোরে কোল্লেম  
সেরসাহেব বোল্লেন, রত্নগুলি আগরায় কোন  
ক্রমেই পাঠান হবে না। আমল থা! আমি  
জানি, কোন্ জিনিসের কি দর, তা তুমি বেশ  
অবগত আছ, তুমি এ রত্নগুলি দিল্লীতে নিয়ে  
বিক্রী কর, দেখো, বেশ শুমরে, বেশ দরে,  
বিক্রী কোত্তে চাও, এগুলি বিক্রী কোরে যে  
টাকা পাবে, ঐ টাকায় মোহর পেঁথে নিয়ে  
এসো। সাদিক! সালরুমাল আর রেশমের বস্ত্র  
গুলি তোমার জিয়ে থাক, তুমি ঐগুলি সঙ্গে  
কোরে নিয়ে যেও, রাজাদের উপহার দেবে,

তাদের কাছে যে সাল কামাল পুরস্কার পাবে, সেগুলি যত লাভে পারো, বিক্রী কোরে নগদ টাকা নিয়ে এসো। বেলা দুই প্রহর হয়েছে, আর এখানে থাকা নয়, এখন একটু আরাম করা যাক, অবকাশ পেলেই একটু শূহ হরে শরীরের বল কোরে নিতে হয়, মচেন মেজাজ ভাল থাকে না।” আরাম কোরবো কি, এদিকে ক্ষতগ্রস্ত মাহিরেরা চীৎকার কোচ্ছে, তাদের সেবা-শুশ্রূষা না কোলে নয়। হাকিম বেনুহামেত এখানে পৌঁছলে এক ঘণ্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়, স্মরণে তাঁর দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়ে উঠলো না। হাকিমের পারিষদেরা এই বিষাদাবহ ঘটনা উপলক্ষে বাড়ীতে ডাকাত পড়বার ভয় চীৎকারশব্দে হাহাকার কোতে লাগলেন, তাঁদের সক্রিয় বিলাপধ্বনি শ্রবণ কোরে মরামাহুয পর্য্যন্ত জাগ্রত হয়ে উঠে। পারিষদেরা বোলে, “হাকিমের কবর না হোলে তারা অন্ন-জল গ্রহণ কোরবে না।” বকারালী তাদের সাঙনা করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন কোতে লাগলেন, তাঁর মনে ভয় হোলো, কি জানি, যদি দৈবাৎ কোন পথিক এই রাস্তা দিয়ে চোলে যায়, সে ব্যক্তি ঐ রোদনধ্বনি শুনে আমাদের সন্ধান জানুতে পারবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হাকিমের কবর না হয়েছিল, সে পর্য্যন্ত তারা শৃগাল-কুকুরের মতন কেবল হাউ হাউ কোরে দুঃখের কান্না কাঁদতে লাগলো! অবশেষে হাকিমের কবর দেওয়া হোলো, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু মাটির উপর শুয়ে পোড়লো, সকলেই অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হোলো। আমার পক্ষে কিন্তু তা নয়, আমার অনেক চিন্তা ছিল, মনে স্মৃতি ছিল না, তাই আমার ঘুম হলো না, নিশ্চয়ই হয়ে অমনি পোড়ে ছিলেম, অথচ লোকে বোধ কোলে, যেন কতই ঘুমুছি। একটু পরে কে যেন খট-খট-মচ্-মচ্ কোচ্ছে শুনে পেলেম, কেউ যেন কিছু নাড়ছে, কি সরিয়ে রাখছে, এইরূপ জ্ঞান হোলো। চোক মেলিয়ে চেয়ে দেখি, যা ভেবোছিলেম, তাই বটে, আমার ভ্রম নয়, রক্তম উঠে তাঁর নিকটে যারা যারা

শুয়েছিল, তারা ঘুমুচ্ছে কি না, তাই ঠাউরে, ঠাউরে একবার নিরীক্ষণ কোরে দেখলে, তখন কিন্তু সকলেই অকাতরে নিজা যাচ্ছিল, তাই নিরীক্ষণ মনে কোরে নিঃসাড়ে মালখানার গিয়ে একটি গাঁটরি খুল্লিলো। আমি ভাবলেম, এখন সাড়া দিয়ে গোলমাল কোরবো না, সে কিছু আশ্বাস্য করে কি না, আগে দেখি, তা যদি হয়, তখন তাড়া দেওয়া যাবে। রক্তম যে তত হাট-চোর ছিল, আমি তা পূর্বে জানুতম না। আমার অপেক্ষাও আর একটি সতর্ক চক্ষু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রক্তমের চরিত্রের প্রতি চেয়ে দেখছিল, হতভাগা রক্তম যেমন একটি গাঁটরি খুলেছে, সেরসাহেব অমনি ষড়মড়িয়ে উঠেই তার মাথাটা টুক কোরে কেটে ফেলে দিলেন। তখন একটা গোলমাল হোয়ে উঠলো, সেই গোলমালে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারা মনে কোলে, শত্রু এসে প্রবেশ কোরেছে, বিশেষতঃ বকারালীর উগ্র করাল মূর্তি দেখে তাদের যেন ধাঁধা লেগে গেল, সেরসাহেব তখন তলওয়ারখানি খুলে কালের স্বরূপ দাড়িয়ে আছেন, সর্কাজ দিয়ে রক্ত বেয়ে পোড়ছে, হতভাগা রক্তমের নশ্বকটি উঁচু কোরে ধোরে টেঁচিয়ে বোলতে লাগলেন, “তোমরা নেমকহারাম, বিশ্বাসঘাতকী চোরের শাস্তি দেখ।” কার মাথা কাটা গেল, কে কার মাথা কাটলে, এ সন্ধান হঠাৎ কেউই নির্ণয় কোরে উঠতে পাচ্ছিল না, যে জঙ্গে যা হয়েছে, সে মর্মান্বস্ত অনেকক্ষণের পর সকলে অবগত হোলো, অবগত হয়ে একটি প্রাণীও সেরসাহেবের প্রতি সম্মুখ হোলো না। এক ব্যক্তির প্রাণবধ কোতে পারেন, তত ক্ষমতা তাঁর ছিল কি না, বোলতে পারি না, তিনি কিন্তু মনে মনে গর্ভ কোন্তেন, তাঁর তত ক্ষমতাই ছিল। বকারালীর চেহারাতে কেমন একটি দ্রুত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাব ছিল, সে ভাবটি মুখে ব্যক্ত করা যায় না, তাঁকে দেখলে ভয় হতো, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেও ভয় হতো, ঘর-গুরু লোক অসম্মুখ হয়ে গজর গজর কোতে

গাগলো, কিন্তু এ কাজটি যে ভাল হয়নি, কি তারা যে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে, এ কথা কেউই সাহস কোরে তাঁর মুখের উপর বলতে পারেন না। যদি আপনারা বকারালীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, সে ব্যক্তি খতিরনদারদ, লোকে তাঁকে ভাল বোলে কি মন্দ বোলে, তাঁর তা খবরেই আসতো না, তিনি তা গ্রাহ্যই কোতেন না। বকারালী আপনার দেওয়ানকে ডেকে রস্তমকে দেখিয়ে দিয়ে বোলেন, “এই কুকুরটাকে নিয়ে কবর দাও।” দেওয়ান গোলমাল না কোরে, নিঃসাড় নিস্তক্ষে রস্তমের সংকার্কার্য সম্পন্ন কোলেন, সেরসাহেব একপেশির শাস্ত হয়ে আপনার শয্যায় চোলে গেলেন, আমার ঠিক অনুমান হোচ্ছে, তিনি গিয়ে শয়ন কোলেন, আপাততঃ নিশ্চিন্ত হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুসলেন। একপে রাত্র, সেরসাহেব উঠে আমাদের আশ্রয়ের উদ্যোগ কোন্তে লাগলেন, কলমবেগ আমাকে একদিকে ডেকে নিয়ে বোলতে লাগলেন, “দেখেছো ভাই, কেমন অবিচার! রস্তম আমার পরম বন্ধু, তাঁকে হুক না হুক খুন কোরে ফেলে, এত অত্যাচার কি সহ্য কোরে থাকি যায়!” আমি বোলেম, “ওটা হঠাৎ হয়ে পোড়েছে, একপ নিষ্ঠুর প্রতিকল দেবার পূর্বে বকারালীর উচিত ছিল, আমাদের জিজ্ঞাসা করেন।” কলমবেগ বোলে, “একটা কিছু প্রতীকার করা বড় আবশ্যক হয়েছে, আমার বন্ধুকে যে শাল-কুকুরের মত জবাই কোরবে, অথচ তার কোন প্রতীকার হবে না, আমি তা সহ্য কোন্তে পারবো না।” আমি কলমবেগকে শাস্ত করবার নিমিত্ত, তাঁকে ক্রান্ত করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন কোলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হলো না, বিস্তর প্রবোধ-বাক্য বোলে অনেক বোঝালেম, সে কিন্তু তাতে কর্পান্তও কোলে না। একটা রহৎ ডেকে কোরে এক ডেক প্লোয়া মধ্যস্থলে রাখা হয়েছে, কলমবেগ ভিন্ন সকলেই আহার কোন্তে বোসেছে, সেরসাহেব কলমবেগকে একটি স্থান দেখিয়ে

দিয়ে সেই স্থানে বোসে আহার কোন্তে বোলেন।

কলমবেগ বোলে, “না, আমি আহার কোরবো না, তোমার মত নিষ্ঠুর তরাহার সঙ্গে বোসে আমার যেন আহার কোন্তে না হয়, আল্লা যেন না করেন, তোমার মত চণ্ডলের, তোমার মত পায়ণ্ডের-মুখ দর্শন কোন্তে হয়!” ঐ কথা শুনে বকারালী গর্জিয়ে বোলেন, “পাপিষ্ঠ! তোর মুখে এত বড় কথা! তোর এত বড় দেমাক! রস্তমের মৃত্যু কি তোর গলায় আটকিয়ে গিয়েছে নাকি?”

কলমবেগ বোলে, “হাঁ! তা নয় ত কি! তার মৃত্যু আমার গলায় বেধে বোয়েছে, প্রতিকল দেবার নিমিত্ত চীৎকার কোরে ডাকছে, বকারালী! তুমি তোমার বোলছি, আজ রবিদেব অন্তগত না হোতে, আর একটি ব্যক্তিকে রস্তমের পার্শ্বে শয়ন কোরে কালনিদ্রায় অভিভূত হোতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, যে নিঃসহায়, যার হাতে অস্ত্র নাই, যে দুর্বল, তুমি তারই ঘন, তুমি তাকেই বধ করবার নিমিত্ত তলওয়ার ধোজে শিখেছ, এইবার তোমার পরাক্রমের, এইবার তোমার বীর্যের প্রভাব বোঝা যাবে, যে আপনা বাঁচিয়ে চোলতে জানে, এবার তার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, তুমি কেমন অস্ত্র শিখেছ, এইবার তা জানা যাবে, একপে খেয়ে নাও, এই তোমার ভ্রমের শোধ খাওয়া, বোধ হয়, আর তোমার খেতে হবে না।”

ঐ কথা শুনে সেরসাহেব সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে কোণখয়ে গর্জিয়ে বোলেন, “তুই অতি অভাজন! তুই অতি অকৃতজ্ঞ, তুই অতি কাপুরুষ, এই আমি তলওয়ার ধুলে দাঁড়ালেম, তুই তোর ভগ্নশরীর রক্ষা কর।” ঐ কথা বোলেই বকারালী তাঁর দুমুখো ধারাল তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে বাগিয়ে ধোলেন, চোট বোসিয়ে যেন আর দ্বি, এমন সময় আমরা পোড়ে নিরস্ত কোলেন, তাঁরে বোলেন, “সমান সমান অস্ত্র

না হোলে বড় অবিচার হবে,তোমাদের যদি লড়াই কোত্তে একান্তই মন হয়ে থাকে, তবে বিরাট অসিখানি অবশ্যই ভাগ কোত্তে হবে, সেখানি ভাগ কোরে কলম্বেগের হাতে যেরূপ একখানি ছোট তলওয়ার আছে, এরূপ আর একখানা তলওয়ার নিয়ে লড়াই করা উচিত ।” বকারালী বোলেন, “আমি অত্যাচার কোরে আপনার সুগম সুবিধা চাই না, তোমাদের যেমন ইচ্ছা হয়, একখানি অস্ত্র এনে আমার হাতে দেও ।” আমরা তৎক্ষণাৎ কলম্বেগের তলওয়ারের মত একখানা তলওয়ার এনে তাঁর হাতে দিলেম, স্থান প্রস্তুত কোরে লওয়া হলো, উভয় যোদ্ধা উভয়ের প্রতি চক্ষু আরক্ত কোরে কালগ্রীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোত্তে লাগলেন, সেরসাহেব তলওয়ারখানি উঁচিয়ে আছেন, প্রহার করেন আর কি, কলম্বেগও আপনার তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে ধরেছে, এমন সময় কে এসে দরজার পাশ স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে চার বার আঘাত কোলে, সে শব্দ অতি কোমল হয়েও মল্ল-যোদ্ধাদের উর্কে উথিত কাল-অসির বেগ নিবারণ কোলে, কাটা দরজা সরিয়ে দেওয়া হলো, বার থেকে একটি স্বর “এনসাক, এনসাক,” এই কথা বোলে উঠলো, সেরসাহেব অধীর হোলেন, লড়াই করা হলো না বোলে দাঁত মুগ্ধ বিচুতে লাগলেন, বিড়-বিড় কোরে কত কি বকতে লাগলেন, কত দেক-সেকও হোতে লাগলেন, শেষে দরজা খুলে দিতে হুকুম দিয়ে দিলেন । যিনি প্রবেশ কোলেন, তাঁর মূর্তিখানি প্রথম দেখেই ভয় হলো, জ্ঞান হলো যে, কোন শত্রু এসে আমাদের বিরল-পুত্র প্রবেশ কোলে, যে মূর্তিকে প্রবেশ কোত্তে দেখলেম, একখানি কৃকসালে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল, তাই তাঁকে হঠাৎ চিন্তে পাল্লেন না । আমাদের কিন্তু অধিকক্ষণ অপরিচিতের জাহ্ন থাকতে হয় নি, তিনি বখন গায়ের আবরণটা পরিত্যাগ কোলেন, তাঁরে চিন্তে পেয়ে চোন্কে উঠলেন, ইলি বয়ং স্থলতান যাহুদ । অপ্রতীক দর্শককে

দেখেও যোদ্ধারা অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কোলেন, “তলওয়ার খুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে কেন ? এ আবার কোন্ ভাব, তুমি বকারালী, তোমার আমি শত্রু মিপাত কোত্তে পাঠিয়েছি, সুহৃদ্ব বন্ধু কোত্তে পাঠাইনি, আমি দেখছি, স্বজনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছো, তোমার এ চর্য কি কেন ?” বকারালী সব কথাই খুলে বোলেন, কলম্বেগ রাজপুত্রের স্বমুখে প্রতিজ্ঞা কোলে, সমুচিত শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না, রাজপুত্র নিষেধ কোলেন, তাঁর কথা কেউই শুনলেন না, তিনি বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষান্ত কোত্তে পাল্লেন না । উভয় যোদ্ধা উভয়ের রক্তপাতের নিমিত্ত কালতৃণায় ছটফট কোচ্ছিল, তারা যে এক্ষণে পরস্পর মিত্র হয়ে একজনের পক্ষ অবলম্বন কোববে, সে অনেক দূরের কথা, সধ্যাতা হবার তো কথাই নয়, বরং প্রতিজ্ঞা কোলে, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু না হোলে ক্ষান্ত হবে না । তারা যে আর এ সংসারে একত্র বাস কোববে, সেটি কখনই হবার নয় । রাজপুত্র দেখলেন, তাঁদের পরস্পর সম্ভাব হবার কোন আকার নাই, বিশেষতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুই ব্যক্তিই যদি জীবিত থাকে, তবে তাঁর সাহস-বৃত্তির পক্ষে বিশেষ হানি জন্মাবে, তাই মাত-পীচ চিন্তা কোরে তাদের যুদ্ধ কোত্তে অস্থ-মতি কোলেন, রাজপুত্র স্বয়ং মধ্যবর্তী হোলেন । সেরসাহেবের প্রহারগুলি মহাবেগে এসে পোড়তে লাগলো, কলম্বেগও কিছু মেঘশাবকের জায় কাপুরুষ ছিল না, সে ব্যক্তিও কালপ্রহার কোরে আক্ষান কোত্তে লাগল, বরং কলম্বেগই সবপ্রথম দুসমনের রক্তপাত কোলে । বকারালী চোট খেয়ে ক্রোধে উন্নত হোলেন, আর তিনি সতর্ক হয়ে কোশলের উপর চোন্তে পাল্লেন না, এখন তিনি এলোমেলো কোপ ঝাড়তে লাগলেন, শত্রুকে বাগমত কারবার পেলেন কি না, এক্ষণে তাঁর সে বিবেচনা ছিল না, তাতে কোরে কলম্বেগের পক্ষে অব্যর্থ সুবিধা হয়ে দাঁড়ালো, ঐ সুযোগ পেয়ে সে

ব্যক্তি দ্বিতীয়বার প্রহার কোতে অবসর পেলেন। পক্ষান্তরে সেরসাহেব একটি দুর্জয় প্রহার করবার অবকাশ পেলেন, এই প্রহারের তেজ যত ছিল, কৌশল তত ছিল না, প্রহারটি এসে কলমবেগের স্বকের উপর পোড়লো, এই চোট খেয়ে কলমবেগের শরীর দিয়ে রক্তের চেউ খেলতে লাগলো। এদের এখন মনুষ্যের আকার নাই, ঠিক যেন দানোর মত চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলমবেগের বলশক্তি ক্রমে খর্ব্ব হয়ে পড়ছে, সেরসাহেব শিঙমূর্ত্তি অনেককণ তিরোহিত হোয়েছে, তাঁর তেজের কিন্তু কণিকা-মাত্রও হ্রাস হয় নাই, উভয়েই সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যেন রক্তদন্তিকা সেজেছে, এ পর্য্যন্ত উভয়ের কেউই অবসর না হওয়ার যুদ্ধের জয়-পরাজয় স্থির হলো না। আমি কলমবেগকে অনেক সাধ্যসধনা কোরে বোলেন, “তুমি ক্ষান্ত দাও, চের হোয়েছে, আর রক্তারক্তি কোরে কাজ নাই।” সে কিন্তু কোনমতেই তার জেদ ছাড়ল না, আমার তত মিনতি করা বুঝা হলো। কলমবেগের লম্বা লম্বা চুলগুলি চোকের উপর এসে পোড়োছিল, সেগুলি সে লরিয়ে ঘাড়ের দিকে ঠেলে রাখলে, রেখেই বীরভেঙ্গে আত্মকালন কোরে বিপক্ষের প্রতি ঘোর বেগে প্রধাবিত হলো, তার বিপক্ষও সেই সময় কালান্তকবৎ দোহুও ক্রোধে অগ্নি-অবতার হয়ে কলমবেগের মস্তকে একটি ঘোর প্রহার কলেন, সেই প্রহারেই কলমবেগ ধরাশায়ী হলো, বকারালীও সেই সময় মুচ্ছিত হয়ে পোড়লেন, আমার মনে কোলেন, ঠিকই এই প্রাণ ভ্যাগ কোরেছে, উভয় বোঝাই অতি নিষ্ঠুররূপে ক্ষতবিক্ষত হোয়েছিল। কলমবেগের আর কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না, তাঁর বাক্য রোধ হয়ে পোড়লো, তাঁর বাঁচবারও আশা ছিল না। সেরসাহেব বিস্তর রক্তপাত হওয়ার দুর্জয় হয়ে পোড়োছিলেন সত্য, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, তাই হাকিম বোলেন, তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। আমরা অতি সন্তর্পণে সেবা-ওষধী কোতে লাগলেন, কিন্তু বার বে

নিয়তি, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কলমবেগ সেই রাতেই মানবলীলা সংবরণ কোলেন, সে ব্যক্তি ভূতলে পতিত হওয়া অবধি তার মুখ দিয়ে বাক্যশ্রুতিও হয় নাই, তার চেতনও হয় নাই। প্রতিপক্ষের কাল-হয়েছে শুনে সেরসাহেব পাশ ফিরে গেলেন, তাঁর সহবাসী কলমবেগের রীরের জ্ঞান সাহস পরাক্রম ছিল বোলে তাঁর মৃত্যুতে বিস্তর আক্ষেপ কোতে লাগলেন। উগ্রদর্শন সেরসাহেবের প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর সেবা-ওষধী, বিস্তর আন্তরিক যত্নে আবদ্ধ হয়েছিল, তিনি এত অবাধা, এত অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন, তাকে শেষোন্মত্ত কোরে রাখাই দুষ্কর হয়ে উঠল। রাজপুত্র অতিশয় আক্ষেপ কোরে বোলেন, না জানি, বকারালী কতকাগেই আরোগ্য হয়ে উঠবেন, কর্তৃকাজের অনেক বিলম্ব পোড়ে গেল। তা যাই হোক, আমার কিন্তু দোত্যকার্যের ভার লোয়ে প্রহান কোতে আজ্ঞা কোলেন, প্রভাত না হোতেই ধনগড়গঞ্জ পারত্যাগ কোরে চোলে বেতে বোলেন। রাজপুত্র মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্রেই কি কোরে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হোলেন, সে সন্ধান আমি অবগত হোতে পারি নাই, তিনি নাকি আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করবার নিশ্চিত অত্যন্ত উতলা হোয়েছিলেন, কি হোচ্ছে না হোচ্ছে, তাই বোধ হয় একবার দেখতে শুনতে এসেছিলেন।

সলিমান তড়াক কোরে লাফিয়ে উঠে বোলেন, “আজ্ঞা! তুমি করণাময়! তুমি দয়াময়! তাই আমরা এ ভয়ঙ্কর পক্ষতক্ষয় থেকে প্রাণ লোয়ে পালাতে পাল্লেন, আমি ভয়েও কখন এমন ভয়ঙ্কর রক্তারক্তির অভিনয়-স্থান দর্শন করি নাই। হজুর! আপনি যে প্রাণ লয়ে বেচে এসেছেন, তাই আমার মনে বড় আত্মলাদ হোয়েছে, আপনি যদি পরামর্শেই কথা জিজ্ঞাসা ককরেন, তবে,—” আমি অমনি সোলামানের মুখে থাবা মেয়ে নিরস্ত কোলেন, তার ভাষণার্থ্য এই, সলিমান যে কথা বোলবে, সে কথা আমি



পূর্বেই জানতে পেরেছিলেম, সে আমার লোহিত-তরঙ্গিত অকল্যাণকর পথ থেকে ফিরে যেতে পরামর্শ দিত। এ পরামর্শ আমার পক্ষে ভাল ছিল বটে, আমারও ভাল বোলে জ্ঞান হতো, কিন্তু করি কি, আমি যে ব্যাপারে জোড়িয়ে পড়েছি, বিশেষতঃ আমি যেক্ষণ অপমানিত হয়েছি, সে অপমান বর্তদিন অরণ্য থাকবে, ততদিন আমি এ কার্যে বিমুখ হোতে পারবো না।

## ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

“কর্তা গেলে বোল পার না,  
চাকরকে পাঠায় দই ‘আনতে।’”

আমরা অধিক পথ চলতে পারিনি, এমন সময় একটি কাতরস্বর কর্ণস্পর্শ কোলে, স্বর শুনে বোধ হলো, একটি প্রাণী যেন বিস্তর কষ্ট, বিস্তর যন্ত্রণা পাচ্ছে, স্থানটি মরুভূমির সদৃশ, যেদিকে চাই, কেবল কতকগুলি কণ্টকময় বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাই না। কতকগুলি কুৎসিত কদাকার বৃক্ষের কোপ থেকে ঐ স্বর বহির্গত হচ্ছিল, আমরা তাড়া-তাড়ি সেই দিকে চল্লম, দেখি না একটি পথিক আমাদের দেখে বিস্তর কাতর হয়ে বোলে, “দোহাই আল্লাহ! আমার বাঁচাও।” পথিকের চারিদিকে কত গুলি তীর ইতস্ততঃ পোড়ে ছিল, সেই তীর দেখে বুঝতে পার্লম, সে ব্যক্তি মাহিরেদের ক্রোধের ভাজন হয়েছিল। কতগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখলম, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেগুলি অস্ত্রের চোট, পথিকের শরীর যদি বিযাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হতো, তবে তাকে জীবন-আশার জলাঞ্জলি দিতে হতো। এই ব্যক্তির অদূরেই আরও তিনজন হতভাগ্য পোড়ে আছে দেখলম, তারা আজবেক দেশের রাজপ্রাতি-মিথি, এদের গায় বিযাক্ত তীরগুলি সংলগ্ন ছিল, এরা বেঁচে নাই, প্রাণে মারা পড়েছে,

এক্ষণে আমার সেবাধর শুধু এক জনের জন্তেই আবশ্যক হোলো। আমি তার ক্ষত-গুলি বেশ কোরে বাঁধলম, বেঁধে সলিমানকে জলের জন্তে পাঠালম, সলিমান বিস্তর কষ্ট কোরে জল নিয়ে এলো, নিকটস্থ গ্রাম থেকে তিন জন লোক সঙ্গে কোরে আনলে, সেইটিই বড় বৃদ্ধির কাজ কোরেছিল, সেই তিনটি লোক সহায় কোরে, ঐ ক্ষতাক্রান্ত ব্যক্তিকে একটি কদাকার মেটে বাপড়িঘরে নিয়ে গেলম, স্বরখানি রামকুঁড়ের নুতন হোলো তো কি বোয়ে গেল, আশ্রয়ের স্থান তো পেলেম, তখন আবার রোদ্‌ খাঁ খাঁ কোচ্ছিল, যেন জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মাচ্ছিল, সে কষ্ট থেকে তো বেঁচে গেলম। ঐ বাড়ীর পুরুষ-দের জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরে আহার অন্বেষণ কোন্তে হোতো, তা ভিন্ন আর তাদের উদ-রাগ্নি-নিবারণের উপায় ছিল না। জঙ্গলে গিয়ে মাহিরেদের সঙ্গে সর্করাই মারামারি কোন্তে হোতো, তাই প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসতে হোতো, সেই গরজে বাড়ীর স্বীলোকটি ক্ষত শুদ্ধ হবার অনেকগুলি গাছগাছড়া শিখে রেখেছিল। আমরা তার বাড়ীতে উপস্থিত হোলে ঐ স্বীলোকটি জঙ্গল থেকে কতকগুলি পাতা ছিঁড়ে এনে জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে, ঐ পাতা গরম কোরে বা ধুইয়ে তাতে বোসিয়ে দিলে, অল্প আফিওণ খেতে দিলে, তাতে কোরে পথিক অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হোলো। নিদ্রাভঙ্গের পর সে ব্যক্তি অনেক শ্রুৎ-স্বচ্ছন্দ হলো। আমার পিটে চাবুক পোডছে, আমি আর বিলম্ব কোন্তে পারিনে, আমাকে আগুন-নার কাজে যেতে হবে, তখাচ গড়িমসি কোরে আরও একদিন বিলম্ব কোল্লম, ভাবলম, এক দিন থেকে গেলে পথিকের যদি কোন উপকার হয় তো হোক। পথিক শ্রাবণ-ধারার দ্বারা আমার উপর অজস্র সাধুবাদ বর্ষণ কোন্তে লাগলেন। আমি যখন বিদায় হই, সেই সময় বোলেন, ‘আমার নিকট এমন কোন বিশেষ পদার্থ নাই যে, তাই দিয়ে কৃত-জ্ঞতার প্রমাণ প্রদান করি। আপনি যদি

কখনও কাবুলের অন্তর্গত গিজনিসহরে গমন করেন, তবে সদাগর হামেতের অনুসন্ধান অবশ্যই কোরবেন, সে ব্যক্তি বাড়ী দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আপনার আতিথা কোরবে।' ঐ শুনে আমি অমনি বোলে উঠলেম, 'কি বোলেন? হামেত! সত্যই তাই নাকি! যার পতিপ্রাণা স্ত্রী তত বীরবিক্রম প্রকাশ কোরে কাল্মাক ডাকাতে উৎপাত থেকে গিজনিসহর পরিত্রাণ কোরেছেন, আমি কি সেই হামেতের সঙ্গে আলোপ কোছি!!'

হামেত শুনে বিশ্বাসপন্ন হোলেন, আমার কিন্তু বারংবার বোলেন, তিনি সেই হামেতই বটেন, আমি কাল্মাকে বৃত্তান্ত কি কোরে অবগত হোলেম, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোলেন। আমি বোলেম, তাঁর একজন সহচরের মুখে সকল কথাই আত্মপূরিক শুনেছি, এই কথা বোলে বোলেম, কাল্মাক ডাকাতে হাতে রক্ত পেয়ে, বিদেশে এসে যদি দুরাশ্রা মাহিরেদের হাতে প্রাণ হারাতেন, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হতো, সে আক্ষেপ রাখবার স্থান থাকতো না। হামেত বোলেন, 'দোস্ত! সেটি আমার অদৃষ্ট, কার অদৃষ্টে কি আছে, কে বোলতে পারে, কাশশত্রুর হস্তে পরিত্রাণ পেয়েও হয় ত শেষে একটু পদস্থলিত হোরে প্রাণটি তখনই হারাতে হয়, আল্লাকেই ধন্যবাদ দাও, আল্লাই সত্য, তিনিই আমার উপকারের নিমিত্ত আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।' আমি প্রতিশ্রুত হোরে বোলেম, 'যদি গিজনির নিকট দিয়ে কখন যাই, তবে অবশ্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাত কোরবো।' ঐ কথা বোলে আমি বিদায় হোলেম, এমন সংপাত্তের উপকার কোন্তে পেরেছি বোলে মনে মনে বেশ আনন্দিতও হোলেম। হামেতের অদর্শনে তাঁর পতিগতা স্ত্রীর চিত্তোদ্বেগ আমার অন্তরগটে চিত্রিত কোন্তে লাগলেম। হামেত দেশে ফিরে গেলে, আমি-অনুরক্তা, খোজেন্তা ঘেরুপ উল্লাসিত হবেন, সে উল্লাসও যেন চক্কর উপর দেখতে লাগলেম। আমার অদৃষ্টে গৃহস্থ নাই, আমার পতিপ্রাণা প্রাণ-য়িনী নাই, দীর্ঘকালের পর দেশে ফিরে এলে

আমার পেয়ে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করে; আমার তেমন কেউই নাই, আমার তেমন কপালই নয়, গৃহে প্রত্যাগমন কোরে, পতিগতা প্রাণ-য়িনীর মুখকান্তি সন্দর্শন কোরে অমির সুখে সন্তরণ কোরবো, বিধাতা বিস্মৃত হয়ে আমার ললাটে মণুর গৃহস্থ লেখেন নাই, তাই এ জন্মে সে সুখের আশ্বাদ জানতে পাল্লেন না। সোয়ার হয়ে এই সকল দুঃখের কথা চিন্তা কোন্তে কোন্তে চোঁলেছি, বোলতে চোলতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে এসে পৌঁছলাম, গ্রামটি জয়পুর থেকে দশকোশ দূরে। পূর্বে মনে কোরে-ছিলাম, এ পথে আর কোন কমেই আসবো না, কিন্তু কার্যের গতিকে আবার আসতে হলো। জয়পুরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন্তে ভয় হলো, এত ভয় হলো যে, মুখে বোলে উঠতে পারিনে। শুনলেম, ঐ গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ গণককার এসেছেন, তাঁর ভারি নাম-খ্যাতি, বাড়ীতে ভিড় লেগেই আছে, যেন বাজার বোসে গিয়েছে, বিস্তর লোক আপনার অদৃষ্টের বিষয় জানবার নিমিত্ত সেখানে উমেদারি কোছে। দৈবজ্ঞের গণনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি, এ শ্রদ্ধা বালাকাল থেকেই আমার আছে, অনেকের সম্বন্ধে গণককারেরা যাকে বা বোলেছেন, তাঁর পক্ষে তাই সিদ্ধ হোতে দেখেছি। কাকেও প্রত্যা-দেশের স্তায় পূর্বদৃষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অদৃষ্টে বিপদ ঘোটবে, আবার সাবধান হও বোলে সতর্কও কোরে দিয়েছেন, যাকে বা বোলতে শুনেছি, তাঁর তাই খেটে যেতে দেখেছি, তাঁরা বাকসিদ্ধির স্তায় যাকে বা বলেন, তাঁর তাই ফলে যায়। আমার মন কখন ভরসায়, কখন নির্ভরসায়, কখন ভয়ে, কখন নির্ভরে আন্দোলিত হোচ্ছিল, আমি যে সাহসবৃত্তির উপর আরোহণ কোরেছি, তাতে কৃতার্থ কি অকৃতার্থ হব, সেই বিষয় জানবার জন্য মনে মনে বড় উতলা হোলেম, আমি যে পথ ধোরে চোলেছি, সে পথ অব-রোধ করবার পক্ষে ভবিষ্যন্তার এমন সুযোগ আর হবে না, সে ব্যক্তি নিবেদ কোলে আমি সে পথে কখনই পদার্পণ

কোরবো' না। আমি জিজ্ঞাসা কোলেম, দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন, কোথায় গেলে তাঁকে দেখা পাওয়া যায়। শুনলেম, তিনি গ্রামের মধ্যে নাই, গ্রামের মধ্যে থাকার রীতি নয়। গ্রামের বাহিরে একটা ভগ্ন গোরস্থান আছে, সেইখানে অষ্টকোণাকার একটি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে বাস কোচ্ছেন, নিশীথ রাত্রে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোন্ডে হয়। আমাকেও তাই কোন্ডে হলো, তত গভীর রাতে একখানি সাল দিগে আপাদ মস্তক ঢেকে সেই ভগ্ন কবরস্থানে চোলে গেলেন, সেখানে বিস্তর লোকের আম-লানি দেখতে পেলেম, যুবা বৃদ্ধ আদি কোরে ছোট বড় নানা প্রকার আনুকা আনুকা চেহারার ভিড় লেগে গেছে, মনে কোলেম, আমিও যে অভিশ্রায় কোরে এসেছি, এরাও সেই অভিশ্রায় কোরে এসেছে। কি হয় ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেই চোলে এসেছে, গণককার তাঁদের বিষয় কি বোলেন, সেই বিষয় তাদের মুখে শুন্তে এসেছে, যদি তাই হয়, তবে তাঁদের নৈরাশ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়েছিল, তার কারণ এই, বাদের অদ্ভুত কথা ব্যক্ত কোরে বোলে দেওয়া হোচ্ছিল, তারা একতিলও দাঁড়াচ্ছিল না, অমনি উর্দ্ধ্বাসে ছুটে পালাচ্ছিল, তাদের অন্তর্মুর্তি দেখে বোধ হোতে লাগলো, তারা যেন বাড়ীতে গিয়ে পোড়তে পাশ্লেই বাচে। গোরস্থানের দরজার কাছে একটি বামন দাঁড়িয়ে ছিল, সে ব্যক্তি গণককারের চাকর, দেখলেম, তাকে প্রশ্ন না কোলে তার দূর-দর্শী চতুর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কোন প্রত্যাশা নাই। ঐ বামন আমার সঙ্গে কোরে অষ্টকোণাকার কুটীরের মধ্যে নিরে গেল, গিয়ে দেখি, দৈবজ্ঞের আসনপিন্ডে হয়ে বোসে আছেন, তিনি বৃদ্ধ, দেখতে খরীকার, শোণের মত শুভ্র দাড়ি লম্বা হয়ে কুলে পোড়েছে, মুখখানি কৈকাসে, যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে, দেখে বোধ হলো, রবিদেবের উজ্জল ছটা সে মুখের উপর কখন যেন প্রদীপ্ত হয়নি। তাঁর মাথার আব্রুমানি কেতার একটি মথ-

মলের টুপী, ঐ টুপীর উপর সোনার রূপোর তারে 'কারিকুরি' কোরে অনেক স্কর লেখা, গুটাকর, তার নিগুত মর্থ প্রকাশ নাই। তা যাই হোক, একটি বিষয় দেখে বিস্ময়-পন্ন হোতে হলো, তাঁর পীঠের উপর তিনটি সর্প রূপ। ধোরে বোলেছে, সর্পগুলি কখন মাথার উপর, কখন ঘাড়ের উপর উঠছে, ক্রমাগত কঁোস কঁোস শব্দ কোচ্ছে, আবার থেকে থেকে লঙ্গকে জিব বার কোরে ভয়ঙ্কর মুর্তি হোচ্ছে। পণ্ডিতবরের সম্মুখে একখানি আসন পাতা ছিল, আমার ইশারা কোরে সেই আসনের উপর বোসতে বোলেন, আমি গিয়ে বোসোছি, সর্পগুলি অমনি হিল্-বিল্ হিল্-বিল্ কোরে কুলোর মত বৃহৎ চক্র ধোরে উঠলো, তাদের ক্রোধপূর্ণ আরক্ত চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগলো। কি ভয়ঙ্কর মুর্তি! দেখে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। গণককার আমার ক্রাস দেখে সর্পগুলিকে তাড়না কোতে লাগলেন, তারা কিছু সঁে তাড়না গ্রাহ কোলে না, তাই দেখে পণ্ডিতবর সক্রতানে একটি শিশ দিলেন, শিশ দিতেই যে গদীর উপর তিনি বোসে ছিলেন, সেই গদীর নীচে থেকে একটি বেজি বেরিয়ে এলে, বেজিটি দেখতে খরীকার, অতি স্নন্দর, আপাদ-মস্তক শাফা ধপ ধপ কোচ্ছে, গলায় রূপোর ছোট ছোট বক্টা বাধা। নেউলের উপর সর্পবিষের প্রভাব খাটে ন, পৃথিবীর মধ্যে একরূপ জন্ত আর দ্বিতীয় নাই। তুচ্ছশক্তি এই কালান্তক জাতশক্তকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কৈচো হয়ে পোড়ল, কৌকড়-শৌকড় হয়ে মাথাগুলি ক্লেঁ কোলে, চক্রগুলি গুড়িয়ে কৌসকঁাস শব্দে গর্জন করাও রহিত হলো, এখন হুড়হুড় কোরে পণ্ডিতের টুপীর পশ্চাতে গিয়ে লুকা-রিত হলো, কেবল থেকে থেকে ঘাড়ের দিক দিয়ে বৃদ্ধ বাড়ীচ্ছিল, তাদের পরমশত্রু সেই বেজিটি কোথায় কি কোচ্ছে, উঁকি মেয়ে মেয়ে তাই দেখছিল। নেউলটি কখন এদিকে সেদিকে শুঁকে শুঁকে ভ্রাণ নিয়ে বেড়াচ্ছিল, কখন বেপরোয়া বেধবর হয়ে পণ্ডিতের

হাঁটুর উপর বোসে আপনার গাত্র ঝাঁচড়িয়ে পরিষ্কার কোচ্ছিল। আমি বোল্লেম, “আমি আমার অদৃষ্ট জানুতে এসেছি, আপনি যদি পারেন তো বলুন, ভয় কোব্বেন না।” ক্ষুদ্রাকার বুদ্ধটি মুখ তুলে চোখ মেলিয়ে, একবার চেয়ে দেখলেন, দূর্গপ্রদীপের কায় মিটিমিট কোরে একটিমাত্র আলো জ্বলছিল, সেই প্রদীপটি তিনি উস্কিয়ে দিলেন, আমি বোল্লেম, “বোধ হয়, আমার বয়স আন্দাজ আটাশ বৎসর, সেপাইগিরি আমার ব্যবসা।”

বুদ্ধটি বোল্লেম, “তবে নিঃসন্দেহ তোমার মাথার উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত হোয়ে বোয়ে গিয়েছে।” আমি মাড় নেড়ে সার দিলেম, বুদ্ধ বোল্লেম, “এখনও বিস্তর বিপদ তোমার জন্তে ভাগারে মজুত রোয়েছে।” আমি বোল্লেম, “তা হোতে পারে, চরমে কি দশা হবে, সেট কথ্য বলুন।”

আচার্য্য বোল্লেম, “শেষ মৃত্যু।”

আমি বোল্লেম, “মৃত্যু তো বরাই রোয়েছে, তা তো হবেই, মৃত্যুর পূর্বে আমার অদৃষ্ট প্রশ্ন করবে কি না, তাই বলুন।” আচার্য্য বোল্লেম, “অদৃষ্টবান্ হবার জন্তে তুমি যখন ব্যাকুল হয়ে বেড়াবে, সেই সময় সর্কী-জক মৃত্যু তোমার গ্রাস কোব্ববে।” এই কথোপকথনের সময় বুদ্ধের আজ্ঞাক্রমে ছুখানি হাত কোণাকূর্ণি কোরে বুকের উপর বেঁধে রেখে হাঁড়িরে আছি, মনে কোচ্ছি, অদৃষ্টের বিষয় বুদ্ধ আরও কত কথ্যই বোল্বে, শুনবো। দৈবজ্ঞ কিন্তু ঐ কথ্যগুলি বোলে মুখ বন্ধ কোল্লেম, সে মুখ আর খুল্লেম না। দেখে যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “আমি যে কোনপ্রকার অভিসন্ধিতে লিপ্ত আছি, আপনি সে বিষয় কেমন কোরে জানলেন?”

আচার্য্য বোল্লেম, “মূব্বা! আমি মহুষ্যের অদৃষ্ট কি কোরে জানুতে পারি, সে বিষয় তোমার বোলুতে বাধ্য নহি। তুমি বল দেখি, তোমার পিতা জীবিত আছেন কি না?” আমি বোল্লেম, “আমি কখন পিতাকে দেখি নাই, আমি তাঁকে জানিও না, চিনিও না।”

আচার্য্য বোল্লেম, “তবে ঐ চুনির আংটিটি কি কোরে তোমার হস্তগত হলো?” আমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেলেম, মনে কোল্লেম, এই ব্যক্তিই উপযুক্ত পাত্র, যে বিষয় জানবার নিমিত্ত তত ব্যগ্র, তত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, এই ব্যক্তি হোতেই তার সন্ধান জানুতে পারবো। আমি বোল্লেম, “আঃ, কি কথ্যই বোল্লেম! আপনি যদি সে বিষয়ে কিছু জানেন, তবে অল্পগ্রহ কোরে বলুন, আর আমার সংশয় রাধবেন না; যে ব্যক্তি আমার পিতা বোলে পরিচয় দিতেন, সেট ব্যক্তি আমার এই আংটিটি প্রদান কোরে-ছেন, কিন্তু তৎকালীন তাঁর কথ্য বইবার শক্তি ছিল না, সেটি দারার নিদারুণ নির্জ্বর-তার গুণ।” আচার্য্য বোল্লেম, “সে দাতার নাম অবশ্যই সাদুলাপী হবে।” আমি বোল্লেম, “হাঁ, তাঁর নাম সাদুলাপী বটে। কেন, আর কি সংসারে এরূপ আকারের এরূপ বর্ণের আংটি নাই?” আচার্য্য বোল্লেম, “না, কখনই না।” এই কথ্য বোলে, একটা ক্ষুদ্র ধোলের তক্তর হাত পুরে দিয়ে অরিকল আমার আংটির মতন আর একটি আংটি দাব কোল্লেম। আমি বোল্লেম, “হাঁ, এইটি তৃতীয় আংটি।” আচার্য্য অমনি বোলে উঠলেন, “এইটি কি তৃতীয়? তবে বোধ হয় দ্বিতীয়টি তুমি দেখেছ?” আমি বোল্লেম, “হাঁ, দেখেছি, আবার যে তৃতীয় একটি ছিল, তা আমি জানু-তাম না।” আচার্য্য বোল্লেম, “তোমার হাতে যে রূপ আংটি আছে, ঐরূপ আর একটি আংটি কোথায় দেখেছ, মনে কোরে দেখ দেখি।” “আমার বিবেচকারী, আমার নিগহদাতা নজফালী খাঁর হাতে যেখেছি, তিনি তখন মাহিরেদের আশ্রয়ে বাস কোচ্ছিলেন।” “তবে তুমি যখন সেখান থেকে চোলে এসো, নজফালী খাঁর হাতে সেই আংটি দেখে এসেছ?” “হাঁ, দেখে এসেছি, তিনি যখন শবাকার হয়ে পোড়েছেন, তখন সেই আংটিটি তাঁর হাতে রোয়েছে দেখছি।” “বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐ আংটির উপর দৃষ্টপাত হবার পূর্বে সে ব্যক্তির যতাব ওরূপ ছিল

না ।” আপনি প্রহেলিকার মত কুঁচি কোন কথা আশায় বোলবেন না, এই তিন আংটি আমূল বৃত্তান্ত আমার ভেঙ্গে খোলসা কোরে বলুন । “বস, চূপ কর! আর আমাদের কথোপকথন চোলেবে না, সপেরা কৌশ কৌশ কোরে গর্জন কোছে, রাত্রি প্রভাত হয়ে এসেছে, আবার কাল রাত্রে এসো, যখন সকালে নিঃশব্দ নিঃশব্দ হবে, যখন অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যাবে না, সেই সময় এসো, এখন উঠ, আর বিলম্ব কোরো না, আপনার ঘরে চোলে যাও ।”

এই কথা বোলে আচার্য্য মিহিসুরে একটি শীশ দিলেন, ঐ শীশ শুনে সেই ধর্ম্ম-মূর্ত্তিটি আমার সঙ্গে কোরে বাইরে নিয়ে এলো, আমি চোলে এলে গণককার আলোটি নিবিয়ে ফেলেম । বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা পাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক চোঁচা টানে সটান বেরিয়ে পোড়লেম । আমিই বা কে, আমার জ্ঞানদাতাই বা কে, সেই বিষয় জানতে না পারায় মনটা বড় উচাটন হলো, ঐ উচাটন মনে ভিঁড়ের মধ্য দিয়ে যখন চোলে যাই, তখন এক ব্যক্তি বোল্ছে শুনতে পেলেম, “দেখো, চেহারাটা কেমন বিক্ৰী হয়ে পড়েছে, চোক মুখ বোসে গিয়েছে, ঠিক যেন মড়ার মতন দেখাচ্ছে, আমি দিবা কোরে বোল্তে পারি, আচার্য্য চোক খুলে দিয়েছেন, তিনি বলেন, তুমি আর বিস্তর দিন বাঁচবে না । শীঘ্র মোরবে, আয়ু শেষ হয়ে এসেছে ।” আর এক ব্যক্তি বোল্লে, “দেখছ ভাই, ভিড়ের ভিতর দিয়ে কেমন ভিড়িং ভিড়িং কোরে লাকাতে লাকাতে চোলেছে, ও ব্যক্তি কেন অদৃষ্ট জানতে এসেছিল ? ও দুর্ভিক্ষ তার কেন হলো ? তাই এখন অহুতাপ কোচ্ছে সন্দেহ নাই ।” তৃতীয় স্বর বোল্লে, “এ ব্যক্তি কে, চেন ?” এই কথা শুনতে শুনতে আমি আড্ডার গিয়ে পৌছিলাম । আমার বিলম্ব দেখে সলিমান ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলো, কতক্ষণে কিরে আস্বে, তাই পথের দিকে চেয়ে দেখছিলো । সলিমান আমার

দেখতে পেয়ে চীৎকার শব্দে বোলে উঠলো, “আল্লা! তোমার মহিমা বৃদ্ধি হোক! আপনি যে সেই ভগ্ন বুদ্ধের কাছ থেকে নির্ধিরে ফিরে এসেছেন, তাই আমার পরম লাভ, লোকে বোল্ছে, সে বেটা মূর্ত্তিমান্ জালি-রাত ।”

আমি বোল্লেম, “চূপ কর স্বর্ষ, তোরা তাঁর গুণ কি জানবি ? তিনি পণ্ডিতচূড়ামণি, তাঁর অতি নিরীহস্বভাব ।

সলিমান বোল্লে, “হজুর ! আমি এইমাত্র জানি, যারা তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোন্তে যায়, তার মধ্যে তিনজনের বাক্যরোধ হয়েছে, তারা একেবারে বোবা হয়ে পোড়ছে, তাই গ্রামের মধ্যে ভগ্নি ডামাডোল চোলেছে, লোকের মনে বড় ভয় হোয়েছে ।” আমি বোল্লেম, “ভায়া অতি অজ্ঞান, তাদের বুদ্ধি অতি কম, মনের বল নাই । তারা হাবার মত ভয়তরাসে, সেই দোষেই তাদের জিহ্বা অসাড় হোয়ে পড়েছে, তাই তারা কথা কোইতে পাচ্ছে না, নচেৎ পণ্ডিতবরের কোন দোষ নাই, তিনি কখনই নষ্টামি কোরে তাদের মন্দ করেন নাই ! যদি আল্লার মনে থাকে, আবার কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরুবো ।”

সলিমান শিউরিয়ে উঠে বোল্লে, “আবার ! আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ? তত বাড়াবাড়ি কোরবেন না, তা হোলে আপনাকে বিপদে পোড়্তে হবে ।”

আমি বোল্লেম, “তুই চাকর বই তো নোস, তোর অত কথায় কাজ কি ? তুই এখন শুয়ে থাক, আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না ।” সলিমান কোরাণের কতকগুলি টীপনি লেখা নিয়ে অস্তে আস্তে চোলে গেল, আমি একটা মাদুরের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পোড়্লেম, নিদ্রা ঘাবার জন্যে শুলেম না, অহুসঙ্কান-রূপ ইচ্ছান্ত্র আমার মনকে টেনে ধোরে রেখেছিল, তাতে আর কি কোরে ঘুম হয় - আমি বে বিষয় জান্বার জন্তে এতকাল লালা-রিত হোয়ে বেড়াচ্ছি, সেই চিরবাহিত পরি-চর অবগত হোতে পায়ে হয় ত আমার অব-

হার বিস্তর বৈলক্ষণ্য হোয়ে পোড়বে, হয় ত এখনকার অবস্থার সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রভেদ হয়ে দাঁড়াবে, হয় ত আমার এই উপস্থিত সাহসবৃত্তি একটি নতন মূর্তি ধারণ কোরবে, রাজপুত্রের অহুসেবা পরিত্যাগ কোরে হয় ত আমার আগ্রাস ফিরে যেতে হবে, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার আত্মীয়-স্বজন জীবিত থাকতে পারেন, হয় তো তাঁদের অহুসন্ধানের নিমিত্ত দূরদেশে গমন কোন্তে হবে, ভাই ভগিনী, পিতা, মাতা, আমার দেখবার নিমিত্ত হয় ত পথ চেয়ে আছেন। পিতা মাতা পুত্র বোলে, ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতা বোলে, আমার সম্ভাষণ কোন্তে পারেন। আহা! সে দিন আমার কতই আনন্দের হবে। আমার শুভ অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়ে আমার স্বতল অহুসন্ধানরূপ গভীর প্রবাহের মুখে এনে ফেলেছে, আমার শুভগ্রহই পথপ্রদর্শক হয়ে আমার সেই অহুসন্ধানের পথে এনে তুলে দিয়েছে। যে রাত্রে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে মন ব্যাকুল হয়, সে রাত্রি যেন প্রভাত হয়েও হয় না, কিংবা কাল প্রভাতে মনের বাসনা পূর্ণ হবে, কি মনের সংশয় দূর হবে বোলে যে রাত্রি চিন্তা আনন্দে প্রফুল্লিত হয়, সে রাত্রিও যেন অধিক দীর্ঘ বোধ হয়, শেষ যেন হয়েও হয় না। স্বর্গদেব গন্ধন সরাগে আপনার রক্তিমামূর্তি প্রকাশ কোলেন, তাঁর সেই প্রাতঃস্মৃতি দর্শন কোরে কতই আনন্দিত হলেম, তৎকালীন আফ্রাদে মেতে উঠে আমি যতখানি প্রফুল্ল আমোদে আমোদিত হোলেম, কোন গইবির সে সময় ততখানি ছুটিচিন্তা হয়ে তত উল্লাস তত আনন্দ বর্ষণ কোন্তে পারে না, আবার যখন ঐ রবি-শেষ মঙ্গরগতিতে আপনার পরিমণ্ডল পরিভ্রমণ কোরে পশ্চিম-নাগরে নিমগ্ন হন, তৎকালীন আমার মন যতখানি আফ্রাদরসে প্রাবিত হলো। একজন পেটার্থী মুসলমান রোমজানের উপবাস কোরেও সে সময় ততখানি আফ্রাদ অহুভব কোন্তে পারে না।” তমোময়ী রজনীর ক্রমিক ঘোরমূর্তি দেখে গভীর রাত্রির দম্ভারা, কুশল হউক, বদল হউক বোলে যেমন না আফ্রাদ-

বৃষ্টি করে, রজনী যত ঘোর হয়ে আসতে লাগলো, আমিও তেমনি আফ্রাদ-বৃষ্টি কোন্তে লাগলেম। সলিমান কাগিয়া খোয়া প্রস্তুত কোরে কিসে আমি চগ্রাস খেতে পারি, তারই চোঁটা, তারই যত কোরে লাগলো, গোলাপ তেল, ভাল ভাল খোন্দার সবুজ, গোলাপি পানের খিলি, আলবোলা আমার সম্মুখে এনে রেখে দিলে, আমি না অহারই কলেমা, না পানই খেলেম, না জামাকই খেলেম, তাই দেখে সলিমান একান্ত মনে কোলে, গণককারের মোহিনী মন্ত্রের প্রভাব-ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে, তাই আমার অহার-দিতে রুচি-প্রবৃত্তি নাই। রাত্রি ক্রমে অধিক হয়ে পড়েছে, আমি শাল জোড়া দিতে বোলেম, আমার একান্ত বিখ্যাতী চাকর সেই সলিমান শাল জোড়া যখন আমার পায়ে জড়িয়ে দেন, সেই সময় দেখলেম, তার হাত দুখানি ধ্বংস কোরে কাপছে, এবার আর প্রাজ্ঞের হার হিতোপদেশের কথা বোলে সে আমার বিরক্ত কোরে না, তার কথায় আমার যে মন ভিজবে না, সে তা জানতে পেরেছিল। তা যাই হউক আমি যখন ঘরে থেকে বেরিয়ে যাই, সলিমান বন বন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। এখনও বেশী রাত হয় নাই, দ্বিপ্রহর হতে এখনও একঘণ্টা বাকী আছে, এই অবকাশে গ্রামের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াতে লাগলেম, স্থানে স্থানে লোক দলল বেঁধে বোসে গিয়েছে, কথাবার্তা প্রায় কানে কানেই কুস্কাস কোরে চোলেছে। গণককার যে প্রতিবাদীদের মনে জ্বালা জ্বলিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোরে আমি চম্বিত না। হয়ে বয়ঃ সমুদ্রই হোলেম, মনে বড় আফ্রাদ হলো, আজ রাত্রে আমি বই সে কবরস্থানে আর কেউই যাবে না, ভালই হলো, অনেক সময় পাব, আমার জগদ্ব্যস্তের কথাগুলি ভাল কোরে শুন্তে পাব। সময় নিকট হয়ে এসেছে, যে এক ঘণ্টা বাকী ছিল, তাও শেষ হোতে আর বড় বিলম্ব নাই। যতই আমি দৈবজ্ঞের নিকটবর্তী হতে লাগলেম, আমার ক্রম ততই আফ্রাদে নেচে নেচে উঠতে

লাগলো। বহুকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বোলে আমার স্তব্ধকরণ উল্লাস-তরঙ্গে ভাসতে লাগল। আমি একমনে চোলেছি, সটান চোলেছি, এমন সময়ে একটি গ্রামবাসী ভাড়াভাড়ি কোরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, সে ব্যক্তি আমার পথ অবরোধ কোলে, আমি যাতে কোন মতেই গণককারের নিকট না যাই, তাই বিস্তর অস্থানয়বিনয় কোরে নিবেশ কোন্তে লাগলো। সে ব্যক্তি বোলে, গণককার একটি মহামায়াবী, মায়া-বিদ্যার প্রভাবে যা মনে করে, তাই কোন্তে পারে, তার গোণাপাড়া সকলি মিথো, তার বস্ত কার্য্য, সকলই মায়া, সকলি জাল। আমি তার উপর অত্যন্ত রাগত হোলেম, “বোলেম, “তুই কে? পথ ছেড়ে দে! সরে তফাত যা! আমার দেক করিস্নে।” সে ব্যক্তি বোলে, “দোহাই আল্লাহ! মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর, তুমি তোমার বিপদ দেখতে পাচ্ছে না, আর দুপা বাড়িয়েছে। কি অমনি,—”এই শেষ কথাটি বোলতে না বোলতেই অমনি তখনি একটা ঘোরতর গভীর শব্দ হয়ে ধরা কম্পিত কোরে তুলে, পৃথিবী যেন বজ্র নিনাদের ঘোর পরাক্রম সহ কোন্তে না পেরে অন্তরবিদার হয়ে স্তমিরয়ে, উঠে কেটে পোড়ল, আরঙ্গ-জবের সমুদায় তোপখানা যেন এককালীন ভীমবিক্রম কোরে ঘোর ভৈরব শব্দে গর্জ্জন কোরে উঠল। তখন কিন্তু নিবিড় মেঘের নীলোদর ভেদ কোরে শিকাস্তির খেতচ্ছটা ধরাভলে ভেসে চোলেছ, সেই নির্মল হাস্য-মুখী খেত আলোকে দেখলেম, ভগ্নকবর-মন্দিরের গর্ভ থেকে হুল জলন্তস্তের ন্যায় রাশি রাশি ধূমপুঞ্জ নির্গত হোচ্ছে, আবার সেই সময় গ্রামের সমুদায় লোক যুটে চারিদিক থেকে ইটপাটিকেলের বৃষ্টি কোচ্ছিল, ইট পাটিকেলের বেশ ধারাসম্পাত হোচ্ছিল। আমি যখন গ্রামের দিকে ফিরে এলেম, সেই সময় লোকে আফ্রাদ প্রকাশ কোরে একটা পশুবৎ ঘোর অসত্য চীৎকার কোয়ে উঠলো। অসভ্য চীৎকার কোরে উঠলো। সব প্রথম সলিমানের সঙ্গে দেখা হলো, আমি প্রাণে

প্রাণে বেঁচে এসেছি বোলে সে ব্যক্তি প্রাণ ভোরে আল্লাহর গুণানুবাদ কোন্তে লাগলো। সে বোলে, “নরাতম পাণিষ্ঠ গণকের কুহক-জাল থেকে গ্রামের লোক যে পরিভ্রাণ পেয়েছে, তার জন্যেও একবার ধন্যবাদ দিয়ে আল্লাহর মহিমা কীর্ত্তন কোলেম।”

আমি বোলেম, “কি রে পাজি! তুই কি বোলছিস? তুই কি বোলছিস বল! তোকে তা বোলতেই হবে।” “না: হজুর। সে ব্যক্তি নাই, অনেককণ হয়ে গিয়েছে, আমরা তাকে খগে পাঠিয়েছি, সেই সর্কদর্শী সর্কজ জগদীশ্বর এক্ষণে যদি তাকে গ্রহণ করেন, তবেই তার পক্ষে মঙ্গল।” “তুই কি ভাবের কথা বোলছিস, তোর ও সব কথার মানে কি?” হজুর। আমি এই কথা বোলছি, আজ আমি আপনার যে একটি উপকার কোরেছি, তেমন উপকার এ পর্যন্ত কেউ আপনার করে নাই, আজ আমার জন্যেই আপনি বেঁচে গেছেন, নচেৎ আজ আপনার কি দুর্দশাই, কি দুর্গতিই না হতো। আপনি যে মনন কোরে বেরিয়ে-ছিলেন, আজ যদি সেই মূর্ত্তমান মায়াবী-রাক্ষসের কাছে গমন কোন্তেন, তবে না জানি, আজ কি সর্কনাশই ঘোটতো, আপনি নষ্ট হোতেন, আপনার দেহ নষ্ট হতো, আপনার প্রাণ নষ্ট হতো, আরও কত কি না হতো।”

আমি বোলেম, “নরাতমচণ্ডাল! সে সর্কজ মহাপুরুষ কোথায়?” “হজুর! তাকে তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে, তার সেই সাপ, বেজি, বামন সবশুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে।” দৈবজ্ঞের অনূষ্টে যা ঘোটছে, ঐ কথা শুনেই তা বুঝতে পালেম, তত সাধের, তত যত্নের বৃত্তান্তগুলি অবগত হবার নিমিত্ত মনে যে চিরবাহিত চিত্তাদৃত অভিলাষ ছিল, সে অভিলাষ এক্ষণে একেবারে চিরবিলুপ্ত হলো, যত পালেম, সলিমানকে যা ইচ্ছা, তাই বোলে ঝুড়ি ঝুড়ি গালাগালি দিতে লাগলেম, “তুই বজ্জাত, তুই পাজি, তুই চণ্ডাল, তুই খুনে, তুই ভাকাত,” এই সকল দুর্ভাক্য বোলে, এ ছাড়া আরও কত কটুক্তি কোরে রাগ প্রকাশ কোন্তে লাগলেম। তখন ঐ



হাথা উন্মাদ আমায় বোলে, তারই পরামর্শ-  
ক্রমে গ্রামের লোক মুটে একটি নিরীহ  
নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করেছে।

আমি বোলেম, “তোমার এ কাপুরুষালি  
করবার কি আবশ্যক ছিল, তুই কেন পরাধিকার  
চর্চায় হাত দিতে গেলি, তুই দুর্ভাগ, তুই কাল  
নষ্ট কর, তুই মহাপাতকী, তোমার মুখ দেখলে  
প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়।” এই বোলে তাঁরে  
ধিকারের উপর ধিকার দিতে লাগলেম।  
আমি তখন আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে  
ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় গেরেছি বুড়ো পাগল  
সলিমানের মুখের উপর জুতো মাতো মাতো  
গ্রাম নয় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেম,  
সলিমান মার খেয়ে খেয়ে শেষে নির্জীবপ্রায়  
হয়ে পোড়লো। আমি একটা পুরুষিণীর ধারে  
গিয়ে বোস্লেম, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভেবে মনে  
মনে কতটুকু আক্ষেপ কোত্তে লাগলেম। সলি-  
মান এমন গাধা, হকুন, আমার পথে কটক  
দিয়ে দিলে, আমি মৎস্যভক্ষ হোয়ে পোড়লেম,  
উপস্থিত বিড়ম্বনা শেল হোয়ে আমার হৃদয়-  
চ্ছেদ কোত্তে লাগলো, স্থির শাস্ত হোয়ে থাকা  
আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো, যে বিষয়  
জানুবার জন্যে কত বৎসর ধোরে লালায়িত  
হয়ে বেড়াচ্ছি, সেই বিষয়টি আজীব্যাক্ত হোতে  
পারতো, কিন্তু আমার ভৃত্য সলিমানের অল্প-  
বুদ্ধির দোষে তার অনধিকার-চর্চায় দোষে  
বিশেষতঃ গ্রামের কতকগুলি ইতর মুখ  
লোকের নিমিত্ত যে বিষয়টি প্রকাশ হোতে  
পেলে না, আর যে কখন প্রকাশ হবে,  
সে আশাও নাই। এই সকল দুঃখ মনে  
হোয়ে আমার কান্না পেতে লাগলো, আমি  
ভেউ ভেউ কোরে কাঁদতে লাগলেম; কাঁদতে  
কাঁদতে উন্মাদের ন্যায় একবার এদিক, এক-  
বার সেদিক কোরে ছুটোছুটি কোত্তে লাগলেম,  
লোকের ভিড়ে চারিদিক ঠেসে গিয়েছে, তারা  
মনে কোলে, আমার দানোর পেয়েছে, নারকী  
গণককারের মায়াজাল আমায় বেড়ে চেপে  
ধোরেছে, এই ভেবে তারা এক এক কোরে  
সকলেই সোরে পোড়লো, সলিমান আমার  
ঐরূপ ভাবান্তর দেখে আপনার ঘোড়ার

উপর সোয়ার হোয়ে তাড়াতাড়ি আগ্রার  
দিকে চোলে গেল, তখন পরদিন লোকের  
মুখে এই কথা শুন্তে পেলেম।

পরদিন প্রাতে আমি সেই এককালীন  
বিশ্ববংশপ্রাপ্ত গোরস্থানটি দেখতে চোলেম,  
গিয়ে দেখি, পাথরের ইটগুলি কক্ষবর্ণ হোয়ে  
স্থানে স্থানে স্তূপাকার হোয়ে রোয়েছে, পাথ-  
রের দেওয়ালগুলি কেটে চৌচির হোয়ে  
পড়ো পড়ো হোয়েছে, যে দিকে চাই, সেই  
দিকে কেবল উজাড় উচ্ছিন্ন দেখতে পেতে  
লাগলেম। একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো,  
সেটা কিন্তু আধপাগল, বর্ষেরা যে কোশল  
কোরে দৈবজ্ঞবরকে নির্ভরপ্রাণে বিনাশ  
কোরেছে, তার মুখে সে সকল ফেরেব-  
ফলির কথা শুন্তে পেলেম। এই স্থানে  
একটি পাহাড়ের খাত ছিল, গোরস্থানের  
পশ্চাৎ দিকে অখণ্ড খাতের প্রান্তভাগের উপর  
ঐ গোরস্থানের পশ্চাৎদিককার দেওয়াল  
গেঁথে তোলা হয়। খাতের আশে পাশে  
বিস্তর ছিঁত, বিস্তর কাঁক ছিল, তাই আর  
বারুদ পুরে দেবার নিমিত্ত গর্ত কোত্তে হয়  
নাই, যদি গর্ত কোত্তে হতো, তবে গণককার  
মনে অবশ্যই ভয় পাইতেন, তিনি তবে পূজা-  
হুই সতর্ক হোতেন। ঐ সকল ছিদ্রের মুখে  
বারুদ পুরে দিয়ে ঐ বারুদ প্রায় গ্রামের  
প্রান্তভাগ পর্যন্ত লোয়ে যাওয়া হয়, তাতে  
কোরেই গোরস্থানের ইমারতগুলি ভূমিসাৎ  
হোয়ে পড়ে। আমার ইচ্ছা ছিল, ওগ্রাবশেষ-  
গুলি স্থানান্তর কোরে গণককারের মৃতদেহটি  
বার করি, কিন্তু আর কাহাকেও পেলেম না  
যে, আমার সঙ্গে যোগাড় দেয়, একটি প্রাণী-  
কেও সে পথ দিয়ে যেতে দেখলেম না, তাই  
অন্তর্য্যাবিযুথ হোয়ে আপনার আড়ডায়  
ফিরে আসতে হলো, এক্ষণে শোকহুঃখমন-  
স্তাপ আমায় যেন আড়ে আড়ে গ্রাস কোত্তে  
লাগলো। অনেকগুলি সন্ধান অবগত হবার  
• নিমিত্ত অতিশয় উতলা, অতিশয় উচাটন  
হোলেম, আমার মন যেন লালায়িত হোয়ে  
বেড়াতে লাগলো। ঐক্যমতঃ আমার জন্ম-  
বৃত্তান্ত কিংবা আমার বংশের পরিচয়। বিতী-

রতঃ সাহস্রা খাঁ ব্যক্তিতে কে ? সে কেন আমার পুত্র বোলে সম্বোধন কোন্তো । তৃতীয় এ সকল গৃহ বৃত্তান্তের মধ্যে নজফালী খাঁ কি কোরে একজন গণীভূত ব্যক্তি হলো, সে ব্যক্তি কি কোরে আমার বংশাবলী ঘটিত অক্ষুট বৃত্তান্তগুলি অবগত হোয়েছিল ? চতুর্থ, যে আংটি তার হাতে আছে, দেখে তোলে আদি, সে ব্যক্তি তো তখন মাহিরে-দের ভিতর শব হোয়ে পোড়েছিল, সে আংটিটি পণককারের হস্তগত কি কোরে হলো ? পঞ্চম, আমার মনে বেশ প্রতীতি হোয়েছিল, এবার আমার অদৃষ্টের বিষয় অবগত হোতে পারবো, আমার পরিচয়েরও অন্তমর্ষ জানতে পারবো । দৈবজ্ঞের মনে ভয় হোয়েছিল যে, অনেক বিপদ, অনেক বিঘ্ন আমার ঘেরে রোয়েছে, তিনি পূর্বাহ্নে সাবধান কোরে দিয়ে আমার রক্ষা কোন্তে পাতেন । এই সকল গুরুতর বৃত্তান্তের মর্ম্মার্থ স্পষ্ট কোরে ব্যাখ্যা করে, এমন লোক আর দ্বিতীয় নাই, বাস্তবিক সে নিগূঢ় কথাগুলি একাল্মাষের মতন তোপের মুখে যেন উড়ে গিয়েছে বোধ কোন্তে হবে । এক্ষণে আবার পূর্বের মত স্থিরশাস্ত্র হোয়ে জয়পুরে যাত্রা কোলেম, সঙ্গে দোশর কেউ নেই, হরকরাদের, সোয়া-রদের পূর্বাহ্নেই সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সুতরাং একাকী রওনা হোয়ে, আমি সেখানে নির্ঝরে পৌঁছিলাম । জয়পুরে পৌঁছে শুনলাম, রাজা বনকীড়া কোন্তে যাবেন, চিতাবাঘ, কালসার, এই সকল জানোয়ারের কোতুক দেখবেন, তারই উদ্ভোগ হোচ্ছে । এই মহোৎসবে আমোদ-আজাদ করবার নিমিত্ত অনেককেই তাঁর সঙ্গে যেতে অহুমতি, কোরেছেন । পরদিন প্রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত কোলেম, রাজন্বর আমার দেখে চিনতে পালেন, তাই তাঁর পাশা-পাশি হোয়ে যেতে অহুমতি কোলেন ।

রাজা জিজ্ঞাসা কোলেন, “তোমার জয়-পুরে আসা এইবার নিয়ে তিনবার হলো, এ যাত্রা কি অভিপ্রায় কোরে আসা হোয়েছে ?” আমি তাঁকে বারবার অবধারিত কোন্ত

বোলেম, এবার আসবার নিতান্তই প্রয়োজন হোয়েছে, যদি অহুমতি করেন, সক্ষ্যার পর সাক্ষাৎ কোরে যে কার্যের ভার লোয়ে এসেছি, তার মর্ম্ম অবগত করাই ।” রাজা তাতে সম্মত হোয়ে বোলেন, “আচ্ছা, সেই কথা ভাল ।” আমরা এক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে কোতুক-ক্ষেত্রে চোলেম । সেখানে যেতে না যেতেই চিতাবাঘগুলি লাফিয়ে কাঁপিয়ে তামাসা দেখাতে লাগলো, এই সময়ে হঠাৎ একটি কালসার দেখতে পেয়ে চক্ষুর ঠুলি খুলে দিয়ে চিতাবাঘটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো । বাঘটি যখন থাবা মেরে মাটিতে বোসলো, একবার এদিক একবার সোদক কোরে যখন পুচ্ছ আফালন কোন্তে লাগলো, আবার যখন শাকারের নিমিত্ত ষাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখাছিল, তখন তার চোকে দিয়ে ঘের্ন বৃষ্টিমানু কালায়ি বলকে বলকে উথলিয়ে পোড়ছি, সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখতে একটি প্রকাশ ভামাসা । ঐ কক্ষসারের প্রতি ব্যাঘ্রটির যখন দৃষ্টিপাত হোলো, তখন তার ভাবভঙ্গি দেখে আমাদের অল্প আঁমোদ হোচ্ছিল না । আমাদের মধ্যে কারুরি কথা কইবার, কি নোড়ে বসবার অহুমতি ছিল না । যে দিকে গেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়, চিতাবাঘটি সেই দিকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে যেতে লাগলো । প্রথমতঃ অনেক অন্তরে থেকে একটি চক্র দিলে, শেষে অল্প অল্প তোরে ক্রমে ক্রমে শাকার-টির নিকটবর্ত্তী হোতে লাগলো । যদি কখন কালসার ষাড় উঁচু কোরে চেয়ে দেখেছে, ব্যাঘ্রটি অমনি একটি ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে প্রবেশ কোরে তার মধ্যে শরীরটি লুকাতে লাগলো, তাই দেখে রাজার মনে অতিশয় আনন্দ হোলো, চরমে কি ফল দাঁড়াবে, সেই কোতুক দেখবার নিমিত্ত সকলেই উতলা হোলো । ব্যাঘ্রটি যেমন কক্ষসারের প্রতি লক্ষ্য কোচ্ছিল, তার চাল-চালনের প্রতি সে যেমন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে দেখছিল, আমরাও তেমনি ব্যগ্র হোয়ে ব্যাঘ্রটির গতি-প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলাম । রাজা

বোলেন, “তবে আর কি, কৃষ্ণসার এখনও তার বিপদ বুঝতে পারেনি, তাই অসংশয়-মনে চারিদিক চোরে খেয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার আর রক্ষা নাই, ঐ দেখ, চিতাবাবুটি ঝোপ আশ্রয় কোরেছে, ঐ ঝোপের পশ্চাদিক্ থেকে লক্ষ প্রদান কোরবে, তাই আশ্বালন কোরে ল্যাজের ঝাপটা মাচ্ছে। এই কথা বোলতে না বোলতেই ব্যাঘ্রটি লক্ষ প্রদান কোলে, কিন্তু কি আক্ষেপ, লক্ষ্যটি ব্যর্থ হলো, কৃষ্ণসারের উপর আক্রমণ কোত্তে পালে না। আমরা মনে কৌতুহলিলাম, এবার তার আশ্রয় নিতান্ত শেষ হোয়েছে, ব্যাঘ্রটি ক্ষুধাবান হোয়ে তার রক্ত পান কোরবে, কিন্তু কালসারটি সেই সময় একটি লক্ষ্য দিয়ে ঠিকুরিয়ে গিয়ে তফাতে পোড়লো, তাঁই সে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পালে, ঠিকুরিয়ে, পোড়েই স্নুথের মরদানের দিকে নক্ষত্রবেগে ছুটতে লাগলো, শেষে কোথায় পালালো, আর তাকে দেখা গেল না। ব্যাঘ্রটিকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে আনবার নিমিত্ত ডুরিওয়ালারা কাঁচা মাংস নিয়ে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগলো, ব্যাঘ্রটি তখন সংস্কৃত গভীর অনুরাগির জায় গুমুরিয়ে গুমুরিয়ে গর্জিয়ে উঠে মহা আশ্বালন কোচ্ছিল, পুচ্ছটি পেছনের ছুথানি পায়ের ভিতর থেকে ঝুলে পোড়েছে, শীকার কোত্তে পালে না বোলে লজ্জায় বেন ঢেকে রেখেছে! আজকার কৌতুকের নিমিত্ত এ বাঘ আর কোন কর্মে-রই হবে না, তার লক্ষ প্রদান করা যদি এক রার নিফল হোয়ে পড়ে, তবে সে দিন আর শীকার কোত্তে কখনই তার প্রবৃত্তি হবে না, কখন কখন সপ্তাহ না গেলে সে তার পূর্ব অপমান বিস্মৃত হয় না। একটু পরেই আর একটি কৃষ্ণসার মরদানের মধ্যে চোরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেলেম, একটি কণ্টকময় ঝোপের পাশে পাশে বাস, খেয়ে বেড়াচ্ছিল। রাজা তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রভাবে পূর্বেই তাকে দেখতে পয়েছিলেন, রাজন-বর ইজিত কোত্তেই দোঙ্গরা একটি চিতাবাবুকে, চক্কর তুলি ঝুলে দিয়ে ছেড়ে

দেওয়া হলো। আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, হোজে পাণ্ডাণ কেটে যাচ্ছ, তাই এ ব্যাঘ্রটি নিতান্ত অকর্ষ্য হোয়ে পোড়লো, শীকার কোত্তে তার প্রবৃত্তিই হলো না, তত অসহ্য গ্রীষ্মের তাড়নার হাঁস-কাঁস কোত্তে লাগলো, ষাড় ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, তাতে স্পষ্ট বোধ হলো, একটি শীতল ছায়া পেলেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় লয়। কোথায় রক্তের ছায়া পোড়েছে, তাই দেখবার নিমিত্ত তার উগ্রবৎ বজ্রচক্ষুটি মরদানের চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোচ্ছিল। ঐ সময় একটি শীকারের প্রতি তার লক্ষ্য হলো, শীকার করাই ব্যাঘ্রের অভ্যাস, তাই পূর্বকার ব্যাঘ্রের মত দূর থেকে মস্ত একটা চক্র দিয়ে ধাবা গেড়ে বোসে পোড়লো, সেই মনোহর কৃষ্ণসারটি যে স্থানে চোরে বেড়াচ্ছিল, ব্যাঘ্রটি সেইখানে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগলো। শুন্লেম, প্রথমটির অপেক্ষা এ ব্যাঘ্রটি বয়সেও বড়, চতুরতায়ও বড়, তাই সকলে মনে কোলে, এবার আর শীকারটি মুখ থেকে ফোস্কে যাবে না, বিশেষতঃ এ ব্যাঘ্রটি আজ তামান দিন পেট ভোরে খেতে পায়নি, উদরাগির জালাতে তাকে আজ শীকার কোত্তেই হবে। আমরা পরস্পর বলাবলি কোত্তে লাগলেম, এবার আর এ কৃষ্ণসারটি পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, আমাদের সে অনুমান অবধা হয় নাই, ব্যাঘ্রটি কালের স্বরূপ হোয়ে একটি দ্রুত লক্ষ প্রদান কোলে, দুর্ভাগ্য হরিণটি জীবনে হতাশ হোয়ে একটি বোর মর্শাত্মিক চীৎকার কোরে উঠল, ঐ নির্বাত চীৎকারই বোলে দিলে, এবারকার আড়ম্বর নিফল হয় নাই।

ব্যাঘ্রটি যত পালে, গলায় গলায় রক্ত পান কোলে, উদরজালা যতক্ষণ শান্ত না হোয়ে-ছিল, তার স্নুথের এগিয়ে যেতে কাহারও সাহস হোঁটো না। আমি মনে কোলেম, কৌতুক দেখতেই তো অনেক সময় কেটে গেল, তাঁর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করি কখন? রাজা অস্তকার বনজীড়ায় অতিশয় প্রফুল্লিত

হোয়েছেন, তাঁর পারিষদেরা আগে আগে চোলেছে, আমরা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছি, সকলেই গৃহাভিমুখে চোলেছি। যেতে যেতে ভাবতে লাগলেম, রাজা হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু একটি বড় অশু-  
 খের বিষয়ও আছে, যে রাজার উপর প্রজারা কথ ঠেসসম্পন্ন নয়, সে রাজার রাজত্ব কখন থাকে, কখন যায়। তার স্থিরতা নাই, প্রজারা তাঁকে প চ্যুত করবার নিমিত্ত লালারিত হোয়ে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই সিংহাসন কেড়ে নিতে ক্রটি করে না। আমার মনে কিন্তু এই একটা অভিমান ছিল, 'আমি যদি কখন তত পরাক্রান্ত রাজপদে অভিষিক্ত হই, প্রজাদের সুখ-সৌভাগ্য আমার জপমালা হবে, কিসে তারা স্বচ্ছন্দে, কিসে তারা আনন্দে থাকবে, কিসে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বান্ধবতা হোয়ে মেহদুরিতে আমায় বেড় দিয়ে ঘিরে রাখবে, আমি তারই যত্ন, তারই চেষ্টা কোত্তেম। যত-  
 জন রাজারাজড়া আছেন, তার মধ্যে জয়-  
 পুত্রের রাজা সকলের অপেক্ষা সুখী বোধ হোলো। যদি প্রজার কাছে তত প্রিয় না হউন, কিন্তু তাঁর তুল্য মান-সম্মান আর কারুরি ছিল না। জয়পুত্রের রাজা যেমন বিনয়ী, যেমন নয়, মোগল বাদশারারও তেমন নন, অথচ আবার সকল বিষয়ে এ রাজার যেরূপ আঁটআঁটি, যেরূপ কড়াকড়ি, অস্ত্র কোন রাজারই সেরূপ শক্তিশক্তি, সেরূপ আঁটআঁটি ছিল না। জয়পুত্রের রাজা কখন কাহাকেও অপমান কোত্তেন না, কি অপমানের কথাও বোলতেন না। মন্ত্রিবর আমার খাঁ সমাদর পূর্বক আমার সংবর্দ্ধনা কোলেন। সংবর্দ্ধনা কোরে বোলেন, "আপনার কি জন্তে আগমন হোয়েছে, সেই কথা শুনতে রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন।" আমি বোলেম, "আপনার তুল্য উপযুক্ত পাত্রের নিকট সে কথা বোলতে কোন বাধা নাই, সৌভাগ্যক্রমে আপনার সদৃশ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোলো, এই আমার পরম লাভ। আমি পূর্বে জান-  
 তেন, উজীর বড় আত্মাভিমानी তাতে কোরেই তত প্রতিবাক্য, তত সততা ব্যবহার তাঁর

পক্ষে অনাদরের হোলো না। আমি বোলেম, "আরজজেবের যে উপকার কোরেছে, রাজপুত্র তারই শত্রু হোয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার সাক্ষী দেখুন বীহন খাঁ, সে ব্যক্তির প্রতি আরজজেব চণ্ডালের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরে-  
 ছেন।" এই সকল কথা বোলে আরজজেব যে উপকার স্বীকার করেন না, বরং যে তাঁর উপকার করে, উল্টে তারই আবার অনিষ্ট কোরে থাকেন, সেই কথা প্রতিপন্ন করবার নিমিত্ত অনেক লতাপাতা কেটে, দিয়া পরি-  
 পাতি কোরে রাজপুত্রের কৃত্যত্বতা চিত্রিত কোল্লেন, চিত্রিত কোরে বোল্লেন, "এ উপকার-  
 দাতক রাজপুত্রকে পদচ্যুত কোত্তে হবে, তাই মহারাজেয় সহায়তা প্রার্থনা কোত্তে এসেছি।" উজীরবর আমার মুখে এ কথা শুনে হস্ত সংবরণ কোত্তে পাল্লেন না, তিনি একটু মুচকে হেসে বোল্লেন, "আপনি যখন যে পক্ষে হন, সেই পক্ষেই মহা উৎসাহী দেখতে পাই, তাই আমি হেসেছি, আপনি ক্ষয় হবেন না।" "যখন যে পক্ষে," এ কথা বলবার তাৎপর্য এই, প্রথমতঃ দারা ও আমীর জেম্‌লার পক্ষ হোয়ে আমাদের এখানে শুভাগমন করেন, আমীর জেম্‌লা তখন আরজজেবের অমুসবার নিযুক্ত, এক্ষণে আবার রাজপুত্র সুলতান মামু-  
 নের পরম মিত্র হোয়ে তাঁর দৌত্যভার লয়ে এসেছেন। শাহজাহান বাদশাহের পক্ষ একান্ত উৎসাহী দেখতে পাছি, বৃদ্ধ বাদশাহের প্রতি যে নিতান্ত কুবাবহার হোয়েছে, সে কথা আমি স্বীকার করি, বাস্তবক সে সবই সত্য।" আমি বোল্লেন, "আমার কোন অপরাধ নাই, রাজপুত্রের মধ্যে একটি অতি নিষ্ঠুর, আর একটি অতি অধম, অতি জব্বল, অকৃতজ্ঞ।" উজীর বোল্লেন, "তাই বটে, তা ভালই কোরে-  
 ছেন, যার জন্তে যা কোরেছেন, আমি কিছু সে কথা বিশেষ কোরে জিজ্ঞাসা কোচ্ছি না, যেটা ঘোটেছে, তাই বোল্লেন। রাজা শুনেও অল্প তামাশা মনে কোরবেন না।" আমীরখাঁর মুখে শেষের কথাটি শুনে মনে মনে কিঞ্চিৎ বেজার হোলেম, আমি যে ক্ষয় হোয়েছি, আমীর খাঁ সেটি বুঝতে পাল্লেন, তাই তিনি

ও কথা উল্টে দিয়ে অল্প কথা নে ফেলেন। আমি বড় বীর, আমার বড় সাহস, আমার বড় উৎসাহ, সেই সকল গৌরবই অধিক কোন্ডে লাগলেন। আমি বোল্লম, “হজুর! রাজপুত্র সুলতান মামুদের কাছে গিয়ে আমি কি বোল্‌বো? আপনি কি সাহায্য কোর্বেন?” মন্ত্রিবর বোল্লেন, “বিষয়-কর্মের কথা পোড়লেই বিষয়-কর্মের মত কথা কৈটতে হয়, তাতে চক্ষু-জজ্ঞা কোন্ডে চলে না, আমি আপনাকে স্পষ্ট পরিষ্কার কথাই বোল্‌ছি, শুনুন। যে কার্যের পরিণামে নৈরাশ হবার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্যে সহায়তা কোন্ডে আমি রাজাকে পরামর্শ দিতে পার্‌ব না, শুধু তা নয়, তার পর শুনুন, সুলতান মামুদ যেরূপ অপ্রাজ্ঞ অসাধবান, তাঁর যেরূপ ব্যস্তত্বভাব, তিনি যেরূপ অপরিণামদর্শী, তাতে কোরে কিছুকাল তাঁকে বিজ্ঞতা প্রাজ্ঞতা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাঁর পিতার সমুদয় বেইমামি দোষ, সমুদায় নেমোক্‌হারামি দোষ তাঁতে বর্তিয়েছে, তদ্বির এক্ষণে আরজ-জেরের সঙ্গে আমাদের সম্ভাব চোলেছে, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকার কুমন্ত্রণার চক্র না করি, তবে বোধ হয়, সে সম্ভাব হঠাৎ ভঙ্গ হবে না।”

আমি বোল্লম, “আপনার এ আপত্তি যে প্রাজ্ঞের মত বিচার-সঙ্গত, সে কথা আমি অস্বীকার কোন্ডে পারি না। তবে যে কার্যের ভার নিয়ে এসেছি, আমি যদি তা প্রতুল কোরে না তুলতে পারি, তাতে কোরে আমার হুঃখিত হতে হবে বটে, কিন্তু চেষ্ঠার তো ক্রটি কোন্ডে না, তাই ভেবেই সন্তুষ্ট থাক্‌বো।”

মন্ত্রিবর বোল্লেন, “তা নয়, আমার কথা কিছু আইন নয় যে, অকাট্য হবে, পরামর্শ দিলেই যে রাজা গ্রহণ কোর্বেন, তাও কর্বেন না। আপনার কথা রাজার কাছে উপস্থিত কোর্বো, তাঁর কি রায় শুনতেই পাবেন, আমি ভাতে কোন কথাই বোল্‌বো না।”

মন্ত্রিবরের যে কথা, সেই কাজ। আমার লগ্নে রাজার কাছে উপস্থিত কোন্ডে, রাজা

তখন খাস্‌কাম্‌রায় বোসে আছেন, আমি সুলতান মামুদের পত্রখানি ধরে দিলেম, পত্রখানি পড়বার অগ্র্যেই আমি যে অভিপ্রায়ে রাজদর্শন কোন্ডে এসেছি, চতুর মন্ত্রিবর সেই মর্ম্মকথাটি রাজাকে মুখে অংগত কোরিয়া পত্রখানি খুলে পোড়তে বোল্লেন। রাজা তাঁর প্রার্থনার সম্মত হবেন বোলে, সুলতান মামুদ প্রবৃত্তি দেবার নিমিত্ত অবশ্যই প্রলোভনের কথা জিখে থাক্‌লেন, সে বিরূপ প্রলোভন, পত্রখানি খুলে সেই বিষয় দেখতে বোল্লেন। পত্রখানি পড়া শেষ হোয়ে গেলে রাজা বোল্লেন, “অস্বীকার করবার সময় বাদশা-জাদাদের দ্বিধাদিক্‌জন থাকে না, কথার কথায় সত্য লগ্না আশা দেখিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে এনে তুলে দেন, তবে কথা এই বাদশাহ-পুত্র যে বিষয়ের অস্বীকার কোরে পাঠিয়েছেন, গত রাত্রে আমিও সেই বিষয়টি স্বপ্নে দেখেছি, ঐটি বড় অদ্ভুত আশ্চর্য্য। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কোরে এ কথার জবাব দিতে পারি না, আগে একটু দীর্ঘস্থির হোয়ে বিবেচনা কোর দেখি, তার পর যা হয়, বোল্‌বো। সুলতানসরমস্তককে এ কথা জিজ্ঞাসা কোন্ডে হবে, তাঁর কি মত, শোনা যাক। সুলতানসরমস্তক একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ দৈবজ্ঞ, এক্ষণে তাঁর তুলা প্রবীণ লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্ত্রিবর! তাঁকে একবার ডেকে পাঠাও।”

মন্ত্রিবর বোল্লেন, “হজুর সকলি বিন্মত হয়েছেন, সে ব্যক্তি যে মহারাজের নিকটে বিদায় হোয়ে আগরায় চোলে গিয়েছেন।”

রাজা বোল্লেন, “তবে আগরাতেই লোক পাঠিয়ে দাও, তাঁকে একবার সঙ্গে কোরেই নিয়ে আসুক।”

আমি বোল্লম, “হজুর! যদি যাপ হয় তো বলি। মহারাজ যার তত গৌরব কোচ্ছেন, সে ব্যক্তি তো দেখতে খরীকার! প্রাজ্ঞের মত সঙ্কেত নাড়ি আছে, কপালটো উঁচু বন ঠেলে বেরিয়েছে, মাথায় একটা আবু মানি ধরনের কাল মধমলের টুপী, সেই ব্যক্তি তো!”

রাজা বোলেন, “হাঁ, সেই ব্যক্তি, পথে বুকি তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে?” আমি বোলেন, “সাক্ষাৎ হয়েছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আচার্য্য মৃতের দলে পরিগণিত হয়েছেন।

রাজা বোলেন, “কি! অলুনসরের কাল হয়েছে? তিনি মরেন নি, বেঁচে আছেন, এ কথা আমার যে শোনাতে পারবে, তাকে আমি লক্ষ টাকা বকসিস কোরবো, আচার্য্য যখন এখান থেকে চোলে যান, তখন তো তাঁর কোন অসুখই ছিল না, তখন তাঁর বুদ্ধিবৈচল্য ও বৈলক্ষ্য হয় নাই, তবে কেন হঠাৎ মৃত্যু হলো?” যেকল্পে দৈবজ্ঞের জীবন অবসান হয়, সেই দুঃখের বৃত্তান্তটি রাজাকে অবগত করালেম, রাজা শুনে ক্রোধে অগ্নি-অবতার হোলেন, মহাবাজ চোমকে উঠে বোলেন, “দেওয়ানার কতকগুলি পশুবৎ পাষাণ চোয়াড় তাঁকে বারুদ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে? নিষ্ঠুর চণ্ডালেরা দৈবজ্ঞবরকে একপ্রকার তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে! আমি তো বেঁচে আছি, এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার প্রতিফল পাবেই পাবে, আমার খাঁ! এ গ্রামের অভাবত: কুড়িজন পাষাণের মাথা আমার এনে দাও।”

উজীর বোলেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ! সম্প্রতি কিছু সন্ধি হয়েছে সে গ্রামটি ঠাকুর জোয়াল সিংহের অধিকারভুক্ত হয়েছে, জোয়াল সিংহকে এ সময় অবমাননা কোলে প্রাজের মত কাজ হবে না।” রাজা বোলেন, “সে কথা সত্য, পাষাণ চোয়াড়দের অদৃষ্ট ভাল, তাই এ ব্যক্তি আমার হাত থেকে বেঁচে গেল। আমার খাঁ! আমি তোমার আজ্ঞা কছি, জোয়াল সিংহকে একখানি পত্রে লিখে পাঠাও, ‘এ কাজ অতি অশ্রম, অতি গর্হিত হয়েছে,’ এ কথা লিখে-বিচারের প্রার্থনা জানাও।”

উজীর বকের উপর কোণাকুলি হাত বেঁধে অতি নত হয়ে রাজাজ্ঞা শিষ্টর বহন কোলেন, রাজা আচার্য্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত শুনে যার পর নাই অতিশয় কাতর হোলেন, তাই সে দিনকার মতন আমাদের কথাবার্তা বন্ধ

হলো, আমরা চোলে এলেম, আমি আমার স্থানে-গেলেম, উজীর জোয়ালসিংহ ঠাকুরকে পত্র লিখতে বোসলেন, ঐ পত্রের উত্তর এসে পৌঁছলে রাজা আমার পুনরায় ডেকে পাঠাবেন, উজীর আমার এই কথা অবধারিত কোরে বোলেন। এই অবকাশে আমার প্রাণপ্রতিমা দেলজানের পবিত্র কবরটি চোলে দর্শন কোলেম, যুবতীকে উদ্ধার কোতে গিয়ে যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দর্শন অবলোকন হোতে হোয়েছিল, কবরটি দর্শন কোরে সেই নির্দয় ঘটনাগুলি একটি একটি কোরে স্মরণপথে সমুদিত হোয়ে আমার হৃদয় কম্পিত কোরে তুলে, তাই মনের বেগ সংবরণ কোতে না পেয়ে ‘কবরের’ উপর দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে কাদতে লাগলেম, বোধ হয়, আমি অনেকক্ষণ ধোরে কেঁদেছিলাম, কেন না, আমি যখন পুরাতন জয়পুরের সর্বাংগেতে ফিরে এলেম, তখন প্রায় অন্ধকার হোয়ে এসেছে, এসে দেখি, অনেকগুলি রাহাগির রাজের মতন আহাতিদি কোরে মাদুর বিছিয়ে বোসে আছে। আল্লা মহল করুন, এই বিনয়বাক্য বোলে, অতিন ও হোরে আমি তাদের সেলাম কোলেম, তারাও আমার ভদ্রতা পূর্ব্বক একটি পাল্টা সেলাম কোলে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোলে, “কি আশ্চর্য্য! যে চাকরটি ভয়ে ধবুধব্ব কোরে কাঁপছিল দেখলেম, তাদের মুনব কোধায় গেল?” আর এক ব্যক্তি বোলে, “হয় ত সে ব্যক্তি বৃদ্ধ আত্মকরের মায়া! মস্তুর প্রভাবে পুড়ে ভস্ম হোয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় ব্যক্তি বোলে, “দোহাই আল্লার! সেই দিগভ্রান্ত, মতিচ্ছন্ন চাকরটির মুখে শুনে-লেম, গ্রামের সমুদায় লোক মুটে সেই বুড়ো ভণ্ডকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ী-শুদ্ধ রসাতলশায়ী কোরে দিয়েছে, শুনে আমি কতই হাসলেম।”

চতুর্থ ব্যক্তি বোলে, “সে ব্যক্তি কি মজার দৈবজ্ঞ! পরের অদৃষ্ট শুণ্ডে সে পটু ছিল, নিছক নিজের বেলায় আত্মল কোমকে বেতো। যে ব্যক্তি নিজের অদৃষ্ট শুণ্ডে জানে না, সে আবার পরের অদৃষ্ট কোন্ মুখে শুণ্ডে

যায়, এমন তো বেহারাও দেখিনি, আমার তো বিবেচনা হয়, সে ধূর্ত বেটার উপযুক্ত শাস্তিই হোয়েছে :

প্রথম ব্যক্তি বোলে, “এখানকার মহারাজের নাকি ঐ দৈবজ্ঞের প্রতি বড় আস্থা ছিল।” অপর এক ব্যক্তি বোলে, “তা হবে, এ কথা বিচিত্র কি, হয় ত একটা যৎসামান্য বিষয় দৈবাৎ বোলতে পেরেছিল, তাই সভাস্থ লোক মনে কোরেছে, তার মতন তালেবর আর কেউ ছনিয়াতে নাই।”

আমি বোলেম, “আমিও তাঁকে বিজ্ঞ বোলে জানুতাম।” ঐ কথা শুনে সকলে, আমার দিকে ফিরে বসিলো।

একটি রাহাগির জিজ্ঞাসা কোলে, “দোস্ত ! তুমি কি সে বৃদ্ধটিকে কখন চক্ষে দেখেছ ?” আমি বোলেম, “হাঁ, দেখেছি। একটুবার মাত্র দেখা হয়, আর একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে আনন্দ লাভ কোভেয়, কিন্তু দেওয়ানার পশুবৎ পায়ণ্ড অবতারদের নিমিত্ত সেটি অদৃষ্টে ঘটে উঠিলো না।”

প্রথম বক্তা বোলে, “স্বামরা শুনেছি, তিনি বৃদ্ধ অশ্লিল চেয়ে উঁচু ছিলেন না, সে কথা কি সত্য ?”

আমি বোলেম, “দোস্ত সকল ! সে সর্বৈব মিথ্যা, খাঁরা এ কথা বোলেছেন, হয় তাঁরা বহুত কোরে বোলেছেন, নয় আসে তাঁদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই বুদ্ধির ঠিক ছিল না। যে প্রাজ্ঞবরের প্রসঙ্গ হোচ্ছে, তিনি আকার প্রকারে প্রায় আমাদেরই মতন, তবে কিঞ্চিৎ মাথায় খাটো ছিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। প্রুকাণ্ড দাড়ি ছিল, তিনি অতি শযীর, অতি অশাস্ত ছিলেন, তাঁর স্বভাবও অতি পবিত্র ছিল, তেমন আপনারা কখন দেখেন নি।”

ঐ কথা শুনে পায়েরা বোলে উঠিলো, “হা বারিক্ আদ্বা ! তবে কি অলীক কথাই আমাদের গলায় ভিতর ঠাসে দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে। তবে কথা কি, ঐ গ্রামের তিনটি লোক তাঁর কাছে অদৃষ্টের বিষয় জানতে যায়, তাঁদের নাকি বাকরোধ হোয়েছে, এ কথা কি সত্য ?”

আমি বোলেম, “আমিও সে কথা শুনেছি, হুর্ভাগ্য মহাপুরুষের অশ্রুতা হবার কারণই সেই। যত্নপিত্তাৎ বাকরোধই হয়ে থাকে, সে দোষ কিন্তু সে মহাপুরুষের নয়, তিনি কেন কুচক্র কুমন্ত্রণা কোরে তাদের শাসন্থ অবরোধ কোন্তে যাবেন, তারা বোঁবা হোলো তাঁর কি লাভ, তবে এই যাত্রা বোঁবা তারা হয় তো হাবার মত বোঁকা, তা তাদের রক্ষনা অবশ হোয়ে পড়েছে।”

একটি রাহাগির বোলে, “ভাল, তাই ঘন হলো, সে ব্যক্তিকে দিক্‌ভুলের দ্বার ফুল্‌শো-চোকো হোয়ে ঘোড়ার চোড়ে যেতে দেলেম, সে আমাদের বোলে, সেই দৈবজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা অবধি তাঁর মনিবের মেজাজ বিগুড়ে গিয়েছে, তার চাল-চলনও নাকি কেমন এক প্রকার খাপসব হোয়ে পড়েছে।”

আমি অমনি বোলে উঠে বসে, “সে বেটা অতি আত্মন্থক, অতি নান্দান, সে উগ্রাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হচেছি।” সে আমারই চাকর, তারই ফাজিল চাপাটির দোষেই সেটি ভবিষ্যদ্বক্তার অকাশ্রুতা হোয়েছে, সন্দেহ নাই।” ঐ কথা বোলে যে যে ঘটনা হোয়েছিল, সমুদায় অবগত করালেম। আমি যে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ কন্তে পেলেম না, সেটা আমার পক্ষে একটি বিড়-ঘনা বোলতে হবে, তাই বিস্তর ছাপ প্রকাশ কোন্তে লাগলেম।

আর একটি রাহাগির বোলে, “এটা ছুখের বিষয় বটে, এতে কার না রাগ হয়, কিন্তু আমার মনে ভয় হোচ্ছে, তোমার চাকর যেরূপ পোঁয়ারতামি কোন্তেছে, সে ভোগা-ভোগ হয় তো তোমাকেই বা ভুগতে হয়। আপনি নিশ্চয় জানবেন, গ্রামের লোকেরা সকল দোষ চাকরের স্বন্ধে দিয়ে আপনারা অন্তর হোয়ে দাঁড়াবে, রাজা শুনে মনে কোরবেন, তুষ্টিও তার চক্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলে, তোমাকে তিনি দোষী কোরবেন।”

আমি বোলেম, “তা হোলে অবিচার হয়, আমি যত অপরাধী, গুরুদেবই তা জানেন,



আমি তঁাকে গুরু বোলেই জানুতাম, তাঁর আদেশগুলিও গুরুবাক্যের দ্বারা শিরে বহন কোরেছি, আমি কখনই তাঁর হুজু কামনা করি নাই, আল্লা তার সাক্ষী আছেন।” রাহাগির বোলে, “সে সবই সত্য বটে, কিন্তু চাকরের অসৎ আচরণের নিমিত্ত মুনিবদের প্রায়ই দায়ী হোতে হয়, রাজা তারে জবরদস্তি কোরে দায়ী করেন। যে স্থলে রাজারা ক্রুপিত হন, বিশেষতঃ চাকর যদি গুরুপূর্ণ কোরে উপস্থিত না থাকে, যে স্থলে তাঁদের ক্রোধ প্রায় মুনিবের স্বক্কেই পতিত হয়। তাই আপনাকে বোলছি, আপনি যত শীঘ্র পারেন, জয়পুর থেকে প্রস্থান করুন, নচেৎ চাকরের অপরাধের নিমিত্ত রাজার গুরুকোপে পড়ে প্রাণে মারা পোড়বেন।”

আমি বোলেম, “আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, নচেৎ আপনার কথামত এখান থেকে চোলে যেতাম, এক্ষণে তা তো পারি না, স্মৃতবাং রাজার অহুগ্রহের উপর, তাঁর বিচারের উপর আমার আত্মসমর্পণ কোন্তেই হোয়েছে, তদ্বির আর উপায় কি? রাজার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হোয়েছে।” আমার মুখে এই কথা শুনে রাহাগিরেরা আমার তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মনে কোলে, তবে আমি একজন মস্ত বড় লোক হব, তার পর তারা কানে কানে ফিস্ ফিস্ কোরে কি বলাবলি কোন্তে লাগলো, আমি তার এক কথাও শুন্তে পেলেম না।

এই সময় আমার ছয়জন হুকরা উপস্থিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোলে, চিঠি-পত্র লয়ে তাদের কোথাও যেতে হবে কি না। আমি বোলেম, “না, কোথাও যেতে হবে না, তবে এক জন কাল প্রাতে আমার কাছে যেন হাজির থাকে। এই আলাপের পর রাহাগিরেরা সকলেই, “হজুর, ধোদাবন্দ, মহারাজ,” এইরূপ সম্বোধন কোরে আমার গৌরব কোন্তে লাগলো, তাদের মধ্যে একজন রাজদরবারে একটা উপকার কোরে দিবার নিমিত্ত বিস্তর অহুরোধ জানালে, সে ব্যক্তি অতি কাতর হোয়ে, অতি নম্র হোয়ে আমার

বিস্তর উপাসনা কোন্তে লাগল। আমি বোলেম, “উপকার কোরে দিতে আমি এখনিই পাতেম, তবে কথা কি, আজকাল একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি, রাজাও এক্ষণে সেই বিষয় লয়ে ভারি আন্দোলন কোচ্ছেন, আপাততঃ তাঁর আর অস্ত্রদিকে মন নাই, তবে তোমার বিষয়টা কি, একবার শুন্তে চাই।”

এক ব্যক্তি হোলে, “আমরা কাশ্মীরের সওদাগর, বেহার নামে সে দেশে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে আমাদের বাস, রেশম, শাল এবং অল্প অল্প বাণিজ্যদ্রব্য লয়ে এ দেশ দিয়ে চিরকাল যাতায়াত কোরে থাকি, মাশুলও যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে থাকি। এক্ষণে মাশুল-দপ্তরের দারোগার বিস্তর মাশুলের দাবি কোচ্ছন, এটি পূর্ব-নিয়মের বহির্ভূত, বিশেষতঃ তত শে-ষণ কোলে আমরা তো একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যাই। বোধ হয়, রাজা এ জবরদস্তি কর আদায়ের বিষয় অবগত নন, এরূপ অত্যাচার চাওয়া বোধ হয় তাঁর অহুমতিক্রমে হোচ্ছেনা, তাই আমাদের

যদি এমন কোন বন্ধু পাই, তাঁরে উপলক্ষ্য কোরে কার্পবৃন্দাজের দৌরাছোর বিষয় রাজদরবারে উপস্থিত করি।” আমি বোলেম, “তবে একখানা দরখাস্ত লিখে রাজদরবারে নিয়ে যাও।” সওদাগর একটু হেসে বোলে, “হজুর! দরখাস্ত লিখে দরবার করা যে কি কষ্ট, কি ব্যয়, তা বুঝি আপনি অবগত নন, আপনারা রাজারাজড়াদের নিকাট বাস করেন, প্রজার হুংখ কি কোরে জানুবেন, দরখাস্ত কোরে রাজাদের কাছে হুংখ জানানো প্রজার পক্ষে যে কি দুঃস্বপ্ন, কি কঠিন ব্যাপার, আপনি তা চিন্তা কোরেও অহুতব কোন্তে পারেন না। প্রথমতঃ মুন্সির কাছে যেতে হয়, শুধু দরখাস্ত লেখাই তাঁর কাজ, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তিনি কেবল রাজার গৌরব, রাজার বশ, রাজার মহিমা কীর্জন কোরে দরখাস্তের ভূমিকা পালন করেন, তার জন্যে প্রতি কথার মূল্য যত দিতে হবে, তা ধরা আছে। তার পর দ্বিতীয় মুন্সির

কিছু উপস্থিত হোতে হয়, তিনি দুঃখের সারমর্মটি লিখে দেন, কিন্তু তাঁর দর বড় চড়া। এই কোন্টেই তো চার দিন কেটে যায়, কষ্ট ও ব্যয় বা হবার তা তো হয়, এতদিন মুন্সিদের নফর-চাকরদেরও দস্তরিখরূপ কিছু কিছু পূজা দিতে হয়, না দিলে ক্ষা নাই, এমনি একটি শক্ত মোড়া দিয়ে মুন্সিবের কাম ভারি কোরে দেয় যে, তাতে কোরে সব পরিশ্রম পণ্ড হোয়ে যায়। এক্ষণে দরখাস্ত পেস্ করবার সময়, এ বড় মহা পাপ, এ বড় কঠিন ব্যাপার দরজায় পাহারাওয়ালারা, চোপদার, জমাদার, তার পর দাওয়ান, নারেবদাওয়ান, তার পর স্বয়ং উজির প্রধান, এঁহাদের মধ্যে যার যেরূপ পদ, তাঁর পেট সেইরূপ মোটা কোন্টে হবে, নচেৎ দরবার করা চোলবে না, সব ভোগি হোয়ে যাবে। তাও বা হোক, যেন খরচপত্র করাই গেল, কিন্তু দরখাস্তখানি রাজার চক্ষে পড়া না পড়া অদৃষ্টের কথা, অদৃষ্ট ভাল হলো তো রাজার চক্ষে পোড়লো, নচেৎ কোথায় এক পাশে পোড়ে থাকবে, তার ঠিক নাই, তাই রাজদরবারে তত টাকার, তত কষ্টের কুকিতে না গিয়ে তার চেয়ে বরং ম'শুল-দপ্তরের দারোগারা ডইয়ে নেয়, সেও ভাল, তাতে আমরা রাজি আছি, তাতে তত কষ্ট, তত ব্যয় হয় না, অথচ আবার লীজ লীজ ছুটিও পাই।”

আমি বোল্লেখ, “রাজদরবার করা যে মুখের কথা নয়, তা আমি মানি। আমি যদি কোন দেশের রাজা হোতাম, তবে প্রজাদের কখন কষ্ট পেতে দিতাম না।” সওদাগরেরা আপনাদের মধ্যে বোল্লে লাগলো, “ছহর কি বোল্ছেন শুন, বাঃ বাঃ। কি এন্দাকের কথাই বোল্ছেন, চেহারাখানিও যেন আমারের মতন।” লগ্নমত খোসামোদের কথা বোল্লে মতলব হাঁসিল অবশ্যই হয়, মুখে লোকের ঘুণাই করুক, আর হতপ্রজাই করুক, তোযামোদের তার বড় মিষ্ট, সে তার কেউ ভুলতে পারে না, তাই আমি সওদাগরেরদের পক্ষ হোয়ে রাজদরবার কোন্টে প্রতিজ্ঞিত হোলো, তারা আমার বোকা বোকা সাধুবাদ মাখার

চাপিরে দিতে লাগলো, সুবস্তুতি কোরে কত যে আমার গৌরব বাড়ীতে লাগলো, তা এক মুখে বোলে ফুরতে পারিনে, শুনে আমার যেন বাকরোধ হোলো। পরদিন প্রাতে উজিরের কাছ থেকে একটি হুকুম এসে আমার ডেকে নিয়ে গেল, উজীর আমার সংবর্ধনা কোরে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা একখানি পত্র ছুটি আদর্শ দিয়ে ধোরে আছেন, আমার দেখে বোল্লে, “দৈবজ্ঞের নিপাতের নিমিত্ত তোমাকেই বাহবা দেওয়া উচিত।”

আমি বোল্লেম, “কি! মহারাজ, আমি! আল্লা তা না করুন, দৈবজ্ঞের মৃত্যুর জন্য আমি যত দুঃখিত, বোধ হয়, মহারাজ তার অর্ধেকও দুঃখিত হননি, তাঁর মৃত্যুতে আমার যেন মহা গুরুনিপাত হোয়েছে, আমি তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি কোরেছি।” রাজা বোল্লে, “তাঁরে মেরে ফেলবার নিমিত্ত তোমার চাকর কি পরামর্শ দিয়ে গ্রামের লোককে নাচিয়ে দেয়নি? এ কথা সত্য কি মিথ্যা?” আমি বোল্লেম, “সে কথা খুব সত্য, সেই গুরুপাপের নিমিত্ত সে পাষণ্ডকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়েছি, যদি ক্ষমতা থাকতো, তার মাথাটা তখনি কেটে ফেলে দিতাম।”

রাজা তখন ভাবি বেগেছেন, ঐ কথা শুনে বোল্লে, “এত বড় গুরুতর কার্যটি অজ্ঞাতে তোমার অমতে কি কোরে হোলো, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, তোমার যখন এদিকে আসা হয়, তোমার উচিৎ কথাযোগ্য রেশেলা, তদ্বির বিজ্ঞ দেখে কতকগুলি ভাগ ভাগ মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে আসা, তাদের উপর তোমার কর্তৃত্ব থাকাও অপ্রাকৃত। তোমার মতন দীন-হুস্বী ইতার রাজদূত আমার নিকট কেন পাঠান হয়েছ, একরূপ দীনদর্শী কোরে পাঠাবার মর্ম বুঝতে পাচ্চিনে, আমি না সে দূতের উপরেই সন্দেহ, না তার আসবার অভিপ্রায় শুনেই সন্দেহ, আমার কথা এই, সুলতান মায়ুদ যদি বারান্তর আমার অপমান করেন, তবে তাঁর পক্ষে মজল হবে না, তাঁর বড়বজ্ঞের কথা আরদজ্জবকে লিখে অবগত করাবো।”

রাজার ঐ গুরুজ্ঞেয় দেখে আমার আর মুখ খুলতে সাহস হোলো না । পূর্বে পূর্বে যে সকল দৌত্যকর্মের ভার লয়ে এসেছিলেন, তাতেও যেমন অপদস্থ হতেছি, এবারও তেমনি অপদস্থ হলেম, তাই আমি অতি বিষন্ন, অতি শ্রান হয়ে পাঠালয়ে চোলে এলেম, সেখানে বস্তুবাক্ষবেরা । বিশেষতঃ মহাজনেরা আমি কতকণে কিরে যাব বোলে হাঁ কোরে পথ চেয়ে দেখছিলেন, আমার দেখে তাঁরা সকলে একেবারে বোলে উঠলেন, “কিরূপ প্রভুল কোরে এলেন বলুন ।” আমি মহাজনেদের বিষয় এককালীন ভুলেই গেছিলেম, যখন রাজবাটীর সীমা প্রায় ছাড়িয়ে এসে পৌড়েছি, তখন তাদের কথা স্মরণ হোলো, যদি পারকও স্মরণ হতো, তখাচ সে কথা উত্থাপন কোরে পাশ্বে ননা, রাজার মেজাজ তখন ভাল ছিল না ।

আমি বোলম, “বন্ধুসকল ! বড় আক্ষেপের বিষয়, আমার চাকর সলিমানকে বাহবা দাও, তারই আত্মশ্রুতির জন্ত তোমাদের দরবারে সুপ্রভুল কোরে তুলতে পাল্লেখ না, দৈবজ্ঞের মৃত্যুতে রাজা রেগে আঙুন হোয়ে গেছেন, তোমাদের কথা কি, আমার নিজের দরবারও শুনলেন না, ‘শুনতে পারবে না,’ এই অপমানের কথা বোলে বিদায় কোরে দিলেন, সে সময় তোমাদের কথা উত্থাপন কোরে ষাট মিনিট চূড়ান্ত হোতো, তাতে কোরে তোমাদের পক্ষে হানি ভিন্ন লাভের প্রত্যাশা কিছুই ছিল না ।” গরিব মহাজনেরা ঐ কথা শুনে মন্তস্তভদের ভার অবসর হোয়ে পড়লো, বৈরাগ্যমেঘে তাদের মুখ চোক ঢেকে কেলে, সলিমানকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি কোরে লাগলো, সলিমান তখন আগরার, সে যে কি অপকার কোরে গিয়েছে, সে তা যথেষ্ট জানে না ।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

খাজিল তাঁতি তাঁত বনে, কাল কোলে  
এঁড়েক কিলে ।

জয়পুত্র, নসীরাবাদ, আজমির, নিমাত প্রভৃতি স্থানে বতাই পরাধু্য হই না কেন, অপর অপর রাজারাজড়ারা, তদ্বির বিস্তর ঠাকুর-বংশীরেরা বতদুর সখ্য, রাজপুত্র সুলতান মামুদের সহায়তা কোত্তে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলেন । পূর্বের আদেশ অনুসারে ধন-গড়গড়ে রাজপুত্রের নামে চিঠি লিখে খাউড়ে রওনা কোরে দিলেম, তার পরেই আমিও রওনা হোলেম, আমার সঙ্গে দুই জন মাত্র হুকুরা ছিল, নির্ঝিরে সেই গুপ্ত উপত্যকার পৌছিলেম, সঙ্কেতকথা উচ্চারণ করায় বখারালী ষা কন্দেরের মধ্যে আমার আহ্বান কোলেন, তিনি এ পর্যন্ত শয়াগত হবই ছিলেন, কলমবেগের সঙ্গে লড়াইতে যে ক্ষত প্রাপ্ত হন, সে ক্ষত অতাপি সুন্দররূপে শুদ্ধ হয় নাই, আমার দেখে বোলেন, “তুমি বেশ সময়ে এসেছো, অন্য রাতে রাজপুত্রের আসবার কথা আছে, কোথায় কিরূপ প্রভুল কোরে তুলতে পেরেছো, তুমি আপন মুখেই তাঁকে বোলতে পারবে । জয়পুত্র হাতছাড়া হয়েছে শুনে রাজপুত্র মর্মান্তিক দুঃখিত হয়েছেন, তোমার দোষেই যে হাতছাড়া হোয়েছে, এইটিই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ কলক হতে যাতে মুক্ত হতে পার, তার চেষ্টা কোরো ।” রাজার প্রিয়পাত্র দৈবজ্ঞের মৃত্যু, আমার চাকরের মৃত্যু, ইত্যাদি ব্রতান্ত সবল আত্মপূর্কিক সেরসাহেবের নিকট ব্যক্ত কোলেন না, ব্যক্ত করবার আশ্যক ছিল না বোলেই তাঁর কাছে সকল কথা ভেঙ্গে বোলেন না । রাজপুত্র কতকণে আসবেন, এই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগলেম, মনে কোলেম, তাঁর কাছেই একটি একটি কোরে সকল কথাই খুলে বোলবো । রাজি যখন দুই প্রহর, সেই সময় সুলতান মামুদ এসে উপস্থিত হোলেন, আমার দেখে বেশ সমায়

কোলেম, জয়পুরে যে কার্য সিদ্ধ হয় নাই, তার ক্ষত বিস্তার আক্ষেপ কোন্ডে লাগলেন। জয়পুর এবং জয়পুরের নিকটবর্তী যে যে ঘটনা হয়েছিল সে সমুদয় বৃত্তান্ত রাজপুত্রকে অবগত করালেন, রাজপুত্র শুনে ছুঁতাপা সন্নিমানের উপর ভারি বিরক্তি প্রকাশ কোন্ডে লাগলেন। আমি বোলেম, “শুদ্ধ তারই দোষে যে সেখানকার যাত্রা নিফল হয়েছে, তা নয়, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বে মন্ত্রিবর আশীর খাঁ আমায় স্পষ্টই বোলেছিলেন, সাহায্য কোন্ডে রাজাকে তিনি কখনই পরামর্শ দেবেন না।” রাজপুত্র বোলেম, “রাজার সেই স্বপ্ন, সে কথা কে বোলতে পারে, সে দৈবজ্ঞ যদি তৎকালীন উপস্থিতি থাকতো, সে ব্যক্তি সে স্বপ্নের অর্থ বিক্রপ সংস্থাপন কোন্ডে, তাই বা কে জানে, হয় ত তাঁর বাগ্ম্য করবার শুণে আমাদের মঙ্গলই হতো, তা রাজা তাঁর উজ্জীরের কথা কখনও শ্রুতেন না।” রাজপুত্র বোলেম, “সাদক! যে সকল লোক আমাদের অষ্টগ্রহের ঘেরে থাকে, তাদের মুখতা দোষে আমাদের বিস্তার প্রমাদ, বিস্তার বিষ ঘোঁটে থাকে, তারা যে কখন কি বিপদ আমাদের ক্ষক্ষে এনে ফেলে দেয়, সেটি কারুরই জানবার সাল্য নাই। যাই হোক, সে ক্ষত আমাদের ভীত হবার আবশ্যক করে না, আমরা এক্ষণে চৌদ্ধ হাজার সৈন্ত সংগ্রহ কোরেছি, পিতার লঙ্ঘনের জায় আমরা তত পুষ্ট নই সত্য, কিন্তু তারা যখন গাফিলি হয়ে বেথবর থাকবে, সেই অসাবধান সময়ে আমাদের এই অল্প সৈন্ত দ্বারাই রহৎ কাণ্ড নিষ্পন্ন হোতে পারবে।” আমি বোলেম, “সে কথা সত্য, তবে এইমাত্র ভয়, সেই বেথবর সময় খুঁজে পাবো না, সেটি আমাদের হাতে লাগবে না, যে চৌদ্ধহাজার সৈন্তের কথা বোলছেন, তারা যে সকলেই আমাদের পক্ষ, তাও নয়, অনেকে শুধু কথায় মাত্র বদ্ধ, অহরেক আবার তলুওয়ার ধোরেও মিত্রতা সঙ্গমাণ কোরবে।” বখারালী বোলেম, “আমার পরামর্শ এই, যেমন রমজান শুরু হবে, সেই সময় আর কালবিলম্ব না কোরে, একেবারে দিল্লীর

কেলা দখল কোরে বসি যাবে, আমাদের লঙ্ঘনের কাঙ্ক্ষা কুড়ে সত্য, কিন্তু যথার্থী কোন্ডে তাদের আলস্য নাই, হয় ত কোন দিন কার কানে ভুলে দেবে, অননি ছাড়া হাডাতে বাড়ি পোড়বে, তখন সব এলিয়ে যাবে।” রাজপুত্র বোলেম, “তবে রাজাদের চিঠি লেখা যাক, তাঁরা যে বিষয় স্বীকার কোরেছেন, তা এক্ষণে পূর্ণ করুন। বিস্তার অন্তর্য বিনয় কোরে এ কথাও লিখে দেওয়া যাক, তাঁরা যেন যথাসাধ্য গোপনে গোপনে দিল্লীতে লঙ্ঘর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁদের সঙ্গে মেইগানেই সাক্ষাৎ কোরবো। দুর্গের ভিতর আমিই সকলের আগে মাথা বাড়িয়ে দেবো, বখারালী! দুর্গ অবরোধ করবার ভার তোমার উপরেই রইলো, সাদক! তোমায় কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গেই কেলায় ভিতর প্রবেশ কোরে হবে, শাজাহান বাদশাহের কাছে তুমি অপরিচিত নও, তোমায় উপস্থিত দেবে তার অনেক সাহস হবে, তাই তোমার আবিষ্কার যন্ত্রের উপর তাঁর রাজপুত্রের সমর্পণ কোরেম।” যে সকল প্রধান প্রধান কর্তৃপক্ষেরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রাভজনকেই একটি একটি ভার নির্দিষ্ট কোরে দিলেন, এমন কি, আমাদের মানস অনায়াসেই পূর্ণ হোতে পারতো, কিন্তু একটি ব্যক্তির জন্তেই সে মানস অসিদ্ধ হলো না।

আমি বোলেম, “কেলায় ফটক তো খোলা পাওয়া যাবে? যে ব্যক্তি থুলে দিতে চেয়েছে, তার কথার উপর তো নির্ভর করা যেতে পারে?”

রাজপুত্র বোলেম, “আমি তা পারি।”

আমি আর বিরক্তি কোলেম না, ধর্ম্ম-ঘাতিনী পাপীয়সী নুরমহলের উপর যখন এত দূর বিশ্বাস করা হয়েছে, তখন পরিণামে সুপ্রভুল হবার পক্ষে আমার মনে বড় সন্দেহ হতে লাগলো। ভাবলেম, ভিতরে ভারি একটা দুঃখভিক্ষা তার আছেই আছে। নুরমহল ফটক থুলে দিতে পারে সত্য, কিন্তু যেমন আমরা কেলায় মধ্যে প্রবেশ কোরবো, ঐ ফটক অমনি তখনি বন্ধ

কোরে দেবে, সে বন্ধ একালে আখেরের মত হবে।

রাজপুতানা থেকে আনুজালা পৌছিয়েছে শুনে আমরা তখনি কচ কোরে দিল্লীতে চোলে গেলেম। সহরের ভিতর প্রবেশ কোত্তে কেউ আমাদের নিষেধ কোলেন না, সুলতান মামুদ নাকি সেনাপতি হয়ে আগে আগে চোলেছেন, তাই নগররক্ষকেরা মনে কোলেন, হয় ত আরজজেবের অনুমতিই আছে, রাজপুত্র সহরের মধ্যে সৈন্ত লেয়ে প্রবেশ কোত্তে পারবেন, কি রাজপুত্র বোলে নিষেধ কোত্তে হয় ত তাদের সাহসই হলো না। ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোরে বখারালী গস্তীরমুর্তি গোয়ে প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র হোয়ে সারবন্দী খাড়া হোতে ছকুম কোলেন, তখন প্রহরীদের মনে সন্দেহ হতে লাগলো, তারা মনে কোলেন, তবে এর মধ্যে অবশ্যই কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে, তাই তারা তলওয়ার ছাড়লেন না। আমাদের লোকেরা কিন্তু তাদের হাত থেকে বন্দুক ও তলওয়ারগুলি মুচড়িয়ে কেড়ে নিলে, কেড়ে নিয়ে, তাদের হাতে পায় বেঁধে প্রহরীদের দার ঘে ঘর, তারে সেই ঘরে আটক কোরে রেখে দেওয়া হলো। কেল্লার ফটকের কাছে পৌছে বখারালী ঐ ফটকের প্রহরী হোলেন, সুলতান মামুদ ঘোড়া থেকে নেমে দরজার চার বার আঘাত কোলেন, ছোটো কাটাদরজা খুলে গিয়ে নূরমহল দর্শন দিলে, এই লক্ষ টাকা তার হস্তে সমর্পণ করা হলো, অমনি বড় ফটক খুলে গেল, রাজপুত্র সুলতান মামুদ একশত বলবান লস্কর সঙ্গে লোয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ কোলেন, আমি আর একশত লস্কর লোয়ে কেবলমাত্র তাঁর পশ্চাদ্গামী হয়েছি, এমন সময় দেখলেম, নূরমহল কেল্লার ফটক বন্ধ কোত্তে গোপনে ইজিত কোলেন, আমি অমনি দাগাবাজি দাগাবাজি বোলে উর্জ্জ্বাসে চীৎকার কোত্তে লাগলেম, ঐ চীৎকার শুনে রাজপুত্র আর অগ্রসর না হয়ে যদি ফিরে এসে পালিয়ে প্রস্থান করেন তো ভাল হয়, সব দিক রক্ষা পায়, কিন্তু সেটি ঘটে

উঠলো না, চক্ষের নিম্নেই একটি প্রকাণ্ড বিরাট ফটক কনকন শব্দে আমার পায়ের কাছেই পোড়ে বন্ধ হোলো, রাজপুত্রও অমনি জন্মের মতন আমার দৃষ্টির বিহীন হোলেন। আর এক পা বাড়ালেই সে দুর্জয় বৃহৎ ফটক-চাপা পোড়ে চূর্ণ হয়ে যেতেম, কিম্বা আর চারি পাঁচ পা অগ্রসর হোয়ে বেলায় মধ্যে প্রবেশ কোলেন নূরমহলের দাগাবাজিফাঁদে গেরেস্তার হয়ে পোড়তেম, আমার অদৃষ্ট ভাল, তার কালফাঁদ থেকে দৈববলে উদ্ধার হোলেম। এই সময়ে আরজজেবের লস্কর পশ্চাদিক্ থেকে আমাদের উপর চাড়াও কোলেন, ভয়ঙ্কর কাটাকাটি হোতে লাগলো, রক্তের স্রোত বোয়ে চোল্লো, রাজপুত্রদিগের বীরবিক্রমে কেল্লা ধরহরি কম্পিত হলো, জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমার প্রাণ ওঠাগত হোয়েছিল। মহাপ্রলয়ের শ্রায় সেই ঘোর কোলাহলের মধ্যে ফটকের মস্তকোপরি গম্বুজ থেকে একটি কণ্ঠস্বর হৈকে হৈকে বোলতে লাগল, “সাদককে গেরেস্তার কোরে বন্দী করা।” কালনাগিনী নূরমহল যখন ফটক রুদ্ধ কোত্তে গোপনে ইজিত করে, তখন নিশ্চয় মনে কোরেছিল, আমি কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোরেছি, এক্ষণে দেখলে, সেটি তার ভ্রম, তাই আমার ধুব্বার নিমিত্ত পাপী-য়সী পর্জ্বিয়ে চীৎকার কোচ্ছিল। আমি যদি বন্দী হই, তবে আর মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই, তাই মোরিনা হোয়ে বিপক্ষের মধ্যে দিয়ে মহাবেগে বেরিয়ে পোড়লেম, এর পূর্বে বখারালী সদর-ফটক অরক্ষিত রেখে আমাদের সহায়তা কেত্তে চোলে এসেছিলেন। আমাদের ঘোড়া নাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লড়াই কোত্তে হোচ্ছে, অস্ত্রের মধ্যে কেবল তলওয়ার, ঐ তলওয়ার সহায় কোরে লড়াই কোত্তে কোত্তে বেরিয়ে পোড়তে হবে। প্রাজি ঘোর অন্ধকারময়, আলোর নাম মাত্র নাই, কে কার বাড়ি চোট্ মারে, তারও ঠিকানা নাই। কেউ কাতরাচ্ছে, কেউ গোজরাচ্ছে, কেউ আর্জানাদ কোচ্ছে, কেউ শপথ কোরে কিরে দিবা কোচ্ছে, কেউ অভি-

সম্পাত কোচ্ছে, ত্রিলোক-সংহারের হার এই সকল ঘোর মর্মান্তিক আত্মনাশের শব্দ চারিদিক থেকে আমার কর্ণবধির কোতে লাগলো, আবার ফটকের মাথার উপর থেকে ঘোর হুকারশব্দে বোলতে লাগলো, “সাদককে ধর, বিশ্বাসঘাতক সাধককে গ্রেপ্তার কর।” ঐ সকল ঘোর আশ্ফালক শব্দের তোড়ে অস্ত্র শব্দ আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ কোন্তে পাচ্ছিলো না, অবশেষে অনেক কষ্টে সেরসাহেব বখারালীকে চিনে বার কোন্তে পাল্লেম, তাঁর শব্দ শুনেই চিন্তে পাল্লেম, চেহারা দেখে পাল্লেম না, তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্তে পেয়েই আমি অমনি “এন্সাক্” বোলে চীৎকার কোরে উঠলেম, বখারালী গলার আওয়াজে আমার চিন্তে পেয়ে বোল্লেম, “সাদক! আমার পাশে পাশে থেকো, তারা কখনই তোমার গেরেস্তার কোন্তে পারবে না।” এই সময় একথানা তলওয়ার কে তাঁর মাথার উপর উচিয়ে ধোরেছে, চোট মারে আর কি, এমন সময় আমি তার হাতের কব্জাটি এক গোটে দুই টুকরা কোরে ফেল্লেম, নচেৎ সেই গোটেই সেরসাহেবকে সাবাড় হোতো। এই সময়ে কেল্লার ভিতর বিপক্ষেরা মুহা হল্লা কোরে ফটকের দিকে চড়াও কোলে, তখন আমরা আরও আসন্ন বিপদগ্রস্ত হলেম। সেরসাহেব বোল্লেম, “সাদক! পালাও পালাও, আর রক্ষা নাই, থাকলেই মারা পোড়বে।” আমরা হন্ হন্ কোরে বাহিরের দিকে উদ্ধাশাসে ছুটেছি, কি শত্রুর, কি মিত্রের যার তার যতদেহের উপর পা হড়কে এক একবার পোড়ছি, আবার অমনি উঠছি, আবার দৌড়ছি, এই রকম কোরে হাঁপাতে হাঁপাতে সহরের ফটকের কাছে এসে পোড়লেম, আমরা যেন মায়ামন্ত্রের প্রভাবে প্রাণ রক্ষ কোল্লেম, নচেৎ কার সাধ্য সে কালমশান থেকে প্রাণ লয়ে সে রাজ্যে বেঁচে আসতে পারে? বখারালী পূর্বেই এই ফটকের প্রহরীগুলিকে যার যে ঘরে বন্দী কোরে রেখেছিলেন, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, বখারালীর ঐ কার্যটি বিজয়ের মতই হয়েছিল।

একপে কাঁকা ময়দানে এসে পোড়লেম, আমাদের যেন কেউ পেছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেইরূপ মহাত্মাসে উদ্ধাশাসে হন্ হন্ কোরে দৌড়ে চলেছি, সর্কাসের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের স্রোত বেয়ে চোলেছে, তার উপর আবার এই পরিভ্রম, আমরা খানিক দূর দৌড়ে ঝিম্বরা হোয়ে পোড়লেম, এদিকে আবার গেটের আলো দেখা বেড়ে লাগলো, তাই দেরে ভয়ে আরও মরিষাচি কোরে দৌড়িতে লাগলেম, কোন্ দিকে দৌড়েছি, তার নিরাকরণ নাই, দৌড়িতে দৌড়িতে খানিক পথে গিয়ে কুকুরের রব শুন্তে পেলেম, তখন নিশ্চয় জান্লেম, গ্রামের দিকেই চোলেছি। হায়! গ্রামে গিয়েও স্থিতির হতে পারবো না, চেহারা দেখেই লোকে আমাদের চিন্তে পারবে, যেমন কেউ মৃত্যুপথ পরিহার কোরে অবির পথে গমন করে, সেইরূপ আমরাও ঐ গ্রাম পরিত্যাগ কোরে অস্ত্রদিকে চোলেম, আশ্রয় দেখতে দেখতে চোলেছি, কিন্তু সে আশ্রয় কোথাও পেয়ে উঠছি না। বখারালী বোল্লেম, “এ কেমন কথা হলো, এ গর্তপাত হবার তাৎপর্য কি? রাজপুত্র কোথায়?” আমি একটি মাত্র কথা বোলে সকল কথার উত্তর দিলেম, — “নূরহল এর মূলধার।”

“কে, সেই কালনাগিনী? সে কি বিশ্বাস-যাতি নী হয়েছে?”

আমি বোল্লেম, “হাঁ, হোয়েছে। যখন শুন্লেম, এ ছঃসাহসের মধ্যে সেও একজন চক্রী, তখনই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল, তখনই ভেবেছি, এ কার্যা প্রতুল কোরে হোলা যাবে না।”

“তুমি তবে তাকে পূর্বে জানতে?”

আমি বোল্লেম, “জানতাম সত্য, হায়! আমার সঙ্গে তার জানাশুনা না থাকাই ভাল ছিল। বখারালী! সেই পাপীয়সীই আমার এত কষ্ট দিয়েছে, এত বাতনা দিয়েছে যে, তুমি তা মনেও ভেবে আনতে পার না।”

“তবে সেই কথা বল, তোমার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল বোধ হয়।”

‘আমি বোলেম, “না, তার প্রতি বরং আমার ঘেব আছে, সেই নিমিত্তই আমার উপর তার তত রাগ, তত আক্রোশ, তত হিংসা, আমি সত্যই বলছি তার বিশ্বাসঘাতিনী হবার তাৎপর্য এই যে, আমার গেরেষ্ঠার কোরে আরদজেবের হস্তে সমর্পণ করে, এইটিই তার মানস, নচেৎ শূলতান মামুদকে কৌশল-ভালে ফেলে সে যে কিছু লাভ কোরবে, সে অভিপ্রায় তার তত ছিল না, আমায় গেরেষ্ঠার কবুবার নিমিত্তই সে অতিশয় উত্তলা হয়েছিল, তাই সে ব্যগ্র হয়ে ফটক বন্ধ কবুবার জন্তে তাড়াতাড়ি সন্ধেত করে, তার সেই সন্ধেত আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছে, তাই আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলেম।” বখারালী সে ফটক চক্ষে দেখেননি, সেই প্রকাণ্ড কালফটক কিরূপ, তাঁকে সেটি বিস্তার কোরে বুঝিয়ে দিয়ে বোলেম, “ততভাণ্ডা শূলতান মামুদের সঙ্গে আর আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে না, জগের মতন আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো।”

সের সাহেব বোলেম, “ভয়ানক কাণ্ড! তিনি হেঁটে গিয়ে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আনলেন, এক্ষণে পোস্তার দানা মাত্র তাঁর অহার হবে, অবশেষে শুকিয়ে নীর্ণ হয়ে চিরকয়ের স্মার কালযন্ত্রণা পেয়ে প্রাণত্যাগ কোতে হবে, এই বিকট মৃত্যু তাঁকে অপেক্ষা কোরে আছে।”

আমি বোলেম, “তাঁর কি অদৃষ্ট! এইরূপেই তাঁর শেষ হবে। এক্ষণে আমরা কোন্ দিকে যাই?”

সের সাহেব বোলেম, “ধনগড়গঞ্জের দিকে তো যাওয়াই হবে না, শত্রুপক্ষেরা এতক্ষণে দখল কোরে বসে আছে, তার অপেক্ষা কোন রাজার বা ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করা বরং ভাল, আগাদের নাম ভাঁড়াতে হবে, যে পদে থেকে যে কর্ম কোন্তে, তাও ভাঁড়াতে হবে।”

আমি বোলেম, “হায়! রাজপুতানায় আর তো আমি মুখ দেখাতে পারবো না, সেখানে গেলে আমার ঘোর বিপদ, যেহেতু, তত রাজ-

পুতকে তাড়িয়ে নিয়ে আস্ত মৃত্যুমুখে এনে ফেলে, নিঃইছি।”

সের সাহেব বোলেম, “সে কথা সত্য বটে, তবে এখন চোলে যাওয়া যাক, যেতে যেতে একটা না একটা আশ্রয় পাওয়া যাবেই যাবে।” এক্ষণে কিন্তু চোলে যাওয়া সহজ কথা নয়, আমার হস্ত-পদ শক্ত হোয়ে আস্তে লাগলো, ক্রমে অবসন্ন হোতে লাগলেম, ক্ষতগুলির জ্বালায় অস্থির হয়ে পোড়লেম, ছট্‌কট্‌ কোন্তে লাগলেম। বখারালীও অবসন্ন হয়ে পোড়লেন, তিনি কলমবেগের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কোরে যে চোষ্ঠ, যে ধাকা খেয়েছিলেন, সে ধাকা থেকে কেবল সম্প্রতিমাত্র সামলিয়ে উঠেছেন, তাই অর তাঁর শরীরে তাদৃশ বল-শক্তি ছিল না। প্রত্যাত হলো হলো বোলে, সের সাহেবের মনে আরও দুর্জয় জ্বাস হতে লাগলো, পাণ্ডু খননের মনেও রাজপ্রত্যাত হোলে তত জ্বাস হয় না। আমরা ভাবছি, আরদজেবের দূত, তাঁর চর, তাঁর লোকজন অবশ্যই চারিদিকে ছুটেছে, তাহা আমাদের বেশ চেনে, তাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য, আরদজেবের হস্তে পোড়লে আমাদের মৃত্যু কেউ রক্ষা কোন্তে পারবে না, তাই প্রাণের ভয়ে আমাদের শরীরে যেন আরও বল হলো, আমরা মেরপিটে দৌড়িতে লাগলেম, দৌড়িতে দৌড়িতে একটি ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোলেম। সেখানে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। এই স্থানে বিশ্রাম করবার চেষ্টা কোলেম, কিন্তু পশ্চাদিকে ঘোড়ার পদপদ শুন্তে পেলেম, আমাদের মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। বখারালী বোলেম, “বিপক্ষেরা আসছে, গাছে-উঠতে না পারলে আমাদের আর নিস্তার নাই, একবার উঠতে পারলে হয়, তা হোলে বৃক্ষের সতেজ শাখা-পল্লবের মধ্যে আমাদের শরীর গোপন কোন্তে পারবো।” ঐ কথা বোলেই বখারালী প্রাণপণে গাছের গুড়িটি জাঁকড়িয়ে ধোলেম, উঠবার জন্তে ছবার চেষ্টা কোলেম, ছইবার হাত কসকে পোড়ে গেলেন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো, আমি



নিকপায় দেখে তলওয়ার দিয়ে গাছের গায় খাঁজ কেটে গর্ত কোরে দিলেম, ঐ গর্তগুলি খাপের কার্য্য কোলে, বখারালী ঐ খাপে পা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠলেন, নিকটে একটা ডাল ছিল, ঐ ডাল ধোরে একেবারে গাছের মাথার গিয়ে চোড়ে বোস্লেম, আমিও শেষে বিস্তর কস্তাকস্তি কোরে, কতক বখারালীর হাত ধোরে গাছের মাথার উপর গিয়ে উঠে বোস্লেম। এক্ষণে প্রভাত হয়েছে, তুরুকসোয়ারেরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোলে, কতক গুলি বৃক্ষপত্রের আড়াল মাত্র আমাদের ভরসা।

আমি বোল্লেম, “তারা গাছের গায় গর্ত-গুলি দেখতে পেয়ে আমাদের সন্ধান পাবে, তবেই জঙ্গলের মত গেছি আর কি।”

আমার সহচর বোল্লেম, “সেটি আমাদের অদৃষ্ট, গ্রহ ভাল হয় তো তারা এদিকে আসবে না, কিন্তু দোহাই আল্লাহ! আমি প্রাণ থাকতে ধরা দেবো না, তারা কখনই আমার জ্যান্ত ধোরে নিয়ে যেতে পারবে না।”

আমি বোল্লেম, “আমাকেও পারবে না, হতভাগ্য দারার মতন যে আমার সহরের ভিতর দিয়ে লয়ে যাবে, সকলে চেয়ে চেয়ে দেখবে আর হাসবে, তা তো কখনই হতে দেবো না, আমার যে জোর কোরে পোস্তার দানা খাওয়াবে, তাও এ প্রাণ থাকতে কবুল করবো না, তা থেকে তলওয়ার দিয়ে কেটে ফেলে দেয়, তাও বরং ভাল।”

বখারালী বোল্লেম, “চূপ, চূপ, আমি তাদের ঘোড়া দেখতে পেয়েছি, তারা যদি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে ঘোড়া থেকে নামতে হবে।”

তারা তাই কোলে, ঘোড়া থেকে নেমে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ কোলে। আমরা যে গাছের মাথার উপর বোসে ভয়ে কাঁপছিলেম, তারাও সেই গাছের তলায় এসে দাঁড়ালো।

তাদের একজন বোল্লে, “অবশ্যই এই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোরেছে, তিন জন তাদের সন্ধানে এগিয়ে যাক, বাকি দুইজন এইখানেই

থাকি, কি জানি, যদি এখনও পৌছিতে না পেরে থাকে, তাও তো হোতে পারে, তা যদি হয়, এই দুজন গ্রহরী তাদের গেরেস্তার কোবুবে।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে, “যদি পেরে উঠা যায়, তবে তাদের প্রাণে না ঘেরে অমনি গেরেস্তার কোন্তে হবে, আমাদের উপর হুকুমই তাই, সেটা যেন স্মরণ থাকে।”

তাদের মধ্যে তিন জন লোক স্বতন্ত্র হয়ে অগ্রসর হলো, বাকি দুজন ঐ গাছের তলাতেই দাঁড়িয়ে রইল। এক্ষণে সূর্য্যোদয়ের আরম্ভ মূর্ত্তি দর্শন দিয়েছে, তাঁর তরুণ-আভার ল্যাক্সা তলওয়ারগুলি ঝক্ ঝক্ কোচ্ছিল। এই দুজনের একজন বোল্লে, “সুলতান মামুদের কি ভরসা, তিনি ভারী জাহাজী দেখিয়েছেন।”

তার সহচর বোল্লে, “এ তো জাহাজীর কাজ হয় নাই, এ কাজ গোঁয়ারের মতই হয়েছে।”

“সে কথা সত্য, গোয়ারতামি যে, তার সন্দেহ কি? কিন্তু জীবা যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে প্রতারণা না কোন্তো, তা হোলে আজ রাজপুত্রের সুপ্রভাত হতো।”

“হায়, কি তামাসা! সে ছুঁড়ী আপনার দিন গুলিয়ে নিয়েছে, সুলতান মামুদ তাকে দুলাল টাকা দিয়ে তাঁর আপনার গারদের ফটক আপনিই খুলিয়ে নিয়েছেন, বড় তামাসাই হয়েছে। রাজপুত্রকে ধোরিয়ে দিয়েছে বোলে তারজজেব আবার আর একলাল টাকা ছুঁড়ীকে বকসিস্ কোরেছেন, তবু ছুঁড়ী সন্তুষ্ট হয়নি। সাদক পালিয়ে গ্রহান কোরেছে বোলে সে মনে মনে বড় দুঃখিত, আরজজেবের কানে নানা কথা ফুলে দিয়ে তাঁর মন ভারি কোরে দিয়েছে, এক্ষণে সাদককে গ্রেপ্তার করবার নিমিত্ত রাজপুত্র ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। তবে তাকে গেরেস্তার কোন্তে পাল্লে আবার বিলক্ষণ দশটাকার মুখ দেখতে পাবো। সুলতান মামুদ যখন কুচ কোরে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় তাঁর গিতার সঙ্গে চোকে চোকে সাক্ষাৎ হয়,

তখন তাঁর মূর্তিখানি ঠাউরে দেখেছিলে কি ?  
খুনে জন্মদেব মূর্তিও তত নির্ভর, তত চোরা-  
ড়ের মতন নহে । জীবির উপর বিশ্বাস করাই  
তাঁর পাগলামি হয়েছিল, এ সকল কাজে  
জ্বীলোকের উপর বিশ্বাস কোন্টেই নাই,  
বিশেষতঃ তার মত চরিত্রের জ্বীলোক কিছু  
অর্থ পেলেই আপনার পিতাকেও পরিয়ে  
দিতে পারে ।”

প্রথম বক্তা বোল্লে, “সে কথা আমি খুব  
মানি, তা বাই হোক, সাদককে গ্রেপ্তার  
কোন্টে হবে । বখারালীকেও গেরেপার  
কোন্টে হবে ।”

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, “বখরালী খুব হ’সি-  
য়ার লোক, সে ব্যক্তিতে কে ?”

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, “সে কথা কেউ  
বোল্তে পারে না । আমার বোধ হয়,  
সে পাঠান, সে একজন বেশ প্রবীণ যোদ্ধা,  
শরীরটি আজও বেশ মজবুত আছে, খুব  
বলিষ্ঠ, খুব কর্ণশূর, কিন্তু একস্থানে স্থির নয়,  
কেবল এ দেশ সে দেশ কোরে বেড়ায়,  
যে তারে বেতন দেয়, তারই চাকর হয়,  
আপনাকে যেন ভাড়া দিয়ে বেড়ায় ।”

আমি দেখ্লেম, ঐ সকল কথা শুনে  
সেরসাহেব চোঁটমুখ-ফুলিয়ে, কাঁপাতে লাগ-  
লেন, রাগে অমনি দুই চক্ষু লাল হয়ে  
উঠলো, হাতখানি যেন আপনা আপনিই  
তলওয়ারের মূট তল্লাস কোন্টে লাগলো ।  
এই সময় আমি একবার তাঁর দিকে দৃষ্টি-  
পাত কোরে চোঁক-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেম,  
তাই দেখে তিনি কান্স হোলেন । তার পর  
প্রহরীরা বোল্তে লাগলো, “ভাল ! বখা-  
রালী যেই হোক, সে কিন্তু এ যাত্রা বেশ  
ঠকিয়ে গেল । ঐ দেখ, আমাদের তিন জন  
বন্ধু কিসে আসছে । কি খবর তাই সকল ?”  
“তাদের কোর সন্ধানই পেলেম না । বোধ হয়,  
তারা জঙ্গলের মধ্যে আদৌ এসেনি । তবে  
আর কি হবে, চল, অন্যদিকে যাওয়া যাক,  
তারা গ্রামের ভিতরেই আছে বোধ হয়, চল,  
সেই দিকেই যাওয়া যাক ।”

প্রহরীরা প্রহান কোলে, আমরা দেখে

আনন্দিত হলেম, এখন নিখাস ফেলে পাঁচ-  
লেম, গাছের উপর আরও একঘণ্টা বিশ্রাম  
কোরে নেমে এলেম । কোথায় যাবো, কি  
কোন্ দিকে যাবো, তার কিছুই স্থির নাই ।

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিধির লিপি কপাল-ঘোড়া ।

একদা কুখ্যাত তুফার আঁপার দেখতে  
লাগলেম, তবে নাকি একটা শস্ত্রক্ষেত্রের  
মধ্য দিয়ে চোলেছি, তাই এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা  
কোন্টে পাল্লেম, নচেৎ অনাহারে জীবনে  
জলাঞ্জলি দিয়ে ভূগুণ্ডে শয়ন কোন্টে হোতো ।  
জল তো খুঁজেই পেলেম না, নিকটস্থ গৃহস্থের  
বাটীতে গিয়ে চাইতেও সাহস হলো না,  
তাদের বাড়ীর নিকট দিয়েও যেতে ভরসা  
হোলো না । তখাচ দুজনে গল্প কোন্টে  
কোন্টে চোলেছি, মোন্টে মোন্টে যে দৈচে  
গিইছি, সেই কথা লয়েই আমোদ কোছি ।

আমার সহচর বোল্লে, “শুনেছ তো,  
গাছের তলার দাড়িয়ে আমার কথা পেড়ে  
বেটাৱা কেমন অপমানের কথা বোল্ছিল ।”

আমি বোল্লেম, “হাঁ, শুনেছি । তুমি রেগে  
আগুন হয়েছিলে, তাও চক্ষে দেখেছি ।”

“রাগ না হবে কেন ? সাদক ! তুমি তো  
কিছুই অবগত নও, এতে যে রাগ হোতেই  
পারে, আগে সে দিন হোক, তখন বিশ্বাস  
কোরে একটি নিগূঢ় কথা তোমার হৃদয়ে  
স্থাপিত কোরবো, সে কথা এখন শুনুলে  
তোমার বিষয় জান হ’বে । হা আঞ্জা !  
আমার চরমদশা কি এই হলো, ঈশ্বরের  
বিচারে কি পাষাণদের দণ্ড নাট, আমি কি  
চিরকালটাই এ দেশ সে দেশ কোরে টো টো  
কোরে বেড়াবো ?”

ঐ কথা বোল্তে বোল্তে বখারালীর রবি-  
দত্ত পবিত্র গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পোড়তে  
লাগলো, আমি পাছে তাঁর মনঃকষ্ট জানতে  
পারি, তাই ঢাকবার নিমিত্ত বৃদ্ধ চোট-পার

চোলে লাগলেন। আমি তাঁর স্বন্ধে হাত দিয়ে বোলেম, “একশে বিলাপ করবার সময় নয়, ঐ দেপ, কতকগুলি চাষা এইদিকে আসছে, চল আমরা অন্তরিক দিয়ে যাই।” বন্ধু আমার হাতখানি বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রোইলেন, মুখে কথা নেই, কে যেন তাঁর বাক্য হরণ কোরে নিয়েছে।

আমি বোলেম, “ও আবার কি বন্ধু! কথা কও, আমি এখন তোমায় বন্ধু বোলে ডাকবো।”

বথারালী বোলেম, “বন্ধু কে? তুমি? তুমি হয় ত আমার পরম শত্রুই হইবে, কি আমার কোন শত্রুপক্ষের লোকই হবে, কি আমার কোন শত্রুকুলে তোমায় জন্মই হবে।”

“ও কি ভাবের কথা বথারালী?”

“সাদক! তুমি এ আংটি কোথায় পেলে? দোহাই আল্লাহ, এ আংটি কোথায় পেলে বল? তুমি কি লুট কোরে পেয়েছো? না কোন ব্যক্তিকে প্রাণে মেরে ফেলে তার হাত মুচড়িয়ে কেড়ে নিয়েছো?”

আমি বোলেম, “আল্লাহ দিকি, তা নয়, (সেরসাহেবের কাতর মূর্তি দেখে আমি শুকনো হয়ে গেলেম) যে ব্যক্তিকে বহুকাল পিতা বোলে জানুতেন, তিনিই আমার এই আংটিটি দিয়েছেন।”

“তাঁর নাম কি? গুরসাজ?”

আমি বোলেম, “না। তাঁর নাম সাহুলা খাঁ, শাহজাদান্ বাদশাহের উজীর।”

বথারালী ছোটো ছোটো কোরে বোলতে লাগলেন, “কি আশ্চর্য! আমার মনে সকলি অন্ধকার, “সকলি গোলমাল বোধ হচ্ছে। সাহুলা খাঁ! এ নাম তো কখন শুনি নাই।”

আমি বোলেম, “আপনি কি আংটির বিষয় কিছু জানেন? সাহুলা খাঁ বোলেছেন, এই আংটি দ্বারা আমার জন্মবৃত্তান্ত জানুতে পারুবো।”

বথারালী আমার কথার প্রতিধ্বনি কোরে বোলেম, “আমি এ আংটির বিষয় কি

জানি, আংটিটি আমার হাতে দাঙ দেখি, ভাল কোরে তদারক কোরে দেখি।” আংটিটির চারিদিকে ঠাউরে ঠাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখেই বোলেম, “একটি দাগ আছে দেখতে পাচ্ছে?”

আমি বোলেম, “হাঁ, পাচ্ছি।”

“সে হাত এ আংটিটি ধোরে আছে, সেই হাতের দ্বারাই ঐ দাগটি হয়, এ আংটি আমারই ছিল, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এর যুড়ী আর একটিমাত্র আংটি আছে। সে আংটি—” আবার তাঁর চক্ষু দিয়ে টন্ টন্ কোরে অশ্রুপাত হোয়ে গাল বেয়ে গোড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আমি বোলেম, “সে আংটিও আমি দেখেছি।”

বথারালী শুনে চিত্তপুতুলের ভায় আড়ষ্ট হয়ে রোইলেন।

আমি বোলেম, “আপনি যে অবাক হয়ে রোইলেন, একবার কেন, কতবার দেখেছি, হুবহু এর জুড়ি আংটি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আর তা পাওয়া যাবে না।”

“কারে পোন্তে দেখেছো? কোন পাষাণের হস্তে সে সূর্য্যকান্তমণি আপনার উজ্জ্বল কান্তি বরণ কোরেছে?”

আমি বোলেম, “নজফালী খাঁর হাতে দেখেছি।”

আমার সহচর বিড় বিড় কোরে বোলেম, “এও একটা আনুখা নাম। সে ব্যক্তি কে?”

সে ব্যক্তি যে প্রকারের লোক ছিল, আমি তাঁরে অবগত কোরিয়ে বোলেম, “শেষে আমি গণককারের কাছে সেই আংটি দেখেছি। গণককারের মৃত্যু হওয়ার, বিশেষতঃ যেক্রমে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাতে সে আংটি আর যে কখন দেখতে পাওয়া যাবে, সে প্রত্যাশা নাই।”

বথারালী বোলেম, “তোমায় সে চাকর বড় আহাম্মক, বেটা জাহান্নাবে যাক, সেই বেটাই সব নষ্ট কোরে দিয়েছে, তার দোষেই বিষয়-বৃত্তান্তগুলি অবগত হোতে পারা গেল না। সেগুলি কেমন কোরে জানুবো, তার কোন উপায়ও দেখছি না; তুমি যে গণক-

‘কারের কথা বোলছো, সে ব্যক্তি কে? সে আটীর বিষয় কি সব জান্তো, দেখে কি চিনতে পেরেছিল?’

‘আমি বোল্লেম, “হা, পেরেছিল।”

“গণককারের নাম কি?”

“আল্‌নসার।”

আমার মুখে তৃতীয়বার এই আল্‌নসার নাম শুনে বথারালী নৈরাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, আমার আঙুলি ক্রিয়ের দ্বারা বোলেম, “যত দিন বাঁচবে, সাবধানে রেখো।”

আমি বোল্লেম, “আমি তাই কোরবো।”

আমরা আবার পায়-পায় এগিয়ে চোলেছি, দুজন চাকরকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে বোল্লেম, “রাজপুতানার কোন পথ দিয়ে যাবো।” তারা শুনে হাসতে লাগলো, মনে কোলে, আমরা বুঝি জেনে শুনে তাদের সঙ্গে নেকামো কোচ্ছি। তারা “চল চল” বোলে জোর কোরে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো, তাদের যত দেখে আমরা মহা আতঙ্কিত হোল্লেম, অবশেষে নিম্নাচ্ছাড়িয়ে বংশারিতে উপস্থিত হোল্লেম। পথ-মধ্যে কতই কষ্ট পেয়েছি, কতই উৎপাতে পোড়েছি, কতই দুর্গতি, কতই দুঃখ মাথার উপর দিয়ে চোলে গিয়েছে, কত স্থানে আতঙ্কে অবসর হয়েছি, সে সকল দুঃখের, সে সকল দুঃবস্থার কথা পাঠককে অবগত করার জন্যে বোল্লেম না।

বথারালী বোল্লেম, “এখানকার রাজার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ-পরিচয় আছে, বোধ হয়, তাঁর কাছে আশ্রয় পেতে পারবো। কিন্তু আমি যে কে, তা তিনি জানেন না, মনগর্ভিত আরজকেবের উপর, নির্দয় নির্ভর শাজাহানের উপর রাজার আন্তরিক ঘেব।”

আমরা এত নিকটে পৌঁছেছি যে, রাজ-বাড়ী আর-সহর দেখা যাচ্ছিল। একটা আশ্রয় না হোলে তো নয়, সে আশ্রয় আবার এত নিকটে হোয়েছে যে, হাত-বাড়ালেই পাওয়া যায়, সেই সাহসে আমাদের শরীরের বল শক্ত নবরাগে যেন আরও সতেজ হলো, আমরা এখন আরও চোটপায় চোলেতে লাগ-

লেম। একটা রোগী টনটনে টাটুর উপর সোয়ার হোয়ে আমাদের আগে আগে একটি খর্কাকার বৃদ্ধ চোলেছে, আমরা তাড়াতাড়ি চোলে তাঁরে গিয়ে বোল্লেম, এক্ষণে প্রায় পাশাপাশি হোয়েই চোলেছি, পরস্পর কথা-বার্তাও চোলেছে, অথচ তিনি বাড় ক্রিয়ের দেখলেন না যে, আমরা কে। একটা স্থানে জমিটা হেটাঠাঠা ছিল, টাটুটি সেখানে হুমড়ি খেয়ে পোড়ে গেল, আমি অমনি তাড়াতাড়ি সোয়ারকে ধোরে তুলতে গেলেম। হে ডগবান্! ধোতন্ত গিয়ে দেখি, ইনি সেই গণক-কার আল্‌নসার! তাঁকে দেখে আমার বিশ্বাস-জ্ঞানও যেমন হলো, আবার ভয়ও তেমনি হলো, মনে কোরেছিলাম, তাঁর দেহটি খণ্ডখণ্ড হোয়ে দেওয়ালের মরদানে গড়াগড়ি বাচ্ছে। গণককারকে দেখে আমার কথা কহিতে সাহস হলো না, তখন জ্ঞান হলো, এ ব্যক্তি অবশ্যই মায়াজীবী হবো। আল্‌নসার কিন্তু একটু মুচকে হেসে শির নম্র কোরে আমার সাধুবাদ কোল্লেম, তাঁর সেই বিনয়পূর্ণ নম্রমুর্স্তি দেখে আমার আতঙ্ক দূরীভূত হলো। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হোয়েছিল, সেই কথা তাঁকে স্মরণ কোরিয়ে দিলেম। তাঁর সঙ্গে যে দ্বিতীয়-বার সাক্ষাৎ কোরে স্মৃতি হতে পারি নাই, বিশেষতঃ তাঁর জন্তে যে কত দুঃখিত, কত নৈরাশ হয়েছি, সে কথাও বোল্লেম।

“দেওয়ানী গ্রামবাসীদের পশ্চৎ নৃশংস আচরণ স্মরণ কোরে আমার হৃৎকম্প হয়, আমি মনে মনে নিশ্চয় কোরেছিলাম, আপনি এ পার্থিব সংসার পরিত্যাগ কোরে ছেন।” এই কথা বোল্লেম বোল্লেম বথারালী এসে উপস্থিত হোলেন।

আমি বোল্লেম, “বন্ধু! ইনিই সেই মহা-পুরুষ আল্‌নসার, যার কথা এইমাত্র হোচ্ছিল।”

বথারালী আমার অপেক্ষাও অতিরিক্ত আগ্রহবান হয়ে সেই লোকটির কাছে, এগিয়ে গেলেন। পূর্বে আমি বোল্লেছিলাম, এই ব্যক্তির কাছে সেই অজরূপ আঙুলি আছে ভূমি কে, কি বৃত্তান্ত, এই সকল জিজ্ঞাস

কোরুবেন, বখারালী তারি এই উপক্রম কোরেছেন, এমন সময় সেরসাহেবের মূর্তি-খানি হঠাৎ রান হোরে পোড়লো, যে কার গেলি হোক, একটা মধ্যাহ্নিক মনোহুঃখ উপ-স্থিত হোরে তাঁর যেন বাক্য হরণ কোরে নিলে। অনেকক্ষণের পর বখারালীর বাক্য-ক্ষতি হলো, তখন বড় বড় মধ্যাহ্নিক তাঁর লগীটে দেখা দিলে।

বখারালী বোলেন, “তুমি কে, বল ? সত্য কোরে বল ? আমার তো ভ্রম হোচ্ছে না ? বল দেখি, তুমি গুরুসাত কি না, তুমি না গুরু-সাত আমার মুখে দাঁড়িয়ে ?” গণককার শুনে অবাক হোরে গেলেন, একটু পেছিয়ে গিয়ে রৌদ্রের প্রথর তেজ লাঘব করবার নিমিত্ত চক্কর উপর একখানি হাত আড়াল দিয়ে রাখলেন, তখন বেলা ঠিক দুই প্রহর, রৌদ্র বাক্য কোচ্ছে। দৈবজ্ঞবর বখারালী-র মূর্তিখানি ঠাউরে টাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন।

বখারালী বোলেন, “তুমি বাস্তবিক গুরু-সাত কি না বল, বোলে আমার মনের সন্দেহ দূর কর।”

দৈবজ্ঞ বোলেন, “হাঁ, আমি গুরুসাত, কিন্তু বন্ধু, আপনি কে, আমি চিনতে পাচ্ছি না, আপনার মূর্তিখানি আমার কাছে অপরি-চিতের স্তায় জান হোচ্ছে, আপনি কে যে, আমার অনায়াসেই চিনে ফেলেন, আমার তো আশ্চর্য্য বোধ হোয়েছে।”

সেরসাহেব বোলেন, “আর কেন, ঢের হোয়েছে, আলার মহিমা বৃদ্ধি হোক, একটা রাজ কথা বোলেই তুমি বুদ্ধিতে পারবে।” এই বোলে তাঁরা একটু তর্কাতর্কে গেলেন, তার পরেই যেন চিরকালের পরমাত্মীয়, এইরূপ আন্তরিক ভক্তির সহিত পরস্পর কোলাকুলি কোলেন, তাই দেখে আমি কল্প বিশ্বাসপন্ন হোলেম না।

দৈবজ্ঞ আর বখারালী পুনরায় আমার সঙ্গে একত্র হোলেন, আমরা তিনজনে সরা-সবু বংশারি সহরে চোলেছি, দৈবজ্ঞবর, একপে বীর নাম গুরুসাত শুনলেম, কি কোরে

তাঁর মৃত্যুরূপ কৌশলজাল থেকে পরিজ্ঞান পেলেন, সেই বিষয় অবগত হবার নিমিত্ত আমি তারি উত্তলা হোলেম, গুরুসাত আড়ে আড়ে একটু হেসে বোলেন, “দোস্ত ! যে ব্যক্তি আপনার অদৃষ্ট গুণ্ডিতে না পারে, সে নিতান্ত আনাড়ি গণক, সে পরের আপদবিপদ কি কোরে বোলেতে পারবে। ফলে আমি কিন্তু মোস্তে মোস্তে বেচে গিয়েছি।”

আমি মনে কোলেম, দৈবজ্ঞের শরীরে বিশেষ কোন সিদ্ধবিজ্ঞা আছে, সে বিজ্ঞা অস্ত্র মস্ত্রযোর নাই, ভবিষ্যৎ ঘটনা জানতে না পারলে তিনি তাঁর মৃত্যুমুখ থেকে কদাচ রক্ষা পেতেন না।

বুদ্ধ বোলেন, “তুমি যে অবাক হোরে গেলে, আমার মুখে কিন্তু সবিশেষ যত্নস্বত্ব শুনে তোমার এ ভ্রম থাকবে না, শুদ্ধ একমাত্র দৈববলে আমি তাদের বারুদচক্কর সন্ধান জানতে পেরেছিলাম, তাই ভিন্ন আর কিছুই নয়। নক্ষত্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা আমার অভ্যাস। পূর্বে জেনেছিলাম, একটি গ্রহ রাজি দুইপ্রহর একঘণ্টার সময় উদয় হবে, সেই গ্রহটি দেখবার অমুরোধে সেই ভগ্ন মসজিদের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছি, বামন অস্তুরচর আমার সঙ্গে ছিল। এদিকে যে ঘোর মৃত্যুবাণ পেতে রেখেছে, তা আমি স্বপ্নেও জান্তেম না। আমি যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি আকাশের দিকে উচু কোরে ধোরেছি, এমন সময় বামন বোলে, “হজুর ! আমি বারুদের আশ্রাণ পাচ্ছি।”

আমি বোলেম, “চূপ কর আহামুক।” তখন মনে কোলেম, বারুদ নয়, অস্ত্র কোন জিনিজের আশ্রাণ পেয়ে থাকবে।

বামন আবার বোলে, “হজুর ! বারুদ আমার পারে ঠেকেছে।”

আমি তখন তার দিকে কিরে দাঁড়িয়ে দেখলেম, যে প্রান্তরের উপর সেই মসজিদটি গর্বে তুলেছে, তার ছিদ্রে ছিদ্রে বারুদ পুরে দেওয়া হৈয়েছে, তবে যে আমার ঘোর বিপদ উপস্থিত, বিপদ যে আমার চারিদিক থেকে ঘেরে কেলেছে, একপে সে কথা

জানতে সিদ্ধমন্তের, কি মায়া-বিচার প্রয়োজন করে না। কখন যে সে বারাদর পাতিতে আঙন ধসিয়ে দেবে, তার নাক ঠিকানা নাই, তাই আর ঘরে গিয়ে তিনিম পত্রগুলি সামলানতে সাহসী হলেম না। বায়নকে বোল্লেম, “তুই আমার সঙ্গে আর,” এই কথা বোল্লেই পল্লের ভিতর দিয়ে যেমন কয়েস, তদন্তমারী দৌড়িতে লাগ্লেম, দৌড়িতে দৌড়িতে অনেক দূরে এসে পোড়লেম। যে সংহাররূপ ফাঁদ আমার জন্তে পাতা হয়েছিল, সে ফাঁদ ছাড়িয়ে অনেক তফাতে এসে পোড়লেম। পুত্র! তেঁমার সঙ্গে যে পুনরায় সাক্ষাৎ হলো না, তার জন্তে আমি তৎকালীন যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হয়েছিলেম, অনেক মর্ষ-কথা, অনেক গোপনীয় কথা তোমায় বোলবো বোলে মনে কোরেছিলেম। আমরা দৌড়ছি আর কবর মন্দিরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোলেছি। রাত্রি যখন দুই প্রহর, এমন সময় মাটি ফেটে একটি ভীম গর্জ্জন হয়ে কর্ণবিবরের সত্ত্বাষণ কোল্লে। নিবিড় সমরশি ক্রমে ক্রমে উল্লে উখিত হোতে লাগলো দেখতে পেলেম। আমার সর্পগুলি, আর আমার সেই মনোহর বেকীটি, এরাই মাত্র গ্রামবাসীদের কোণে পোড়ে প্রাণে নষ্ট হলো। গ্রামবাসীরা নাক পতি মূর্খ, অতি নির্দোষ, তাই তারা এ কাজ কোত্তে অগ্রসর হয়, তারা যে দুষ্টবুদ্ধিতে কোরেছে, তা আমার বোধ হয় না, আমি তাদের সে দোষ দিই না।” দৈবজ্ঞের মুখে ঐ সকল কথা শুনে বড় আপ্যায়িত হোলেম, যে কথা প্রকাশ কোত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, এক্ষণে সেই কথা শোনবার নিমিত্ত উমেদারী কোত্তে লাগলেন। দৈবজ্ঞবর বোল্লেম, “আমি যে কথা বোলেছি, সে কথার অজ্ঞা হবে না। বিশেষতঃ তোমার এই সহচরটি যখন অজ্ঞা-বধি জীবিত আছেন, তখন সে কথা বোলে আরও তোমার পরিভূক্ত কোত্তে পারবো। তোমার সহচরের অদৃষ্টের সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট গাঁথা রয়েছে। তোমাদের দুজনের একরূপ চেষ্টা, একরূপ আশ্রয়।”

এক্ষণে আমরা বংশারি সহরে প্রবেশ কোলেম, সহরটি বিরাট প্রচীর দ্বারা বেষ্টিত, আমরা একটি ভয় রাজ-অট্টালিকার আড়ডা কোলেম, রাজা পথিকদিগের নিমিত্ত ঐ বাড়ীটি নির্দিষ্ট কোরে বেধে দিয়েছেন। তখন বেলা অবসান হয়েছে, তখাচ বথারালী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলে গেলেন, তাঁর বাসনা, আপাততঃ রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। এর পূর্বে দৈবজ্ঞের সঙ্গে তাঁর নিরিবিলি কথাবার্তা হয়।

বথারালী চোলে গেলেন আলমাসার, এক্ষণেয়ার নাম গুরসচ শুন্লেম, আমায় ডেকে বোল্লেম, “তোমার দুটি আংটির ইতি-বৃত্তান্ত তোমায় বোলবো বোলে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তোমার কোন্ বংশে জন্ম, তাই জানবার জন্তে তুমি উন্নতপ্রায় হয়েছো, তা তো হবারই কথা, এই অঙ্গুরীর পরিচয় অবগত হলে তোমার বংশের পরিচয়ও অবগত হোতে পারবে, একটি অঙ্গুরী দুটি কুলাচার্য্য হয়ে তোমার বংশাবলীর কুলজি কীর্তন কোরবে। আমার যেন স্মরণ হোচ্ছে, তুমি বোলেছো, তোমার হাতে যে আংটিটি আছে, ঐ আংটি সাহুলা খাঁ তোমায় প্রদান কোরেছে, তার তখন কথা কইবার ক্ষমতা ছিল না।”

আমি বোল্লেম, “হাঁ, ঐ কথাই বটে। সাহুলা খাঁ ভাবভঙ্গি দ্বারা, ইন্দিজ উপায়া দ্বারা অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে আমার বিস্তর সাধাসাধনা কোরে বোলে দিয়েছেন, এই আংটিটির প্রতি আমার বেন বিশেষ বড়, বিশেষ স্নেহ থাকে। আমার মাতাপিতা কে, কোন্ বংশে আমার জন্ম, সে সকল কথা এই আংটি একদিন আমার অবগত করাবে।”

দৈবজ্ঞ বোল্লেম, “সাহুলা খাঁ তোমায় যেরূপ অনিষ্ট কোরেছেন, তার কাছে এ অতি ক্ষুদ্র উপকার। আমি যা জানি, তোমায় অবগত কোচ্ছি, তুমি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।—

শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের পাঁচ পুত্র। যথা—চস্ক, পার্বেজ, শাহজাহান,

জেহান্দার ও সারিয়ার। তদ্বির দুই কন্যাও ছিল, তারা কিন্তু অল্প বয়সেই পঞ্চদশ পাৰ। পাবুবজের ও জেহান্দাহেরও অকালে কালপ্রাপ্তি হয়। এক্ষণে চমক, শাজাহান, ও সারিয়ার এই তিন পুত্রমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য তাঁদের সকলেরই ছিল। চমক জ্যেষ্ঠ পুত্র, অথচ আবার বাদশাহের প্রিয়পাত্র, তাই সর্ববাদিসম্মত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তিনিই হয়েছিলেন, তাঁর যত্ন হওয়ায় ভ্রাতা সারিয়ার তাঁর রাজপিত্তা বাদশাহের ত্রিংশ পুত্র হোলেন। জাহাঙ্গীর এই পুত্রকে, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বোলে ঘোষণা কোরে দিলেন। চমক ও সারিয়ার এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর বেশ সৌহৃদ্য, বেশ সৌভ্রাতৃত্ব ছিল। উভয় ভ্রাতাই পিতার অভিক্রটিমত সন্তুষ্ট থাকতে সম্মত হোলেন। শাজাহানের চরিত্র কিন্তু সেরূপ ছিল না। শাজাহান অতি যদগর্ভিত, অতি নৃক, অতি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন। চমক ও সারিয়ার বাদশাহের কাছে প্রিয় ছিলেন বোলে ভ্রাতাদের প্রতি অতিশয় বিষেষভাব জানাতেন। চমকের দুই পুত্র, এক কন্যা হয়, সারিয়ার নিঃসন্তান। আমি তখন জাহাঙ্গীরের দরবারে দৈবজ্ঞের ব্যবসায় করি, আমার নাম গুরুদাস। আমার কুঁতলা আরবজাতীয়, আমার মাতা আরমানি। আমি বাল্যকাল থেকে রাশিচক্রের গণনা ও গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি অবগত হোয়ে অভ্যস্ত আমোদিত হোতোম, তাই প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞা অভ্যাস কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। আমার বয়স্তোরা, আমার সমকালীন লোকেরা আমা অপেক্ষা অতিশয় হুঁপুট, অতিশয় বলিষ্ঠ ছিলেন, তাই তাঁদের মধ্যে কেউ রণপ্রিয় হোলেন, কেউ বা শীকার-আমোদে অম্লরক্ত হোলেন। চমক আমার সংসর্গ অতিশয় ভাগবাস্তেমন। বিজয় পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বোলে সেই সূত্রে চমকের সঙ্গেও তাঁদের আলাপ-পরিচয় হয়। তৎকালীন আরাকানবাসীদের সঙ্গে জাহা-

ঙ্গীরের অতিশয় মনোহর ঘোটেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ আরাকানের একজন গুটপুরুষ পণ্ডিতদের মধ্যে প্রতিষ্ট হয়ে চমকের কাছে সদাসমীচনা যাতায়াত করে। শাজাহান চিরকালই চিত্রাঙ্কসঙ্কলন কোরে বেড়াতেন, রাজপুত্রের এই ছিন্ন পেয়ে বাদশাহের কাছে স্পষ্ট চূর্ণীম কোরে বোলেন, “চমক তাঁর বিকল্পে চক করিতেছে।” এ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞান কথা সাজিয়ে চমকের নামে বিস্তর ঘনি কোত্তে পাঠলেন। জাহাঙ্গীরের মনে খটকা জন্মিল, বাদশাহ বিবেচনা কোল্লেন, শাজাহানের কথা সত্য হোতে পারে, তাই চমককে এবটা নির্জনে কোল্লোত্তে পাঠিয়ে সেইখানে তাঁকে আকী-বন কাপারক্ক কোরে তাগিলেন। জীপুত্রের মায়া জন্মের মত পরিভাষণ কোত্তে করে, আর কখন কখনে ধাবলোভন কোত্তে পারবেন না, সে বিষয় রাণোজ পুরীকোত্তে জানুত্তে পেরেছিলেন, তাই সারিয়ারের হাতে দেয়ে, বিস্তর বোলোভায়ে, স্বী আত সম্মানগুলিকে তাঁর আশ্রয়ে সমর্পণ কোল্লেন। সারিয়ার প্রদিশিত হয়ে বোলেন, সম্মান-গুলিকে পুত্রবৎ সেছে লালন-পালন কোব-বেন, হুঃখিনী মাতাকেও রক্ষণাবেক্ষণ কোব-বেন। তাই তাই যখন বিদায় হন, স্বী-পরিবারের আশ্রিতাদে রাজবাটী পরিপূর্ণ হোলো। চমক সারিয়ারের হস্তে একটি চূন্নির আংটি দিয়ে বোলেন, “ভাই! এই আংটিটি গ্রহণ কর, এটি পিতা আমার প্রদান করেন, তোমারও ঐরূপ একটি আংটি আছে। পিতা যখন আমাদের মেহমমতা কোত্তেন, আমাদের কাজকথার প্রতি যখন তাঁর প্রতীতি ছিল, সেই সময় আংটি দুটি আমাদের প্রদান করেন, এক্ষণে আমার উপর তাঁর সেরূপ রূপা, সেরূপ রক্ত নাই। আল্লা করুন, তোমার কোন নন্দ্যচন্দ্রের কথা বাদ-শাহ যেন কর্ণে স্থান না দেন, তোমার কুৎসার প্রতি তিনি যেন বধির হন। ভাই! তুমি খুব দাবধান, খুব সতর্ক হয়ে চোলবে, চারিদিকে যেন দৃষ্টি থাকে, শাজাহান অতি দুর্জনে,



‘অতি দুর্দান্ত থল, সে যেন তোমার নামে  
ছনাম কবুবার অবসর না পায়।’

সারিয়ার আংটি গ্রহণ কোলেন, যে  
আত্মলে আপনার আংটিটি পরা ছিল, তার  
পাশের অতুলিতে ভ্রাতৃদত্ত অঙ্গুরীটি পরি-  
ধান কোলেন, পরিধান কোরে বোলেন, “এটি  
আমি জীবনাবধি ধারণ করবো।” চম্ভুর  
প্রতি এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা হওয়ার আমি অভি-  
শয় কাতুর হোলেম, জ্ঞান হলো, আমি যেন  
শোকরাশির অতল গভীরে নিমগ্ন হোলেম,  
সে শোক সহ্য কোন্তে না পেরে অন্তর্জালায়  
ছটকট কোন্তে কোন্তে ছুটে গিয়ে একটি  
কাকা মরুতানে এসে পোড়লেম। নিকটে  
একটি গিরিগুহা ছিল, সেই গুহার মধ্যে  
আশ্রয় নিলেম। স্থল পরিত্যক্তে ঐ গুহাটি  
নির্মাণ করা হয়। আশ্রয় নিয়ে প্রতিজ্ঞা  
কোলেম, আর আমি কখন দিল্লীর ভিতরেও  
প্রবেশ কোব্রো না, জাহাঙ্গীরের দরবারেও  
যাবো না, যে হেতু সেখানে বিচার নাই।  
একপাশে বিশ্বের লোক আমার সঙ্গে দেখা  
কোন্তে আসতে লাগলো, তাদের অদৃষ্টে কবে  
কি ঘোটবে, সেই কথা গণনা কোরে বোলে  
দিতেম, তাতেই আমার দিনপাত হোতে  
লাগলো, যদি বিষয় বিশেষে আমার বাক্য  
সফল না হোতো, তাতে কোন হানি ছিল  
না, তাদের পূর্কেই বোলে দিতেম, আমার  
কথা এখন না খাটুক, হুদিন পরে খাটবে। ঐ  
তোকবাক্য বোলে আপনার পথ পূর্কাক্ষেই  
পরিষ্কার কোরে রেখে দিতেম। আমি যেন  
বাক্‌সিদ্ধ, সে সকল লোক আমার সেইরূপই  
গৌরব কোন্তে লাগলো। দুটি একটি কথা  
দৈবাৎ কখন সফল হোতো, তাতে কোরেই এ  
দেশ সে দেশে নাম-খ্যাতি হোয়ে পোড়লো।  
একবার শাহজাহান বাদশাহ স্বয়ং আমার সেই  
নির্জন আবাসে এসে উপস্থিত হন। একটি  
ঘটনার বিষয় তোমার বোলবো, সেই ঘটনার  
পরেই তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।  
চম্ভু ও সারিয়ার এই রাজপুত্রদ্বয়ের সঙ্গ  
পরিভ্রমণ কোরে চোলে এলে পর তাম্র  
ভূতীর দিবসে রাজ হই হয়, এমন সময় একজন

যুবক উর্জ্বাসে দৌড়িয়ে এসে বোলে, সে  
দৈবাৎ হোঁচোট খেয়ে একটি মৃতদেহের  
উপর পোড়ে গিয়েছে, যখন পোড়ে যায়,  
তখনও সে ব্যক্তি গোঁড়াচ্ছিল, তাই বোধ  
হয়, সে মরেনি, এখনও বেঁচে আছে, ঐ কথা  
শুনে আমি একটা আলো নিয়ে দৌড়াদৌড়ি  
সেইখানে চোলে গেলেম, গিয়ে দেখি না,  
চম্ভু মৃতপ্রায় হোয়ে পোড়ে আছে, তাঁর  
শরীরে এমন স্থান ছিল না যে, সেখানে  
দুর্জয় অস্ত্রঘাতের চিহ্ন নাই। দেখে আমি  
শিউরে গেলেম, আমার হৃৎকম্প হোতে  
লাগলো। সেই যুবক আর আমি দুজনে  
হাতাহাতি কোরে নিজস্বদেহে দেহটিকে  
আমার নির্জন আবাসে এনে  
ফেলেম, কৃষককে বারংবার সাবধান কোরে  
দিলেম, যে যেন এ কথা কদাচ মুখের বার  
না করে। চম্ভুকে ঘরে এনে সেবা-শ্রদ্ধা  
কোন্তে লাগলেম, চিকিৎসা শাস্ত্রও আমার  
জানা আছে, তাই ঔষধ পত্রেরও ব্যবস্থা  
কোলেম। দিনকয়েক পরে রাজপুত্র সুন্দর-  
রূপে আরোগ্য হোয়ে উঠলেন, তাই দেখে  
মহা আশ্চর্যমিত হোলেম, তাঁর ভ্রাত্তে একটি  
গুপ্ত-কুটীর নির্দিষ্ট কোরে দিলেম। স্থানটি  
বড় নির্জন, কেউ অহুসন্ধান কোরেও তার  
সন্ধান পেতে পাভো না। আমি আমার  
পূর্কের মতন লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ  
কোন্তে লাগলেম। চম্ভু যে সময় দুর্দশাপন্ন  
হোয়ে সেই নির্জন কুটীরে পোড়ে আছেন,  
তাঁর কালের স্বরূপ সহোদর শাহজাহান কন্ডরে  
এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কতক-  
গুলি বহুমূল্যের উপহার আমার প্রদান  
কোরে বোলেন, তিনি তাঁর অদৃষ্টের বিষয়  
জানতে বাসনা করেন। আমি বোললেম,  
তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে। সে কথা বস্-  
বার বাধা কি, সিংহাসনের পথ আপনার ভ্রাত্ত  
পরিষ্কার করবার নিমিত্ত তাইয়ুরবংশ নির্মল  
করা তাঁর অভিপ্রায়। যার এরূপ রক্তপানী  
নৃশংস চরিত্র, সে যে সম্রাট হবে, সে কথা  
বিচিন্তা কি? তার পর বোলেম, তোমার পুত্র-  
সকল দুর্জয় হবে, তারা তোমার কারাবধ

কোরে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা কোরবে, কালক্রমে সেই সকল ঘটনা উপস্থিত হোলে আমার বাক্য সপ্রমাণ কোরে দিয়েছে, আমার সেই ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা বোধ হয় শাজাহানের মনে সর্বদাই উদয় হয়ে থাকে। শাজাহান নিজের নিষ্ঠুর, পাপস্বভাব এবং ছলোভী, তাঁর বংশাবলী যে সংপাত্ত সাধু হবে, সেটা অতি অসম্ভব! তাদের পিতা যখন ভ্রাতৃহত্যা কোরেছিলেন, তখন তাদের প্রকৃতিও যে পিতার অশুররূপ নিষ্ঠুর হবে, সেটা আর বিচিত্র কথা কি, বরং সেই সম্ভাবনাই অধিক। মনুষ্যের স্বভাব, মনুষ্যের প্রবৃত্তি অধ্যয়ন কোরে এই ভবিষ্যৎ-বাক্য বোলতে সক্ষম হোয়েছিলেন। রাজপুত্র চস্কর এক মাসের মধ্যে আরোগ্য বহায়ে চোলে ফিরে বেড়াতে লাগলেন, রাজ্যে কিন্তু গৃহের বার হোতে তাঁর সাহস হোতো না। আমার ইচ্ছা ছিল, রাজপুত্র পিতার কাছে গিয়ে ভ্রাতার নৃশংস আচরণের কথা নিবেদন কোরে মুক্তকণ্ঠে বিচারের প্রার্থনা করেন, 'র ভক্তে বিশ্বর যত্নও কোরেছিলেন, চস্কর কিন্তু সে কথা গ্রহণ কোলেন না, তিনি বোলেন, তাঁর পিতা তাঁকে রাজ্যপুত্র কোরেছেন, তাই আর বাদশাহের মুখদর্শন কোরবে না, পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাবার নিমিত্ত প্রাণপণে একবার চেষ্টা কোরে দেখবে, যে হেতু তখন রাজসিংহাসন ছাড়-মত তাঁহারই হওয়া উচিত, আপাততঃ তিনি পারস্থানাদি দেশ ভ্রমণ কোতে যাত্রা কোরবেন। রাজপুত্র আমার ডেকে বোলেন, "শুভসাহ! তুমি আমার পরমবন্ধু, আমার ভ্রাতা সারিয়ার শাজাহানের নিষ্ঠুর কোপে পোড়ে প্রাণে যদি মারা পড়েন, তবে তুমি আমার সম্ভানগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখো।" আমি বোলেন, "আমি তা রাখবো, তাদের রক্ষণাবেক্ষণও কোরবো।" আমার মূখে ঐ কথা শুনে রাজপুত্র চস্কর দেশভ্রমণের যাত্রা কোলেন।

শাজাহান বাদশাহ ঐ পর্যন্ত সারিয়ারের প্রতি পিতৃবৎসল হোয়ে বখেটে মেহবব কোতে

লাগলেন, তাই দেখে শাজাহান মনের ভিতর জোলে পুড়ে মোতে লাগলেন, রাগেবো প্রকাশ কোতে লাগলেন, সারিয়ার কিন্তু খুব সাবধান সতর্ক হোয়ে চোলে লাগলেন, শাজাহান কোম ছল-ছিদ্র পান না, স্ত্রীরাং চস্কর মতন বাদশাহের কাছে সারিয়ারের নামে 'খানি কোতেও পারেন না। রাজপুত্র সারিয়ারের কাছে দুটি লোক সর্বদা যাত্রা-য়াত করিও, আমি কিন্তু তাদের প্রতি ভারি বিরক্ত ছিলাম, তাদের নামে 'খানি কোরে রাজপুত্রকে মধ্যে মধ্যে সতর্কও কোরে দিতাম, সারিয়ার কিন্তু তোষামোদের বক্তা ছিলেন, তাই তাদের প্রতি রুষ্ট না হোয়ে বরং সন্তুষ্ট থাকাই জানাতেন। ঐ লোক দুটিকে আপ-বার কাছেই রেখে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম সাহজাখাঁ, অপর জনের নাম নজফালী খাঁ। ঐ দুই ব্যক্তির পরিচয় আমার সুন্দররূপেই জানা আছে, তাদের কথা আমায় আর বোলতে হবে কেন? রাজপুত্র সারিয়ার একবার সেখ খাজামাউদীনের পবিজ গোরহান দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতৃপুত্র পুত্রী সঙ্গে নিয়ে আজমীরের তীর্থযাত্রা করেন, সাহজাখাঁ ও নজফালী খাঁ ঐ পারিষদ দুটিও তাঁর সঙ্গে আইসে, সেই খাজার নাম পবিজ হোয়ে লোকে চিরস্মরণীয় হোক। সে সময় কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হোয়েছে, রাজপুত্র নিষ্ক-গায় হোয়ে আমার দীমছুখী মলিন পর্বত-কূটরে আশ্রয় গ্রহণ কোতে বাধ্য হোলেন, আমি অবস্থামত রাজপুত্রের আতিথ্য কোলেন, সে দিনকার রজনী ঘোর তমোময়ী হয়ে অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করে, ঘন ঘন গভীর মেঘগর্জনে, ঘনঘন বিদ্যুৎপাত হোতে লাগলো, তার উপর আবার যেমন কড়, তেমনি বৃষ্টি হোয়ে পৃথিবী-যেন রসাতলে যাবার উপক্রম হলো, আমার দীমছুখী কূটরটি জলে ভাসতে লাগলো, রাজপুত্র অতি শয় ক্লান্ত হোয়েছিলেন, তাই সেই অবস্থায়ও শিশুসম্ভানগুলির হস্ত ধোরে অকাতরে নিদ্রা বেতে লাগলেন, তাঁর পারিষদদের দেখে বোধ হলো, তারাও রাজপুত্রের স্থায় গভীর

## উজীর পুত্র

নিজ্রায় অচেতন হয়েছিল। নিশীথরাত্রের পূর্বেই আমার ক্ষুদ্র কুটীরটি নীরব নিশ্চল হলো। আমার চক্ষু দুটি নিজ্রায় কেবল আক্সা হুয়ে আসছিল, এমন সময় পার্শ্বগৃহে ছটো-ছটীর ঝটাপটির শব্দ শুনে পেলেম, ঐ গোলমালে উঠে বোসলেম, সেট পাশের ঘরে প্রবেশ কোরে, দেখি, রাজপুত্রের বসঃস্থলে দুটি অস্ত্রাঘাত হোয়েছে, যেমন না নরদমার মুখ দিয়ে জল গোড়িয়ে পড়ে, সেইরূপ ঐ দুটি অস্ত্রাঘাতের মুখ দিয়ে হুড় হুড় কোরে রক্ত গোড়িয়ে পোড়ছিল, রাজপুত্র, সেই লোহিততরঙ্গের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন! হায়! একি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর অভিনয় দর্শন কোলেম, দেখে আমার হৃৎকম্প হোতে লাগলো, আমার জীবন থাকতে সে বিকট নৃশংসদর্শন কখনও বিস্তৃত হবো না। বালক-বালিকারা এই নির্দয় ঘটনার কিছুই অবগত নয়, তারা চীৎকারশব্দে খুল্লতা তাকে ডাকতে লাগলো। একটি বালকের একখানি হাত রাজপুত্রের বৃকের উপর আড় হোরেছিল, তার সেই হাতের কবজাতে নরঘাতকের ছোঁয়ার অল্প একটু চোট লাগে, তারই বেদ-নায় বালকটি কোকিয়ে কোকিয়ে কাঁদতে লাগলো, আমি সে দিকে কর্ণপাত না কোরে সারিয়ারকে বাঁচাবার নিমিত্ত যত্ন কোন্ডে লাগলেম, আমার যত্নে কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না, রাজপুত্র আমার হাতের উপরেই চরমনিখাস পরিত্যাগ কোরে প্রাণত্যাগ কোলেন। আমি প্রভাত হোতে না হোতেই সন্তানগুলিকে নিয়ে দিল্লী যাত্রা কোলেম, ভাবলেম, সেখানে গিয়ে এই দুর্ঘটনার কথাগুলি বোলে লোকের মন ত্রাসে পরি-পূর্ণ কোরে দেবো। দুই পর্বতের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র খুঁড়ি-পথে নিষ্ঠুর সাহুল্লা খাঁ, আর তার নৃশংস সহচর নজফালী খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো, তারা ঠাট্টার স্বরে আমার জিজ্ঞাসা কোলে, আমি কোথায় চোলেছি, জিজ্ঞাসা কোরেই আমার ঐখান থেকে ফিরে যেতে বোলেন। যেখানে অপশাতবুড়াপ্রাপ্ত রাজপুত্র অবস্থে থলোয়

উপর পোড়ে আছেন, আমি তাদের সঙ্গে সেইখানে ফিরে চোলেম, যমদূতের স্বরূপ সেই কালান্তক নরহস্তারা একটি কবর খনন কোলে, আমার দিগ্বেগ জোর কোরে খুঁড়িয়ে নিলে। তারা যে এই দুঃস্থ নিষ্ঠুর কার্যে লিপ্ত ছিল, পাছে সে কথা কখন প্রকাশ করি, তাই আমার শাসাতে লাগল, তারা প্রতিজ্ঞা কোরে বোলেন, যদি এ কথাগুলি ঘৃণাকরে কাহারও কাছে প্রকাশ করি, তবে এই সন্তানগুলিকে তাদের পিতৃব্যপথের পথিক কোরে দেবে, আর যদি আমি ঐ দুঃস্থ কথা-গুলি অপ্রকাশ রাখি, তবে সন্তানগুলিকে নিয়ে তারা প্রতিপালন কোরবে, সন্তানগুলি যে অপ্রমাদে, কি নিরাপদে থাকবে, আমার মৌনাবলম্বন থাকাই তার জামিনস্বরূপ হলো, সন্তানগুলির অহুরোধে আমার প্রতিশ্রুত হোয়ে বোলতে হলো। তারা যে পর্যন্ত জীবিত থাকবে, তাদের নাম কোনক্রমেই ব্যক্ত কোরবো না, তারাও পুনর্বার প্রতিজ্ঞা কোরে বোলেন, ঐ সন্তানগুলিকে আপনার সন্তানের মায় লালন-পালন কোরা নজফালী খাঁ কিন্তু তৎকালীন গৃহশূন্ত ছিলে, তাই তিনি বোলেন, তাঁর পরমাত্মীয় বৃ-কন্দাজ খাঁর হস্তে একটি পুত্রকে আর একটি কন্যাকে সমর্পণ কোরবেন, সে ব্যক্তি তাঁর ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতৃকন্যা এই ঘোষণা কোরে দিয়ে তাদের রীতিমত প্রতিপালন কোরবে, তাদের পিতা-মাতা কে, কোন্ বংশে তাদের জন্ম, সে পরিচয় কিন্তু তাদের অবগত করাবে না। সাহুল্লা খাঁ একটি মাত্র বাল-ককে লয়ে চোলে যান, তার নিজ অস্ত্রাঘাতে যে বালকের হস্তে একটি চিহ্ন হয়, আমার বোধ হয়, সেই বালককেই সে গ্রহণ করে। ঐ কথা শুনে আমি (উজীর পুত্র) অমনি চোম্কে উঠে বোলেন, “হে করুণাময় জগদী-শ্বর! তবে আমিই কি সেই বালক?” দৈবজ্ঞ বোলেন, “কান্ত হও, বাস্তব হইও না, এই কথা স্থির হয়ে কালান্তক চোরাডেরা রাজ-পুত্রকে বিবস্ত্র কোরে তাঁর অঙ্গে যত রক্ত ছিল, আপনার ভাগবাটোরা কোরে নিলে,

চুনির আংটি দুটিও দুর্ভাগ্যে হিষ্টা কোরে নিলে।”

গুরুসাহ্ আমায় বোলেন, “তুমি যে আংটিটিপোরে আছ, ঐ আংটিটি তোমার পিতা চম্‌কুর হাতে ছিল, তোমায় আর অন্ধ-কারে রাখবার প্রয়োজন নাই, তোমার পথিকসংচর বথারালীই তোমার পিতা।” গুরুসাহ্ যে কথা শোনালেন, সেটা আমি পূর্বেই আন্দাজে আন্দাজে বন্ধ জানতে পেরেছিলাম, যথেষ্ট কিছু প্রকাশ করি নাই, ভাবলেম, তিনি যা বোল্‌ছেন বোলে যান, দেখি, তাঁর মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে পড়ে। গুরুসাহ্‌র মুখে যখন অবধারিত শুন্‌লেম, বথারালী আমার পিতা, শুনে আমি হতজ্ঞান-প্রায় হলেম, তখন মনের মধ্যে কত প্রকার পরস্পর বিরোধী ভাব উপস্থিত হইল আমার অস্তঃকরণ ব্যাবুল কোন্‌তে লাগলো, ঐ সংবাদ শোনবার পর আমি কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হোলে বন্ধ বোলেন, “কই, দেখি দেখি, তোমার হাতখানি দাও তো দেখি।”

আমি অননি হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বোলেন, “হাঁ, আছে বৈকি, ঐ যে, দাগ রয়েছে দেখা যাচ্ছে, দাগটি ডান হাতে ছিল।”

বন্ধ বোলেন, “উপরে পুরমেশ্বর আছেন, সে কথা যেমন সত্য, তুমি যে চম্‌কুর পুত্র, ঐ কথাও তেমনি সত্য। সস্ত্রাট জাহাঙ্গীর তোমার পিতামহ।”

নর্দমার মোহানা দিয়ে যেমন না জল গড়িয়ে পড়ে, আমার চক্ষু দিয়ে সেইরূপ অশ্রু গড়িয়ে পোড়তে লাগলো, এ অশ্রু চুই প্রকার,—শোকের আর আশ্রাদেব—আশ্রাদেবের কারণ এই, এত কালের পর আমার বংশের পরিচয়, আমার পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হলেম। আমার পিতা যে ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে হতসম্পত্তি হোয়েছেন, আমার খল্যাতাতের যে অপঘাত-মৃত্যু হোয়েছে, সেই দুঃখ অরণ কোন্‌তে অতিশয় শোকাবুল হোলেম। আমি বোলেন, “হে রূপাময় জগদীশ্বর! তবে কি আমি সেই নরহত্যা নৃশংস শাজাহানের অশ্রু-

রোধে আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন কোন্‌তে গিছিলাম! সেই নির্ভর অপঘাতকের মিমি-তেই কি এত কাল পরিভ্রম কোন্‌তে হোয়ে শরীর পতন কোলেম, হায়! সাদল্লা খাঁর যদি কথা কহিবার ক্ষমতা থাকতো, তবে কোন্‌ কালে বংশের পরিচয় দিয়ে আমার মনের অন্ধকার দূর কোন্‌তে। তিনি যখন আমার অঙ্গুরিটা প্রদান করেন, তাঁর মনের অভিশ্রু প্রায় তাই ছিল। নজফালী ণাঁও ঠিক কথা বোলেছে, সে ব্যক্তি আমার বোলেছিল, আমি যে কথা শুন্‌তে বাসনা করি, তিনি তালা অনায়াসেই বোল্‌তে পারেন, তবে এই কথা বোলেন, সে সকল বৃত্তান্ত কদাচ তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হবার নয়। তা যাই হোক, এখনও অনেক বিষয় অবগত হতে বাকি আছে—আমার ভাই কোথায়? আমার ভগিনী কোথায়? তারা সব কোথায় গেল? হা আলা! তবে কি ইউসুফ আমার ভাই? তবে কি দেলজান আমার ভগিনী?”

দৈবজ্ঞ বোলেন, “বুদ্ধদাজ খাঁ যে সন্তান-গুলিকে প্রতিপালন করেন, তাঁরা কি ঐ নামেই খ্যাত ছিলেন?”

আমি বোলেন, “হাঁ, ঐ নামেই খ্যাত ছিলেন।”

“তাঁর কি নিজের সন্তান-সকলি ছিল না?”

“না।”

“তবে তো ঠিকই হয়েছে, ইউসুফ তোমার ভাই, দেলজান তোমার ভগিনী।” একপে বাক্যে ... মজাবেগে আমার চক্ষু দিয়ে অনর্গল অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। দেলজানের অপঘাত-মৃত্যুর বৃত্তান্ত অনেক কষ্টে বুদ্ধকে অবগত করালেম।

গুরুসাহ্ বোলেন, “তবে আমি যে কথা শুনেছি, সে কথা মিথ্যা নয়। নজফালী বিবাহ করেন নি বটে, একটি কৃষ্ণপঙ্কের কন্যাকে কিছু লালন-পালন কোন্‌তে, ঐ কন্যার প্রতি তাঁর অতিশয় স্নেহ ছিল, স্নেহে মেন অন্ধ ছিলেন, ঐ কথা যে নিজহন্তে তোমার ভগ্নির প্রাণ নষ্ট করে, সে কথাও আমি শুনেছি।”

আমি চীৎকার কোরে বোলতে লাগ-  
লেম, “হা দেলজান! তোমার অপঘাত-  
মৃত্যুতে আমি যে কত হাহাকার কোরেছি,  
কত বিলাপ কোরেছি, জগদীশ্বরই তা  
জানেন, তুমি যদি এতদিন জীবিত থাকতে,  
তবে বিধাতা অদৃষ্টে যে কি কর্মফল লিখ-  
তেন, তা এক্ষণে বলা যায় না, হয় তো তুমি  
আমার প্রাণস্বিনীই হতে!”

দেলজানের সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ না  
হয়, তার জন্তে সাহুলা খাঁ যে কেম তত  
আপত্তি কোরেছিলেন, তাঁর মর্ম্ম এখন আমি  
বুঝতে পার্লেম। এই জন্মেই তিনি তাঁর  
পাপস্বভাব বন্ধু নজফালীর কড়া নূরমহলকে  
আমার প্রাণস্বিনী করবার চেষ্টা পেয়েছিলেন।  
সাহুলা খাঁ যে আমার পুত্র নির্বিশেষে লালন-  
পালন কোরেছিলেন, তার মর্ম্ম আর কিছুই  
নয়, শুদ্ধ আমার উপলক্ষ কোরে তাঁর দুর্কা-  
সনাগুলি সুসিদ্ধ কোরে লভেন, আমার  
যেন হস্তের হাতিয়ার কোরে রেখেছিলেন।  
সাহুলা খাঁ কারারুদ্ধ হলে আমি যে রাজ-  
পুত্র, সে কথা আমার অবগত করিয়েছেন কি  
না, তাই নিশ্চয় জানুবার নিমিত্ত আরজজেব  
ও নজফালী খাঁ তত উৎকণ্ঠিত তত উদ্বিগ্ন  
হয়েছিলেন। আমি যে রাজকুলে জন্মগ্রহণ  
কোরেছি, সে বিষয় আমি যথার্থই অনভিজ্ঞ  
ছিলেম। তন্নিমিত্ত লোকের কাছে এমন সাব-  
ধান হয়ে কথাবার্তা কোইতেম, তারা শুনে  
মনে কোতো, সাহুলা খাঁ হঠাৎ আমার  
পিতা, তাতেই বোধ হয় আমার না হোরফা  
হয়েছিল। আমি রাজপুত্র বোলে আরজজেব  
আমার সম্বন্ধে বড় সাবধান হয়ে চলতেন,  
রাজপুত্র আমায় কদাচ কখন প্রাধান্যপদে অভি-  
ষিক্ত করেন নাই, পাছে আমার বংশবৃত্তান্ত  
প্রকাশ হোয়ে পড়ে, প্রকাশ হোয়ে পোড়লে  
পাছে নিজস্বার্থের নিমিত্ত তাঁর বিরুদ্ধে অস-  
ধারণ করি, তাঁর মনে সেই ভ্রাস বড় ছিল।  
এই সকল চিন্তা, এই সকল বিবেচনা একটি  
একটি কোরে আমার মনোমধ্যে মুহূর্ত্ত  
উদয় হোতে লাগলো। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত  
সংশয়, কত সন্দেহ উপস্থিত হোয়ে আমার

অন্তঃকরণ ভোলগাড় কোঙে লাগলো, তা  
বোলে শেষ কোতে পারিনে, এমন কি, সন্দে-  
হের উপর সন্দেহ হোয়ে আমার মনের ভিতর  
সন্দেহের যেন ভিড় লেগে গেল। আমি, কি  
আমার ভাই, কি আমার ভগ্নি, আমরা সক-  
লেই যে জীবিত আছি, শাজাহান বাদশা সে  
বিষয় সুবিদিত ছিলেন না। সাহুলা খাঁ যখন  
কিরে-দিব্যা কোরে বোলে, রাজপুত্র সান্নি-  
য়ারকে মেয়ে কেলেছে, তিনটি সন্তানকেও  
প্রাণে নষ্ট কোরেছে, ঐ কথা বোলে সে যখন  
পুরস্কারের প্রার্থনা কোলে, শাজাহান তখন  
মনে কোলেন, তবে নিশ্চয়ই কেউ জীবিত  
নাই। আমি যে আরজজেবের ভাই, সে  
সজ্ঞান রাজপুত্র কি কোরে জানতে পারেন  
আমি তো তার কিছুই স্থির কোতে পার্লেম  
না। যতদিন আমি আমার নিজ পরিচয় অবগ-  
ত ছিলেম, তত দিন রাজপুত্র আমায় অনা-  
দর করেন নি, এবং ভাল ভাল কাজকর্মের  
ভার দিয়ে সমাদরই কোরেছেন, তথাচ কিছু  
উচ্চ গোরবের পদে প্রাণান্তেও আমার অভি-  
ষিক্ত করেন নাই, রাজপুত্র খুব সাবধান সতর্ক  
হোয়ে চলতেন। নজফালী খাঁ যখন রট  
পুত্রের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন, যৎকালীন সাহুলা  
খাঁর প্রতি পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়,  
বোধ হয় সেই সময় ঐ নজফালী খাঁই রাজপুত্র  
আরজজেবকে আমার বিষয় অবগত করান।  
নজফালী খাঁ কিছু এক্ষণে মানবলীলা সংবরণ  
কোরেছেন, রাজপুত্রের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধক্ষেপ  
হোয়েছে, তাই এক্ষণে আর সে সকল বিষয়  
অবগত হবার উপায় নাই। সাহুলা খাঁ আমার  
বারম্বার বোলেছেন, আরজজেবের হস্তে তাঁর  
জীবন, তাই বোধ হয় তিনি যে একজন অপ-  
ঘাতক, সে কথা রাজপুত্র মনে কোলেই প্রমাণ  
কোরিয়ে দিতে পারতেন। বুদ্ধ শাজাহান যৎ-  
কালীন চারি পুত্রকে বন্দী করবার অভিপ্রায়  
করেন, সেই সময় সাহুলা যে আরজজেবকে  
বাঁচাবার নিমিত্ত তত ব্যগ্র, তত সচিন্তিত  
হন, তার কারণ এই ভিন্ন আর কিছুই নয়,—  
সাহুলার অপরাধ ভিন্ন আর কিছুই নয়।  
সাহুলার অপরাধ সপ্রমাণ কোতে হোলে নজ

কালী খাঁর দ্বারা আরম্ভের, কোন প্রকার উপকার হবার প্রত্যাশা ছিল না। যেহেতু, তা হোলে নজফালীকেও সেই কাদে জড়িয়ে পোড়তে হতো। তবে যে আরম্ভের কি কোরে সাহুল্লা খাঁর কষ্টকরূপ হোয়েছিলেন, সে বিষয় আমি ভেবেই স্থির কোন্তে পাচ্ছি না, দৈবজ্ঞকে বোল্লেম, “যদি তিনি এই ঘোর জটিল কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে আমার উৎকর্ষা নিবারণ কোন্তে পারেন, তাঁর কাছে আমি চিরবাসিত হোয়ে থাকি।” দৈবজ্ঞের কিছু তত বিজ্ঞা ছিল না যে, আমার সেই উদ্দেশ্যের অপনয়ন করেন। আমাদের কথোপকথন হোচ্ছে, ইতিমধ্যে আমার পিতা ফিরে এলেন, তাঁরে দর্শন কোবেই, আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উৎকর্ষা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হলো। এক আমি সবে মাত্র প্রথম ল্লাহু অবনত কোরে পিতাকে প্রণাম কোলেম।

আমার পিতা চমক বোলেন, “পুত্র! পুত্র! উঠ, দারবকস উঠ, তোমার প্রকৃত নামই ঐ। এই বুদ্ধ মহোদয় বুঝি তোমার জন্মবৃত্তান্তের কথা তোমার অবগত কোরিয়েছেন?”

আমি বোল্লেম, “আজ্ঞে হাঁ, তাঁর মুখে সব শুনেছি। আপনার প্রতি যেরূপ অবিচার হোয়েছে, আপনি যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হোয়েছেন, তাই চিন্তা কোরে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্ছে।” এই সময় হুঃখে আমার অশ্রুপাত হোতে লাগলো, অশ্রুবিন্দুগুলি এত উত্তপ্ত যে, তার স্পর্শে চক্ষু দগ্ধ হোয়ে ঝোলসে যেতে লাগল।

পিতা বোলেন, “বালক! তার প্রতিফল অবশ্যই দিতে হবে। আমি আপনার নিমিত্তে কিছু চিন্তা করি না, কিন্তু আমি যখন পুত্র প্রাপ্ত হয়েছি, সে পুত্রও যখন আমার উত্তরাধিকারী, আবার বিচার-সম্মত সিংহাসন যখন আমারই পাওয়া উচিত, তখন আমি প্রতিজ্ঞা কোচ্ছি, ঐ সিংহাসনের নিমিত্ত একবার প্রাণপণে হটোপাটি কোরে দেখতেই হবে। পুত্র! আমিও মনে জানছি, তুমিও তার জন্তে কায়মনোবাক্যে যত্ন কোরবে। পুত্র দারবকস! তুমি এই প্রতিজ্ঞা

কর, তুমি কখনই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে না, এই দুর্জয় অভিপ্রায় সুসিদ্ধের নিমিত্ত রক্তরূপ নদীর তরঙ্গে যদি সম্প্রদান কোন্তে হয়, তাও কোরবে।”

আমি বোল্লেম, “পিতা! আমি সেই প্রতিজ্ঞাই কোলেম। আমি যদি এই প্রতিজ্ঞা হোতে বিমুখ হই, তবে জগদীশ্বর যেন আমাকে পরিত্যাগ করেন। যে জগদীশ্বর শৈশবে, যৌবনে রক্ষা কোরে এসেছেন, তবে তিনি যেন আমার প্রতি বিমুখ হন, আমার এ দাবি, এ আপত্তি অগ্রাহ্য নয়।”

“পুত্র! তবে তাই ভাল। আমার সম্মান-দিগের সহিত লাক্ষ্য কি কোরে হোতে পারে?”

আমি বোল্লেম, “একজন এখনও উপস্থিত হয়ে আপনার আশীর্বাদ শিরে গ্রহণ কোলেও কোন্তে পারে, কিন্তু আর এক জন,”—“কি, কি বোল্লে, তবে কি সে বেঁচে নাই, আমার প্রিয় পুত্র বেটি, সে কি,—”

আমি বোল্লেম, “না পিতা, আমার ভাই নয়, আমার ভগ্নী মারা পোড়েছেন।”

পিতা বোলেন, “আহা! দুঃখিনী অবলা! তা ভালই হয়েছে, দুর্কিসহ হিংসার নিদারুণ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে।”

“ধায়ের! এত শৈশবে কি কোরে তার মৃত্যু হোলো।”

আমি বোল্লেম, “তা—

পিতা কথন—

আমি বোল্লেম, “অপঘাতক নয়, অপ-  
ঘাতিনী! যে স্বীলোকটি দিল্লীস্থ কেল্লার  
ফটকে রাজপুত্র সুলতান মায়ুদকে প্রতারণা  
কোরে ধোরিয়ে দেয়, তারই হস্তে।”

“তবে সে কালনাগিনী! সে তাড়কা  
রাক্ষসী! আমি যদি দিব্যজ্ঞানে জান্তে  
পান্তেম, ঐ রাক্ষসী আমার স্নেহময়ী কন্ডার  
প্রাণঘাতিনী, তবে কি তার সঙ্গে তত আলাপ,  
তত মন্ত্রণা করি, তার সঙ্গে সন্ডাব করা হুয়ে  
থাকুক, তারে তখনই ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড কোরে

ফেল্‌তেম। আহা সারিয়ার! নজকালী থা।  
আর সাহুলা থা। এই দুটি কালান্তক বমকে  
তুই কোথায় পেয়েছিলি? এ ছরস্ত কাল-  
দস্যুরা কি কোরে তোর বিশ্বাসপাত্র হলো?”

আমি বোলেম, “পিতা! বুদ্ধমহোদয়কে  
হুড়ে কোথায় গিয়ে কালক্ষেপ কোলেন?”

“পুত্র! আমি পারস্থানে ছিলেম, কান্দী-  
তে গিয়েছিলেম, কাবুলেও বাস করেছি,  
সকল স্থানে কোন পক্ষ না কোন পক্ষ  
হয়ে ফেল যুদ্ধ কোরে বেড়িয়েছি, এক মাত্র  
তলওয়ার আমার সহায় ছিল। কতবার মনে  
করে ছিলাম, ঐ তলওয়ার আমার নিজস্বার্থের  
নিমিত্ত ধারণ করবে। একবার ছদ্মবেশে  
দিল্লীতে ফিরে এসেছিলেম, এসে শুন্‌লেম,  
গুরুপাঠের মৃত্যু হয়েছে, আমার সন্তান-  
গুলিরও কোন নাম-নিশানা শুন্‌তে পেলেম  
না, তাই আমার বিদেপে চোলে গেলেম,  
যে মনন কোরে এসেছিলেম, সে মননও  
পরিত্যাগ কোলেম।, পুত্র! তোমার সকল  
কথাই বোলছি, শোন, এ যাত্রা প্রথম  
আগ্রার এসে উপস্থিত হই, এই স্থানের  
রাজার অহুরোধে শাজাহান আমার  
গোয়ালিয়ারস্থ দুর্গের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত  
করেন, তিনি কিন্তু স্বপ্নেও জানেন  
না, আমি কে। তাঁর কোপভাজন অপরাধী-  
-দ্বন্দ্বিতা ঐ দুর্গের মধ্যে করেদ কোরে রাখা  
ছিলেম।

সেই সকল অপরাধীর  
ধান হয়ে কথাবার্তা দিয়ে একটি বান্ধ-  
বের দল আমার কাছে এসে, আমার  
চিন্তিতে পাঠে বোধ হই, সেটি কথার  
নয়। আমার চেহারা বিস্তার পরিবর্তন  
হয়েছে, এই যে গভীর ক্ষতচিহ্নটি আমার  
ললাটে দেখতে পাচ্ছো, এই যে আমার এই  
গালেতে মাংস উড়ে গিয়ে গর্ভের মত  
হয়েছে, দেখতে পাচ্ছো, একটি বোরতর  
বুদ্ধিতে ঐ দুটি চিহ্ন প্রাপ্ত হই, তাই একধকার  
মুষ্টি দেখে কেউ আমার পরিচয় জানতে  
পারেন না। বিশেষতঃ আমি বৎকালীন জাহ-  
পাতিত করি, বৎকালীন বাদশাও পীড়িত  
ছিলেন, সেই সময় যেমন স্বাধীনতা হুঃখ

পেয়েছিলেম, তেমন আর জন্মেও কখন পাই  
নাই, এমন কি, একটি নির্জন স্থানে গিয়ে  
ডুকিয়ে কঁদতে লাগলেম। আমি গোয়ালি-  
য়ারের দুর্গের অধ্যক্ষ হোয়ে সে পদে অধিক-  
কাল নিযুক্ত ছিলেম না। ঐ পদ গ্রহণ কর-  
বার শুদ্ধ এই মাত্র কাংক্ষ্য যে, আমার মনে  
যে দুর্জয় বাসনা ছিল, সেই বাসনা ধ্বংসে  
সিদ্ধ হবে, এই পদ তারই সূত্রপাত হোলো  
মনে কোরেছিলেম, সে অভিশ্রায় যেক্ষণে  
পূর্ণ হবে, ঐ পদে বোসে তারই নকসা, তারই  
কল্পনা মনে মনে চিত্রিত কোন্তে লাগলেম,  
অর্থাৎ আমি রাজপুত্র বোলে পরিচয় দিয়ে,  
হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমারই, এই আপত্তি  
কোসে, শাজাহানের সঙ্গে ধোর বিবাদ উপ-  
স্থিত করবার মানস-কোরেছিলেম, তদ্বিন্ন  
আমার স্নেহের আধার সন্তানগুলিরও সংবাদ  
পাবো বোলে প্রত্যাশা ছিল। আমি কিন্তু  
শেষে দেখলেম, শাজাহান দৃঢ় অটল হোয়ে  
বোসেছেন, এক্ষণে তিনি হেলবার দোলবার  
পাত্র নন। বিশেষতঃ আমার সাধ্য ছিল না,  
তাঁর সিংহাসন কম্পিত কোরে তুলি, তদ্বিন্ন  
তখন আমি নিশ্চয় মনে কোলেম, সংসার  
আমার কেউ নাই, আমি নিঃসন্তান, আমি  
একমাত্র। এই বৈরাগ্যভাব উদয় হোয়ে  
আমার মনে অতিশয় উদাস্ত জন্মিল, আমি  
আমার অভিশ্রায় পরিত্যাগ কোলেম, তার  
পরেই চারিদিক থেকে যুদ্ধ বেজে উঠলো।  
আমি সর্বপ্রথম দারার অহুরেবা করি, তার  
যুদ্ধে পরাস্ত হবার মূলীভূতই আমি, আমিই  
তাকে প্রবৃত্তি দিয়ে হাতী থেকে উত্তীর্ণ হোতে  
বলি। যখন দেখলেম, আমার মনস্কামনা পূর্ণ  
হয়েছে, দেখে আমার মনে বড় উল্লাস  
হোলো। সুলতান সুলতার পক্ষ হোয়েও যুদ্ধ  
কোরেছি, তাকেও ঐরূপে উচ্ছিন্ন দিয়েছি।  
ইচ্ছা ছিল, আরদজেবকেও ঐরূপে উচ্ছিন্ন  
দেবো, সে ব্যক্তি কিন্তু জয়ের উপর জয় লাভ  
কোরে নিরাপত্ত হোলো, তাই আর তার  
নতন সেনাপতিত্ব প্রয়োজন হোলো না, সে  
ব্যক্তিও তার পিতার ভ্রাতা নিরপরাধীর পবিত্র  
কবিরপাত কোরে আগনার অভীষ্ট সিদ্ধ



করেছে, এক্ষণে তিনি একমাত্র সর্বজয়ী পুরুষ হোয়ে দাঁড়িয়েছেন। পুত্র! আমাদের আপা-  
— একটি কৰ্ম কোত্তে হবে,—একটি নির্ঘাত প্রথার কোরে আরজজেরকে সবেগে রসা-  
তলে নিক্ষেপ কোত্তে হবে, তার দুর্কাসনার উচ্চশব্দ হোভে তহাত দিয়ে টেনে ছুড়ে কেলৈ দিয়ে তারে ঘোর অধঃপাতে পাঠাতে হবে, সুবিচার এখনও দেশের মধ্যে সর্বজয়ী হোয়ে দর্প কোরে বেড়াচ্ছে।” গণককার বোলেন,  
“ঈশ্বরের মনে বা আছে, তা হবেই, আমি আশীর্বাদ কোচ্ছি, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।”

আমার পিতা বোলেন, “গুরুদাস! আপনি এতাবৎকাল কোথায় ছিলেন? কিক্রমে কাল-  
যাপন কোরেন?”

গণককার বোলেন, “জেনাবাহী! আমি আরব দেশে গমন কোরেছি, কুশতন্তু নিয়ে পারস্থান, তিব্বত, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ কোরেছি, কেবল চতুরতার উপর নির্ভর কোরেই দিনপাত কোরেছি, কখনও গণক-  
কার হোয়ে লোকের কাছে পরিচয় দিয়েছি, খন বা বাদশাহের সভায় অবস্থান কোরেছি, রাজারাজড়ারা আমার পরামর্শদানের প্রার্থনা কোরে কতবার আমার ডেকে পাঠিয়েছেন। সকল রাজদরবারেই সমাদর পেয়েছি, বিশেষতঃ আমি এ দেশে ফিরে এলে জয়পুরের রাজা আমার অতিশয় গৌরব কোরেছেন। সে সকল কথা থাকুক, এক্ষণে কি সংবাদ বলুন। রাজা কি আমাদের আশ্রয় দেবেন বোলেছেন?”

আশ্রয় দিতে রাজা বিলক্ষণ আগ্রহ আছেন, শুধু আশ্রয় কেন, তিনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, আমাদের বৃহৎ আড়ম্বরের সহায়তাও কোরবেন, বরং এখানে অন্যান্য একটি বৎসর অবস্থান করবার নিমিত্ত জেলাজিদি কোচ্ছেন। ততদিন বাস কোলে বিস্তর অল্পকূল মিত্র পাওয়া বাবে, তন্নিম্ন বিস্তর লঙ্ঘরও সংগৃহীত হবে, তখন আরজজেবের সমকক্ষ হয়ে যুদ্ধ কোত্তে পারবো।”

আমরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পোড়েছি,

এক্ষণে বিশ্রাম কোত্তে যাব, এমন সময় একটি রজপুত সর্দার ধূলার ধসরিত হয়ে আমাদের ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ কোলে। তার মুখে গুলেম, আরজজেব হকুম দিয়ে সুলতান মামুদের গমদান নিয়েছেন। ন্য-  
মহল, যাকে লোকে জীবা বোলে ডাকে, বৃদ্ধ বাদশাহের সহায়তা কোরেছিল, বাদশা যাতে পালিয়ে পাহান কোত্তে পারেন, তারই চেষ্টা পেয়েছিল, তার উপপতিও ঐ অপরাধে লিপ্ত ছিল। শাজাহান বাদশাহ রাজব্যবহার্য্য রত্নগুলি প্রাপণপণ্যে রক্ষা কোস্তেন, সেই-  
গুলি তাদের ঘৃণ দিতে স্বীকার কোরেছিলেন, আরজজেব সেই সন্ধান জানতে পেরে ন্য-  
মহলকে আর তার উপপতি দুর্গাধাককে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের কচক্র কুপবামশ করা জন্মের মত ফুরিয়ে গিয়েছে। পাপীয়সী নূরমহলের প্রতি যে সুবিচার হোচ্ছে, সেই কথা শুনে আছাদে পুলকিত না হয়ে থাকতে পারেন না, আমার পিতাও শুনে অত্যন্ত উজ্জাসিত হোলেন। আমি নিজা বাবার জন্ত অনেক যত্ন পেতে লাগলেম, নিজা কিন্তু কোন মতেই হোলো না। অবস্থার কি বিচিত্র পরিবর্তনই চক্ষে দেখ-  
লেম,—নিঃসহায়, নির্ধার, নিরুপায় হয়ে, অনাথার স্রাস-দেশবিদেশ টো টো কোরে ফিরেছি; কখনও বৃক্ষতলায় শয়ন কোরে

কখনও বা পাত্রাভানে

এক্ষণে

কোথায়? আজ

হয়েছি, আমার পিতা বুবারাজ, আমার পাণ্ডেই

শয়ন কোরে আছেন। এটি কি স্বপ্ন? না

যথার্থই সত্য? যে আমি অন্ন-বস্ত্রের অভাবে

পথের কাঁজাল হয়ে রাতারা রাতারা বেড়ি-

য়েছি, সেই আমি আজ কি রাজপুত্র

হোলেম!! সেই আমি আজ কি দুর্দান্ত

জাহাঙ্গীর সম্রাটের পৌত্র হোলেম!! সংসা-

রের লাল। কি বিচিত্র! যে শাজাহানের

নিকট আমি প্রথম চাকুরী স্বীকার করি, যার

আজ্ঞা চিকাল শিরে বহন কোরবো বোলে প্রতিজ্ঞা করি, সেই নির্ভর নরহত্যা শাজাহান এক্ষণে আমার খুল্লতাতে হোলেন। আমার পরমশত্রুদিগের পক্ষ হয়ে এতদাল পরিভ্রম কোন্তে কোন্তে শরীর পতন কোরেছি, যে শত্রুকে সিংহাসন থেকে টেনে ছুড়ে ফেলে দেওয়াই বে হস্তের উচিত কার্য্য ছিল, সেই হস্ত কিনা সেই শত্রুকে সিংহাসনের উপর অচল রাখবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কোরে-ছিল! হার! সংসারের চরিত্র কি অদ্ভুত! বিধাতার খুটিল পথ কারুরই বোধগম্য নয়, সেই আমি এক্ষণে রাজপুত্র হোলেম, এ কথার প্রতি কেহই প্রতিবাদ কোন্তে পারেন না। আমি রাজপুত্র হোলেম বটে, রাজপদের কিন্তু কোন চিহ্ন নাই,—রাজ-সম্পদ নাই, রাজ-বাক্স নাই, রাজ-পারিষদ নাই, রাজ-পদের পৌরব রক্ষা করি, তার মত অর্থবলও নাই, লোকবলও নাই। তবে কথা এই, রাজপদ পাবার জন্য উত্তরকালে কথির-প্রাবিত ঘোর হুনিবার সময়ানল প্রজালিত কোন্তে হবে, সেইটিই কেবল মনের মধ্যে দেদীপ্যমান হয়ে জাগরুক রয়েছে। আমার ভ্রাতা ইউসোফ, সেই বা কোথায়? কি কোরেই বা তারে আমাদের বংশবৃত্তান্ত অবগত করাবো? এই সকল চিন্তার আন্দো-লনে হয়ে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে মহা-দুঃখ লাগলো, তাই আজ নি হয়ে কথাবার্তা দে-দিই-কলা, কখন কোতো সাহসী বা হয়ে কোতো সাহসী হইবো? এই বোধ হইতে লাগলো, আমি চোরাগা-হ উপস্থিত হয়ে ভামাম রাজ ছটফট কোন্তে কোন্তে নিশি প্রভাত কোলেম। প্রভাতে সকলের আগে গাজোখান কোলেম, সুস্বিষ্ট প্রাতঃসমীরণ সেবন কোরে অনেক সুস্থও হোলেম।

প্রভাতে শুন্লেম, সম্রাট শাজাহান মানবলীলা সংবরণ কোরেছেন। এই সংবা-দের পরক্ষণেই শুন্তে পেলেম, আরাজ্জবের বাক্রোধ হয়েছে, রাজপুত্র নিদান সজ্ঞাপন। ইউসোফের, কি পলাতক সুলতার কোন

সংবাদই অবগত হোতে পারেন না। ইতি-মধ্যে ঐ বংশারিতে একজন সৈনিক কর্ণচারী এসে উপস্থিত হোলেন। সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য রাজপুত্র সুলতার অল্পগমন কোরেছিল, তাই মুখে শুন্লেম, হতভাগ্য ইউসোফ মানব-লীলা সংবরণ কোরেছেন,—বাস্তবিক তিনি অনাহারেই প্রাণত্যাগ কোরেছেন। পথ চোন্তে চোন্তে অস্থি-চর্ম অবশিষ্ট হয়ে আরাকানের নিকট সংসারমারা পরিত্যাগ করেন। ঐ আরাকান থেকে রাজপুত্রের সহিত পালিয়ে প্রস্থান কোচ্ছিলেন। ইউ-সোফ প্রাণ পরিত্যাগ কোলেন, তখাচ রাজ-পুত্রের সজ পরিত্যাগ করেন নি। এই কর্ণ-চারীর মুখে সুলতান সুলতার প্রস্থানের বিষয় কতক কতক অবগত হোলেম, সে বৃত্তান্ত এই :—

কর্ণচারী বলতে লাগিলেন, 'এই রাজ-পুত্র অতি কষ্টে পোড়েও, অতি দুরবস্থাপন্ন হয়েও তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁর দৃঢ়সঙ্কল্প পরি-ত্যাগ করেন নাই, শেষে কিন্তু দুর্দান্ত প্রতি-কুলাদৃষ্টের সহিত পরাভূত হয়ে তাঁর সর্বজনী ভ্রাতা আরাজ্জবের নিকট অবসর হোলেন। আমীর জেমলার সৈন্য বেড়াজালের ন্যায় তাঁর চতুর্দিক ঘেরে ফেলেছিল, তাই রাজ-পুত্র পালিয়ে ঢাকায় যেতে বাধ্য হোলেন। ঢাকা শেষ সত্তর, বঙ্গদেশের মধ্যে সমুদ্র-তীরে অবস্থিত করে। সেখানে গিয়ে জাহাজ দুস্ত্রাপ্য হোলো, কোন্ দিকে যাবেন, কার আশ্রয়ে বাস কোরবেন, তারও ঠিকানা ছিল না। তাই রাজপুত্র চারিদিক অকূল-পাথার দেখতে লাগলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান বাজকে আরাকানের রাজার নিকট পাঠিয়ে দিলেন, রাজা তাঁকে অল্পদিনের নিমিত্ত আশ্রয় দিতে পারেন কি না, তাঁর রাজ্য দিয়ে তাঁকে মক্তার গমন কোন্তে অত-মতি কোরবেন কি না, এই দুই কথা জিজ্ঞাসা কোরে পাঠালেন। রাজপুত্র যথোপযুক্ত কালে ঐ পথ দিয়ে মক্তার বাত্রা কোরবেন, মক্তা হয়ে মদিনায় যাবেন, সেখান থেকে তুরকী দেশে বা গায়হানে গিয়ে বাস

কোরবেন। আরাকানের রাজা পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী, তিনি রাজপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, সুতরাং সুজার আহ্বানের নিমিত্ত কতকগুলি জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন, জাহাজগুলি পর্তগীজ নাবিক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং পর্তগীজ সৈন্য দ্বারা চালিতও হয়। সুজা জলপথে যাত্রা কোরে বিস্তর অশ্রমে, বিস্তর পারিশ্রম সঙ্গে লোরে আরাকানে উপস্থিত হোলেন। আরাকানপতি মহাসমাদরের সহিত রাজপুত্রের অভ্যর্থনা কোরে যথোচিত ভদ্রতা প্রদর্শন কোলেন, তদ্বিধা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবার সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত কোরে দিলেন।

জলপথে মক্কা যাত্রা করবার মূলময় উপস্থিত হলো, রাজপুত্র জাহাজের প্রার্থনা কোরে নিত্য দরখাস্ত কোতে লাগলেন। আরাকান-রাজা কিন্তু জাহাজ প্রদান কোতে তাদৃশ সম্মত হোলেন না, তার তাৎ-

এই, সুলতান সুজার সঙ্গে প্রথম প্রথম যেকোন সদাসর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ কোতেন, হদানীং আর সেরূপ আত্মীয়তা রক্ষা কোতেন না, বরং অনেক তাচ্ছিল্যই কোতে লাগলেন। সুলতান সুজা রাজার বিরুদ্ধ-জ্ঞাব দেখে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান বাজকে বিস্তর বহুমূল্যের উপহার দিয়ে আরাকান-পতির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। পুত্রের যুগ দিয়ে এই ওজর কোলেন, তিনি শারীরিক অসুস্থ, তাই স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ কোতে পারেন না।

রাজপুত্র তত তোষামোদ কোলেন, তথ্যচ মক্কা যাবার জন্য জাহাজ পাবার কোন কিনারা হলো না। সে বিষয় যাই হোক, একটি কথা শুনে আমরা কিন্তু হতবুদ্ধি হোলেম। আরাকানপতি বোলে পাঠালেন, সুলতান সুজার কন্যাগুলিকে তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। সুজা এই প্রস্তাবে অসম্মত হোলেন। আরাকানপতি শুনে অগ্নি-অবতার হয়ে উঠলেন, সুতরাং সুজার অবস্থা নিরুপায় হয়ে পোড়লো, তখন আবার মক্কা যাবার সময়ও অতীত হয়, এক্ষণে কর্তব্য

কি? একটা উপায় অবগত হই। কোয়েই নয়, তাই সুজাকে উন্নতপ্রায় হয়ে দুঃসাহসের উপর আশ্রয় কোড়ে হয়েছিল। এই পৌত্তলিক দেশে অনেকগুলি মূলমানের বাস ছিল, সেই মূলমানগুলিকে সুজা আপনাব হস্তগত কোলেন, তদ্বিধা প্রায় তিন শত অশ্রুর তাঁর সঙ্গেও ছিল, তাই রাজপুত্র স্থিত কোলেন, এই মূলমানগুলিকে লোরে মক্কার অজ্ঞাতে একদিন রাজবাটী চড়াও কোরবেন, চড়াও কোরে সপরিবারে রাজাকে প্রাণে সংহার কোরে রাজসিংহাসন স্বয়ং অধিকার কোরবেন। কতকগুলি পর্তগীজও এই দুর্মম কল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সকলেরই মনে অতিশয় উৎসাহ জড়িল, সকলেই মনে মনে স্থির কোলে, এই উপলক্ষে দেশটি হস্তগত হবে, তার সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, তাঁদের অতিশ্রীয়া সুসিদ্ধ হবার সম্ভাবনা তোলে হোতে পারতো, বিধাতার কৌশল কিন্তু আত্ম-সংগত, যে দিন রাজবাড়ী আক্রমণ কোরবেন মনস্থ কোরেছিলেন, তার পূর্বদিন আরাকানপতি সুজার চরভিসন্ধির সন্ধান অবগত হোলেন, সুতরাং আমাদের যুক্তি, কিকির, কৌশল সকলই বিফল হলো, আমাদের সব অভিসন্ধি যেন বানের জলে ভাসিরে নিয়ে গেল, সুজা সপরিবারে ধ্বংস হবেন, তাইই উপক্রম হয়ে দাঁড়ালো, আমরা পালিয়ে পিণ্ডিতে যাব।

বোলেই।  
কয়েক পুত্র  
রোগা হন তখন  
রেন নি, তাই চৌলভে  
না গেলে, নানাহারে পথিমধ্যে  
অবসর হয়ে প্রাণত্যাগ কোলেন, সেটি তাঁর  
পক্ষে কল্যাণকরই বোলেতে হবে, যেহেতু,  
তাঁকে আর রাজকোপে পোড়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা  
ভোগ কোরে মোতে হলো না। আমরাও  
দৌড়িতে দৌড়িতে ক্লান্ত হয়ে পোড়লেম,  
আমাদের গতিশক্তি রহিত হয়ে এলো, দুই  
হাঁটু অবশ হয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়তে  
লাগলো, সুতরাং শত্রুপক্ষেরা এসে আমাদের  
ঘেঁষে কলে ঘেঁষার কোলে, আমরা তখন













